SAMSAPTAK
ISSN: 2454-4884
ESTD.- 2015
PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

SAMSAPTAK
ISSN
INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
INDIA
2454-4884

A Bengali Peer-Reviewed & Refereed Journal

সংশপ্তক

দশম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা
ডিসেম্বর-২০২৪

বিশেষ সংখ্যা

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান

ও অন্যান্য প্রবন্ধ

পত্রিকা অধিকর্তা
ড. উৎপল মণ্ডল

সম্পাদক
উত্তম দাস

সহ-সম্পাদক
অতীশচন্দ্র ভল্লা

সংশপ্তক

SAMSAPTAK

Peer-Reviewed & Refereed Journal

A bi annual journal based on research social ,literary and cultural discourse

সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক পত্রিকা

২০২৪ ,ডিসেম্বর

2024 ,December

Vol.10, Issue- I

দশম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা

ISSN-2454-4884

Title of the magazine – Samsaptak

পত্রিকার নাম – সংশপ্তক

The language in which Published – Bengali

যে ভাষায় প্রকাশিত – বাংলা

Periodicity of Publication – Six monthly

ব্যবধান – ষাণ্মাসিক

Magazine Director – Dr. Utpal Mandal

পত্রিকা অধিকর্তা

ড. উৎপল মণ্ডল

Name of the editor – Uttam Das

সম্পাদকের নাম - উত্তম দাস

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : বর্ণমিছিল আর্ট প্রেস , সিউড়ি

প্রচ্ছদ- উত্তম দাস

মূল্য – ৭০০/-

সূচিপত্র---

সম্পাদকীয়- i

বিশেষ সংখ্যা ---

- চর্যাপদ ও নিম্নবর্গীয় মানুষজন
  ড.রাকা মাইতি-- 1
- চর্যাপদের প্রান্তীয় লোকজাগরণ:প্রসঙ্গ সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন'
  ড.এমডি.বাবুল হোসেন - 7
- রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণে তারাশঙ্করের ছোটগল্প
  অন্তরা চ্যাটার্জী - 12
- সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাসে প্রান্তিক লোকজীবন
  বাবলী বর্মন- 18
- জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের নীরব প্রতিবাদ
  ড. বিপুল মণ্ডল- 25
- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের পেশা ও ভাষা : একটি সমীক্ষা
  ড. হজরত উমার ফারুক- 30
- সত্তর-আশির দশকের লেখক অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরার গল্পে নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা:
  জয়া প্রধান - 36
- নিম্নবর্গীয় নারীর অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই : অনিল ঘড়াইয়ের নুনবাড়ি
  কনিকা সরকার- 41
- মনসামঙ্গল কাব্যে নিম্নবর্গের বিবর্তন
  ডঃ কোহিনূর বেগম- 45
- হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প : নিম্নবর্গের নিখুঁত চিত্রায়ণ
  মানস রঞ্জন বণিক- 49
- সমরেশ বসুর ‘কিমলিস্’ গল্পে শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম
  ড. মৌসুমী পাল-- 54
- নিম্নবর্গীয় চরিত্র : সভ্যতার অন্তরালে চিরায়ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক
  মৃণালকান্তি মুর্মু- 59
- ‘সাপের ঝাঁপি বুকে’— তারাশঙ্করের বেদেনীরা
  ড.প্রীতম চক্রবর্ত্তী- 64
- কল্লোল-পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের নির্মাণ (নির্বাচিত)
  রাহুল মণ্ডল- 70
- সুন্দরবনের জেলেনি ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ-আখ্যান : অমর মিত্রের ধনপতির চর
  ড. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম- 76

- নিঃস্বতা-ক্ষুধা-বঞ্চনায় নিম্নবর্গের আত্মা : শৈবাল মিত্রের গল্প
  রেজাউল ইসলাম- 85
- জোছন দস্তিদারের ‘দুই মহল’ নাটক: প্রতিবন্ধী নিম্নবর্গীয় মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অস্তিত্বসংকট
  রিঙ্কু প্রামাণিক - 90
- ‘বি.টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের শ্রেণিদ্বন্দ্ব
  ড. শান্তনু প্রধান-- 95
- মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিরোধ
  ড. শুভেন্দু মণ্ডল-- 103
- রাজশেখর বসুর ‘দক্ষিণ রায়’ ছোটোগল্প : নিম্নবর্গের অবস্থান ও উচ্চবর্গের রাজনৈতিক বোঝাপড়া
  সোমনাথ চ্যাটার্জী - 110
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দলিতদের অবস্থান
  ড. ব্রততী রানী মাইতি সাহু-- 118
- নিম্নবর্গীয়দের জীবনকথায় সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’
  ছন্দা পাল- 123
- শবর চরিত এক নিম্নবর্গীয় আখ্যান : কথাশিল্পী নলিনী বেরা
  জাহানারা খাতুন- 129
- **শেখর দেবরায়ের ‘মনসাকথা' : নিম্নবর্গীয় মানুষের আত্মজাগরণের ইতিহাস**
  ড. মাগফেরা বেগম - 137
- প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পঃঅবহেলিত মানুষের প্রতিবেদন
  প্রসেনজিৎ সরকার- 143
- তারাশঙ্করের উপন্যাস : নিম্নবর্ণের জীবন-বেদ
  সুনীল মণ্ডল- 149
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি : নিতাই কবিয়াল
  ড.উত্তম দাস- 154
- ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে মালো সম্প্রদায়ের জীবনবেদ
  দেবলীনা বিশ্বাস- 160

সাধারণ সংখ্যা—

- মতি নন্দীর ‘কোনি’ - প্রত্যয় ও প্রাণশক্তির আশ্চর্য ঐকতান
  ড. অচিন্ত্য মাজী - 166
- মনস্তত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘অন্তঃশীলা’
  বাণী রায় – 172

➢ স্বার্থপরতাই স্বর্গে পৌঁছানোর সোপান (সসস)
ড. দীনবন্ধু বিশ্বাস - 178
➢ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শোচক
হুমায়ুন কবির - 183
➢ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলঃ উনবিংশ শতকের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক
মহুয়া মুখার্জী- 188
➢ ঔপনিবেশিক পর্বের অভিনীত বাংলা নাটকে সঙ্গীত ও নৃত্য
ড. মানিক বিশ্বাস- 194
➢ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস ' উপন্যাসে তৎকালীন আঞ্চলিকতার প্রেক্ষাপটে তাঁদের জীবনচিত্র
মিতা বাগ- 200
➢ দেবদাসীদের শিকল ভাঙার আখ্যান - পারাবতের ‘বিজয়নগর’
মিঠুন মণ্ডল- 208
➢ উত্তর আধুনিকতা ও ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা: একটি মূল্যায়ন
মৌসুমী নন্দী- 212
➢ ফিরে দেখা : সুলেখা দাশগুপ্তের জীবন-জিজ্ঞাসা
ড. নাজমা ইয়াসমিন- 218
➢ ‘রাগশর’ উপন্যাস : গুরু-শিষ্য সম্পর্কের অনন্য আখ্যান : ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
পায়েল হালদার - 223
➢ সমরেশ বসুর ‘এসমালগার’ গল্পে উদবাস্তুদের ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রচেষ্টা
পিউ দত্ত - 227
➢ দুঃখ ও তার অভিভবের উপায় : একটি সাংখ্যীয় সমীক্ষা
প্রসেনজিৎ খাঁ- 232
➢ অবিভক্ত মেদিনীপুরের ঐতিহ্য পটচিত্র ও পটুয়া সম্প্রদায়: একটি পর্যালোচনা
প্রভাস মাইতি- 236
➢ রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিল চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর
রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা- 240
➢ দীপেন্দ্রনাথের ছোটগল্প : সমকালের প্রেক্ষিতে
ড. রাজীব ঘোষ- 245
➢ মতি নন্দীররচনা :সাহিত্য ও বাস্তব ক্রীড়া-কাহিনির এক অভূতপূর্ব মিশেল
মহঃ রেজ্জাক আনসারি- 251
➢ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ফেরিজীবীরা : ভাষা ও সংস্কৃতির নতুন দিক
ড. সাগর দেবনাথ- 256
➢ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পাতঞ্জলযোগ ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে রাজযোগ
সায়ন ভট্টাচার্য্য- 271

- একই রক্ত বুকের তলে : ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাস
  ড. শর্মিষ্ঠা সেন- 276
- ‘অদ্ভুতুড়ে’ চরিত্রের ঘনঘটায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শিশু-কিশোর সাহিত্য :
  চরিত্র চিত্রণের এক নতুন আঙ্গিক
  সৌরভ চক্রবর্তী – 282
- শ্যামল সিংহের কাব্যগ্রন্থ ‘চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা’ : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
  ড. সুবীর বসাক – 287
- মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প
  ড. সুব্রত পাল - 294
- অণুগল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী :- একটি পর্যালোচনা
  সুমন সরকার - 301
- যুগ সন্ধিক্ষণের নির্মাণ ও বিনির্মাণে কবি তরুণ সান্যাল
  তমাল মুখোপাধ্যায় - 305
- মায়ের প্রেমিক : এক নারীর জীবন সংগ্রাম ও প্রেমাস্পর্শে উত্তরণের আখ্যান
  তনয়া দাস - 314
- দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান: বাংলা সাহিত্যের নিঃসঙ্গ জহুরীর আশ্চর্য জীবন নির্মাণ
  উজ্জ্বল গরাই- 320
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প উপন্যাসে বিহারের লোক জীবন
  অতীশচন্দ্র ভল্লা- 325
- মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোকনৃত্য: নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা
  সাবিনা বিশ্বাস - 329
- সৈকত রক্ষিতের মদনডেরি :বাদ্যযন্ত্রে জনজাতির হদিশ
  ড. অর্ধেন্দু সরকার-333
- মনোজ মিত্রর পুরাণের মুখচ্ছদে এক রাজনৈতিক স্যাটায়ার : ‘ নরক গুলজার ’
  বিশ্বজিৎ কোনার- 336
- মধুসূদন দত্তের ‘দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা’ : বহুমাত্রিক অন্বেষণ
  ড.দেবযানী ভট্টাচার্য্য - 342
- কাঁটাতারে ক্ষত-বিক্ষত জীবনাখ্যান (রমেশচন্দ্র সেনের পথের কাঁটা আর প্রফুল্ল রায়ের - রাজা আসে রাজা যায়)
  গৌরাঙ্গ পাল- 351
- সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ‘সহরায়’ উৎসবে পুজো-পার্বণের রীতি-নীতি ও ‘সহরায়’ গানের তাৎপর্যতা :
  ইন্দ্রাণী মুর্মু - 354
- ব্যক্তি জীবন থেকে কর্মময় জগতের সংক্ষিপ্ত পরিসর : প্রসঙ্গ কালীপ্রসন্ন সিংহ
  ইতিষা নন্দী- 360

➢ লীলা মজুমদারের উপন্যাসে স্বতন্ত্র নারী চরিত্র
পরিতোষ পাল , ড. উৎপল মণ্ডল - 366
➢ শিবায়নের চাষপালা : কবি রামেশ্বরের মৌলিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ
প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী- 369
➢ 'এক অন্তহীন আত্মানুসন্ধানঃ সন্মাত্রানন্দের 'নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা'
প্রভাত দাস - 375
➢ বনফুলের 'কৈকেয়ী' নাটক: নবভাবনায় রামায়ণ
পূজা পাসী - 380
➢ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : সামাজিক বৃত্তি ও মানবের ইচ্ছাশক্তি
সুজিত কুমার সাহু- 384
➢ "দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি':
বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থান"
সুস্মিতা গুহ - 389
➢ সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত
তাপস পাল - 397
➢ বিনতা রায়চৌধুরী রচিত ছোটোগল্প : বার্ধক্য জীবনের সংকট ও মধ্যবিত্ত নারীজীবনের আত্ম সংকটের প্রেক্ষিতে
অভিজিৎ দেবনাথ - 406
➢ টুসু গানে রাধা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ
ড. শান্তনু ভট্টাচার্য - 412
➢ 'মৌরিফুল' ও 'দ্রবময়ীর কাশীবাস': এক নতুন ধরনের সন্ধানে
প্রসেনজিৎ রায়- 417
➢ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা পরিভাষা
সায়ক বসু- 421
➢ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাস : প্রসঙ্গ স্থান-পরিসর
সন্দীপ দাস- 428
➢ অমর মিত্রের উপন্যাসে 'সময় থেকে সময়ান্তরে যাত্রা' ; একটি পর্যালোচনা
দীপক পাত্র- 436

সম্পাদকীয়-

'সংশপ্তক' পত্রিকার এই সংখ্যায় যারা প্রবন্ধ লিখেছেন, তাদের প্রত্যেককে 'সংশপ্তক' পত্রিকার পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। প্রথম থেকেই এই পত্রিকা সকলের ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও সহযোগিতা পেয়ে এসেছে , ভবিষ্যতেও পাবে - এই আশা রাখি।

বাংলা সাহিত্যের নিম্নবর্গের অবস্থান জানার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এই সাহিত্য, সমাজ এবং ইতিহাসের গভীরতর উপলব্ধি তৈরি করে। শুধু তাই নয় , সাহিত্যে নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে আমরা সমাজের অবহেলিত, শোষিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের বাস্তবতা, তাদের সংগ্রাম এবং তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করতে পারি। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের গুরুত্ব শুধু সাহিত্যিক নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এই সাহিত্য নিম্নবর্গের প্রতি যেমন সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছে তেমনি সাম্যের ধারণা প্রসারেও ভূমিকা রেখেছে। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ কেবলমাত্র একটি বিষয় নয়; এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন। নিম্নবর্গের জীবনচিত্র সাহিত্যে বাস্তবতা, মানবিকতা, এবং সাম্যের ভাবনা নিয়ে এসেছে। যা সাহিত্যের গুণগত মান এবং প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়েছে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নিম্নবর্গীয়দের জীবনযাত্রা এবং তাদের অবদান সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলোর সাক্ষ্য দেয়।নিম্নবর্গ বলতে সেই শ্রেণি বা সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়, যারা সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রান্তে অবস্থান করে। বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন সময় এই নিম্নবর্গের জীবনের কথা তুলে ধরেছে, যা সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয়দের উপস্থিতির কথা উপেক্ষা করলে সাহিত্য পুরোপুরি বোঝা মনে হয় অসম্ভব । নিম্নবর্গীয় চরিত্র এবং তাদের জীবনের কাহিনি সাহিত্যে সমতার বোধ এবং মানবিকতার গভীরতা যুক্ত করে।সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। নিম্নবর্গের মানুষরা সমাজের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। তাদের অবস্থান জানা মানে সমাজের শোষণ, অসমতা এবং ক্ষমতার কাঠামোর প্রকৃতি বোঝা। যা আমাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান বুঝলে তাদের দুঃখ, কষ্ট এবং সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি তৈরি হয়। সাহিত্যে এই বিষয়গুলো তুলে ধরার মাধ্যমে পাঠকদের মধ্যে মানবিক বোধ ও সাম্যের চেতনা জাগ্রত হয়। উদাহরণ স্বরূপ,

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। নিম্নবর্গীয়দের জীবন এবং সংস্কৃতি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ করে। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের অবস্থান তাদের প্রতি সমাজের শোষণ, বৈষম্য এবং অবহেলার দিকগুলোকে প্রকাশ করে। যেমন, মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় নিম্নবর্গ এবং আদিবাসীদের প্রতি অন্যায় ও শোষণের দিকটি গভীরভাবে ফুটে উঠেছে ।সাহিত্য নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান তুলে ধরে সমাজে সাম্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারে। এমনকি বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করে এটি সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে।এছাড়াও নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান জানলে সমাজের মূলধারার বাইরে থাকা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারা যায়। এটি সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তার জগতে নতুন মাত্রা যোগ করে ।

নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান বিশ্লেষণ করা মানে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।বাংলা সাহিত্যের নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান জানা সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে সমাজের গভীরতর বোধ তৈরি করে। এটি শুধু পাঠককে মানবিক এবং সমতাভিত্তিক চেতনায় সমৃদ্ধ করে না, বরং সমাজের পরিবর্তন এবং উন্নতির জন্য প্রেরণা দেয়। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিম্নবর্গের গুরুত্ব অপরিসীম।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যও নিম্নবর্গের মানুষের দুঃখ-কষ্ট, শোষণ এবং বিদ্রোহকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছে। সেলিনা হোসেনের লেখায় নিম্নবর্গের গ্রামীণ জীবন, অভাব, এবং মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে।এমন প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায় । উপরিউক্ত কারণ গুলোর বাইরেও একাধিক কারণ থাকতে পারে ।

যাইহোক ,বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান ছাড়াও এই সংখ্যার সাধারণ বিভাগে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক যেসব প্রবন্ধ এসেছে , সেই প্রবন্ধগুলিও মৌলিক ভাবনাজাত এবং গবেষণাধর্মী ।

চর্যাপদ ও নিম্নবর্গীয় মানুষজন

ড. রাকা মাইতি
অধ্যাপিকা ,বাংলা বিভাগ বাজুকল মিলনী মহাবিদ্যালয় ,বাজুকল; পূর্ব মেদিনীপুর

সংক্ষিপ্তসার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'। এই বিশেষ স্বীকৃতি গৌরবে-ই যুগ যুগ ধরে গৌরবান্বিত হয়ে থাকবে 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আসনে। 'চর্যাপদ' ধর্ম ও জীবনের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক অপূর্ব সাহিত্য। এখানে যে জীবন প্রতিফলিত তা হল— বাংলাদেশের আদি জনগোষ্ঠীর অসহায় জীবনসংগ্রাম। একইসঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব। ফলে 'চর্যাপদ' সমকালীন বাংলাদেশের সমাজ তথা সামাজিক জীবনের বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে চর্যার কবিদের অজ্ঞাতসারে-ই। আর এই দলিলে স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়েছে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য, শোষণ, দুর্নীতি প্রভৃতি। এইসঙ্গে পরিস্ফুট সমাজের নীচুতলা মানুষজনের জীবনের সামগ্রিক পরিচয় অর্থাৎ তাদের বাসস্থান, খাদ্য, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি। ফলে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের ধারায় যেমন 'চর্যাপদ'-এর মূল্য অপরিসীম, তেমনি তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মের গুরুগম্ভীর তত্ত্বের সহজভাষ্যরূপেও 'চর্যাপদ'-এর গুরুত্ব যে অনস্বীকার্য তা-ই এই প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস করেছি।

সূচক শব্দ-

সাধন পদ্ধতি, নিম্নবর্গীয় মানুষ, অবৈধ সম্পর্ক, লোকায়ত বৃত্তি, যাপন চর্যার রীতি-নীতি, শ্রেণিবৈষম্য, শোষিত সমাজব্যবস্থা।

মূলপ্রবন্ধ-

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের 'দীনের সঙ্গী' কবিতায় বলেছেন—

"শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।"

কবিগুরুর উদ্ধৃত উক্তিটি মাথায় রেখে-ই আমরা কয়েক শতাব্দী পেছনে উপনীত হয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লক্ষ্য করব বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী আবিষ্কার 'চর্যাপদে'র মধ্যেও বৌদ্ধ সহজযানের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের আড়ালে খেটে খাওয়া এক বিশেষ শ্রেণির মানুষজনের অসহায় জীবনের আখ্যান বর্ণিত। পাল রাজাদের আমলে চর্যার গানগুলি রচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেনরাজাদের প্রভাবে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব বিস্তার ঘটে। এ সম্পর্কে ড. স্বপনকুমার দে বলেছেন—

"বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির প্রসারে সামাজিক স্তর বিভাগ অনুযায়ী বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত বা উচ্চকোটির এবং বেদ বহির্ভূত আচার আচরণে অভ্যস্ত মানুষ ছিল অনভিজাত বা নিম্নকোটির। তারা সমাজে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য ছিল।"[১]

এইসব অন্ত্যজ অস্পৃশ্য মানুষজনের জীবনবৃত্তান্ত-ই চর্যাপদে বর্ণিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধনসংগীত হলেও এখানেও ধর্ম তথা ঈশ্বরকে নামিয়ে আনা হয়েছে ধূলায় স্নাত ঘর্মাক্ত কলেবর খেটেখাওয়া মানুষজনের মাঝে। এইসব কর্মী মানুষদের জীবনের আধারে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকরা গুহ্য ধর্মতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। অথচ এঁরা লৌকিক জীবন বিমুখ মনন নিয়ে-ই পরোক্ষভাবে জীবনপ্রীতি-তেই একাত্ম হয়ে গূঢ় তত্ত্বকথা রচনা করেছেন। অন্যদিক, থেকে বিশ্লেষণ করে বলা যায় চর্যার সাধকরা বিশ্বাস করেন, ইহলোকের এই জীবন, মানুষজন, সমাজ-সবই অলীকে মায়ামাত্র। সত্য শুধু ঈশ্বর। আর সেই ঈশ্বর আছেন প্রত্যেকের অন্তরে। তাই সর্বাগ্রে নিজের আত্মাকে চেনা প্রয়োজন। আর সেই চেনার প্রক্রিয়া সাধনপদ্ধতির দ্বারা যেমন সম্ভব, তেমনি জীবনমুখী নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাও সম্ভব। এটা-ও এক সুন্দর পন্থা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, চর্যাপদে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষজনের জীবনচিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। এরাই তথাকথিত ভাষায় নিম্নবর্গীয় মানুষজন। বহু যুগ ধরে ভারতের সামাজিক ইতিহাসের ধারায় এই নিম্নশ্রেণির মানুষজন এক বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তবে চর্যাপদের যুগে এই নিম্নবর্গীয় বা 'সাব-অলটার্ন' শব্দটি মানুষের কাছে অজ্ঞাত-ই ছিল। মার্ক্সীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী গ্রামসি তাঁর 'Prison Notebook' গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে সর্বপ্রথম 'সাব-অলটার্ন' শব্দটি প্রয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে সেমন্তী ঘোষ বলেছেন—
"ক্ষমতা বিন্যাসের যে ধরণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চরিত্র তৈরি করে তার সূত্রেই গড়ে ওঠে ক্ষমতার অধিকারী 'উচ্চবর্গ' আর ক্ষমতাহীন 'সাব-অলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গ'।"

['বুদ্ধিজীবীর নোটবই', 'সাব-অলটার্ন'প্রবন্ধ, পৃ-৪৫২]

ফলে এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষণের রূপ যখন সীমাহীন পর্যায় অতিক্রম করবে, তখন-ই প্রবল প্রতিরোধ চরমরূপ ধারণ করবে। আর এইভাবে-ই নিম্নবর্গের মানুষজনের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একসসময় বিকশিত হবে। এইভাবে-ই ১৯৮০ সালের প্রথমের দিকে সৃষ্টি হয়েছিল 'সাব-অলটার্ন' তত্ত্ব।

সাহিত্য যেমন জীবনের দর্পণ হয়, তেমনি চর্যাপদও ধর্মের মোড়কে নিরক্ষর অসহায় নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের দর্পণ হয়ে উঠেছে। এরা-ই বাংলার আদি জনগোষ্ঠী। সিদ্ধাচার্যেরা গূঢ় ধর্মতত্ত্বকে সহজ সরল রূপে বোধগম্য করে তোলার জন্য এদের সমাজ ও এদের বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করেছেন। শুধু তাই নয় এদের ব্যবহৃত কথ্য ভাষা-ই সিদ্ধাচার্যেরা অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন। এতে চর্যাপদ-এর সাহিত্যমূল্য এক বিশেষ মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে।

চর্যাপদের যুগে প্রথমদিকে ছিল পাল রাজাদের রাজত্ব, পরে আসে সেন রাজাদের রাজত্ব। পাল রাজারা ধর্মের ক্ষেত্রে উদার মনোভাবাপন্ন হলেও সেন রাজারা মোটেও উদার ছিলেন না। ফলে এই সময় থেকেই সমাজে স্তর বিন্যাস শুরু হয়েছিল। এই সূত্রে সমাজে অভিজাত উচ্চ বর্ণরা ছিল ব্রাহ্মণ ও ধনী ব্যক্তি আর নিম্ন বর্ণের অন্তর্গত ছিল ডোম, চণ্ডাল, শবর, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণিসম্প্রদায়ের লোকজন। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, চর্যাগানে মূলতঃ বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের বিবিধ গূঢ়তত্ত্ব তথা আচরণীয় বিষয়-ই বিশ্লেষিত হয়েছে। এই সূত্রে বলা যায়, চর্যাপদের রচনাকালের ঊর্ধ্বতম সীমা অষ্টম শতাব্দী (যখন পাল রাজা গোপালদেব ছিলেন) আর নিম্নতমসীমা সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দী (যখন পালবংশের শেষ রাজা মদনপাল ছিলেন) । তবে সেন রাজাদের আমল থেকে-ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে অবশেষে নাথশৈব প্রভৃতি অন্য ধর্মের সাধনার মধ্যে মিশে গিয়ে অন্যরূপ ধারণ করে। ,

চর্যাপদে সিদ্ধাচার্যেরা ধর্মের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বকে যে সুস্পষ্ট সহজ ভাষায় বোধগম্য রূপে প্রকাশিত করেছেন, তার মূল কারণ-ই হল সাধারণ নিম্নবিত্ত নিরক্ষর মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা। এদের জীবনযাত্রার আধারেই ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। আজ থেকে বহু শতাব্দী পূর্বে ধর্মের মহিমা প্রকাশের জন্য নিম্নবর্গীয় মানুষজনের জীবনযাত্রার রূপকে এই যে সাহিত্যে রূপদান, তা চর্যাপদ-ই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় সূচনা করে দিয়েছে। ফলে একইসঙ্গে ধর্মের তত্ত্বও মানুষজন অনুধাবন করল, আবার খেটে খাওয়া নিম্নস্তরের মানুষজনের শোষিত জীবনের নগ্নরূপও প্রকাশিত হয়ে গেল, এখানেই জীবন, ধর্ম ও সাহিত্য একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গেল।

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করব চর্যাপদের যুগে নিম্নবর্গীয় মানুষজন কীভাবে বসবাস করত, এর-ই নিদারুণ চিত্র পরিস্ফুট নিম্নোক্ত চর্যায়—

"নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছই জাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।।
আলো ডোম্বি তোত্র সম করিবে ম সাঙ্গ।।"[২]

উপরোক্ত গীতটি দেশাখ রাগে রচিত, পদকর্তা কাহ্নপাদ। এখানে দেখা যাচ্ছে ডোম্বি নারী নগরের বাইরে বসবাস করছে। কারণ সে অস্পৃশ্য তাই নগরের মধ্যে তার বসবাস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাছাড়া ছোঁয়াছুঁয়ি রক্ষা করে ব্রাহ্মণবর্গকে থাকতে হয়, ধনীরাও এদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল- এইসব রমণীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করার জন্য-ই নেড়া ব্রাহ্মণরা তাদের কুঁড়ে ঘরের আশেপাশে-ই ঘোরাফেরা করতে থাকে। উপরোক্ত পদটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোম্বি রমণী নৌকায় যাওয়া আসা করে, চাঙ্গাড়ী বা 'চঙ্গতা' বিক্রি করে এরা জীবিকানির্বাহ করে। শেষপর্যন্ত কামান্ধ ব্রাহ্মণ ঐ ডোম্বিকে কাছে পায় না। কারণ সমাজ অবৈধ সম্পর্কের জন্য নিম্নবর্গীয় মানুষজনকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হতো, ধনী ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণদের জন্য তেমন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই দেখা

যাচ্ছে তখনকার দিনের সমাজে এক চরম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এর-ই জন্য সমাজে নিম্নস্তরের লোকজন বসবাস করত নগর থেকে দূরে লোকালয় ছাড়িয়ে জঙ্গল পাহাড়ের গুহায় বা মালভুমির ওপরে। এদের এই কষ্টপূর্ণ জীবনযাপনের খবর কেউ-ই রাখত না। আরেকটি চর্যাতেও এই বসবাসের চিত্র পরিস্ফুট—

"উঁঞ্চা উঁঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।"[৩]

চর্যার কয়েকটি পদে (যেমন: ৮সংখ্যক, ৪৮সংখ্যক,৪৯সংখ্যক) উচ্চবংশ, রাজ-রাজবংশ, দেশজয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যেমন -১২ সংখ্যক পদে দাবা খেলার উল্লেখ আছে-যা রাজপুরুষদের অবসর বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল—

"পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মরাড়ি ইউ
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।
মতি এঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা।
অবশ করিআ তববল জিতা।।"[৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চর্যার বেশিরভাগ পদে-ই সমাজের নীচুতলার মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসহায় জীবনযাত্রা-ই প্রতিফলিত। সমগ্র সমাজের এক বৃহৎ অংশ হলেও ঘৃণা ও অত্যাচারের ভয়ে এরা সভ্য সমাজে থেকে দূরে বাসস্থান গড়ে তুলেছে। শুধু তাই নয়, সমাজে তখন মদ্যপানের প্রচলন ছিল। এরই প্রভাবে সমাজে উচ্চ শ্রেণির লোকেরা এইসব নিম্ন শ্রেণির রমণীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করত। দুয়ারে চিহ্ন দেখে-ই গ্রাহকেরা বুঝতে পারত কোনটা শুঁড়িঘর—

"দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ।।"[৫]

মদ্যপ অবস্থাতেই উচ্চ শ্রেণির এক নাগরিক বলছে—

"আলো ডোম্বি তোত্র সম করিবে ম সাঙ্গ।"[৬]

এরূপ সদম্ভ উক্তির কোন উত্তর ডোম্বি দেয় না কারণ অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণির রমণীর এরূপ প্রেমালাপে কোন আস্থা বা বিশ্বাস কোনটাই নেই। চর্যাপদে বর্ণিত নীচুতলার মানুষজনের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপনের আরেকটি দিক হল এদের লোকায়ত বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা, ঝুড়ি বোনা—

"তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর ন চঙ্গতা।"[৭]

তুলো ধুনা, নৌকা চালনা, মদ বিক্রি ইত্যাদি। এইসব জীবিকা নির্বাহ করে খুব একটা অর্থসম্পদ এরা পেতনা। অর্থসম্পদে হীন হওয়ার জন্য এদের নিদারুণ দারিদ্র্যের মাধ্যমেই জীবন নির্বাহ করতে হতো। তখনকার দিনে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে কার্পাস চাষ ও করা হতো। এর থেকে সুতো তৈরি করে কাপড় বোনা হতো। আর ছিল মদ চোলাই-এর ব্যবসা, শুল্ক আদায়, নট বৃত্তি। একটি চর্যায় বর্ণিত আছে—

"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই।।"[৮]

এর মাধ্যমে ডোমনী নারীরা ধনী ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করত। তবে বলা যায়, এই জীবিকাগুলির মধ্যে কোনটিই সম্মানজনক ও অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক ছিলনা।

বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদে দেখা যায় নিম্নবর্গীয় মানুষজনের গৃহে পারিবারিক গঠন ছিল একান্নবর্তী অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-শালী-পুত্রবধূ ('বহুড়ী') -সকলেই আছে। একান্নবর্তী পরিবারের প্রচলন যে ঐতিহ্যধর্মী অনুসারী, 'চর্যাপদ' তার-ই ইঙ্গিত বহন করছে। অর্থের অভাব থাকলেও এরা সকলকে নিয়ে-ই সুখে থাকতে চায়। যেমন নিম্নোক্ত চর্যাটি—

"সসুরা নিগ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কাগ-ই মাগঅ।।
দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ।।"[৯]

এখানে যৌথ পরিবারের যেমন ইঙ্গিত আছে, তেমন-ই এই পরিবারে নিয়মকানুন-ও কঠোর ছিল। কারণ প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযোগ ছিলনা। তাই ঘরের বউকে শ্বশুরের ঘুমিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তারপরে সে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে যায়। এছাড়া আরো দু'একটি চর্যায় একান্নবর্তী সংসারের ছবি পরিলক্ষিত—

"সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।"[১০]

দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে সামাজিক বিবিধ রীতিনীতি, অনুষ্ঠান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সূত্রে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহকেন্দ্রিক জীবনাচরণে বিভিন্ন সামাজিক আচার বিচার জড়িত। হাজার বছর পূর্বেকার চর্যাগীতিও এর ব্যতিক্রম নয়।এইসব নিম্নবিত্ত নিরক্ষর মানুষজন যেসব রীতিনীতি মেনে চলত, তা বর্তমানে প্রচলিত বিবিধ নিয়মকানুনের-ই সূচনা রূপ বলা যায়। যেমন নবজাতক ও তার মায়ের জন্য আঁতুড় গৃহের ব্যবস্থা ছিল—

"ফিটলেসু গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।
না এথু চাহনি সো এথু নাহি।।
পহিল বিআণ মোর বাসনয়ুড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সো বায়ুড়া।।"[১১]

মৃতদেহ সৎকারের রীতি নিম্নোক্ত চর্যায় পরিস্ফুট—

"চারিবাসে গড়িল রে দিআঁ চঞ্চালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাক কএলা কান্দই সগুণ শিআলী।।"[১২]

এরপরে শ্রাদ্ধের কথাও উল্লেখ আছে—

"দহ দিহে দিধলী বলী।"[১৩]

বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে যৌতুকপ্রথা, বাসর জাগা- সব-ই যুক্ত ছিল, যা বর্তমানে বিবাহরীতির মধ্যেও পরিলক্ষিত—

"কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চরিআ।।
ডোম্বি বিবাহআ অহারিড জান।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধান।।"[১৪]

এছাড়া, চর্যাপদে দেখা যায় বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ।বিবাহ পরবর্তী সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্রও চর্যাপদে দেখা যায়—

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিনী নামে সহজ সুন্দরী।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গ অণত লাগেলী ডালী।
এ কেলী সবরীএ বন হিণ্ডুই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।।
তিআ -ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলি।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রতি পোহাহিলী।।"[১৫]

উদ্ধৃত পদটির মধ্যে নরনারীর পরিপূর্ণ সুখী দাম্পত্য মিলনের চিত্র বর্ণিত। মাঝে মাঝে দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি হলেও পরক্ষণেই আবার মিলনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । তবে এর মধ্যেও অভাব অনটন, অতিথির আগমন লেগেই আছে—

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী।।
বেগ সংসার বডহিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়।।"[১৬]

সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যেও এইসব মানুষগুলি অতিকষ্টে জীবন নির্বাহ করে। ঠিক একই চিত্র দেখা যায়—

"কবরী ন লেই, বোড়ী ন লেই, সুচ্ছড়ে পার করেই।"[১৭]

কিংবা দরিদ্রা গর্ভিনী নারীর উক্তি—

"হাঁউ নিরাসী খমন সাঈ।"[১৮]

এদের বিত্ত বৈভবের চিহ্নমাত্র নেই। তাই নিচুতলার রমণীরা ময়ূরপুচ্ছের পরিধান, গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা পরিধান করেই খুশী। অনেকসময় এরা খিদের জ্বালায় পদ্মের ডাঁটা খেয়ে থাকত। দৈনন্দিন জীবননির্বাহে গৃহস্থালীর উপকরণ হিসাবে এরা ব্যবহৃত করত-হাঁড়ী, পিটা (দুধ দহনের পাত্র), ঘড়ি বা ঘড়া, গাড়ু প্রভৃতি। অলংকারের মধ্যে ছিল কানেট (কর্ণভূষণ), আরশি, নূপুর প্রভৃতি। ব্যবহার্য বাদ্যযন্ত্র ছিল মাদল, কাঁসি, ডমরু, বীণা, বাঁশি, অস্ত্রশস্ত্রাদির মধ্যে ছিল কুঠার, টাঙ্গি, তালাচাবি প্রভৃতি।

সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে লড়াই করে মানুষগুলো বেঁচে থাকলেও, শান্তির উপায় ছিল না। কারণ চুরি ডাকাতির উপদ্রব লেগেই থাকত কারণ মাঝরাতে ঘরের বউ-এর কানের ভূষণ চুরি হয়ে গেল-এমন নিদর্শনও চর্যাপদে বিদ্যমান।তবে এইসব রোধ করার জন্য থানা কাছারি ('উআরি'-১২), কোটাল ('দুষাদি'-৩৩)-এসব ছিল। কিন্তু জোরদার ডাকাতি হলে, বাঁচামরা -এদের দুই-ই সমান হয়ে উঠত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চর্যাপদের যুগে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য অত্যন্ত প্রকট ছিল। এইজন্য এইসব শ্রমজীবী নিম্নবর্গীয় মানুষজনের কাছে বেঁচে থাকার একমাত্র মূলধন ছিল কায়িক পরিশ্রম, বুদ্ধিচর্চা এখানে গৌণ। শোষণের রূপ যে কতটা নির্লজ্জ রূপ ধারণ করতে পারে, তার প্রমাণ চর্যাপদে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় মানুষজনের জীবনযাত্রা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল- এই সামগ্রিক জীবনযাত্রার বেশিরভাগ দিক-ই বর্তমানে বাঙালীদের দৈনন্দিন জীবননির্বাহে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই অবলীলায় প্রবিষ্ট হয়েছে। একদিকে ধর্মের মহিমা ও তত্ত্ব প্রকাশ, অন্যদিকে সমাজে শোষিত অবহেলিত নিঃস্ব মানুষবর্গের জীবনযাত্রার রূপায়ণ-এই দুই-এর অপূর্ব মেলবন্ধনে চর্যাপদ নিঃস্ব সাধারণ মানুষজনের জীবনের অনবদ্য চিত্রশালা হয়ে উঠেছে বলা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে মানব ইতিহাসের ধারায় দেখা যায় একদল মানুষ শুধু-ই অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিনের পর দিন অন্যদলের মুখে অন্ন জুগিয়েছে নিঃস্বার্থ ভাবে অথচ তারা হয়ত কোনদিন অন্ন খেয়েছে, কোনদিন নিরন্ন থেকেছে। যুগে যুগে এইসব নিম্নবর্গীয় মানুষজনের নিঃস্বার্থ মানবসেবা ও কষ্টপূর্ণ জীবনসংগ্রাম ঈশ্বর মহিমা অপেক্ষা কোন অংশে খাটো নয়। তাই পৃথিবীর বুকে এরা চিরকাল-ই অমর হয়ে থাকবে এদের কর্মের দ্বারা। তাই চর্যাপদের সাধক তথা কবিবৃন্দ অত্যন্ত বিচক্ষণপূর্ণ ও সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব ও নিরক্ষর ভদ্রেতর মানুষজনের জীবনসংগ্রামকে একইসঙ্গে গ্রথিত করেছেন। ফলে ধর্ম ও জীবন একইসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল—

"রাখোরে ধ্যান থাক রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।।"

['ধূলামন্দির', *গীতাঞ্জলি, সঞ্চয়িতা* : রবীন্দ্রনাথ]

তথ্যসূত্র:

১. দে, স্বপনকুমার, *চর্যাগীতি রূপে রূপান্তরে,* ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীপঞ্চমী, ১৪২৭, পৃ:-২৪০

২. রায়, দিলীপকুমার, *চর্যাগীতি প্রসঙ্গ,* গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ,বইমেলা, ২০০৮, পৃ:-৬৫

৩. দে, স্বপনকুমার, *প্রগুক্ত,* পৃ:-৬৮

৪. মজুমদার, অতীন্দ্র, *চর্যাপদ,* নয়া প্রকাশ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ,জানুয়ারী, ২০২৩, পৃ:-১২০

৫. তদেব, পৃ:- ১০৯

৬. তদেব, পৃ:-১১৭

৭. তদেব, পৃ:-১১৭

৮. তদেব, পৃ:-১২৬

৯. তদেব, পৃ:-১০৮

১০. তদেব, পৃ:-১১০

১১. তদেব, পৃ:-১৩০

১২. তদেব, পৃ:-১৬৪

১৩. তদেব, পৃ:-১৬৫

১৪. তদেব, পৃ:-১২৮

১৫. তদেব, পৃ:-১৩৮

১৬. তদেব, পৃ:-১৪৪

১৭. তদেব, পৃ:-১২২

১৮. তদেব, পৃ:-১৩০

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সঞ্চয়িতা,* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ৯ই মে,২০০৫

২. মজুমদার, অতীন্দ্র, *চর্যাপদ,* নয়া প্রকাশ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারী, ২০২৩

৩. দাশ, নির্মল, *চর্যাগীতি পরিক্রমা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৮

৪. রায়, দিলীপকুমার, *চর্যাগীতি প্রসঙ্গ,* গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ,বইমেলা, ২০০৮

৫. দে, স্বপনকুমার, *চর্যাগীতি রূপে রূপান্তরে,* ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীপঞ্চমী, ১৪২৭

....

চর্যাপদের প্রান্তীয় লোকজাগরণ:প্রসঙ্গ সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন'

ড.এমডি.বাবুল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ:

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম। তাঁর 'নীল ময়ূরের যৌবন' অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদের সময়কালের পটভূমিতে রচিত একটি উপন্যাস। হাজার বছরের প্রাচীন কালের চর্যার কবিদের কাব্য বিষয়কে ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব ভাবনায় স্বাধীন রূপ দিয়েছেন। এই উপন্যাসের বৃহৎ ক্যানভাস জুড়ে আছে প্রাচীন যুগের কবিগণ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাহ্নপা। কাহ্নপাকে গুরুত্ব দিতে গিয়েই অন্যান্য চরিত্ররা এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। তাঁরাও কবি। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের দান অসামান্য। তাঁদের মূল সংগ্রাম ছিল রাজভাষার বিরুদ্ধে অর্থাৎ সংস্কৃতের পরিবর্তে মুখের ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। বিভিন্ন ধরনের লোভ-প্রলোভন, নির্যাতন সত্ত্বেও কবিগণ কাজ করে গেছেন একান্ত নিভৃতে। তারা যেন বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভাষাযোদ্ধদেরই পূর্বপুরুষ। যাদের লক্ষ্য একটাই, স্বাধীন ভূখন্ডে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা এবং মাতৃভাষার অধিকার আদায়। ফলে যেন মুছে যায় যুগের সীমানা। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে কিভাবে ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করেছেন চর্যার কবিদের মাতৃভাষা রক্ষার লড়াই ; সমকালের রুচি, সংস্কৃতি, জীবনাচার, ঐতিহ্যের মধ্যে কিভাবে অতীতের একটি জনজাগরণের মুহূর্তের সন্ধান করেছেন, প্রাচীন বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের সুখ -দুঃখ,আনন্দ-বেদনা, জীবন জীবিকা, প্রেম ভাবনা সম্পর্ককে সহজ সরল ভাষায় কিভাবে ধরে রেখেছেন আলোচ্য উপন্যাসে; সর্বোপরি বিষয় এক রেখেও কিভাবে তিনি চর্যাপদের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন — বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়গুলিই খতিয়ে দেখা হয়েছে।

সূচকশব্দ:

সেলিনা হোসেন, কথাসাহিত্য, চর্যাপদ, বিনির্মাণ, অন্ত্যজ সমাজচিত্র, ভাষা আন্দোলন।

মূল প্রবন্ধ:

নেপালের রাজদরবার থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কারের ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশের সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এর নামকরণ করেছিলেন 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। এরপর নানান গবেষণায় চর্যাপদের আরও বিস্তৃত ব্যাপ্তি আমরা জেনেছি। খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী চর্যাপদের কাল বলে প্রতিষ্ঠিত। তারপর চর্যার ৫০ টি পদ, মুনি দত্তের সংস্কৃত টিকা আবিষ্কার, কয়েকটি পদের হদিস না পাওয়া, তেইশ জন পদকর্তার সন্ধান পাওয়া এসব বহুচর্চিত।[১] সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাস পড়ার পর বইটি চর্যাপদের নবরূপ এ কথা আমাদের মনে হবেই। মনে হবে, হাজার বছর পেছনে নয়, একেবারে একবিংশ শতাব্দীতে বসে চর্যাপদের জনজীবন, মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই সবকিছুই চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনাকে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন তাঁর নিজস্ব ঘরানায় এক নতুন রূপ দিয়েছেন যেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখিকা সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে চর্যাগীতি সংকলনের অন্যতম কবি কাহ্নপাদ ও অন্যান্য কবিদের জীবন যাপন, স্বাধীন দেশ গড়ার স্বপ্ন এবং নিজেদের মুখের ভাষা প্রয়োগের স্বাধীনতার লড়াই বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক প্রাগাধুনিক যুগের সৃষ্টি চর্যাপদের বিশ্লেষণ নিজের মতো করে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে। প্রচলিত পাঠ প্রয়োজনে ভেঙেছেন, ভেঙে গড়েছেন নতুন করে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব বিশ্লেষণে না গিয়ে তৎকালীন সময়ে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের সাধারণ মানুষের নিতান্ত সাদামাটা জীবনের সুখ দুঃখ ও অসহায়তাকে নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। রাজতন্ত্রের অত্যাচার, অন্ত্যজ অস্পৃশ্য প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারে বাধ্য করা শাসকের কথা লেখিকার কলমে ধরা পড়েছে। বিশ শতকের বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বাধীন দেশের স্বপ্ন এবং বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই যেন উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) অন্যতম। প্রচলিত ধ্যান ধারণা ভেঙে নতুন চিন্তাজগৎ, আমাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, রীতিনীতি সবকিছু সম্পর্কে বিশ্বাসের রূপান্তর ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, মানুষের সত্তা এক বিশেষ নির্মিতি, যাকে অর্জন করতে হয় বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে।[২] জীবন প্রতিমুহূর্তে যেহেতু বদলায়, তাই অতীত- বর্তমান এই সময়ের মধ্যে চলাচলের রাস্তা, প্রশ্ন করার স্বাধীনতা পুরনোকে আবার নতুন রূপে, নতুন ভাষায় রূপ দেয়। প্রচলিত রচনার মধ্যে আটকে না থেকে পুরনোকে নতুন রূপে আবিষ্কার বা রূপান্তর ঘটানো, যা নতুন শিল্পের জন্ম দেয়। ফুকো'র কথায়-"As soon as one questions that unity, it loses its self - evedience; it indicates itself, constructs itself, only on the basis of a complex field of discourse"।[৩]

সাহিত্যের কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থাকা উচিত নয়, প্রতিমুহূর্তে তাকে গড়তে হয় নতুন মূল্যবোধ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলিকে নতুন রূপে ফুটিয়ে তোলার আরেক নাম বিনির্মাণ। ফলে পাঠের বিষয় এবং পাঠকের মধ্যে স্থান পরিবর্তনের সুযোগ থেকে যায়, একটি যুগের বা সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা হাত বদলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবে ,নতুন চিন্তায় নব নির্মাণ ঘটায়। লেখক উহ্য থেকে যায় কখনো কখনো, নবনির্মিত সাহিত্য পাঠকের কাটাছেঁড়ায় পূর্ণতার পথে যাত্রা করে। অস্পষ্ট থেকে যাওয়া অংশগুলি পাঠক পূর্ণ করে দেয়-"At the very moment of completeness or perfection, a gap or void is revealed at the core of the space, a gap basic to the space and to the process of self reflexivity itself."[৪]

মিশেল ফুকো'র ছাত্র জাঁক দেরিদা মনে করেন, বিনির্মাণে একটি অনন্ত পাঠ প্রক্রিয়া সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। যেখানে লেখক পাঠক কিংবা বিশ্লেষকদের মধ্যে সমস্ত কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এই পাঠ প্রক্রিয়ার ভিন্নতায়। পাঠ প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত বলে কিছু নেই, ব্যক্তিভেদে পাঠ বদলায়, পাঠক তার নিজের মত করে নতুন রূপ দেয়। পাঠক বদলে এইভাবে সাহিত্যে নতুন নির্মাণ ঘটে। সাহিত্য সমালোচনায় দেরিদা ইউরোপীয় সাহিত্যে এইভাবে আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। দেরিদার চিন্তাসূত্র গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কে আকৃষ্ট করেছিল। 'অবিনির্মাণ' সম্পর্কে তিনি বলেন-"অবিনির্মাণ নাছোড়বান্দা। সে ভেঙে গড়ে গড়ে ভাঙবে, জয় করে সন্তুষ্ট হয়ে নাকে তেল দিয়ে ছুটি নেবে না, তার দৈনন্দিন দায়িত্ব অসমের মূলহীন অনুবাদ।"[৫]

যিনি পুনর্নির্মাণ করেন তিনি প্রথমে পাঠক পরে লেখক। পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন বিনির্মাণের মাধ্যমে কিভাবে নতুন নির্মাণ করা যায়। এক্ষেত্রে নির্মাতাকে সমকাল ও পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। চর্যাগীতির পদসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান না থাকলে সেলিনা হোসেন 'নীল ময়ূরের যৌবন'উপন্যাস রচনা করতে পারতেন না। পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে তিনি প্রাগাধুনিকের সঙ্গে আধুনিক বিপন্ন সময়ের সংযোগসেতু তাই অনায়াসে নির্মাণ করেন। উৎসের ঋণ স্বীকার করেও তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক। পাঠক থেকে তার উত্তরণ ঘটে লেখক হিসেবে।

।। দুই।।

বিশ শতকের প্রথমার্ধ এক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি মানুষের জীবন ও মননকে, চিন্তা-চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আত্মচেতনার রিক্ততা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা থেকে মানুষ মুক্তির দিশা খুঁজেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি জাগানোর আকাঙ্ক্ষা উত্তরাধুনিককালের শিল্প সাহিত্যে বিস্তৃত সাড়া ফেলেছে। ফলে সাহিত্যশিল্পীদের মধ্যে দেশ-জাতি-রাষ্ট্র কিংবা ধর্মচেতনাকে নতুন করে উপলব্ধি করার প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও দেশভাগের মতো ঘটনা আবার নতুন করে পরাধীন করেছে বহুমানুষকে। বাংলার বিভাজন যেমন আমাদের আত্মিক চেতনার ওপর চরম আঘাত এনেছে; তেমনি বাংলাদেশের পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিও চরম অপমানজনক হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। নতুন দেশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ঘোষিত হওয়ায় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, মাতৃভাষার জন্য রক্তক্ষয়, বাংলা ভাষার স্বীকৃতি এবং পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত তারই পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ। লেখিকা সেলিনা হোসেন সচেতনভাবেই এই সমস্ত তথ্যের নতুন ভাষ্য এঁকেছেন 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের এগারো বছর পর লেখিকা বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভাষা চেতনার উগ্রতায় বিপন্ন হয়ে পড়া

আঞ্চলিক ভাষার অসহায়তা এবং সেই ভাষাভাষী মানুষের উপর নির্মম রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার ফুটিয়ে তুলেছেন তার উপন্যাসে। একইসঙ্গে প্রান্তিক মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জাগিয়ে তুলেছেন।

"কাহেরে ঘিণি মেলি আচ্ছহু কীস/বেঢ়িল হাঁক পড়অ চৌদীস/আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।"[৬] ভুসুকু পাদ রচিত পদে জানা যায়, হরিণ তার নিজের মাংসে নিজের শত্রু। সেলিনা হোসেন উপন্যাসের পর্ব বিভাগের ক্ষেত্রে 'আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী' বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। শবরীর মেঘবরণ চুল, খোঁপায় ময়ূর পালক, কটিদেশে মেখলা, পায়ে মল, মুখে চন্দনের প্রসাধন প্রভৃতির বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে এই উপন্যাস। শবরীর এই রূপে মুগ্ধ কাহ্ন গদগদ ভাষায় তার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছে-"তুমি এক পবিত্র মন্দির শবরী। সারাক্ষণ সেখান থেকে আরতির ঘন্টা শুনতে পাই। এ এক চমৎকার প্রার্থনার ভাষা। এর বাইরে আমি আর কোনোকিছু বুঝতে চাই না। বুঝি না ঈশ্বর, বুঝি না বেদ।"[৭] কাহ্নর মতো করে আর কেউ কথা বলতে পারে না, সুন্দর করে কথা বলতে পারে সে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ কাহ্ন বাড়ি ফেরার পথ হারায়। শবরীর শরীরের চন্দনের গন্ধ তাকে পাগল করে। সঙ্গে হাঁড়িয়ার নেশা তাকে অন্য মানুষ করে দেয়-"জানো সখি নেশা হওয়ার পর তোমাকে আর বউ বলে মনে হয় না, মনে হয় অন্য নারী। যে নারীর ওপর কোনো অধিকার নেই, অথচ যাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে ওঠে। যাকে পাওয়ার জন্য মন পাগল হয়ে যায়।"[৮]

কাহ্নর পদ লেখার আর এক অনুপ্রেরণা ডোম্বি। ভালোবেসে যাকে নাম দিয়েছে মল্লারী। কাহ্নর সঙ্গ মল্লারীর সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। সারাদিন নৌকা চালানোর ধকল অনায়াসে মিটে যায় কাহ্নর মুখের মিষ্টি কথায়। তাকে নিয়ে লেখা কাহ্নর গান, সে গুনগুনিয়ে গায়-"ওকে নিয়ে একজন ভাবে এবং লিখতে প্রেরণাবোধ করে ভাবতেই ওর শরীর শিরশির করে। ওর ঠোঁট নড়ে, ও গায়, একশো পদমা চৌষঠটি পাখুড়ী/তঁহি চড়ি আচঅ ডোম্বী বাপুড়ী"[৯]

কাহ্ন বৌদ্ধরাজা বুদ্ধমিত্রের রাজসভায় পাখা টানার কাজ করে। এই কাজ করতে ভালো লাগে না তার। শুধু পেট চালানোর দায় থেকেই কাজ করা। একঘেয়ে কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে সে। মুক্তির শ্বাস দেয় কখনো রামক্রীর দোকানের মদ, কিংবা মল্লারীর সঙ্গ। রাজা বুদ্ধমিত্রকে সহ্য করতে পারলেও তার মন্ত্রী দেবলভদ্র কাহ্নর দুচোখের বিষ। তার এবং প্রতিবেশীদের ওপর অকারণে মন্ত্রী রুষ্ট হন, বিনা বিচারে সাজা দেন। রাজা বুদ্ধমিত্রের কোনো ভূমিকা থাকে না। কারণ মন্ত্রীর ওপরে নির্ভর করেই রাজাকে রাজকার্য চালাতে হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মন্ত্রী টিলার পার্শ্ববর্তী অরণ্যময় অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের জমিজমা দখল করে নেয়। প্রজাদের পায়ের তলায় পিষে মারে। রাজা ও মন্ত্রীর এইরকম বেহিসেবী জীবনে সাধারণ জনজীবন, তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

উপন্যাস যত এগোতে থাকে, দেখা যায় সাধারণ জনজীবনের দৈনন্দিনের যাপনচিত্র। পথের দুপাশে ঘরবাড়ি, কাউকে আর একটু দূরে নির্বাসিত করা হয়েছে একাকী তার ছোঁয়া থেকে বাঁচতে। রয়েছে দোকানপাট, বাজার। সাধারণ মানুষের জীবিকা হিসেবে দেখা গেছে চাষবাস, কার্পাস বোনা, চাঙারি বানানো, পশুশিকার, দুধ দোয়া,খেয়া পারাপার ইত্যাদি।"বৌদ্ধ রাজা বেদ- বিরোধী হলেও আর্য-সংস্কারের বিরোধী নয়। ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে আপোস করেছে বুদ্ধমিত্র। সে কারণে তার রাজসভায় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অনেক রাজকর্মচারী নিযুক্ত রয়েছে।"[১০] আর প্রতিদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আসর বসে রাজসভায়, যেখানে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র আলোচনা ও মাঝে মাঝে গীতের আসর চলে। কাহ্নর 'ম্লেচ্ছ' ভাষা এখানে ব্যবহার করা অপরাধ। শাস্তি পেতে হয় ব্যবহার করলে। কাহ্ন কিছুতেই ভেবে পায় না, পুজো আর্চা ছাড়া "যে ভাষার কোনো ব্যবহার নেই তার এতো মূল্য কীসের? মাথায় তুলে রাখলে তো তার প্রবাহমানতা থাকে না। বরং ওদের মুখের ভাষাই মুখে মুখে ঠিক থাকবে, বিস্তৃত হবে এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে।"[১১] সেলিনা হোসেন স্পষ্ট করে দেন ১৯৫২ সালের বাংলাদেশের মাতৃভাষা রক্ষার লড়াই আরো ৩০ বছর পর 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে কাহ্নর মূল দাবি হয়ে ওঠে। রাজ দরবারে সে গীত পড়ার অনুমতি পায় না। রাজার কাছ থেকে গীত পড়ার অনুমতি পেয়েছে একথা শুনে মন্ত্রী দেবলভদ্র কাহ্নকে- "ভাগ, যতসব ছোটলোকের কারবার। লাই দিলে মাথায় ওঠে। আবার মুখে মুখে কথা বলা হচ্ছে! শুয়োরের বাচ্চা!"[১২] চরম অপমান করে মন্ত্রী রাজপ্রাসাদ থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাকে বার করে দেয়।

কাহ্ন এর প্রতিশোধ নিতে চায়। মল্লারীর সঙ্গে এই যন্ত্রণা ভাগ করে নেয়, দুজনেই প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। সুযোগ বুঝে, দেবলভদ্রের ভাগ্নেকে হত্যা করে মল্লারী। কাহ্ন রাজ দরবারের চাকরি ছেড়ে দেয়। গীত লেখে, সোজা স্পষ্ট ভাষায়। শাস্তি হয় তার। রাজার লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়, আটকে রাখে চুনের ঘরে। দমবন্ধ ঘরে ছটফট করে কাহ্নপা। শবরীর দিনরাত্রি এক হয়ে যায়।

অন্ধকার কুঠুরিতে বসে অবসন্ন শরীর মনে দেখতে ইচ্ছে করে শবরীকে। ইচ্ছে করে ডোম্বির কাছে ছুটে যেতে। দেবল ভদ্রের ভাগ্নেকে খুনের অপরাধে, ডোম্বিকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়-"রাজার আইন ফাঁসি-গাছে তিন দিন ঝুলিয়ে রাখা হবে ডোম্বির লাশ।"[১৩] কাহ্নুকে আটকে রাখা চুনের ঘর থেকে বের করে রাজ দরবারে নিয়ে যাওয়ার সময় এই দৃশ্য সে দেখে। মন্ত্রী দেবলভদ্র কাহ্নুর শাস্তি ঘোষণা করে-"না ওকে ফাঁসি-গাছে ঝোলানো হবে না। ওকে মেরে ফেলবো না। ওর শাস্তি হবে তিলে তিলে। ধুঁকে ধুঁকে মরবে ও। ওর হাত দু'টো কেটে ফেলো। গীত লেখার সাধ বুঝুক।"[১৪]

।। তিন।।

চর্যার পদ নয়, হাজার বছরের প্রাচীন চর্যার কবিদের কাব্য বিষয়কে ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব ভাবনায় স্বাধীন রূপ দিয়েছেন। চর্যার কবিদের আলো আঁধারি ভাষায় রচনা করা পদের গুঢ়তত্ত্ব, ধর্মচেতনা, সাধন পদ্ধতি এই বিষয়গুলি তিনি কোনভাবেই উপন্যাসে ধরার চেষ্টা করেননি। বরং সমকালের রুচি, সংস্কৃতি, জীবনাচার, ঐতিহ্যের মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন অতীতকে। পদ্য মাধ্যমকে ছেড়ে গদ্যভাষায় চর্যাপদে প্রতিফলিত প্রাচীন বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের সুখ-দুঃখ,আনন্দ-বেদনা, জীবন জীবিকা, প্রেম ভাবনা সম্পর্কে সহজ সরল ভাষায় উপন্যাস রচনা করেছেন। বিষয় এক রেখেও তিনি চর্যাপদের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ১৯৫২ সালের বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ সবই উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের মূল চরিত্র কাহ্নু ছাড়াও চর্যাপদে প্রতিফলিত আরও অনেক চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন।

জনপদের একদিকে কামোদের মুদির দোকান, একটু এগুলেই রামক্রীর মদের দোকান, রামক্রীর বউ দেবকী একাই একশো, মূলত সেই দোকান চালায়। নগরীর বাইরে ডোম্বির কুঁড়েঘরে যদিও ব্রাহ্মণরা তার ছোঁয়াতে কোন আপত্তি দেখে না। লম্পট ব্রাহ্মণরা রাতের অন্ধকারে ওর কাছে আসে, আর দিনের বেলা মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুযোগ পেলে ডোম্বি এদের ছেড়ে কথা বলে না। তরুণ যুবক দেশাখ পশুশিকারে সিদ্ধহস্ত, অনটনের সংসারে সেই একমাত্র রোজগেরে। দাদা, বৌদি, ছোট দুটি বোন আর অসুস্থ বয়স্ক বাবা-মা নিয়ে তার সংসার। উপার্জনের জন্য তার দাদা ভুসুকু বৌদি সুলেখাকে রেখে ঘর ছাড়ে, যাদের নৌকায় ভুসুক বাণিজ্যে গিয়েছিল তাদের লোকজন বলতে পারেনা সে আদৌ কবে ফিরবে। অভাবের সংসারে দীর্ঘ অপেক্ষার পরে একদিন সুলেখা বিপত্নীক সুদামের হাত ধরে ঘর ছাড়ে। সারাদিন খেতে কাজ করা, কারো সাথে পাঁচে না থাকা সুদাম কে নিয়ে শুরু হয় তার নতুন সংসার। ভাগ্যের কি পরিহাস এরপর একদিন সত্যি ভুসুকু ফিরে আসে।ভুসুকুর 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' সত্যি হয়। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কাহ্নুকে বলে-"ভেবে দেখলাম সুলেখার কোন দোষ নেই। ওর যৌবনটাই ওর সঙ্গে শত্রুতা করেছে। হরিণের মাংস যেমন হরিণের শত্রু।"[১৫] কুক্কুরীপাদের কথা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সে লোকালয়ে থাকে না, দূরে পাহাড়ের কোলে থাকে। রাজার বিচিত্র আইনে মাথা ঘুরে যায় তার। পদ লেখে-"দুলি দুহি পিটা ধরণ না জাই/রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ"[১৬] গাছের তেতুল কুমিরে খায়, একথা কবি কাহ্নুপাকে ভাবায়। আসলে কুক্কুরী যোগীর জীবনযাপন করলেও মানুষের কথা ভাবে, ভালবাসে মানুষ। দেশাখ নতুন তরুণ দল তৈরি করে, তীর চালানো শেখায়। কারণ সবার ভেতরে রয়েছে লড়াইয়ের প্রস্তুতি, সময় সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। উপন্যাসে ধরা পড়েছে ধনশ্রী-ভৈরবীর অভাবের সংসার চিত্র, দেশাখ-বিশাখার ভালোবাসা ও দেশাখের দায়িত্ববোধের পরিচয়। দেশাখের তীর ধনুকের দলে জোয়ান ছেলের ভিড় বাড়ে। শিবু, বাদল, গৌরাঙ্গ নিমাই যোগ দেয়। সবার একটাই স্বপ্ন, নতুন এক ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা। কাম মহোৎসবে দশ জোড়া যুবক-যুবতী তাদের সঙ্গীদের সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে সারারাত নাচে, ভোররাতে তাদের মিলন হয়, যা আসলে একত্রিত হওয়া এবং এক নতুন স্বপ্ন গড়ে তোলার উৎসব।

কাহ্নুর দুই হাত কেটে, ডোম্বিকে ফাঁসি গাছে ঝুলিয়েও দেশাখদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে আটকানো যায় না। দুটি সন্তানের একসঙ্গে জন্ম হওয়ার কারণে রাজার আইনে ভৈরবীকে আলাদা করতে চায় না ধনশ্রী। রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ধনশ্রী বলে-"আমার অসতী বউ নিয়ে যদি আমি ঘর করি যাতে রাজার কী? আমাদের ভালো রাজার দেখতে হবে না। চাই না এমন রাজা।"[১৬] রাজার বিরুদ্ধে যাওয়া এবং ভয়ংকর শাস্তি পেতে হবে জেনেও ধনশ্রী চুপ করে থাকে না। রাজার লোকেরা বেপরোয়া ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ে। দোষ না করলেও ধরে নিয়ে যায় রাজপ্রাসাদে, শাস্তি দেয়। তাতেও দমানো যায় না। এইভাবে সাধারণ অন্ত্যজ মানুষের কথা উঠে আসে সেলিনার কলমে। কাহ্নু যাদের প্রতিনিধিত্ব করে-"তোরা কেউ দুঃখ করিস না দেশাখ। আমাদের তেমন একটা জায়গা একদিন হবে। আমরাই রাজা হবো। রাজা-প্রজা সমান হবে। আমাদের ভাষা রাজদরবারের ভাষা হবে।"[১৮] কাহ্নু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে "আমাদের ভাষা আমাদের মুখে

মুখেই বেঁচে থাকবে রে দেশাখ।"[১৯] বিশ শতকে বসে লেখিকা এইভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সাম্যবাদী ভাবনা এবং ভাষা রক্ষার লড়াই জাগিয়ে রাখে সাদামাটা প্রান্তীয় জনজীবনের মধ্যে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মানসিকতা বিপন্ন জাতিকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়। নতুন দেশ গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলে প্রাচীনকালের কাব্যের চরিত্ররা। তৈরি হয় নতুন ডিসকোর্স, 'নীল ময়ূরের যৌবন'।

উল্লেখপঞ্জি:

১. দাশ নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বাদশ সংস্করণ, জুন ২০১৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১১-১৫।

২. ভট্টাচার্য প্রভাতকুমার, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিমা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা: ১৮।

৩. ভট্টাচার্য তপোধীর, মিশেল ফুকো: তার তত্ত্ব বিশ্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃষ্ঠা: ৫৪।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ৭৪।

৫. দাশ অনির্বাণ (সম্পা.), বাংলায় বিনির্মাণ/অবিনির্মাণ, অবভাস, ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৫৪।

৬. দাশ নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বাদশ সংস্করণ, জুন ২০১৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৩১।

৭. হোসেন সেলিনা, নীল ময়ূরের যৌবন, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪

৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ২৫।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৪।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৫।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪৩।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৪০।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৪১।

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১২৫।

১৬. দাশ নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বাদশ সংস্করণ, জুন ২০১৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১১৯।

১৭. হোসেন সেলিনা, নীল ময়ূরের যৌবন, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১০২।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৪৪। ১৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৪২।

....

রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণে তারাশঙ্করের ছোটগল্প

অন্তরা চ্যাটার্জী
স্বাধীন গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ-

অভিজ্ঞতার সম্ভার দিয়ে ঘেরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলি সমাজজীবনেরই শিল্পরূপ। সমাজের সর্বসাধারণের কথা গাঁথতে গাঁথতে তাঁর গল্পে মোচড় দিয়ে ওঠে স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের কথা। রাঢ় বাংলার মানুষ তারাশঙ্করের লেখায় রাঢ়ের বৈচিত্র্যরেখায় জ্বলজ্বলে এই নিম্নবর্গ শ্রেণিসম্প্রদায়। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে চিত্রিত হয়েছে রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, সংস্কার, কুসংস্কার, ভাষা, বেশভূষা, খাদ্য ইত্যাদি। রাঢ় বাংলার সুখ-দুঃখগুলোকে সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করা অনুভবই তাঁকে গল্পচ্ছলে বাস্তব লিখিয়ে নিয়েছে। তাঁর নিখুঁত জীবনদর্শন একটা গোটা পিছিয়ে থাকা সমাজকে আমাদের চিনিয়ে দেয়। এখানে আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি', 'বেদেনী', 'নারী ও নাগিনী', 'দেবতার ব্যাধি' এবং 'ডাইনী' গল্প অবলম্বনে রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করবো।

মূলশব্দ-

গল্পকথা, অন্ত্যজ জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, কুসংস্কার, বেশভূষা, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস।

বাংলা কথাসাহিত্য তার জন্মের পূর্বলগ্ন থেকে একাধিক পরিধির বৃত্তে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে, ক্রমবিবর্তনের ধারায় সমৃদ্ধ হয়েছে তার ক্ষেত্র। জীবনঘেঁষা সাহিত্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কথাসাহিত্য বলে জীবনেরই কথা, ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর পৃথিবীর কথা। তাই গল্প গল্পের মতো হলেও আসলে বাস্তব থেকে রঙ নিয়েই প্রতিভার তুলি দিয়ে গল্প সাজান গল্পকারেরা। নানান রঙের আলোয় গড়া ছোটগল্প তাই জীবনকে বলতে বলতে সমাজের প্রতিচ্ছবিকেই আয়নার মতো তুলে ধরে। সমাজকে কেন্দ্র করেই উঠে আসে সেই স্থানের সংস্কৃতির রূপ, চেনা যায় ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, ইতিকথাকে। আসলে প্রত্যেক জাতির স্বত্ত্বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার সমাজ, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই সূত্র ধরেই আমরা চিনে নিতে পারি মানুষগুলোর পরিচয়, তাদের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি, বিচিত্র ধ্যান-ধারনা, মূল্যবোধ, মানসিকতা।

বাংলা ছোটগল্পে বারবার উচ্চারিত হয়েছে সমাজের সকল বর্গের কথা। উচ্চবিত্তের কথা থেকে মধ্যবিত্তের ব্যথা বলতে বলতে নিম্নবিত্তের খরা মাটিতে পদার্পণ বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেল না কিছু" নিম্নবিত্তরা তাদেরই দলে। বাংলা ছোটগল্পের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকেনি কোনো সম্প্রদায়ই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ গল্পকারের ছোটগল্পে ধরা পড়েছে অন্ত্যজের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির চিত্র।

এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ডামাডোল হয়ে গেছে মানুষের অবস্থান, পরিস্থিতি। দ্বিতীয় বিশ্বোযুদ্ধোত্তর কাল এক ভয়াবহ সময়, বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ দুই ক্ষেত্রেই। যুদ্ধের দাবানল, ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশভাগ, অবক্ষয়, বাস্তবতার সংঘাত মানুষকে, সমাজকে, পরিবেশকে, সমগ্র পৃথিবীকে টুটি চিপে ধরেছিল। মানুষ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল অপরিচিত। বলাবাহুল্য, এইসময়েই যারা আরও অদৃশ্য হয়ে রইল তারা সমাজের প্রান্তিকবর্গ। এইসময় সাহিত্যিকেরাও অনেকবেশি সমাজসচেতন হয়ে উঠলেন, ইতিহাসের কড়া প্রভাব এবং সমাজের নজর এসে পড়ল ছোটগল্পের উপরেও। ব্যতিক্রমী নন ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিশেষ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বহু বিচিত্র উপন্যাসের মতোই ছোটগল্পেও গ্রামবাংলার অন্ত্যজশ্রেণি বিশেষ করে রাঢ়বাংলার অন্ত্যজশ্রেণির সমাজ-সংস্কৃতিকে গল্পে তুলে এনেছেন। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, বাউরী-বাগদী, বেদে-কাহার, সাপুড়েসহ নানানধরণের গোষ্ঠী, তাদের আচার-আচরন, ভাষা, জীবিকা, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার, এককথায় সমাজ ও সংস্কৃতির একাধিক দিক গল্পকথায় নিজেদের জাহির করেছে।

রাঢ়বাংলার সঙ্গে তারাশঙ্করের যোগ আত্মিক, যোগ জন্মের। বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ঘোষ বলেছেন, "বাংলার রাঢ় অঞ্চল আদিবাসীপ্রধান। স্তরিত শিলার মত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতির স্তরে স্তরে আদিম

কৌম সংস্কৃতির উপাদান নানা রূপে ও বিচিত্র বিন্যাসে প্রথিত হয়েছে।" সেই রূপ ও বিন্যাসকেই নিজস্ব সুর ও দৃষ্টিতে গল্পে যাপন করেছেন গল্পকার। আলোচনার নকশায় সেই যাপনই অন্বেষণে সচেষ্ট হবো।

জীবননদী বয়ে যায় নিজস্ব গতিতে, মেশে বহু স্রোত। তবে জীবনের এই স্রোতেই ঘাপটি মেরে বসে থাকে নিয়তি। নিয়তির হাতে বাঁধা অসহায় মানুষের জীবনরহস্যের গভীর দিকটি দেখাতে গিয়ে 'তারিণী মাঝি' গল্পটি লিখেছেন তারাশঙ্কর। একটি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাঢ়বঙ্গের নিম্নবর্গের সমাজ-সংস্কার উঠে এসেছে এই গল্পে। নদীটি ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়া ঘাটের যাত্রী পারাপারের মাঝি তারিণী। তারিণী নদীর মানুষ-- "জলের শরীল, রোদে টান ধরে জল পেলেই ফোলে।"[১]

বারো মাসের সাত-আট মাস ময়ূরাক্ষী মরুভূমির মতো থাকলেও বর্ষার শুরুতে তার রূপ হয় রাক্ষসীর মতো। ময়ূরাক্ষীর ভীষণ বানে তারিণী অনায়াসে অসহায় বহু পশুপ্রাণী, মানুষকে উদ্ধার করতে পারে, সহজ-সরল মানুষটি নিজের জীবনের পরোয়া করে না, কারণ সে জানে মা'র বুকে সন্তানের মৃত্যু হয় না। নদীর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা জীবিকায় এই মানুষগুলোর নদীই একমাত্র অবলম্বন। এই নদী না থাকলে তারা ভাতে মারা যাবে।

রাঢ় বাংলার মাটিতে যেমন খরার প্রাদুর্ভাব, তেমন বন্যাও সর্বগ্রাসী। তারিণীকে নিজের জীবনে দিতে হয় ময়ূরাক্ষীর কাছেই অগ্নিপরীক্ষা। নিষ্ঠুর জীবনসত্যের সামনে দাঁড়িয়ে বহুজনের ত্রাণকর্তা তারিণীকে নিজের স্ত্রীকে নিজের হাতেই বিসর্জন দিতে হয়। দুর্যোগ কখনো সময় দেখে না, দেখে না ভালোবাসা। নদীর ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা এইসব হতদরিদ্র মানুষের জীবনকে বিপদ ছুঁয়ে থাকে এমনভাবেই, পরিণতিও কখনো কখনো এমনি করেই হয়।

গল্পে আরও দেখি, দুর্ভিক্ষ গ্রাস করেছে গ্রামবাংলার হাসিকান্নার জীবনকে— "দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়াছিল। মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে সে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল।"[২] কালাচাঁদ গ্রাম ছাড়ে, পলাশডাঙার ভদ্রলোকের গলায় দড়ি, গ্রামের প্রান্তে মৃত দেহগুলিকে শৃগাল-কুকুরের ছিঁড়ে খাওয়া—অন্ত্যজ জীবনের এইসব দুর্দিনের ছবি ভেসে এসেছে গল্পে।

জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর কত নিখুঁতভাবে মানুষকে দেখেছেন, দেখেছেন সংস্কৃতিকে, তার খোঁজ পাওয়া যায় গল্পের চরিত্রদের ভাষা পড়লেই। তারিণীর ভাষায় 'ন'-এর জায়গায় 'ল'-এর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—"ফরসা লী-ল। পচিদিকেও তো ডাকে না!"[৩] একইসাথে কালাচাঁদেরও ভাষায়— "দাঁড়াও দাদা, একটা তাল পড়ে রইছে, কুড়িয়ে লি।"[৪] এই সমাজ তাদের নিজস্ব ভাষাগোষ্ঠীর তালিকায় দৈনন্দিন জীবনে যেসব ভাষা ব্যবহার করে থাকে তাতে রয়েছে প্রবাদ-প্রবচনও— "লাজে মা কুঁকড়ি বেপদের ধুকড়ি"[৫], "আমার হাড়ির ললাট ডোমের দুগগতি হয় ভাই"[৬]।

আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী উপলক্ষে গনুটিয়ার ঘাটে ভীড়, হিন্দুধর্মের সংস্কার অনুযায়ী গঙ্গাচান করে পুণ্যলাভ করা, দশহারার দিন পূজার্চনা, উৎসবে নতুন পোশাক পরার কথাও সংস্কৃতিরই অঙ্গ। কুসংস্কার হিসেবে পিছু ডাকলে বিপদের কথা আছে। ঘোষ মহাশয়ের বউমা যার তেরো-চৌদ্দ বছরের বেশি বয়স নয় তার বাল্যবিবাহ এবং ওইটুকু মেয়ের দীর্ঘ অবগুণ্ঠন সেই সমাজব্যবস্থার এবং সংস্কারের প্রতীক। আবার গল্পে তামাক ও মাদক সেবন, আমানি ছাঁকার কথা থেকে এই নিম্নবর্গের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কেও আমরা অবহিত হই।

'বেদেনী' গল্পে দেখা যায় নগ্ন আদিম জীবনোচ্ছ্বাসের কাহিনি। গল্পে আদিবাসী সম্প্রদায় বেদে জাতির জীবন-জীবিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, রূপ, দাম্পত্যজীবন, পরকীয়া, হিংস্রতা, বর্বরতা, আচার-আচরণ, সংস্কারের চিত্র জ্বলজ্বলে। এই বেদে জাতের প্রতি লেখকের কৌতুহল ছিল বরাবরের। তাঁর আত্মজীবনীর স্মৃতির পাতায় পাওয়া যায়— "আমার সাহিত্য কর্মের মধ্যে কালের বিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিলীয়মান গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বিশেষ ধারায় ব্যক্তিত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এসব আমার নিজের চোখে দেখা।...জমিদার শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনা করবার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল। বোধ করি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে লেখেননি বা লেখেন না বলে।" [৭]

শম্ভু বাজিকরের স্ত্রী রাধিকা বেদেনী। তারা বাঘ নিয়ে সার্কাস দেখায়। সার্কাসের বাইরে রাধিকা ছাগল, বাঁদর, সাপ নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, গৃহস্থের বাড়ি খেলা দেখিয়ে গান গেয়ে উপার্জন করে। রাধিকার প্রথম স্বামী শিবপদ-- "সে করিত বেতের কাজ—ধামা বুনিত, চেয়ার- পালিশের কাজ করিত। ফুলের সৌখিন সাজি তৈয়ার করিত।' [৮] শিবপদ আর রাধিকা উপার্জনের জন্য যখন বাইরে যেত

তখন শিবপদর সঙ্গে একটি যন্ত্র থাকত, কোমরে গোঁজা থাকত বাঁশের বাঁশি, রাধিকা যখন সাপ নাচিয়ে গান গায়ত, শিবপদ তখন বাঁশি বাজাত। তাছাড়া সামাজিক বৃদ্ধদের মজলিশে শিবপদর ডাক পড়ত, লেখাপড়াও শিখেছিল কিছু কিছু নিজ চেষ্টায়।

তারাশঙ্কর অন্ত্যজ সমাজকে দেখেছেন, চিনেছেন, গড়েছেন গল্প দিয়ে—"বেদেদের তিনি নানা মেলায় খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছেন। লাভপুরের বাড়ীতেও বেদেরা আসত সাপের খেলা দেখতে – তিনি তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়তেন -একথা তাঁর কন্যা গঙ্গার কাছ থেকে শোনা। তিনি শিল্পী হিসাবে তারপর যা করেছেন তা হল এই বেদেদের জীবনের বিভিন্ন তথ্যাদির ওপর বিভিন্ন মানবিক আবেদন (যেমন প্রেম, স্নেহ, ঈর্ষা, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি) আরোপ করে বেদেদের ছবিগুলি জীবন্ত করে ফেলেছেন।"[৯] আরেক জায়গায় বলেছেন— "ডাইন ডাকিনী ভূত প্রেত সমাকুল আমার সে কাল। বেদে সাপুড়ে পটুয়া দরবেশ তখন দেশে প্রচুর। প্রতিদিনই এদের কারুর না কারুর বা কোনও দলের না কোনও দলের সঙ্গে দেখা হতোই। আমার সাহিত্যিক জীবনে এঁরা দল বেঁধে ভিড় করে এসেছে ঠিক এই কারণেই।"[১০]

তারাশঙ্করের গল্পকথায় সত্যরসের বুনন প্রকট। উক্ত গোষ্ঠীর মেয়েদের রূপগত বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে বেদেনীর রূপবর্ণনার মধ্য দিয়ে— "কালো সাপিনীর মত ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিণি বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সুতোর মতো সিঁথিতে , তাঁহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে , টানা অর্ধনিমীলিত ভঙ্গির মদির দৃষ্টি দুটি চোখে, সুচালো চিবুকটিতে সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়াফুলের গন্ধ যেমন নিঃশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা।"[১১]

শিল্পলোকের অন্যান্য বাসিন্দার মতো 'বেদেনী' গল্পেও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের ভাষাকে যথাযথ ব্যবহার করেছেন তারাশঙ্কর। কৃষ্ণ তাদের সমাজভাষায় কিষ্টো হয়ে উঠেছে। রাধিকা কিষ্টোর নাম জানতে চইলে সে বলেছে—

"নাম শুনলি আমাকে গালি দিবা বেদেনী।"[১২]

"কেনে?"[১৩]

"নাম বটে, কিষ্টো বেদে।"[১৪]

লক্ষ্য করা যাচ্ছে শম্ভুর আচরণের সাথে ভাষার ব্যবহার, রাধিকার সঙ্গে বাকবচসায় "পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মত ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল, ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর।"[১৫]

এই বেদেরা বিচিত্র জাত। গল্পে দেখি তারা— "জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্ম ইসলাম। আচারে পুর হিন্দু, মনসা পূজা করে, মঙ্গল-চণ্ডীষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ গান করে, তাহারা নিজেরা বলে—পটুয়া, চিত্রকরের জাত। বিবাহ-আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামি পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়।"[১৬] উঠে এসেছে পটুয়া সম্প্রদায়ের কথা, যারা হিন্দু পৌরাণিক গান করে, পট আঁকে।

নেশা হিসাবে মাদকের উল্লেখ রয়েছে। বেদে জাতির মদ চুরির অভ্যাসও তাদের সংস্কৃতিরই অন্তর্গত। তারা মদের সাথে পাখির মাংস, মুড়ি খেয়ে থাকে।

লোক-লৌকিকতা দিয়ে মাখা এদের মধ্যে একটি আদিম প্রবৃত্তির খোঁজ পাওয়া যায়। রাধিকা শিবপদকে ছেড়ে এসেছে শম্ভুর কাছে, আবার তারপর শম্ভুর কথা না ভেবেই নিজেকে সমর্পণ করেছে কেষ্টো বেদের কাছে। এই পরকীয়া তার মনে কোনোরকম গ্লানির সঞ্চার করেনি। বরং তার চরিত্রে নিষ্ঠুরতারই ছাপ লক্ষ্য করি।

'নারী ও নাগিনী' গল্পের বিষয়বস্তু মানবীয় আসক্তি থেকে মানবেতর আসক্তি জগতে মিশে এক হয়ে গেছে। অন্ত্যজ গোষ্ঠীর মানুষ খোঁড়া শেখ সাপের ওঝা, সাপ নিয়ে খেলা করে, বিষম ঢাকি, তুবড়ি, বাঁশি নিয়ে তার কারবার। খোঁড়া মজুরও খাটে তবে সেটা সাপ না থাকলে।

খোঁড়া শেখ একটি সাপকে নিকে করে নাকফুল পরিয়ে দেয় তার বিবি জোবেদার সামনে। জোবেদাকে বলে— "ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, আর তোর সতীন হল।"[১৭] উক্তির মধ্য দিয়ে উক্ত গোষ্ঠীর সমাজপ্রথার একটি হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। একইসাথে মুসলিম সমাজে বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ রীতি নাকের পরার কথাও গল্পে পাচ্ছি।

সভ্যসমাজ বহির্ভূত এইসব অন্ত্যজ জীবনকে তারাশঙ্কর গভীর আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যথাতেও যেমন হৃদয় পেতেছেন, তেমন কর্ণপাত করেছেন কথার প্রতিও। আদরের সাপিনীকে নিয়ে খোঁড়া গান গেয়ে উঠেছে—

"জানি না গো এমন যে হবে
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরাতে যাবে
ও জানি না গো"[১৮]

সাপিনীর মধ্যে জেগে ওঠা হিংসাই জোবেদাকে ছোবল দেয়। জোবেদা মারা গেলে সাপিনীকে ছেড়ে দিয়ে খোঁড়া বলে— "শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই।"[১৯] অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি, জাতি, বর্ণসহ যা কিছু বিষয় সমাজের শ্রেণিবিভাগ তৈরি করেছে সেই সমস্তকিছুকে বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু মানুষের মনের দিকে দৃষ্টি ফেলি তবে দেখা যায় ভালোবাসা, হিংসা, হিংস্রতা গোষ্ঠীভেদে পৃথক হয় না, স্বভাবভেদে একই হয়ে যায়।

এই সম্প্রদায়ের কিছু খাদ্যাভ্যাসের সাথেও পরিচয় ঘটে আমাদের, যেমন- পান্তাভাত খাওয়া, গাঁজার উল্লেখ আছে।

'দেবতার ব্যাধি' গল্পে বিস্তৃত হয়েছে গল্পকারের জীবনরহস্যের স্তরভেদী সুর। গল্পটির স্থান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে রাঢ়বাংলার পল্লীগ্রামকে, লেখক বর্ণনায় বলেছেন— "রাঢ়দেশের পল্লীগ্রাম— গণ্ডগ্রাম অবশ্য বলা চলে, সপ্তাহে দুদিন হাট বসে, ছোট বাজারও বসে; মিষ্টির দোকান, নটকানের দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহারি দোকান, কাটা কাপড়ের দোকান না থাকলেও বৈরাগী খোঁড়া আর তনু মিয়া দুজনের দুটো সেলাইয়ের কল চলে—একটা বাজারের এ-মাথায়, একটা ও-মাথায়। কিন্তু বাজার-হাট—সব এই দিকে হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের যাকে বলে মুখপাত, সেটা এদিকে নয়। সেটা হল ভদ্রলোক-পল্লীতে।..."[২০] দরিদ্র মানুষেরা বিভিন্ন ছোট ছোট জীবিকার মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবনকে অতিবাহিত করে চলেছে স্বছন্দ তালে।

এইসব পিছিয়ে পড়া মানুষেরা রোগে পড়লে ডাক্তারের কাছে যায় না, পাশের গাঁ দেবীপুরের জাগ্রত কালীমাই তাদের অবলম্বন। প্রতিমাসে অমাবস্যাতে সেখানে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এদের আচার-সংস্কার যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই চিকিৎসার আলো ছুঁতে না পারার অন্ধকার দিকটিও দৃশ্যমান। গল্পে সদানুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী যুবকের সেবা-সমিতি প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে। দরিদ্র গৃহস্থকে সাহায্য, অনাথ-আতুরের সেবা রাঢ় বাংলার এইসব সংস্কৃতিও উঠে এসেছে।

ডাক্তার গড়গড়ি পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর জীবনে ঈশ্বরের মতো আবির্ভূত হন। সামান্য ফি নিয়ে বিনিময়ে দরিদ্র মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দেবতা হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু এই দেবতা হয়ে ওঠার ভয়ঙ্কর পূর্ব ইতিহাসই তাকে আর এই গণ্ডগ্রামে থাকতে দেয়নি। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অন্তিম শয্যায় হেডমাস্টারকে লেখা চিঠির মধ্যে তাঁর দেবতা হয়ে ওঠার বীভৎস ব্যাধি সম্পর্কে জানতে পারা যায়। প্রাণ বাঁচানোর দক্ষিণা হিসাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তারকে চেপে ধরে কামনার প্রবৃত্তি, ঋণ মেটাতে অসহায় নারীদেহ এর শিকার হতে বাধ্য হয়। এ খুব সত্যি কথা যে ঋণগ্রস্ত মানুষের কাঁধে ঋণের বোঝার পরিশোধ চরম দাবিতে উঠে এলে পরিস্থিতি সহায়সম্বলটুকুও বিসর্জন দিতে বাধ্য করে কখনো কখনো, এর শিকার আরো বেশি করে হয় সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষেরা, নারীরা তো বটেই। গল্প বুনতে বুনতে মানবমন, জীবন ও চরিত্রের রহস্যকে দেখাতে গিয়ে যাদের মুখ ফুটে বলার অধিকারটুকুও নেই তাদের কথাও লিখে গেছেন গল্পকার এভাবেই।

ভাষাসচেতন লেখক আলোচ্য গল্পে রাঢ় বাংলার ভাষার বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন— "পশ্চিম রাঢ়ের পল্লী, লোকদের কথায় বিচিত্র টান, ঐ-কার-এ-কার চন্দ্রবিন্দু, ড়-কারের ছড়াছড়ি; 'গিয়াছে' 'হয়েছে' স্থলে বলে— 'গৈছে', 'হইছে'; 'কেন'কে বলে— 'কেনে'; 'খেয়েছি'কে বলে—খেয়েচি'; 'হার'কে বলে— 'হাড়'; 'রাম'কে বলে ড়াম ।নিতান্ত নিম্নস্তরের লোকে আবার 'রাম' কে বলে — 'আম' আর 'আম'কে বলে 'জাম'।"[২১] এই ভাষার ধরণ বিশেষ করে অন্ত্যজশ্রেণির হলেও, রাঢ়বাংলার প্রায় সর্বশ্রেণিই কমবেশি এই ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত।

'ডাইনী' গল্পের নামকরণের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কুসংস্কারের মূর্তি। এক হতভাগিনী স্নেহ-প্রেম বঞ্চিত নারীর জীবন কীভাবে মানুষের কুসংস্কার, বিকৃত মন অভিশপ্ত করে শেষ করে দিতে পারে তাইই গল্পের বিষয়বস্তু। রুক্ষ কাঁকুড়ে লাল মাটির দেশ রাঢ়, সেখানে বন্যা যেমন উত্তাল হাজিরা দেয় তেমন প্রাণ কাঁদিয়ে ছাড়ে কাঠফাটা রোদ্দুর, খরার ধুধুভূমি। গল্পের সূচনায় ছাতি ফাটা মাঠের বর্ণনা শিহরণ জাগায়— "জলহীন, ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির এ প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মতো মনে হয়।..." [২২]

"মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে 'দলদলির জলা'। অর্থাৎ গভীর পঙ্কিল মরণাজাতীয় জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী ভীষণ শক্তিশালিনী নিষ্ঠুর, ক্রূর এক বৃদ্ধা ডাইনী।"[২৩] সমাজের উচ্চশ্রেণির থাবায় নিম্নশ্রেণির নিপীড়ন নতুন কিছু নয়, গল্পে দেখি হারু চৌধুরী সোরধনীকে 'ডাইনী' সম্বোধন করে বিকৃত ভাষায় বলে— "হারামজাদী ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।"[২৪] একটা গোটা সমাজ ভিত্তিহীন অন্ধবিশ্বাসকে লালন করে সোরধনীর জীবনকে অভিশপ্ত কাহিনিতে গেঁথে গ্রাম থেকে, জীবন ও সমাজ থেকে প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গ ধরেই উঠে এসেছে সমাজের ডাইনী সম্পর্কে মনগড়া অলীক কিছু কল্পনা— ডাইনীর রক্ত শুষে খাওয়া, নরুণ চেরা চুরির মতো চোখ, বাণ মারা, সর্বনাশী লোলুপ শক্তি, গাছ চালাতে পারার ক্ষমতা ইত্যাদি। এমনকি সরা একসময় নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করে তার নজর খারাপ, কিন্তু তার সৎ মন ঠাকুরকে ডাকে তাকে ভালো করে দেওয়ার জন্য— "গভীর রাত্রি— সেদিন বোধহয় চতুর্দশীই ছিল, হাঁ চতুর্দশীই তো— বাকুলের তারাদেবী তলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমার আগের প্রতি চতুর্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে— মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব, কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।"[২৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মানত করাও তাদের সংস্কৃতিরই অঙ্গ।

গল্পে রয়েছে নিম্নসম্প্রদায় বাউরি ও হাড়ীর কথা। সোরধনী ও তার স্বামী ডোম। ডোম জাতের মানুষ যে সমাজে পতিত তা সোরধনীর স্বামীর কথায় উঠে আসে— "জাতে পতিত বলে আমাকে মেয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি?"[২৬]। তাদের গোষ্ঠীর সাঙা পাতানোর উল্লেখও রয়েছে।

সোরধনীর স্বামী কলে কাজ করতো, সংসার পাতার পর কয়লা ঠেলত। গল্পে নিরক্ষর চাষীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডাইনীর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গ্রামের মানুষের গুণীনের ওপর বিশ্বাসও বেশ দৃঢ়।

অধ্যাপক সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "রুক্ষ রাঢ়ের নির্মম বাস্তব তারাশংকরের 'ডাইনী' গল্পের প্রেক্ষাপট। স্বার্থকেন্দ্রিক অথচ সরল আদিম জনজীবন ডাইনী ভীতির অমোঘ প্রভাব এই গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনা। শিক্ষা-দিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমারেখায় ওপারে, কু-সংস্কার ঘেরা তিমিরাচ্ছন্ন এক রূপকথার রাজ্যে তারাশংকর পাঠককে নিয়ে গেছেন, যেখানে রাক্ষস-খোক্ষসের মতোই আছে 'ডাইনী'-র অমোঘ প্রভাব।"

তারাশঙ্কর তাঁর সহজাত প্রতিভাবলে বাংলা ও তার জনজীবনকে দেখেছেন, ভেবেছেন ও এঁকেছেন। রাঢ় বাংলার আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা সংস্কৃতিকে চিনেছেন। পিছিয়ে থাকা শ্রেণিবর্গের প্রতি তাঁর দৃষ্টি চিরকালীন, সেই দৃষ্টি নিয়েই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ সমাজ ও সংস্কৃতির রূপকে, তাঁর বৈচিত্র্যময় ছোটগল্পেরা সেই সাক্ষ্য বহন করে দৃঢ়ভাবে।

তথ্যসূত্র-

১) ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ(সম্পাদিত), শ্রেষ্ঠ গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর, ২০২২ (তৃতীয় প্রকাশ), কলকাতা- ৭০০ ০০৯, পৃ. ৪৬।

২) তদেব, পৃ. ৪৪।

৩) তদেব।

৪) তদেব।

৫) তদেব, পৃ.৪০।

৬) তদেব, পৃ. ৪৪।

৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, ২য় পর্ব, পৃ. ১৫২।

৮) ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদিত), শ্রেষ্ঠ গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর, ২০২২ (তৃতীয় প্রকাশ), কলকাতা- ৭০০ ০০৯, পৃ. ১১২।

৯) ভট্টাচার্য, সুকুন্তলা, রুক্ষমাটির কবিয়াল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ, তারাশঙ্কর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮, পৃ. ২০৪।

১০) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার কালের কথা, তারাশংকর স্মৃতি কথা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৮৭, পৃ. ৭৫।

১১) ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ, শ্রেষ্ঠ গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর, ২০২২ (তৃতীয় প্রকাশ), কলকাতা- ৭০০ ০০৯, পৃ.১০৯।

১২) তদেব, পৃ. ১১০।

১৩) তদেব।

১৪) তদেব।

১৫) তদেব, পৃ. ১১২।

১৬) তদেব, পৃ.১১১।

১৭) তদেব, পৃ. ৭১ ,

১৮) তদেব।

১৯) তদেব, পৃ.৭০।

২০) তদেব, পৃ.১৭১।

২১) তদেব, পৃ. ১৭২।

২২) তদেব, পৃ. ১১৯।

২৩) তদেব।

২৪) তদেব, পৃ. ১২১।

২৫) তদেব, পৃ.১২৬।

২৬) তদেব, পৃ. ১৩০।

গ্রন্থপঞ্জী-

১) ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদিত), শ্রেষ্ঠ গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর, ২০২২ (তৃতীয় প্রকাশ), কলকাতা- ৭০০ ০০৯।

২) ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ, ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর, ভারবি প্রকাশনী, ৩০জুন ২০০৮(প্রথম প্রকাশ), কলকাতা-৭৩।

৩) ভট্টাচার্য, সুকুন্তলা, রুক্ষমাটির কবিয়াল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ, তারাশঙ্কর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮।

৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার কালের কথা, তারাশংকর স্মৃতি কথা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৮৭।

....

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাসে প্রান্তিক লোকজীবন

বাবলী বর্মন
গবেষক,বাংলা বিভাগ,কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract)

কথাসাহিত্যিক সুব্রত মুখোপাধায় বিশ শতকের সাতের দশকের একজন পরিচিত মুখ। মানভূম-পুরুলিয়ার আঞ্চলিক রুক্ষ ভূ-প্রকৃতির আদলে গড়া অদ্ভুত কঠিন, কায়ক্লিষ্ট এবং হতদরিদ্র নিম্নবৃত্ত শ্রেণির মানুষজন যাঁদের জীবনে আশ্চর্য কোমলতা স্বরূপ ঝুমুরের সুর-ছন্দ, নৃত্য-গীত শিরায়-ধমনীতে বহমান সেই প্রান্তিক রসিক-নাচনীদের মিলন-বিরহ-দুঃখ-সুখের আনন্দময় জীবনের অনন্য আখ্যান 'রসিক' উপন্যাস। অবহেলিত হারিয়ে যেতে বসা এক সমাজকে তিনি নির্মোহ ভঙ্গিতে রসিক-নাচনীদের জীবনযাত্রার হুবহু চিত্র সাহিত্যে রূপদান করেছেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে লক্ষণীয়। কর্মজীবনে তিনি যেহেতু ছিলেন একজন মহকুমা শাসক তাই তাঁর প্রশাসনিক কর্ম জীবনের সঙ্গে সাধারণ মানুষজনের সম্পর্ক এবং প্রশাসনের আঁতের কথার পরিচয় আমরা উপন্যাসগুলিতেও লক্ষ্য করি। লেখকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্যিকের মরমী নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর কথাসাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। শিল্পীর নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় আমরা তাঁর উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র্যেও লক্ষ্য করি। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক শিল্পরূপ লাভ করেছে। ফলে উপন্যাসগুলির প্রকাশভঙ্গী আরো বেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। লোকঐতিহ্যকে তিনি শিল্পীর নিপুণ তুলিতে উপস্থাপন করেছেন বেশ কয়েকটি উপন্যাসে। আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনার সুবিধার্থে যথাক্রমে 'পৌর্ণমাসী' (১৯৮৪), 'মধুকর' (১৯৮৯) এবং 'রসিক' (১৯৯১) এই তিনটি উপন্যাস (নির্বাচিত) অবলম্বনে লোকায়ত ঐতিহ্য যে তাঁর উপন্যাসগুলিতে মুখ্য অবলম্বন এবং লোকায়ত ভাবনার আলোকে উপন্যাসগুলি নিজস্বতায় দীপ্তমান হয়ে উঠেছে তা আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে ।

মূল শব্দ (Keywords)

সুব্রত মুখোপাধ্যায়, নির্বাচিত উপন্যাস, লোকজীবন, রসিক-নাচনী সম্প্রদায়, প্রান্তিক মানুষজন, লোকায়ত ভাবনা।

মূল আলোচনা (Discussion)

সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০-২০২০) বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন প্রখ্যাত কথাকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত সাতের দশকে ছোটগল্প রচনার মাধ্যমে। এরপর তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের জীবনে কুড়িটির অধিক উপন্যাস এবং শতাধিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের উৎস শিকড় থেকে উঠে আসা সাধারণ নিম্নবৃত্ত শ্রেণির মানুষজন। যাদের মাথার উপরে বাসের ছাঁদটুকুও নেই পায়ের নিচের মাটিটুকুও পরের কিন্তু তারা তাদের নিজস্বতায় নিজেরা অম্লান। বহমান জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নার বেদনাঘন জীবনের চলতি পথের কথাকে তিনি সাহিত্যে রূপদান করেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে মহকুমা শাসকের পদে কর্মরত ছিলেন, তাঁর সেই কর্মজীবনে সাধারণ দুঃখী, অসহায় মানুষজনের আর্থিক সহায়তা এবং তাদের হয়ে সাহিত্য অঙ্গনে আবেদন জানিয়েছেন। তুলে ধরেছেন শিল্পীর মরমী দৃষ্টি দিয়ে মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানবিক বার্তা। রথের চাকা টানতে যাদের চিরকাল প্রয়োজন সেই সকল মানুষই 'লোক' বলে পরিচিতি পেয়ে আসছে। তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না সব কিছুই আমাদেরকে শিকড়ের টানে টেনে নিয়ে যায়। তাই আমরা তাদের কাছে বার বার ছুটে যাই, তাদের সকল দুঃখের অংশীদার হতে। সেই শিকড়েই যে রয়েছে সাহিত্যের বুলি নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বরুপ-প্রকৃতি। আপনজন স্বরূপ সেই নিম্নবর্গের মানুষগুলির কথাকেই সুব্রত মুখোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন তাঁর স্বরচিত উপন্যাস-ছোটগল্পে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্বসূরি লেখককুল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অভিজিৎ সেন, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখদের কথসাহিত্যের পাশাপাশি সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কথাজগতেও নিম্নবর্গের মানুষ স্বমহিমায় শিল্পরূপ পেয়েছে। নিম্নবৃত্ত, সহায় সম্বলহীন সাধারণ দিনমজুর, কুলি, মেথর, ফাঁসুড়ে জল্লাদ, নৌ-শিল্পী, নাচনী ইত্যাদি বৃত্তিধারী

মানুষদেরকে উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে চিত্রশিল্পীর ন্যায় রূপদান করেছেন কথাশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। নির্বাচিত ‘পৌর্ণমাসী’, ‘মধুকর’ এবং ‘রসিক’ উপন্যাস তিনটি তার দৃষ্টান্ত।

‘পৌর্ণমাসী’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় শারদীয় ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় ১৯৮৪ সালে। বনেদী পরামাণিক বংশের কন্যা এবং পুত্রবধূ পূর্ণশশীর জীবনের সেকাল একাল নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। পূর্ণশশী তার উত্তরাধিকার সূত্রে মা নিভাননীর থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত নাপিত বিদ্যার লোকগাঁথা, মিথ, লোকাচারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হিন্দু শাস্ত্র মতে নাপিত ছাড়া আনন্দ কি শোক কোন অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হয় না। তাদের নরুণের ছোঁয়ায় সকল অশুচ সূচি বা শুদ্ধি হয়। এরকম একজন জীবন্ত মানুষকে নিয়ে এবং তার জীবনের সুখদুঃখ, স্মৃতিকে ঘিরে উপন্যাসটির আখ্যান নির্মিত হয়েছে। ব্যতিক্রম হয়েছে উপন্যাসটিতে পুরুষের পরিবর্তে এক নারীকে দেখানো হয়েছে, যে তার পঁচাত্তর বছরের জীবনে নাপিত কন্যার এবং পুত্রবধূর ভূমিকা পালন করে আসছে। নাপিত পুরুষদের কাজ বাহির মহলে হলেও নাপিত বউদের কাজ ছিল অন্দরমহলে বাড়ির বউ মেয়েদের নরুণ ছোঁয়ানো শুভ কাজে, একাদশীর দিন এয়োদের পায়ের নখ কাটা, আলতা পড়ানো, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরোহিতকে সাহায্য করা, পুজোর সামগ্রী যোগান দেওয়া ইত্যাদি। ষোলটি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে বর্ণিত উপন্যাসটিতে লোকপ্রবাদ, লোকছড়া, লোকায়ত ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে প্রচলিত লোকপ্রবাদের মাধ্যমে –

“এক আকাশ তারা মাথায় করে পূর্ণশশী বসেছিল অন্ধকার আমগাছটির নিচে। আমপাতার ছাদনা গলে তারার আলো গড়িয়ে পড়ছে আকাশ থেকে কুয়াশার মাঝখান দিয়ে। এরই একপাশে এক চিলতে চাঁদ- মহাদেবের জটার কোণে আড় হয়ে গিঁথে থাকা গহনার মতন।... মা বলত আকাশ হল মহাদেবের কপাল। দিনের বেলায় তেতে ওঠে আবার রাত্রি হলেই জুড়িয়ে স্থির।”[১]

লোকসাহিত্যের শাশ্বত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে এখানে। আকাশকে মহাদেবের কপালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অন্দরমহলের নারীদের বিভিন্ন ব্রত, পূজা-পার্বণ, লোকাচার, লোকশিক্ষা, প্রবাদ, লোকগান, ছড়া, ধাঁধার ব্যবহার রয়েছে উপন্যাসটিতে। লোকশিল্পের যে ঐতিহ্য তা পূর্ণশশীর কথায় ব্যক্ত হয়েছে –

“মা বলতো নাপতেনীর জন্ম ধারণ হল মানুষের যজমানির জন্য। তার আর কোনো কাজ নেই। মানুষের বিপদ আপদ কিংবা আনন্দের দিনে সে এসে না দাঁড়ালে কোনো কিছুই সম্পূর্ণ হয় না। সে এসে না ছুঁলে আনন্দ বা দুঃখ কোনটিরই ষোলকলা পূর্ণ হয় না।... তাইতো মরলেও নিশ্চিন্দি নেই। নাপিত না এলে পিতৃপুরুষের জল দানে নান্দীমুখ হবে না। সে এসে পা রাখবে আর অমনি বাপ-পিতামহ অন্নজলের জন্য হাঁ করবেন।”[২]

পরামাণিকদের বা নাপিতদের সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে যে – “মানুষের মধ্যে নাপতে ধূর্ত্ত পাখির মধ্যে কাওয়া, আর দেবতার মধ্যে কানাই ধূর্ত্ত, যার নেই ধরা পাওয়া।”[৩] বিভিন্ন ধরণের শোলোক বা ছিল্‌কার প্রয়োগ যেমন – ‘আলতা নাহি পরলে রাই, আসবে না তোর প্রাণ কানাই’[৪], ‘হাতে দিলাম খই, তুমি আমার জন্মের সই’[৫], ‘বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না’[৬] আছে। প্রচলিত অনেক লোকগানের ব্যবহার রয়েছে – ‘দেখে এলাম গঙ্গার ঘাটে মহাভারতের ইসটিমার, হরিদাস কেরানি যে তার আর দয়াল নিতাই চাঁদ টিকিট মাস্টার’[৭], ‘নদীর কূলে হবে রে শেষ বিয়ে’[৮], ‘ললিতা লো চিনবি তখন, তোর ললিত মাংস হবে যখন- কি গুণ আছে ওই রাই চরণে-’[৯]। হিন্দু রীতির বিবাহে নাপিতের গৌরবচন পাঠ না হলে যে বিবাহ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বিবাহ মণ্ডপেও নাপিতদের ‘হরগৌরির গৌরবচন’ পাঠের জন্য আবশ্যিকতা রয়েছে তা প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ হয়েছে উপন্যাসটিতে-

“শুনুন সবে ভক্তিভরে করি নিবেদন
কিঞ্চিৎ বিবাহের কথা করাবো শ্রবণ
দশরথ বরকর্তা কিবা শোভা পায়
কন্যাকর্তা সীতার পিতা যেন জনক রায়
বর লয়ে বরযাত্রী আযোধ্যা নিবাসী
উপনীত হলেন সবে জনকালয়ে আসি
শুভদিন শুভযোগে শুভকর্ম ধরে
মনের সাধে পুরোহিত ঠাকুর শুভকর্ম সারে
বিবাহ প্রায় হল সাঙ্গ শুনুন বিবরণ

হরিষ মনে উলুধ্বনি দিন সর্বজন...”[১০]

এছাড়া পূর্ণশশী ও কিরণশশীর লোকাচার পালন করে সই পাতানো এবং তার উপযুক্ত ছড়া পাঠের কথা বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন লোকাচার এবং লৌকিক দেবদেবীদের পূজা পার্বণের উল্লেখের ফলে উপন্যাসটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। লোকশিল্প মূলত বংশপরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্য বাহিত শিল্প। তাই আমাদের ঐতিহ্যকে জানতে হলে লোকসংস্কৃতির পাঠের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। নিজেদের অস্তিত্বকে তথা জাতিসত্তাকে জানতে হলে লোকসাহিত্যের দুয়ারে সকলকে পাঠ নিতেই হবে। আমাদের হৃৎস্পন্দনকে অনুভব করতে নিজেদের প্রাণকে জিয়ে রাখতে কথসাহিত্যিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও সেই কাজটিই করেছেন, পথের পাশে অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকা মণিমাণিক্যকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের উপস্থাপনায় উপন্যাসটিকে করে তুলেছেন প্রাণময় সৃষ্টি।

‘মধুকর’ উপন্যাসটি শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে সুব্রত মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার সুপরিচিত শ্রীপুর-বলাগড় অঞ্চলের নৌ-শিল্পীদের পরম্পরাগত নৌ-শিল্পটির বিপন্নতা এবং অবলুপ্তপ্রায় রূপকে পাঠকের সামনে এনেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ এই শিল্পটির পত্তন হয়েছিল মধ্যযুগে অষ্টাদশ শতকের সূচনালগ্নে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করলে আমরা নৌ-শিল্পের এবং নৌকার বিভিন্ন প্রকারভেদের কথা জানতে পারি। কবিরা বিভিন্ন রকমভেদের নৌকার ব্যবহার, নির্মাণ পদ্ধতির কথা বর্ণনা করেছেন। এরকম একটি সাবেক প্রসিদ্ধ শিল্পের অবক্ষয়ি বিপন্নতার কথা ‘মধুকর’ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন একালের কথাশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। শ্রীপুর-বলাগড়ের এই সুপ্রাচীন শিল্পটি কালের গর্ভে বিলীয়মান বিশ্বায়নের কবলে অবলুপ্তপ্রায় লোকশিল্পটির কথাকে তিনি সাহিত্যে চিত্ররূপ দান করেছেন। নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক এই নৌ-কারিগরদের জীবনের নানা লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকঐতিহ্য, ট্যাবু, টোটেম ইত্যাদির প্রয়োগ করে উপন্যাসটিতে লোকজীবনের এক অনবদ্য আখ্যান নির্মাণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মধুকরের নাতি বাদল নৌকা নির্মাণের ব্যস্ততার মাঝে নদীর কাঁকড়া ধরে দাদুকে দেখাতে এলে কাঁকড়ার নাম উচ্চারণ করতেই মধুকর রেগে নাতিকে ধমক দেয় কারণ ট্যাবু রয়েছে যে কুঁচে, কাঁকড়া, কচ্ছপ হল অযাত্রা। তাই নাম পরিবর্তন করে বলতে হয় ‘দশরথ’[১১]। নৌ-শিল্পীরা তাদের পরম্পরাগত লোকাচারকে মান্যতা দিয়ে নৌকা পত্তনের কাজে হাত দেন। শুভকাজ সূচনা করার আগে পণ্ডিতের কাছে পাঁজি পুঁথি দেখে, চাঁদ তারার অবস্থান, গতিপথ দেখে দিনক্ষণ স্থির করেন। উপন্যাসটিতেও দেখি নৌ-শিল্পী মধুকর বারিক অজয়-সন্দীপদের বায়না করা নৌকা নির্মাণের কাজ শুরু করার পূর্বে সাত দিন চেয়ে নেন। সাত দিন পর মঙ্গলবারেই চাঁদ তারা শুদ্ধ রয়েছে তাই সেই দিনই নৌকার কাজ শুরু করতে মত প্রকাশ করেন মধুকর। নৌ-কারিগরদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সওদাগর ওঝার গণনা না মেনে সপ্তডিঙা নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করায় তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, সেই লোকবিশ্বাস যে বিংশ শতকেও নৌ-কারিগররা মেনে চলেন তার দৃষ্টান্ত আমারা ‘মধুকর’ উপন্যাসটিতে দেখি। এমনকি নৌ-শিল্পীদের বাড়ির মেয়ে বউরাও যে তাদের হস্তশিল্পে নিজেদের ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলেন, তার চিত্র রয়েছে উপন্যাসটিতে। মধুকর বারিকের পুত্রবধূ পলাশী তার নিজের হাতে তৈরি চটের ব্যাগে ফুটিয়ে তোলে সাবেক একটি বজরার চিত্র, যেটি চলেছে ঢেউ ভেঙে সাহেব মেমদেরকে নিয়ে দূরদূরন্তের পথে পাড়ি দিতে। বজরার গায়ে বাহারি নকশা গাঁথা, জানলায় সারি সারি সাহেব মেমদের মুখ মাথায় টুপি পরা। এই উপন্যাসেটিতেও পলাশীর সই পাতানোর প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। এরপর লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে পুতুল নাচ দেখানো, পুতুল নাচের দল গড়ে বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে আনন্দ দান গ্রামের মানুষদেরকে, রামায়ণ, মহাভারতের ধর্মমূলক পালা ইত্যাদি দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহের কথা উল্লেখিত হয়েছে। মধুকরের জামাই বিনোদ পুতুল নাচের দল তৈরি করে তাকেই জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম নির্বাচন করেছেন। নৌকা নির্মাণ সমাপ্ত হলে খরিরদারের হাতে নৌকা তুলে দেওয়ার আগে ফুল জল দিয়ে পূজা দান করার নিয়মকে মধুকর ধরে রেখেছেন। জন্মদাতা বিশ্বকর্মার হাতের জল না পেলে নৌকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না -এই লোকবিশ্বাসে বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে নৌকা বিক্রি করার প্রথাকে নৌ-কারিগররা বাঁচিয়ে রেখেছে – “মধুকর দুই অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে ঢেলে দেয় নৌকার মাথায়। মনে মনে এক মুঠি ফুল তুলে নেয়। অঞ্জলিবদ্ধ হাতে মধুকর বারিক আশীর্বাদ নাকি নিবেদন রাখে মনে মনে। আবার যেন দেখা পাই হে আমার রক্তঘাম পাত করা সন্তান।”[১২] শ্রীপুর-বলাগড়ের নৌ-শিল্পটির প্রাচীনতাটিকে বোঝাতে লোকমুখে প্রচলিত যে ভগীরথ যেদিন মা গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন সেই দিন থেকেই এই নৌকা তৈরির পত্তন ধরাধামে। স্থানটির পূর্বনাম ছিল ‘আঁটিশেওড়া’ গ্রাম। উপন্যাসটির সমাপ্তি এবং সূচনা হয়েছে মধুকরের শোনা একখানি প্রাচীন লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে – “নদী দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া যায়, এ হেন সোনার নৌকা জলে ভেসে যায়...”[১৩] এই লোকসঙ্গীতটি মধুকর দেশভাগের পূর্বে ওপার বাংলায় অবস্থান কালে কোন মাঝি মহাজন ছোকরার মুখে শুনেছিল। দেশভাগের পূর্বে এবং পরে নৌ-শিল্পীরা তাদের জীবনের নানা বিপর্যয় পেরিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাপ

পিতামহের এই লোকশিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে এই লোকশিল্পটি ধ্বংসের মুখে অবলুপ্তপ্রায় একটি শিল্প। একালের আমদানি রপ্তানির বাজারে শিল্পটি পুঁজিপতিদের তথা বাণিজ্যিক হয়ে পড়েছে। উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগের অভাব, মূলধনের স্বল্পতা ইত্যাদি আর্থিক কারণ এমনকি ঘরেও নিজেদের উত্তরসূরির কাছে শিল্পীরা অযোগ্য বলে পরিগণিত ফলে তারা নিজেদের অস্তিত্বকে আর বিশুদ্ধতা নিয়ে ধরে রাখতে পারছে না। শিল্পের এই অপমৃত্যু সত্যিই বেদনাদায়ক। প্রকৃত শিল্পীরা মূলধন, পুথিগত উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাকে আয়ত্ত করতে পারেনি জন্য বিশ্বায়নের ফলে তারা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলছে। শিল্পীদের সেই করুণ বিষাদগাঁথা উপন্যাসটির আখ্যানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শিল্পের এই অবক্ষয়ি রূপ আর এক শিল্পীর তুলিতে চিত্রিত হয়েছে 'মধুকর' উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে।

'রসিক' উপন্যাসটির প্রকাশকাল জানুয়ারি ১৯৯১ সালে। পুরুলিয়ার একটি লোকনৃত্য হল নাচনী নাচ। সেই নাচনী নাচ উপন্যাসটির মূল প্রেক্ষাপট। নাচনীদের সঙ্গে তাদের রসিকদের এবং পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি উপন্যাসটিতে বিস্তারিত ভাবে শিল্পরূপ লাভ করেছে। নাচনী নাচ ও ঝুমুর গানের অপূর্ব সংমিশ্রণে উপন্যাসটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। মানভূম-পুরুলিয়া অঞ্চলে নাচনী নাচের জনপ্রিয়তা অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত সময়কালে এমনকি একবিংশ শতকেও সিন্ধুবালা দেবী, পোস্তবালা দেবী, বিমলাবালা দাসী, ননীবালা দাসী, চারুবালা কালিন্দী, মালাবতী দেবী, রাজুবালা দাসী, সরস্বতী দেবীর মত অনেকেই এই নাচের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এই নাচনীরা একসময়ে সমাজে সম্মানিতা ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে নাচনীরা সমাজের শোষণ, বঞ্চনার শিকার হয়ে ও নাচনী নাচের ঘরানার পরিবর্তন হয়ে আজকের নাচনী শিল্পীরা সমাজে ব্রাত্য। মানভূম-পুরুলিয়া অঞ্চলের এই নাচনীদের বিশেষ নাচের প্রচলন হয় উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ অনেকটা বাইজি নৃত্য সংস্কৃতির অনুকরণে। মধ্যযুগের রাজ আমলে কিংবা জমিদার বাড়িতে ও পরে বাবু সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেশ বিদেশ থেকে নাচের জন্য বাইজি ভাড়া করে এনে আনন্দ ফুর্তি উপভোগ করার যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল তারই ক্ষয়িষ্ণু রূপ পরবর্তী সময়ের মানভূম-পুরুলিয়ার নাচনী নাচ। বাইজী নাচেরই পরবর্তী সময়ের শিষ্ট রূপ নাচনিদের নাচের মধ্যে চলে এসেছে। মানভূমের জমিদাররা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তির ফলে তাঁদের বৃত্তহীন ও বৈভবহীন অবস্থায় অবসর বিনোদনের জন্য ব্যয়বহুল বাইজিদের পরিবর্তে নাচনীদের নাচের আসরের আয়োজন করতেন। জমিদার বাড়িতে অথবা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে বিয়ে, অন্নপ্রাশন কিংবা গ্রামের বারোয়ারি পূজোয় এই নাচনীদের নাচের আসরে বায়না করে নিয়ে আসত টাকার বিনিময়ে। শুধু পুরুলিয়া নয় পুরো রাঢ় অঞ্চলে অষ্টাদশ শতক থেকে নাচনী নাচের জমজমাট আসর বসত জমিদারদের গৃহে ও পরে জমিদারের অনুকরণে স্থানীয় মানুষরাও নাচনী নাচের আসর বসাতেন। নাচনীদের নাচের টাকায় রসিকের সংসার চলত। রসিক তাঁর সংসারকার্য পরিচালনার জন্য অন্য কর্ম ছেড়ে রসিক হয়ে নাচনী রেখে নিজ সংসারধর্ম চালনা করতেন। রসিকের কুলের বউ ও সন্তান থাকত সঙ্গে তাঁরা একজন নাচনী রেখে আসরের জন্য দল গড়ে নাচনী নাচ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নাচনী নাচ একসময় রাজা কিংবা জমিদারের দ্বারা চালিত হলেও বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা পূর্বে অথবা স্বাধীনতা উত্তর সময়কালে সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের অবলুপ্তির কারণে এই নাচনীরা সমাজের নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়েরা ডোম, হাড়ি, মুচি ইত্যাদি নিম্নবৃত্ত পরিবারের মেয়েরা পেটের দায়ে সংসারের অভাব-বঞ্চনার শিকার হয়ে নাচনী হয়ে যেত। নাচনী হতে গেলে যেমন রসিক ছাড়া সম্ভব নয় তেমনি রসিকেরও নাচনী ছাড়া রসিক হওয়া সম্ভব নয়। তাইতো সবাই রসিক হয়ে শিল্পীর আনন্দলাভ ও দেশে বিদেশে নাচ-গান করে সংসার চালনা করতে চাইলেও পারেন না। তাঁকে নাচনী রেখে নাচ-গান করে সংসার চালনা করতে হবে। এই নাচনীরা উচ্চ বর্ণের কিংবা উচ্চবৃত্ত সচ্ছল সংগতিসম্পন্ন পরিবারের কেউ জন্মসূত্রে নাচনী হবার স্বপ্ন দেখেন না। রসিকরা হয়ত শিল্পী হিসাবে অথবা বংশপরম্পরায় রসিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু নাচনীরা মানভূম-পুরুলিয়ার গরীব, দুঃখী কোন পরিবারের মেয়ে যারা দুবেলা দুমুঠো খাবারের আশায় স্ব-ইচ্ছায় কোন রসিকের নাচনী হয়ে যান। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারে অভাবের তাড়নায় মাতা অথবা পিতার দ্বারা কোন কন্যা সন্তান রসিকের কাছে বিক্রি হয়ে যান নাচনী হবার জন্য। 'রসিক' উপন্যাসটিতে সুব্রত মুখোপাধ্যায় ধারাবাহিক ভাবে দুটি কাহিনিকে উপস্থাপন করেছেন একটিতে নাচনী বিজুলিবালার ক্ষোভ, হতাশা, বঞ্চনা সবকিছুকে অতিক্রম করে শিল্পের কদর করতে শেখা বা শিল্পী হয়ে ওঠার দৃশ্য পাশাপাশি অন্যদিকে দেখি তরণীসেনের প্রকৃত নাচনীর অভাবে রসিক হওয়ার স্বপ্নভঙ্গের দৃশ্য। পুরুলিয়ার শুষ্ক মাটিতে নাচনীরাই প্রাণ ঢেলে দেন নৃত্য ও ঝুমুর গানের পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সমাজ তাদেকেই বঞ্চিত করে রাখে। মানুষ হিসাবে তাঁদের বাঁচার অধিকারটুকু কেড়ে নেয়। এমনকি মৃত্যুর পরও তাঁদের মৃত দেহকে সৎকারের কাজটিও

ডোমের হাতে দেওয়া হয়। মৃতদেহের সৎকারের শেষ কাজটি কোন ডোমকে গ্রামের বাইরে নদীর ধারে সম্পন্ন করতে হয়। নাচনীও রসিকের বউয়ের মতই মাথায় সিঁদুর দেয় ও সংসারের বাড়তি কাজকর্ম করেন। কিন্তু তাঁকে হেঁশেলের কাজকর্ম বা রান্না ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। শেষ জীবনে নাচনীরা সংসারের কাছে বা সন্তানের কাছে কোনও অধিকার দাবী করতে পারবেন না এবং মৃত্যুর পরে নাচনীর দেহটিকে ডোম এসে দড়ি দিয়ে বেঁধে গ্রামের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে নদীর জলে কিংবা ভাগাড়ে ফেলে দেবেন অথবা কোন সহৃদয় ডোম নদীর ধারে তাঁর সৎকারের ব্যাবস্থা করবেন। যৌবনে নাচনীদের নাচের কদর থাকলেও বৃদ্ধ বয়সে নাচনীদের কষ্টের সীমা থাকে না। এরকম একটি বিপন্ন শিল্পের কথাকে এবং শিল্পীদের করুণ অশ্রুসিক্ত বেদনাঘন জীবনের কথাকে শিল্পরূপ দান করতে গিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় সাহিত্য দর্পণে মানভূম-পুরুলিয়া সংস্কৃতির চিত্রকে অবিকল জীবন্ত করে প্রতিবিম্বিত করেছেন। মানভূমের লোকসঙ্গীত ঝুমুরের সৌন্দর্য, লোকদেবী ভাদু, টুসু, সাতবৌনি দেবীর পূজা, কুলপ্রথা, লোকাচার ইত্যাদিকে সুনিপুণ ভাবে পরিবেশন করেছেন। নীচে উপন্যাসে উল্লেখিত কয়েকটি ঝুমুরের পদ দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

ক) "নাগর আসিবে বলে দুয়ার রাখিনু খুলে/ সরবইস্য লিয়ে গেল চোরে গো/ না জানি কোন ঘুমের ঘোরে।/ ঘটি লিল বাটি লিল তাও সইতে পারি/ দিদিলো মাথা বাঁধা ডোর গেল চুরি..."[১৪]

খ) "আমি কলসি নিয়ে রাধারানী/ আমার লাগর বাজায় বাঁশি/ আমি লাজে মইরলাম ও ননদী/ তাই হব কাশীবাসী..."[১৫]

গ) "ই ছক্‌রা মজেছে লতুন রঙেতে/ হায়রে হায় কলি যুগেতে-..."[১৬]

ঘ) "ঝিঙাফুল লিলেক জাতি কুল গো/ পিরিতি হল শূল/ এমন জান'লে কালার সাথে/ কে পাতাথ ফুল গো।।/ বর্ণ ছিল চাঁপার কলি/ ভাবে ভাবে হইলাম কালি/ বসিলে উঠিতে লারি/ হাতে ধরে তুল গো।।/ প্রথম পিরিতি কালে/ হাতে চন্দ্র আনে দিলে হে/ ঘর থা'কে বা'র কইরলে কালা/ দিয়ে কত ঝুল গো।।..."[১৭]

সাঙ্কেতিক ঝুমুরের দৃষ্টান্ত –

"পাঁচে পঞ্চগুণ সিন্ধু বিন্দু দেল/ তিথি তথি তায় হরণ গেল/ এই বলি গিরিধারী চলি গেলা মধুপুরে/ আর না আওল ফিরি-"[১৮]

রসিকের কুলপ্রথার কথা বর্ণিত হয়েছে যথা- রসিককে আগে বাড়িতে কুলের বউ বিয়ে করে আনতে হবে তার পর নাচনী রেখে দল বেঁধে গান বাজনা করে জীবিকা নির্বাহের বাসনা বা ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। কুলের বউ হবে সমগোষ্ঠীর বা নিজ জাতির। নিচু জাতের ডোম, হাড়ী, মুচির কন্যার মুখ দেখা শুধু পাপ নয় মাহাপাপ। জাতপাতের বেড়াজাল যে পুরুলিয়ার নিম্নবৃত্ত শ্রেণির মানুষজনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে কায়েম ছিল তা তরণিসেনের পিতা গুলঞ্চকুমার কথায় স্পষ্ট - "রুজ সকালে উঠ্যে অ্যাকটি ডম বিটিছেল্যার মু দিখা। ই শুধু পাপ লয়, মহাপাপ।... -পহিলে কুলপ্রথা। পরে লাচনী। আগে জাতের বউ, ভাতের বউ। পরে ডম লাচনী।"[১৯] এছাড়া মেয়েদের সই পাতানোর মত ছেলেদেরও সখা অথবা 'ফুল' পাতানোর প্রসঙ্গের উল্লেখ, ধাঁধার প্রয়োগ- "অজমতের চলা, রামকৃষ্ণের গলা, দুর্যোধনের বলা"[২০], পৌষ মাসের টুসু পরব বা উৎসবের গানের বর্ণনা রয়েছে –

"-এত বড় পোষ পরবে রইলি মা শ্বশুর ঘরে
তর কি মাগো নাই মনে পড়ে।
আমার দু নয়ানে লোর পড়ে।
বাপে মায়ে বিহা দিল ভাল শ্বশুর ঘর দেখে
জনম গেল ঢালা মার খা'তে..."[২১]

রসিকের সংসারে কুলের বউয়ের সঙ্গে নাচনীর যেরূপ ঈর্ষাপরায়ণ সতীন স্বরূপ সম্পর্ক তেমনি লোকদেবী 'সাতবৌনি' দেবী বলে এক লোকদেবীর উল্লেখ উপন্যাসটিতে রয়েছে। এই দেবী মাঠের মাঝে এক বড় শ্যাওড়া গাছের ডালে বাস করে। এই 'সাতবৌনি' দেবীরা হলেন সাত বোন যথাক্রমে- মনসা, বসন্তকুমারী, ওলাইসিনি, কালু বুড়ি, কাঁদুনি বুড়ি ইত্যাদি। এই সাতজন বোন বা সাতবৌনিরা কেউ দেবতা নন অপদেবতা। কোনও পুরুষ মানুষ একা ওই শ্যাওড়া গাছের তলা দিয়ে ভরদুপুরে কিংবা রাত্রিকালে হেঁটে গেলে তারা সেই পুরুষকে বিয়ে করতে চান। সেই পুরুষটি যদি বিয়ে করতে রাজী না হন কিংবা প্রাণভয়ে কোন এক বোনকে বিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন অন্য বোন তার ঘাড় মটকে দেন কিংবা দেহের কোন অংশে আগুনবাণ ছুঁড়ে দেহ জখম করেন। উপন্যাসটিতেও রসিক ধ্রুবকুমারকে এই 'সাতবৌনি' আগুনবাণ ছুঁড়ে পা জখম করে দিয়েছে বলে অমলা জানায়। এছাড়া বিভিন্ন লোকবিশ্বাস ঝাড়ফুঁক,

মন্তরতন্তর, পাঁজি দেখে গ্রহ নক্ষত্র দেখে দিন ক্ষণ স্থির করা, যাত্রায় মঙ্গল অমঙ্গল বিচার, কবিরাজি চিকিৎসা, হাত দেখা ইত্যাদির সমাহারে উপন্যাসটির আখ্যান নির্মিত হয়েছে। আঞ্চলিক ঝাড়খন্ডী লোকভাষার ব্যবহার উপন্যাসটিতে মণিমাণিক্যের ন্যায় শোভাবর্ধন করেছে এবং আঞ্চলিক ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রয়োগে কথাকার সুব্রত মুখোপাধ্যায় পুরো মানভূম-রাঢ়বঙ্গের মানুষদের আঞ্চলিকতার আবহ তৈরি করেছেন। মানভূম সংস্কৃতির মানুষদের লোকসঙ্গীত, লোকভাষা, লোকসংস্কৃতিকে এবং বিভিন্ন লোকাচারের প্রয়োগে উপন্যাসটিতে তিনি পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও সহানুভূতি পূর্ণ মন নিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় উপন্যাস তিনটিতে (পৌর্ণমাসী, মধুকর, রসিক) ভিন্ন ভিন্ন তিনটি নিম্নবৃত্ত পরিবারের চিত্রকে শিল্পরূপ দান করেছেন। যাদের বাসের জন্য মাথার উপরে চাল নেই, পায়ের নিচে মাটিটুকুও পরের। কিন্তু তাদের একমাত্র পরিচয় নিজেদের জাতিসত্তা। যা তাদের একান্তই আপন। সেখানে কারোর হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ নেই। সেই নাপিত বংশের কন্যা নিভাননী তার নিজের সন্তানের মধ্য দিয়ে বেঁচে রয়েছে পঁচাত্তর বছর ধরে পূর্ণশশীর মাধ্যমে। পূর্ণশশীও তার মায়ের কাছে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করতে যে শিক্ষা লাভ করেছিল তা আজীবন বহন করেছে। মধুকর বারিকও তার পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত নৌ-কারিগরি বিদ্যাকে ধরে রেখেছে। আত্মনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে অনুভব করার যে শিক্ষা তা উপন্যাসগুলি পাঠে আমরা লাভ করি। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার সাধনার পথে একমাত্র মৌল একক হল লোকশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম। যা মানুষের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনকেই পূরণ করে না, মানুষের অন্তরস্থিত সৌন্দর্য শক্তিকে প্রকাশ করে। শত শত বছর ধরে যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে চলেছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং লোকশিল্প কলা। যা মানুষের জিনগত শিল্পবোধ ও নান্দনিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাকে শিল্পরূপ দান করেছেন উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে কথশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

তথ্যসূত্র (References)

১) মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, উপন্যাস অমনিবাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ-১৪২২। পৃ. ৩।

২) তদেব। পৃ. ৪৮। ৩) তদেব। পৃ. ৭৯। ৪) তদেব। পৃ. ১৩। ৫) তদেব। পৃ. ৪৮। ৬) তদেব। পৃ. ৫১। ৭) তদেব। পৃ. ১৬।

৮) তদেব। পৃ. ১০। ৯) তদেব। পৃ. ১০৩। ১০) তদেব। পৃ. ৫৯। ১১) তদেব। পৃ. ১৪৭ ১২) তদেব। পৃ. ১৮৪।

১৩) তদেব। পৃ. ২৪৬।

১৪) মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, 'রসিক', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বের-২০১৮। পৃ. ১৬৩।

১৫) তদেব। পৃ. ১১৪। ১৬) তদেব। পৃ. ১৪৫। ১৭) তদেব। পৃ. ৩৮৪।

১৮) তদেব। পৃ. ৫১১। ১৯) তদেব। পৃ. ২১০। ২০) তদেব। পৃ. ৫১৬। ২১) তদেব। পৃ. ৫৭৯।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

আকর গ্রন্থঃ

১। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, 'উপন্যাস অমনিবাস', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ-১৪২২।

২। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, 'রসিক', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বের-২০১৮।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। মজমুমদার, উজ্জলকুমার, 'উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০০৯।

২। পাল, রবিন, 'উপন্যাসের বর্নময় ভুবন', অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০১১।

৩। রায়, দেবেশ, 'উপন্যাস নিয়ে', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর-২০১৯।

৪। রায়, দেবেশ, ‘উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর-২০২১।

৫। ভট্টাচার্য, দেবীপদ, ‘উপন্যাসের কথা’, দে’জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৮।

৬। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ‘কালের প্রতিমা’, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছরঃ ১৯২৩-১৯৯৭, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ-২০১৭।

৭। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ‘বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল ষাট বছরের বাংলা উপন্যাস (১৯৪৯-২০০৯)’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী-২০১১।

৮। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ‘বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর-২০১৬।

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ‘বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০২২-২০২৩।

১০। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, ‘দুই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৮।

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, নবম সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৪।

১২। রায়, অলোক, ‘সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য’, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৭০০০০৬, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী-২০২২।

১৩। দাস, অমিতাভ, ‘আখ্যানতত্ত্ব’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ-২০১৪।

১৪। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, ‘বাংলা উপন্যাস ও তাঁর আধুনিকতা’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল-২০০০।

১৫। চক্রবর্তী, অলোক, ‘আখ্যানের তত্ত্বভুবন’, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি-২০২৩।

………………………………………………

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের নীরব প্রতিবাদ

ড. বিপুল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ও সাহিত্য বিভাগ
শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদিয়া

সংক্ষিপ্তসার

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবাদ প্রতীম উপন্যাসিক। ‘কল্লোল’ এর লেখকরা যখন বিদ্রোহী চেতনার পরিচয় দিতে গিয়ে সমাজমনস্ক হতে পারেননি। তখন জগদীশ গুপ্ত নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমাজ জীবনের বিচিত্র প্রেক্ষাপট ও দুর্লভ কিছু আবিষ্কারে মগ্ন। তিনি উপন্যাসের মধ্যে সমাজের নিচুতলার মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস, নিয়তি তাড়িত, ভাগ্যবিপর্যয় ও অসহায় জীবনের যথাযথ চিত্র তুলে ধরেছেন। শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্যজনিত সংস্কারের দিকটি যেমন উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক পটভূমিতে নিম্নবর্গের মানুষের দুর্দশা ও শোষণের নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ (১৯২৯) ‘লঘুগুরু’ (১৯৩১), ‘দুলালের দোলা’ (১৯৩১), ‘রোমন্থন’ (১৯৩১) প্রভৃতিতে উচ্চবর্গের শাসন ও শোষণ এবং নিম্নবর্গের নির্মম দারিদ্রের জটিল সমস্যার চিত্র পাওয়া যায়।

সূচক শব্দ :

কল্লোল, বিদ্রোহী, বর্ণবৈষম্যজনিত, নিম্নবর্গ, সমাজব্যবস্থা, উচ্চবর্গ, অর্থনৈতিক, নগ্ন রূপ ।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবাদ প্রতীম উপন্যাসিক জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। ‘কল্লোল’ এর লেখকরা যখন বিদ্রোহী চেতনার পরিচয় দিতে গিয়ে সমাজমনস্ক হতে পারেননি। তখন জগদীশ গুপ্ত নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমাজ জীবনের বিচিত্র প্রেক্ষাপট ও দুর্লভ কিছু আবিষ্কারে মগ্ন। তিনি উপন্যাসের মধ্যে সমাজের নিচুতলার মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস, নিয়তি তাড়িত, ভাগ্যবিপর্যয় ও অসহায় জীবনের যথাযথ চিত্র তুলে ধরেছেন। শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্যজনিত সংস্কারের দিকটি যেমন উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক পটভূমিতে নিম্নবর্গের মানুষের দুর্দশা ও শোষণের নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ (১৯২৯) ‘লঘুগুরু’ (১৯৩১), ‘দুলালের দোলা’ (১৯৩১), ‘রোমন্থন’ (১৯৩১) প্রভৃতিতে উচ্চবর্গের শাসন ও শোষণ এবং নিম্নবর্গের নির্মম দারিদ্রের জটিল সমস্যার চিত্র পাওয়া যায়।

‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ (১৯২৯) উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত পতিত জীবনের এক করুণ মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র সিদ্ধার্থ নামধারী নটবর। তার প্রকৃত পরিচয় হল, সে নিম্নবর্গের এক বৈষ্ণবীর গর্ভজাত ও ব্রাহ্মণের জারজ সন্তান। তার অতীত জীবন কিছু কলঙ্কময় অধ্যায়ের সমষ্টি। সেই কুৎসিত ও নগ্ন জীবন অজয়ার প্রেমের ছোঁয়ায় সে নবজন্ম লাভ করে বিকশিত হতে চেয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখা যায় সিদ্ধার্থরূপী নটবরের ছদ্ম পরিচয় অপ্রত্যাশিত ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার অপরাধ সে স্বীকার করেছে। নটবর নতুন জীবন কামনায় উদগ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু অজয়া তাকে প্রত্যাখ্যান করে কঠিন সংযমের পরিচয় দেয়। নটবর নিম্নবর্গের জারজ সন্তান তথা ‘অভ্যস্ত পাষণ্ড’ হয়েও অজয়ার ভালোবাসার মূল্য দিতে চেয়েছে। কিন্তু এতে উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণদের মর্যাদা হানি হয়। তথাকথিত পতিত মানুষের অন্তহীন প্রেম উচ্চবর্গের চোখে মূল্যহীন। উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণ যখন জৈবিক তাড়নায় নিম্নবর্গের বৈষ্ণবীর সাথে আদিম ক্রিয়ায় অবৈধভাবে লিপ্ত হয়েছে তখন তাদের জাত যায় না। আবার তারই ঔরসজাত-জারজ-সন্তান যখন অজয়ার সাথে প্রেমে লিপ্ত হয়েছে তখন উচ্চবর্গের মানুষেরা তাদের হীনদৃষ্টিতে দেখছে। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত এই উপন্যাসে মূল্যহীনের মূল্য দিতে চেয়েছেন। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে মানুষের কোন জাত ভেদাভেদ নেই। তাই উপন্যাসের মধ্যে নটবরের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে তাঁরই আপন অন্তরের বাণী-

> “...কিন্তু আমিও মানুষ।”[১]

কিন্তু নিয়তির চক্রান্তে নটবরের ভালোবাসাও ব্যর্থ হয়েছে।

এ উপন্যাসে একদিকে যেমন ব্রাত্যজীবনের সমস্যা ও জটিল রূপ ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক পটভূমিতে নিম্নবর্গের দরিদ্র প্রজার দুরাবস্থার চিত্রও পাওয়া যায়। জমিদারি প্রথার অন্তর্ভুক্ত হেতমপুর গ্রাম। প্রজারা জমিদারকে কখনো চোখে দেখেনি, বারোমাসেই পড়ে থাকে কোলকাতায়। তার নায়েব গোমস্তরাই জমিদারি দেখাশুনা করে। এই নায়েব গোমস্তারাই প্রজাদের ওপর নির্মম অত্যাচার করে। শোষিত, বঞ্চিত অবহেলিত প্রজাদের মুখ বুজে তাদের নিপীড়ন-নির্যাতন ভোগ করতে হয়। আর সে জন্যই জগদীশ গুপ্ত জমিদারি প্রথাকে ধিক্কার জানিয়েছেন, এবং বিশেষত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর তাদের জুলুম, পীড়ন, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন।

জগদীশ গুপ্ত-এর 'লঘু-গুরু' (১৯৩১) উপন্যাসে সমাজের পতিতা নারীর সামাজিক মর্যাদা লাভের বিষয় সুস্পষ্ট। স্বভাবত, পতিতা সম্পর্কে উচ্চবর্গ তথা ভদ্র জনেরা সমাজে তাদের হীন চোখে দেখে। এ উপন্যাসে উচ্চবর্গের বিশ্বম্ভর নিম্নবর্গের পতিতা নারী উত্তমকে রক্ষিতা হিসাবে ঘরে এনেছে। সংসারে তার একমাত্র কন্যা টুকীকে দেখাশুনার দায়িত্ব উত্তমের উপরে থাকে। কিন্তু উত্তম সম্পর্কে চাপা গুঞ্জন শুনতে পায় বিশ্বম্ভর। পাড়ার প্রতিবেশীদের কুৎসিত মন্তব্য-হয়তো উত্তম টুকীকে নিয়ে গিয়ে টাকা রোজগারের জন্য বেশ্যা বৃত্তি গ্রহণ করাবে। আর যদি তা না হয়, তবে টুকীকে বিয়ে দেওয়া মুশকিল হবে, কারণ টুকী যেহেতু বেশ্যার হাতে মানুষ হয়েছে। বিশ্বম্ভরের কাছেও প্রতিবেশীদের এই যুক্তি সমর্থিত হয়। হঠাৎ যেন তার জ্ঞান চক্ষু খুলে যায়। সে মনে মনে ভাবে-

"কার এত গরজ পড়িয়াছে যে, ভদ্রলোকের মেয়ে ছাড়িয়া দিয়া বেশ্যার হাতে যে মানুষ হইয়াছে, সেই টুকীকে ঘরে লইবে।"[২]

পতিতার জীবন সম্পর্কে সমাজে উচ্চবর্গের ভদ্রলোকেরা উন্নাসিক মনোভাবেব পরিচয় দেয়। তাদের কাছে পতিতা একেবারে অপাংক্তেয়। পতিতা নারী কখনো ভদ্রলোকের সহানুভূতি লাভের আশা করে না। পূর্বসূরী শরৎচন্দ্র সহানুভূতির সঙ্গে পতিতার জীবন তুলে ধরেছেন। পতিতা নারীর সতীত্ব অপেক্ষা প্রেমের গৌরবকেই তিনি বড় করে দেখিয়েছেন। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত 'লঘু-গুরু' উপন্যাসে পতিতার সতীত্ব কিংবা প্রেমের দিকটি বড় করে দেখাননি। পতিতাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ও মর্যাদা দানের বিষয়টি-ই তার কাছে মুখ্য। উত্তম বেশ্যার জীবন ত্যাগ করে বিশ্বম্ভরের ঘরে এসেছে। আসলে পতিতা নারী উত্তম চিরাচরিত সমাজ সংস্কারের বুকে হেনেছে চরম আঘাত। শরৎচন্দ্রের পতিতা নারী সংস্কারের চাপে দ্বিধাগ্রস্থ। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, উত্তম পতিতা হয়েও শুচিবায়ুগ্রস্থ। অবশ্য এ সম্পর্কে বিশ্বম্ভরের কাছে উত্তমের বক্তব্য হলো-

"আমার শুচিজ্ঞান নেই, কিন্তু ওকে শেখাতে হবে বলেই বাইরে দেখাই।"[৩]

সমাজের বুকে পতিতা নারীকে মর্যাদা দান জগদীশ গুপ্তের ভাবাবেগ পরিচালিত হয়নি। সমাজের কঠোর বাস্তবতাকে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। এদিক থেকে জগদীশ গুপ্ত কল্লোল-চেতনার সার্থক রূপকার।

'লঘু-গুরু' উপন্যাসে জগদীশ গুপ্তের নিম্নমধ্যবিত্তের চেতনায় নিম্নবর্গের পতিতা সম্পর্কে মর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশীরা উত্তমকে 'বেশ্যা' বলে টুকীর কানে বিষ ঢেলেছে, টুকীর মা যে রক্ষিতা এবং সে যে উত্তমের গর্ভজাত সন্তান নয়-এ বিষয়ে তারা বেনামী চিঠি লিখে ধর্মদাসের পুত্রের সঙ্গে টুকীর বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। এমনকি বিশ্বম্ভরও এ সম্পর্কে উত্তমকে কটুক্তি করতে দ্বিধাবোধ করেনি। সে উত্তমকে বলেছে-

"এই হয়রানি আমার কেবল তোমার জন্যে, তুমি এসে না জুটলে কবে আমি খালাস পেয়ে যেতাম।"[৪]

এ উপন্যাসে সমাজের জাতিভেদজনিত বৈষম্যের চিত্র পাওয়া যায়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্গের ডোমেরা অস্পৃশ্য। সুন্দরী ডোম জাতের মেয়ে। সে রূপে গুণে সুশ্রী। আর সেই জন্যই পরিতোষ সুন্দরীর প্রেমে মাতোয়ারা। টুকীর স্বামী পরিতোষেরই রক্ষিতা। বিয়ের পর হিন্দু প্রথানুযায়ী টুকী স্বামীগৃহে অর্থাৎ ডোমপাড়ার সুন্দরীর বাসভবনে গিয়ে উঠলো। সমাজের মধ্যে ডোমেরা অস্পৃশ্য বলে, সেকারণে পরিতোষের বিয়ে করা বৌকে তারা উঠোনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রেখে গেল। সুন্দরী রক্ষিতা হলেও জাত-পাতের দিক থেকে অস্পৃশ্য ডোমের অপেক্ষা তার মর্যাদা অধিক। সুন্দরী ডোমপাড়ায় এ বিধবা রমণীর গর্ভের সন্তান নষ্ট করার ঔষধ দেয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। ওষুধ ব্যবহারের বিধি-নিয়ম না মানায় বিধবা রমনীটির ননদকে সুন্দরী ক্রোধের সঙ্গে বলেছে-

"তোরা ছোটলোক ত ছোটলোকই, ছোটলোকের হদ্দ ডোম কিনা।"[৫]

জগদীশ গুপ্ত এই উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত বিশ্বস্তরের পাশাপাশি সমাজের ঘৃণিত নারী উত্তম ও সুন্দরীর পতিতা বৃত্তির চিত্র এবং রক্ষিতা হিসাবে তাদের মানবিকবোধকে তুলে ধরেছেন। তার উপন্যাসে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা অনুপস্থিত। আসলে তার মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

জগদীশ গুপ্তের 'দুলালের দোলা' উপন্যাসটি ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসে সমাজের জাত-পাত-স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এখানে উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণের সংস্কার তথা জাত্যভিমান, নীচতা-শঠতা ও হীনমন্যতাবোধের নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসে পোড়া-বৌ গ্রামের উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণদের অনাচার ও ব্যভিচারের চিত্র উজ্জ্বল রূপে ফুটে উঠেছে। গ্রামীণ সমাজে উচ্চবর্গ ব্রাহ্মণের সংস্কার কতখানি পীড়াদায়ক, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছে নীরদ সরকার।ধর্মভাই মনীশের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে নীরদবরণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আসল চেহারা প্রত্যক্ষ করেছে। বর্ণবৈষম্য তথা স্পৃশ্য-অস্পশ্যের নগ্নরূপ দেখে সে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। যেহেতু সে এবং সতীশ জারজের বংশধর, সেহেতু মনীশের বাড়িতে তারা এক পংক্তিভোজের যোগ্য নয়। ধর্মভাই মনীশ নীরদকে এঁটো বাসন ধুয়ে দিয়ে যেতে বলেছে। মর্যাদা রক্ষার্থে সতীশ তার নিজের ও নীরদের উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে-ধুয়ে পরিষ্কার করেছে নির্দ্ধিধায়। আসলে নীরদ ও সতীশ নিম্নবর্গের জারজের সন্তান বলে উচ্চবর্গের সংস্কার আচ্ছাদিত মনীশ তাদের অবহেলা করেছে, যার ফলে খাবার পড়ে বাসন পরিষ্কার করতে হয়েছে। কিন্তু নীরদ জাতিভেদের উর্ধ্বে সে সকলকে আপন করে নেয় এক নিমিষে। সে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে-

"জাতিভেদ আর ছোঁয়া-ছুঁয়ির অপবিত্রতা আমি মানি না, এত মানি আর সে বিষয়ে আমি এত নিঃসংঙ্কোচ যে, কাহারো জাতি পরিচয় আজ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই, জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়াই কখনো মনে হয় না। কিন্তু এখানে প্রীতি ভোজনে বসিবার উপক্রমেই এই শ্রেণী বিভাগের ভেদ-সঙ্কট, আর ইহাদের চতুরতা, এমন বিসদৃশ নির্লজ্জ আর তীক্ষ্ণ হইয়া দেখা দিলো যে, সহিষ্ণুতা হারাইয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।"[৬]

জারজের সন্তান সতীশ সমাজের উচ্চবর্গের কাছে একেবারেই অপাংক্তেয়। পোড়া-বৌ গ্রামে চিরাচরিত নিয়ম হল-

"শুদ্দুর বামুন-বাড়ী খেলে সে পাতা ফেলে এটোঁয় গোবর দিয়ে আসবে।"[৭]

সতীশ নিম্নবর্গের শুদ্রের সন্তান। সে উচ্চবর্গের সামাজিক রীতি-নীতি মানতে রাজি নয়। উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণরা এভাবে নিম্নবর্গের শুদ্রদের ঘৃণা করে হীন মনে দেখত। এর ফলে নিম্নবর্গের মনে বিদ্রোহের জেগে উঠল।

উচ্চবর্গের বর্ণবৈষম্যের ফলে তার অন্তরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। সে নীরদকে বলেছে-

"আমার সমাজ আছে, না জাত আছে, যে ওদের আমি কি ধার ধারি। আমার এঁটো আমি ফেলতাম না বাবু; সত্যি কথা যে ফাঁকি দিতাম।"[৮]

তৎকালীন সমাজে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের দাপট অনস্বীকার্য। সমাজে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার উপায় হল ধোপা-নাপিত আর হুঁকো বন্ধ করা। আসলে সমাজে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ নিম্নবর্গের মানুষদের শুদ্রজ্ঞানে ঘৃণা করে থাকে। জগদীশ গুপ্ত সমাজের উচ্চবর্গের মুখোস খুলে দিতে চেয়েছেন। বিশেষত, এই উপন্যাসে দেখা যায় সমাজে নিচুতলার তথাকথিত পতিত মানুষের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে তিনি সোচ্চার।

সমকালীন সমাজে কোনো ক্রিয়া অনুষ্ঠানে উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণদের পাশে নিম্নবর্গের কোন স্থান ছিল না। উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণদের জন্য খাবার রান্না হয়েছে, সেই রান্নার সুগন্ধ নিম্নবর্গের মানুষেরা নাকে ঘ্রাণ নিলে নাকি খাদ্যবস্তু উচ্ছিষ্ট হয়ে যেত, এটা উচ্চবর্গরা মনে করে। আর সেজন্যই ব্রাহ্মণের এসব অনাচার দেখে নীরদ দ্বারিকাঠাকুরের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। সে তাকে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছে-

"আগে মানুষ, তারপরে ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে-আপনাদের এই কথাটা মনে করবার সময় এসেছে।"[৯]

গ্রামীণ সমাজে নিম্নবর্গের চেতনা অনুপস্থিত। তারা দরিদ্র হবার জন্য ভাগ্যকে দায়ী করে। কোনদিনই তারা পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করে না। এই নিম্নবর্গের মানুষগুলোকে শোষণ করে থাকে উচ্চবর্গের জমিদার মহাজনেরা। এ উপন্যাসে মনীশরা সুদখোর শোষক শ্রেণীরই প্রতিভূ। লোভ-লালসা বা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে এরা সমাজে যে কোন হীন কর্ম করে থাকে।জগদীশ গুপ্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত করেছেন। মনীশ সম্পর্কে পিসিমার উক্তি হল-

"...মুসলমানকে টাকা দেয় না, দেয় কেবল ছোটজাত হিন্দুকে, তারা পায়ের ধুলো চেটে বেড়ায়-প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্ব ফাঁকি দিয়ে খায় না।"[১০]

জগদীশ গুপ্ত সমাজসচেতন শিল্পী। গ্রামীণ সমাজে বর্ণবৈষম্যজনিত শোষণের চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি অর্থনৈতিক পটভূমিতে নিম্নবর্গের পতিত মানুষের দুরবস্থা ও বিত্তশালী মহাজনশ্রেণীর শোষণের চিত্রও তুলে ধরেছেন। তবে চরিত্রগুলো শোষণের বিরুদ্ধে কোথাও সোচ্চার বা শ্রেণীসচেতন নয়।

জগদীশ গুপ্ত 'রোমন্থন' (১৯৩৬) উপন্যাসে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বিধ্বস্ত গ্রামীণ বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসে একদিকে গ্রামের সঙ্গে একান্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শহুরেবাবুদের গ্রাম্য পরিবেশ ও নিচুতলার মানুষের প্রতি অবহেলা, অন্যদিকে গ্রামীণ সমাজে স্বার্থান্বেষী সুবিধাভোগী মহাজন শ্রেণীর শঠতা প্রবঞ্চনার ফলে ভূমি নির্ভর নিম্নবর্গের গ্রামীণ জীবন কিভাবে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তার চিত্র তুলে ধরেছেন।

এই উপন্যাসে অভয় গ্রামবাংলার অবহেলিত ও অপাংক্তেয় কৃষকশ্রেণীর প্রতিভূ। চরমদারিদ্র্যের মধ্যে তার দিন কাটে। অথচ গ্রামের মহাজন ঋণের দায়ে, তাকে সর্বদা শোষণ করে চলেছে। গ্রামবাংলার সার্বিক অবক্ষয় ও দূরবস্থার জন্য কেবল শহরকে দায়ী করেন নি জগদীশ গুপ্ত, তাঁর মতে গ্রামের স্বার্থান্বেষী মহাজন-জমিদারও সমান দায়ী।

বস্তুত, গ্রাম্যচাষীরা দুঃসময়ে অর্থের প্রয়োজনে গ্রাম্য মহাজনের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকায় শেষে নিঃসহায় চাষী ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা মহাজনের হাতে সমর্পণ করে মুক্তি পায়। এ উপন্যাসে অভয় পুত্রের চিকিৎসার জন্য ভুলু দাসের কাছে মাত্র পঁচিশ টাকা ধার নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু মহাজনের সেই ঋণ পরিশোধ করতে সে অক্ষম। ঋণের সুদ হয়েছে আসলের সমান। ভুলু দাস একজন লোভী সুদখোর মহাজন। দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষ অভয়ের বাড়িখানি গ্রাস করার দুরিভসন্ধি-ই তার মধ্যে প্রকট। তাই সে টাকার জন্য অভয়কে আদৌ পীড়াপীড়ি করে না। গ্রামীণ সমাজে ঠক প্রবঞ্চকেরও অভাব নেই। এই মহাজন ছাড়াও গ্রামের অধিকাংশ সরল মানুষের দুর্গতির জন্য ধূর্ত ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে দায়ী।

গ্রামের দুই বিপরীত শ্রেণীর প্রতিভূ কালোশশী উচ্চবর্গের আর অভয় নিম্নবর্গের সম্পর্ক প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিতের। অভয় কালোশশীর নিকট প্রতারিত হয়েছে। অভয়ের চরম দারিদ্র্যের সুযোগ নিতে কালোশশী এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। লেখক কালোশশী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

"তবু বাবুদের সঙ্গে তার ঐক্য আছে-একটা আলাহিদা স্থানে উভয় পক্ষের মনে মনে ধর্ম সমন্বয় ঘটিয়াছে; সেই একটি মাত্র দৈবজ আবহাওয়ার মাঝে বাবুদের সঙ্গে কালোশশী একত্রে অবস্থান করে।"[১১]

'রোমন্থন' উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত বাংলার চরম সংকট ও দুর্দশার মূল কারণ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। কলকাতা শহর পত্তনে গ্রামীণ জীবন শহরমুখী হয়েছে। গ্রামের উচ্চবর্গ গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে এসেছে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এবং বিলাস চরিতার্থকল্পে তারা গ্রামের মানুষের উপর নির্মম শাসন ও শোসন চালিয়েছে।

গ্রামীণ সমাজে উচ্চবর্গের বাবুশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের যে বিস্তর ভেদ রয়েছে, লেখক তা নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। স্বভাবত, 'গেঁয়ো' মানুষের প্রতি শহুরে বাবুদের অতি জঘন্য ঘৃণার ভাব বর্তমান। অভয় ও কালোশশীর কথোপকথনের মধ্যেই এর মূলভাবটি ধরা পড়েছে। অভয়ের প্রতি কালোশশীর উক্তি হলো-

"-বাবুরা শুয়ে শুয়ে যে মেহনৎ-টা করে তোমার আমার ভুঁই চষার চেয়ে তো আকাশ প্রমান বেশি।'

-তা হবে।

-তা-ই হয়েছে। মজুর আর বাবুতে তফাৎ ত এখানেই। তুই সারাদিন খেটে ছ' আনা পাবি-বড় জোড় সাত আনা, বাবুরা মাথা খাটিয়ে হাকিমের সামনে একটা কথা বলে' দেবে তার দাম দিতে হবে তোকে চারটি টাকা।"[১২]

'রোমন্থন' উপন্যাসের শেষভাগে দেখা যায়, গ্রামের স্বার্থান্বেষী মানুষ জাত-পাতের দোহাই দিয়ে কেমন করে হীন পঙ্কিলতার গর্ভে নিমজ্জিত। বাড়ির তথাকথিত 'ছোটলোক' বাগদী রাখালের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত-এই অপবাদ রটিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করেছে নির্দ্বিধায়। গ্রামের মানুষও এই বধূ ও তার বিধবা মাকে এক ঘরে করে চরমশাস্তি দিয়েছে।

জগদীশ গুপ্ত এই উপন্যাসে গণমুখী জীবনের স্বরূপ তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু চরিত্রগুলি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোথাও সোচ্চার নয়। অর্থাৎ কোন চরিত্রকে তিনি সংগ্রামী করে তোলেন নি। জমিদারি প্রথা, জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে গ্রামের চাষীরা এবং

নিম্নবর্গের মানুষগুলো কোথাও প্রতিবাদ মুখর নয়। তারা অধিকার সচেতন বা শ্রেণীবোধে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত ছিলেন স্বতন্ত্র পথের পথিক। 'নির্মোহ নিরাসক্ত বিজ্ঞান বুদ্ধির' প্রতি তাঁর আস্থা ছিল প্রবল, এবং সে কারণেই তিনি ভাবলুতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। তাঁর উপন্যাসে অধিকাংশ চরিত্রই গ্রাম বাংলার নিম্নবর্গের অসহায় দুর্বল, অবহেলিত, শোষিত বঞ্চিত, নিপীড়ত মানুষ। বাস্তবাদী সাহিত্যিক হিসাবে তিনি শুধু বাংলাসাহিত্যে নয় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম প্রাণবন্ত লেখক।

সূত্র নির্দেশ:

১। গুপ্ত জগদীশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'অসাধু সিদ্ধার্থ', কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ১৫২
২। গুপ্ত জগদীশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'লঘু-গুরু', কলকাতা, ১৩৫৪, পৃ. ২৭
৩।তদেব, পৃ. ২৯
৪।গুপ্ত জগদীশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'লঘু-গুরু', কলকাতা, ১৩৫৪, পৃ. ৪৬
৫।গুপ্ত জগদীশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'লঘু-গুরু', কলকাতা, ১৩৫৪, পৃ. ৫৭
৬।গুপ্ত জগদীশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'দুলালের দোলা', কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ২৫৩
৭।তদেব, পৃ. ২৪০
৮।গুপ্ত জগদীশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'দুলালের দোলা', কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ২৪০
৯।তদেব, পৃ. ২৫১
১০।গুপ্ত জগদীশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'দুলালের দোলা', কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ২৪৫
১১।গুপ্ত জগদীশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, 'রোমন্থন', কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৮১
১২।গুপ্ত জগদীশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, 'রোমন্থন', কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৮১

....

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের পেশা ও ভাষা : একটি সমীক্ষা

ড. হজরত উমার ফারুক

সহ শিক্ষক,জগন্নাথপুর হাই মাদ্রাসা(উচ্চ মাধ্যমিক),হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ

সারসংক্ষেপ:

প্রত্যেক মানুষকে জীবন যাপনের জন্য অর্থ উপার্জন করতে হয়। অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। বরাবরই জাতির সঙ্গে পেশার একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যদিও বর্তমানে জাতিগত গণ্ডির মধ্যে পেশা আবদ্ধ নেই। তারপরেও উচ্চবর্গের পেশার সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের পেশার বিস্তর ফারাক রয়েছে। মানুষের পেশার সঙ্গে তার ভাষারও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নিম্নবর্গের জীবন কথা আলোচিত হয়েছে। আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের কাব্যের পথ ধরে আধুনিক কথা সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ পর্বে গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন। তিনি নিম্নবর্গের মানুষের বাস্তব চিত্র তাঁর ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর গল্পে বিভিন্ন জাতি,বর্ণ ও পেশার মানুষের ছিল সরব উপস্থিতি। তিনি চরিত্র চিত্রণে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি গল্পে চরিত্র উপযোগী ভাষা ব্যবহার করে চরিত্রকে বাস্তবসম্মত ভাবে গল্পে উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রের পেশা ও ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তিনি চরিত্রকে গল্পের মধ্যে সজীব প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তিনি গল্পের বর্ণনায় মান্য চলিত ভাষার ব্যবহার করলেও চরিত্রের সংলাপে কথ্য ও ঘরোয়া ভাষার ব্যবহার করছেন। তাঁর গল্পে নিম্নবর্গের মানুষ বিশেষ স্থান পেয়েছে। তাঁর 'হীরালাল' গল্পের প্রধান চরিত্র হীরালাল নিম্নবর্গের ব্যক্তি। তাঁর ' প্রেম ও প্রহার' গল্প গোয়ালা দম্পতির দাম্পত্য কলহ নিয়ে রচিত। 'দুধ মা' এবং 'বন্য শিশু' গল্পে নিম্নবর্গের মানুষের সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় মেলে। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গল্পে নিম্নবর্গের মানুষের পেশা ও ভাষার সার্থক ব্যবহার দেখা যায়।

মূল শব্দ:

নিম্নবর্গের অবস্থান, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হীরালাল, প্রেম ও প্রহার, দুধ মা, বন্য শিশু।

মূল প্রবন্ধ:

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আবহমান কাল ধরেই চলছে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম। একদা ভারতবর্ষে জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা ছিল সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামো স্বরূপ। উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলো রাষ্ট্র পরিচালনা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মূল নিয়ন্ত্রক। নিম্নবর্গের মানুষের কাজ উচ্চবর্ণের মানুষের আজ্ঞাবহ হয়ে সেবা করা। জাতির সঙ্গে পেশার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যদিও উত্তর আধুনিককালে জাতিগত পেশায় বৈচিত্র্য দেখা গেছে। মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির অবস্থান বর্তমান সমাজব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। সাম্যবাদের ভাবনায় যা শাসক ও শোষিত শ্রেণি। আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত শ্রেণিকে আমরা নিম্নবর্গ বলতে পারি। নিম্নবর্গের অবস্থান বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে ডোম,শবর, চণ্ডাল সহ অন্যান্য নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন চিত্র বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে। পরবর্তীতে মঙ্গলকাব্য,জীবনী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য সহ মধ্যযুগের কাব্যধারা বেয়ে আধুনিক কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন ও চালচিত্র বর্ণিত। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে নিম্নবর্গের জীবনকথা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্র সমসাময়িক কালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছোটগল্প রচনায় আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ছোটগল্পের ভাঙ্গা গড়ার কালে তিনি ছোটগল্প রচনা করে বাংলা ছোটগল্পকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। বিষয় নির্বাচন, চরিত্র চিত্রণ ও আঙ্গিক গঠনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণি,বর্ণ ও পেশার মানুষ তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। "প্রভাতকুমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লেখক ।"[১]

তিনি তাঁর ছোটগল্পে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজের উচ্চবর্ণের পাশাপাশি নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য রচনায় তিনি মুন্সীআনার পরিচয় দিয়েছেন। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাঁর গল্পে। নিম্নবর্গের মানুষের পেশা ও ভাষা তিনি বাস্তবসম্মতভাবে ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'হীরালাল', 'প্রেম ও প্রহার' ,'দুধ মা', 'বন্য শিশু' গল্পে নিম্নবর্গের জীবন কথা চিত্রিত। এছাড়াও 'বিষবৃক্ষের ফল', 'পত্নীহারা', 'কুড়ানো মেয়ে', 'হতাশ প্রেমিক', ' বলবান জমাতা', ' হারাধন' সহ অন্যান্য ছোটগল্পে নিম্নবর্গের পেশা ও ভাষার বাস্তবসম্মত প্রয়োগ লক্ষণীয়। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে তাঁর নির্বাচিত কিছু ছোটগল্প আলোচনা করা হলো।

হীরালাল:

প্রভাতকুমারের 'হীরালাল' গল্পটি তাঁর 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে সংকলিত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। গল্পটি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছোটগল্পের প্রধান চরিত্র হীরালাল। সে নিম্নবর্গের ডোম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তার পরিচয় দিয়েই গল্পের সূচনা হয়েছে ।

"হীরালাল জাতিতে ডোম। বৃদ্ধ হইয়াছে, বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না, আকার খর্ব, দেহখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অধিক স্থূলও নহে। কিন্তু এত বয়স হইলেও তাহার দেহে এখনও বল আছে।...গ্রামখানির নাম মাণিকপুর। গ্রামের যেটা ডোমপাড়া, যেখানে অন্যান্য ডোমদের বাস, সেখানে হীরু থাকে না। গ্রামের অপর প্রান্তে, শ্মশান হইতে অল্প দূরে একখানি মাটির ঘরে সে একাকি বাস করে।"[২]

হীরুর স্ত্রী, সন্তান কেউ নেই। সকলেই গত হয়েছে। কথিত আছে ভূতের সঙ্গে তার বিশেষ ভাব রয়েছে।গভীর রাতে তার সঙ্গে ভূতের কথোপকথন হয় তাই সে ডোমপাড়ায় না থেকে লোকালয় থেকে দূরে শ্মশানের কাছে বসবাস করে। সে ওষুধপত্র, তন্ত্র মন্ত্রও জানে। আশেপাশের গ্রামের লোকজন বিভিন্ন রোগের জন্য তার কাছে ওষুধ নিতে ও ঝাড়ফুঁক করতে আসে। একদিন রাত ১১ টা নাগাদ এক স্ত্রীলোক হীরুর বাড়িতে ওষুধ নেওয়ার জন্য আসে। সেই স্ত্রীলোক বললো-

" শেয়ালের বড় উপদ্রব হয়েছে,বুঝেছ! রান্নাঘরের বেড়া ফাঁক করে, রোজ রাত্রে শেয়াল ঢুকে, আমার হাঁড়ি খেয়ে যায়। দুটো শেয়াল মরে, এই রকম খানিকটা বিষ তুমি আমায় দিতে পারো?"[৩]

এই স্ত্রীলোকের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে হীরুর মনে সন্দেহ হয়। সে চড়াদামে তাকে বিষ দেয়। বিষ নিয়ে স্ত্রীলোক চলে গেলে হীরু তার অনুসরণ করে। স্ত্রীলোক এক ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রামে এক বাড়িতে প্রবেশ করে। এই মহিলা বিনোদলালের স্ত্রী নীরদা। তার স্বামী দুইবছর ধরে বিদেশে কর্মরত। সে তার চার বছরের একটি পুত্র সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে থাকে। এক মাসের ছুটি নিয়ে বিনোদ বাড়ি ফিরছে । এরপর গল্প নতুন মোড় নিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়েছে। হীরু রাতে প্রাচীর টপকে বিনোদের ঘরে প্রবেশ করে। এত রাতে তাকে দেখে নীরদা অবাক হয়ে বললো-

" হীরু তুই চোরের মত এখানে কি করছিস? বাড়ি ঢুকলি কি করে?

হীরু বলিল, পাঁচিল টপকে এসেছি। কাল অষুধ নিয়ে এলে ওষুধের ফলটা কিরকম হলো তাই দেখতে এসেছি।"[৪]

এই কথা শুনে নীরদা বিস্মিত হয়ে বলে, ওষুধ কোন কাজ করছে না। ওষুধ কাজ না করার কারণ হীরু বিষের গুঁড়ো না দিয়ে রাতের বেলা ভুল করে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল। তাই বিনোদ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। নীরদা, হীরুকে বলে সে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। হীরু যে জবাব দেয় তাতে নিম্নবর্গের ভাষার বাস্তব নিদর্শন মেলে। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল-

" হ্যাঁ-লো হারামজাদি শয়তানী নচ্ছারনী! হ্যাঁ! তোকে ফাঁকি দিয়েই তো টাকা নিয়েছি। এখন আমি যে জন্য এসেছি তা বলি শোন। নে, তোর গয়না কাপড় বাক্স থেকে বের করে, পুঁটুলি বেঁধে নে। তোকে, আজ রাত্রেই কলকাতায় যেতে হবে।"[৫]

হীরুর প্রস্তাবে রাজি না হলে সে বিনোদকে সব বলে শোরগোল শুরু করে দেবে। একপ্রকার বাধ্য হয়েই নীরদা হীরুর সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্টেশনের দিকে রওয়ানা দিল। পরদিন বিনোদ তার স্ত্রীর পদস্খলনের বিষয় জানতে পেরে জমিজামা বিক্রি করে ছেলেকে নিয়ে অমৃতসরে চলে গেল। এভাবে গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

আলোচ্য গল্পে গল্পকার প্রভাতকুমার নিম্নবর্গের হীরালালকে প্রধান চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। নীরদাকে একজন খল চরিত্র হিসেবেই পাঠক গল্পে পেয়েছে। সে উচ্চবর্ণের গৃহবধূ হলেও তার স্বভাব চরিত্রে নিম্নরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রেম ও প্রহার:

প্রভাতকুমারের 'প্রেম ও প্রহার' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়। পরবর্তীতে গল্পটি তাঁর 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে সংকলিত হয়। আলোচ্য গল্পটি নিম্নবর্গের এক দম্পতির কলহ বিবাদ, বিচ্ছেদ ও মিলনের ঘটনা নিয়ে রচিত।গল্পের প্রধান চরিত্র পেশায় গোয়ালা ভজহরি গোপ ও তার স্ত্রী মোক্ষদা সুন্দরী । তাদের দাম্পত্য কলহ দিয়ে গল্পের সূচনা হয়েছে।গল্পকার প্রভাতকুমার নিম্নবর্গের এক দম্পতির সংসারের নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন-

"প্রভাতকুমার বাঙালি সংসারের নিপুণ কলাবিদ। তাঁর স্নিগ্ধ মমত্বের স্পর্শে আমাদের পরিচিত পারিবারিক জীবনের হাসি কান্না গুলি মনোরম হয়ে দেখা দিয়েছে।"[৬]

'প্রেম ও প্রহার' গল্পের নামকরণের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের কলহ ও মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে। পদ্মা তীরবর্তী রায়গঞ্জনামা গ্রামে বসবাস করে গোয়ালা সম্প্রদায়ের ভজহরি গোপ ও তার স্ত্রী মোক্ষদা সুন্দরী।গল্পের সূচনা স্বামী স্ত্রীর উত্তপ্ত বাক্যালাপের মাধ্যমে। উভয়ের কথোপকথনে নিম্নবর্গের ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেছেন গল্পকার। ভজহরি উচ্চস্বরে বলে-

" খপর্দার মাগী মুখ সামলে কথা কোস নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।"[৭]

ভজহরি স্ত্রীকে জুতা-পেটা করার কথা বললে পাল্টা জবাব দিয়েছে মোক্ষদা। সে বলল-

" ইস! রাগ দেখ পুরুষের! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবেন। জুতো পাবি কোথা তাই শুনি? বাপের জন্মে জুতো কখনও পায়ে দিয়েছিস রে মিনসে।"[৮]

স্বামী স্ত্রীর বাকবিতণ্ডায় গল্পে ইতর শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মোক্ষদা স্বামীকে সম্বোধন করেছে 'মিনসে' বলে। স্বামী পয়সা রোজগার করতে পারে না বলে সে খোটা দিয়েছে। তার পাল্টা জবাব দিয়েছে ভজহরি। সে স্ত্রীকে 'শুয়োরকে বাচ্ছি', 'মাগী', 'শালী হারামজাদি'বলে সম্বোধন করেছে। তাদের উভয়ের মুখে বহু কথ্য শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে। 'ন্যাকা', 'গেরাস', 'শরীলটে', 'গায়ে গতরের', 'নোকের' শব্দ প্রয়োগ রয়েছে। ভজহরি ও মোক্ষদার কলহ বাকযুদ্ধে সীমাবদ্ধ থাকে না, কখনো তা হাতাহাতি পর্যায়ে পৌঁছয়। একদিন মোক্ষদার সঞ্চিত অর্থ গোপনে ভজহরি নিয়ে ছিপ লাগানোর জন্য পিতলের হুইল কিনে আনে। এই নিয়ে সংসারে কুরুক্ষেত্র বাঁধে। ভজহরি স্ত্রীর মুখ লক্ষ্য করে জ্বলন্ত কলিকা ছুঁড়ে মারে। মোক্ষদাও পাল্টা আক্রমণ করে। সে ভজহরির মাথায় সজোরে হুঁকো ছুঁড়ে মারে, পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়। মাথায় আঘাত পেয়ে মেজাজ বিগড়ে ভজহরি হুমকির সুরে বলল-

" দাঁড়া শালী হারামজাদি; তুই আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস, যাচ্ছি পুলিশে নালিশ করতে। তিনটি বচ্ছর তোকে যদি আমি জেল না খাটাই তাহলে মিনসের ছেলেই নই।"[৯]

এই হুমকি দিয়ে ভজহরি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।মোক্ষদা ভাবে সত্যিই কি তার স্বামী তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গেছে। রাতে সে স্বামীর জন্য খাবার ঢেকে রেখে নিজে খেয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন বেলা বাড়লেও স্বামী বাড়ি না ফেরায় সে থানায় খোঁজ নিতে যায়। দারোগবাবু জানান যে, রায়গঞ্জ ঘাটে এক ব্যক্তির ধুতি গামছা পাওয়া গেছে। দারোগা মৃত ব্যক্তির নামধাম ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করল। পরবর্তীতে মোক্ষদা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় শ্যামবাজারে রামদয়াল মিত্রের বাড়িতে ঝি হিসেবে কাজ শুরু করে। ভজহরি অ্যাটর্নিবাবুর ভৃত্য হিসেবে কাজ করছিল।ঘটনাক্রমে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়। তারা উভয়েই নিজ নিজ কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে আসে। তারা নিজেদের কুটির সংস্কার করে গাভী কিনে জাত ব্যবসা শুরু করে সুখের সংসার করতে লাগলো। দাম্পত্য কলহ দিয়ে গল্পের সূচনা হলেও গল্পের পরিণতি মিলনান্তক।

দুধ মা:

আলোচ্য 'দুধ মা' গল্পে উচ্চবর্গের অন্তঃসারশূন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, কপটতা ও নিম্নবর্গের কর্তব্য নিষ্ঠা ও সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।গল্পের সূচনা হয়েছে সার্কুলার রোডের উপর বড় বাগানওয়ালা নীলবর্ণের দ্বিতলবাড়ি ও গৃহকর্তার পরিচয় দিয়ে। গৃহকর্তা ডি. ভাদুড়ী মিন্টো মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক এবং এই কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের বড়কর্তা। ডাক্তার ভাদুড়ী ও তার স্ত্রী বিভাবতী এই গৃহে বসবাস করেন। অর্থ, যশ,খ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অভাব না থাকলে সন্তানের অভাবে নিঃসন্তান এই দম্পতির মানসিক প্রশান্তি নেই। ডাক্তারবাবুর বাড়ির সদর বারান্দায় এক অজ্ঞাত পরিচয় সদ্যোজাত পুত্র সন্তান পাওয়া নিয়েই গল্পের কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়েছে। সকালে ডাক্তারবাবুকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ির ঝি সোনার মা বলল-

" কোন অবাগী শতেকখোয়ারী এমন কাজ করলে মা, তা তো জানিনে! একটা মরা ছেলে এনে, আমাদের সদর বারান্দায় শুইয়ে রেখে গেছে।"[১০]

ডাক্তার গৃহিণীর মতে-

"... এ নিশ্চয়ই কোনও নষ্ট স্ত্রী লোকের কাজ ।বিধবা টিধবা কেউ প্রসব হয়েছে, তার আত্মীয় বন্ধুরা গলা টিপে মেরে এইখানে ফেলে রেখে গেছে।"[১১]

গৃহিনীর এই কথা শুনে সোনার মা, যে কথা বলেছে তাতে নিম্নবর্গের ভাষার সার্থক নিদর্শন মিলে সে বলেছে-

" তাই হবেক গো, তাই হবেক। পুলিশে খবর দাও মা, তারা ধরে নিয়ে গিয়ে হারামজাদি নচ্ছার মাগীকে ফাঁসি দিক।"[১২]

ডাক্তার বাবু শিশুকে দেখে বললেন যে, শিশুটি মৃত নয় জীবিত। গৃহিণী শিশুকে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়ে নিঃসন্তান ডাক্তার দম্পতি শিশুকে নিজেদের কাছে রেখে দিলেন। এই দম্পতি শিশুকে খোকা বলে ডাকেন।

ডাক্তাবাবু হাসপাতালেই খোকার দুধ মার সন্ধান পান। তার নাম ফুলটুসিয়া,জাতিতে দোষাধ, বাড়ি পাটনা। বাবা মারা যাওয়ার পর শিয়ালদহের কাছে মামার বাড়িতে তারা বসবাস করে। ফুলটুসিয়া খোকাকে দুধ পান করায়। সে খোকাকে আপন সন্তানের মত স্নেহ করে। খোকাও তাকে ছাড়া থাকে না। ইতিমধ্যেই খোকা এক বছরের হয়েছে। সে দুধ মাকে 'ফুলি- মা' বলে ডাকে। খোকার বয়স দুই বছর হলে ফুলি সন্তান সম্ভবা হয়। ডাক্তারবাবু এবার ফুলিকে বিদায় করলেন। ফুলির খোকাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। সে কান্নার সুরে বলল,"খোকাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকবো মা? কেমন করে আমার মুখে ভাত জল রুচবে ?"[১৩]

ফুলির এই উক্তিতে তার মাতৃ হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। খোকাও রাতে ফুলি-মা যাবো বলে কান্না করে। আশ্বিন মাসে ফুলির পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।এদিকে ফাল্গুন মাসে খোকা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। এই খবর শোনামাত্র ফুলি সব বাধা উপেক্ষা করে খোকার কাছে ছুটে আসে। কিন্তু যথাযথ চিকিৎসার পরেও খোকা বাঁচলো না। খোকার মৃত্যুতে ডাক্তার গৃহে শোকের ছায়া। এদিকে ফুলি বিলাপ করে বলে- "ওরে আমার ধন রে, আমার বুকের কলজে রে, আমায় ছেড়ে তুই কোথায় চলে গেলি রে?"[১৪]

খোকার মৃত্যুর পর তার শেষকৃত্য খ্রিস্টীয় ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী করার জন্য পাদ্রীসাহেব ডাক্তারবাবুর কাছে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে ডাক্তার ভাদুড়ী আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে, আমি তার জনক না হলেও পিতা। তখন পাদ্রী সাহেব জানান যে, আমি তার পিতামহ। পাদ্রী সাহেব খোকার জন্মরহস্য উন্মোচন করে জানান যে, তাঁর পুত্র জোসেফের ঔরসে ফুলির গর্ভে খোকার জন্ম। খোকার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হওয়ার পর গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

বন্য শিশু:

প্রভাতকুমারের 'বন্য শিশু' গল্পটি তাঁর 'ষোড়শী' গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৭ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যায়। গল্পের প্রধান চরিত্র কুমুদনাথ ডাক্তারের পরামর্শ মেনে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য শীতঋতু যাপন করতে স্ত্রী গিরিবালা ও দুই বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে সিমলা যাত্রা করেন। সিমলা কালেক্টারি অফিসে কুমুদবাবুর সতীর্থ যদু বাবু ছিলেন। সেখানে থাকার ভালো বন্দোবস্ত হয়। একদিন কুমুদবাবু তারাদেবী মন্দিরে পুজো দিয়ে মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে গল্প করার সময় এক পাহাড়ী শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। পুরোহিত জানান যে, দুদিন আগে সেই ছেলেটিকে কুড়িয়ে পেয়েছেন। কুমুদবাবু ছেলেটিকে মানুষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি স্ত্রীকে বলেন-

"দেখ এরা অসভ্যজাতি, এদের কি ছেলে হারালে কোন দুঃখ আছে? তাহলে মা আসত, নিয়ে যেত। এখানে থাকলে ছেলেটি দু'দিনে মারা পড়বে।"[১৫]

শিশুটিকে বাড়ি আনা হলো, তার নাম রাখা হয় বুনো। খোকার সঙ্গে বুনোর বেশ ভাব জমে উঠল। তার সঙ্গে সারাদিন খেলাধুলা করল। কিন্তু পরের দিন সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনা হলো। কিন্তু দুদিন পর গিরিবালার কোলে বুনোর মৃত্যু হল। বুনোর অকাল প্রয়াণে ভীষণ কষ্ট পেল এই দম্পতি। বুনোর মৃত্যুর পর এক পাহাড়িয়া রমণী বাসায় ঢোকার চেষ্টা করলে ভৃত্য বিশুয়া তাকে ধরে ফেলে। একদিন খোকাকে নিয়ে বিশুয়া ঘুরতে যায় তখন এই পাহাড়িয়া রমণী খোকাকে আক্রমণ করে। পুলিশ এই রমণীকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। কুমুদবাবু পুলিশের কাছে জানতে চান তার ছেলেকে আক্রমণের কারণ কি, উত্তরে দারোগা বলল-

" ও বলে, তারাদেবী পাহাড়ে ওর ছেলে হারাইয়া গিয়েছিল, আপনি আনিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ও প্রতিশোধ লইতে চাহে।"[১৬]

কুমুদবাবু অবাক হন। পরের দিন খোকা খেলাধুলা করে ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময় সেই রমণী বিদ্যুৎ বেগে ঘর থেকে তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। "সেই সর্বনাশী লেপচা- রমণী; কিছুক্ষণ পূর্বে রক্ষীকে হত্যা করিয়া গারদ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।"[১৭]

এই লেপচা রমণী বিশুয়ার গলদেশ ছিন্ন করে ঘরে ঢুকে খোকাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে। এইভাবে ট্র্যাজিক পরিনিতির মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সমাজবাস্তবতা অঙ্কনের নিপুণ কারিগর। তিনি জীবন জীবিকার তাগিদে ব্যক্তিগত জীবনে নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পেশাগত জীবনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর ছোটগল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছেন। " তাঁর ছোটগল্পগুলি চলতি জীবনের এক-এক টুকরো ভাসমান ছবি।"[১৮]

তিনি জীবনে নিজের দেখা বাস্তব ঘটনাগুলো ছোটগল্পে বাস্তবসম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই সমাজের চলমান চিত্র তাঁর গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সমাজের নিম্নবর্গের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনকথা অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তিনি গল্পের মূল উপজীব্য করেছেন। তিনি তাঁর গল্পে অধ্যাপক, চিকিৎসক,হাকিম, উকিল,জেলার,পত্রিকা সম্পাদক সহ উচ্চবর্গের পেশার মানুষের পাশাপাশি মুটে, মজুর,ঠেলাওয়ালা,ঝি, চাকর,দারোয়ান, ডোম, মাতাল সহ অন্যান্য নিম্নবর্গের পেশার মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর গল্পে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছে। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বিদেশের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাঁর ছোটগল্প তৎকালীন সমাজের জীবন্ত দলিল। " বিশ শতকের প্রথম পাদে বঙ্গ-বিহার- উত্তর প্রদেশের ধনী-দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের সামাজিক জীবনের বাস্তবচিত্ত তিনি অঙ্কন করেছেন।"[১৯]

ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরেই তিনি বাস্তবসম্মত ভাবে চরিত্র নির্মাণ করেছেন। চরিত্র উপযোগী ভাষা ব্যবহারে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষের পেশার সঙ্গে ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেছেন। তাই একবিংশ শতাব্দীতেও প্রভাতকুমার সমান জনপ্রিয়।

উল্লেখপঞ্জি:

১। দাশ শিশিরকুমার: বাংলা ছোটগল্প, দেজ পাবলিশিং,কলকাতা-৭৩,ষষ্ঠ সংস্করণ- আগস্ট ২০১২,পৃষ্ঠা:১৫১।

২। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার: গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড),মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:,কলকাতা-৭৩,দ্বিতীয় মুদ্রণ- আষাঢ় ১৪২৫,পৃষ্ঠা:৩৮৪।

৩। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা:৩৮৫।

৪। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা:৩৮৯।

৫। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা:৩৯০।

৬। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ: বাংলা গল্প বিচিত্রা, প্রকাশ ভবন,কলকাতা-৭৩, সপ্তম মুদ্রণ- ভাদ্র,১৪২১, পৃষ্ঠা: ২৬।

৭। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার: গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড),মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:,কলকাতা-৭৩,দ্বিতীয় মুদ্রণ- আষাঢ় ১৪২৫,পৃষ্ঠা:৩৯২।

৮। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা: ৩৯২।

৯। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা: ৩৯৩।

১০। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা: ৬০০।

১১। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা: ৬০০।

১২। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা: ৬০০।

১৩। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা: ৬০৬।

১৪। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা: ৬০৭।

১৫। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার: গল্প সমগ্র (১ ম খণ্ড),মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:,কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- আষাঢ় ১৪২৫,পৃষ্ঠা:২০৮।

১৬। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা:২১০।

১৭। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা:২১০।

১৮। চৌধুরী শ্রীভূদেব: বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা:লি:,কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ-২০১৭-২০১৮, পৃষ্ঠা:১৫১।

১৯। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার: কালের পুত্তলিকা ,দেজ পাবলিশিং,কলকাতা-৭৩,চতুর্থ সংস্করণ- জুন ২০১৫,পৃষ্ঠা:১৩৮

....

সত্তর-আশির দশকের লেখক অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরার গল্পে নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

জয়া প্রধান
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

ইংরেজি 'সাবঅলটার্ন' (Subaltern) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল 'নিম্নবর্গ'। 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ইতালির মার্কসবাদী নেতা, দার্শনিক আন্তনিও গ্রামশির 'দ্য প্রিজন নোটবুক' গ্রন্থে। আভিধানিক অর্থে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। অধস্তন কর্মচারী বা অফিসারদের 'সাবঅলটার্ন' বলা হয়। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ সাধারণত 'অধস্তন' বা 'নিম্নস্থিত'। গ্রামশির এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' বা 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট বারোটি খন্ডে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশিত হয়েছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'- এর প্রথম তিনটি খন্ডে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে উপনিবেশবাদ ও বুর্জোয়ার আভিজাত্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার মূল দিকটি হল - ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজ শাসনকালে জাতীয়তাবাদ ও নবজাগরণের উন্মেষ। যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক দিয়ে বঞ্চিত হত তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সম্মিলিত প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হল নিম্নবর্গ তত্ত্ব। এছাড়াও পরবর্তীকালে সমাজের ব্রাত্য, প্রান্তিক, অন্ত্যজ, দরিদ্র জনগণ ব্যাপকভাবে নিম্নবর্গের মধ্যে পড়ে। এরা হীনমন্যতার কারণে সমাজের উচ্চবর্গের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ধীরে ধীরে এই নিম্নবর্গীয় মানুষরা সমাজে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর-আশির দশকে যেসমস্ত খ্যাতনামা লেখকরা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরা। এই দুই স্বনামধন্য লেখককে অন্ত্যজ জীবনের রূপকার বলা যেতে পারে। কেননা তাঁদের লেখায় আমরা শেকড়ের সন্ধান পাই। তাঁরা গ্রাম-প্রকৃতি-সমাজ-পরিবেশ থেকে গল্পের বিষয় নিয়েছেন। তাঁদের গল্পের চরিত্রগুলির জীবনসংগ্রাম লক্ষণীয়। তাঁরা সুবর্ণরেখা নদী, জঙ্গলমহলের ধারে কাছে যে সমস্ত মানুষ ও তাদের স্বরূপ দেখেছেন; সেই সমস্ত ব্রাত্য-অসহায়-দরিদ্র মানুষকেই হুবহু গল্পে এঁকেছেন। গ্রামজীবন ও নিম্নবর্গ মানুষদের কথা অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরার গল্পে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়

মূল শব্দ:

নিম্নবর্গ তত্ত্ব, অন্ত্যজ-দরিদ্র মানুষ, জীবন সংগ্রাম, গ্রাম্য পরিবেশ, বঞ্চনার শিকার, কুসংস্কার, শোষণ।

আলোচনা:

আশির দশক থেকে নিম্নবর্গদের নিয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সাহিত্যে লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রাচীন কাল থেকেই চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্যে ডোম্বি, শবর, ব্যাধ প্রভৃতি অন্ত্যজ মানুষদের নিয়ে কাহিনি রচনা করা হয়েছে। সময়ের গতি এগিয়ে আসার সাথে সাথে বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতেও সাহিত্যে আমরা নিম্নবর্গের পরিচয় পাই। নিম্নবর্গ বলতে ঔপনিবেশিক ভারতে যারা উচ্চবর্গের অন্তর্গত , সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরীব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষি, নীচু জাতির মানুষ প্রভৃতি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। আমরা এখন সত্তর আশির দশকের লেখক অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরার গল্পে নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন করে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করবো।-

অনিল ঘড়াইয়ের গল্পে নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: অনিল ঘড়াই ১৯৫৭ সালে ১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অন্তর্গত রুক্মিণীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনিল ঘড়াইয়ের লেখার মূল অবলম্বন গ্রামের প্রান্তিক মানুষজন। তিনি মূলত গ্রামের মানুষ বিশেষ করে অন্ত্যজ, নিম্নবিত্ত, দলিত, অস্পৃশ্য শ্রেণীর জীবনের চড়াই-উৎরাই, আসা-আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা প্রভৃতির কথা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। এই কারণে তাঁকে অন্ত্যজ জীবনের রূপকার বলা হয়ে থাকে। অধ্যাপক শ্রাবণী পাল অনিল ঘড়াই সম্বন্ধে বলেছেন -

"নিম্নবর্গের জীবনচর্চা তাঁর কাছে অনুশীলিত কোনো তত্ত্ব নয়, জন্মলব্ধ জীবনমথিত এক উপলব্ধি।"[1]

অনিল ঘড়াইয়ের **'চরণ'** গল্পটিতে দেখা যায়, চরণ এক হতদরিদ্র মানুষ। পেশায় চর্মকার। মৃত পশুদের দেহ সে ভাগাড়ে ফেলে দেয় এবং তাদের চামড়া ছাড়িয়ে মহাজনের কাছে বিক্রি করে। জাতিতে সে যেমন নিম্ন কাজেও তেমনি সে নিম্নবিত্ত। তার স্ত্রী যমুনা গর্ভবতী। এছাড়া তার আরো দুটি সন্তান রয়েছে। তারা কোনোদিন পেট ভরে ভাত খেতে পায় না। তাই যে সন্তান আসবে তাকে চরণ কি খাওয়াবে-এই চিন্তায় অসহায় চরণ যমুনাকে বলে 'পেট ধসিয়ে দিতে' অর্থাৎ বাচ্চা নষ্ট করতে। একজন মানুষ কতটা অভাবে-কষ্টে-বিপদে জর্জরিত হলে বাচ্চা নষ্ট করার কথা বলে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না। চরণের ঘরের চাল ভাঙা। সে চাল ছাইবে কি করে যেখানে পেটপুরে ভাতই খেতে পায় না। -

"চালটা ছাইবে কি দিয়ে? যার জমি নেই, তার তো খড়ও নেই। ঘর থাকলেও ঘরের মাথায় ছাদ নেই। শুখা পেটে ভাত নেই। ভাতের দেশে ভাতের বড় আকাল! ক'দিন আর আটা সিজা খেয়ে বাঁচা যায়? পেটের দায়ে সেই কালো কোকিল রেডিওটা বেচে দিয়েছে চরণ মাত্র ষাট টাকায়।"[2]

গল্পের ট্র্যাজেডি এখানেই থেমে থাকেনি। চরণের স্ত্রী যমুনার ওপরে কুনজর পড়ে মহাজন আতর আলির। চরণকে বাধ্য হয়ে ৫০ টাকার বিনিময়ে গর্ভবতী যমুনাকে দিয়ে দিতে হয় আতর আলিকে। গরীবরা যে চিরকালই শোষিত, বঞ্চিত তারই ছবি পাই আমরা এই গল্পে। এছাড়াও নীচুজাতির মানুষের গায়ের ছোঁয়া লাগলে উঁচুজাতির মানুষের যে পূজো লাগেনা-এই জাতিভেদাভেদের কথাও লেখক তুলে ধরেছেন এই গল্পে। **'কাঠবাদামের ফুল'** গল্পটিতে এক অসহায় দরিদ্র কৃষক পিতা বুদুরাম ও তার মেয়ে হাভাতির করুণ মর্মান্তিক পরিণামের ছবি পাওয়া যায়। বুদুরামের শুধুমাত্র মেয়ে হাভাতিকে নিয়েই সংসার। হাভাতির মা নেই। এদিকে দিন দিন হাভাতির বয়স বেড়ে প্রায় কুড়ির ঘরে পৌঁছে গেছে। হাভাতিকে নিয়ে তাই বুদুরামের ঘুম নেই। কেননা হাভাতির বিয়ে দিতে হবে। এদিকে বুদুরামের খাপরার ঘর। ঘরে ভাত নেই, সে মেয়ের বিয়ে দিবে কি করে? এই দুর্ভাবনায় তার মন খামচে ধরে।-

"ঘরে ভাত না থাকলে ঘরে মন বসানো যায়? দশ কাঠা জমিন বাঁজা মেয়ের মত। এ-বছরও বর্ষা ঝরেছিল,....হলে কী হবে। ফসল হয়নি, যা হয়েছে তা না হওয়ারই মত। দু' মাসও চলেনি। সেই আঘাত সামলাতে পারেনি বুদুরাম। বছরভর কি খাবে এই চিন্তায় আরো বুড়িয়ে গিয়েছে সে। একা হলে চেয়ে-চিন্তে, এ দোর সে - দোর করে চালিয়ে দিত। কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে কাল হয়েছে, কাল হয়েছে তার ফুলে ওঠা সুরভিত গতরটা।"[3]

হাভাতি প্রেমে পড়ে সেপাইবাবুর। সেপাইবাবু তাকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। সেপাইবাবু মা এর অসুস্থতার জন্য দেশে যায়। সে হাভাতিকে কথা দিয়ে যায়, ফিরে এসে বিয়ে করবে। কিন্তু হাভাতির বিয়ে হয়নি। সে ধর্ষিত হয়েছে এক পরদেশী ভেড়া চরানি যুবকের হাতে। সেপাইবাবু হাভাতিকে বলেছিল কাঠবাদামের ফুল তাদের প্রেমের প্রতীক। কিন্তু শীতে যখন সেপাইবাবু ফিরে আসে তখন সব ফুল ঝরে গেছে কাঠবাদামের। শুধুই কি কাঠবাদামের ফুল ঝরে গেছে? না। হাভাতির জীবনের স্বপ্ন, স্বাদ, বাঁচার অধিকার সব ঝরে গেছে। এই করুণ পরিণতি পাঠককে কষ্ট দেয়। **'উরাংগাড়া'** গল্পে দেখা যায়, কলকাতাবাসী স্নেহময়, সায়ন্তনী ও সুবর্ণরেখা নদীর পাশে জঙ্গলবেষ্টিত গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী মেয়ে বুদনীর কাহিনী। স্নেহময় ও সায়ন্তনী স্বামী-স্ত্রী। স্নেহময় চাকরিসূত্রে স্ত্রী সায়ন্তনীকে নিয়ে সুবর্ণরেখা নদীর পাশে মুরী স্টেশনের কাছে একটি কোয়ার্টারে থাকে। স্নেহময় স্ত্রীর রূপ, হাসি খুশি মুখ দেখে সবসময় সজীব থাকে। অন্যদিকে বুদনী জনমদুঃখী মা হারা এক আদিবাসী মেয়ে। তার দরিদ্র বাবা ভাকুয়া দু'বেলা পেটপুরে মেয়েকে খাওয়ার দিতে পারে না। তাই ভাকুয়া স্নেহময়ের কাছে আবেদন করে বুদনীকে কাজে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য। বুদনী স্নেহময়ের ফ্ল্যাটে কাজের মেয়ে হিসেবে ঢোকে। এইখানেই শুরু হয়ে যায় গণ্ডগোল। ধীরে ধীরে স্নেহময় আকৃষ্ট হয় বুদনীর প্রতি। উড়াংগাড়া হল সুবর্ণরেখার শাখানদী। তাই স্নেহময়ের মতে -

"সায়ন্তনী যদি সুবর্ণরেখা হয় বুদনী তাহলে উড়াংগাড়া নদী। দু'জনের স্রোত আছে, কিন্তু সে স্রোতের ফারাক বহু।.... উরাংগাড়া নদীর ঢেউ আড়বাঁশির সুরের চেয়েও মিহি, মিঠে।"[4]

স্নেহময়ের কারণে বুদনী অন্তঃসত্ত্বা হয়। বুদনীর অন্যত্র বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের সাত মাসের মধ্যেই বুদনীর ছেলে হওয়ার কারণে তার স্বামী আত্মহত্যা করে ও বুদনী স্বামীঘর থেকে বিতাড়িত হয়। গল্পে আমরা বুদনীর জীবনের ট্র্যাজেডি পাই। বুদনী তার সঠিক মূল্য পায়নি। সে বাসনার শিকার হয়েছে এবং সমাজে এক অবহেলিত মেয়ে হিসেবে রয়ে গেছে। **'চৌকিদার'** গল্পটিতে সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের

মানুষের কাছে নিম্নবর্গের মানুষ কিভাবে শোষিত, অত্যাচারিত তার ছবি পাই। এই গল্পে হলধরবাবু হলেন পঞ্চায়েত-প্রধান, অবস্থাশালী মানুষ। অন্যদিকে সনাতন চৌকিদার একজন সহজ-সরল-সৎ মানুষ যার কোনমতে দিন চলে যায়। বেণুবাবু আর একটি চরিত্র, যিনি খুব ভালো ও নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। নিঃসন্তান বেণুবাবু দেবতার নামে একটি ষাঁড় ছেড়েছিল। সেই ষাঁড়ের কারণে হলধরবাবুর মেয়ের পা ভেঙে গেলে হলধরবাবু ধমক দেয় সনাতন চৌকিদারকে ষাঁড়টিকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু সনাতন অবলা প্রাণটিকে একেবারে মেরে ফেলতে চান নি। এর ফলে শুরু হয়ে যায় সনাতন চৌকিদারের প্রতি মানসিক অত্যাচার।-

“ডেকে আনা হলো - সনাতন চৌকিদারকে। হলধরবাবু তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ষাঁড়ের মাথা চাই। নাহলে তোমার মাথা আমি ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে দেব।”[৫]

সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরা কিভাবে ভালো-সৎ-দরিদ্র নিম্নবর্গ মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় - তারই ছবি পাই আমরা এই গল্পে।

নলিনী বেরার গল্পে নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: নলিনী বেরা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তের কাছাকাছি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী জঙ্গলবেষ্টিত লোধা, সাঁওতাল, ভুঁইয়া অধ্যুষিত বাছুরখোঁয়াড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর গল্পে, উপন্যাসে আমরা সুবর্ণরেখা নদীর পাশে জঙ্গলবেষ্টিত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী অন্ত্যজ নিম্নবিত্ত মানুষদের কাহিনি আমরা বিশেষ করে পাই। তিনি স্বচক্ষে যা দেখেছেন তাই-ই তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি নিজেও বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে জল পান করা নিয়ে অস্পৃশ্যতার শিকার হয়েছেন। তাঁর গল্পগুলিতে সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের নিম্নবর্গের প্রতি অত্যাচার লক্ষ করা যায়। দেখতে পাই - ডাইনি সন্দেহের মত কুসংস্কার, দরিদ্রতা, অভাব প্রভৃতি। নলিনী বেরার গল্পগুলোতে তাঁর জন্মভূমির প্রতি অগাধ টান, ভালোবাসা লক্ষ করা যায়। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পের বিষয় নির্বাচনের মূলে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। নস্টালজিক অনুভূতিতে তিনি গল্পের বিষয়বস্তু নির্মাণ করেছেন। লেখকের জন্মস্থান ও সেই অঞ্চলের বিভিন্ন পেশা এবং নানাবিধ বর্ণের মানুষ - তাদের আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি,বিশ্বাস, প্রকৃতি, পরিবেশ, ভৌগোলিক নানা পরিচয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা তাঁর গল্পে প্রতিফলিত। ভাষা এবং আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারেও তিনি নিপুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। জীবিকার তাগিদে তিনি শহরমুখী হলেও আঞ্চলিক, গ্রামীণ নানা সত্তা তিনি তাঁর গল্পে বহাল রেখেছেন।

শ্রী নলিনী বেরার **‘ঝাঁটার কাঠি’** গল্পটিতে গ্রামের আদিবাসী মেয়ে সুনির জীবনে ঘটে যাওয়া চরম দুঃখ কষ্ট ও মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এই গল্পে নিম্নবর্গীয় মানুষদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কথা পাই আমরা। গল্পের অন্যতম চরিত্র সুনিকে ডাইনি সন্দেহে তার চোখে ঝাঁটার কাঠি ঢুকিয়ে তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। সুনি সাঁওতাল মেয়ে। এই সাঁওতাল পরিবারের লোকজনেরা বাবুদের বাড়ি কাজ করে যা উপার্জন করে তা দিয়েই কোনমতে তারা দিন চালায়। গল্পে বলা হয়েছে, সুনি বাবুদের বাড়ি কাজ করতে যায় আর তার রূপ দেখে বাবুদের বাড়ির ছেলে মুগ্ধ হয়ে থাকে। দিন গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাবুদের বাড়ির ছেলেটি চলে যায় শহরে চোখের ডাক্তারির পড়াশোনা করার জন্য। অন্যদিকে সুনি রয়ে যায় তার গ্রামে লোধা সাঁওতাল দের মাঝে। পরবর্তীকালে সুনিকে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ থেকে রাবণ টুডু নামে একজন আদিবাসী যুবক ‘সিঁদুর-বাপলা’ অর্থাৎ জোর করে মাথায় সিঁদুর ঘষে বিয়ে করে নিয়ে যায়। অবশ্য তাতে আপত্তির কিছু নেই। কেননা তাদের সমাজে এ ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু গল্পে গণ্ডগোল বাঁধে এইখানে যে, গ্রামের লোক রটিয়ে দেয় সুনি মানুষ নয়, ‘চিড়কিন ভূত’। অর্থাৎ সে ডাইনি। ডাইনি সন্দেহে তার চোখে ঝাঁটার কাঠি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলবশত সুনি চোখে দেখতে পায় না। পরে অবশ্য তাদের গ্রামের বাবুর ছেলেটি চিকিৎসা করে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনে। আমরা আধুনিক সময়ে বাস করলেও কিছু কিছু জায়গায় ডাইনি সন্দেহে আজও নারীদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। এই কুসংস্কারের কথাই প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পটিতে।

‘মাছরাঁকা’ গল্পটিতে গ্রামসমাজের সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন তথা উঁচুবর্গের মানুষরা দরিদ্র, গরীব, অসহায় অন্ত্যজ মানুষদের কতটা নিকৃষ্ট তথা নীচু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য চোখে দেখে তার পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। টাকা না থাকলে মানুষের কোনো মূল্য থাকে না, তারা টাকাওয়ালা মানুষের চোখে একপ্রকার ‘ছোটলোক’। এই গল্পে শশধর দঁড়পাট হল একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তার পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছে। আর গল্পকারের ভাষায় শশধর ‘মাছরাঁকা’ অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিমাণে মাছ লোভী। পুকুরের চারপাশে মাছধরা দেখা লোকজন মালিক শশধরের চোখে ছোটলোক।-

"শশধর দেখল পুকুরটার চাদ্দিকের পাড়ে লোকজন গিজগিজ করছে, বেশিরভাগ ন্যাঙটো কচিকুচোর দল। 'যতসব ছোটলোক!' নাক কুঁচকাল শশধর।"[6]

এই শশধর এতটাই নিষ্ঠুর, বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ যে, সে তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী ঊর্মিলাকে কোনো সাহায্য করে না। ঊর্মিলাকে শশধর মাছের ভাগ দেয়নি। ঊর্মিলার ছোট ছেলে পুকুরে মাছ ধরতে সাহায্য করলেও জ্যেঠু শশধর দঁড়পাট তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ঊর্মিলা মাছ চুরি করতে বাধ্য হয়। কেননা তার সংসারে অভাব অনটন। সে তার নিরন্ন দুটি ছেলেমেয়ের মুখে বহুদিন পর ভালো করে ভাত দিতে পারবে তাই মাছ চুরি করেছে। গল্পে শশধর তার তার ছেলেদেরকে শেখায় তার মতোই প্রভাবশালী হতে। সমাজে প্রায়ই দেখা যায় গরীব-বড়োলোক, উচু-নিচু - এর ভেদাভেদ; শোষণ-শাসন প্রভৃতি। এই ব্যবস্থাটিকেই লেখক তাঁর 'মাছরাঁকা' গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

'সুমন্তর বাড়ি' গল্পটিতে সুমন্ত তার স্ত্রী রুমা ও তাদের ছেলে সন্ময়কে নিয়ে চাকরিসূত্রে শহরে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে। সেই ভাড়া বাড়িতে সন্ময় বিকেলে তিনতলার ছাদে খেলার জন্যে ঘুড়ি ওড়াতে উঠলে তাকে কান ধরে সিঁড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেয়। এতে সন্ময়ের বাবা মা আঘাত পায় এবং রাগ করে, জেদ করে নিজেদের বাড়ি কোনমতে বানায়। সমাজে অর্থ, বর্ণ, জাতিকে কেন্দ্র করে ভেদাভেদ-বৈষম্যের চিত্র আমরা নলিনী বেরার বিভিন্ন গল্পে পাই। এই গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। গল্পে আমরা আর একটি কাহিনি পাই, সেটি হল নিম্নবিত্ত মানুষদের না খেয়ে থাকার যন্ত্রণা। এই ঘটনাটি গল্পে ফুটে উঠে তখন যখন সুমন্ত তার নতুন বাড়ির আসবাবপত্র বানানোর জন্য কাঠ নিতে গ্রামের বাড়িতে যায়। এখানে গল্পে নস্টালজিয়া প্রকাশিত হয়েছে সুমন্তের স্মৃতির দ্বারা। নলিনী বেরার বহু গল্পে নস্টালজিয়ার প্রভাব দেখা যায়। সুমন্তের স্মৃতিতে ভেসে আসে তার শৈশবের কষ্ট ও অনাহারের দিনগুলি। সুমন্ত আর বসন্ত দুইভাই তখন খুব ছোট। তাদের ঘরে হাঁড়িতে ভাত ফুটে না। তখন 'যাঁতাঘর' অর্থাৎ বড়ো কাঠের গুড়ির ওপর চাপ দিয়ে মহুয়া ফল থেকে একপ্রকার তেল বানানো হত। সেই যাঁতাঘর থেকে সারা গায়ে চুপচুপে তেল মেখে স্নান করে দুই ভাই বাড়িতে এসে একদিন মাকে ভাত দিতে বলে। কিন্তু তারা ভাত পায়নি। কেননা তাদের বাড়িতে ভাত রান্না হয়নি।-

"ছেলে দুটি বুঝল, আজ তাদের ঘরে হাঁড়ি চড়ে নি। ধুস্, তেল জোটে তো ভাত জোটে না! তারা আবার ফিরে গেল যাঁতাঘরে।"[7]

সুমন্ত তার নতুন বাড়িতে আসবাবপত্র বানানোর জন্য অনেক কাঠ আনার সাথে সাথে একটি বড় যাঁতাকাঠ-ও নিয়ে আসে। নতুন বাড়ির সাথে যে যাঁতাকাঠটি একেবারেই বেমানান তা নিয়ে সুমন্তর স্ত্রী পুত্রের সাথে সাথে অনেক আত্মীয় স্বজন সকলে মিলে সুমন্তকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। কিন্তু সুমন্ত তাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে না। শহরে থাকলেও গ্রামের প্রতি যে এক অসম্ভব অনিবার্য টান রয়ে যায় - তা আমরা শ্রী নলিনী বেরার বহু গল্পের চরিত্রে পাই। এই গল্পে সুমন্তর দ্বারা তা লক্ষণীয়। তাই বলা যায়, যাঁতাকাঠটিকে কেন্দ্র করে সুমন্তের স্মৃতিচারণা ও অভাবের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে লেখক নলিনী বেরা নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে যেমন প্রকাশ করেছেন তেমনই গ্রামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও টানকে বর্ণনা করেছেন।

আধুনিক সময়ের একজন উজ্জ্বল কথাসাহিত্যিক শ্রী নলিনী বেরার একটি বিখ্যাত গল্প হল **'বাবার স্মৃতি'**। এই গল্পটি আসলে তাঁর নিজের জীবনেরই গল্প। এই গল্পটি পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। গল্পে কথক তথা লেখকদের পরিবারের আর্থিক-অভাব, কষ্টের কথা নিদারুণ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে পাঠক ও লেখক সহানুভূতি মিশ্রণের দ্বারা এক-একাত্ম হয়ে যায়। এই গল্পে প্রথমে লেখক তথা কথকের বাবার মৃত্যু ও পরে মায়ের মৃত্যুর ঘটনা রয়েছে। গল্পে কথকের বাবা মায়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ, অশান্তি ঘটে থাকে আর্থিক অনটনের কারণে। এটি তো একটি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা টাকা-পয়সার অভাবে প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারে খিট-মিট, কলহ লেগেই থাকে। এরপর কথকের অনেক কষ্ট করে হোস্টেলে পড়াশোনা করার বর্ণনা পাই। হোস্টেল ফি এর জন্য তাঁকে ছাড় দেওয়া হয়। কেননা লেখক ছিলেন অসম্ভব ভালো, মেধাবী ছাত্র। ক্লাস নাইন-এ পড়ার সময়ে একদিন লেখক হোস্টেলে থাকাকালীন অবস্থায় খবর পায় যে তাঁর বাবার রক্ত-আমাশয় হয়েছে।-

"একদিন শুনলাম বাবার অসুখ করেছে, রক্ত-আমাশয়, কিছুতেই সারে না, শিবু কোবরেজও 'ফেল' মারছে।"[8]

আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়না যে, আর্থিক অনটনের কারণে চিকিৎসা করতে না পারার কারণেই লেখকের বাবার মৃত্যু ঘটে। কেননা বর্তমানে রক্ত-আমাশয় অসুখের কারণে মৃত্যু ব্যাপারটি স্বাভাবিক নয়। এরপর কথকের মায়ের দ্বারা একা সংসার সামলানো ও শেষে

মায়েরও মৃত্যু - এই ঘটনাগুলি পাঠককে বেদনায় ভারাক্রান্ত ও বিমর্ষ করে তোলে। তাই এখানে লেখক-পাঠক এক হয়ে মিশে যায় এবং গল্প শেষে লেখকের সাথে সাথে পাঠকও চোখের জলে ভেসে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরা সত্তর-আশির দশকের আকাশে ভাসমান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁরা যথার্থ বাস্তববাদী লেখক। কেননা তাঁরা সমাজে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের ভেদাভেদতো দেখেছেন-ই, কখনো কখনো নিজেরাও এই বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। আর এই বিষয়টিকেই তাঁরা তাঁদের গল্পে, উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। তাঁদের গল্পে আমরা শিকড়ের টান দেখতে পাই। মানুষ কতটা অসহায় দু'মুঠো অন্নের কারণে, কতটা অসহায় কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে, কতটা অসহায় ক্ষমতাবান লোকের কবলে - সেই অসহায়-অন্ত্যজ-নিম্নবর্গ মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি আমরা লেখকদের গল্পের পাতায় পাতায় পেয়ে থাকি যা আমাদের বাস্তবভূমি সম্পর্কে অবগত ও ঋদ্ধ হতে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র:

1.পাল, শ্রাবণী, 'সত্তর-উত্তর গ্রামসমাজ ও বাংলা ছোটগল্প', একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ: ১৫৮।

2.ঘড়াই, অনিল, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৪, জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, পৃ: ১৩৬।

3. ঐ, পৃ: ৫৬।

4. ঐ, পৃ: ৯৫।

5. ঐ, পৃ: ১৫।

6. বেরা, নলিনী, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ: ৬৭।

7. ঐ, পৃ: ৩০৭।

8. ঐ, পৃ: ৩৭৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

1.Guha, Ranjit, 'Subaltern Studies', Oxford University Press, 1982.

2.কর্মকার, লক্ষণ (সম্পাদনা), ' বিষয়: নলিনী বেরা', সৃজন, Vol. 27: Special Issue: November 2019, ISSN 2278-8689, দ্বিতীয় মুদ্রণ 2022 ।

....

নিম্নবর্গীয় নারীর অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই : অনিল ঘড়াইয়ের নুনবাড়ি

কনিকা সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ-

নিম্নবর্গের জীবন নির্ভর সাহিত্য রচনায় অনিল ঘড়াইয়ের 'নুনবাড়ি' উপন্যাসটি এক অসামান্য সৃষ্টি। উপন্যাসে নুনমারা সম্প্রদায়ের জীবনকথা উঠে এসেছে। উপন্যাসটি এই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের একটি অবহেলিত নিম্ন সমাজের মেয়ের ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি। অসহায়তা আর অপমান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এক সংগ্রামময় জীবন লবঙ্গর। লবঙ্গ সমাজ-সংস্কারের নিয়ম মেনে বিবাহের পর স্বামী কালাচাঁদকে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাতে চেয়েছিল। কালাচাঁদের কিছুদিন সংসার জীবনে মন থাকলেও পরবর্তী সময়ে অন্য মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। পাশাপাশি সংসার জীবনও শাশুড়ি, ননদের অত্যাচারে দুর্বিসহ ছিল। তাই লবঙ্গ না পেয়েছে স্বামীসুখ, না পেয়েছে সংসার সুখ। শেষপর্যন্ত স্বামী ও শাশুড়ির হাত থেকে রেহায় পেতে কোলের ছেলে নোনাইকে নিয়ে বাবা জটায়ুর কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। নোনাইকে আঁকড়ে ধরে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করে লবঙ্গ বেঁচে থাকতে চেয়েছে। এপ্রসঙ্গে লবঙ্গ, নুন তৈরীর কৌশল এবং নুনমারাদের মত নিম্নবর্গের মানুষের জীবন চিত্রের কথা উঠে এসেছে। উপন্যাসে লবঙ্গকে আশ্রয় করে নুনমারা সম্প্রদায়ের মানুষের বেঁচে থাকার কাহিনি, ও তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার এক অদম্য প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। তাদের কঠোর জীবন সংগ্রাম নুন ও নারীকে এক করে তুলেছে। লবঙ্গর জীবন না পাওয়াতে পরিপূর্ণ থাকলেও সে কখনোই নিজেকে আস্তাকুড়ে পড়ে থাকা নারী বলে ভাবতে পারেনি। নিজের আত্মসম্মানটুকু বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে নিজের প্রতিবাদী সত্তার উত্তরণ ঘটাতে সদা বদ্ধপরিকর থেকেছে। নিজের জীবনের না পাওয়াকে পূর্ণতা দিতে গিয়ে বলেছে নারীরাও যে সমাজে পুরুষের সমতুল্য। নুনবাড়ি উপন্যাসে লবঙ্গ সমাজের বুকে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে তা সর্বদা প্রশংসনীয়।

সূচকশব্দ : নুনমারা, পদস্খলন, ক্লেদাক্ত, জীবনদায়ী, ঘোগরা, শুকুইমোলা, চরদাগানো, ছুঁচনি।

সত্তর পরবর্তী বাংলা উপন্যাস জগতে অন্ত্যজজীবন নির্ভর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অনিল ঘড়াই এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর সাহিত্য রচনার মূল বিষয়ই ছিল নিম্নবর্গের জীবন ও সেই জীবনের উত্থান-পতনের আনুষঙ্গিক বিষয়। আসলে লেখকের জন্মভূমি ছিল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার রুক্মিনিপুর গ্রাম। এই গ্রামজীবনই তাঁকে পিছিয়েপড়া শ্রেণিকে নিয়ে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। লেখক নিজেও ছিলেন অসহায় দরিদ্র পরিবারের সন্তান। শত দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে পরিবারকে জীবন কাটাতে তিনি দেখেছেন। লেখক এর পিতামাতা দুজনেই ছিলেন কালিগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তাই আর্থিক দুর্বলতার পাশাপাশি সামাজিক অসম্মানও ছিল। জীবন তাঁকে কেবল বামমুখ দেখিয়েছে। সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে বেঁচে থাকা যে কতটা কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসগুলিতে সমাজের সেই না পাওয়া মানুষের কথাই বারবার উঠে এসেছে। লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানা হতাশার কথা তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় দেখা গেছে।

নুনবাড়ি উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে উঠে এসেছে পূর্ব মেদিনীপুরের নোনাখাল ও গঞ্জেরহাট সংলগ্ন অঞ্চল।
নুনবাড়ি থেকে 'নুন চলে যায় মাটি থেকে যায় এই প্রাচীন সত্যে বিশ্বাসী সে' - এখানে সে হল উপন্যাসের নায়িকা লবঙ্গ। উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে লবঙ্গ। নুনমারা সম্প্রদায়ের অবহেলিত, লাঞ্ছিত একটি মেয়ের জীবনে নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর কাহিনি হল উপন্যাসটি। সর্বদা অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সে। জল না পাওয়া গাছের মত ধীরে ধীরে স্বামীর অবহেলায় শুকিয়ে গেছে লবঙ্গ, কিন্তু তবুও সে হার শিকার করেনি। তার জীবনে না ছিল প্রেম, না ছিল ভালবাসা তবুও সে নিজেকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়ার নারী বলে ভাবতে পারিনি। কারণ তার প্রাণ আছে, মন আছে সে পড়ে থাকতে পারে না। তাই সে নিজের আত্মসম্মানটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেখানে তার অপমান হয় সেইস্থান পরিত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। লবঙ্গ তার স্বামী কালাচাঁদকে

নিয়ে সুখে সংসার করতে চেয়েছিল কিন্তু বিয়ের সময় কালাচাঁদকে তার বাবা সাইকেল দেবে বলেও সাত বছরেও তা দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে লবঙ্গ আর টিকতে পারেনি। পাশাপাশি আছে শাশুড়ি ননদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও অত্যাচার। সমস্ত কিছু সহ্য করে লবঙ্গ শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকলেও একসময় সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়। স্বামী কালাচাঁদ ও শাশুড়ির গোপন কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারে – "চাপা গলায় বলেছিল, ওরে শেষ করে দে-না হলে নোনাখালের ওধারে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে রেখে আয়। ওর কালোমুখ যেন আমায় আর দেখতে না হয়।"[১] শেষ পর্যন্ত লবঙ্গ বুকের সন্তান নোনাইকে নিয়ে শাক তুলতে যাওয়ার নাম করে বাবা জটায়ুর কাছে চলে আসে। যদিও লবঙ্গ ভেবেছিল কালাচাঁদ তাকে নিতে আসবে কিন্তু সে আর আসেনি। কারণ সে তখন গঞ্জের মেয়ের প্রেমে মত্ত। তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলেছে। স্বামী, শ্বশুরবাড়ির কাছে লবঙ্গর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। লবঙ্গরই বা তাদেরকে আজ কিসের প্রয়োজনে, প্রেমের বারি বর্ষণে যেমন মাটি থেকে নুন চলে যায় কেবলমাত্র পড়ে থাকে মাটি আর সেই মাটি দিয়েই গড়ে ওঠে মূর্তি, প্রতিমা - হয় শিল্প। কিন্তু তাতে তো আর প্রাণ থাকে না, যার প্রাণ আছে সে পড়ে থাকতে পারে না। তাই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে লবঙ্গ নিজের জীবনের ভার নিজেই গ্রহণ করে। সমাজে যারা মেয়েদের পরগাছা ভাবে, উইঢিবি ভাবে, নোনাখালের নরম ফেনার মত অসহায় ভাবে, মেয়েরা যে আদতেও তা নয় লবঙ্গ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

নুন যেন এক প্রকার নারী। প্রেমহীনতায় নারীর রূপ-যৌবন যেমন শুকিয়ে যায় তেমনি নুনবাড়িকে যত্ন না করলে তা থেকে নুন পাওয়ার আশাও ক্ষীন হয়ে যায়। নুন আর নারীর যুগলবন্দী চিত্রটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে – "নুনবাড়ি থেকে নুনজল পড়ছে টুপটাপ। পেতে রাখা মাটির কলসিতে সেই জল পড়ার মোহময় শব্দ। এই শব্দের সঙ্গে যেন তার বেঁচে থাকার শব্দের হুবহু মিল। ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে লবঙ্গর। ঘোলা চোখে সে দেখে কলসি ভরছে, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ফোঁটায় এক সময় কলসিটা কানায় কানায় ভরে যাবে। হয়তো উথলেও পড়বে। কিন্তু তার কী হবে? অশৌচ, কলসির মতো ফাঁকা এই দেহটা নিয়ে সে আর কত কাল একলা হাঁটবে?"[২] যথাযোগ্য মর্যাদা না পাওয়ায় লবঙ্গর কামনা-বাসনার ইচ্ছেগুলো দিন-রাত সর্বক্ষণ জেগে থাকে, যার ডাকে সাড়া দিতে কখনো তাকে দু'পা এগোতে হয় কখনো বা তাকে দু'পা পিছিয়ে আসতে হয়। যৌবন জ্বালায় সে যেন দগ্ধ ক্ষুধার্ত এক নারী। উপন্যাসের সেই চিত্র বারংবার ফুটে উঠেছে - "কণ্ঠিরাম তার কাছে এখন সিঁড়ি। কণ্ঠিরামই পারে তার মনের মেঘ তাড়িয়ে জীবনদায়ী তৃপ্তি সুধা ঢেলে দিতে তার ওই ফাটল ধরা বুকটায়। একটা অবলম্বন তার দরকার। অবলম্বনহীন জীবন এখন বড়ই দুর্বিষহ।"[৩] ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো কণ্ঠিরামকে আঁকড়ে ধরে লবঙ্গ বাকি জীবনটা বাঁচতে চেয়েছিল। লবঙ্গ সহায় সম্বলহীন হলেও আর কতদিন অপবাদ ও লোকনিন্দার কথা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। জীবনটা কোন বাঁধা পুকুরের মত নয়, তা নোনাখাল। সমাজ তাকে বিবাহ নামক বন্ধনে আবদ্ধ করে সারাজীবন বাঁধা পুকুরের ঢেউহীন জলের মত টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তার অর্ধমৃত, স্বামীর – খেদান মনটা তাকে সতী-সাবিত্রীর মত জীবনটাকে কাটাতে বলেছিল। কিন্তু যে সমাজ দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতে অপারক, সেই সমাজের এমন একপক্ষ নীতিজ্ঞান সে মানতে যাবে কেন? সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের কথা ভেবে কণ্ঠিরামের সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে লবঙ্গর মানসিক অবস্থা প্রথমে বৈশাখের জলাশয় এর মত শুকিয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই নিজের সুখী ও নিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে সমাজ কথিত স্বেচ্ছাচারী জীবন-যাপন করার জন্য দুবার ভাবেনি। লবঙ্গের বারবার মনে হয়েছে যেখানে একজন পুরুষ একাধিক নারীকে জীবনের সঙ্গী করতে পারে, সেখানে একজন নারী তা পারে না কেন? ঔপন্যাসিকও তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন পাঠকের কাছে যা উপন্যাসে স্পষ্ট – "পুরুষ দলিত সমাজে পুরুষের পদস্খলন, স্বৈরাচার, অসংযম, স্বেচ্ছাচার, বিধ্বংসী জীবনযাপন যদি নির্বিবাদে সকলে মেনে নেয় তাহলে একটা অসহায় আত্মসমস্যা জর্জরিত মেয়ের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন? এই সমাজে কেউ পিঠে এসেছে, কেউ পেটে এসেছে তেমন তো নয়! অধিকারের মাপকাঠি এক হওয়া আজ খুবই প্রয়োজন; নাহলে বৈষম্যের বিষে নীল হয়ে যাবে গাছের সবুজ পাতা, বাতাস হারিয়ে ফেলবে তার প্রাণদায়ী ক্ষমতা। পৃথিবীর জল-হাওয়া সব নষ্ট হয়ে যাবে।"[৪]

লবঙ্গ তার অতীতকে ভুলে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। অতীতের হতাশা, চোখের নেশা, মনের জ্বালা মুছে ফেলে বাকি দিনগুলো তাকে কাটাতে হবে। সে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চায়, সে তার স্বামী বা বাবা কারোরই বোঝা নয়। তার দুটো হাত-পা আছে, শরীরটাও কম নয়। সে কখনোই আর পুরুষের হাতের ময়লা হয়ে ধরা দেবে না। মাঝে মাঝে তার মানসিক অধঃপতন ঘটে, আর তারজন্য সে নিজেকেই দায়ী করে। সে ভাবে প্রেমহীনতায় জল না পাওয়া গাছের মত শুকিয়ে যায় তার রূপ-যৌবন। আস্তাকুঁড়ে

ফেলে দেওয়া নিস্প্রাণ ছবির মত সে নয়, শুধু এটুকু বোঝানোর জন্যই সে নিজেকে মোহময়ী করে রাখে। নাই বা পেল সে সময়মত খাবার, ভালোবাসা, তা বলে কি সে শেষ হয়ে যাবে? বউ হয়ে শাঁখা সিঁদুরের মর্যাদা না দিলে সে বউ বাঘিনী হয়ে যায়, তাই প্রাকৃতিক যৌবনকে দমিয়ে রাখা কত যে কঠিন লবঙ্গ তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছে। তাই কালাচাঁদ তাকে যে শাস্তি দিয়েছে তার দ্বিগুন শাস্তি সে তাকে ফিরিয়ে দিতে চায়। লবঙ্গ তার স্বামীর কাছে যথাযোগ্য মর্যাদা না পাওয়ায় তার কামনা বাসনার, ইচ্ছেগুলো দিনরাত সর্বক্ষণ জেগে থাকে। যার ডাকে সাড়া দিয়ে সে কখনো এগিয়ে আসে আবার কখনো পিছিয়ে যায়। পিছিয়ে গিয়ে আবার সে থমকে দাঁড়ায়। তবে কোন্ আকর্ষনে বা কোন্ মায়ায় সে থমকে দাঁড়ায় তা সে নিজেও জানে না। আর এই না জানা রহস্যের ভিতরে তার বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা, বৈচিত্রময় পদচারণা। লবঙ্গ তার অপূর্ণ কামনার পূর্ণতা পেতে কণ্ঠিরামকে আশ্রয় করে। তাই লবঙ্গের শরীরে বেড়ে ওঠা নবজীবনের খোঁজ পেলে কণ্ঠিরাম টাকা দিয়ে তার ব্যবস্থা করতে চাইলে লবঙ্গ ক্রুদ্ধ, দলিত, আহত, স্বপ্নভঙ্গ চোখে তাকিয়ে ফনাতোলা সাপিনীর মত উদ্ধত নিঃশ্বাসে বাতাস ভরিয়ে বলে, সে অবলা হতে চায় না। কণ্ঠিরাম যদি লবঙ্গকে অবলার ভেবে থাকে তাহলে সে বড় ভুল করবে। লবঙ্গ জানে সে কোন অন্যায় করে নি। অপবাদ লোকনিন্দার ভয়ে সে আর পালিয়ে বাঁচবে না। কারণ পালিয়ে বাঁচার মধ্যেই আর যাই থাকুক বীরত্ব-শান্তি-মহত্ব থাকে না। তাই কণ্ঠিরামকে নিয়ে সে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়।

জটায়ু লবঙ্গের বাবা। চায়ের দোকান চালিয়ে কোনরকমে বেঁচেছিল। জটায়ুর আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। কোনরকমে একটা পেট খেয়ে না খেয়ে কেটে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় কি উপায়ে তিনটি পেটের অন্ন সংস্থান করবে, সেটা একটা চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। তার একটা চায়ের দোকান ছিল সেটিও ঠিকঠাক চলে না। তাই লবঙ্গ ঘরে বসে না থেকে দু পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করে। লবঙ্গ তার বাবার বন্ধ হয়ে যাওয়া চায়ের দোকানটি খুলে যেমন করেই হোক সংসারের ফুটো নৌকাটা বয়ে নিয়ে যাবে, কোন কাজেই তার লজ্জা নেই। তবে খরার কারণে দোকানটি বেশিদিন চলল না। কারণ এই সময় মানুষ চায়ের থেকেও শরবত বেশি খায়, যদিও কেউ আসে তারাও সেই ধারের খদ্দের ফলে দোকানটি আর বেশিদিন টানা লবঙ্গর পক্ষে সম্ভব হয় না। এছাড়াও তার বাবার দোকানে ভিড় কম, কারণ তার বাবার দোকানের পাশের দোকানে সারাক্ষণ গান বাজে তা শোনার জন্য লোক সেখানে ভিড় করে। লবঙ্গ বুদ্ধিমতী মেয়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলে – “নোনাখালের কত যে ঢেউ – সব ঢেউ কি মাথা উঁচু করে গন্তব্যে পৌঁছায়? সে পারে নি। এর জন্য আপশোসে বুক ফাটিয়ে কি লাভ!”[৫] লবঙ্গ গোবর কুড়িয়ে ঘুটে বানিয়ে বিক্রি করতে চাইল। কিন্তু কেনার লোক পেল না। পোদ্দারদের ধানকুটা কলে ধান ঝাড়ার কাজ নেয়, কিন্তু পোদ্দারবুড়ো ছিল হাড়কৃপণ, লবঙ্গ চুরি করেছে এই অপবাদে চাল খোঁজার নাম করে তাকে প্রায় বিবস্ত্র করে দেয়। লবঙ্গ বাধ্য হয় সেকাজ ছেড়ে দিতে। এদিকে অসুস্থ হয়ে জটায়ু হাসপাতালে ভর্তি হলে লবঙ্গকে দেখে বলে – “স্বামী খেদান মেয়েমানসের এ সমাজে কোনো দাম নেই বিটি, সবাই তারে কুনজরে দেখে। কেউ তার মনের দুঃখটা বুঝতে চায় না।”[৬] বাধ্য হয়ে বাপের বাড়ির পূর্বপুরুষের জীবিকা নুন তৈরি করাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইল লবঙ্গ। আর এই নুন তৈরির বিভিন্ন কৌশল, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম-এর মধ্য দিয়ে লেখক নুনমারা সম্প্রদায়ের মত নিম্নবর্গের মানুষদের বেঁচে থাকার অদম্য প্রয়াস, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের কথাকে তুলে ধরেছেন। নুন তৈরি করার প্রথম কৌশল হল চর দাগানো, ছুঁচনি দিয়ে নুনমাটি তোলা, নুন তৈরির জন্য গর্ত তৈরি করে প্রথম গর্তে নুন মাটি দিয়ে দ্বিতীয় গর্তে প্রথম গর্তের তুলনায় দ্বিগুণ গর্ত করে কলসি বসিয়ে নুনজল ধরে নেওয়া। নুন জ্বাল দেওয়ার জন্য উনুন তৈরি করার, ঘোগার হাত থেকে নুনবাড়িকে বাঁচাতে হয় কারণ ঘোগাই নুনবাড়ির সবচেয়ে শত্রু। এইভাবে নুনজল ঘোলা হতে হতে নুনে পরিণত হয়। সেই নুন মালিকের ঘরে বিক্রি করে দুটো পয়সা পেলে তা দিয়ে অসহায় মানুষগুলি চাল, ডাল কিনে এনে পেট ভরায়। নুন মাটিকে দাগান দেবে বলে তাদের মধ্যে এক প্রকার রেষারেষি লেগে যায় “নুনমাটির দখল নিয়ে সকালবেলায় যেরকম জীবন-মরণ কাড়াকাড়ি লেগেছিল যা চোখে না দেখলে বোঝাই যায় না ! মানুষের এত অভাব অনটন কাছে না আসলে তা অনুভব করা যায় না।”[৭] এর মধ্যে দিয়ে নুনমারা সম্প্রদায়ের অভাব অনটনের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও সময়মতো দুটো পেটের ভাত তারা জোটাতে পারে না, জোটাতে পারলেও তরকারি থাকে না। যদি কোনদিন একটু আধটু তরকারি জোগাড় করতে পারে তা হল সজনের শাকভাজা, হ্যালেঞ্চার চচ্চরি, গেঁড়ি, গুগলি। এই খেয়েই কোনরকমে দিন কেটে যায়। এদের চাওয়া পাওয়াটাও খুবই সামান্য। যা আমরা নোনাই এর কথার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি তবে এই সামান্য জিনিসটা জোগাড় করতেও এরা হিমশিম খায় “মারে, শুকুই মোলা দে। আজ আমি শুকুই মোলা দিয়ে ভিজে ভাত খাব। মুখের কাছে ভাত উঠিয়ে আবার কী মনে করে ভাতটা নামিয়ে রাখে লবঙ্গ। বলে, শুখামাছ রোজ রোজ আমি কুথায় পাব?”[৮] অর্থাৎ বছরের বেশিরভাগ দিনই তাদের নুন আর জলভাতেই দিন কাটে।

নুনমারা সম্প্রদায়ের জীবন কথাকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এর আগে কোন উপন্যাস লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। এদের জীবনে নানান সামাজিক প্রতিকূলতা, দারিদ্র্যতা, হতাশা বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম আহারের অভাব থাকলেও কিছু কিছু সংস্কার একেবারেই যে নেই তা নয়। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ভিতকে মজবুত করতে এরাও বেশ কিছু সংস্কার মেনে চলে। লবঙ্গ নুনবাড়ি তৈরি করতে গিয়ে কিভাবে সে সংস্কারের পন্থাকে অনুসরণ করেছে - "বৃহস্পতিবার শুভ দিন। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে নেয়ে এসেছে লবঙ্গ। নুনবাড়িতে মাটি ঢালা হবে আজ। শুদ্ধ শরীরে এসব কাজ করলে নুনবাড়ির আয়ু বাড়ে। তাই নিজের দিক থেকে শুদ্ধ থাকার কোনো রকম ত্রুটি রাখেনি লবঙ্গ। ঘরে এসে সে একটা ধোয়া শাড়ি পরেছে।"[৯]

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র লবঙ্গ। সমাজ দ্বারা সে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অবহেলিত হলেও নিজের অক্ষমতাকে উপলব্ধি করে, সমাজের বুকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে সদা সচেষ্ট থেকেছে। সমাজের সে পিছিয়েপড়া শ্রেণি নুনমারা সম্প্রদায়ের সন্তান হয়েও সমস্ত লাঞ্ছনাক-গঞ্জনাকে পিছনে ফেলে কীভাবে নিজের প্রতিবাদী সত্তাকে সর্বদা জাগ্রত করে রাখা যায় তার নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। সমাজের ভয়ে ভীত না হয়ে সে নিজেকে ভালো রাখার জন্য নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে।

তথ্যসূত্র

১) ঘড়াই, অনিল, নুনবাড়ি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০১৬, পৃষ্ঠা, ১৩।
২) তদেব, পৃষ্ঠা, ৮৫।
৩) তদেব, পৃষ্ঠা, ১১৮।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা, ১২৮।
৫) তদেব, পৃষ্ঠা, ১৮।
৬) তদেব, পৃষ্ঠা, ২৩।
৭) তদেব, পৃষ্ঠা, ৬০।
৮) তদেব, পৃষ্ঠা, ৫৮।
৯) তদেব, পৃষ্ঠা, ৮১-৮২।

সহায়ক গ্রন্থ

ঘড়াই, অনিল, 'নুনবাড়ি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০১৬।
গুহ, রণজিৎ, 'রচনাসংগ্রহ ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতি' প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০২০।
ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা) , 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৮ম মুদ্রণ, ২০১৫।
মণ্ডল, দীনবন্ধু, 'সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন', আশাদীপ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০১৫।

……………………………………………

মনসামঙ্গল কাব্যে নিম্নবর্গের বিবর্তন

ড. কোহিনূর বেগম
সহকারী অধ্যাপিকা, গুসকরা মহাবিদ্যালয়, পূর্ব- বর্ধমান

সারসংক্ষেপ-

মঙ্গলকাব্যধারায় মনসামঙ্গল কাব্য লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি। দেবী মনসার দেবত্ব প্রতিষ্ঠা আর তার সঙ্গে সমাজ বিবর্তনের স্পষ্ট রূপরেখা এই কাব্যকে এক অন্য জায়গায় উত্তীর্ণ করেছে। পঞ্চদশ,সপ্তদশ, অষ্টাদশ - প্রায় তিন শতক ধরে লেখা এই কাব্যে বাঙালী সমাজের যে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কাব্য রচয়িতাগণ সমাজ অভিজ্ঞতার আলোকে তা তুলে ধরেছেন। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ বিভাজনে গঠিত হিন্দুসমাজের বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় পঞ্চদশ শতকে। এর আগে ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণ ও পরে ইসলাম ধর্মের প্রচার, প্রসার, ধর্মান্তরকরণের মধ্যে বাংলায় নবগঠিত মুসলমান জাতির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এরা প্রায় সবাই সবাই অবহেলিত, অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য বর্ণের প্রতিনিধিত্ব সমাজ থেকে সরে গিয়ে অর্থকৌলীন্যে প্রতিষ্ঠিত বণিক সমাজের হাতে চলে গেছে। যে ছত্রিশ বর্ণের কথা আমরা হিন্দুসমাজে দেখি তা যুগ বিবর্তনে অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহের মাধ্যমে ছত্রিশ পেরিয়ে একচল্লিশে পৌঁছেছে। পঞ্চদশ, সপ্তদশ, ও অষ্টাদশ শতকে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সময়ের পরিবর্তনে প্রতিটি শতকে রচিত একই মনসা কাহিনিতে যুগ-সময় সচেতন অচেতন দুইভাবেই উঠে এসেছে। পঞ্চদশ শতকে পূর্ববঙ্গীয় ধারায় নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত ‘ পদ্মাপুরাণ’ কাব্য লিখেছেন, একই সময়ে রাঢীয় ধারায় বিপ্রদাস পিপিলাই ‘মনসাপুরাণ’ কাব্য লিখছেন। ফলে এই সময়ে আমরা বিভিন্ন জায়গার সামাজিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের ছবি পেয়ে যাচ্ছি। আবার সপ্তদশ শতকে পূর্ববঙ্গীয় ধারায় কবি বংশীদাস যেমন লিখছেন তেমনি রাঢীয় ধারায় লিখছেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, উত্তরবঙ্গীয় ধারায় লিখছেন জগজ্জীবন ঘোষাল। অষ্টাদশ শতকে রাঢীয় ঐতিহ্যে বিষ্ণু পাল, উত্তরবঙ্গ ঐতিহ্যে জীবন মৈত্র মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। ফলে তিনশতক জুড়ে লেখা এই কাব্যে বাঙ্গালী সমাজের পরিবর্তনের ও বিবর্তনের ছবি কাহিনিসূত্রে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কাব্যকাহিনিতে নিম্নবর্ণ সমাজের প্রতিনিধি চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছে জেলে সম্প্রদায়ের দুই ভাই জালু-মালু। মালী সমাজের প্রতিনিধি ধনা-মনা, নিম্নবর্ণীয় মহিলা ছদ্মবেশী দেবী মনসা। জোলা মুসলমানও নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সমাজে এই নিম্নবর্গের মানসিকতার , সংস্কারের , আচার-আচরণের রদ-বদল ঘটেছে যুগ প্রেক্ষাপটে।

মূল শব্দ

মনসামঙ্গল, নিম্নবর্ণ, উচ্চবর্ণ, সমাজ, বিবর্তন, সংস্কার, ঐতিহ্য, মধ্যযুগ, মঙ্গলকাব্য।

মূল প্রবন্ধ

লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে আনুমানিক ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে যে বিশেষ ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য গড়ে উঠেছিল তা মঙ্গলকাব্য নামে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এই মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যটি সার্থক সাহিত্য হিসাবে উঠে এসেছে পঞ্চদশ শতকে। এরপর তার বিস্তৃতি ঘটেছে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। এই হিসাবে প্রায় প্রত্যেক শতকের বাস্তব সমাজ বিবর্তনের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই কাব্যের বিভিন্ন কবির লেখনিতে উঠে এসেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র –এই চারটি বর্ণবিভাগ আর্যসমাজ ব্যবস্থায় কঠোরভাবে রক্ষিত হলেও বিবর্তনের সময় বেয়ে শেষ পর্যন্ত তা টিকে থাকতে পারে নি। অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহের মাধ্যমে বাংলায় বর্ণবিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থকৌলীন্যে অনেক সম্প্রদায় সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু সমাজব্যবস্থায় খেটে খাওয়া শ্রমজীবি মানুষ চিরকাল অবহেলিত থেকেছে। মনসামঙ্গল কাব্যে নিম্নবর্ণের সামগ্রিক একটা রূপরেখা আমরা পর্যবেক্ষণ করি। কাহিনিকেন্দ্রিক আখ্যানকাব্য বলে এই কাব্যে নিম্নবর্ণের প্রতিনিধি চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছে জেলে সম্প্রদায়ের দুই ভাই

জালু-মালু, মালী সমাজের ধনা-মনা, নৌকার মাঝি সম্প্রদায়, রাখালশ্রেণী, ডুমুনিরূপী গৌরী ও বেহুলা, এবং নিম্নবর্ণ মহিলার রূপধারণে স্বয়ং দেবী মনসা। জোলাশ্রেণীর মুসলমানগণও এই নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে হিন্দুধর্মে ছত্রিশ বর্ণের উল্লেখ থাকলেও কোন কোনো কোনো ক্ষেত্রে একচল্লিশটি বর্ণবিভাগ দেখা যায়।উত্তরবঙ্গীয় ধারায় অষ্টাদশ শতকের কবি জীবন মৈত্রের 'মনসার ভাসান' এ একচল্লিশটি বর্ণ পাওয়া যায় – "তিলি তাঁতি সূত্রধর, শুঁড়ি ঘুড়ি মালাকার /কৈবর্ত কোত্তালি কাণহাড়ি।/বণিক নাপিত কুরি,চাই ধাই তাম নীহোরি/কোচ মেচ চণ্ডাল বাউর।।/ যোগী জোলা ভাট নট, গারো হজ ভাউ ভোট/ গোপ বারুই সেকার মোদকী।/কুমার কামার মেন, চামর ঢুলায় জেল/ নানাজাতি ঢুলিয়া বন্ধকী।।"[১] আবার সপ্তদশ শতকের রাঢ়ীয় ধারার কবি বিষ্ণু পাল মৎসপ্রিয় বাঙালির সঙ্গে ছত্রিশ ধরনের মাছের সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন –"কই কামার টেঙ্গরাত্ত রজপুত।।/ ......লোনা মাছগোলা তারা জাতে রে বারোই।/"[২] এইভাবে জিয়ল মাছ- ভাট, বাগি মাছ- নাপিত, গাঙ্গতড়া- কায়স্থ, গাগর মাছ- বদ্দি, মত্ত্যা মাছ- বণিক, কাতলা-ক্ষেত্রি, জাল মাছ- সাকারি, খয়রা মাছ-ময়রা, খালিবাউস-তাম্বুলি, কলিভারি- কুমার, গড়ইমাছ- চাষা, চেঙ্গ মাছ- আগুরি, খলিসা- দৈবকী, সোল মাছ- গোয়ালা, বোয়াল-তাঁতি, আড় মাছ- ছুতার, রুই মাছ- সউ, বাণকড়া- গড়াই, ছোয়া মাছ- পোদ্দার, ডাড়িকা- বাউরি, ফলইমাছ- কৈবর্ত, পেড়ামাছ- কেঅট, সালমাছ- পাঠান, চান্দকুড়া- ডোম, পুটি- বেশ্যা, গাছি- মুচি, পুইয়া মাছ- দরজি, সুসক- ফিরিঙ্গি, কেন্যা- তেলেঙ্গা, বিছুই- বাজিকর। একথা সত্য মাছের এই তুলনায় বেশিরভাগ বর্ণই নিম্ন বর্গের অন্তরভূক্ত। সামাজিক বিবর্তনের পথ বেয়ে আজও অনেক বর্ণ দেখা যায়।

পঞ্চদশ শতকে উদ্ভূত বণিকতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্ণশ্রেণী ছিল উচ্চবিত্তদের ভৃত্যস্বরূপ। কাব্যে বণিক সমাজের প্রতিনিধি ক্ষমতাশালী চাঁদ সদাগর জানিয়েছে – "জালু মালু দুই ভাই চাকর আমার"[৩] প্রতিদিন তারা বণিক গৃহে মাছ জোগানোর কাজে নিয়োজিত থেকেছে। কিন্তু কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিকটুকু তারা পায় নি। ছদ্মবেশী মনসার উক্তির আলোকে জালু-মালুর মতো শ্রমজীবি মানুষের বিপর্যয়গ্রস্ত অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত করেছেন কবি বিষ্ণুপাল – "বাছা হেন রাজার সেবা কর/মাগু পুষিতে নারো কেনে জোগায় মছের জোগান।/অন্ন বিপরীত দুখখ তাম্বুল বিপরীত মুখ/কলেবরে নাহি আচ্ছাদন।।/তোর কেনরে শূনের দড়ি/পরিধান ছেড়া ধড়ি/মাথা তোর ভেদ ভেআস্কার।/মনষ্য জনম হয়া ফের নানা দুখখ পায়া/জীবনেতে কি সুখ তোমার।।"[৪] –মনসার এই রূঢ় বাস্তব সত্য উক্তি নিম্নশ্রেণির চেতনা জাগরণের কাজ করেছে। সমাজে উচ্চবিত্তরা সুখে থাকলেও নিম্নবিত্তরা এক অসহনীয় অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করতো। পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে দেখিয়েছেন নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জালু-মালু মনসার ঘট পেয়েও ভয় পেয়েছে, যদিও মনসা আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছে – "এই ঘট নিয়া তুমি করহ পূজন।/চান্দের ধনে তোমার ধন হইবে সমান।।"[৫] - একথা শুনে তাদের খুশী হবার কথা কিন্তু শাসকশক্তির প্রতিনিধি চাঁদসদাগরের কথা ভেবে তারা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। পঞ্চদশ শতকের জালু-মালুরা প্রতাপশালী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মানসিকতা তখনও অর্জন করতে পারে নি।

সপ্তদশ শতকে নিম্নবর্গ জনসাধারণের আত্মিক জাগরণের ছবিটি কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। পিতৃশ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে 'শতভার মৎস' আনার জন্য চাঁদসদাগর জালুমালুকে আদেশ দিলে তারা জানিয়েছে - "ধীবরের তনয় বলে শুন সদাগর।/এতদিনে ছাড়িলাঙ তোমার নগর।।/একভাই করি তব কোটালি বিষয়।/পাকা খন্দে মাহিনা না দেহ মহাশয়।।/আর ভাই বটি তব সঙ্গের চাকর।/নিত্য নিয়া মৎস খাত্ত ডাগর ডাগর।।/তোমার আরতি হৈল মৎস শতভার।/নগরে থাকিতে তবে না পারিব আর।।"[৬] জালু-মালুর এই প্রতিবাদের ভাষা যুগ বিবর্তনেই এসে পড়েছে। ধর্মীয় সংস্কারে পান-সুপারি বা তুলসীপত্র হাতে ধরিয়ে ধনী বা অভিজাতশ্রেণি নিম্নবর্গের মানুষদের যেকোনো কাজে ব্যবহার করতো। তাই কাহিনিগত দিক দিয়ে পঞ্চদশ শতকের জালু-মালুর চেয়ে সপ্তদশ শতকের জালু-মালু অনেক প্রতিবাদী। প্রায় এক শতকের মধ্যে নিম্নবর্গের মানসিকতার জাগরণের যে বিবর্তন ঘটেছে তা সহজেই অনুমেয়।

বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণ ডোমজাতির অবস্থান অনেক নীচের দিকে ছিল। এরা ছিল অস্পৃশ্য –অন্ত্যজ। মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতাগণ উচ্চসমাজের বেহুলা ও দেবী মনসাকে ডোমনারীর ছদ্মবেশ পরিয়েছেন। এক্ষেত্রে মনে হয় ধর্মীয় সাম্যের চেতনা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। কবি বিজয়গুপ্তের কাব্য কাহিনিতে দেখা যায় বেহুলা ডোমনারীর ছদ্মবেশে চাঁদসদাগরের গৃহে প্রবেশ করেছে। চাঁদপত্নী সনকা ডোম নারীবেশী বেহুলাকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু ধর্মীয় বা সামাজিক নিয়মকে সে অস্বীকার করতে পারে নি। বেহুলাকে অস্পৃশ্য জাতির মতোই অন্নভক্ষণ করতে দিয়েছে – "আনিয়া মানের পাত বাড়ি দিল পান্তাভাত"[৭] তবে এই সামাজিক অবস্থান

নিম্নবর্ণ শ্রেণি শজেই মেনে নিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের বেহুলাও জানিয়েছে – "ডোমনী বলিল মোরা হই নীচ জাতি।/ তোমার সাক্ষাত অন্ন খাইব কেমতি।।"[৮] তবে একথা সত্য চৈতন্যদেবের ধর্মীয় ঐক্যবোধের প্রভাবে বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার ছবিও পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকের কবি ক্ষেমানন্দের সৃষ্ট বেহুলা অনায়াসেই তাঁর পরিচয়ে জানিয়েছে – "বেহুলা ডোমনী আমি সায়ডোম পিতা।/চাঁদ ডোম শ্বশুরা লখাই ডোম পতি।/ অতি কুলহীন মোরা হই ডোমজাতি।।"[৯] এক্ষেত্রে নিম্নবর্গ ক্রমশ যুগ প্রেক্ষাপটে তাদের মর্যাদার জায়গায় বিবর্তিত হচ্ছিল। নিম্নবর্গের নারীরা সমাজের সর্বত্র অবাধ গতিতে যাতায়াত করতে পারতো। এজন্য দেবী মনসা কখনো গোয়ালিনী, কখনো নটীবেশ ধারণ করে নিজের কার্যসিদ্ধি সহজেই করতে পেরেছে। চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ, ধন্বন্তরি বধ ঘটনাগুলি সে সময়ের রাজনৈতিক পালাবদলের দিকটিকেই ইঙ্গিত দেয়।

অন্যদিকে মালীপুত্র ধনা-মনা প্রতাপশালী ওঝা ধন্বন্তরীর শিষ্য। মনসার ষড়যন্ত্রে ধন্বন্তরী মারা গেলে চাঁদের চন্দন বৃক্ষ জীবন্ত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে –"জিয়াইব চন্দন বৃক্ষ আঁখির নিমেষে।/নৃপতি গৌরব অতি করিব বিশেষে।।"[১০] সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও অর্থ উপার্জনের লোভ নিম্নবর্গের মানুষের নৈতিক অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে ধনা-মনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা বা খেয়া পারাপারের কাজে ডোমনারীরা নিয়োজিত থাকতো। লোকজনকে আকর্ষিত করার জন্য এরা যত্ন সহকারে প্রসাধনে সুসজ্জিত হয়ে অর্থ উপার্জনের পথটিকে সুগম করে তুলতো। লোকমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এরা গানো গাইতো – "পঞ্চম স্বরে ডোমনারী মধুর গীতি গায়ে।"[১১] খেয়াপারাপার ছাড়াও তাদের অন্য একটি বৃত্তি ছিল বেত,বাঁশের তৈরী বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করা। ঘরে ঘরে গিয়ে এরা পাখা বা 'বিচনি' বিক্রি করতো। আজকের সমাজেও এই বৃত্তি সমানভাবে লক্ষ্যনীয়। পাখার উপর নানাধরনের কারুকার্য তাদের শিল্পীমানসিকতার বিষয়টিকে উন্মোচিত করেছে। সামাজিক দিক দিয়ে নিম্নবর্গের এই উত্তরণ পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে অষ্টাদশ শতক তথা আধুনিকযুগ পর্যন্ত বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের প্রেক্ষাপটে বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সামাজিক রদবদলও দেখা যায়। ইসলাম ধর্মের প্রচার,প্রসার ও ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার দ্বারা বাংলায় নতুন মুসলমান জাতির উদ্ভব ঘটেছে যারা বেশীরভাগই হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গ থেকে আগত। পঞ্চদশ শতকের রাঢ়ীয় ধারার কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাপুরাণ' কাব্যে লিখেছেন – "হিন্দুত কলিমা দিল, মুসলমানি শিখাইল/ তথা বৈসে জত মুসলমান।/ শিখাএ নামাজ অজু, সদাই মক্তবে রুজু/নিরন্তর খলিফা জোগান।।/ নিকা-বিভা ঘনে ঘন, তথা করে সরবজন/ সদা খোসালিত অতিশয়।"[১২] একথা সত্য, যে সাম্যের আশায় হিন্দু অন্ত্যজ শ্রেণি আশ্রয়লাভ করেছিল ইসলাম ধর্মের ছত্র ছায়ায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে তাদের কোনো উন্নতিই ঘটে নি। রাজশক্তি এব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসিন ছিল। ফলে গতানুগতিক জীবনযাত্রা ও পূর্বের বৃত্তিকে অবলম্বন করে তারা সমাজে বেঁচে রইল। হিন্দু তাঁতি ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান জোলা হয়ে গেল, হাড়ি,ডোম, বাগদী, চাড়াল, ব্যাধ নামান্তরে হল জেলে, নিকেরি, কাহার, কশাই, মুলুঙ্গী, রংরেজ, মুজারি, কাগজি,মণ্ডল, বিশ্বাস, সর্দার প্রভৃতি। এইসব শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য, অশিক্ষা কোনোদিনই ঘোচে নি। শতকের পর শতকে ক্ষোভ দ্বন্দ্ব চলতে থাকলেও হিন্দু-মুসলমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সময় সমন্বয়, সহাবস্থান দেখা যায়। সপ্তদশ শতকের মুসলমান সমাজে পটিদার শ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায়। এরা কাহিনিমূলক পট অঙ্কন করে মুখে ছড়া কেটে কাহিনিটিকে ব্যাখ্যা করতো।ঘরে ঘরে গিয়ে এইভাবে তারা ধান, চাল, সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ লিখেছেন – "পটিদার পট লিখে আর লিখে পটি।/ঘরে ঘরে বুলে সব পাড়াইয়া কাঠি।।/ প্রমাণ জুখিয়া দেই ধান মাষা তোলা।/পটিদার সানা বান্ধে কিনে যুগী জোলা।।/পট লয়া মাগে কড়ি নাই ভূমিভাগ।"[১৩] কাপড় রঙ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করতো তারা রংরেজ মুসলমান নামে পরিচিত ছিল। কাগজ প্রস্তুতকারী মুসলমান কাগজী, তাঁতি মুসলমান জোলা নামে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছিল। এইভাবে বৃত্তিভেদে অনেক নিম্নবর্গের মুসলমানের উদ্ভব ও বিবর্তনের ছবি মনসামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়।

নিম্নবর্ণশ্রেণীর দ্বারা পূজিত দেবী মনসাও সমাজে স্বীকৃতি পান নি, অনেক লড়াই , ছলনা, প্রতিহিংসার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে দেবত্বে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। নিজের অধিকার কিভাবে আদায় করে নিতে হয় তা দেবী মনসা নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। অনেক অপমান, লাঞ্ছনা,গঞ্জনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, একটি চোখও সে হারিয়েছে, তবুও কন্যার অধিকার, সম্মানের অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে মনসাও ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে মানবিক রূপ লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র

১) ভট্টাচার্য আশুতোষ সম্পাদিত বাইশা কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা -২৫০

২) এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পাদিত বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮, পৃষ্ঠা নং- ৫৩

৩) কয়াল অক্ষয়কুমার ও দেব চিত্রা সম্পাদিত মনসামঙ্গল- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, লেখাপড়া,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা নং- ১৩৬

৪) এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পাদিত বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা নং- ৫১

৫) দাসগুপ্ত প্যারীমোহন ও দাসগুপ্ত শ্রীজয়ন্তকুমার সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, বরিশাল প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা নং- ১৮৯

৬) কয়াল অক্ষয়কুমার ও দেব চিত্রা সম্পাদিত মনসামঙ্গল-কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, পৃষ্ঠা- ১৩৭

৭) দাসগুপ্ত প্যারীমোহন ও শ্রীজয়ন্তকুমার সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা -৫২৫

৮) ভট্টাচার্য আশুতোষ সম্পাদিত বাইশা কবি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২, পৃষ্ঠা ২৫০

৯) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ – মনসামঙ্গল পৃষ্ঠা- ২৮৬

১০) সেন সুকুমার সম্পাদিত মনসাবিজয়- কবি বিপ্রদাস পিপিলাই, পৃষ্ঠা- ১১৬-১১৭

১১) বিজয়গুপ্ত- পদ্মাপুরাণ- পৃষ্ঠা- ৩১

১২) বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসাবিজয়-পৃষ্ঠা- ৬৭

১৩) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ –মনসামঙ্গল পৃষ্ঠা-১২৫

সহায়ক গ্রন্থ

১) ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,এ মুখারজী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২, বঙ্কিম চ্যাটারজী স্ট্রীট(কলেজ স্কোয়ার),কলকাতা-৭, অষ্টম সংস্করণ, বইমেলা ১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ২০০০।

২) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯,

৩) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম সং -১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ -২০২১

৪) দাসগুপ্ত প্যারীমোহন ও দাসগুপ্ত শ্রীজয়ন্তকুমার সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, বরিশাল, প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।

৫) সেন সুকুমার সম্পাদিত, মনসাবিজয়-কবি বিপ্রদাস পিপিলাই,এশিয়াটিক সোসাইটি,প্রথম সংস্করণ ১৯৫৩ খ্রীঃ।

৬) সোসাইটি এশিয়াটিক সম্পাদিত বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮ খ্রীঃ।

৭) কয়াল অক্ষয়কুমার ও দেব চিত্রা, সম্পাদিত মনসামঙ্গল-কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, লেখাপড়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সংস্করণ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

৮) বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ খ্রীঃ।

৯) মুখোপাধ্যায় শ্রীসুখময়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, প্রথম প্রকাশ ১৯74খ্রীঃ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৩ খ্রীঃ।

১০) শরীফ আহমদ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ন্যা উদ্যোগ,২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা -৬, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ২০1৪ খ্রীঃ।

১১) ভট্টাচার্য আশুতোষ সম্পাদিত বাইশা কবি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ খ্রীঃ।

....

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প : নিম্নবর্গের নিখুঁত চিত্রায়ণ

মানস রঞ্জন বণিক
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

ইতালি 'সুবলতের্নো' বা ইংরেজি ভাষার 'সাবলটার্ন' শব্দটি থেকে বাংলা প্রতিশব্দ 'নিম্নবর্গ' কথাটি এসেছে। বাংলা সাহিত্যের একেবারে সূচনায় নিম্নবর্গের জীবন ও সংগ্রামের কথা সেভাবে না এলেও ধীরে ধীরে তা জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ধারায় নানা সাহিত্যিকের লেখায় নিম্নবর্গ মানুষের জীবনযাত্রা, সংগ্রামের কথা এসেছে। হুমায়ূন আহমেদ তাদের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী ছোটগল্পকার। নিজের দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তার ছোটগল্পগুলিতে হুমায়ূন আহমেদে মূলত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের কাহিনীই তুলে ধরেছেন বেশি, কিন্তু তার যে কয়েকটি ছোটগল্পে নিম্নবর্গের কাহিনীর চিত্রায়ণ রয়েছে, তা নিখুঁত এবং বিস্ময়কর। নগরজীবনের মধ্যে থেকেও তিনি ভোলেন না নিম্নবর্গের কথা বলার মুনশিয়ানা। হুমায়ূন নিম্নবর্গ শ্রেণীর জীবনকেও নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। নিম্নবর্গের সংগ্রাম নিয়ে লেখা হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পগুলি আসলে নিম্নবর্গের জীবনযাত্রার সার্থক ক্যানভাস। হুমায়ূন আহমেদের গল্প কখনোই নিম্নবর্গের একরৈখিক জীবনকে তুলে ধরেনি, কারণ তার গল্পে যেমন নিম্নবর্গের পরাজয়ের গল্প আছে, তেমনি তার ভালোবাসার, তার আনন্দের কাহিনীও রয়েছে।

মূল শব্দ :

নিম্নবর্গ, বাংলা সাহিত্য, হুমায়ূন আহমেদ, ছোটগল্প, চরিত্র, শ্রেণী, জীবনযাত্রা, সংগ্রাম, চিত্রায়ণ

মূলপ্রবন্ধ :

ইংরেজি ভাষায় 'সাবলটার্ন' বা 'সাবর্ডিনেট' শব্দটির অর্থ হলো অধস্তন। শব্দটি মূলত সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, অধস্তন অফিসারদের বোঝানোর জন্য। সাবলটার্ন (ইতালিতে সুবলতের্নো) শব্দটির বহুল ব্যবহৃত করেছিলেন ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি। গ্রামশি তার বিখ্যাত ' কারাগারের নোটবই' তে সাবলটার্ন শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় রণজিৎ গুহই প্রথম সাবলটার্ন এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে নিম্নবর্গ শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের একদম সূচনায় নিম্নবর্গের কথা তেমনভাবে ঠাঁই পায়নি, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের জীবনযাপন, সংগ্রাম ও সামাজিক অবস্থান বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। বিশেষ করে ১৯৬০ বা ১৯৭০ এর দশকে নিম্নবর্গের মানুষের কণ্ঠস্বর বাংলা সাহিত্যে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত ধরে যে দিকটা স্পষ্ট হল, সেই ধারাই আরও প্রবলভাবে ফুটে উঠল মহাশ্বেতা দেবীর হাত ধরে। নিম্নবর্গের জীবনকে নিয়ে সাহিত্যে এলো গভীর বিশ্লেষণ ও সমাজের প্রতিফলন। পাশাপাশি এলো গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, শোষণ, ও সামাজিক বৈষম্যের ছবি। আরও পরবর্তী সময় অনেক সাহিত্যিকদের লেখাতেই নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে। তাদের সূচীর মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ এক ব্যতিক্রমী কথাকার।

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী লেখক। ১৯৭৩ সালে তার প্রথম উপন্যাস ' নন্দিত নরকে ' এর মাধ্যমে তিনি সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। এই উপন্যাসে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অসামান্য কাহিনী এবং হুমায়ূনের লিখনশৈলী অচিরেই পাঠকের মন জয় করে নেয় এবং পরবর্তী দশকগুলোতে একের পর এক গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং সিনেমার চিত্রনাট্য লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যের শীর্ষস্থানে উঠে আসেন। হুমায়ূন আহমেদ যে ধরনের লেখা লিখেছেন তাতে তার লেখা মূলত মানুষের মনোজগৎ, সম্পর্ক, দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক বিভিন্ন স্তরের কথা বলে। হুমায়ূনের লেখায় সাধারণ মানুষের সুখ - দুঃখ, আশা - নিরাশা ও মানবীয় সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকগুলোই বেশি প্রতিফলিত হয়।

একথা স্বীকার্য যে হুমায়ূন আহমেদের গল্প ও উপন্যাসে মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাহিনীই দেখা গিয়েছে বেশি। হুমায়ূন নিজেও মূলত শহুরে গল্পকার হিসেবেই পাঠকমহলে পরিচিত হয়েছেন বেশি। কেননা তার সাহিত্যের বেশিরভাগ গল্পই আবর্তিত হয়েছে মূলত শহুরে

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত চরিত্রের সংকটকে ঘিরে। যেকোনো সাহিত্যিক এর ক্ষেত্রেই যেটা হয়, সেই সাহিত্যিক নিজের জীবনে যে শ্রেণীর মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করেন বেশি করে, তাদের জীবনযাত্রাই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার ভেতরে সঞ্চারিত হয়, এবং সেটাই মূলত তার লেখায় অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। হুমায়ূন নিজের জীবনেও শহরের জীবনযাত্রা দেখেছেন বেশি, মূলত ঢাকা শহরের, ফলে তার লেখাতেও অনিবার্যভাবে শহুরে জীবনযাপন এর কথা এসেছে বেশি। কিন্তু তাই বলে একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে হুমায়ূন এর লেখায় নিম্নবর্গ শ্রেণীর কথা আসেনি। বরং আশ্চর্য হলেও এটা সত্যি যে হুমায়ূন এর অনেক লেখায় নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিচ্ছবি এতো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, নিম্নবর্গের মানুষের চরিত্র আঁকতে গিয়ে হুমায়ূন এতো সহজ, সরল অথচ গভীর অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, নিম্নবর্গের মানুষের সংগ্রাম, দুঃখ ও বঞ্চনার গল্প এতো বাস্তবতার সঙ্গে তার লেখায় রয়েছে, যে বোঝা যায়, হুমায়ূন আসলে নিম্নবর্গ শ্রেণীর জীবনকেও কতখানি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই আমি গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে হুমায়ূন এর লেখা কয়েকটি লাইন ছিল এরকম, 'যিনি নিজে চোখ বন্ধ করে থাকেন, কিন্তু আশেপাশের সবাইকে বাধ্য করেন চোখ খোলা রাখতে।' আসলে এই লাইনগুলো হুমায়ূন এর নিজের জীবনের বেলাতেও সত্যি। নগরজীবনের মধ্যে থেকেও তাই তিনি ভোলেন না নিম্নবর্গের কথা বলার মুনশিয়ানা।

নিম্নবর্গের জীবন নিয়ে হুমায়ূনের সবথেকে উল্লেখযোগ্য গল্পটি যে 'বান' তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিম্নবর্গের মানুষের রূঢ় জীবনের এক ভয়াবহ বাস্তবতার ছাপ রয়েছে এই গল্পে। গল্পের মুখ্য চরিত্র রহমান। গল্পের শুরু হয় রহমানের স্ত্রী বাতাসীর ভয়ার্ত গলার চিৎকার দিয়ে। নদীতে বন্যা হওয়ায় তাদের ঘরে জল ঢুকছে বলে বাতাসী দেখতে পায়, ফলে সে আতঙ্কে চেঁচিয়ে রহমানকে জাগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু গল্প এগোলে বোঝা যায় রহমান অনেক আগেই ঘুম থেকে জেগেছে, ঘরে জল ঢুকছে সে জানে। বাতাসী কাঁদতে শুরু করলে সে ধমক দেয়, ঘরে আলো জ্বালতে বলে। বাতাসী রহমানের ছোট বোন পুতির ঘুম ভাঙাতে বললে রহমান ফের ধমক দিয়ে চেঁচাতে বারণ করে। রহমান বাইরে এসে দেখতে পায় আশেপাশের ঘরবাড়িগুলোর লোক জেগে উঠেছে। আলো বারবার নিভে গেলে রহমান গাল দেয় বাতাসীকে। গোয়াল ঘরে ঢুকে রহমান গরুগুলোকে দড়ি খুলে ছেড়ে দেয়। এর মধ্যেই পুতি ও রহমানের মা জেগে ওঠে। রহমানের মা কানে শুনতে পায় না ফলে দুর্যোগের ভয়াবহতা বুঝতে না পেরে সে রহমানকে পুতির ব্যাপারে অভিযোগ করতে ব্যস্ত থাকে, সে বলে পুতি তাকে গাল দেয়, ঠেলা দেয়। রহমান এই সবকিছুতে খুব বিরক্ত হয়, রাগের বশে সে তার ঘুমন্ত পুত্র কাদের আলীকে চড় মেরে তার ঘুম ভাঙায়। আসন্ন দুর্যোগের দুশ্চিন্তায় রহমান তামাক টানে, ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে পায় কলা গাছের ভেলা করে হাসু চাচা এসেছেন। নিম্নবর্গের মানুষ হয়েও এই দুর্যোগের মধ্যেও সে নিজের ভদ্রতাবোধ ভুলে যায় না, সে হাসু চাচাকে জিজ্ঞেস করে তামাক খাবেন কিনা সেকথা। ঘরের ভেতরে জল যখন আরও বাড়তে থাকে, পুতির চোখে সেটা দেখে জল এলে রহমান তাকে সান্তনা দেয়, ডর লাগনের কিছু নাই। কাম কর। কোমর ছাপিয়ে জল আসার আগেই রহমান সবাইকে নিয়ে চালে উঠে পড়ে। বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ে। সবাই আক্ষেপ করতে শুরু করলে রহমান তাও দৃঢ়ভাবে বলে, 'প্যান প্যান করবা না'। রাত হয়ে গেলেও বৃষ্টি আর থামে না, জল আরও ফুলেফেঁপে ওঠে, স্রোতের প্রবল টানে রহমানের পুরোনো চালাঘর কেঁপে কেঁপে ওঠে। গল্পের একেবারে শেষে আমরা দেখতে পাই গোটা গল্পে যে রহমানকে দেখে খুব দৃঢ় এবং নির্বিকার মনে হচ্ছিল, রহমানের বোন পুতি শুনতে পায় তার ছাব্বিশ বছরের সেই দাদা ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে। পুতির ইচ্ছে হয় তার দাদার পাশে গিয়ে বসার, কিন্তু তার সাহস হয় না। বন্যার জলে নিম্নবর্গের মানুষের অসহায়তার ছবি ফুটে উঠেছে এই গল্পে। প্রকৃতির সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের লড়াই, তার সংগ্রামের কথাও এই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন হুমায়ূন।

এই ধারাতেই হুমায়ূন আহমেদের আরেকটি গল্প 'জুয়া'। গল্পের মুখ্য চরিত্র প্রণববাবু। তিনি শিক্ষক হলেও স্কুলে তিনমাসের বেতন পাননি। সরকার থেকে বেতন না দেওয়ায় স্কুলের শিক্ষকদের সবারই খুব খারাপ অবস্থা। কিন্তু সবথেকে করুণ অবস্থা প্রণববাবুর। আর্থিক দিক থেকে তার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে পড়ে যে সহকর্মীর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার চাইতে হয়েছিল। যদিও সে টাকাও তিনি পাননি। বাজারেও তার সামান্য ধার তিনি মেটাতে পারেন না। তিনি যখন বাজারের রাস্তা দিয়ে যান তখন করিম মিয়া তাকে বারেবারে তার দুশো এগারো টাকা ধার মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তাগাদা দেয়। করিম মিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করে যে নিবারণ সাহা বলে তার আরও একজন খদ্দের যেভাবে চারশ টাকা পাওনা না মিটিয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছে তিনিও সেরকম হয়তো চলে যেতে পারেন। প্রণববাবু তাকে আশ্বস্ত করেন, ভারতে তার কেউ থাকে না, তাই তিনি ভারতে পালিয়ে যাবেন না। গল্পের শুরুতে আমরা দেখতে পাই স্কুলে থার্ড পিরিয়ডে কোনো ক্লাস না থাকায় প্রণববাবু কমনরুমে এসে স্কুলে আসা একটি পত্রিকায় নজর বুলোতে গিয়ে তার লটারিতে

টাকা জেতার কথা জানতে পারেন। এই খবরে তিনি এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েন যে কোনো কথাই বলতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যে লটারির টিকিটে তিনি প্রাইজ জিতেছেন সেটিও তিনি নিজের ইচ্ছায় কেনেননি। স্কুলের হেডমাস্টার ময়মনসিংহ থেকে পঞ্চাশটা টিকিট কিনে এনে স্কুলের সব শিক্ষকদের সেগুলো বিক্রি করেছিলেন। আর্থিক দুরবস্থার কারণে কেউ কেউ সেগুলো কিনতে না চাইলে তিনি বলেছিলেন, দেশের কাজে এক্সাম্পল সেট করতে হবে তাই পাঁচটা করে টিকিট সবাইকে কিনতে হবে আর স্টুডেন্ট দের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু পরে জানা যায় আসলে প্রতি দশটি টিকিটে দুটাকা করে লাভ করার জন্যই হেডমাস্টার এরকম করেছিলেন। লটারির টিকিটে জেতার খবর পেয়ে প্রণববাবু সারাদিন নিশ্চুপ হয়ে স্কুলে শুয়ে থাকেন। তার এই জেতার খবরে বাকি শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে, কেউ আর ক্লাসে যায় না, কারণ প্রত্যেকেই টিকিট কেটেছিল নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা ভেবে। ইংরেজির শিক্ষক আজিজুদ্দিন ক্লান্ত স্বরে প্রনববাবুকে ফুর্তি করার কথা বলেন, কিন্তু পরে বোঝা যায় তিনি ভেতরে ব্যাপারটা নিয়ে হতাশ। তার হতাশার প্রকাশ হয় ছাত্রদের উপরে। ক্লাস না হওয়ায় উল্টে তিনি ছাত্রদের ধমক দেন। হেডমাস্টার সাহেব তার মেয়ের বিয়ের কথা ভাবেন, তার মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাবে কারণ তার পাত্রের দাবি তাকে মোটরসাইকেল কিনে দিতে হবে। সেই হতাশা আর ক্ষোভ থেকে তিনি প্রণববাবুকে মোটর সাইকেল কেনার কথা বলেন। কেউ ক্লাস নিতে না যাওয়ায় হেডমাস্টার সেই নিয়ে প্রশ্ন করায় এসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার বলেন, ‘তিন মাস বেতন নাই, এর মধ্যে একজন দুলাখ টাকা পেলে মেজাজ ঠিক থাকে ?’ এরপর টিফিন পিরিয়ডে স্কুল ছুটি হয়ে যায়। স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাওয়ায় ছাত্রদের জন্য রাখা টিফিন লুচি আর বুন্দিয়া বেচে যায়। অন্যদিন হলে এই বেচে যাওয়া টিফিনের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে উৎসাহী আলোচনা হতো। কিন্তু সেদিন এসব কিছুই হয় না। স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেলেও প্রণববাবু স্কুল থেকে বেরোন সন্ধ্যার পরে। যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরেন তখন তিনি ভেবেছিলেন হয়তো লটারির খবরটা নিয়ে সবাই তাকে প্রশ্ন করবে। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করে না। প্রণববাবুর মনে পড়ে তার ছেলে সুবল যখন চুরির কেসে গ্রেফতার হলো তখন লোকের প্রশ্নে তাকে জেরবার হতে হয়েছিল। বাজারে করিম মিয়া তার কাছে আবার টাকা চাইলে প্রণববাবুর খুব ইচ্ছে হয় তাকে লটারির কথাটা বলার, কিন্তু তিনি বলেন না। প্রণববাবু বাড়ি ফেরার পর তার সঙ্গে হঠাৎ তার ছেলে সুবল দেখা করতে আসে। সে তিনশো টাকা চায় তার কাছে। প্রণববাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তার মনে পড়ে তার মেয়ে অঞ্জুর কথা, তার সঙ্গে দীর্ঘদিন দেখা না হওয়ার কথা। সুবল তাকে কাঁদতে দেখে বলে, ‘চিন্তার কিছু নাই বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।’ প্রণববাবু বলেন, ‘কিছুই ঠিক হয় না’। এরপরেই গল্পের শেষ হয় মাছের চোখের মতো মৃত জোছনার উপমা দিয়ে। বোঝা যায়, দু লাখ টাকা জেতার পরও প্রণববাবুর মতো নিম্নবর্গের মানুষের মন থেকে বেদনার আঁচ যায় না, কারণ আসলে হঠাৎ করে পাওয়া অনেকগুলো টাকাও পুরনো ক্ষতকে সারাতে পারে না।

‘সুলেখার বাবা’ গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই নিম্নবর্গের এক করুণ কাহিনী। তীব্র দারিদ্র্য আর অভাবের কাছে যে স্নেহ আর মমতাও তুচ্ছ হয়ে যায়, অভাবের তাড়নায় নিজের সন্তানকেও তখন বিক্রি করার ভাবে বাবা। গল্পের মুখ্য চরিত্র সুলেখা নামের একটি মেয়ে। সে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একটি লোককে তাদের বাড়ির গেটের সামনে দেখতে পায়। লোকটি তাকে অদ্ভুতভাবে দেখতে থাকে এবং হাসতে থাকে। লোকটির চোয়াল ভাঙ্গা, মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা, চোখ দুটো ফোলা। লোকটি কিছুক্ষণ পর পর পিক করে থুথু ফেলছে দেখে সুলেখার সেই দৃশ্য দেখে বড় বিশ্রী লাগতে থাকে। লোকটির বা চোখের নীচে একগাদা ময়লা থাকায় এই কুৎসিত দৃশ্য সুলেখা দেখে না কারণ তার মা তাকে বলেছিলেন কোনো কুৎসিত দৃশ্য না দেখতে। লোকটি তাকে দেখে হাসছে দেখে সুলেখা তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে লোকটি জানায় তার কোনো নাম নেই। লোকটি তারপর আবার থুথু ফেললে সুলেখা যখন তাকে ধমক দেয় ঠিক তখনই সুলেখার মা আসেন সেখানে। তিনি সুলেখাকে ধমক দিয়ে খাবার খেতে যেতে বলেন, তারপর লোকটির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। লোকটির সঙ্গে সুলেখার মার কথপোকথনে আমরা জানতে পারি এই লোকটিই আসলে সুলেখার বাবা। অভাবের তাড়নায় টাকার বিনিময়ে সে সুলেখাকে বিক্রি করে দিয়েছিল কিন্তু মেয়ের জন্য তার মন টানে তাই সে ছুটে এসেছে তাদের কাছে। এরপর সুলেখার বর্তমান বাবাকেও আমরা দেখতে পাই, তিনি এই ঘটনায় বিরক্ত তিনি নিদান দেন যে একশো টাকা দিয়ে লোকটাকে বিদায় করে দিতে। শেষপর্যন্ত সুলেখাই সেই টাকা দিয়ে আসতে যায় লোকটির কাছে। সুলেখা টাকা দিলে লোকটি অর্থাৎ সুলেখার আসল বাবা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তাকে জিজ্ঞেস করে, সে ভালো আছে কিনা, স্কুলে পড়ে কিনা। শেষ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই সুলেখার বাবা তার অপরাধবোধ থেকেই যেন সুলেখাকে বলতে চেষ্টা করে যে সে ভাতের জন্য চূড়ান্ত অভাবের জন্যই তাকে বিক্রি

করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সুলেখাকে সে জিজ্ঞেস করে যে সে তাকে চিনতে পারে কিনা। সুলেখা তাকে চিনতে পারে না, পুরো ব্যাপারটা সে বুঝে উঠতে পারে না। সুলেখার বাবা টাকা না নিয়ে কুঁজো হয়ে এক অসহায় ভঙ্গিতে হেঁটে চলে যায়। নিম্নবর্গের মানুষের এক করুণ দৃশ্য ফুটে ওঠে এই গল্পে। বোঝা যায়, নিম্নবর্গের মানুষ হয়ে অভাবের তাড়নায় সে মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছে বটে, কিন্তু সে অমানুষ নয়, তার মেয়ের জন্য তার ভালোবাসা একটুও কম হয়নি। এ যেন নিম্নবর্গের মানবিকতার অনন্য বয়ান।

'সৌরভ' গল্পে আমরা দেখতে নিম্নবর্গের পরিবারের এক বাবার যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছবি। আজহার খা নামে এক অসহায় পিতার গল্প দেখতে পাই, মাসের ছাব্বিশ তারিখে তিনি যখন বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন তখন তার মেয়ে লিলি তাকে তার প্রিয় সেন্টের শিশি আনতে বলে। তিনি পরের মাসে এনে দেবেন বললেও লিলি জেদ ধরে বসে থাকে। অর্থের অভাব থাকায় আজহার খাঁ তার মেয়ের এই আচরণে বিরক্ত হন, তার চড় মারতে ইচ্ছে করে। কিন্তু লিলি যখন তাকে নিজের জমানো তিনটে দশ টাকার নোট এনে দেয় তিনি তখন লজ্জা ও হতাশার মিশ্র অনুভূতির মধ্যে পড়েন। তিনি কথা দেন সেন্টের শিশি তাকে আজকেই এনে দেবেন। বৃষ্টি আর কাদা উপেক্ষা করেই তিনি যখন সেন্টের শিশি আনতে দোকানে যান তখন কয়েকটি দোকানে লিলির পছন্দের সেই ' ইভিনিং ইন প্যারিস' এর শিশিটি পাওয়া যায় না। অবশেষে পাঁচ নম্বর দোকান ঘুরে সেটি পাওয়া গেলেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়। টাকা দিতে গেলে আজহার বুঝতে পারেন টাকাগুলো কোথাও পড়ে গিয়েছে। সেন্টের শিশি না পেয়ে তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকেন, ইটের ধাক্কায় পড়ে যান। তিনি মেয়ের কষ্টের কথা ভেবে বহু রাস্তা ঘুরে তার পরিচিত রফিকের কাছে গিয়ে যখন বিশটা টাকা নিয়ে সেন্টের দোকানে গিয়ে পৌঁছান, তখন রাত সাড়ে বারোটা, দোকান বন্ধ আর তার গায়ে প্রবল জ্বর। তবু তিনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে দোকানদারের কাছে শিশিটা কিনে নেন। জ্বর গায়ে রাত বারোটায় সেই শিশি নিয়ে ফেরার পর রিকশা থেকে নামতে গিয়ে শিশিটি ভেঙে যায়। তিনি দেখতে পান তার স্ত্রী আর মেয়ে লিলি চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য। সেন্টের শিশিটা ভেঙে গেলে তিনি অসহায় সুরে বলে ওঠেন, 'লিলি তোর শিশিটা ভেঙে গেছে রে।' তার মেয়ে তখন কান্নার সুরে বলে ওঠে, 'আমার শিশি লাগবে না। তোমার কি হয়েছে বাবা ?' আজহার খা যখন জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় পড়ে থাকেন তখন বাইরে থেকে ভেসে সেন্টের শিশির সৌরভের মধ্যে দিয়ে এই গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু পাঠক বুঝতে পারে এই সৌরভ আসলে নিম্নবর্গ পরিবারের ভালোবাসার সৌরভ।

বলা বাহুল্য এই গল্পগুলি শুধুমাত্র উদাহরণ মাত্র, আরও বহু গল্পে হুমায়ূন তার নিখুঁত কলমের আঁচড় দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নবর্গের নিজস্ব বয়ান। নিশিকাব্য,খাদক, ফেরা, শীত, সংসার এরকম বহু গল্পে তার নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাই সৈয়দ শামসুল হক বলেছিলেন, 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা, হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দীর্ঘজীবন লাভ করবেন তার ছোটগল্পের জন্য। তার কিছু ছোটগল্প কেবল বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তো বটেই, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিতেও অসাধারণ।' জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন অনবদ্যভাবে। প্রথম আলো পত্রিকায় হুমায়ূন আহমেদ এর গল্প, সাক্ষাৎকার নিয়ে বসন্ত বিলাপ বলে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান বলেছেন, 'হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন গল্প বলার জাদুকর। এই জাদু দিয়ে তিনি বাংলাভাষী এক বিশাল পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করেছেন, যারা তার বইয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকত।'

প্রবন্ধের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে হুমায়ূন এর এই সবকটি গল্প নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে নিম্নবর্গের জীবনের ঘটনার চিত্রায়নে হুমায়ূন এক কুশলী শিল্পী। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের গল্প কখনোই নিম্নবর্গের একরৈখিক জীবনকে তুলে ধরেনি, কারণ তার গল্পে যেমন নিম্নবর্গের পরাজয়ের গল্প আছে, তেমনি তার ভালোবাসার, তার আনন্দের কাহিনীও আছে। তাই একথা বলাই যায় যে হুমায়ূন আহমেদের অনেক ছোটগল্প আসলে নিম্নবর্গের জীবনযাত্রার সার্থক ক্যানভাস। হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যে শুধু নিম্নবর্গ শ্রেণীর মানুষের মানবিক দিকটিই ফুঁটে উঠেছে তাই নয়, বরং তাদের প্রবল সংকট ও নিজেদের অবস্থান মুখ বুজে মেনে না নেওয়ার কথাও রয়েছে। হুমায়ূন আসলে নিম্নবর্গ শ্রেণীকে শুধুমাত্র বঞ্চনার প্রতীক হিসেবে দেখাতে চাননি, বরং তাদের জীবনের মধ্যেও আনন্দ, ভালোবাসা, ও আশা খুঁজে পাওয়ার গল্পও বলেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, নিম্নবর্গের ইতিহাস,আনন্দ পাবলিশার্স, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১০, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ২

২. তদেব, পৃষ্ঠা ৩
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৫
৪.আহমেদ, হুমায়ূন, গল্পসমগ্র অখন্ড, কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৫৬
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৩
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৩
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৫৫
৮.আহমেদ, হুমায়ূন, এই আমি, কাকলী প্রকাশনী,৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৬

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১.ইসলাম আজহার, বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ভাবনা ও শিল্পমূল্য ,অনন্যা প্রকাশনী, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০, প্রথম মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬
২. ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, নিম্নবর্গের ইতিহাস,আনন্দ পাবলিশার্স, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১০, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬
৩. আহমেদ হুমায়ূন, গল্পসমগ্র অখন্ড, কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০,তৃতীয় মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১
৪. আহমেদ হুমায়ূন, এই আমি, কাকলী প্রকাশনী,৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০,সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩
৫. রহমান মতিউর, বসন্ত বিলাপ, ভূমিকা , প্রথমা প্রকাশন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা - ১২১৫, প্রথম মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ২০১২

....

সমরেশ বসুর 'কিমলিস্' গল্পে শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম

ড. মৌসুমী পাল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ-

রাজনৈতিক চিন্তায় মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সমরেশ বসু শ্রমজীবী মানুষকে শ্রেণিদ্বন্দ্বের অঙ্গীভূত করে তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য 'কিমলিস' গল্পে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের শ্রমিকদের অবস্থা, শ্রমিক-সচেতনতা এবং শ্রমিকদের মধ্যেকার কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটা প্রাথমিক রূপ ফুটে উঠেছে।গল্পের নায়ক বেচন শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছিল, অবিচারের প্রতিবাদ করে কারাবরণ করেছিল। অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক সংগ্রামী মনোভাবই তাকে প্রতিবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গল্পকার সমরেশ বসু সমাজের ভাঙ্গন ও অবক্ষয়ের মধ্যে মানুষের প্রতিরোধের ক্ষমতাকে চিত্রিত করেছেন এবং নিপীড়িত নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেও মনুষ্যত্বের অম্লান পরিশুদ্ধতাকে আবিষ্কার করেছেন। এই অনুসন্ধান, উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে তার ছোটগল্পে। শিল্পাঞ্চলে বড় হওয়া সমরেশ শৈশব থেকেই কারখানায় শ্রমিকের চালচিত্র প্রত্যক্ষ করে এসেছেন।

সমরেশ বসুর বহু গল্প-উপন্যাসে বস্তুবাদী শ্রমিক জীবনের ছবি উঠে এসেছে। নিপীড়িত শ্রমিকদের মধ্যে অধিকারবোধ এবং প্রতিবাদী চেতনা কিভাবে ঘটে তা লেখক 'কিমলিস্' গল্পের নায়ক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। আমার এই প্রবন্ধে একক প্রতিবাদ ও একক সংগ্রাম নয়, সংগঠিত সংগ্রাম ও চূড়ান্ত বিপ্লবই যে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে মুক্তি নিয়ে আসতে পারে, এই কথাটি বেচন বুঝতে পেরে কিভাবে সবাইকে নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হলো, শোষক ও শোষিতের শ্রেণিদ্বন্দ্বে নিজেদের অবস্থান চিহ্নিত করে তাদের সমবেত সংগ্রামে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হলো এবং শেষ পর্যন্ত গল্পে শোষিত শ্রেণির জয় ঘোষিত হলো, তাই আলোচনা করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো।

সূচক শব্দ:

শ্রমজীবী মানুষ, শ্রেণিদ্বন্দ্ব, শোষক, শোষিত, সংগ্রামী চেতনা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, নিপীড়ন, অধিকারবোধ

মূল প্রবন্ধ

বিভিন্নমুখী সৃষ্টি নিয়ে সমরেশ বসু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাব বা তত্ত্বের দিক থেকে পাঠকের তার সঙ্গে মতপার্থক্য থাকলেও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে এবং চরিত্রচিত্রণের শক্তিমত্তায় তিনি গল্পকে এমন রসোত্তীর্ণ গড়ে তোলেন যে পাঠকের রসগ্রহণে কোনো বাধা হয় না। রাজনৈতিক চিন্তায় মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সমরেশ বসু শ্রমজীবী মানুষকে শ্রেণিদ্বন্দ্বের অঙ্গীভূত করে তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায় – "লেখক নিজে জীবন শুরু করেছিলেন শ্রমিকরূপে। পেশাগতভাবে তাই তিনি একদা শ্রমজীবী মানুষের মাঝখানে ছিলেন। মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে তিনি বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওদের সমস্যা ও স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন।"[১] কিন্তু ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই মানুষের এমনই অন্তরঙ্গ পরিচয় দিতে পেরেছেন যে তাঁর গল্পে তত্ত্ব কখনোই রসসৃষ্টিকে ব্যাহত করেনি বরং জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে গল্পের চরিত্রকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে, এক নতুন মাহাত্ম্যে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। 'কিমলিস্' গল্পটিতে সমরেশ বসুর এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'কিমলিস' গল্পটি রচিত হয় ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের শ্রমিকদের অবস্থা, শ্রমিক-সচেতনতা এবং শ্রমিকদের মধ্যেকার কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটা প্রাথমিক রূপ এই গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। গল্পের নায়ক বেচন শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছিল, অবিচারের প্রতিবাদ করে কারাবরণ করেছিল। অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক সংগ্রামী মনোভাবই তাকে প্রতিবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কোন সচেতন রাজনৈতিক মতের দ্বারা প্রাথমিক অবস্থায় সে পরিচালিত হয়নি।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন সে ফিরে আসে তখন তার বাইরের পোশাকটারই শুধু পরিবর্তন হয়নি, মনটাও অনেক বদলে গেছে। কারাবাসকালে রাজনৈতিক শিক্ষাগ্রহণে মার্কসবাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে এবং সে বিশ্বাস করেছে ক্রান্তির ভেতর দিয়ে ভবিষ্যতে মজদুররাজ কায়েম হবেই। কারাগারে মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে তার আচার-আচরণ পরিশীলিত হয়েছে, রুচির পরিবর্তন ঘটেছে।

মাত্র দেড় বছর জেলবাস করলেও এই স্বল্প সময়ে তার মধ্যে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রতিবাদী মনের অধিকারী বেচন তার প্রতিবাদের একটা দার্শনিক ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণির সমাজের সর্বাধিক প্রগতিবাদী ভূমিকার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছে। সে বুঝেছে একক প্রতিবাদ ও একক সংগ্রাম নয়, সংগঠিত সংগ্রাম ও চূড়ান্ত বিপ্লবই মুক্তি নিয়ে আসতে পারে। সে তার বাবা বনোয়ারী, মা রামদেই, স্ত্রী ঝুনিয়া, ছোট ছোট ভাইবোন, বস্তিবাসী প্রতিবেশী ও অন্যান্য শ্রমিক - সকলের কাছেই সে এক রূপান্তরিত নূতন বেচন বলে প্রতিভাত হয়েছে।

"শিল্পাঞ্চলে বড় হওয়া সমরেশ শৈশব থেকেই কারখানায় শ্রমিকের চালচিত্র প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসে বস্তুবাদী শ্রমিক জীবনের ছবি উঠে এসেছে।"[২] বস্তির মানুষজন এবং আত্মীয়দের মধ্যে বেচনের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে যে শ্রমিকদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়, তাতে তাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনযাত্রার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারখানায় রেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে তাকে সংগঠিত প্রতিবাদী সংগ্রামের রূপ দিয়েই বেচন কারাবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও সেই সংগ্রামে জয় হয়েছে শ্রমিকদেরই। ছাঁটাইয়ের সময় প্রতিবাদী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সাধারণ শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয়তা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে।

বেচন একাই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে মার খেয়ে আহত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের সে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। ফলে কারখানার কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। শ্রমিকদের শোষণে সক্রিয় শুধু কারখানার মালিক বা কর্তৃপক্ষই নয়, তাদের দালাল বস্তির মালিক কালিকাপ্রসাদ ও তার সহযোগীরাও। এই শোষণের রূপটি শ্রমিকরা যে বোঝে না তা নয়, কিন্তু তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে সংগ্রাম করার চেতনা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে শ্রমিকদের এই মানসিকতার বাস্তব চিত্র 'কিমলিস্' গল্পে পাওয়া যায়।

সমরেশ বসু তাঁর ছোটগল্পে যেসব চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন তারা সমাজের নিচুতলার মানুষ। আমাদের আলোচ্য 'কিমলিস্' গল্পে রয়েছে সংগঠিত শিল্পের মজুরের কথা। সমরেশ বসু সমাজের নিচু তলার মানুষদের মধ্যে বাস করেছেন। তাদের সঙ্গে কারখানায় কাজ করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে তাদের অসাধারণ সব গল্প লিখেছেন। নিজে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টিতে আসা মুখিয়া শ্রমিকদের তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের বস্তির জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। আমাদের আলোচ্য গল্প 'কিমলিস্' এর যে মূল চরিত্র বেচন এমনি একজন শ্রমিক।

'কিমলিস্' একটি চরিত্রনির্ভর ছোটগল্প। এই গল্পের নায়ক বনোয়ারী কাহারের ছেলে বেচন কারখানায় রেশন চালু রাখার দাবিতে শ্রমিকদের জন্য লড়াই করে জেলে গিয়েছিল। জেলে গিয়ে তার মার্কসবাদী রাজনীতিতে দীক্ষা হয়েছে। কিন্তু বেচন জানে কমিউনিস্ট বিপ্লবী হয়ে ওঠা সহজসাধ্য নয়। বেচন আশা করে হয়তো সত্যিকারের একজন ক্রান্তিকারী হয়ে উঠতে পারবে সে। তার বাবা-মা ও স্ত্রী তার আচরণে ভীত হয়েছে। তার বাবা তাকে বস্তি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যখন সে আহত হয়েছে তখন তারা তাকে বুঝতে পেরেছে।

বেচন চরিত্রকে পরিস্ফুট করে তুলবার জন্য বস্তিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও তাদের চেতনার প্রকাশ করেছেন গল্পকার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এক শীতের সন্ধ্যায় বেচন যখন বস্তিতে আবির্ভূত হয়েছে তখন সেখানকার পরিবেশ ও বস্তিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার একটি বাস্তবচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। শ্রমিকদের যে আত্মনির্ভরতা নেই, তারা যে সংগঠিত হয়ে নিজেদের শক্তিকে এখনও উপলব্ধি করতে পারেনি, অস্থির বাড়িওয়ালা ও সর্দার কালিকাপ্রসাদের ওপর তাদের নির্ভরতা দেখে সহজেই বোঝা যায়। সেই নির্ভরতা পরিবর্তিত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয় এবং ছাঁটাই রোখাও সম্ভব হয়। পাঠক বুঝতে পারেন "বেঁচে থাকার আশা-নিরাশায়, জীবনের জোয়ার-ভাঁটায়, আন্দোলিত শ্রমিকদের জীবনকাহিনী বলতে গিয়ে গল্পকার তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দিকটায় বিশেষ জোর দিয়েছেন।"[৩]

'কিমলিস্' গল্পটির আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, সুযোগ থাকলেও লেখক এখানে শ্রমজীবী মানুষের উপরে ট্রেড ইউনিয়নের বা রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব এবং তার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দেখাননি। তার ফলে গল্পটি কোন রাজনৈতিক গল্প হয়ে ওঠেনি। জীবনের বাস্তবতা থেকে জেগে ওঠা প্রতিরোধের রাজনীতি গল্পে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

বেচন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং তার জন্য কারাবরণ করেছে। তাতে তার জীবনযাপনের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং চিন্তার জগতে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে। তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব রূপান্তরিত হয়ে গেছে নতুন চিন্তায়। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বেচন নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সংগ্রামের জন্য।

মানুষের মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। বেচনের চরিত্রে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। অপরের জন্য আত্মদানের মহত্ব বেচনের মধ্য দিয়ে লেখক সমগ্র গল্পে সঞ্চারিত করে দিতে সমর্থ হওয়ায় 'কিমলিস্' একটি যথার্থ রসোত্তীর্ণ গল্প হয়ে উঠতে পেরেছে।

গল্পের প্রথমে বনোয়ারী, রামদেও, ঝুনিয়ার কাছে তাদের নিজের মানুষ বেচনের নতুন চিন্তা ও চেতনাকে ভীতিজনক বলেই মনে হয়েছে। কালিকাপ্রসাদ মনে করেছে যে এটা একটা রোগ এবং এই রোগ থেকে মুক্ত করা পিতা হিসেবে বনোয়ারীর কর্তব্য। পরবর্তীকালে বেচন পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হয়েছে। সে তার নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ, চটকদারি চেহারা বদলে অভাবগ্রস্থ শ্রমিকদেরই একজন হয়ে উঠেছে। পরিবারের লোকেরা যখন দেখল যে বিপদের দিনে নিজের প্রাণকে বিপন্ন করেও নিঃস্বার্থভাবে বেচন শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তারা এবং অন্যান্য বস্তিবাসী শ্রমিকরাও বেচনকে পরমাত্মীয় বলে উপলব্ধি করেছে। এমনকি কালিকাপ্রসাদের নিষেধও তারা অগ্রাহ্য করেছে। একজনের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতায় শ্রমিকচেতনার এই পরিবর্তন। এই পরিবর্তন শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট সম্পর্কে আতঙ্কের মনোভাব থেকে ভালোবাসার মনোভাবে রূপান্তর।

গল্পকার 'কিমলিস' গল্পটিতে তাঁর বক্তব্য গল্পটির প্রধান চরিত্র বেচনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই বাস্তব পরিবেশ এবং অরাজনৈতিক অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে চেতনার বিকাশ ফুটিয়ে তুলেছেন। নিপীড়িত শ্রমিকদের মধ্যে অধিকারবোধ এবং প্রতিবাদী চেতনা কিভাবে ঘটে তা লেখক 'কিমলিস্' গল্পের নায়ক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন।

'কিমলিস্' গল্পের নায়ক বেচন। তাকে ঘিরে আছে কালিকাপ্রসাদের মত সুদের কারবারী, কারখানার মালিক, বাবা-মা-স্ত্রী আর কারখানার শ্রমিকরা। এই দুনিয়া আর ওই বস্তির নানা ঘরের শ্রমজীবী মানুষগুলোর প্রধান বিরোধী হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় কালিকাপ্রসাদকে। সে খুব সহজে বুঝে নেয় এই নতুন ক্রান্তিকারীকে বস্তি থেকে তাড়াতে না পারলে তার কায়েমী স্বার্থের উপর আঘাত আসবে। সেইজন্য সে নানাভাবে জেলফেরত বেচন যে সাংঘাতিক দুর্বৃত্ত 'কিমলিস্'এ পরিণত হয়েছে তা বনোয়ারীকে জানায় এবং বেচনকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে বলে। অন্যদিকে আর যেসব চরিত্র গল্পে রয়েছে তারা বেচনের সমপর্যায়ের বস্তিবাসী মানুষ, তারাও খেটে খায়, শোষিত হয়। কিন্তু শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না।

বেচনের বাবা বনোয়ারীর সঙ্গে বিরোধ, মা রামদেইয়ের মাতৃস্নেহের মধ্যেও সংশয়, স্ত্রী ঝুনিয়ার পরিবর্তিত বেচনকে নিয়ে দুর্ভাবনা ও ভয় - এসবের মধ্য দিয়ে তার পারিবারিক জীবনে অশান্তি দানা বাঁধতে থাকলেও সে অক্লান্তভাবে তার নতুন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে এবং ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। তাই সমালোচক বলেন - "নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক জীবনচর্যাকে তিনি দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন নিজের অস্থিমজ্জায়। সেই কারণেই ব্যক্তি অভিজ্ঞতার নিরিখে তা এত প্রাঞ্জল এবং বাস্তব হয়ে উঠতে পেরেছে।"[8] না খেতে পাওয়া, শরীরের যত্ন, অপরিচ্ছন্নতার প্রতি অমনোযোগিতা, নতুন চাকরির ক্ষেত্রে রিকশাওয়ালাদের মালিকের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা - এসবের পেছনে তার নতুন উপলব্ধ ভাবনা কার্যকর থেকেছে। এই নতুন চিন্তা নিয়েই বেচন শ্রমিকশ্রেণির হয়ে লড়াই চালিয়ে যায়।

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সমবেত শ্রমিকদের মাঝে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয় বেচন। ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীবৈষম্য, শোষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন ছিল, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ ছিল না। সাম্যবাদ শোষিত মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শক্তি যোগায়। সেই শক্তির জাগরণও বহুমূল্যে অর্জিত হয়। এই গল্পের নায়ক বেচনের মধ্য দিয়ে গল্পকার সমরেশ বসু তাকে শিল্পসম্মত করে তোলেছেন।

আলোচ্য গল্পে বেচন কারখানার কর্মীদের হরতাল আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। হরতাল কমিটির মেম্বার। কারখানার শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ রেশনের কমতি, ক্রমাগত খারাপ মান ও বেশি দাম নিয়ে অসন্তুষ্টি তো ছিলই, এর উপর কোম্পানি বন্ধ করে দিলে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করে তুলতে বেচনকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। লাগাতার হরতাল, ম্যানেজার ঘেরাও ইত্যাদি ঘটনার পর শ্রমিকদের দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিল। কর্মীরা আবার কাজে যোগ দিয়েছিল। কারখানার চিমনি আবার নিয়মিতই আকাশের বুক উগরে নির্গত করছিল কালো ধোঁয়া।

এই কর্মকান্ডের প্রধান হোতা বেচনকে ম্যানেজারবাবু এককভাবে ডেকে পাঠানোয় তার গুরুত্বের কথা ভেবে খুশি মনেই সে হাজির হয়েছিল ম্যানাজারবাবুর ঘরে। কিন্তু সেখানে পূর্বপরিকল্পিতভাবে উপস্থিত দারোগাবাবু তাকে চালান করে দিয়েছিল কলকাতার জেলখানায়। যাতে সে ভবিষ্যতে আর শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলতে না পারে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করায় দারোগাবাবু বেচনকে বলেছিল - "আসলি কারখানামে, যাঁহা পুরা রেশন মিলবে, আর পুরা হরতাল কমিটি হাজির আছে।"[৫]

বাস্তবের কারখানায় শ্রমিকরা কোম্পানির শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনা-অত্যাচারে জীবন-যৌবন খোয়াতে খোয়াতে যন্ত্রে পরিণত হয়। দারোগাবাবুর কথিত আসলি কারখানা হল জেল, যেখানে হরতাল করা সম্ভব নয়। সেখানকার অন্ধকারে বসে শক্তি অর্জন করে জেলবন্দী শ্রমিক রাজবন্দীর হওয়ার গর্বে বেচনের বুক ফুলে উঠে। ভয়কে জয় করে বেচন হয়ে ওঠে যন্ত্রী। তার গৌরবান্বিত ছবি এঁকেছেন গল্পকার সমরেশ বসু –"কথাটা মনে হতেই সে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল তার অপ্রতিভতা ছেড়ে। শার্টের কলারটা ঠিক করে নিল, বার দুয়েক প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।"[৬]

জেল ফেরত বেচন ছোকরা দোস্তের কাছে কারখানার হালচাল জিজ্ঞেস করে। চার্জশিট, ওয়ার্নিং ইত্যাদির কারণে ও আতঙ্কে শ্রমিকদের অসহায়তার কথা শুনে শ্রমিক সংগঠনের হয়ে প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বলে - "হম্ কালহি কারখানা যায়েগা। দেখো ভাই, জিসকো বোলতা মজদুর তুম ওহি হ্যায়।"[৭] শোষক ও শোষিতের শ্রেণিদ্বন্দ্বে অবস্থান চিহ্নিত করে তাদের সমবেত সংগ্রামে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে বেচন।

বেচন কাজের জায়গায় রিকশাওয়ালাদের বুঝাতে চেষ্টা করে কিভাবে মালিক তাদের ঠকাচ্ছে। ফলে তার চাকরী যায়। তারপর গদিতে চাকরের কাজ করার সময় মালিককেই মজদুররাজের কথা বুঝাতে গিয়ে কাজ হারায়। কারখানাতে জনা চল্লিশেক লোককে ছাঁটাইয়ের কথা শুনে তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বেচন। সেই ছাঁটাইয়ের তালিকায় মায়ের নাম থাকায় মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে বেচন মজদুররাজের মাহাত্ম্য। কিন্তু তখন তাকে কেউ বুঝতে চেষ্টা করেনি। বরং তার বাবা বনোয়ারী তেড়ে এসে বলে - "শালা কিমলিসপনা দিখানে আয়া?"[৮]

ঘরে-বাইরের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা একরোখা করে তোলে বেচনকে। সে খাঁটি 'কামনিসে'র মত 'মজদুরের জিন্দীগী' বদলে দিতে গিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। রেশন হরতালের সাফল্য, জেল জীবনের অভিজ্ঞতা ও মজদুর রাজের আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত হতাশা ও অসহযোগিতাকে ভুলিয়ে বেচনকে সংগ্রামমুখর করে তোলে। তার সংগ্রামী চেতনার একনিষ্ঠতায় আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততায় শ্রমিকেরা তার উপরে ভরসা রাখে।

কারখানার মজদুররা ছাঁটাই নোটিশ জারি হলে বুক চাপড়ে কোম্পানিকে গালিগালাজ করতে করতে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন আত্মপ্রত্যয়ের সুরে কারখানার সামনে দাঁড়িয়ে বেচন চিৎকার করে বলে - "হাম বেচন। হম্ বোলতা, তুলোগ ঠাহর যা। ছাঁটাই জরুর বন্দ্ করনে হোগা।"[৯] সেদিন কারখানার সবাই বেচনের বক্তৃতার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং বেচন তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করে তার বক্তব্যের মাধ্যমে। বেচন শ্রমিকদের মজদুররাজ কায়েমের স্বপ্ন দেখায় - "মজদুর তু খানা বিনা মর জায়েগা তো জমানা কৌন বদলেগা!"[১০]

বেচন বুঝতে পেরেছে যে মালিক কখনো শ্রমিকের স্বার্থ দেখে না। শ্রমিকদের লড়াই করে নিজেদের অধিকার আদায় করতে হয়। তাই বেচন শ্রমিকদের অধিকারের জন্য প্রতিবাদী হয়। ফলে গুলিবিদ্ধ হয় বেচন। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিকরা আর কারখানায় যায়নি। রেশন হরতালের পুনরাবৃত্তি ঘটে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এবং শেষপর্যন্ত ছাঁটাই তুলে নিতে কোম্পানি বাধ্য হয়। "সমরেশ বসু এই গল্পে এক সাধারণ বস্তিবাসী তরুণের সাম্যবাদী চেতনায় সত্তার জাগরণকেই দেখাননি, তার উদ্বর্তনের ছোঁয়ায় শ্রমজীবী মানুষের সামগ্রিক জাগরণকেই ভাষা দিয়েছেন।"[১১]

গল্পকার সমরেশ বসু সমাজের ভাঙ্গন ও অবক্ষয়ের মধ্যে মানুষের প্রতিরোধের ক্ষমতাকে চিত্রিত করেছেন এবং নিপীড়িত নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেও মনুষ্যত্বের অম্লান পরিশুদ্ধতাকে আবিষ্কার করেছেন। তার এই অনুসন্ধান, উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে অসাধারণ সব ছোটগল্পে। লেখক সমরেশ বসুর গল্প-উপন্যাসে তাঁর একান্ত নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতায় সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্ব থেকেই শ্রমজীবী মানুষেরা স্থান পেয়েছে অনায়াসেই। "আসলে ব্যক্তিগত জীবনযাপনে তিনি আ-মৃত্যু ছিলেন মানুষেরই কাছাকাছি। যখন যেরকম মনুষ্য চরিত্র তাঁকে আকৃষ্ট করেছে তখনই সেই মানুষকে আগাগোড়া আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছেন তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে এই নিম্নজীবী, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষগুলির সান্নিধ্যে।"[১২] সমাজের একেবারে নিচ থেকে সুস্থ জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্তগুলি তিনি তাঁর গল্পগুলিতে একের পর এক উপস্থাপন করেছেন। শীতের সন্ধ্যায় কর্মক্লান্ত শ্রমিকের বস্তিতে ফিরে আসার ছবি এঁকেছেন। আমাদের আলোচ্য গল্প 'কিমলিস্'এ ও আমরা এই শ্রমজীবী মানুষের ছবিই ফুটে উঠতে দেখি।

তথ্যসূত্র ঃ

১) নাগ, ড. দীপালি, 'এবং মানুষ : সমরেশ বসুর গল্প', পৃষ্ঠা – ৬১।

২) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদনা), 'গল্পচর্চা', দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ – 'কিমলিস : এক আলাক্ চীজ',- সন্তোষকুমার মন্ডল, পৃষ্ঠা – ১০৫০।

৩) নাগ, ড. দীপালি, 'এবং মানুষ : সমরেশ বসুর গল্প', পৃষ্ঠা – ৭৩।

৪) রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা, 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ন'(১ম খন্ড),পৃষ্ঠা – ১২৭।

৫) 'কিম্ লিস', সমরেশ বসু, 'সমরেশ বসুর রচনাবলী', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পৃষ্ঠা – ৮০১।

৬) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৮০১।

৭) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৮০২।

৮) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৮০৯।

৯) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৮১০।

১০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৮১১।

১১) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদনা), 'গল্পচর্চা', পৃষ্ঠা – ১০৫৫।

১২) রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা, 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ন'(১ম খন্ড),পৃষ্ঠা – ১২৭।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, (সম্পাদিত), 'সমরেশ বসুর রচনাবলী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৮।

২) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদনা), 'গল্পচর্চা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯ ৩য় সংস্করণ, ২০১৮।

৩) নাগ, ড. দীপালি, 'এবং মানুষ : সমরেশ বসুর গল্প', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯ ১ম প্রকাশ, ২০০৫।

৪) রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা, 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ন'(১ম খন্ড), পূর্বাশা, কলকাতা-৭৩, ২য় সংস্করণ, ২০১২।

....

নিম্নবর্গীয় চরিত্র : সভ্যতার অন্তরালে চিরায়ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক

মৃণালকান্তি মুর্মু
গবেষক ,বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:
পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজ-সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য সৃষ্টি ও সমাজের অগ্রগতিতে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরা একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই সমাজ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। যুগ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরাই। এদের কর্মময়তার মধ্য দিয়েই পৃথিবী থাকে সজীব ও সতেজ। সাহিত্য সৃষ্টিতে এই চরিত্রের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনই পৃথিবীর বুকে সৌন্দর্যময়তার সৃষ্টি শৈলীতে এই চরিত্রের অবদান রয়েছে। ভগীরথ তাঁর কঠোর তপস্যার দ্বারা মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন করে যেমন নতুন প্রাণের স্পন্দন ঘটিয়েছেন তেমনই এই নিম্নবর্গীয় চরিত্রেরা তাদের কর্মের মধ্য দিয়ে যুগ-সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। বিশ্বকর্মার অপরূপ শিল্পসৃষ্টি এদের হাতেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাই চিনের প্রাচীর থেকে শুরু করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এদের হস্তেই নির্মিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যিকদের রচনায় যেমন এই নিম্নবর্গীয় চরিত্রের উত্থান-পতন ঘটেছে তেমনই সাহিত্যের গতিকে সুদৃঢ় করতে এই চরিত্রের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন বাংলার অন্যতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' এর অধিকাংশ কবিও ছিলেন এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর। তাই তাঁদের রচনায় নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ রূপে গণ্য হয়েছে। কেবল 'চর্যাপদ' ই নয় তার পরবর্তী মধ্যযুগ ও এই একবিংশ শতাব্দীর অজস্র রচনায় নিম্নবর্গীয় চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ সাহিত্য ও সমাজের মূল ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়েছিল এদের হস্তেই। সাহিত্য সমাজ দর্পণ আর সেই দর্পণে প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার নেপথ্যে সর্বদাই নিয়ত রয়েছেন এই নিম্নবর্গীয় চরিত্রেরা। কবি-সাহিত্যিকেরাও এই নিম্নবর্গীয় চরিত্রের কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করে তা সাহিত্যে তুলে ধরেন। সমাজের মূল স্রোত এই নিম্নবর্গীয় চরিত্রের কর্মময়তার মধ্য দিয়েই বিদ্যমান। এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরাই তাদের কর্মের মধ্য দিয়ে সভ্যতার ধারাকে চিরকাল অক্ষুন্ন রেখেছেন। তথাপি এই চরিত্রেরা চিরকালই যেন সভ্যতার অন্তরালে অবহেলিত থেকে গেছে। আমি এই প্রবন্ধে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের গুরুত্বের কথা স্মরণ করে সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

মূল শব্দ:
নিম্নবর্গীয় চরিত্র, সমাজ ও সাহিত্যে তাদের অবদান, কর্মময়তার মধ্য দিয়ে সভ্যতার ধারাকে অক্ষুন্ন রাখা,যুগসংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

মূল প্রবন্ধ:

সাহিত্য সমাজ দর্পণ, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতিচ্ছবি তাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য কখনই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এককথায় সমাজের জীবন্ত দলিল বলা যেতে পারে সাহিত্যকে। সময় যত এগিয়েছে,সাহিত্যও তত সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সাহিত্যের এই অগ্রসর ও পরিবর্তনশীলতায় যেমন উচ্চবর্গ শ্রেণীর মানুষের ভূমিকা রয়েছে একিরকমভাবে তেমনি নিন্মবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের ভূমিকাও রয়েছে। আর তাই সাহিত্য জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উর্ধ্বে উঠে মানবতার জয়গান গেয়ে ওঠে। এই কারণেই মানুষের অন্তর্জগতের কথা জানতে হলে সাহিত্য পাঠ করতে হয়। সাহিত্য পাঠের গুরুত্ব প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহর মন্তব্য –"মানুষকে বুঝতে চাও তো? তাহলে ইতিহাস পড়ে হবে না,সাহিত্য পড়ো, কবিতা পড়ো, কবিতা –মানুষের দুঃখের কথা, বেদনার কথা, সেইখানে পাবে। ইতিহাস বইতে পাবে না।" তাই জগত ও জীবনের মর্মকথা জানতে হলে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে সাহিত্য পাঠে।

আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চরিত্র। এই নিম্নবর্গীয় চরিত্র যারা সভ্যতার অন্তরালে চিরায়ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের কাজ করে চলেছে নিরন্তর। কিন্তু সমাজ যেন এই চরিত্রকে কখনই তেমন মূল্য দেয়নি, যা তাদের প্রতি অন্যায়-

অবিচারেরই নামান্তর। অথচ বাংলা সাহিত্যের একেবারে গোড়া থেকে অর্থাৎ 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে বর্তমানের সকল সাহিত্যেই নিম্নবর্গীয় চরিত্রের ঘনঘটা লক্ষ্য করা যায়।

সমাজের উপায়নে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, এই নিম্নবর্গীয় চরিত্রের উপস্থিতি সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ ও শিল্পকলার মাধ্যমে সাহিত্যের অবয়ব গঠন করে, মহাকালের আলোয় তাকে সূর্যস্নান করিয়ে সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।তাই বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের উপস্থিতি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় 'নিম্নবর্গ' বলতে বোঝায় সমাজের নিচুতলার মানুষদেরকে। এই নিচুতলার মানুষেরা যারা অন্ত্যজ, ব্রাত্য ও প্রান্তিক মানুষ; দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ। এইসব নিম্নবৃত্ত মানুষদের কোন স্থান ছিল না উচ্চবিত্ত অর্থাৎ আভিজাত্যপূর্ণ মানুষের সমাজে। অথচ সমাজের একেবারে মূল শিকড় বলা যেতে পারে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষদেরকে।

'নিম্নবর্গ' শব্দের উৎস বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ইংরেজি 'sub-altern' শব্দটি। ইতালীয় দার্শনিক, কমিউনিস্ট নেতা, আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর 'Prison Notebooks'('কারাগারের নোটবই') গ্রন্থে 'সাব-অলর্টান' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই 'সাব-অলর্টান' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন — বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় শোষিত শ্রেণীকে বোঝাতে। ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ তাঁর 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' গ্রন্থে প্রথম 'সাব-অলর্টান' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেন।

বাংলা সাহিত্যের একটা বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরা। 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অসংখ্য বাংলা গ্রন্থে এই দরিদ্র, প্রান্তিক জনজাতি একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়,আমাদের দেশের বেদ-পুরাণ এও এইসব চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে এইসব চরিত্রের স্থান গুরুত্বপূর্ণ হলেও সমাজে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিল না। যদিও 'অথর্ব' বেদ এর পঞ্চদশ কান্ডে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের দুঃখ ও বঞ্চনার কথাই যেন অধিকমাত্রায় ব্যক্ত হয়েছে।

সমাজে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরা একেবারে গ্রামের প্রান্তে বাস করত। উচ্চবিত্ত সমাজে তাদের কোন কদর ছিল না। আমাদের দেশের জাতীয় মহাকাব্য 'মহাভারত' যা বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহাকাব্য তাতেও দেখি নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের দ্বারা লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে বারংবার। যেমন — একলব্য নিম্নজাতের ছিলেন বলে আর্যগুরু দ্রোণাচার্য তাকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করেননি। আবার কর্ণও নিম্নবর্ণের সারথী অধিরথের পুত্র রূপে পরিচিত ছিলেন বলে তিনিও দ্রোণাচার্যের শিষ্য হতে পারেননি।

প্রাচীন বাংলার নিদর্শন গ্রন্থ 'চর্যাপদ' এ নিম্নবর্গের মানুষের যে চিত্র পাই তাতে তাদের প্রতি বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার দিকটিই স্পষ্ট। শহর বা নগরে উচ্চবিত্ত মানুষদের সাথে তারা বসবাসের অধিকার পেত না। নগরের বাইরে কুঁড়ে ঘরে তারা বাস করত, ব্রাহ্মণেরা তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে তারা ছিল অস্পৃশ্য, অচ্ছুত। কাহ্নপাদ রচিত ১০ নম্বর চর্যায় পাই —

"নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।।"

অর্থাৎ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সাথে নিম্নবৃত্ত শ্রেণীর মানুষের কোন প্রকার ভাব সম্পর্ক বা আদান-প্রদান ছিল না এই চর্যা থেকে তা একেবারেই স্পষ্ট। এছাড়াও চর্যাপদে ডোম,শবর,চন্ডাল, তাঁতী,কাহার,বাগ্দী ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় জনজাতির পরিচয় পাই।

সাহিত্যের গোড়া পত্তন ঘটে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের দ্বারাই। আদি কবি বাল্মীকির আদি মহাকাব্য 'রামায়ণ' এর উদ্ভব হয়েছিল এক নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর ব্যাধের কর্মকান্ডের ফলেই। যদিও ব্যাধ যে কাজটি করেছিল বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও সমাজ নিন্দিত। কিন্তু তার কার্যের ফলেই 'রামায়ণ' মহাকাব্য সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনাটি ছিল এইরকম — একদিন স্নান করার পর বাল্মীকি মুনি তাঁর আশ্রমে যাচ্ছিলেন সেইসময় পথের পাশে গাছের ডালে এক প্রণয়রত কৌঞ্চ দম্পতিকে দেখে বাল্মীকি মুনির মন পুলকিত হয়। ঠিক সেই সময়ে এক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা বিদ্ধ হয় প্রণয়রত কৌঞ্চ দম্পতির মধ্যে কৌঞ্চ পাখিটি। এই ঘটনায় কবি বাল্মীকি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং সেই সময়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা
যৎ কৌঞ্চ মিথুনাদেকমধীঃ কামমোহিতমঃ।"

কবি বাল্মীকির শোক থেকে সৃষ্ট হওয়া এই উক্তি শ্লোক নামে পরিচিত এবং যা পরবর্তীকালে 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সৃষ্টি করে।সুতরাং 'রামায়ণ' মহাকাব্য কবি বাল্মীকির রচিত কিন্তু এর সৃষ্টি মূলে এক নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর ব্যাধের কার্যই ক্রিয়াশীল থেকেছে।

পরবর্তীকালে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত গ্রন্থ 'চর্যাপদ'। যা প্রাচীন বাংলার অন্যতম নিদর্শন, এই গ্রন্থ তেইশ জন কবির পঞ্চাশটি পদের সংকলন। লক্ষ্য করার বিষয় এই তেইশ জন কবির অধিকাংশই অন্ত্যজ-অব্রাহ্মণ নিম্নবর্গের মানুষ। অনঅভিজাত নিম্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল এরা। যেমন — মদ তৈরি,তাঁত বোনা, বাঁশের ঝুড়ি-চাঙারি তৈরি, নৌকা বাওয়া, পশু শিকার ইত্যাদি। তাঁরা এইসব কর্মের মধ্য দিয়ে কোনরকমে নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর এই অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামেরই চিত্র পাই তাদের রচিত গ্রন্থ 'চর্যাপদ' এ।

এককথায় 'চর্যাপদ' কে বলা যেতে পারে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের গীতি আলেখ্য। কারণ তখনকার সময়ের নিম্নবর্গীয় মানুষের দিনযাপনের নানা চিত্র পাই চর্যাপদের একাধিক পদে। ঢেন্টণপাদ রচিত ৩৩ নম্বর চর্যাতে পাই —

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।"

এখানে উল্লিখিত প্রতিবেশী হীন টিলার উপরে ঘর,হাড়ীতে ভাত নেই অথচ অতিথির নিত্য আনাগোনা। প্রকৃতি নির্ভর দারিদ্র্য পূর্ণ পরিবারের কন্যা শবরীবালার পরিধানের যে অলঙ্কার তা সোনা-রূপা নয় তার বদলে প্রকৃতি থেকে পাওয়া ময়ূরপুচ্ছ,গুঞ্জার মালা ইত্যাদি।

'চর্যাপদ' এর পরবর্তী বাংলা সাহিত্য 'মনসামঙ্গল','চন্ডীমঙ্গল','ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি মঙ্গল কাব্যেও একাধিক নিম্নবৃত্ত শ্রেণী সমাজের উল্লেখ পাই। চোদ্দ শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য।তাই এক সুদীর্ঘ সময় ধরে মঙ্গলকাব্যের ধারা বিস্তৃত। বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্মে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই কাব্যগুলি। তবে এই কাব্যগুলিতে যে সমস্ত দেব-দেবীর উল্লেখ পাই তারা সকলেই লৌকিক দেবী,অনার্যকুলোদ্ভব। নিম্নবর্গীয় মানুষের সংগ্রামের পাশাপাশি দেবীর সংগ্রামের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে এই কাব্যে। যেমন 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখি দেবী মনসাকেও অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে চাঁদসদাগরের হাতে পূজা পাওয়ার জন্য। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে অনেকখানি অংশ জুড়েই রয়েছে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের স্থান একথা বেশ স্পষ্ট করেই বলা যায়।

'মঙ্গলকাব্য' এর মধ্যে যেভাবে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের দিনযাপনের নানা চিত্র ও অনার্য লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের উল্লেখ রয়েছে তাতে অনায়াসেই এই কাব্যগুলিকে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের জীবনগাথা বলা যেতে পারে। তবে তুর্কিবিজয়ের পর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয় শুরু হয়। তখন অনেক অনার্য দেবদেবীর আর্যীকরণ ঘটলেও ধর্মঠাকুরের সঙ্গে পুরাণের সংযোগ তেমন দৃঢ় হয়ে ওঠেনি।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান কাহিনী চাঁদসদাগর, প্রধান চরিত্র চাঁদসদাগর নিজে আর্য ও উচ্চবৃত্ত সমাজের অধিবাসী। কিন্তু চাঁদসদাগর ছাড়াও একাধিক পার্শ্বকাহিনী,পার্শ্বচরিত্র আছে যারা প্রায় সকলেই নিম্নবর্গীয় সমাজের অধিবাসী। যেমন —রাখালদের কাহিনী,হাসন-হুসেনের কাহিনী,জালু-মালুর কাহিনী ইত্যাদি। এইসব নিম্নবর্গীয় চরিত্রেরা কাব্যের গুণগত মান বৃদ্ধিতে যে সহায়তা প্রদান করেছে তাতে কোন সংশয় নেই।

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে নিম্নবর্গীয় মানুষের স্থান আরো বিস্তৃত। এই কাব্য দুটি খন্ডে বিভক্ত — ১.আখেটিক খন্ড ২.বণিক খন্ড । আখেটিক খন্ডের কাহিনীর কেন্দ্রে আছে অনার্য চরিত্র যথা কালকেতু ও ফুল্লরা,ব্যাধ দম্পতি। অনার্য এবং নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মধ্যেই এদের অবস্থান। তবে যদিও কাব্য কাহিনী অনুযায়ী কালকেতু ও ফুল্লরা শাপভ্রষ্ট দেবতা ইন্দ্র পুত্র নীলাম্বর ও তার স্ত্রী ছায়া। কিন্তু কাব্যে যেভাবে তাদেরকে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে প্রথম থেকেই তাদের ব্যক্তিত্বে, চরিত্রে পূর্বজন্মের অনুস্মৃতি নেই। বৃত্তিগত ও জাতিগত দিক থেকে ব্যাধ প্রাগার্য যুগের অধিবাসী ও নিম্নবর্ণের মানুষ হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছে।

কালকেতু ও ফুল্লরা ছাড়াও 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র দেবী চন্ডী, তিনিও অনার্য দেবী। দেবী চন্ডী জঙ্গলের পশু-পাখিদের আরাধ্যা দেবী। কাব্যে দেখি কালকেতুর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত পশুরা তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিল। দেবী সেই পশুদের অভয়ও দিয়েছেন —

"পশুর গোহারি শুনি সকল মঙ্গলা।
আশ্বাসিয়া সিংহেরে দিলেন কণ্ঠমালা।।

আজি হইতে মনে কিছু না করিহ ভয়।

না বধিবে মহাবীর কহিনু নিশ্চয়।।"

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে আরো বেশ কিছু নিম্নবর্গীয় চরিত্রের দেখা পাই। যেমন গুজরাট নগর নির্মাণের পর যেসব সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে আসে—কুম্ভকার,কামার,গোপ,তাম্বুলীজন,তন্তুবায়,মালী,বারুই,কলু,ধীবর,বাগদী,কোচ, পাটনী, চন্ডাল, ডোম,কিরাত,শুন্ডী ইত্যাদি সকলেই নিম্নসম্প্রদায়ের মানুষ। সব মিলিয়ে 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খন্ডকে মধ্যযুগীয় নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন আলেখ্য বলা যেতে পারে।

মধ্যযুগের শেষের দিকে রচিত হয়েছিল শিবায়ন কাব্য। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র শিব; শিবের যে সমস্ত কার্যকলাপ যেমন কৃষিকাজ, মাছধরা, নিম্নবর্গীয় নারী বাগ্দীনী, কোচিনীদের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদির দ্বারা শিব নিম্নবর্গীয় শ্রেণীসমাজের মূল প্রতিনিধি রূপে চিত্রিত হয়েছে। এককথায় শিবায়ন কাব্যে সতেরো-আঠারো শতকের গ্রাম-বাংলার দারিদ্র্যপীড়িত নিম্নবর্গীয় মানুষের সংসারের প্রাত্যহিকতার চিত্রই উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ মধ্যযুগের একেবারে শেষে রচিত হয়েছিল 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। এই কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র যে সমাজ ও সময় সচেতন ছিলেন তা তাঁর কাব্য থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। তৎকালীন সময়ে সমাজের যাবতীয় চিত্র ও নিম্নবর্গের অবস্থান কেমন ছিল তার একটা স্বচ্ছ আভাস পাওয়া যায় এই কাব্যে। যদিও নিম্নবর্গীয় চরিত্র এই কাব্যে সেই অর্থে প্রাধান্য পায়নি। তবে হরিহোড় চরিত্রটিকে উচ্চবর্গের বলা যায় না। হরিহোড় জন্মসূত্রে কায়স্থ হলেও অনান্য কায়স্থ সম্প্রদায়ের মানুষদের মতো সামাজিক আভিজাত্য ও মান্যতা হরিহোড়ের পিতার ছিল না। কাব্যে হরিহোড়ের পিতা-মাতার দারিদ্র্য, তাদের সামাজিক অবস্থান যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক দিনযাপনের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

আধুনিক যুগের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের মননলব্ধ রচনাতেও নিম্নবর্গীয় চরিত্রের উল্লেখ পাই। এই যুগের অন্যতম বলিষ্ঠ কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনাতেও নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন প্রণালীর কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। যেমন 'শাস্তি' গল্পটিতে এক রুই পরিবারের বিপর্যয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জগদীশ গুপ্তের 'দিবসের শেষে' গল্পটি এক নিয়তি লাঞ্ছিত নাপিত পরিবারের কাহিনী নিয়ে রচিত। মনোজ বসুর 'পৃথিবী কাদের' এক অত্যাচার লাঞ্ছিত চাষি পরিবারের বিপর্যয়ের গল্প। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'আন্টা বাংলা' গল্পে ওঁরাও পরিবারের মর্মান্তিক ট্রাজেডি অঙ্কিত। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যৌথ' গল্পটিতে এক ছুতোর পরিবারের বিষাদময় পরিণতির দৃশ্য পাই। মহাশ্বেতা দেবীর 'বায়েন' গল্পটি এক ডোম পরিবারের বিপর্যয়ের কাহিনী। দেবেশ রায়ের 'হাড়কাটা' গল্পটি এক কাহার পরিবারের প্রেম প্রণয়মূলক মধুর জীবনালেখ্য।

বিভিন্ন সময়ের সাহিত্য রচনা ও সাহিত্য গ্রন্থের বাইরে গিয়েও যদি দেখি তবে দেখা যায় এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরা সৃজনশীল কর্মে বেশ পারদর্শী। যেমন —আল্পনা,দেওয়ালচিত্র, নকশা ইত্যাদি যা অঙ্কন-লিখনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বলে অভিহিত হয়েছে। এদের সৃজন কর্ম লোকসাহিত্যের গবেষণার বিশেষ সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষের ব্যবহৃত বিশেষ কিছু সরঞ্জাম যা মিউজিয়ামে সংরক্ষণের জন্য গণ্য হয়েছে। এছাড়া কপালে তিলক, হাতে উল্কি কিংবা দৈহিক কোন অংশে চিত্রিত নানা ধরনের আঁকিবুকিকে এই শ্রেণীর সংস্কৃতির মধ্যে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ — প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মোটবারো' তে দুলারীর হাতের উল্কি ও প্রফুল্ল রায় রচিত 'বাঘবাহাদুর' গল্পের নায়কের সারাদেহে চিত্রবিচিত্র আঁকিবুঁকি কাটা ইত্যাদিকে এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সাথে সাথে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরা কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব যেমন টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে তেমনি সমাজের প্রবহমান ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতেও সহায়তা প্রদান করেছে। কারণ এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরাই সভ্যতার মূল কারিগর। এদের কর্মমুখরতার মধ্য দিয়েই পৃথিবী সজীব ও সতেজ থাকে। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের 'ওরা কাজ করে' কবিতায় এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের জয়গান গেয়েছেন —

"ওরা চিরকাল

টানে দাঁড়,ধরে থাকে হাল;"

এদের কর্মময়তার মধ্য দিয়েই পৃথিবী খুঁজে পায় তার নতুন দিশা, সভ্যতা আনে তার নতুন আলো।

বিভিন্ন সময়ের কাব্য-সাহিত্যে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের যে উদারতা ও মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তা পরবর্তী সমাজের কাছে আদর্শে রূপায়িত হয়েছে। যেমন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে ঈশ্বরী পাটনীর সেই উক্তি —

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

এই উক্তি কেবল ঈশ্বরী পাটনীর একার নয় সর্বকালীন এক মায়ের শাশ্বত উক্তি যা তার সন্তানের প্রতি অগাধ ভালোবাসার আর্তি রূপে চিরস্মরণীয়।

সবমিলিয়ে বলা যায় পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজ ও সভ্যতার যাবতীয় উন্নয়নের মূলে রয়েছে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষেরা। বিশ্বকর্মার অদৃশ্য শিল্পসৃষ্টি এদের হাতেই নির্মিত হয়েছে। সে হোক প্যারিসের আই এফ এল টাওয়ার কিংবা আমাদের দেশের অন্যতম সৌন্দর্যের প্রতীক তাজমহল সবই এই নিম্নবর্গীয় চরিত্রের মানুষের হাত ধরেই নির্মিত হয়েছে। সমাজের আশ্চর্য সব কারুকার্য এদের দ্বারাই সাধিত হয়েছে। কিন্তু এইসব নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের আমরা যথার্থ সম্মান দিতে পারিনি তাই আজও এই চরিত্রেরা অবহেলিত ও অপাংক্তেয় যা খুবই লজ্জাজনক। তাই আমাদের উচিত এই নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন যাতে করতে পারি তার জন্য আমাদের সকলকেই সমবেতভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আর তবেই সম্ভব হবে চিরকালীন সভ্যতার অন্তরালে থেকে যাওয়া এই নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের প্রতি যথার্থ মূল্য প্রদান করা।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়,ড.পার্থ,'বাংলা সাহিত্য পরিচয়', তুলসী প্রকাশনী,৯/৭ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-২

২.গিরি,সত্যবতী,মজুমদার,সমরেশ(সম্পাদনা)
'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' (দ্বিতীয় খণ্ড), রত্নাবলী প্রকাশনী,৫৫ ডি,কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ.৬৫৬

৩.তদেব, পৃ. ৬৬৩

৪.তদেব, পৃ. ৬৬৫

৫.তদেব, পৃ.৬৬৭

৬.গিরি, সত্যবতী, মজুমদার,সমরেশ,(সম্পাদনা)'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন',(প্রথম খণ্ড), রত্নাবলী প্রকাশনী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ.৪৪১

৭. তদেব, পৃ.৪৪২

৮. তদেব,পৃ.৪৪৪

৯.তদেব, পৃ.৪৪৮

১০.তদেব, পৃ.৪৫০

১১.তদেব,পৃ.৪৫২

১২. তদেব, পৃ.১৮১

……………………………………………

‘সাপের ঝাঁপি বুকে’— তারাশঙ্করের বেদেনীরা

ড.প্রীতম চক্রবর্ত্তী

সহকারী অধ্যাপক, শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ

বিষয় চুম্বক:

রবীন্দ্র-শরতোত্তর বাংলা কথাভুবনে রাঢ়-বাংলার রূপকার হিসেবে আবির্ভাব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কথাবৃত্তে নিজের রোহভূমি ও সেখানকার মানুষকে সপ্রাণ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তিনি। প্রান্তিক জনজীবনের কথকতায় তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস সমৃদ্ধ, সেই সূত্রে তাঁর কাহিনিতে পেয়েছি বেদে-সাপুড়েদের জীবন ও জীবিকার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। ওইসব সম্প্রদায়ের মেয়েরাও লেখকের কলমে হয়ে উঠেছে সজীব-প্রাণময়। নারীর সহজাত গুণাবলীর সঙ্গে তাদের যাপিত-জীবনের অভ্যাস— সবকিছু নিয়ে কেউ কেউ মধ্যবিত্ত নারীচেতনার মূলে তীব্র কুঠারাঘাতও করেছে। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে তেমনি কয়েকটি বেদে-রমণীর দিকে আলোকপাত করা হলো। আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে একটি উপন্যাস (নাগিনীকন্যার কাহিনী) ও কয়েকটি গল্প (‘বেদেনী’, ‘বেদের মেয়ে’ এবং ‘সাপুড়ের গল্প’); প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে লেখকের আরো কিছু গল্প-উপন্যাসের উল্লেখ ঘটেছে।

সূচক শব্দ :

তারাশঙ্কর, বেদে সম্প্রদায়, নারী, গল্প-উপন্যাস, প্রেম, কামনা, প্রতিহিংসা।

‘তারাশঙ্করের জীবনী’ লিখতে গিয়ে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য প্রথম বাক্যেই তাঁকে ‘মৃত্তিকাসম্ভব জনজীবনের অবিস্মরণীয় কথাকোবিদ’ বলে উল্লেখ করেছেন। আর ‘তারাশঙ্কর পথের ধুলায় বিচরণ করেন অনায়াসে’—লেখকের ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এমন কথাই বলেন সুমিতা চক্রবর্তী। অন্যত্রও তিনি লিখেছেন— ‘তারাশঙ্করের জীবনবীক্ষা ছিল বীরভূমের প্রান্তরের মতো বিস্তৃত। খুব ছোট জীবন, একান্ত ঘরের জিনিস নিয়ে লেখার আগ্রহ দেখা যায় না তাঁর। ... বিভিন্ন শ্রেণির, বিচিত্র জাতি-গোষ্ঠীর মানুষকে দেখতে, চিনতে, জানতে ভালোবাসতেন তিনি। আজন্ম সন্নিহিত বসবাসের ফলে জন-জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের আপনার লোক ভাবতে তাঁকে কোনো চেষ্টা করতে হয়নি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রজা-জমিদার, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের শত্রুতা সম্পর্কও যেমন সত্য, তেমনি এই সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কও ভারত ইতিহাসের আরেক সত্য।’[১] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক চক্রবর্তী ‘মধ্যবিত্ত কাহিনিমূলক উপন্যাসে’র চেয়ে ‘জনজাতি গোষ্ঠী’ নিয়ে লেখা উপন্যাসে তারাশঙ্করের শিল্প সার্থকতা বেশি লক্ষ করেছেন। এই সূত্রেই আমরা দেখি তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে সাপ-সাপুড়ে, বেদে-বেদেনী এসেছে বারে বারে। কারণ —‘জঙ্গলাকীর্ণ বীরভূম বিষধর সর্পের লীলাভূমি’। বিলীয়মান সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হয়েও সমাজের বিভিন্ন স্তরে তারাশঙ্করের ছিল আন্তরিক আনাগোনা। তাই তাঁর রচনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে তথাকথিত নিম্নবর্গ ও প্রান্তিক জনজীবন।

১৯৫৫ সালে ‘নাগিনীকন্যার কাহিনী’তে যে বেদেনীদের আমরা দেখি তাদের উৎস-সন্ধানে সুমথনাথ ঘোষ ‘তারাশঙ্কর রচনাবলী’র (খণ্ড-৮) ভূমিকা অংশে লেখকের প্রথম পর্বের উপন্যাস ‘আগুন’ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন—

‘আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম বাজিকরদের। এই জাতটি আমার চিরদিনের বিস্ময়। পুরুষেরা দেখায় ভেল্কিবাজি, নারীরা সাপ বাঁদর লইয়া নাচায়। নিজেরাও নাচে নাগিনীনৃত্য। অপূর্ব সে নৃত্য, স্থিরচরণে দেহ হিল্লোলিত করিয়া। সে নৃত্যের নাম নাগিনীনৃত্য ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না।’

‘অদ্ভুত মিষ্টভাষী এই যাযাবর জাতিটি। ... বর্বরা যাযাবরীরা মোহময়ী, সর্বাঙ্গে যেন মোহ ছড়ানো ... যাযাবরী আমাকে মোহগ্রস্তই করিয়াছিল। কিন্তু অনুশোচনা হইতেছে না। জীবনরসে উচ্ছল যাযাবরী রহস্যময়ী।’

‘আজও আমার মনের পটে যাযাবরী নাচিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে ছায়াপথের এই অংশটুকু দীর্ঘ, সুদীর্ঘ, জীবনব্যাপী দীর্ঘ হউক।’[২]

তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসে সেই 'যাযাবরী'রা এসেছে বিচিত্র মূর্তিতে। বাহ্য-প্রকৃতিতে তাদের একই শ্রেণির মনে হলেও চরিত্র-বৈচিত্র্যে প্রত্যেকে অনন্য; প্রেম-প্রবৃত্তি, প্রতারণা বা প্রতিশোধে কেউ কারোর মতো নয়, স্ব-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। রচনা-কালের অনুক্রমে তাদের ফিরে দেখা যেতে পারে।

তারাশঙ্করের অন্যতম একটি ছোটগল্প 'বেদেনী' ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৪৬)— যে গল্প-সংকলনে এটি স্থান পায়, তার নামও 'বেদেনী'। মানুষের আদিম জৈববৃত্তির এই গল্পটির কেন্দ্রে আছে এক নারী চরিত্র— যার অবস্থান আমাদের চেনা এই পরিশীলিত জগতের বাইরে। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধিকার আবির্ভাব কঙ্কালীর মেলায়, স্বামী শম্ভু বেদের সঙ্গে প্রতিবছরই কিছু জীব-জন্তু নিয়ে খেলা দেখাতে আসে। এই রাধিকার পূর্ব ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন— সে ছিল শিবপদর স্ত্রী, 'সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মতো'; পশুজন্তুর প্রতি শিবপদর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না; সে করত বেতের কাজ— ধামা বোনা, পালিশের কাজ কিংবা শৌখিন ফুলের সাজি তৈরি করে ভালোরকম উপার্জন ছিল তার, আর কোমরে বাঁধা থাকত বাঁশি। রাধিকার পোষা নাগ যখন নাচত, রাধিকা গাইত গান— বাঁশিতে সুর তুলত শিবপদ। সর্বোপরি প্রান্তিক নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষ হয়েও নিজের চেষ্টায় পড়াশোনা শিখেছিল সে। পাড়ার সামাজিক মজলিসে ডাক পড়ত তার, সেই স্থিতধী মানুষটির মতামতকে গুরুত্ব দিতেন প্রবীণেরাও। কিন্তু শিবপদর এই মার্জিত রুচির জীবন তৃপ্তি দেয়নি রাধিকাকে। সাপের ঝাঁপি, বাঁদর আর ছাগল নিয়ে ঘোরা বেদেনী রাধিকার পশু-প্রবৃত্তি বা জৈব-প্রবৃত্তির জায়গাটি ছিল তৃষ্ণার্ত, তাই 'উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠ দেহে'র শম্ভুকে দেখে স্বামী-সংসার অনায়াসের ছেড়ে যেতে পেরেছে রাধিকা।

খুব সচেতনভাবে শিবপদ ও শম্ভুর আকৃতি ও প্রকৃতিগত তারতম্যটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন লেখক- 'শিবপ্রসাদ শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ। সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি'। অন্যদিকে গল্পকারের ভাষায়— 'শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ মাখানো আছে। ক্রুর-নিষ্ঠুরতা পরিব্যঞ্জক একধারার উগ্রতামাটে রঙ আছে— শম্ভুর দেহবর্ণ উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নীচেই একটা খাঁজ, সাপের মতোই ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সে দন্তুর, সম্মুখের দুইটা দাঁত যেন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে।'— এ হেন শম্ভু দশ বছর নিরুদ্দেশ থাকার পর ছেঁড়া তাঁবু, বাঘ আর বিগতযৌবনা বেদেনী নিয়ে গ্রামে হাজির হলে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে রাধিকা।

সরোজমোহন মিত্র লিখেছিলেন— 'প্রবৃত্তি প্রধান গল্পে তারাশঙ্করের কোন জুড়ি নেই। এই প্রবৃত্তির মধ্যে জৈব প্রবৃত্তিই প্রধান। 'বেদেনী' গল্পে আছে তারই নগ্ন প্রকাশ।'[৩] তাই শম্ভু যখন রাধিকাকে বলে 'তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব', রাধিকা 'বিস্ময়ে স্তম্ভিত' হয়ে যায়। যৌনতার স্পর্শ আছে এই আচরণে। স্বামীর নির্মল প্রেম-মাধুর্যে নয়, শম্ভু বেদের উগ্র কামনা ও হিংস্র ভঙ্গিতে নিজের কামনাকে তৃপ্ত করতে চেয়েছে রাধিকা। বাঁধা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। এক দুঃসাহসী যাপনকে সঙ্গী করে জীবনের পথে এগিয়ে চলে, আচরণে প্রকাশ ঘটে পশু প্রবৃত্তির। ভোজবাজি দেখাতে গিয়ে 'বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাধটাকে চুমো খায়, সবশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয় মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল।'— এই রৌদ্ররসে ভরা জীবন রাধিকার। এমনই তার ক্রোধ-হিংসা ধারালো ছুরির মতো 'আলোকের স্পর্শে চকমক করিয়া ওঠে।'

দুই কালের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের সাহিত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, আলোচ্য গল্পে সেই দ্বন্দ্ব খুব সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শম্ভুর 'ভোজবাজি ছারকাছ' (সার্কাস)-কে ছাপিয়ে গেছে কিষ্টোর নতুন সার্কাস- 'তাদের তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অভিনবত্ব আছে।' কিষ্টোর সাজ পোষাকও প্রান্তিক বেদেদের চেয়ে বেশ খানিকটা আলাদা। বাঁদর-ছাগল-সাপ নাচিয়ে বেদেরা যে প্রথাগত খেলা দেখাত সেখান থেকে সরে এসেছে কিষ্টো। তার নতুন তাঁবুতে অভিনব খেলা দেখায় সে— 'উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মতো গাল-মোটা, স্থবিরার মতো স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জির মতো টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সার্টিনের একটা জাঙ্গিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের বডিস। কুৎসিত মেয়েটাকেও যেন সুন্দর দেখাইতেছে।' রাধিকার চোখে ভেসে ওঠে কিষ্টোর সার্কাসের 'তরুণ' বাঘটি— 'সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম; মুখে হাসির মতো ভঙ্গি যেন অহরহ লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটা শিথিলদেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে।' এই তুলনা আপাতভাবে দুটি বাঘের মধ্যে করা হলেও এ তো আসলে রাধিকার চোখে যথাক্রমে কিষ্টো আর শম্ভু। শম্ভুর 'বুড়ো বাঘের খেলা'র প্রতি দর্শক যেমন অনাগ্রহী,

এমনই শম্ভুর নৈকট্য যেন রাধিকার মনে এক বিরক্তির উদ্রেক করে। রাধিকার অবচেতন মনের এই আকাঙ্ক্ষা শম্ভুর বুড়ো বাঘের প্রতি বিরক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, যা শম্ভু বাজিকরের চোখ এড়ায় না, স্ত্রীকে শাসিয়ে বলে- 'ছোকরার উপর বড় টান যে দেখি তুর।'

বেদেনী রাধিকার মধ্যেও শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। নতুন তাঁবুর বাজনা, আর সেখানে দর্শকদের সমাগম যত বেড়েছে রাধিকা তত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আবার কখনো স্বামীর প্রতি বিরক্ত হয়ে মদের বোতল খুলে বসেছে। রাতের অন্ধকারে কিষ্টোর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেবার কথাও ভেবেছে সে। এ কি কেবল কিষ্টোর প্রতি হিংসা! না কি কিষ্টোর প্রতি নিজের গভীর আকর্ষণকে ঢাকা দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র? যুবা পুরুষটির প্রতি নিজের বিরক্তি প্রকাশের অতিরিক্ত প্রচেষ্টায় 'রাধিকা একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ করিয়া ছুঁড়িয়া বসিল।' শুধু স্বামীর কাছে নয়, নিজের কাছেও একনিষ্ঠ পত্নী হবার চেষ্টা তার। অথচ এই কৃতকর্মের জন্য মনে মনে আহতও হয়েছে সে।

পরবর্তী ঘটনায় কিষ্টোর প্রতি রাধিকার অনুরাগ স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে। যখন শম্ভুর অভিযোগের ভিত্তিতে কিষ্টোর তাঁবুতে দারোগা এসেছে চোলাই মদ খুঁজতে মধ্যযুগের 'কুলত্যাগিনী রাধা'র মতোই স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে পরপুরুষের জন্য বিপদ-বাধা তুচ্ছ করে কিষ্টোকে বাঁচিয়েছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মদের বোতল সরিয়ে ফেলেছে আর 'নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।'

রাধিকা আর শম্ভু পরামর্শ করেছিল কিষ্টোর তাঁবুতে আগুন ধরানোর— উৎসাহী ছিলো রাধিকাই। পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল তীব্র কামনার উৎসটিকে। ঘুমন্ত স্বামীকে ফেলে 'ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মতো' সে অন্ধকারের মধ্যে 'সনসন' করে কেরোসিন আর দেশলাই নিয়ে চলেছে— এ যেন কামনার সর্পিল চলন। কিন্তু মন থেকে কিষ্টোর ক্ষতি চায়নি বলেই আগুন না ধরিয়ে আগে কিষ্টোর তাঁবুতে প্রবেশ করেছে, যেখানে 'অসুরের মতো' ঘুমোচ্ছে কিষ্টো— 'কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কী সাহস! উঃ বুকখানা কী চওড়া, হাটের পেশীগুলো কী নিটোল। তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ— ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে'— আবেগে আশ্লেষে কামনা মদির রাধিকা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘুমন্ত কিষ্টোর বুকে। অন্ধকার তাঁবুতে জ্বলে উঠেছে দুই নরনারীর জৈব-প্রবৃত্তি। কিষ্টোকে নিয়ে দেশান্তরের পথে পা বাড়াতে চেয়েছে রাধিকা, 'উন্মত্ত বেদিয়া' পুরুষটিও তার 'দুরন্ত যৌবন' নিয়ে রাজী হয়েছে অনির্দিষ্ট পথে চলতে। গল্পকার এখানেই শেষ করেননি, বেদেনী রাধিকার এতদিনের অতৃপ্ত যৌনবাসনা আর শম্ভুর প্রতি 'কামবিতৃষ্ণা'র বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঘুমন্ত শম্ভুর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে 'খিলখিল' করে হেসে উঠেছে 'মরুক বুড়া পুড়্যা'।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী' (১৯৫৫) উপন্যাসে সাঁতালি গ্রামের প্রেক্ষাপটে বিষবেদে সম্প্রদায়ের যাপনে উঠে এসেছে দলপতি শিরবেদের সঙ্গে 'বেদেজাতির ধর্মবোধের প্রতীক নাগিনীকন্যা'র সংঘাত। এই সংঘাতের দুটি ছবি ধরা আছে উপন্যাসে। প্রথম পর্বে মহাদেব ও শবলার দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় পর্বে ধনঞ্জয় ও পিঙলা। ছ'মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় বেদেকন্যার; আর পাঁচ বছরের আগে সাপের কামড়ে স্বামীর মৃত্যু হলে সেই মেয়ে হয় নাগিনীকন্যা— 'একজন শিরবেদের আমলে দু-তিনজন নাগিনীকন্যার আসন পার হয়ে যায়।' কিন্তু 'বিষহরি দেবীর কাছে উৎসর্গীকৃত আজীবন কুমারীত্বের ব্রতধারিণী' মেয়েগুলি তো নিষ্কাম হতে পারে না। স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা ফুটে ওঠে তাদের দেহে-মনে। অথচ 'ব্যভিচারের অপরাধ' তাদের স্পর্শ করলে 'গোটা বেদে সমাজের মুখে কালি পড়বে'। অন্যদিকে 'বেদের কন্যের লাজ নাই, শরম নাই, বেদের কন্যের ধর্ম নাই, বেদের কন্যের ঘরের মায়া নাই, বেদের কন্যে বেদেনী অবিশ্বাসিনী।' হয়ত বেদেনী-রাধিকারই মতো। নাগিনীকন্যা শবলার মনেও এসেছিল 'বয়সের নেশা', কামের চেয়ে গভীর ছিল প্রেম— সেই জোয়ান বেদের প্রতি। ছেলেটির প্রেমেও ছিল একাগ্রতা। শবলা মানসিক-দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের চক্রান্তে রাজগোখরোর কামড়ে প্রাণ গিয়েছিল জোয়ান বেদেটির। শবলার শরীর-মনের তৃষ্ণা তখনও মেটেনি। তাই 'কচি ধন্বন্তরী' শিবরামের কাছে 'মাতৃকুক্ষীতে সদ্যসমাগত সন্তান-হত্যার ভেষজ চেয়েছে সে'। কারণ তার চোখেও নামে অবাধ্য স্বপ্ন। আসলে 'বেদের মেয়ে মায়াবিনী, বেদের মেয়ে ছলনাময়ী, বেদের মেয়ে সর্বনাশী, বেদের মেয়ে পোড়ারমুখী।' সেই 'সমাজে অবাধ উদ্দাম জীবনলীলা', তারই প্রভাবে এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কামনা জেগেছিল শবলার মনে; শরীরী পিপাসায় দেহে ধরেছিল জ্বালা— 'বুকে আমার সাতটা চিতার আগুন, সর্ব অঙ্গে আমার মরণ জরের তপ'। 'জলচারিণী সরীসৃপ'এর মতো শিরবেদে মহাদেবের কাছে গিয়ে তার 'কলিজার উপর' বিঁধে দিল বিষাক্ত কাঁটা। জলে ঝাঁপ দিল শবলা। চল্লিশোর্ধ প্রেয়সী দধিমুখীর বদলে তরুণী শবলা— মহাদেবের কামনাও কি প্রজ্জ্বলিত হয়নি! শবলার যুক্তি— 'শিব নিজে ধরমভেরষ্ট হয়্যা কুচনীপাড়ায় ঘুরে আপন কন্যের রূপে মোহিত হয়।' তাদের 'জৈবিক জীবনের' স্বেচ্ছাচারের আদলে নিজেদের

আরাধ্য দেবতাকেও সাজিয়েছে তারা; আর 'ওদের পূজা নিতেই দেবতাটি অম্লান মুখে গ্রহণ করেছে উৎশৃঙ্খলতার অপরাধ, ধরেছেন বর্বর নেশাপরায়ণের রূপ...'। তবে শবলা মুসলমান বেদের সঙ্গে ঘর বাঁধতে গিয়েও সফল হয়নি। মাতৃত্বে ব্যর্থতা হয়েছে অন্তরায়। 'পোড়াকপালী বেদের বেটি', খর চলন-বলন-চাউনি তাদের মাতৃমূর্তি নয়, দিয়েছে এক অভিশপ্ত জীবন। পিপাসার উজানে ভাসলেও 'সর্বনাশীরা ফিরেছে— ধর্ম বিসর্জন দিয়ে। কিছুদিন পরই অঙ্গে দেখা দিয়েছে মাতৃত্বের লক্ষণ। তখন ওই সন্তানকে নষ্ট করতে গিয়ে নিজে মরেছে। কেউ পালাতে চেয়েছে। কেউ পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়েও রক্ষা পায়নি তারা। রক্ষা পায় না। হয় মরেছে বেদে সমাজের মন্ত্রপূত বাণের আঘাতে— নয়তো নাগিনীধর্মের অমোঘ নির্দেশে প্রসবের পরই নখ দিয়ে টুঁটি টিপে সন্তানকে হত্যা করেছে। ডিম ফুটে সন্তান বের হবামাত্র নাগিনী সন্তান খায়— নাগিনীকন্যাকেও সেই ধর্ম পালন করতেই হবে।'

হতভাগিনী শবলা পতি-পুত্র-পরিবার না পেলেও প্রাণে বেঁচেছিল, প্রতিবাদিনী হয়েও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। কিন্তু পরবর্তী নাগিনীকন্যা পিঙলা বাঁচেনি। মহাদেবের পরবর্তী শিরবেদে গঙ্গারামের 'অন্তরের অন্ত:স্থলে স্বেচ্ছাচারের কামনা কুটিল পথে আত্মপ্রকাশ' করেছিল। সে পাপী ভ্রষ্ট ব্যভিচারী— 'জটিল তার চরিত্র, কুটিল তার প্রকৃতি। সে ডোমন করেত। বেদে পাড়ায় সে অবাধে চালিয়ে চলেছে তার পাপ।' নাগিনীকন্যা পিঙলার উপর পড়েছিল তার কুদৃষ্টি, তাকে আয়ত্ত করতে গঙ্গারামের জটিল পন্থা— 'কন্যাটির মনে সে বিশ্বাস জন্মাতে চেয়েছিল, তার অঙ্গে চাঁপার গন্ধ ওঠে। কল্পনা করেছিল, এই বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত উদভ্রান্ত হয়ে পিঙলা একদিন রাতে বের হবে, নয়তো পালাতে চাইবে। পালালে এসে তাকে নিয়ে পালাত। মুরশিদাবাদে সে যেত ওষুধের উপকরণ আনতে। সেখান থেকে সে এনেছিল চম্পকগন্ধ, নিত্য মধ্যরাতে সে এসে পিঙলার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে সেই গন্ধের আরক ছিটিয়ে দিত।' এর পিছনে ছিল শিরবেদের 'মহাপাপের বাসনা'। এই গন্ধের সঙ্গে পিঙলা মিশিয়ে ফেলে মিলন ঋতুতে সাপিনীর অঙ্গের সুবাসকে। মনে পড়বে তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্প— 'পায়ের কাদা ধুইয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, গন্ধ কিসের বল দেখি জোবেদা?... খোঁড়া কথা কহিল না, সে শুধু ঘনঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল।... খোঁড়া বলিল, বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে, তাই। ওই গন্ধেই সাপ চলে আসে।' আর বিষবেদেদের বিশ্বাস— 'সাঁতালি নাগিনীকন্যের ওই হইল সব্বনাশের হেতু, পরানের ঘরের আগুন। সে আগুন ঘরে লাগলে ঘরের সাথে নিজে পুড়্যা ছারখার হয়্যা যায়। নাগিনীকন্যের অঙ্গে চাঁপার বাস ফুটলে— হয় কন্যে আত্মঘাতী হয়, লয়তো কুলে কালি দিয়্যা বেদেকুলে পাপ চাপায়ে অকূলে ভাসে।' আর সেই উন্মাদরোগে আক্রান্ত পিঙলা, মিথ্যা অপরাধবোধে 'মেয়েটির কষ্টের যে অন্ত নাই, মস্তিষ্ক থেকে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত অহরহ এই যন্ত্রণায় নিপীড়িত হচ্ছে।' নাগু ঠাকুর— শবলার অনুরোধে যে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল, গঙ্গারাম যাকে বন্দি করেছিল। পিঙলা মানুষটিকে মুক্তি দিলেও থেকে গিয়েছিল নাগু ঠাকুরের 'মহানাগের ঝাঁপি'। সেই শঙ্খচূড়ের ছোবল নিজের বুকে নিয়ে 'বিশীর্ণা তপস্বিনী' পিঙলা নিজের জীবন যন্ত্রণা জুড়িয়েছে আর 'নিষ্কাম ব্রতে' ঢাকা পড়া অতৃপ্ত কামনা আর জীবন বাসনা থেকে মুক্তি পেয়েছে বিধবা বেদেনীরা।

'বেদের মেয়ে' ('শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৫৬) গল্পটির কেন্দ্রে আছে শিবি বেদেনী— 'বিখ্যাত চোর চন্দর বেদিয়ার ভাগ্নির মেয়ে'। যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে তারা গ্রামে বসতি স্থাপন করলেও সেই বেদে দলের পুরুষেরা যেমন চৌর্যবৃত্তিকে ত্যাগ করতে পারেনি, তেমনি 'ওদের মেয়েগুলি পুরুষদের মতই স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র-চরিত্র। রীতিও বিচিত্র। পুরুষেরা যখন ঘরে থাকে তখন ওরা হিংস্র এবং বন্য, সামান্য কথাতেও নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আক্রমণ করে। যখন পুরুষেরা জেলে যায় মেয়েরা তখন পোষ-মানা হরিণীর মত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের পিছনে পিছনে বেড়ায়, করুণ মদির-দৃষ্টিতে চেয়ে তাদের আকর্ষণ করে।' গুপ্তপাড়ার চন্ডীমণ্ডপের রামায়ণ গানের আসরে গিয়ে শিবিও সেভাবেই এগিয়েছিল গুপ্তমশায়ের দৌহিত্র প্রভাতের দিকে— 'বয়সে পনেরো ষোলো বছর, গৌরবর্ণ; আয়তনয়ন; ছেলেটি খদ্দরের জামা গায়ে চটি পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।' তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার বাসনায় শিবি বেদেনী প্রায়-তরুণ প্রভাতকে বিড়ি চাইলে ভয়ে কেঁদে বাড়ির অভিভাবকদের কাছে মেয়েটির নামে নালিশ করেছিল সে। অবাক শিবি কৌশলে গা ঢাকা দিয়েছিল তখন।

বেশ কয়েক বছর পরে আবার দুই নরনারীর সাক্ষাৎ-- ততদিনে শিবি 'দাগী চোর' ভোলার স্ত্রী। পুকুরধারে বটগাছের 'শিরডগালে' লাল কাপড় বেঁধে 'বীর' ভোলা জয় করেছিল শিবির মন; 'ভোলা যখন ঘরে থাকে, শিবি তখন ব্যাঘ্রী। যখন সে জেলে যায়, তখন স্বৈরিণী।' ভোলা তখন অবশ্য জেলে যায়নি; পথে প্রভাতকে দেখে শিবি প্রণাম করতে গেলে নারীটিকে 'ঘৃণাভরে' প্রত্যাখ্যান করে

পুরুষটি। সেসময় শিবির মধ্যে ‘ছেলেবেলার নেশার’ বদলে এসেছে এক ‘তীক্ষ্ণবাস্তব বুদ্ধিমতী ছলনাময়ী’। সে গুপ্তপাড়ায় ঘোরে আর প্রভাতের জানালার কাছে গান গায়। ফিরে যায় প্রভাত। কিন্তু আরো কয়েক বছর পর যখন ভোলা জেলে, প্রভাত তখন স্বদেশী কাজে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছে। ‘বেদের মেয়ে’ শিবি ডাকবাংলোয় পুলিশের কাছে দেহ বেচতে গিয়ে প্রভাতবাবুর আসন্ন বিপদের খবর পায় এবং পুলিশের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই ঘটনা অনিবার্যভাবে মনে করায় তারাশঙ্করের ‘গণদেবতা’ উপন্যাসের দুর্গাকে; ছিরুর কৌশল আর পুলিশের হাত থেকে নজরবন্দী-যতীনকে সে-ই বাঁচিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত তারাশঙ্করের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ ধরনের ঘটনার সংযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বনফুলের ‘অগ্নিশ্বর’ উপন্যাসেও এই ধরনের ঘটনা আমরা দেখেছি। শিবি প্রভাতকে বাঁচানোর জন্য চটুল গান ধরেছিল, হয়েছিল ছলনাময়ী। শেষরক্ষা হয়নি, পুলিশের গুলি পায়ে লেগেছিল প্রভাতের। সেবার প্রভাত প্রাণে বেঁচে গেলেও গল্পের পরিণতিতে কিন্তু শিবির ছুরিতেই প্রাণ গিয়েছিল প্রভাতের। ভোলাকে বাঁচাতে গিয়ে না জেনেই পছন্দের পুরুষের বুকে আঘাত হেনেছিল। ভাবতেও পারেনি পুলিশের সঙ্গে আসা লোকটি প্রভাতবাবু— মনে হয়েছিল ‘ছুরি যেন সে নিজের বুকেই বসিয়েছে’; প্রভাতের লোনা রক্ত ছিটকে পড়েছিল তার মুখেও। সূক্ষ্ম গোপন প্রেম, যা শিবি তরুণ বয়স থেকে মনের গহনে বহন করেছিল, তার এমন নির্মম সমাপ্তি শুধু বেদেকন্যাকে নয়, পাঠককেও স্তম্ভিত করে দেয়।

‘সাপুড়ের গল্প’ (১৩৬৫, ‘তরুণের স্বপ্ন’)-এর কেন্দ্রে আছে কালী বেদেনী। বেদের দলের ‘মেয়েগুলো আশ্চর্য’ আর ‘সেই মেয়েদের মধ্যেও আশ্চর্য’ কালী; গল্পকার তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— ‘মেয়েটা তরুণী নয়, যুবতী— কিন্তু যেন ষোলো-সতের বছরের মেয়ে। ছিপছিপে চেহারা, মিশমিশে কালো রঙ, ঠোঁট দুটো আরো কালো, তারও চেয়ে কালো রুক্ষ কালো চুলের রাশি। সে অল্প নয়, একরাশ। ওদের দলের কাছেও ও বিচিত্র। তিন-তিনবার বিয়ে করে স্বামী ছেড়েছে। আচারে বিচারেও ওর অনেক স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু তবু ওকে সহ্য করে চলে দলের লোক। ওর যত সাহস তত বুদ্ধি। বাবু ভাই, দারোগা, জমাদার— এদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ও একেবারে উকিল মোক্তার। তার উপরে মোহিনী জানে। পুরুষেরা ওকে পছন্দ করে না কিন্তু না মেনে পারে না। মেয়েরা ওকে এক বাক্যে মনে প্রাণে ভালোবাসে; ও যাই হউক, যাই করুক কারুর বাড়া ভাতে হাত বাড়ায় না; কারুর ঘর ভাঙে না।’— আর মেয়েটির ‘বঁধু’ কালী নাগ— ওই নাগ তার কাছে ‘নাগর’। আবারও মনে পড়বে সেই ‘নারী ও নাগিনী’র খোঁড়া শেখকে, যার বাঁ-পা শুধু ভাঙাই নয়, যৌনব্যাধিতে মুখ বিকৃত, বসন্তের দাগে কুৎসিত; সে ইটের পাঁজা থেকে উদ্ধার করা সাপিনীকে সিঁদুর পরিয়ে ‘নিকে’ করেছিল, নাক ফুঁড়িয়ে পরিয়েছিল ছোট্ট ‘মিনি’, মুগ্ধ হয়েছিল সেই উদয়নাগের বাহারে। ‘বিবি’র মতোই চুমু খেয়েছিল তাকে। বিরক্ত হয়েছিল খোড়ার বউ জোবেদা, বাঁ’হাতে ঘুঁটে ছুড়ে মেরেছিল সাপিনীকে। জবেদার বাঁ’পায়ে কামড় দিয়েছিল সাপিনী। নারী আর নাগিনী, ‘মেয়েজাতের স্বভাব’ বশে দ্বন্দ্বে-সংঘাতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু বর্তমানে ‘পশুকামিতা’ বা ‘পশ্বাচার’ প্রভৃতি পরিভাষার ব্যবহার সচল, তাই এগুলিকে নিছক ‘বিকৃত যৌনতা’ বলা যায় না। আর ‘সাপুড়ের গল্প’-এ কালী বেদেনীর ‘নাগর’ সেই ‘সাপা’ মারা পড়ল শুশুনিয়া পাহাড়ে সন্ন্যাসীর ‘ধুলো পোড়া’য়। ‘ঝরঝর কান্না’ পেরিয়ে কালী সেই লোকটিরই ভৈরবী হয়েছিল। বিনিময়ে পেয়েছিল শঙ্খচূড় সাপ।

কয়েকমাস উড়িষ্যার প্রান্তে প্রান্তরে ভৈরবের সঙ্গে ভৈরবী বেসে ফিরেছে কালী। তারপর এসেছে প্রতিশোধের চরম মুহূর্ত— মত্ত ভৈরবকে নেশাগ্রস্ত ভৈরবীর দংশন করা চুম্বন। একেবারে যেন ‘সাপিনীর কামড়’। বেহুঁশ সন্ন্যাসী ঠোঁটে তখনো জমে আছে কাঁচা রক্ত। আর ‘সর্বনাশী’ কালী সেখানে ঝিনুকে করে ঢেলে দেয় শঙ্খচূড়ের বিষ। বেদেনীর তীব্র প্রতিশোধ বিষ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার নাগহন্তার সর্বশরীরে— ‘যত বিষ তত রাগ, তত হিংসে।’ বাঁচিয়ে রাখে না সন্ন্যাসীর দেওয়া সেই শঙ্খচূড়কেও— সাপুড়ের মেয়ের প্রতিশোধস্পৃহায় তার গর্জনও থেমে যায় চিরকালের জন্য।

এভাবেই তারাশঙ্করের বেদেনীরা ছড়িয়ে আছে আরো-গল্প-উপন্যাসে। অনেক সময় বেদেনী না থাকলেও সাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তাঁর রচনায়, স্মরণে আসবে ‘রাজসাপ’-এর মতো গল্প। সাপের প্রসঙ্গ আছে ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’র সূচনা থেকে কালোশশীর মৃত্যুদৃশ্য; অন্যদিকে ‘বনওয়ারীর ঘরে ঢুকেছে কালসাপিনী, সুবাসী কালসাপিনী’,— কালোবউয়ের বিধবা বোনঝি। ‘নারী ও নাগিনী’র জোবেদার মত ‘গণদেবতা’র পদ্মও নিঃসন্তান, সেও গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে ‘মস্ত বড় একটা কালো কেউটে’ তাকে জড়িয়ে ধরছে। পদ্মের অবচেতন অনুভূতিতেও হয়তো মিশে গেছে ছিরুর কামতাড়িত দৃষ্টির বিষ। আর সেই বিষের ক্ষয় যতীন আর উচ্চিংড়ের ‘মা-মণি’ ডাকে। তবে তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাসে বেদেনীদের মাতৃসত্তা নয়, নারীত্বের প্রেম-পিপাসাকেই সার্বিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

সূত্র-সংকেত :

১. সুমিতা চক্রবর্তী, 'উপন্যাসের বর্ণমালা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১৬, পৃ. ১৪৭
২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রচনাবলী' ৮ম খণ্ড (ভূমিকা অংশ), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ১৪২৬, পৃ. [৫]
৩. সরোজমোহন মিত্র, 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১১, পৃ. ২৪৪

....

কল্লোল-পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের নির্মাণ (নির্বাচিত)

রাহুল মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত), কলকাতা

সারসংক্ষেপ

'নিম্নবর্গ'বলতে বর্ণাশ্রম প্রথায় একেবারে নিচুস্তরে থাকা ব্যক্তিবর্গকে বোঝায় যারা উচ্চবর্গের দ্বারা শোষিত, অবহেলিত এবং বঞ্চিত হয়ে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে নিম্নবর্গের দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে অন্ত্যজ মানুষেরই বয়ানে। এরপর বাংলা মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে বিশ শতকে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের আগে পর্যন্ত এই প্রান্তিক মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্যের কেন্দ্রীয় আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। ফলত সমাজের মতো সাহিত্যের পরিসরেও নিম্নবর্গের মানুষরা একঅর্থে প্রান্তিক।

সাধারণত নবজাগরণের কাল বলে পরিচিত উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙালির একাংশ সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতার ধারণাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত বাঙালির হাতেবাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছে। এই সময়পর্বে লেখা উপন্যাসে নিম্নবর্গের উপস্থাপনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে, অন্ত্যজ নারীর চরিত্রায়নে উচ্চবর্গের কোন মানসিক প্রবণতাগুলি প্রকাশ পেয়েছে এবং ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজে অস্পৃশ্যতার ধারণা গুলিকে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রমুখের নির্বাচিত উপন্যাস এবং বাংলা শিশুপাঠ্য বা 'প্রাইমার' অবলম্বনে আলোকপাত করা হবে।

সূচক শব্দ-

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস, নিম্নবর্গের চরিত্রায়ন, শিক্ষিত বাঙালি, বাংলা 'প্রাইমার', সামাজিক বৈষম্য, বর্ণজনিত অস্পৃশ্যতা, নিম্নবর্গের অপরাধ প্রবণতা, নিম্নবর্গীয় নারী, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের অবস্থান

বাংলা শব্দভাণ্ডারে 'নিম্নবর্গ' শব্দ একেবারে অর্বাচীন সংযোজন। ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ ইংরেজি 'Subaltern' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।[১] রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) 'সংসার' (১৮৮৫) উপন্যাসে দেবীপ্রসন্নবাবুর স্ত্রীর কটাক্ষ প্রশ্নের উত্তরে বিন্দু বলেছিল তাদের তালপুকুর গ্রামে 'তিরিশ চল্লিশ ঘর ভদ্রলোক আছে, আর অনেক ইতর লোকের ঘর আছে।'[২] উপন্যাসে উল্লিখিত 'ইতর' মানুষরাই সমাজের নিম্নবর্গ। রণজিৎ গুহ ভারতবর্ষের সমাজে শাসক ও শোষিতের সম্পর্কের নিরিখে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের বিভাজন করেছেন। উচ্চবর্গ বলতে তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রভুশক্তির অধিকারী দেশি ও বিদেশী ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়েছেন।[৩] জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও লিঙ্গগত অবস্থানের নিরিখে উচ্চবর্গের দ্বারা শোষিত শ্রেণির মানুষেরা নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাস ও সাহিত্যের মূল উপজীব্য সমাজ হওয়ায়, ইতিহাসের গণ্ডি অতিক্রম করে নিম্নবর্গ ক্রমশ সাহিত্যের পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে নিম্নবর্গের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের আগে পর্যন্ত তারা কেন্দ্রীয় আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্যের মূল অবলম্বন ছিল ধর্ম। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বাঙালির যুক্তিবাদী মন কল্পনার স্বর্গ ছেড়ে সাহিত্যে তুলে ধরেছিল সমকালীন সমাজকে। এইসময়ে বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে মূলত শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, চাকুরীজীবী, ভদ্রলোক শ্রেণির হাতে। সাহিত্যের পাশাপাশি তাঁদের চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন সভা-সমিতি, পত্রপত্রিকা এবং বাংলা শিশুপাঠ্যে। এই উচ্চবর্গের কলমে নিম্নবর্গের চরিত্রায়ন কীভাবে ঘটেছে তা নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে পর্যালোচনা করা হবে।

অম্বিকাচরণ গুপ্তের (১৮৫৮-১৯১৫) 'শান্তিরাম' (১৮৮৫) উপন্যাসে সদ্যোজাত শান্তিরামের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন, "কালীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, কাহাকেও দেখিতে মন্দ ছিল না। সুতরাং শান্তিরামকেও দেখিতে গৌরবর্ণ- তাহার মুখ, চোখ, নাক, কাণ ভদ্রলোকের মত হইয়াছিল।[৪] চরিত্রের বর্ণ ও শারীরিক গঠনের উপর ভর করে ঔপন্যাসিক এখানে ভদ্রলোক ও ইতর শ্রেণির

পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। বর্ণের ভিত্তিতে এই সামাজিক বিভাজনের ধারণা বৈদিক যুগ থেকে সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের জাতি-বর্ণ বন্দোবস্তে ব্রাহ্মণের বর্ণ শ্বেত, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্য পিঙ্গল এবং শূদ্র চিহ্নিত হয়েছে কৃষ্ণ বর্ণ দ্বারা। শ্বেতবর্ণ শুভ ও পবিত্রতার সঙ্গে এবং কৃষ্ণবর্ণ অশুভ এবং অপবিত্রতার অনুসঙ্গে গণ্য করা হতে শুরু করে।[৫] এজন্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীকে বলতে শোনা যায়,

"অম্বিকা বলেন কিছু ব্যাধের নন্দনে।

পবিত্র হইলে মোর পদ-দরশনে।।"[৬]

অর্থাৎ দেবী দর্শনে কালকেতুর ব্যাধ জীবনের অপবিত্রতা ঘুঁচল। নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি এই অস্পৃশ্যতার ধারণা উনিশ শতকেও সমাজে বহমান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) উপন্যাসে কালীদীঘির ডাকাতরা ছিল কৃষ্ণবর্ণের। নির্জন স্থানে ইন্দিরার উপর আক্রমণকারী যুবককে দেখে তার মনে হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির কুলি মজুরের মতো। 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসে 'বিকটমূর্তি' পুরুষকে অমরনাথ- "দেখিবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয় পাষণ্ড- বোধ হয় ডোম কি সিউলি-কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।"[৭] এই অন্ত্যজ মানুষের ছায়া স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণরা শুদ্ধতা হারায়।[৮] এজন্য কুসুমকুমারী দেবীর (?-১৯১৫) 'স্নেহলতা' (১৮৯০) উপন্যাসে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও অমৃতলাল মুচির ঘরে চিকিৎসা করায় যদুনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর কন্যার সঙ্গে অমৃতলালের বিয়েতে সম্মত হননি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) 'মুক্তামালা'য় (১৯০১) অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত মুমূর্ষু পথচারীর সেবা-শুশ্রূষা করায় সমাজপতিরা সুবলকে একঘরে করেছিল। এই সামাজিক ভীতির কারণেই অসহায় স্ত্রীলোককে আশ্রয় দেওয়ার আগে ইন্দিরার জাতি-পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়েছে তার আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে। ইন্দিরার রূপ দেখে বৃদ্ধের মনে হয়েছে 'ছোটঘরে এমন রূপ হয়না।' সনাতন আদর্শের প্রতি আস্থাশীল বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাত-ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা তাঁর 'সহজ রচনা শিক্ষা' গ্রন্থে। পত্র রচনার বিধিলিপি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "শূদ্রকে পত্র লিখিতে গেলে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ পাঠ লেখাই উচিত। ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিতে হইলে শূদ্রের প্রণাম পাঠ লেখাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এখন অনেক শূদ্র ইহা মানেন না।"[৯] শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের আর মান্য করছে না বলে তাঁর প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বাঙালি নিজের চিন্তাধারাকে পরবর্তী প্রজন্মকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলা শিশুপাঠ্য তথা 'প্রাইমার' লিখতে শুরু করে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের (১৮১৭-১৮৫৮) 'শিশুশিক্ষা-৩'য় (১৮৫০) 'চুরি করা বড় দোষ' শীর্ষক ঋজুপাঠে গোপালকে শেখানো হয়, পায়ে বেড়ি পরে মাটি কাটতে থাকা 'গৌরবর্ণ' যুবকটি বিদ্যান হয়ে সুখের দিন কাটাতে পারতো, যদি না তার চুরি করার অভ্যাস থাকতো।[১০] উচ্চবর্গের কলমে দেহের বর্ণ শ্রেণি-পরিচয়ের পাশাপাশি হয়ে উঠেছিল পেশাগত পরিচয়ের সূচক। বৈদিক যুগ থেকে বর্ণাশ্রম প্রথার মাধ্যমে সমাজের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে শূদ্রদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল শ্রমসাধ্য এবং উচ্চবিত্তের চোখে ঘৃণিত পেশা গুলি। অন্যথায় তাদের জন্যে পড়ে থাকত ভবঘুরে ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা অপরাধমূলক পেশা গুলি।[১১] মধ্যযুগে লেখা মঙ্গলকাব্যে বেশ কিছু উপজাতির মানুষ দৈহিক শক্তির জোরে বীরত্বের শিরোপা অর্জন করেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর বিক্রমে জঙ্গলের পশুরা সন্ত্রস্ত ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্য কালু ডোম ও লখাই ডোম চরিত্র বীরত্বের জন্য উজ্জ্বল। ঔপনিবেশিক শাসনে এই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের চিহ্নিত করা হয় অপরাধপ্রবণ উপজাতি বা ক্রিমিনাল ট্রাইব হিসেবে।[১২] বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী', দামোদর মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৩-১৯০৭) 'দুই ভগ্নী', (১৮৮১) 'যোগেশ্বরী' (১৮৯৮) প্রভৃতি উপন্যাসে নিম্নবর্গের চরিত্রেরা মূলত অসামাজিক কাজে লিপ্ত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের হীরা কিংবা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'দুই ভগ্নী' উপন্যাসের মাধী আত্মহত্যার প্ররোচনার জন্যে বিষ সংগ্রহ করেছিল চণ্ডালের বাড়ি থেকে। 'যোগেশ্বরী' উপন্যাসে অত্যাচারী জমিদার শ্যামলালের যাবতীয় কুকর্মের পেয়াদা গদাধর ছিল জাতিতে চণ্ডাল। উপন্যাসে শ্যামলালের যাবতীয় কুকর্মের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে তার জন্ম-পরিচয়ে। এজন্য মৃত্যুশয্যায় শ্যামলালের মাতাকে (প্রকৃত মা নন) বলতে শোনা যায়– "ইতরের পুত্র কখনও ভদ্র হইতে পারে কি? আমি নিজেই শ্বশুরবংশের সর্বনাশ করিয়াছি।"[১৩] এছাড়াও 'ইন্দিরা' উপন্যাসে কালীদীঘির ডাকাত, ঘুমন্ত ইন্দিরার উপর আক্রমণকারী যুবক কিংবা 'রজনী' উপন্যাসে রজনী ও অমরনাথের উপর হামলাকারী ব্যক্তি ছিল নিম্নবর্গের মানুষ। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০-১৯০৮) 'বিশ্বনাথ' (১৮৯৬) উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র বিশ্বনাথ ওরফে বিশে ডাকাত ছিল বাগদী জাতির মানুষ। অত্যাচারী ধনীদের লুট করে সে গরিবদের হিতকাজে লুটের সম্পদ ব্যবহার করতো। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ চরিত্র প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য-

"তাহার কৃত লোকহিত এখনও বাঙ্গালার গৃহে গৃহে উল্লাসে কথিত হইয়া থাকে।/ অথচ এই বিশে ডাকাত বঙ্গসমাজের অতি নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।"[১৪] এখানে 'অথচ' শব্দের প্রয়োগ ঔপন্যাসিকের মননে বীরত্ব, মহত্ব ও ঔদার্যের ধারণার সঙ্গে বাগদি জাতির বৈপরীত্যের অবস্থানকে ইঙ্গিত করে। উপন্যাসের চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ ডাকাতের অন্যতম সাগরেদ ভগবান মদকের ডোম হওয়ার জণশ্রুতি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য- "সেই প্রেমচাঁদ ডোম এই ইতিহাসে ভগবান্ মদক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। মহাশয়েরা যদি কেহ "অজানত" তাহার দোকানের মিষ্টান্নগ্রহণকল্পনা করিয়া জাতি হারাইবার আশঙ্কা করেন, সেই জন্য বলিতেছি, ভয় নাই ! ভগবান মিষ্টান্নোপজীবীর বংশধর বটে। প্রেমচাঁদ তাহার গুরুদত্ত নাম। এবং সে বলরামসম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া লোকে তাহার "হাড়ি" বা "ডোম" উপাধি রটাইয়াছে।"[১৫] জাত-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার বদলে ঔপন্যাসিককে পাঠকের জাত খোয়ানোর আশঙ্কা দূর করতে দেখা যায়। অথবা ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র এখানে জাতের মতো অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পাঠকের ভীতি নিয়ে রসিকতা করেছেন। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিকের অবস্থান আসলে বুঝিয়ে দেয় তৎকালীন সামাজিক কাঠামোয় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পক্ষেও জাতিগত বৈষম্য ধারণার সরাসরি বিরোধিতা করা সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় সব নারী এক অর্থে নিম্নবর্গ, তবে অন্ত্যজ নারীর অবস্থা আরও খানিকটা ভিন্ন রকমের ছিল।[১৬] নিম্নবর্গীয় নারীদের প্রতি উচ্চবর্গের মনোভাব স্পষ্টভাবে চেনা যায় 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) উপন্যাসে প্রফুল্লের মায়ের নামে কলঙ্ক রটার পর হরবল্লভের প্রফুল্লকে 'বাগদী বেটি' সম্বোধনে। একজন উচ্চবর্গীয় চরিত্রের এই বয়ানে বাগদি সম্প্রদায় চিহ্নিত হয়েছে অপশব্দের সমার্থক হিসেবে। চর্যাপদের যুগ থেকে প্রান্তিক মানুষেরা সমাজে ব্রাত্য হলেও অন্ত্যজ নারীদের প্রতি উচ্চবর্গের মানুষেরা প্রলুব্ধ ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যের লোকায়ত শিব ছিলেন ডোম ও কোচনী রমনীদের প্রতি আসক্ত। অন্ত্যজ নারীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রকার জীমূতবাহন বলেছেন, কোনও ব্রাহ্মণ বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া নিম্নবর্গের কোনো স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে নৈতিক অপরাধ হয় না। সংসর্গ দোষ হয় মাত্র। সামান্য প্রায়শ্চিত্তে সেই দোষ ও খণ্ডন করা যায়।[১৭] এই বিধানের মাধ্যমে উচ্চবর্গের ব্যভিচারকে লঘু করে শাস্ত্রকার নিম্নবর্গীয় রমণীদের মানুষ হিসেবে এবং একইসঙ্গে নারী হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদাকে অস্বীকার করেছেন। উনিশ শতকে বড়লোক বাবুদের উপপত্নী রাখা সামাজিক মর্যাদায় বিষয় হলেও নিম্নবর্গীয় রমণীদের প্রতি আসক্তি ছিল উচ্চবর্গের চোখে ঘৃণ্য রুচির পরিচায়ক। সমাজের অন্ত্যজ স্তরে পালিত নানা বৈবাহিক আচরণের প্রতি উচ্চবর্গের প্রবল অবজ্ঞা ছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'কৃতজ্ঞতা' (১৮৯৬) উপন্যাসে বালবিধবা সুরবালার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গে বারো বছরের বালিকা সুরবালা ভগীদাসীকে জানিয়েছে, "মর্, আমি কি না তোর মতন কৈবর্ত্তের মেয়ে, তাই আবার বিয়ে হবে !"[১৮] সমাজের অন্ত্যজ নারীদের চারিত্রিক স্থিরতা নেই, অর্থের বিনিময়ে নিজের মান-সম্ভ্রমকে বিকিয়ে দিতে তারা প্রস্তুত এবং তথাকথিত ভদ্রঘরের স্ত্রীলোককে তারা বিপথগামী করে, নিম্নবর্গীয় রমণীদের চরিত্রায়নে উচ্চবর্গের বিশেষ মনোভাবগুলি একাধিক উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ফুলমণি, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মালতী গোয়ালিনী, শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) 'যুগান্তর' (১৮৯৫) উপন্যাসের কামিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলি অর্থের বিনিময়ে ব্যভিচারের এই সহজ সমীকরণে সৃষ্ট। এমনকি 'শান্তিরাম' উপন্যাসের সুভদ্রা গোয়ালিনী আপন কন্যা বিধুকে জোর করে তুলে দিয়েছে জমিদার শান্তিরামের হাতে এবং অর্থের লোভে সন্তানের হত্যার খবর পর্যন্ত গোপন করেছে। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৫৮-১৯০৯) 'আমাদের ঝি' (১৩০২) উপন্যাসটি "উত্তম পুরুষে লেখা লেখকের আত্ম-অভিজ্ঞতার কাহিনী।"[১৯] উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে নামপরিচয়হীন এক বালবিধবা পরিচারিকা, যে পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয়েছে আসমানতারা নামের বাইজিতে। স্ত্রীর অনুরোধে শ্বশুরগৃহ থেকে আনা বালবিধবা ঝি গৃহকর্তার প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করে এবং গল্পকর্তার পরিবারের নানা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে। কাহিনির শেষে দৈবক্রমে ঝি চরিত্রটি ভিখারিণীতে পরিণত হয়। এই ঝি চরিত্রের সূত্রে কলকাতার পরিচারিকাদের সম্পর্কে লেখকের উপলব্ধি- "ইহারাই কলিকাতার ঝি! পোনের আনা উনিশ গণ্ডা ঝিই প্রায় এইরূপ ! ...ধন্য কলিকাতা ! ধন্য তোমার নৈতিক উন্নতি ! ! তোমার সংসর্গে আসিয়াই, পল্লীগ্রামের অনাথা স্ত্রীলোকগণ তাহাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কলঙ্কিত করে !"[২০] অন্যদিকে লেখকের পত্নী জমিদার কন্যা সুরবালা সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও স্বামীর প্রেমে একনিষ্ঠ এবং স্বামীর প্রতি আসক্ত জেনেও ঝি-র প্রতি ক্ষমাশীল। সামাজিক কাঠামোর দুই স্তরে থাকা এই দুটি নারী চরিত্রের একনিষ্ঠতা ও ব্যভিচারের বৈপরীত্য নিম্নবর্গের নারীর প্রতি উচ্চবর্গের সেই বিশেষ মনোভাবেরই ইঙ্গিতবাহী। নারীর কলমেও এই বিশেষ মনোভাবের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা ভাষায় নারী রচিত প্রথম উপন্যাস হিন্দুকুল কামিনী প্রণীত 'মনোত্তমা'য় (১৮৬৮) নারীর পাতিব্রত্য বিষয়ে ভৈরবী ঠাকুরাণীর বাণী- "নীচ জাতিতেও যে, পতিব্রতা সাধ্বী রমনী

জন্মে, তাহারও এক বিচিত্র উদাহরণ দেখাইলেন।”[২১] উনিশ শতকে বাংলার তথাকথিত নবজাগরণে জাতি বৈষম্যের প্রচলিত ব্যবধানকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬) উপন্যাসের জগমোহন, শচীশ, ‘যুগান্তর’ উপন্যাসের নবীনচন্দ্র, ‘স্নেহলতা’ উপন্যাসের অমৃতলালের মতো ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিরা নিম্নবর্গের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করেছিল। তবে আধুনিক মনস্ক বাঙালি মন জাতিগত বৈষম্যের ধারণাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে নিম্নবর্গকে মানুষ হিসেবে সমমর্যাদায় স্থান দিতে পেরেছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। গোটা উনিশ শতক জুড়ে তাই বাংলা উপন্যাসে উচ্চ-নীচ বিভাজনের ধারণা স্পষ্ট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ শতকে মূলত কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নিম্নবর্গের জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে শুরু করেন। তবে ‘কল্লোল যুগ’ শুরু হওয়ার বেশ কিছু সময় পূর্বেই বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের ‘যোগেশ্বরী’, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘পাপের পরিণাম’ (১৯০৮)-এর তিনটি প্রসঙ্গ অবলম্বনে এই পরিবর্তমান মনোভাবের দিকে আলোকপাত করা হবে।

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের ‘যোগেশ্বরী’ উপন্যাসের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক রামহরির মতো একজন কৈবর্ত চরিত্রের জন্য ‘গ্রন্থের স্থান ব্যয় করা’র প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পূর্বোল্লিখিত নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলির মতো সে ঘন কৃষ্ণবর্ণের, দেহের গঠন বলিষ্ঠ, পরিধানের বস্ত্র খাটো। ঔপন্যাসিকের কথায় “তারপর সে মূর্খ, সে ইংরাজি জানে না, খবরের কাগজ পড়ে না, ঔপন্যাসিক প্রণয়ের ধার ধারে না, বক্তৃতা করিতে বা শুনিতেও জানে না।”[২২] এককথায় সে ‘ছোট লোক’ শ্রেণির মানুষ। তবে এই উপন্যাসে রামহরি এবং তার স্ত্রী কামিনী বিপদগ্রস্ত এক পরম সুন্দরী ব্রাহ্মণ গৃহবধূ সুহাসিনীকে উদ্ধার করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। গৃহবধূর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে রামহরি সুহাসিনীর জন্য স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা করেছে এবং ভুল করেও সেই ঘরের দিকে পা বাড়ায় না। কেবল দূর থেকে সুহাসিনীকে প্রণাম করে নিজের কাজে চলে যায়। এই সময়পর্বে লেখা অন্যান্য উপন্যাসে দস্যু, অর্থলোভী, নারীলোলুপ, অপরাধপ্রবণ নিম্নবর্গের চেনা ছকের বাইরে রামহরি চরিত্রের এই ভিন্ন উপস্থাপনা প্রান্তিক মানুষের চরিত্রায়নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বিশ শতকের সূচনাকালে প্রকাশিত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘পাপের পরিণাম’-এর ষোড়শ অধ্যায়ে সুবালা চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক যে দুটি গল্পের উল্লেখ করেছেন তা বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। গোলকধাম গ্রামের জমিদার পরিবারের সদস্য সুবালা কোমল ও পরোপকারী স্বভাবের কারণে গ্রামের মানুষের কাছে লক্ষ্মীস্বরূপা ছিল। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সে দিদি, দাদা, মাসি ইত্যাদি আত্মীয়তাসূচক সম্বোধন করতো। প্রথম গল্পে দেখা যায় গ্রামের দিনমজুর সুগ্রীব চঙ্গ একমাস যাবৎ রোগে শয্যাশায়ী। সুগ্রীব চঙ্গের স্ত্রী মায়ার মুখে তাদের দারিদ্র্য ও ভাতের অভাবে শিশুপুত্র ভুলুর কান্নার গল্প শুনে সুবালা নিজের সোনার বালাজোড়া তাদের দিয়ে আসে। উনিশ শতকের ঐতিহাসিক রোমান্স আর নারী-পুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনের ভিড়ে, অন্নকষ্টে দরিদ্র শিশুর এই হাহাকারের দৃশ্যের মাধ্যমে লেখক নিম্নবর্গের চিরন্তন সমস্যাকে আরেকবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। পরের দৃশ্যে দেখা যায় মায়া সুবালার দেওয়া বালাজোড়া রায়বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে এসেছে।[২৩] চরম দারিদ্র্য ও অন্নকষ্টের মুহূর্তেও একটি দিনমজুর পরিবারের আত্মসম্মান বজায় রাখার এই প্রচেষ্টা সাহিত্যে অবশ্যই অভিনব। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা-৩’য় ‘পরের দ্রব্যে লোভ করিও না।’ শীর্ষক ঋজুপাঠে একটি বাচ্ছা স্কুলের খেলার মাঠে সোনার হার পাওয়ার পর তাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেওয়া হয় যে হারটি দারোয়ানকে দেওয়া যাবে না, কেননা সে ছোটলোক, ফলে লোভ সামলাতে পারবে না।[২৪] আলোচ্য উপন্যাসের এই প্রসঙ্গটি কোথাও উচ্চবর্গের সেই ভ্রান্ত মনোভাবের উপরে নিম্নবর্গের আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পরবর্তী গল্পে রায়বাড়ির বাগানে তালশাঁস কাটতে আসা নফর ডোমের দুই বছরের শিশুকন্যা সুবালার হাতে জীবনে প্রথমবার সন্দেশ খেতে পেয়ে ভালোবেসে তাকে ‘থুবালা মাথী’ সম্বোধন করেছিল। কিছুদিন পর শিশুকন্যাটি জ্বরে বিকারগ্রস্ত হয়ে তার ‘থুবালা মাথী’র কাছে যাওয়ার বায়না ধরে। ‘নীচ লোকের আস্পর্ধা’র কথা শুনে রায়বাড়ির ভৃত্যরা হাস্য-পরিহাস করে বলেছে ‘সন্দেশের লোভে’ই শিশুটি এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে। অসুখের খবর শুনে সুবালা কিছু খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে নফর ডোমের বাড়িতে উপস্থিত হয়। প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা শিশুটিকে অনেক ডাকাডাকির পর সে চোখ মেলে তাকিয়ে তার হাত দুটি প্রসারিত করে একান্ত মনে সুবালার দিকে চেয়ে থাকে। ডোমের কন্যাকে স্পর্শ করা সমাজে নিষিদ্ধ থাকায় ডোমনী খাদ্য-সামগ্রীর প্রতি শিশুটির নজর ঘোরানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ‘সেদিকে সে দৃক্‌পাত করিল না।’ শিশুর এই স্নেহভরা আকুতি উপেক্ষা করতে না পেরে “ডোমের কন্যাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।”[২৫] এই দৃশ্য দেখে ডোমনী সমাজপতিদের ভয়ে কপালে করাঘাত করতে থাকে। এদিকে সুবালার দেওয়া এক টুকরো

কমলালেবু হাতে নিয়ে শিশুটি তাঁর স্কন্দে মাথা রাখলো এবং “তাহার মুখশ্রী শান্তিভাবে পূর্ণ হইল।”[২৬] দরিদ্র হলেও কোনো বিশেষ খাদ্য সামগ্রীর লোভ নয় বরং শিশুর কাছে স্নেহ-ভালবাসাটুকুই একান্ত কাম্য, এই সহজ সত্যিকে লেখক ডোম শিশুর আচরণে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। পাশাপাশি ব্রাহ্মণকন্যার দ্বারা একটি ডোম শিশুকে কোলে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় আসলে জাত-ব্যবস্থার অদৃশ্য দেওয়ালকে চূর্ণ করে চিরন্তন মানব সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ‘বিশ্বনাথ’ উপন্যাসে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের তুলনায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থান এই রচনায় অনেকবেশি স্পষ্ট।

তথ্যসূত্রঃ

১. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়,পার্থ (সম্পাদিত)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। ‘ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস’, পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৫

২. দাসআশুতোষ (সম্পাদিত)। *রমেশ-রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)। ইউনাইটেড পাবলিশার্স,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: ১৯৭৩, পৃ. ৫১৮

৩. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়,পার্থ (সম্পাদিত)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’,রণজিৎ গুহ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,এপ্রিল ১৯৯৮,পৃ. ৩৩

৪. গুপ্ত, অম্বিকাচরণ। ‘শান্তিরাম’। ভারত মিত্র প্রেস, কলকাতা, ১৮৮৫, পৃ. ৩

৫.চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত)। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*।‘কাস্ট’, সুমন ভট্টাচার্য।পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৩৩

৬.বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৭০

৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। ‘রজনী’। *বঙ্কিম রচনাবলী*।দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৬১৩

৮. ভদ্র,গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়,পার্থ (সম্পাদিত)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। ‘একটি অসুরের কাহিনী’,রণজিৎ গুহ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৬৮

৯. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পাদিত)। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা, দোলপূর্ণিমা ১৩৬১,পৃ. ৯৪০

১০. খাস্তগীর, আশিস (সম্পাদিত)। *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২৩৩

১১. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। ‘একটি অসুরের কাহিনী’, রণজিৎ গুহ । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৭২

১২. পূর্বোক্ত পৃ. ৭৩

১৩. মুখোপাধ্যায়, দামোদর।‘যোগেশ্বরী’।বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১২৬৯, পৃ. ১২৫

১৪. মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র।‘বিশ্বনাথ’।সাহিত্য প্রেস, কলকাতা, ১৮৯৬, পৃ. ৬

১৫. পূর্বোক্ত পৃ. ৬৭

১৬. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়,পার্থ (সম্পাদিত)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। ‘ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস’, পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ২০

১৭. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার, সমরেশ (সম্পাদিত)। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন* (প্রথম খণ্ড)। ‘আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান’, বিশ্বজিৎ পাণ্ডা। রত্নাবলী, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ৪৪৩

১৮. মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র। ‘বিশ্বনাথ’। সাহিত্য প্রেস,কলকাতা, ১৮৯৬,পৃ. ৭

১৯.বসু, রামদুলাল। *বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ*। চলন্তিকা প্রকাশক,কলকাতা, ৫ এপ্রিল, ১৯৫৪, পৃ. ২৭০

২০. চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ।‘আমাদের ঝি’ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। যোগেন্দ্র প্রেস, কলকাতা,১৩০৭,পৃ. ৩৯

২১.বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত)। ‘মনোত্তমা’। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০৫

২২. মুখোপাধ্যায়, দামোদর। ‘যোগেশ্বরী’। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১২৬৯, পৃ. ৩৭

২৩. মুখোপাধ্যায়, সুদেব (সম্পাদিত)।*ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী* । কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৬, পৃ. ৩৪৫

২৪.খাস্তগীর, আশিস (সম্পাদিত)। *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ* । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ.২২৯
২৫. মুখোপাধ্যায়, সুদেব (সম্পাদিত)।*ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী* । কামিনী প্রকাশালয়,কলকাতা, অক্টোবর ২০০৬, পৃ. ৩৪৮
২৬. পূর্বোক্ত পৃ. ৩৪৯

……………………………………………

সুন্দরবনের জেলেনি ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ-আখ্যান : অমর মিত্রের ধনপতির চর

ড.শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ , গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ , গোপীবল্লভপুর -২, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ:

রাষ্ট্র-নামক সরকারি যন্ত্রের পেষণ - দরিদ্র অসহায় চরবধূ জেলেনিদের নিপীড়ন আর লাঞ্ছনা এবং তারই প্রতিরোধে নিম্নবর্গীয় নারীশক্তির জাগরণ – এহেন ভাবনার বহুরৈখিক বিন্যাস আমরা দেখছি অমর মিত্রের 'ধনপতির চর'(২০০৭) উপন্যাসে। ধনপতির চরে, ছ-মাসের (কার্তিক থেকে চৈত্র) এক আজব পৃথিবীর সন্ধান দেন ঔপন্যাসিক। এই জগতের অধীশ্বর ধনপতি নামধারী এক বৃদ্ধ, যে কিনা নিজেকে হার্মাদ-পেদরুর বংশধর, কখনও-বা বৃদ্ধ কাছিম বলে পরিচয় দেয়। চরবাসীদের কাছে সে বরাবরই এক 'অলীক বিত্তান্ত' রচনা করে তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে চায়। শীতের সিজন শুরু হতেই জীবিকার অন্বেষণে সুন্দরবনের ঘোড়াদল ক্যানিং ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে জেলে-জেলেনিরা চলে আসে ছ'মাসের এই পৃথিবীতে। তারা ফিশিং করে, চরে মাছ শুকায়, শুকনো মাছ ডাঙায় পাঠায়। এই ছ'মাসের রোজগারেই তাদের সারা বছরের জীবনধারণের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনই নেমে আসে প্রশাসনিক আধিপত্যকামিতা - রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসন।হ্যাঁ,সুন্দরবনে গজিয়ে ওঠা এক চর - যে চর হয়ে ওঠে জেলেনিদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অবলম্বন- তাকেই 'গরমেন' করতলগত করতে চায় চরবাসীদের উচ্ছেদ করে। সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে সুন্দরবনের জেলেনি - কুন্তি যমুনা বাতাসিরা। একুশ শতকের এই নারী জাগরণ, নারীশক্তির বিদ্রোহ,নিম্নবর্গীয় কণ্ঠস্বর - তারই প্রকাশ সাধনে ঔপন্যাসিক অমর মিত্র Magic Realism তথা নতুন অথচ ধূসর এক বাস্তব জগতে নিয়ে গেছেন পাঠকে - মন্ত্রমুগ্ধের মতো, তীব্র গতিময়তায়। চরবাস্তবতার এই শৈল্পিক রূপায়ণই তো 'ধনপতির চর'- বাংলা উপন্যাসের এ এক মাইলস্টোনও বটে।

সূচক শব্দ:

সুন্দরবন, ধনপতির চর,চর-বধূ,জেলেনি,নিম্নবর্গ,নারীশক্তি,প্রশাসনিক আগ্রাসন,অলীক বৃত্তান্ত,জাদুবাস্তবতা,বহুস্বর।।

মূল আলোচনা :

১ .

পোস্টমডার্ন উপন্যাসের একটা অনিবার্য লক্ষণ - স্রষ্টার জীবনদর্শনের সঙ্গে সৃষ্ট চরিত্রের দর্শনের সংঘাত। আর এই সংঘাতকে স্পষ্ট করতে উপন্যাসকারদের লেখনীতে বেরিয়ে আসে চলমান সময়ের প্রেক্ষিতে অস্থিচর্মসার জীবনের হা-পিত্যেশ,বেঁচে থাকার মরিয়া সংগ্রাম ও অধুনা যন্ত্রজীবনের দোলাচলময়তা। সেই জীবনের খোঁজে শিল্পীর যাত্রা অব্যাহত থাকে – শহর-নগর গ্রাম সর্বত্র। অমর মিত্র তেমনিই একজন উপন্যাসকার, যিনি তাঁর রচনায় যেমন অবলীলায় তুলে ধরেন গ্রাম ও শহরের অভিকেন্দ্রগুলি তেমনি চারপাশের অভ্যস্ত বাস্তবতা একটু একটু করে ভাঙতেও থাকেন। বিপন্ন সময়, বিধ্বস্থ জীবন বারবার ঘুরে ফিরে আসে তার লেখনীতে। কখনো পৌরাণিকতার আড়ালে, কখনও মায়ার সম্মোহনে, কখনও বা ইতিহাসের অসিতে। 'ধনপতির চর'(২০০৭) তেমনই মায়ায় সম্মোহনে গড়া সুন্দরবনের প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মাছমারা জেলে-জেলেনিদের এক প্রতিরোধ-আখ্যান,রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে।

২.

অমর মিত্রের শিল্পমানস ও ধনপতির চর

স্রষ্টার জীবনদর্শনের সঙ্গে সৃষ্ট চরিত্রের সংঘাত অমর মিত্রের 'ধ্রুবপুত্র', 'অশ্বচরিত', কিংবা 'নদীবসত','পূর্বযামিনী', 'কৃষ্ণগহ্বর' – সবেতেই প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষ হয় একুশ শতকীয় নারী জাগরণের অন্তর্বয়ন 'ধনপতির চর'(২০০৭) উপন্যাসেও।আসলে এই উপন্যাস রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামিতার বিরুদ্ধে নারীশক্তির সম্মিলিত বিদ্রোহ,যা একুশ শতকীয় নারী জাগরণকেই দ্যোতিত

করছে। পাশাপাশি মাটি বা ভূমি কামড়ে পড়ে থাকার মরিয়া প্রয়াস ও নিজের জমি-জোতে দখলিস্বত্ব ধরে রাখার জন্য নারীশক্তির যে লড়াই অমর মিত্র দেখাচ্ছেন, তাতে করে আমাদের স্মৃতিতে অবশ্যই টোকা মারে একুশ শতকের শূন্য দশকে ঘটে যাওয়া ভূমি আন্দোলনের এক অস্পষ্ট চলচ্ছবি।

একথা জোর দিয়ে বলা যায়,একুশ শতকের প্রথম লগ্নেই প্রান্তজীবনের অন্দরমহলের দ্বারোদ্ঘাটনের প্রয়াস যে ক'জন ঔপন্যাসিক করেছেন, অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' অবশ্যই তার প্রথম সারিতে থাকবে। ভালো লাগার জায়গা তো আছেই,সেই সঙ্গে কী এই সম্মোহনী শক্তিতে অমর মিত্র পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন সারাক্ষণ! অনেকটা সংলাপধর্মী এই উপন্যাস আমাদের জিজ্ঞাসু মনকে ক্লান্ত হতে দেয় না কখনো। এক অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে অমর 'ধনপতির চর'কে আশ্চর্য গতিময় করে তুলেছেন। তাই 'ধনপতির চর' গতিময় উপন্যাস (Dynamic Novel)। উপন্যাসে তথ্য, তত্ত্ব, দর্শন, জীবন যেমন আছে ; তেমনি আছে ভাঙা বাস্তব, রুগ্ন বাস্তব, কঠোর বাস্তব, বাস্তবাধিক বাস্তবও। কি সহজ ভঙ্গিতে অমর মিত্র এসবের একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়!

৩.

ধনপতির চর : রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জেলেনিদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ - একুশ শতকীয় ভূমি আন্দোলনের চালচিত্র

অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' (২০০৭) - সুন্দরবনে উত্থিত এক দ্বীপে ছ'মাসের পৃথিবীতে বসবাসকারী চরবধূদের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনসংগ্রাম – সেই সঙ্গে 'গরমেন'-এর আগ্রাসী থাবার বিরুদ্ধে যমুনা, বাতাসি, কুন্তিদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ও স্বাধিকার রক্ষা – এহেন বহুরৈখিক বয়ানে বিন্যস্ত একটি মাইলস্টোন সূচক উপন্যাস।

একুশ শতকের চিন্তা-চেতনায় অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' (২০০৭) অবশ্যই আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়।লেখকের জীবনদর্শন একটা ইউনিভার্সাল রূপ পেয়ে যায়। রাষ্ট্র-নামক সরকারি যন্ত্রের পেষণে পিষ্ট মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ – দরিদ্র অসহায় চরবধূদের নিপীড়ন আর লাঞ্ছনার আবহগীতিকেই স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক। নারী যেন ভোগ্যবস্তু – ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামিতার এই স্পষ্ট চেহারার বিরুদ্ধাচারণ করে নারী তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ হয়। সেই সঙ্গে একমাত্র উপার্জিত চরভূমি, যা কি না সরকারি 'পয়স্থ ভূমি'ও বটে, তাই তাকে দখল করার জন্য সরকারি আগ্রাসন - তারই বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে নারীশক্তি - একুশ শতকীয় চেতনায় লেখকের এই বোধ সহজেই বৈশ্বিক রূপ পেয়ে যায়। তাই তিনি স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী কথাকারদের থেকে একক এবং অনন্যও বটে।

এই চরম ও নির্ভেজাল বাস্তবকে প্রতিপন্ন করতে ঔপন্যাসিক ধনপতির 'অলীক বিত্তান্ত' রচনা করেছেন। স্বপ্ন, কল্পনা, মিথ, সংস্কার, কিংবদন্তী আর চিত্রকল্পময় ভাষার মিশ্রণ ঘটালেন, যা কিনা শেষাবধি জাদুবাস্তবতার চেহারা পেয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছে একুশ শতকীয় এক বাস্তব আখ্যান। ড. তপোধীর ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন:

'ইতিহাস ও কিংবদন্তির সীমারেখা এতে ঝাপসা ও লুপ্ত; শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক পরিসরের বাস্তব অনায়াসেই সহাবস্থান করে প্রকল্পনা ও কুহকের সঙ্গে। তবে যেহেতু এই আখ্যান একুশ শতকের প্রারম্ভিক দশকে পরিকল্পিত ও রচিত হয়েছে, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতাপ ও নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের কৃৎকৌশল, ঔপন্যাসিকের মনন ভূমির অনিবার্য অংশ।'[১]

উপন্যাসটি মূল প্লট - ধনপতির চর , 'ঘোড়াদল থেকে সাড়ে ছয় লিগ দূরে, বঙ্গোপসাগরের মোহনায় কাছিমের পিঠের মতো ভেসে আছে ধনপতির চর'। 'ধনপতির চরের তিনদিকে নদী, সমুদ্রের মতো নদী, সমুদ্র প্রায় নদী আর একদিকে, দক্ষিণে সমুদ্র'- এই বাস্তব অবস্থানটি আমাদের চিনিয়ে দেয় যে, ধনপতির চর সুন্দরবনেই গজিয়ে ওঠা কোন চরভূমি। উপন্যাসে এই চরের প্রসারিত বোধ হিসাবে উঠে আসে- ঘোড়াদল, ফিরিঙ্গিতলা, সোনাখালি, বাসন্তি, কাকদ্বীপ, নামখানা, জয়নগর, কুলতলি, গোচরণ ইত্যাদি স্থাননাম, যা আমাদের সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেয়। তাই ধনপতির চরকে আমরা সুন্দরবনের এক চর হিসাবেই গ্রহণ করব।

এহেন ধনপতির চরে, ছ-মাসের (কার্তিক থেকে চৈত্র) এক আজব পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এই জগতের অধীশ্বর ধনপতি নামধারী এক বৃদ্ধ, যে কিনা নিজেকে হার্মাদ-পেদরুর বংশধর, কখনও-বা বৃদ্ধ কাছিম বলে পরিচয় দেয়। চরবাসীদের কাছে সে বরাবরই এক 'অলীক বিত্তান্ত' রচনা করে তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে চায়। শীতের সিজন শুরু হতেই জীবিকার অন্বেষণে ঘোড়াদল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে জেলে-জেলেনিরা চলে আসে ছ'মাসের এই পৃথিবীতে। তারা ফিশিং করে, চরে মাছ শুকায়, শুকনো মাছ ডাঙায় পাঠায়। এই ছ'মাসের রোজগারই তাদের সারা বছরের জীবনধারণের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়।

ধনপতির চরে ছ-মাসের এক ব্যতিক্রমী সংসার জীবনের কথা স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক। জেলেরা ছ'মাসের জন্য পছন্দ মতো জেলেনি খুঁজে নেয়। শুধুই ছ'মাস। চৈত্রের শেষে চর ভেঙে গেলে তারা চলে যায় নিজস্ব সংসারে। আর চরবধূরা উপায়ন্তর না পেয়ে কখনো-কখনো পতিতালয়ে সঁপে দেয় জীবন কিংবা অন্য কোথাও। পরবর্তী সিজনে একই স্বামী নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে চরবধূরা নতুন কোন সঙ্গী জুটিয়ে নেয়। সেও ছ'মাস। এই ছ'মাসই চরবধূদের বাঁচার অবলম্বন। এই ক'দিনে শরীর ভারী হয়, নিতম্ব ফুলে যায়, খেয়ে দেয় বাঁচে। তাদের জীবনযাত্রার ধারাপাত ঔপন্যাসিক রচনা করেছেন এভাবে:

'তারা বোশেখ থেকে আশ্বিনে খেটে খায় না, ঘাস পাতা খেয়ে বাঁচে। আশ্বিনের শেষ থেকে চৈত্র অবধি চরে এসে খেয়ে বাঁচে। খেয়ে বাঁচে, রমনে বাঁচে, সুখে বাঁচে। বাঁচে বলেই কাছিম সর্দারের পুজোয় সবাই দুলে দুল ছড়া কাটে; চন্দ সুয্যি যত দিন..."। (ধনপতির চর, দে'জ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৬)

সুতরাং 'ধনপতির চর'ই এহেন যন্ত্রণাদগ্ধ মানসীদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে, খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অবলম্বন।

আশ্বিন থেকে চৈত্র - এই ছ'মাস ধনপতির চর নতুন এক কলোনির চেহারা পায়। মাছমারারা দরমা দিয়ে এক একটি ঘর তুলে নেয়। সামনে একটু জায়গা ফাঁকা রাখে মাছ শুকানোর স্থান। এই কদিনে তারা টমেটো, লঙ্কা, ফুলকপি, শীতের শাকসবজি বানায়। ঘর তোলার আগে মাছ মারাদের পিছু পিছু চলে আসে চরবধূরা। কেউ ঘোড়াদল থেকে পছন্দ মতো সঙ্গী খুঁজে নেয়। যারা সঙ্গী পায় না, তারা চরে এসে জেলেপুরুষ খোঁজার চেষ্টা করে। খুঁজেও নেয়। যেমনটা নিয়েছে বাতাসি গণেশকে, যমুনা পীতাম্বরকে, কুন্তি বৃদ্ধ ধনপতিকে। নারীমানসের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় এই ছ'মাস।

আসলে ঔপন্যাসিক অমর মিত্র ইতিহাস ও ভূগোল (Time and Space) ছাড়িয়ে এক সাংস্কৃতিক চলমানতাকে স্পষ্ট করেছেন উপন্যাসে। ইতিহাসের বোধ আর ভূগোলের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে জীবন-জীবিকা ও আর্থসামাজিক বহুরৈখিক চলন ও খোলস বদলানোর বয়ান রচনা করেছেন। তাই ধনপতির চরে গঞ্জ বসে যায়,এক অস্থায়ী কলোনির জন্ম হয় যেন। বহির্জগত থেকে ব্যবসায়ীরা আসে। 'মীনা বাজারের' পত্তন ঘটায়। চাল, ডাল, নুন, তেল, কেরোসিন, মিষ্টি-মিঠাই, কুড়মুড় ভাজা, বাদাম, চানাচুর, তেলেভাজা নানাবিধ ফল কত কি! বাজার থেকে দূরে ভাটিখানায় মদ্য ব্যবসা চলে। দিনে রাতে ট্রানজিস্টার, বাজে হিন্দি ফিল্মের গান, হেমন্ত, রফি, কিশোর, লতা, গীতা দত্তের গান। কেউ কেউ নিয়ে আসে সাবান, স্নো, পাউডার, চুড়ি, শাঁখা, সিঁদুর। সেগুলো পরে জেলেনিরা ছ-মাসের বউ সাজে। কেননা, তাদের বিশ্বাস 'সিঁদুর শাঁখা থাকলে সংসার পোক্ত হয় ছ- মাসের জন্য। শাঁখা সিঁদুর চুড়ির ফেরিওয়ালা যে দুপুরে হাঁক ছাড়ে চরে নেমে, জেলেনিদের ভিতর যেন সাড়া পড়ে যায়। ওই ব্যাপারীর জন্যই যেন তারা অপেক্ষা করেছিল। যখন সিঁদুর ঘষে সিঁথিতে, শাঁখা পরে হাতে, জেলেনিদের চারদিকে যেন উলুধ্বনি বয়ে যায়। হার্মাদি বাতাস ওই ধ্বনি বয়ে আনে সমুদ্র থেকে।' (পৃ. ৭৯)

ধনপতির চর ব্রাত্য নারীদের কাছে আর একটি পৃথিবী হয়ে ওঠে - জগতের ভিতর আর একটি জগৎ। তাই ছ'মাসের সংসারকে বারো মাসের করতে আকুতি জানায় চরবধূরা। এই আকুতির মধ্যে যন্ত্রণাদগ্ধ নারীমানসের হাহাকার ও স্থায়ী সংসার পত্তনের সুখস্মৃতি- দু'ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. 'ছ-মাসের সংসার যদি বারো মাসের হয়ে যেত দিদি, তবে দশ দিকে মন যেত? আমার ভিটে হত, উঠোন হত, গোয়াল হত, গোরু-বাছুর হত, জমি হত, ধান হত, ধানের গোলা হত, আমার ঘরে মা লক্ষ্মী অচলা থাকত দিদি'। (বাতাসি, পৃ. ১৯)

২. 'যমুনা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'এ জেবনে বারো মাসের সংসার কেউ পাব না।' (পৃ. ২০)

এই বারো মাসের সংসার পাওয়ার জন্যই কুন্তি (বয়স ২০) তার নারীত্বেরও বিসর্জন দেয় 'গরমেন' মালাকারের কাছে:

'দু-হাতে মালাকারকে জড়িয়ে ধরল, তার বুকের উপর নখ বসাল, আঁচড়ে দিল প্রায়। তার তলপেটের নীচে হাত গুঁজে দিয়ে গরগর করে উঠল, নাও, তাড়াতাড়ি করো, শুধু আমাদের বারো মাস থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ো, আমি ধনপতির একশো ছেলের মা হয়ে ঘুরে বেড়াব।' (পৃ. ১৪০)

অর্থাৎ ধনপতির চরের রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে সন্তান ধারণের বাসনা জানায়-- যার মধ্যে নিহিত আছে বারো মাসের সংসার স্থাপনের আকুতি। বাতাসি তার ছ'মাসের চর-স্বামী গণেশের কাছে সেই আর্জি জানায়:

'চিত হয়ে, দুই উরু দুই দিকে প্রসারিত করে ডাক দেয় গনেশ সর্দারকে, এসো কত্তা, আমি আমার খোকা লিয়ে এই ধনপতির চরে বারোমাস থেকে যাব, তুমি আসবা যাবা। মনে করব, ছ-মাস আমার মরদ গেছে ঘুড়াদলে কাজ কম্মে, আশ্বিন গেলি আসপে-' (পৃ. ১৫০)।

ছিন্নমূল চরবধূদের শিকড় খোঁজার এই চেষ্টা, সম্বৎসর সংসার পালনের এই ঐকান্তিক বাসনা- 'হৃদয় খুঁড়ে' শুধু 'বেদনা' জাগানো নয়; সচ্ছল চিরস্থায়ী সংসার পত্তনের এই আর্জি - আবহমান নারী অধিমানসেরই দ্যোতক। অনিতা অগ্নিহোত্রী চরবধূদের এই কামনার মধ্যে দেখেছেন, 'নারীর মৌলিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা',যার মূলে আছে নারীর প্রজননের সিদ্ধান্তের স্বাধীনতার দাবি।

চরবধূদের জীবনযাপনের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে রূপ আর যৌবন। স্বামী নির্বাচনে এটাই মাপকাঠি। সেই যৌবন আবার কখনো-কখনো ধ্বংসেরও বার্তা নিয়ে আসে। বাতাসি রূপ-যৌবনে পরিপূর্ণ এক প্রতিমা। তাই গণেশ তো তাকে পেয়েই-ছে, সেই সঙ্গে ব্যাপারি দশরথ সিং, নবদ্বীপ মালাকার প্রত্যেকের লোভাতুর দৃষ্টি তার উপর পড়ে। চরবধূরা বাতাসি, যমুনা, কুন্তিরা যেন শুধু ভোগ্য হয়ে ওঠে 'গরমেন' মঙ্গল সিং, মালাকার, অনিকেত সেনদের কাছে।' 'গরমেন' মঙ্গল সিং তো বাতাসিকে ৫৭০০ টাকায় বিক্রি করে দেয় ব্যাপারি দশরথ সিং-এর কাছে। তার জন্য সে নিজে ২৫০০ টাকা পায়। আসলে:

'ব্যাপারি- পুলিশ, এখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতাপশালী কারবারি আর গরমেন, একে অন্যের হাত ধরে কাজ বাগাতে চায়। কর্পোরেট বাণিজ্য জগৎ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে কব্জা করে। অসহায় এইসব নারীর সংসার ভাবনা তো ব্যর্থ হয়-ই, কিন্তু তাদের যৌবনের বিকিকিনি তারা মেনে নিতে পারে না – বারো মাসের সংসার ভাবনাই তাদের বেচাকেনা আটকে দেয়, চরের মালকিন ধনেশ্বরীর অদম্য তেজের সহায়তায়।'[২]

নিজের সম্ভ্রম রক্ষার্থে চরবধূরা বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ভণ্ডুল করতে চায় এই 'গরমেন'-ই চক্র। বাতাসির বুদ্ধিমত্তাই তাকে বাঁচিয়ে দেয়। চরবধূদের হাতে প্রহৃত হয়ে ব্যাপারি দশরথ সিংকে তাই চর ছাড়তে হয়। এই ঘটনার জন্য আর এক 'গরমেন' বিডিও কর্মী নবদ্বীপ মালাকার 'ইনকুমারি'তে আসে। ধনপতির সপ্তদশী বিবি যুবতি কুন্তির ওপর তার প্রাথমিক লোভ পড়ে, পরে বাতাসির ওপর।'গরমেন'দের কামাতুর দৃষ্টি আর লালসা নিবৃত্তির উপরেই যেন 'ইনকুমারি'র রিপোর্ট নির্ভর করে। রিপোর্ট ভালো হলে চরে থাকবে, নতুবা চর থেকে উৎখাত হতে হবে তাদের , এ সত্য তারা জানে। আর জানে বলেই কুন্তি তার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে - চর রক্ষার্থে। জানে আর এক 'গরমেন' সমতুল্য তাদের চর নিয়ামক বৃদ্ধ ধনপতি। তাই সে নিজের গড়া Tabu নিজেই ভাঙে, বাতাসিকে গরমেনদের সঙ্গে যেতে বলে। তখনই বিপক্ষ শিবির থেকে এসেছে প্রবল প্রতিবাদ, নারীরা প্রতিবাদ। ধনেশ্বরী কুন্তি-ই সেই প্রতিবাদের প্রধান নেত্রী হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামিতা, নারীলোলুপতা ও রাষ্ট্র নামক শ্রেণিশোষণের যন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ'ই এই উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন:

'ঔপন্যাসিক অমর মিত্র তাঁর বয়ানকে সর্বত্র ব্যাপ্ত ঔপনিবেশিকতার কাহিনি হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন,যার মধ্যে সমান্তরালভাবে ব্যক্ত হয়েছে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিরোধের বয়ানও। আর, একই সঙ্গে প্রস্তাবিত হয়েছে ব্রাত্যজনের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার আদল এবং সাংস্কৃতিক প্রতিস্রোতের নব্য ইতিহাস।'[৩]

ধনপতি চরের জীবন নিয়ামক বৃদ্ধ ধনপতি। চরকে নিজেই কুক্ষিগত করতে ক্রমশ 'অলীক বিত্তান্ত' রচনা করে চলে। বাস্তব-অবাস্তবের মিশেল গড়া সেই কল্পকাহিনি চরের মানুষ সত্য বলে মনে করে। তাই বৃদ্ধ ধনপতি কাছিম সর্দারের সঙ্গে নিজেকে সমীকৃত করলেও চরের মানুষ প্রতিবাদ করে না। ছ-মাসের চরে সে 'ট্যাক্স' পায়। 'গরমেন'-এর লোক কাজে-অকাজে চরে এলে প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা করে। বাতাসি যে বিক্রি হয়ে যায় তা সে জানে। কেননা, সে তো আর এক 'গরমেন'। ছোটো চররাষ্ট্রকে শাসন করতে সে নিজস্ব সংবিধান রচনা করে:

'ধনপতির চরে যারা আসে তাদের স্বামীপুত্র নেই। মা-বাবা ভাইবোন নেই। অন্তত এই চরে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। এই চরে তারা তাদের গ্রাম, নগর, জেলা, মহকুমার কথা উচ্চারণ করে না কখনও। সে পরিচয় তোলা নিষেধ আছে। ধনপতি বলে, যতক্ষণ তুমি এখানে, এই চরই তোমার দেশ। ওই মৎস্যজীবী মানুষ তোমার স্বামী। যদি তার সঙ্গে মিলেমিশে পেটে এসে যায় কিছু, তা খালাস করে ঘোড়াদলে ফেরে।' (পৃ. ১১৩)

সন্তান উৎপাদনের জায়গা এই চর নয়; তাই বারো মাসের চরের ভাবনাকে সে সমর্থন করে না 'গরমেন'-এর মতোই। তাই 'গরমেন' সত্তার সঙ্গে তাকে আলাদা করে দেখতে কষ্ট হয় বইকি:

'ধনপতির চরে এ নিয়ম নেই যে ছ-মাসের সংসারে জেলেনির ঘরে পর-পুরুষ এসে ঢুকবে। তাহলে চরের সমাজটাই যে ভেঙে যায়। চরের তো একটা রীতি আছে। সে রীতি মেনে চলে সবাই।' (পৃ. ৮৪)

ধনপতির গড়া এই রীতিকে সাধুবাদ জানাতে দ্বিধা করি না। কিন্তু বাতাসি যখন তার সম্ভ্রম রক্ষার্থে ব্যাপারি দশরথ সিং ও পুলিশ মঙ্গল মিদ্দেকে হেনস্তা করে - চরবাসীদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে চর থেকে তাদের বিতাড়িত করে, তখনই 'গরমেন'-ই হানায় (ইনকুমারি') চরের অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংকট ঘনীভূত হয়ে আসে। ধনপতি তখন নিজের গড়া ট্যাবু (Tabu) নির্দ্বিধায় ভেঙে ফেলে এবং বাতাসির বিরুদ্ধে জেলেদের নিয়ে মিটিং করে-

'বাতাসিরে গরমেন নিয়ে যাক... চর যদি গরমেনের হাতে যায়, আমরা সবাই কুথায় যাব, এজন্যি মেয়ে-ছেলে লিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাকে, থাকুক।' (পৃ. ১৬৫)

চররক্ষার দোহাই দিয়ে নিজের গড়া প্রতিবিধান নিজেই বদলে দেয় যে, তাকে 'গরমেন'-এর সমপর্যায়ভুক্ত বলতে বাধা জাগে না।

সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলে গজিয়ে ওঠা ধনপতির চরে প্রশাসন তথা 'গরমেন' তার দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এ শুধু চরদখল নয়, চরের নারী দখলও বটে। চরনারীদের তরল মাংস উপভোগ করতে সবশ্রেণির 'গরমেন' মরিয়া প্রয়াস চালায় এবং তা সফল করতে তারা সরকারি ক্ষমতায় সুবিধাবাদী ব্যাখ্যান তৈরি করে নেয়। ভয় আর প্রশাসনিক ক্ষমতার জিগির তুলে সম্ভোগ পিপাসা চরিতার্থ করতে চায়। যমুনা-বাতাসি-কুন্তি-প্রত্যেকেই 'গরমেন'- এর সুবিধাবাদী আখ্যানে জড়িয়ে পড়ে। তাই রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের সমান্তরাল বয়ান রচনা করেন ঔপন্যাসিক,এভাবেই:

'ছ-মাসের পেটের ভাত, ঘর বিছানা, স্বামী, দু-চার পয়সা হাতে স্নো, পাউডার, সাবান এসব ঠিক রাখতে গরমেনকে চটালে চলে না। তারা জানে ধনপতি সর্দারও শেষ পর্যন্ত 'গরমেন'-এর অধীন। এ পৃথিবীতে 'গরমেন'-এর বাইরে কিছু নেই। গাং, পানি, জেলে নৌকা, জেলে, গাঙের মাছ, কচ্ছপ, চর, চরের মাটি, চরের গাছগাছালি সবেতেই'গরমেনে'র অধিকার।' (পৃ. ১৩৭)

'সর্বশক্তিমান, সর্বগ্রাসী, বহুরূপধারী যে ধনতান্ত্রিক রথ, যা প্রান্তিক মানুষের কথায় 'গরমেন', 'যোগস্তা 'আমিন', 'বিডিও', 'নিসপেক্টার পুলিশ' এরা 'গরমেন'-এর প্রতিভূ, তাদের কাছে চরবধূদের অসহায়ত্ব লেখক স্পষ্ট করেছেন। কিন্তু শেষাবধি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছে নারীর মনের ভিতর থেকে, নারীর কণ্ঠস্বরে।[৪] তাই অমর মিত্রের এই পাঠকৃতি হয়ে ওঠে অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশবাদের দ্বারা মথিত জনজীবনের প্রতি ইশারা।[৫] ঔপন্যাসিকের এই বহুস্বরিক কণ্ঠস্বর আধুনিক মানুষকে নতুন করে জাগিয়ে দেয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গরমেনের সর্বাত্মক উপস্থিতির চেহারাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে।

দশরথ সিং-এর প্রতিহিংসার সুনিপুণ কৌশলে 'গরমেন'ও হার মানে। হার মানে সৎ বিবেকবান বিডিও অফিসার অনিকেত সেনও। জেলাশাসকের কাছে ধনেশ্বরীর নামে চরভূমির পাট্টা পড়চার বন্দোবস্ত করেও ব্যর্থ হয় অনিকেত। কেননা, ততদিনে জেলাশাসকের দপ্তরে গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্ট জমা পড়ে । 'ফ্রি মিক্সিং প্রস্টিটিউশন'-এর আড্ডা বনে গেছে নাকি ধনপতির চর। তাই জেলাশাসক চরদখলের অভিযান শুরু করে। কেননা, এতদিনে ধনপতির চর হয়ে ওঠে 'গভমেন্ট দ্বীপ'। ওই দ্বীপের 'পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এরপর এডস্, ভি ডি ছড়িয়ে যাবে তোমার ঘোড়াদলে।' তাই চর আর চর থাকবে না, বনসৃজন করবে দশরথ সিং-এর 'গ্রিন উড কোম্পানি'। হোটেল বানাবে, ট্যুরিস্ট সেন্টার গড়বে- সুন্দরবনেই নাকি সবুজায়ন করবে। চরবাসীদের জীবন উপাচারে থাবা বসায় 'গরমেন' জেলাশাসক এবং তারও 'বড়ো গরমেন' বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার কর্ণধার দশরথ সিং। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিষ্পেষণে পিষে মরে চরবাসী। চরদখলে বন্দুক, বেয়নেট আর 'গ্যাঙ অফ রেপ'- এই ত্রিবিধ পথ বাৎলে দেন সবচেয়ে বড়ো 'গরমেন' দশরথ। উচ্ছেদ তো হবেই, উচ্ছেদের আগে সব চরবধূ 'রেপড়'ও হবে। যেমন করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সে 'রেপড়' করেছে, ঠিক তেমন করে। আর সেই সঙ্গে ধনপতির চরে ‘হোসেন মিঞা’ বনতে যাওয়া অনিকেতের প্রতিবাদের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়; বেঁচে থাকে শুধু তার সহানুভূতিটুকু। চরনারীরা তাই গর্জে ওঠে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই ডাক দেয় কুন্তি- ধনেশ্বরী কুন্তি।

৪.

কুন্তি : মহাভারতীয় নয়,একুশ শতকীয় নারী জাগরণের প্রতিমূর্তি

ধনপতির সপ্তদশী বিবি ধনেশ্বরী কুন্তি যেন নারী জাগরণের মূর্ত প্রতীক। নারীকে নিয়ে কামোন্মত্ত পুরুষের খেলার ছক সে ভাঙতে চায়। নারীর শরীর বিক্রি ও নারী পাচার চক্রের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। চরে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ও চর রক্ষার্থে সে নিজের নারীত্বকেও বিসর্জন দেয়। কুন্তির এই ঔদার্য ও বৃহত্তর স্বার্থে নারীত্বের বিসর্জন - তাকে চরনেত্রী করে তোলে। ধনপতি তার রাজ্যপাট বিবি কুন্তির হাতেই সমর্পণ করে দেয়। তারপর সেই হয়ে ওঠে চরের অধীশ্বরী। তখন সে সগর্বে ঘোষণা করে 'আমি এ চরের মালকিন, এই চর, গাঙ, সমুদ্দুর, আশমান, তারা, গাঙের মাছ, গাঙের পাখি সবি আমার।' (পৃ. ৩৩৫) তার প্রজাদের বারো মাসের স্বচ্ছলতার জন্য সে ধনপতিরও বিরুদ্ধাচারণ করে। এ ক্ষমতা কুন্তির ছাড়া আর কার আছে ?

ধনপতির চরের 'বিত্তান্ত' সে জেনেছে ধনপতির কাছ থেকে। চর আগে ছিল মা কমলার, তারপর পেদরুর, তারপর ধনপতির, এখন স্বয়ং তার অর্থাৎ ধনেশ্বরী কুন্তির। তাই এই নারী চর রক্ষার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে চায়। আসলে ঔপন্যাসিক বহুরৈখিক লড়াইকে স্পষ্ট করে উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে ড. ইসলাম বলেছেন:

'লড়াই এখানে খাদক ও খাদ্যের মধ্যে, ভোগেচ্ছু ও ভোগপাত্রের মধ্যে। খাদক ভোগ করতে যাচ্ছে, খাদ্য নিজেকে খাদ্য হতে দিতে চায় না - এরই লড়াই। সেই আদিম সাপ-ব্যাঙের-বাঘ-মানুষের লড়াইয়ের মতো একেবারে খাদক-খাদ্যের লড়াই। ধনপতির চরে লড়াইটা এই পর্যায়ের। আবার সব ভোগকারীর একে অপরের সহায়ক, বলতে গেলে a chain of lumpens এখানে ক্রিয়াশীল। আর খাদ্য যারা, তারা প্রায় বৃথা লড়াই করছে খাদ্য না বনবার জন্য এবং লালন করছে অমোঘ স্বপ্ন, ঘর- সংসার, জীবনের।'[৭]

হ্যাঁ, এ তাদের অস্তিত্বের লড়াই, বাঁচার লড়াই, ভোজ্য থেকে নিবৃত্তির লড়াই। কিন্তু চর দখলের বিরুদ্ধে যখন তারা সংঘবদ্ধ লড়াই-এর ডাক দেয় তখন তা দেশ- কাল-নিরপেক্ষ বৈশ্বিক হয়ে ওঠে। তা অবশ্যই সরকারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনজাতির জমি বা মাটি কামড়ে পড়ে থাকার লড়াই-এর সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে। কুন্তিদের এই সংগ্রাম তাই সমকাল ছুঁয়ে আলাদামাত্রা পেয়ে যায়।

ধনেশ্বরী কুন্তি ক্রমাগত নতুন 'বিত্তান্ত' রচনা করে চরবাসীদের জাগাতে চায়। ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। কুন্তির মধ্যে এক অপরাজেয় নারীসত্তার জাগরণ ঘটে।

> "যমুনা বলল, গরমেন যদি নেবে বলে নেয়।
> পারবে নি। আবার বলল ধনেশ্বরী।
> কত গেরাম নিয়েছে গরমেন, আমি জানি ধনেচ্ছরি।
> - তবু পারবে নি।
> যমুনা বিশ্বাস করল না। তখন ধনেশ্বরী বলল,
> দ্যাখো, আমি ধনেচ্ছরি, আমি পেদরুর বিবির বংশধর, আমার বাপের ঘর ছেল লিসবোঁয়ায়, লিসবোঁয়াও
> আমার নাই, চরও নাই, তবে আমি ছাড়ব নি।" (পৃ. ৩৮১

কুন্তির এই দৃঢ়চেতা, অনমনীয় মনোভাবই তো সকলকে জাগাবে। সে সবার অজান্তে মহাভারতের কুন্তির সঙ্গে সমীকৃত হয়ে যায় যেন। তার বৃত্তান্ত রচনাই তো চরবাসীদের জীবনবৃত্তান্ত, আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাই সে 'নতুন বেত্তান্ত' রচনা করে চরবধূদের সংঘবদ্ধ করে।

ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে সর্বহারা চরবধূদের (কুন্তি, বাতাসি, যমুনা) এই সংগ্রাম- ঔপন্যাসিকের সাম্যচেতনার পরিচায়ক। রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের স্বপ্ন দেখে, যে সমাজ হবে মাতৃতান্ত্রিক - নারী ফিরে পাবে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব। আর এই লক্ষ্য পূর্ণ করতে এবং রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন প্রতিহত করতে কুন্তিরা তাই ধনপতি 'পেদরু'কে জাগাতে চায় : 'জাগাও ধনপতিরে। চুমা দাও। বুকের কাপড় ফেলি দাও, বুকি ঠেকাও, চোখে ঠেকাও, ঘুম ভাঙবে?... বস্তর খুলে জাগাও ধনপতিরে!... এতেই গরমেন হারবে।' (পৃ. ৩৮২)

ধনপতি জেগে উঠে চর নিয়ে চলে যাবে 'যে লিসবোঁয়ায় গরমেন নেই' সেইখানে। কেননা, ব্রাত্যনারীদের শুধু পুরুষতন্ত্র ধর্ষণ করে না, ধর্ষণ করে রাষ্ট্র,[৭] এমনকি সমাজও - নানাভাবে। কখনও সার্বিক দিক থেকে পঙ্গু করে, কখনও জীবিকার সমূহ পথ রুদ্ধ করে, কখনও

বা ব্রাত্যনারীদের জীবন উপাচারে থাবা বসিয়ে। যেমন বসিয়েছে ধনপতির চরে। তাই চরবধূরা চর নিয়ে শ্রেণিহীন, শোষণহীন এক কল্পরাজ্যে পাড়ি দিতে চায়। টমাস মুর ১৫১৬ খ্রি. 'Utopia' নামক একটি সামাজিক উপন্যাসে এমনই শোষণহীন, শ্রেণিহীন দ্বীপ তথা সমাজের কল্পনা করেছিলেন। 'ধনপতির চর'-এও চরবধূরা আদিম মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে ধর্ষণকামী রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। সাম্যভাবনায় জারিত ঔপন্যাসিক অমর মিত্র তাই সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালক 'গরমেন' (এখানে ব্যক্তিমানুষ) কর্তৃক ধর্ষিতাদের ভূগোল-নিরপেক্ষ অস্তিত্বের[৮] বৃত্তান্ত রচনা করেন 'ধনপতির চর' উপন্যাসে। কিন্তু তা আজ নির্মম সত্য হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে। তাই ঔপন্যাসিকের 'অলীক বৃত্তান্ত' আর' অলীক' থাকে না; আজও সত্য হয়ে ওঠে- বৈশ্বিক সত্য।

৫.

অমর মিত্র ও নবীন যুগের ভারত : অসহায়ের দিনলিপি - চর-বাস্তবতার প্রকাশ

বিপন্ন, বিধ্বস্ত, অসহায়, মানুষই অমর মিত্রের মৌল উপজীব্য - সে আধুনিক হোক আর অনাধুনিক হোক। তাঁর মানসপট ক্রমাগতই পরিবর্তিত হয় - গ্রাম, শহর, নগর ছাড়িয়ে ধূসর অতীতেও। এভাবেই বর্তমান ও অতীতের মেলবন্ধনেই অমর মিত্রের শিল্পসত্তা পরিপূর্ণতা পায়। উপন্যাসটির ব্লার্বে লিখিত অংশটি লেখকের শিল্পসত্তার শিকড় চিনিয়ে দেয়:

'গত তিরিশ বছরের গ্রাম ও শহরের পরিবর্তন, বিপন্ন সময় ও অসহায় মানুষ, প্রকৃতির নানা রূপ তার গল্প উপন্যাসে প্রতিভাত। বৈচিত্র বিষয়ে তিনি অনন্য। কখনও দু-হাজার বছর আগের উজ্জয়িনী নগর হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসের বিষয়, কখনও বা ভূমিকম্প পীড়িত লাতুর কিল্লারি উঠে আসে তার ভাঙা হাড়গোড় মাংস নিয়ে। কখনও-বা রাজপুত্র গৌতমের অশ্ব তাঁর প্রভুর অপেক্ষায় থেকে থেকে সময় পার করে এসে পড়ে সমকালীন ভারতবর্ষে, বা একখানি গৃহ নির্মাণই হয়ে ওঠে ভারত নির্মাণ। ব্যাবিলন, বাগদাদ কলকাতা শহর ঢুকে পড়ে কারবালা প্রান্তরের অন্ধকারে। নিয়ত বৈচিত্রময় জীবনসন্ধানী লেখকের কলমে সমগ্র ভারত ধরা পড়ে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো করে। ধনপতির চর সেই ভারতবর্ষের আর এক রূপ। প্রাচীন ও নবীন পৃথিবী এখানে এসে মিলেছে যেভাবে নদী এসে মেশে সাগরে।'[৯]

কোন ভারতবর্ষ? সমীকরণটি উলটে নিলে দেখা যাবে, একেবারে নবীন এ যুগের ভারত নামান্তরে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পেষণে পিষ্ট অসহায়ের দিনলিপি-ই 'ধনপতির চর'। প্রাচীনের মোড়কে নবীন পৃথিবী তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসন এখানে স্পষ্ট। সুন্দরবনে গজিয়ে ওঠা এক চর - যে চর হয়ে ওঠে জেলেনিদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অবলম্বন- তাকেই 'গরমেন' করতলগত করতে চায় চরবাসীদের উচ্ছেদ করে। আর সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা নারীশক্তির বিদ্রোহ - তারই প্রকাশ সাধনে ঔপন্যাসিক অমর মিত্র পাঠককে এক নতুন অথচ ধূসর বাস্তব জগতে নিয়ে যান। চরবাস্তবতার এই শৈল্পিক রূপায়ণই তো 'ধনপতির চর'- বাংলা উপন্যাসের এক মাইলস্টোনও বটে।

৬. ধনপতির চর : ম্যাজিক রিয়ালিজম - বহুস্বরিক আবেদন ও বাংলা উপন্যাসের নতুন প্রত্যয় - অমর মিত্রের স্বকীয়তা।।

স্বপ্ন-কল্পনা, সংস্কার-কিংবদন্তি, বাস্তব-বাস্তবাতিত, ছায়া- কায়া, রূপকথা - মিথ ,চিত্রকল্পময় ভাষা ইত্যাদি উপন্যাসটির কথা শরীরে পরিব্যপ্ত হয়ে এমন এক মায়াময় জগত তৈরি করেছে, যা বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে অনুভব-বেদ্য নয় বরং মগ্নচৈতন্য দিয়েই তা আমাদের বুঝে নিতে হয়। ফলত ম্যাজিক-রিয়ালিজমের প্রকাশ ভূমি হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস। অলীক বৃত্তান্তের মোড়কে জীবন ও বাস্তবের পরিসরকে চিনিয়ে দেন ঔপন্যাসিক, আমাদের।কিন্তু কেমন করে?।যেমন:

১. ধনপতির জন্ম বৃত্তান্ত - কাছিমের ডিম থেকে জন্ম লাভ।

২. চরের অবস্থার পরিবর্তন

৩. কূর্ম অবতাররূপী কাছিমের পূজা

৪.পেদরু,ধনপতি বৃত্তান্ত

৫. হার্মাদদের চর আনয়ন বৃত্তান্ত

৬. চরকে পিঠে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকার বৃত্তান্ত

৭. চিত্রকল্পময় ভাষা: কাছিম, কাছিমের ডিম, কাছিমের পিঠ,পেদরু, ধনপতি,গরমেন, ইনকুমারি

এহেন ভাষ্য ও বয়ানের মাধ্যমে মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ গঠনের কথা বলছেন লেখক, যা বাস্তবের অধিক বাস্তব অর্থাৎ জাদুবাস্তবকেউ দ্যোতিত করছে। এভাবেই অমর মিত্র কেন্দ্রিকতার বদলে বিকেন্দ্রায়ন ঘটাচ্ছেন। আপাত অর্থহীন চরসঞ্চালনই গভীর দ্যোতনা আনে উপন্যাসে। কেননা অসহায় চরবধূদের 'গরমেন'ই আগ্রাসন থেকে কাঙ্খিত মুক্তি এনে দেবে চর - চরের চলমানতা ওরফে

কূর্ম অবতার কাছিম সর্দার। কঠিন বাস্তবের পাষাণ ভারকে এভাবেই হাতুড়ির ঘায়ে চূর্ণ করছেন অমর। সেইসাথে নির্দিষ্ট কালখণ্ডকে প্রসারিত করে দিচ্ছেন হাজার বছরের ক্যালেন্ডারে।এই উপন্যাস তাই বহুবাচনিক স্বরে প্রোথিত হয়ে যায়।

হ্যাঁ,উপন্যাসের আলোচনার মিখাইল বাখতিন সর্বপ্রথম 'পলিফনি' বা বহুস্বরিক উপন্যাসের কথা বলেছেন। বহুস্বরিক উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্ররা কেউ ফেলনা নয়, কাউকে অবজ্ঞা করা হয় না, প্রত্যেক চরিত্রই নিজস্ব অবস্থান থেকে নিজস্ব অভিমত পোষণ করে। নিজস্ব শ্রেণি থেকে তারা তাদের ভিন্ন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এমনকি তারা স্রষ্টার দর্শনের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপেও অবস্থান করতে পারে।অমর মিত্রের সৃষ্ট চরিত্ররা কেউ গৌণ নয়, প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভাস্বর। কুন্তি বাতাসিরা তাদের ঘোষিত অবস্থান থেকে একবিন্দুও টলেনি। আর টলবেই বা কেন? সুন্দরবনের তেভাগা সংগ্রামে বাতাসি অহল্যা উত্তমীরা তো বুক পেতে দিয়েছিল গুলির সামনে। কে জানে? এই উপন্যাসের কুন্তি বাতাসি যমুনাদের নির্মাণে লেখকের মননে সেই ভাবনাও হয়ত ক্রিয়াশীল ছিল!!

'চেতনা মানে অপর অস্তিত্বের প্রত্যয়, এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য ব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে'[১০] যে উপন্যাসে ,সেই উপন্যাস তো একের মধ্যে অনেক কথাই বলে। এক্ষেত্রে সমাজের দুই প্রান্তীয় অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়। আধিপত্যকামী শক্তির বিরুদ্ধে রুখা শুখা অন্ত্যজ শ্রেণির সংঘাত পোস্টমডার্ন উপন্যাসে বিভিন্ন ভাবেই চিত্রায়িত হচ্ছে। এই অপর সত্তার অভিব্যক্তিই[১১] আধুনিক উপন্যাসে নিজস্ব জায়গা করে নিচ্ছে। 'ধনপতির চর' উপন্যাসে 'গরমেন'ই আধিপত্যকামিতার বিরুদ্ধাচারণের পাশাপাশি নারী অধিমানসের চিরায়ত বাসনা, নারীশক্তির উজ্জীবন, মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার আকুলতা, অন্ত্যজ শ্রেণির মাটি কামড়ে পড়ে থাকার অঙ্গীকার - এসবের সমান্তরাল বয়ান উঠে এসেছে। এভাবেই অপরাশক্তির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করছেন অমর মিত্র।

আসলে অমর মিত্রের রচনায় জনসংস্কৃতি ও ভদ্রসংস্কৃতির পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি কোথাও যেন এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়ে যায়। এভাবেই অমর মিত্র খণ্ড কালের খণ্ড যুগের অন্তর্বয়নে মুক্ত করেন মহাকালের জানালা। বাংলা উপন্যাসে সংকট মোচনের এক অন্যতম স্থপতি হয়ে ওঠেন তিনি।

এ কথা মানতেই হচ্ছে, চরকে নিয়ে গজিয়ে ওঠা কলোনি, অস্থায়ী সংসার - এই মৌলিক বয়ান বাংলা উপন্যাসের এক ব্যতিক্রমী দিক। যদিও মানিকের হোসেন মিঞার 'ময়নাদ্বীপ' আমরা পূর্বেই পেয়েছি, কিন্তু ময়নাদ্বীপ আসলে Utopia - কল্পরাজ্য। আধুনিক উপন্যাসকাররা সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করলেও একুশ শতকীয় চেতনায় তা আর অবাস্তব থাকে না। বাস্তববাধিক বাস্তব হয়ে ওঠে। বাংলা উপন্যাসের বদল বৃত্তান্ত রচিত হয়ে যায় এই অতিবাস্তব চর-অখ্যানে। অমর মিত্রের এই চর-আখ্যান উপন্যাসের সংকট মুক্তির এক সদর্থক প্রচেষ্টা শুধু নয় ; বাংলা উপন্যাসের নতুন অভিমুখীকরণের সূচকও বটে।

সূত্র নির্দেশ:

১.ভট্টাচার্য,তপোধীর,উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৯৯।
২.ইসলাম,সা'আদুল, 'ধনপতির চর : চরভূমির আদি অন্ত আগ্রাস ও আধিপত্যকামির রসায়ন', সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১১,পৃ. ১৯২।
৩.ভট্টাচার্য,তপোধীর,প্রাগুক্ত, পৃ.৩০০।
৪.মুখোপাধ্যায়,অরুণকুমার, 'বাংলা উপন্যাসে রূপ ও রীতির পালাবদল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১,পৃ.৩৭১।
৫.ভট্টাচার্য,তপোধীর,প্রাগুক্ত, পৃ.৩০২।
৬.ইসলাম, সা'আদুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।
৭.ভট্টাচার্য,তপোধীর ,প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৪।
৮.তদেব, ঐ, পৃ.৩০৪।
৯.মিত্র,অমর, ধনপতির চর,ভূমিকাংশ,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭।
১০.ভট্টাচার্য, তপোধীর ,প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫।
১১.বন্দ্যোপাধ্যায়,তাপসী,-'মিখাইল বাখতিন:তত্ত্বের সীমায় প্রয়োগের আকাশে', পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা,সম্পাদনা- নবেন্দু সেন, রত্নাবলী, কলকাতা,২০০৯,পৃ. ৬৯৯।
(আলোচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে-

অমর মিত্র, ধনপতির চর, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা,১ম প্রকাশ, ২০০৭ -থেকে)

..

নিঃস্বতা-ক্ষুধা-বঞ্চনায় নিম্নবর্গের আত্মা : শৈবাল মিত্রের গল্প

রেজাউল ইসলাম, উৎপল মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ ,উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিম্নবর্গের ধারণা বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজতত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নবর্গ বলতে আমরা সেই সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণিকে বুঝি, যারা ঐতিহাসিকভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং সামাজিকভাবে প্রান্তিককৃত এবং অবহেলিত। বিশেষত, ভারতের মতো একটি বর্ণ ও শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে নিম্নবর্গের অবস্থান গভীর সামাজিক অসাম্যের প্রতিফলন।নিম্নবর্গ বলতে সাধারণত সমাজের সেই অংশকে বোঝানো হয়, যারা সামাজিকভাবে অবদমিত, বঞ্চিত এবং ক্ষমতাহীন। এই শ্রেণির মানুষগুলো সামাজিক অবকাঠামোর নীচের স্তরে অবস্থান করে এবং দীর্ঘদিন ধরে শোষণ, বঞ্চনা, এবং বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে। যদিও নিম্নবর্গ বলতে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, তবে সাধারণভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে শ্রমজীবী শ্রেণি, দলিত, আদিবাসী, এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

ভারতে নিম্নবর্গের অবস্থান মূলত বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত নিম্নবর্গের মানুষরা বর্ণপ্রথার কারণে সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি বর্ণের ভিত্তিতে মানুষদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করা হতো। এর মধ্যে শূদ্ররা ছিল নিম্নবর্গের মানুষ, যাদের কাজ ছিল সমাজের উপরিস্তরের মানুষদের সেবা করা। তাদের উপর আরোপিত ছিল নানান সামাজিক নিষেধাজ্ঞা এবং তারা উচ্চবর্ণের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় নিম্নবর্গের মানুষদের অবস্থা কিছুটা পরিবর্তিত হলেও, তারা প্রকৃত অর্থে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। ব্রিটিশ শাসকরা নিম্নবর্গের মানুষদের শিক্ষার সুযোগ দিতে চাইলেও, সমাজের উচ্চবর্গের বিরোধিতার কারণে তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবর্গের মানুষেরা ঋণের ফাঁদে পড়ে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে।

নিম্নবর্গের মানুষেরা সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত অংশ হিসেবে চিহ্নিত। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠিন এবং তারা সামাজিকভাবে অবহেলিত ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। নিম্নবর্গের মানুষেরা সাধারণত কৃষিকাজ, দৈনিক মজুরি, এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এই ধরনের কাজ সাধারণত অস্থায়ী, অনিশ্চিত, এবং অনেক সময় মানবিক শর্তহীন হয়। ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবে সবসময় দুর্বল থাকে এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।এছাড়া শিক্ষার অভাবও নিম্নবর্গের মানুষদের উন্নয়নের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। তারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যার ফলে তাদের জন্য ভালো কাজের সুযোগ কমে যায়। নিম্নবর্গের মানুষেরা সমাজে উচ্চশিক্ষা এবং ভালো চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রায়ই তারা সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা যে ধরনের সুবিধা পায়, তা থেকে দূরে থাকে।

নিম্নবর্গের মানুষেরা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নিজেদের অধিকার এবং মর্যাদার জন্য আন্দোলন করেছে। বিশেষত উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে নিম্নবর্গের মানুষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও নিম্নবর্গের মানুষেরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দেয়।ড. বি আর আম্বেদকর নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার দাবি তুলেছিলেন। তার নেতৃত্বে নিম্নবর্গের মানুষেরা স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সংরক্ষণের সুযোগ পায়, যা তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের সংবিধানে নিম্নবর্গের জন্য যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা তাদের সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।ভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, নিম্নবর্গের ধারণাটি প্রধানত জাতিভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত। বর্ণব্যবস্থা সমাজের এক বড় অংশকে নিম্নশ্রেণির দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে। নিম্নবর্গের মানুষেরা সাধারণত সমাজের শীর্ষস্তরে ওঠার সুযোগ পায় না এবং তারা শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক সংকট, এবং সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়।বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের

প্রতিচ্ছবি বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে বিশ শতকের শুরুর দিক থেকে, যখন বাংলা সাহিত্য নিম্নবর্গের জীবনের দুঃখ-কষ্ট এবং সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে শুরু করে। নিম্নবর্গের জীবন, তাদের কষ্ট, অবহেলা এবং সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই সাহিত্যগুলি নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক অবস্থান, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, এবং তাদের সঙ্গে সমাজের উচ্চবর্গের দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

বিশেষত, শৈবাল মিত্রের মতো লেখকরা নিম্নবর্গের জীবন, তাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম, এবং সমাজের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং তাদের লেখায় এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। শৈবাল মিত্রের লেখায় নিম্নবর্গের চরিত্রগুলো সমাজের বঞ্চনার শিকার হলেও তারা কখনও নিজেদের আত্মপরিচয় এবং মর্যাদার জন্য লড়াই করা থেকে বিরত থাকে না। তাদের সংগ্রাম কেবল আর্থিক বা সামাজিক নয়, বরং এটি নৈতিক ও মানবিক অধিকারের দাবির প্রতিফলন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন কথার ইতিহাস বিভিন্ন উপন্যাস, গল্প ও কবিতায় কালের প্রবাহমানতায় ভিন্ন রূপে পরিবেশিত হয়েছে। যেমন অনেক সমালোচক রাই দাবি করেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এক উচ্চবিত্তের কাঠামোকে লক্ষ্য করা যায়, নিঃস্বতা বা সাধারণ মানুষের জীবন খুব একটা বেশি নেই। কিন্তু যদি আমরা, কাবুলিওয়ালা গল্পটিকে লক্ষ্য করি "কাবুলিওয়ালা" গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃস্বতা আফগানদের উপর একটি মহৎ চিত্রণ দিয়েছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র রাহমান খাঁ একজন নিঃস্বতা কাবুলিওয়ালা, যিনি বাচ্চাদের জন্য কাবুল থেকে স্বপ্নের দেশে যান। এই গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নবর্গ আফগান সম্প্রদায়ের জীবনধারা, বিশেষত তাদের অস্থিরতা, অপরাধ ও মানবতার সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। রাহমান খাঁর চরিত্র একটি প্রতিক যা নিঃস্বতাদের অবস্থান, তাদের মূল্যবোধ এবং জীবনের সমস্যা নিয়ে জিজ্ঞাসা করে।যেমন এই গল্পই একটি প্রসঙ্গ আসে—"একদিন একটি অজানা কাবুলিওয়ালা আমার কাছে এসে বলল, 'আমি এই দেশের সব নিঃস্বতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাত্রা ও তাদের কষ্টের ওপর অনেক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তার 'পথের দাবী' উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। অপরদিকে, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্তের বন্ধুত্ব এবং জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বঞ্চিত মানুষের সংগ্রাম ও জীবনযাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'পথের দাবী' উপন্যাসে একটি অংশ রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে নিম্নবর্গ জীবন যদি সমাজের কাছে একটুখানি স্পর্শ পেত, তাহলে সে নিঃস্বতা অচিরেই বিলীন হতো।এছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানষ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'—এই কয়েকটি উপন্যাসের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নিম্নবর্গের জীবন ও সমাজের যে ছবি উঠে এসেছে, তা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা গেলেও নিম্নবর্গের জীবনের মানসিক ও ভৌগোলিক প্রভাব কীভাবে বৃহত্তর অর্থে নিঃস্বতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা স্পষ্ট হয়।

যেমন শৈবাল মিত্রের 'আতর আলীর রাজসজ্জা' গল্পে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে সাধারণ মানুষের নিঃস্বতায় পীড়িত অবস্থাকে উচ্চপদস্থ ধনী ব্যক্তিরা ব্যবহার করেন এবং নিঃস্বতা জীবনের কঠোরতাকে একটি অপ্রধান বিষয় বলে চালিয়ে দেন। আতর আলী এখানে দেশের সমস্ত নিঃস্ব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং মেঝবাবু সেই সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করেন যারা সুযোগের অপব্যবহার করেন। যদিও গল্পের সূচনায় আমরা লক্ষ্য করি, আতর আলী ক্ষুধা ও লোলুপ জীবনযাত্রার তাড়নায় নিজের বিবেককে বিকিয়ে দিয়ে কিছু অসামাজিক কাজ করতে রাজি হয়ে যায়। গল্পের শুরুতেই আতর আলীর জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে শৈবাল মিত্র জানিয়েছেন- আতর আলীর "জীবনে এই প্রথম বিয়ে, প্রথম জুতা পরা। হাঁটার আগেই দু'পায়ে আগুনতি ফোসকা উঠে গেল।"[২]

গল্পকার এখানে নতুন জুতো পরার ফলে ফোস্কা ওঠার ঘটনাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, নিঃস্বতা থেকে বেরিয়ে আসা আতর আলী যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, তা পেয়ে তার শরীর যেন মেনে নিতে পারছে না। এরপর গল্পে দেখা যায়, আতর আলী যেন সাধারণ একজন লোক নয়, বরং এক রূপকথার নায়ক, যে এক চুমুক জল ছাড়া দেড়শ লুচি, পাঁচ কেজি বোদে, আড়াই কেজি ছোলা এবং পাঁচশো ভেলি গুড় খেয়ে ফেলতে পারে। বাবুদের বাড়িতে যখন মেয়ের বিয়ের আয়োজন হয়, তখন বিশেষভাবে আতর আলীর জন্য প্রায় দশ কেজি চালের পোলাও রান্না করা হয়। একবার তো সে একজন লোকের সামনে জ্যান্ত সাপ কচ কচ করে চিবিয়ে খেয়ে সবাইকে অবাক করে দেয়। শহর থেকে বাবু পাড়ায় আত্মীয়-স্বজন এলে মাঝে মাঝে আতর আলীর ডাক পড়ে। এর কারণ হল-

"একজন মানুষ কি পরিমান খেতে পারে, সেটা দেখাতে আতর আলী দমভর খায়।"[৩]

এই দমভর খাওয়া এক নজরে মজার মনে হলেও, গল্পকার এখানে নিখুঁত নিঃস্বতার প্রতীক হিসেবে তা তুলে ধরেছেন। একজন মানুষ কতটা ক্ষুধার্ত হলে এমন সুযোগের অপেক্ষা করতে পারে, যেন সে নিজেকে প্রমাণ করে, আর কিছু না পারুক অন্তত নিজের পেটটি ভরাতে পারে। আতর আলীর এই অদ্ভুত খাওয়া-দাওয়া, অর্থাৎ তার নিঃস্বতার কথোপকথনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ক্রমশ পরিণত হয় উপহাসে। এই উপহাস আসলে প্রমাণ করার জন্য একটি প্রচেষ্টা। আতর যেভাবে সব খাবার খেয়ে নিজেকে প্রমাণ করে, তেমনিভাবে বাবু বাড়ির লোকেরা আতরকে সার্কাসের জোকারের মতো সবাইকে দেখাতে ব্যস্ত থাকে। দাবি একটাই থাকে, উত্তর পাইয়ে নেওয়ার দাবি- "কি বিশ্বাস হল?"[৪]

'খয়ের খাঁর ইন্তেকাল' গল্পটি একটি ভিন্ন আবেদন নিয়ে এসেছে। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, খয়ের খাঁ যেই ঘরে থাকতেন এবং তার মৃতদেহ যেভাবে সাজানো হয়েছে, তার মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায় যে, গল্পটি এক বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মানুষের জীবন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী হয় না; একদিন এই জীবিত অবস্থাটি শরীরকে ত্যাগ করেই চলে যেতে হবে। খয়ের খাঁকেও বিদায় নিতে হয়েছে। তবে গল্পের নাটকীয়তা তখনই শুরু হয় যখন জানা যায়, খয়ের খাঁর স্থানে হোচেন নামের এক ব্যক্তি দাসু হালদারকে জ্যান্ত কবর দিয়ে নিজের প্রতিশোধ বাস্তবায়িত করে। জমিদার বড়বাবু দাসু হালদার গরীব মানুষেরা যেমন শোষণ করে, তেমনি গরিবদের পরিবারের সম্মান, অর্থাৎ মা-বোনেদের নিয়ে নোংরা পরিবেশ তৈরি করেছে।

হোচেন, যিনি সামান্য ঘরামির কাজ করে শান্তিতে জীবনযাপন করছিল, গ্রামের একটি মেয়ের, চিনি বিবি, প্রতি প্রেমে আবদ্ধ। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চিনি বিবিকে উপহার দিয়ে, বিয়ের স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নের জন্য সে তার সামান্য উপার্জন থেকে পয়সা জমিয়ে চিনি বিবিকে একটি সস্তা শাড়ি কিনে দেয়। বিয়ের সময় চিনি বিবিকে আরও নানা উপহার দিয়ে নিজের ঘরের লক্ষ্মী হিসেবে বরণ করার স্বপ্ন দেখতে থাকে। সেই স্বপ্নের পূরণের সময় আসন্ন। কিন্তু গল্পের এখানেই একটি চূড়ান্ত মোড় আসে, যেখানে দাসু হালদারের কুনজর চিনি বিবির ওপর পড়ে। যা হোচেন কখনোই কল্পনাও করেনি। কারণ, চিনি বিবি গরিব হলেও তার সম্মান এত সস্তা নয় যে, যে কোনো বাবু তা কিনতে চাইবে। দাসু হালদার সে সম্মানকে পাত্তা না দিয়ে, তার শারীরিক চাহিদা চিনি বিবির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কারণ দাশু হালদার চিনি বিবিকে- "হালদার বাজারের মেয়ে মানুষ বানাতে চায়।"[৫]

নিম্নবর্গমানুষদের লাঞ্ছনা যন্ত্রণাকে হয়তো দাশু হালদারের মতো লোকেরা শুধু ব্যবহার করতে জানে। তাই বাজারের মেয়ে করতে চাইলেও, তাদের ভেতরে বিন্দুমাত্র প্রায়শ্চিত্তের দাগ কাটেনা। হোচেন ভালোভাবেই জানে হালদার গোষ্ঠী কতটা বড়, সে চাইলেও হয়তো প্রতিবাদ করতে পারবে না। সে অত্যন্ত গরিব অসহায় মানুষ। তবুও হোচেনের মনে বিদ্রোহের ফোয়ারা উন্মোচিত হয়- "হোচেনের মাথায় ধিক-ধিক আগুন জ্বলে। হালদারের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস নেই। তবু কিছু করা দরকার।"[৬]

নিম্নবর্গগরিব মানুষদের জীবনে শোষণের বহু দিক খোলা থাকে, যে কোন ভাবে যে কোন ব্যক্তি তাদের শোষিত করে চলে যেতে পারে। কিন্তু সেই শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার রাস্তা গরীব মানুষদের জন্য খুবই কম থাকে। হয় তাকে লড়াই করতে হয় নতুবা এই পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিতে হয়। মতিবিবি দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বেছে নেয় এই নিঃস্ব জীবনের লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য। যদিও হোচেন মতি বিবির এই সিদ্ধান্তের আভাস অনেক আগেই পেয়েছিল কিন্তু তা বুঝতে পারিনি, কারণ সে দাশু হালদারের ভয়ে উপোস করা শুরু করে দিয়েছে। কোন কিছু না খেয়ে রাত দিন অতিবাহিত করে চলেছে। হোচেন যে তাকে কিছু জোর করে খাওয়াবে, তা খাওয়ানোর জন্য তো টাকা দরকার। যা হোচেনের কাছে ছিল না। চিনি বিবি যে আত্মহত্যা করেছে তার সংবাদ হোচেন একিনের কাছ থেকে পেয়েছিল। চিনি বিবির লাশ লিচু গাছের ঝুলে যেন হোচেনের কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর চাইছে। এদিকে পুলিশ না আসা পর্যন্ত লাশ নামাবার নিয়ম নেই, থানায় খবর পাঠিয়েছে দাশু হালদার নিজেই। প্রত্যন্ত গ্রাম তাই থানার দূরত্ব প্রায় সাত মাইল,। সন্ধ্যের আগে পুলিশ আসবার কোন সম্ভাবনা নেই।হোচেন যখন চিনি বিবিকে দেখে, তার মাথা ঘুরতে থাকে এবং পূর্বের কাটানো মুহূর্তগুলো দানা বেঁধে আসতে থাকে।হোচেন যে শাড়িটুকু চিনি বিবিকে উপহার দিয়েছিল নিঃস্বতার কলহে সেই শাড়িকেই চিনিবিবি দুই ভাগ করে এক অংশ দিয়ে নিজের লজ্জা ঢেকেছিল আর এক অংশ দিয়ে নিজের গলায় দড়ি দিয়েছিল। কারণ চিরকাল বোকাসোকা হয়ে থাকা সেই চিনি বিবি মেয়েটি হয়তো জানতো না- " যে মরার পর লজ্জা করে না"[৭]

চিনি বিবির মৃত্যুর পর, গ্রামের মধ্যে কেচ্ছা ছড়িয়ে পড়ে যে, হোচেনের সন্তানের কারণে চিনি বিবি আত্মহত্যা করেছে। এই মিথ্যে গুজবের জন্য হোচেনকে জেলে যেতে হয়, যদিও প্রমাণিত হয়, চিনি বিবির পেটে কিছুই ছিল না। হোচেন এই অপমান সহ্য করে, কিন্তু তার ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে। অবশেষে খয়ের খাঁর মৃত্যুর পর, হোচেন প্রতিশোধের সুযোগ পায়। দাশু হালদারকে মদ্যপ অবস্থায় জ্যান্ত কবর দিয়ে হোচেন তার প্রতিশোধ বাসনা পূরণ করে এবং গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।গল্পটি নিঃস্বতাদের উপর সমাজের শোষণ ও অত্যাচারের নৃশংসতা প্রকাশ করে। হোচেনের প্রতিশোধ আমাদের ন্যায়বিচার এবং নৈতিকতার সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। শৈবাল মিত্র এই গল্পে দেখিয়েছেন, শোষিতদের ন্যায় বিচারের প্রয়োজন এবং সমাজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অন্যায়ের প্রতিচ্ছবি, যা নিঃস্বতা মানুষদের অসহায়তার চূড়ান্ত রূপ তুলে ধরে।

শৈবাল মিত্রের ‘ইলিশের রাত’ গল্পটি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত, যেখানে ক্ষুধা ও নিঃস্বতাতার নির্মম বাস্তবতার মাঝে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে মানবীয় দ্বন্দ্ব ও আত্মকেন্দ্রিকতার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সনত, একজন স্কুল মাস্টার, যার ছোট বেতনে পুরো পরিবারের ভার বহন করতে হয়। একদিন সে পঁচিশ টাকা দিয়ে একটি ইলিশ মাছ কিনে নিজের জন্য একাই তা খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মা আভারানি তার স্বার্থপর পরিকল্পনা বুঝতে পারে। নিঃস্বতাতার মাঝে পরিবারকে এভাবে অবহেলা করায় আভারানির হৃদয়ে কষ্ট জন্মায়, কারণ বাকি পরিবারের সদস্যরা সামান্য খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।তাই যখন মাছ ভাজার সময়, মাছ তেলেতে পড়ে একটু শব্দ হলেই সনদ বলে উঠেছিল- “আসতে, বেজায় শব্দ হচ্ছে।”[৮]

গল্পের মধ্যে আভারানির নিঃস্বার্থতা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে, যখন তিনি নিঃস্বতা, কঙ্কালসার এক মেয়েকে দেখে তার কোলের শিশুর জন্য নিজের খাবারের দুধ দেয়। আভারানির এই নিঃস্বার্থ কাজ সনদের স্বার্থপরতার বিপরীতে দাঁড়ায়, যেখানে সনত নিজেই নিজের পরিবারকে উপেক্ষা করে ইলিশ খাওয়ার পরিকল্পনা করে।গল্পটি একটি ইলিশ মাছের মাধ্যমে এক বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরে, যেখানে সনতের চরিত্র ধনী ব্যক্তিদের প্রতীক হিসেবে দেখা যায়, যারা নিজেরাই সুখী হতে চায় কিন্তু অন্যদের ভাগাভাগিতে অস্বীকৃতি জানায়। গল্পের শেষে সনদের ব্যক্তিত্বে সামান্য পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়, যা এই সংকটের মধ্যেও কিছু মানবিকতার চিহ্ন প্রকাশ করে।

‘কমলি, তুই ঘরে যা’ গল্পে শৈবাল মিত্র দারিদ্র্য ও সামাজিক নির্যাতনের নির্মম বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলি—এক নিঃস্বতা, রূপবতী, নিস্পাপ নারী, যার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শিকার হতে হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের অধীন শহরের প্রতিটি রাক্ষসের মতো পুরুষ তাকে ভোগ করার জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। তার দুর্বল স্বামী তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ। শহরে এসে কমলির পাঁচ বছরের সন্তান ক্ষুধার জ্বালায় মারা গেছে, কিন্তু তার নিজস্ব যন্ত্রণা শেষ হয়নি। রেলপুলিশের মতো লোভী পুরুষেরা তার চারপাশে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে, যারা কমলিকে শিকার করতে চায়।গল্পের নিষ্ঠাবান মধ্যবিত্ত চরিত্র কমলিকে রেলপুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিলেও, শেষ পর্যন্ত সে নিজেই কমলিকে আর এক শিকারীর দিকে ঠেলে দেয়। সমাজের চোখে কমলির নিঃস্বতা ও দুর্বল স্বামীকে রূপবতী কমলির উপযুক্ত মনে হয় না। এই তিক্ত বাস্তবতার মধ্যে গরিবদের দুর্দশাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষ, রোগ, ও নিঃস্বতা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়।

শেষমেশ, পেটের ক্ষুধার সাথে দেহের ক্ষুধার কথাও উঠে আসে। তাই কমলিকে ফিরে যেতে বলা হয় তার স্বগ্রামে, সেখানে “দেহের ক্ষুধার চেয়ে আরো প্রবল এক ক্ষুধা আছে, তার নাম শ্রম, শান্তি, শুদ্ধতা।”[৯]কিন্তু গল্পে এই বাস্তবতা স্পষ্ট যে বঞ্চনা, দুর্ভিক্ষ, ও সামাজিক শোষণের হাত থেকে কমলির মতো নারীরা কখনোই পুরোপুরি মুক্তি পায় না।যারা তাকে আরও শোষণ ও লাঞ্ছনার ফাঁদে ফেলার জন্য উদগ্রীব। সমাজের নিঃস্বতা ও অসহায় নারী হিসেবে কমলির অবস্থান শৈবাল মিত্র অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।এই গল্পে নিঃস্ব নারীর শরীর এবং অস্তিত্ব কিভাবে একটি পুরুষতান্ত্রিক ও সমাজের শক্তিশালী শ্রেণির লোভের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়, তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কমলির জন্য ‘ঘরে যাওয়া’কোনো নিরাপত্তার প্রতীক নয়, বরং তার নিরাশ্রয় জীবনের এক চূড়ান্ত প্রকাশ। তার ঘর নেই, আশ্রয় নেই, এবং নিজের মর্যাদার জন্যও সে লড়াই করতে পারে না। কমলি চরিত্রটি শোষিত, বঞ্চিত নারীর প্রতীক, যাদের জন্য সমাজের প্রচলিত কাঠামো শুধুমাত্র নির্যাতনের পথ তৈরি করে দেয়।

শৈবাল মিত্রের গল্পগুলো নিম্নবর্গের মানুষের জীবন সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট, এবং সমাজের উচ্চবিত্তের হাতে তাদের অবিরাম শোষণের প্রতিফলন তুলে ধরে। নিম্নবর্গের মানুষেরা, যারা সারাজীবন শোষিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত, তাদের জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোও বৃহত্তর

সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে মিত্র মানবিক মূল্যবোধের পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, এবং সমাজতত্ত্বে নিম্নবর্গের অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যা সমাজের অন্তর্নিহিত অসাম্য, বৈষম্য এবং শোষণ ব্যবস্থার গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরে। শৈবাল মিত্রের মতো সাহিত্যিকরা এই বিষয়গুলোকে সুনিপুণভাবে চিত্রিত করে নিম্নবর্গের মানুষের কণ্ঠস্বরকে সমাজের মূলধারায় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কাবুলিওয়ালা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-৭২, ১৩৩৩,পৃ. ১১৬

২. মিত্র শৈবাল, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ১৫

৩. তদেব

৪. তদেব

৫. মিত্র শৈবাল, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ১৩

৬. তদেব

৭. তদেব

৮. মিত্র শৈবাল, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ২৮

সহায়ক গ্রন্থঃ

১.সরদার, মনোরঞ্জন (সম্পাদনা), পথ সাহিত্য পত্রিকা, একাদশ বর্ষ, জুলাই ২০১৮

২.চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ও ভদ্র, গৌতম নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৮

৩.খান, ইয়াসিন (সম্পাদনা), দলিত ও জাতপাত কথা, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, জুন ২০১৪

৪.চক্রবর্তী, দীপক, মনোরথের ঠিকানা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ২০১৮

....

জোছন দস্তিদারের ‘দুই মহল’ নাটক: প্রতিবন্ধী নিম্নবর্গীয় মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অস্তিত্বসংকট

রিঙ্কু প্রামাণিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ -

ভারতবর্ষ বিবিধের মাঝে অবস্থিত মহান মিলনের দেশ। বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য ভারতের মূল সুর। যে দেশে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের বসবাস লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে সেই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভাজনের সাথে সাথে ঔপনিবেশিকতা প্রবেশের ফলে তৈরি হয় অর্থনৈতিক বিভাজন। এই সমস্ত বিভাজনের ফলস্বরূপ দেশের মধ্যে দুই ধরনের শ্রেণি গড়ে ওঠে, যথা- উচ্চশ্রেণি বা উচ্চবর্গ এবং নিম্নশ্রেণি বা নিম্নবর্গের। যার ফলে নিম্নবর্গের মানুষেরা তাদের শ্রমের মধ্যদিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত করলেও সকল ক্ষেত্রেই তারা বঞ্চিত, অবহেলিত থেকেই গেছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই উৎপাদক শ্রেণির অবদান অনেক। তাদের শ্রমের বিনিময়ে তাদের সঠিক পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। তাই তাদের সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে হয়। তারা কোনো ভাবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মানের কোনো উন্নতি হয় না। বাংলা নাটকে এই সমস্ত নিম্নবর্গীয় ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন নাটক রচিত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম একটি নাটক হল জোছন দস্তিদারের ‘দুই মহল’। নাটকের মধ্যে নিম্নবর্গীয় প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজ বিশেষভাবে দেখা যায়। এই সমস্ত নিম্নশ্রেণির মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে সমাজের উচ্চবর্গীয়রা। নাটকের মধ্যে এই সকল ‘বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন’ নিম্নবর্গীয় ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও অর্থের ভাণ্ডার ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন রঞ্জন সান্যাল। এই মুখোশধারী ব্যক্তির অন্য একটি পরিচয় আছে, ইনি হলেন সম্ভ্রান্ত সমাজসেবক। নাটকে যে সকল নিম্নবর্গীয় প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে তারা এক একজন এক এক ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী। কারও পা খোঁড়া হাত নুলো, কেউ চোখে দেখতে পায় না, আবার কেউ কেউ কথা বলতেই পারে না। এই সকল ব্যক্তিরা কিন্তু জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী নয়। রঞ্জন সান্যালের মতো কিছু অসৎ ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এদের প্রতিবন্ধীতে পরিণত করেছেন এবং তাদের দিয়ে নানান ভাবে ব্যবসা করিয়ে নিয়ে নিজেকে সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছেন। এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শোষিত, নিপীড়িত হলেও তারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনবরত ভিক্ষাবৃত্তি করেই চলেছে। কারণ তারা জানেন ভিক্ষা না করলে মালিক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ওপর নানান ভাবে শারীরিক অত্যাচার করবেন, এমনকি দুমুঠো ভাত খেতেও দেবেন না। অর্থাৎ যারা উচ্চবিত্তদেরকে সমাজের উচ্চ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার মূল শক্তি, তাদেরই যেন কোনো না কোনো ভাবে সমাজের জঞ্জাল হিসেবে পিছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যেদিন এই সমস্ত নিম্নবর্গীয় প্রতিবন্ধী সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের জবানিতে নিজেদের সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা,অভাব-অভিযোগ, সমাজ-সংস্কার, নতুন সমাজ গঠনের ভাবনা, তাদের আন্দোলন-প্রতিরোধ, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলবে সেদিন সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুলে যাবে এক নতুন দিগন্ত।

মূলশব্দ –

নিম্নবর্গ, উচ্চবর্গ, প্রতিবন্ধী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, শোষণ, অত্যাচার, সামাজিক অবস্থান, অস্তিত্বসংকট।

মূল প্রবন্ধ -

‘নিম্নবর্গ’ ধারণাটি আধুনিক যুগে ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও প্রান্তিক-অবহেলিতের অস্তিত্ব আমাদের সমাজবিন্যাসে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান। কিন্তু ‘সাবলটার্ন’ বলতে যে আধুনিক ধারণা তার উৎপত্তি অনেক পরে। জোছন দস্তিদারের ‘দুই মহল’ নাটকে প্রতিবন্ধী নিম্নবর্গীয় মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অস্তিত্বসংকট কেন্দ্রিক আলোচনার পূর্বে ‘নিম্নবর্গীয়’ শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতেই পারে। ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান আলোচনার সূত্রেই ‘নিম্নবর্গ’ (Subaltern) বর্তমানে একটি তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। যদি সমাজতত্ত্বের আলোচনার দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে ‘নিম্নবর্গ’ ধারণাটি

এসেছে মার্কসচর্চার সূত্র ধরেই। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি যখন জেলবন্দি ছিলেন তখন ইতালির কমিউনিস্ট নেতা আন্তেনিও গ্রামসি তাঁর বিখ্যাত 'কারাগারের নোট বই' (A Prisoner's Note Books ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালে রচিত) গ্রন্থে মার্কস-এর ভাবনাকেই মুসোলিনির প্রহরা এড়িয়ে 'প্রলেতারিয়েত' শ্রেণি অর্থে 'সাবলটার্ন' শব্দটি সুকৌশলে প্রয়োগ করেছিলেন। ব্যাপকার্থে এই প্রতিশব্দটি ইতালির পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মেহনতি শ্রমিক শ্রেণিকেই মূলত নির্দেশ করে। যারা সমাজের একেবারে নিচুশ্রেণির খেটে খাওয়া দিনমজুর সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাচীন কাল থেকেই এই নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ওপর উচুশ্রেণির মানুষের আধিপত্য বিস্তার করেই চলেছে। উচুশ্রেণি বলতে মূলত সমাজে আর্থিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরই বোঝানো হয়ে থাকে। তবে নিম্নবর্গ ইংরেজি 'সাবলটার্ন' (Subaltern) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সাবলটার্ন শব্দটি পূর্বে ব্যবহার করা হত, ক্যাপ্টেনের অধঃস্তন কর্মচারী অর্থাৎ বড়ো অফিসারের অধীনে যে ছোট অফিসার থাকেন তাকে বলা হত সাবলটার্ন। যার ব্যবহার অনেকটা অনুন্নত বা সাবর্ডিনেট অর্থে হত। অর্থাৎ সাবলটার্ন মানে হল অধস্তন, নীচে যার অবস্থান। আবার অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্রে 'সাবলটার্ন'-এর অর্থ এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা অন্য কোনও প্রতিজ্ঞার অধীন যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়। বর্তমানে যাদের রাষ্ট্রীয় সঠিক কোনো পদ বা মর্যাদা থাকে না, তারাই নিম্নবর্গ।

নিম্নবর্গ বলতে মূলত রাষ্ট্রের উৎপাদক শ্রেণিকে বোঝানো হত। তাদের শ্রমের মাধ্যমেই উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই উৎপাদক শ্রেণির অবদান অনেক। কিন্তু এই শ্রেণিটি সর্বদাই অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়। তাদের শ্রমের বিনিময়ে তাদের সঠিক পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। তাই তাদের সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে হয়। তারা কোনো ভাবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মানের কোনো উন্নতি হয় না। এই উৎপাদক শ্রেণি রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখলেও তারা বেশিরভাগ সময়ই উচ্চবর্গের দ্বারা অবহেলিত হয়ে থাকে এবং সমাজে এদের অবস্থান একেবারে প্রান্তে বা শেষসীমায়। তাই এদের প্রান্তজন হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর প্রান্তজনের অবস্থান প্রসঙ্গে বলেছেন– "প্রান্ত নির্মিত হয় কেন্দ্রের সাপেক্ষে এবং পুরো ব্যাপারটা আপেক্ষিক। কেন্দ্র হল সবচেয়ে আলোকিত, উজ্জ্বল একটি অবস্থান। যা কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং সে মনোযোগ টানতে সমর্থ হয়। অপরপক্ষে অনুজ্জ্বল, অনাকর্ষণীয় চরিত্র হলো প্রান্তের। সমাজে পড়ে থাকা প্রান্তিক মানুষেরা তাই মূলত নিম্নবর্গীয়, উচ্চ অভিজাত সমাজের কাছে ব্রাত্য, অন্ত্যজ, পতিত। তার বৃত্তিও তদ্রূপ। ক্ষমতা থেকে দূরে তার অবস্থান। ন্যূনশক্তি বলেই ক্ষমতাশালী কেন্দ্র তাকে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে। প্রান্তিক মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসহায়, বিপন্ন, নিরন্ন, দরিদ্র, সুবিধাহীন, অপরিচিত, অনালোকিত। এরা ততটা আত্ম সচেতন নয়। এদের কণ্ঠস্বর মৃদু ও ভীরু।"[১] সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপ তথা উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধের পাশাপাশি বাংলা নাটকের মধ্যে নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

সাহিত্যকে বলা হয় মানব ও সমাজ জীবনের দর্পণ। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। সাহিত্যে মানবমনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং মানব জীবনের শাশ্বত ও চিরন্তন অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। 'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্বে সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য শব্দটির মধ্যে 'মিলন' অর্থটি প্রত্যক্ষ করেছেন, যা আনন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অনেকে তাঁকে বলেছেন আনন্দবাদী শিল্পতাত্ত্বিক। এটা ঠিকই যে তাঁর শিল্পভাবনার মূলেই আছে আনন্দ। এই পাঠক, স্রষ্টা, বিষয় ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। যা থেকে সহজেই আত্মোপলব্ধি ঘটে।"[২] যে-কোনো শিল্প কর্মের সংজ্ঞার্থ প্রদান করা রীতিমতো দুরূহ বিষয়। কেননা, মহৎ সৃষ্টিশীল প্রতিভা কেবল পুরোনো সংজ্ঞানুবর্তিতায় আবদ্ধ থাকেন না, বরং সৃষ্টির মধ্যদিয়ে তিনি নতুন সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করেন। তবুও বোঝার সুবিধার্থে আমরা সাহিত্যের সব শাখারই সংজ্ঞার্থ প্রদানের চেষ্টা করি। নাটকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। এর অস্তিত্ব প্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমন- কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি মূলত পাঠের জন্য হলেও নাটকই এমন একটি মাধ্যম যা পাঠের পাশাপাশি অভিনয়ও করা হয়। অর্থাৎ নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। তাই এটি একটি মিশ্র শিল্পমাধ্যাম। অভিনয়ের মধ্যদিয়েই নাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকে। আমাদের মনে রাখতে হবে— 'পেশার সঙ্গে নেশার সংযোগ' কোনো না কোনো দিক থেকে লক্ষ করা-ই যায়। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় কোথাও থিয়েটারের মতো এমন আকর্ষণীয় মাধ্যম আজ কিন্তু নেই। অন্যসব ক্ষেত্রে সেটা দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারে নানান মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ সিনেমা এখন আমরা ইন্টারনেট বা টিভি যে কোনো উপায়েই দেখতে পারি, গানও বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে পাবার আশা করি, কিন্তু থিয়েটার-ই এমন একটি মাধ্যম যার একটি ভিডিওগ্রাফি পাওয়া গেলেও যে মুহূর্তে অভিনয়টা হচ্ছে তাতে যে উত্তেজনাটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে তৈরি হচ্ছে, সেটা যেমন বিদ্যুতের মতো

দর্শকের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে – তার কোনো বিকল্প নেই। দেখা ও শোনা—এই দুটি মৌল বিষয় নাটকের প্রধান শিল্প বৈশিষ্ট্য হলেও, আমরা নাট্যগ্রন্থ পাঠ করেও সাহিত্যরস আস্বাদন করতে পারি।

বাংলা নাটকের মধ্যেও ঠিক এই রকমই অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত নিম্নবর্গের অবস্থান লক্ষ করা যায়। যার মধ্যে অন্যতম একটি নাটক হল জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল'। নাটকের মধ্যে প্রতিবন্ধী নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণির মানুষ অবহেলার কারণে প্রতিবন্ধকতাকে অভিশাপ হিসেবে মেনে নিয়ে তারা অবহেলিত বঞ্চিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। নাট্যকার নাটকের মধ্যে মূলত যে সকল 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের তুলে ধরেছেন তারা সমাজের একেবারে নিচুশ্রেণির অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অনাথ সম্প্রদায়। যারা নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজের সঙ্গে অনবরত লড়াই করেই চলেছে। ভিক্ষাবৃত্তি যাদের মূল উপজীব্য। এই সকল 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও অর্থের ভাণ্ডার ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন রঞ্জন সান্যাল। এই মুখোশধারী ব্যক্তির অন্য একটি পরিচয় আছে, ইনি হলেন সম্ভ্রান্ত সমাজসেবক।

নাটকে যে সকল প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে তারা এক একজন এক এক ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী। কারও পা খোঁড়া হাত নুলো, কেউ চোখে দেখতে পায় না, আবার কেউ কেউ কথা বলতেই পারে না। এই সকল ব্যক্তিরা কিন্তু জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী নয়। রঞ্জন সান্যালের মতো বদমাস জোচ্চর কিছু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এদের প্রতিবন্ধীতে পরিণত করেছেন এবং তাদের দিয়ে নানান ভাবে ব্যবসা করিয়ে নিয়ে নিজেকে সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছেন। এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শোষিত, নিপীড়িত হলেও তারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনবরত ভিক্ষাবৃত্তি করেই চলেছে। কারণ তারা জানেন ভিক্ষা না করলে মালিক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ওপর নানান ভাবে শারীরিক অত্যাচার করবেন, এমনকি দুমুঠো ভাত খেতেও দেবেন না। এমনকি প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা এবং তাদের দিয়ে অর্থের আয় বাড়ানোর জন্য গুন্ডাদলের লোকেরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেমেয়েদের অপহরণ পর্যন্ত করেছে। এই সকল সম্প্রদায়ের অন্যতম দুটি চরিত্র- মনুয়া ও ওসমানী, যারা ধীরে ধীরে একে অপরকে খুব ভালোবেসে ফেলে এবং সকলের অজান্তেই একটি সন্তানের জন্ম দেয়। তারা নিজেরা খুব কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেও কিছুতেই তাদের সন্তানের কোনো ক্ষতি হতে দেননি। এমনকি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে একটি গুপ্ত স্থানে সন্তানকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাকে নিয়ে তারা খুব খুশি ছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষে হয়নি। গুন্ডাদলের লোকেরা তাদের সন্তানের কথা জানতে পারেন এবং তাদের মালিক রঞ্জন সান্যালকে তার খোঁজ দেন। অত্যাচারী রঞ্জন সান্যাল তার লোকেদের বলেন- বাচ্চাটিকে মেরে ফেলার কথা। কারণ তিনি জানেন সন্তানের মৌহ মনুয়া ও ওসমানীকে এই বদ্ধ, কষ্টের জীবন থেকে বাইরে সাংসারিক জীবনে নিয়ে যেতে পারে। তার ফলে নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি হতে পারে। অর্থাৎ উচুশ্রেণির মানুষেরা কখনোই নিম্নবর্গের ব্যক্তিদের উন্নতি চাননি, সকল সময়ই নিজেদের পায়ের নিচে তাদের রেখেছেন। নিম্নবর্গীয় প্রতিবন্ধীরা রঞ্জন সান্যালের মতো মানুষদের দ্বারা শোষিত হলেও উচ্চবিত্তদের উচুতে নিয়ে যাওয়ার পিছনে এই সমস্ত নিচুশ্রেণির মানুষের অবদান অনস্বীকার্য।

রঞ্জন সান্যালেরও নিজস্ব পরিবার আছে, যেখানে তার এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। তার মেয়ে অপর্ণা সবসময় সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে থাকতে, খেতে, জীবনযাপন করতে পছন্দ করতেন। তাই তার দাদার বন্ধু বারীন রায়ের দারিদ্র্যের কথা জানতে পেরে তাকে বিবাহ করতে চাননি। কিন্তু অপর্ণার দাদা সুবীর উচ্চঘরের সন্তান হলেও সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষদের সাথে চলাফেরা করতে পছন্দ করতেন। এমনকি একজন সাধারণ দরিদ্র ঘরের মেয়েকেও তিনি ভালোবাসতেন এবং তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। এমন সময় অপর্ণার বিবাহ ঠিক হয় উচু ঘরের সন্তান কুণাল মিত্রের সঙ্গে, যেখানে রঞ্জন সান্যাল মনুয়া ও ওসমানীকে ছলনা করে তাদের বাড়িতে কাজ করার উদ্দেশ্যে আসতে বলেন এবং তার গুন্ডাদলের লোকেরা বাচ্চাটিকে শেষ করে দিতে পারে। এমনকি নিজের হবু পুত্রবধূকে হত্যা করার জন্যও তিনি লোক পাঠান কারণ মেয়ে নিম্নশ্রেণির অন্তর্গত, যে কিছুতেই তার পরিবারের সদস্য হতে পারবে না। ফলত মনুয়া ও ওসমানী নাটকের অন্তিমে যেমন রঞ্জনের ছলনার কথা জানতে পারেন এবং নিজের সন্তানকে বাঁচাতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অন্যদিকে সুবীর পিতার কুকর্মের কথা যেমন জানতে পারেন পাশাপাশি সেই নিষ্পাপ সন্তানের অপহরণের কথাও বুঝতে পারেন। তাই সুবীর নাটকের অন্তিমে পিতার প্রায়শ্চিত্ত্যের জন্য নিজেই সংসার, ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। সুতরাং মনুয়া ও ওসমানী প্রতিবন্ধী ও অক্ষম হলেও তারা নিজেদের সন্তানের কথা ভেবে সব রকম কষ্ট সহ্য করেছেন। এমনকি সমাজ এবং রঞ্জন সান্যালের মতো বদমাশ, জোচ্চর ব্যক্তির সঙ্গে ক্রমাগত বেঁচে থাকার লড়াই করে গেছেন। একজন সাধারণ সুস্থ ব্যক্তি যেমন তার

সন্তানকে সমস্ত বাধা বিপত্তি থেকে আগলে রাখেন এবং রক্ষা করেন, ঠিক তেমনই নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পিতা-মাতা মনুয়া ও ওসমানীও তাদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। সমাজের অনেক মানুষেরা ভেবে থাকেন প্রতিবন্ধী মানেই তারা সমাজ বঞ্চিত এবং অবহেলিত হয়ে বেঁচে থাকবেন। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাচিক প্রতিবন্ধী 'সুভা' প্রসঙ্গে বলেছেন- "যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না।"[৩] যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মনুয়া ও ওসমানী, যা নাটকে খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজের শৃঙ্খলে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত হল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থান। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে বন্ধন গড়ে ওঠে। নিম্নবর্গীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সেই সমাজেরই একজন। সমাজে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান অত্যন্ত অবহেলিত। পরিবার থেকে শুরু করে সব স্থানেই প্রতিবন্ধীদেরকে খাটো করে দেখা হয়। আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতো প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সব অধিকার ভোগ করার কথা থাকলেও বরাবরই তারা সেগুলি থেকে বঞ্চিত। আত্মীয়-স্বজন সামাজিক মান মর্যাদার ভয়ে তাদের দূরে সরিয়ে রাখেন। সমাজে তাদের অবাধ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষা, চাকরি, বিয়ে, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হয়। বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়ে তারা সমাজে নিজেদেরকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করতে পারে না।

যে কোনো মানুষের সামাজিক অবস্থান তৈরি হয় পরিবার থেকেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি প্রযোজ্য। আমাদের দেশের প্রতিবন্ধীরা কোনো না কোনোভাবে পরিবারে অবহেলার শিকার। তবে কোনো পরিবারে বেশি, কোনো পরিবারে তা কম। অবহেলার কারণে প্রতিবন্ধকতাকে অভিশাপ হিসেবে মেনে নিয়ে তারা অবহেলিত বঞ্চিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। দরিদ্র পরিবারগুলোতে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা আরো করুণ। অনেক সময় তাদের অনাহার অর্ধাহারে থেকে দিন গুজরান করতে হয়। অধিকাংশ পরিবারেই প্রতিবন্ধীদের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিম্নবর্গীয় প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদেরকে অবহেলায় পিছনে ফেলে রেখে সমাজ এগিয়ে যাবে তা কখনই সম্ভব নয়। সমাজের অংশ হিসেবে তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করলে প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদে পরিণত হবে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি আমাদের যে দায়িত্বগুলো আছে তার কিছু আলোচনা এখানে করা হল— দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন : প্রতিবন্ধীদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হল তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। অনেক পিতা মাতা আছেন যাঁরা তাঁদের প্রতিবন্ধী শিশুদের বাইরে আনতে এবং অন্য শিশুদের সাথে মিশতে দিতে লজ্জা পান। কিন্তু আমাদের এ ধরনের মন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রতিবন্ধীদের সামাজিক স্বীকৃতিদান : প্রতিবন্ধীদেরকে সমাজের অংশ হিসেবে মেনে নিতে হবে। সামগ্রিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধীদের স্বীকৃতি দিতে হবে। সমাজের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে তাদেরকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শিক্ষার ব্যবস্থা : ভারতে ৯৭% শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও মোট প্রতিবন্ধী শিশুদের মাত্র ১১% স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায়, যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই নগণ্য। এ জন্য প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধকতার ভিত্তিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে দায়িত্ব : বেশির ভাগ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার প্রবেশ করার মতো ঢালু পথ নেই, যা খুবই দুঃখজনক। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা দেশের সর্বত্র বিনামূল্যে করা, চিকিৎসকদের চেম্বারে দেখানোর ক্ষেত্রে, তাদেরকে আগে সুযোগ করে দেওয়া আমাদের সকলের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা : বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ 'মানবিক' ভাতার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এই ভাতা বর্তমান সময়ের তুলনায় অনেক কম। তাই এই ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে প্রতিবন্ধীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতার পরিধি বাড়াতে হবে। চলার পথে সহায়তা করা : আমাদের চলার পথে বিভিন্ন 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' ব্যক্তিদের দেখতে পাই। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদেরকে রাস্তা পারাপারে, শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে হাত ধরে বা অন্যভাবে সহযোগিতা করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষায় বিশেষ আইন প্রণয়ন করে তার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে অবহেলিত ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বঞ্চিত। অনেকের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জীবনযাত্রার মান অনেক নিম্ন। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এতো বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধীকে পুনর্বাসন করা অত্যন্ত দুরুহ। তাই সমাজের সচেতন সকল স্তরের বিশেষ করে শিক্ষিত বিত্তবান মানুষদের প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে এগিয়ে আসা উচিত। যার ফলে সমাজের এই সমস্ত পিছিয়ে থাকা অক্ষম মানুষেরা আর পাঁচজন সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিদের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যেতে পারে। আবার শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে এই সমস্ত নিম্নবর্গীয় প্রতিবন্ধীদের নিজেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে

হবে এবং তাদের জবানিতে নিজেদের সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা, অভাব-অভিযোগ, সমাজ-সংস্কার, নতুন সমাজ গঠনের ভাবনা, তাদের আন্দোলন-প্রতিরোধ, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলবে সেদিন সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুলে যাবে এক নতুন দিগন্ত। তাই আমরা বলতে পারি নাটকের মধ্যদিয়ে সৃষ্ট এই সমস্ত ভাবনা তথা উপাদানগুলি নিম্নবর্গীয় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে এবং তাদেরই জীবনচর্যার দলিল হয়ে ওঠে এই সব নিম্নবর্গীয় প্রতিবন্ধী কেন্দ্রিক নাটকগুলি। এই গবেষণায় সেই সব হীরকখণ্ডগুলির ঔজ্জ্বল্য ও প্রভা পুনরাবিষ্কারের মধ্যদিয়ে সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই মৌলিক আলোচনাটি সমাজনির্বাসিত ও অবহেলিত 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' মানুষদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে যদি বিন্দুমাত্র কাজে লাগে তাহলে গবেষণাকর্মটি সার্থক হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র –

১. নস্কর সনৎকুমার, 'পুরাতনী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র প্রসঙ্গ' (প্রথম খণ্ড), আশাপূর্ণা প্রকাশনী ৭২এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০২২, পৃ. ২৮১

২. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্বে সাহিত্যের পথে', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, আগস্ট ২০১১, পৃ. ১০

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গল্পগুচ্ছ', শুভম্ পাবলিশার্স, ৭নং শ্যামাচরণ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ: ১১৭

সহায়ক গ্রন্থ –

১. জোছন দস্তিদার, 'দুই মহল', জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে

২. কিরণময় রাহা, 'বাংলা থিয়েটার', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ফেস-২, নয়াদিল্লি-৭০, ১৯৮৫

৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'বাংলার রঙ্গমঞ্চ', সাহিত্য সঙ্গী, ৬ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, ২০০৮

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গল্পগুচ্ছ', শুভম্ পাবলিশার্স, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ২০০৭

৫. নস্কর সনৎকুমার, 'পুরাতনী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র প্রসঙ্গ' (প্রথম খণ্ড), আশাপূর্ণা প্রকাশনী ৭২এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০২২

৬. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্বে সাহিত্যের পথে', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, আগস্ট ২০১১

....

‘বি.টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের শ্রেণিদ্বন্দ্ব

ড.শান্তনু প্রধান
অতিথি অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ , বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা-উত্তরকালে কলকাতা শহরে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল দেশভাগ ও উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ে অসহায় নিম্নবর্গীয় মানুষেরা শহরের কেন্দ্রে আশ্রয় না পেয়ে বাধ্য হয়ে চলে যায় শহর সংলগ্ন বস্তিতে। শুধুমাত্র যে উদ্বাস্তু মানুষেরা বস্তিতে গিয়ে উঠেছিল তা কিন্তু নয়, নিজেদের উন্নতি সাধনে গ্রাম থেকে আসা শহরাভিমুখী মানুষরাও শহরের কেন্দ্রে জায়গা না পেয়ে আশ্রয় নেয় বস্তিতে। এই বস্তিজীবনে এসেও তারা সরল পথে জীবন নির্বাহ করতে পারে না। কারণ অর্থনৈতিকভাবে উচ্চশ্রেণির মানুষেরা তাদেরকে শাসন ও শোষণ করতে শুরু করে। তখনি তারা সংঘবদ্ধ হয়ে উচ্চশ্রেণির অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এই বস্তিকেন্দ্রিক মানুষের জীবনচর্চা ও প্রতিবাদের কথা বাংলা উপন্যাসে সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, অসীম রায়, মহাশ্বেতী দেবী এবং অমরেন্দ্র ঘোষের কলমে বারে বারে উঠে এসেছে। বিশেষত, সমরেশ বসুর ‘বি.টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসটিতে শহরের বস্তিজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সম্মিলিতভাবে নিম্নবর্গীয়দের জীবন অন্বেষণের কথা কীভাবে চিত্রিত হয়েছে তা-ই তুলে ধরা হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ -

শ্রমজীবী মানুষ, বস্তি জীবন, নিম্নবর্গীয় মানুষদের যাপনচর্চা, প্রতিবাদী সত্তা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, শ্রেণিদ্বন্দ্ব।

মূল প্রবন্ধ-

‘প্রলেতারিয়েত’ শ্রেণি অর্থে ‘সাবলটার্ন’[১] বা নিম্নবর্গ শব্দটি তাত্ত্বিক পরিসরে সুকৌশলে প্রথম ব্যবহার করেন গ্রামসি, তাঁর ‘Prison Notebooks’ (১৯২৯-৩৫)-এ । আসলে ইতালির দক্ষিণ অংশের নিম্নতর কৃষিজীবী অর্থাৎ যারা ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অনেকটা পিছিয়ে তাদের কথা বলতে গিয়ে এই শব্দটি বা শ্রেণিটির কথা ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তীক্ষেত্রে ১৯৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ‘সাবলটার্ন স্টাডিজ’ গ্রন্থটি। এরপর বারো বছরের মধ্যে আট খণ্ড ‘সাবলটার্ন স্টাডিজ’ গ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। আধুনিককালে জনসমাজে এই তাত্ত্বিকচর্চা গড়ে উঠলেও মনুষ্য সমাজে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই একটা শ্রেণিদ্বন্দ্ব কিংবা নিম্নবর্গীয় মানুষদের প্রতি অবজ্ঞা ও তাদের শোষিত রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে তার কোনো তাত্ত্বিক পরিসর ছিল না। যা পরবর্তীতে মানুষকে আরো সচেতন করে তুলতে এই সকল তাত্ত্বিক পরিসর ও চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে সেই ‘চর্যাপদে’র কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যেসকল রচনা রচিত হয়েছে তার অনেক রচনাতেই নিম্নবর্গীয় বা প্রান্তীয় মানুষদের চিত্র বারংবার-ই চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত, মানুষ যত কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পের দিকে অগ্রসর হয়েছে ততই জীবন-যাপনের ক্ষেত্রভূমির সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে তাদের পেশাগত পরিবর্তনও। আগে যারা চাষী ছিল তারা পরিণত হয়েছে শ্রমজীবী শ্রেণিতে।[২] অর্থাৎ তাদের জীবনের পর্যায় পরিবর্তন হলেও থেকে গেছে তাদের সমশ্রেণি, অভাব এবং দারিদ্র্য। আর এই নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীদের কথাকতা তুলে ধরলেন সমরেশ বসু তাঁর ‘বি. টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসে। উপন্যাসটি ১৯৫২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও তা প্রথমে ‘নতুন সাহিত্য’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শহরকেন্দ্রিক এই নিম্নবর্গীয়দের আলোচনার পূর্বে কলকাতা শহরের বস্তি গড়ে ওঠার পটভূমির উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাদের সামনে কয়েকটি বিষয় উপস্থিত হয়—

১। শহরে ধনী ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য যত বাড়তে লাগল ততই অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের স্থান হল মূল শহরের কেন্দ্র থেকে বাইরে। এই শহর থেকে বাইরে এসে তারা বসবাসের জন্য যে জায়গায় থাকল তা-ই হল বস্তি।

শহর

মূল কেন্দ্র (শহর কলকাতা) — কেন্দ্র বর্হিভূত (শহরের পার্শ্বস্থ বস্তি অঞ্চল)

২। কলকাতা বস্তি অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি কীভাবে ঘটল তা একটি রিপোর্টের অংশ তুলে ধরলেই বোঝা যায়—

“পৌরসভার ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Administration Report থেকে সেকালের পৌরসভার অধীনে ১৬টি উদ্যান সমেত পুষ্করিণীর একটি তালিকা পাওয়া যায়...জমির মালিকগণ তাদের অধীনস্থ প্রজাদের লীজ দলিলের মাধ্যমে জমি বণ্টন করত। জমি গ্রহীতারা নিজেদের সুবিধামত যত্রতত্র কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করত। কলিকাতায় বস্তির সংখ্যা এইভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।”[৩]

৩। আরও দেখা গেছে—

“জমির মালিকগণ এই প্রকার বস্তি নির্মাণের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজন বোধ করত না। এর ফলে রাস্তাঘাটের সমস্যা, জনস্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি প্রভৃতি পৌর সমস্যা দেখা দিতে থাকে।”[৪]

৪। এই পটভূমির ফলে গড়ে উঠেছে কলকাতা শহরের বস্তিজীবন। ধনিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে বস্তি জীবনের দুস্তর পার্থক্য। উনবিংশ শতাব্দীতে শহরের বস্তিজীবনের যে রূপায়ণ দেখা গেছে তা ক্রমশ; স্বাধীনতা- উত্তরকালে নিম্নবর্গীয় মানুষের ভিড়ে সেই জীবনের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেখা গেছে বস্তির পরিবর্তিত রূপ এবং তাতে সৃষ্টি হয়েছে এই জীবনের নানান বৈশিষ্ট্য—

ক। সরকার মালিকপক্ষকে লিজ দলিলের মাধ্যমে জমি বণ্টন করত। সেই জমিতে জমি গ্রহীতারা যত্রতত্র কুঁড়ে ঘর বানাত।

খ। গৃহগুলি নির্মিত হত বাঁশ, মাটি, টালি, বেড়া, চোঙ প্রভৃতির মাধ্যমে।

গ। বস্তিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের মান ছিল অত্যন্ত নিম্ন। তার ফলে নিজেদের জীবনযাপন চালাতে হত কষ্টে।

ঘ। শহরে এই অঞ্চলটি থাকে সব সময় অবহেলিত। কারণ এই অঞ্চলের উন্নতির কথা সরকার খুব-একটা ভাবে না।

ঙ। এই বস্তিতে যারা বাস করে তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই হয় শ্রমিক শ্রেণির।

চ। বস্তির বাড়িগুলি স্বল্প পরিসরে সংলগ্ন হওয়ায় আলো-বাতাসের স্বাভাবিক প্রবেশের সুযোগ থাকে না।[৫]

ছ। শ্রমিকেরা কাজের সূত্রে এখানে থাকে এবং তাদের কাজ শেষে হলে তারা চলে যায় অন্য বস্তিতে।

জ। অর্থনৈতিক সামাজিক দিকে থেকে নিম্নমানের হওয়ায় অশিক্ষা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বস্তি বাসিন্দারা হয় হতাশাগ্রস্ত নৈরাশ্য পীড়িত এবং মানসিকভাবে চরম বিকারগ্রস্ত।[৬]

ঝ। নানারকম অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্মদাতা হল এই বস্তি।[৭]

এই বস্তিজীবনের রূপ, উচ্ছেদ এবং প্রতিবাদের আলেখ্যে সমরেশ বসু রচনা করেছেন ‘বি. টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসটি। এই উপন্যাসটি সৃষ্টির প্রেক্ষিতে রয়েছে জীবনের ত্রিবেণী অভিজ্ঞতা—

১। সত্য মাস্টারের অনুপ্রেরণা;

২। বস্তিজীবনের অভিজ্ঞতা;

এবং ৩। বামপন্থী রাজনীতি।

শুধু তাই নয়, নিজের জীবনের অর্থনৈতিক দিকটিও উপন্যাসে বারে বারে চিত্রিত হয়েছে। এই ধরনের উপন্যাসের প্রতি লেখকের মমত্ববোধ একটু বেশিই ছিল সেকথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন—

“শ্রেষ্ঠ মুখটির সন্ধানে যেতে যেতে মনে পড়ে, ‘বি.টি. রোডের ধারে’ যার পাণ্ডুলিপি হারিয়ে এক রাত্রেই পাগল প্রায় হয়েছিলাম, মনে করতাম, তার প্রধান পুরুষ চরিত্রটি প্রত্যক্ষত আমিই, কারণ একটি মহত্ত্বের প্রবণতা, তখন সম্ভবত আমার অবচেতনে ক্রিয়াশীল ছিল।”[৮]

অর্থাৎ লেখকের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অবচেতন মনের ক্রিয়াশীলতা থেকে জন্ম নেয় ‘বি.টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসটি।

এই উপন্যাসের আখ্যানে রয়েছে শহর সংলগ্ন বস্তির অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের বঞ্চনাময় জীবন-যাপন এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও প্রতিবাদ। এখানে শহরের অসামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্রের অবতারণা রয়েছে—

"বস্তিটার ধার ঘেঁষেই, কর্ড রোডের দিকে মুখ ফেরানো একটা হাল আমলের দোতলা বাড়ি।"[৯]

উপন্যাসের শুরুতেই দেখা গেছে কলকাতার বস্তিজীবনের পরিবেশ। যেখানে শহরের প্রাসাদোপম বাড়ি, স্থাপত্য কীর্তি শোভাবর্ধন করছে তার পাশাপাশি আর একদল মানুষ বাঁচে বস্তিজীবনের সরীসৃপের মতো।[১০] কেননা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এইসব মানুষের শ্রমকেই কাজে লাগানো হয়ে থাকে। যা এই উপন্যাসে শ্রমজীবী চরিত্রদের মধ্যেও ফুটে উঠেছে। এই বস্তিজীবনের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন—

"...গঙ্গার তীরে তীরে, রেললাইনের ধারে ধারে অসংখ্য কারখানা ইমারত। তারই ছত্রছায়ায় ছড়ানো আবর্জনা স্তূপের মতো বস্তি। এবড়ো খেবড়ো, বাঁকাচোরা দোমড়ানো সুদীর্ঘ শিল্পশহর।"[১১]

এই বি.টি.রোডের ধারে এই বস্তির লোকেরা কাজের শেষে যাদের সংসার নেই তারা বেরিয়ে গেছে—

"কেউ গেল আড্ডায়, জুয়ার ঘরে, বেশ্যালয়ে। কেউ কেউ শুধু পথে পথে ঘুরতে লাগল আর শিকারি চিলের মতো দেখতে লাগল এদিক-ওদিক।"[১২]

এই রকম এক কদর্যতাময় জায়গায়, যেখানে নিয়ম-কানুনের কোনো বালাই নেই, শ্রমজীবী মানুষেরা যে যার মতো করে থাকে, ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই, সেই রকম এক বস্তিতে গোবিন্দ নবাগত হয়ে এসেছে। সেই বস্তির মালিক আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করেছে কোথায় যাবে? তার উত্তরে আগন্তুক বলেছে—

"শহরে যাবার রাস্তাটা খুঁজছিলুম। যা আঁধার পথ। ভেবেছিলুম ইদিক দিয়ে- রাস্তা টাস্তা হতে পারে।"[১৩]

অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষেরা রুজি-রোজগারের জন্য শহরে আসতে চেয়েছে। তারা ভাবে শহরে এলে তাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা মিটে যাবে। যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গোবিন্দও ইছামতীর কাছ থেকে এই বস্তিতে এসে উঠেছিল। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী মানুষেরা যতই অর্থ উপার্জন করুক না কেন তাদের সেই সংসারের দুর্দশা কোনোদিন খোঁচে না। তার কারণ কখনো তাদেরকে ছাঁটাই করা হয়, কখনো বা তাদের বস্তি উঠিয়ে দেওয়া হয়, কখনো আবার বস্তি মালিকের চাপে শ্রমজীবী মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়। যা এই উপন্যাসের বস্তি জীবনে প্রান্তীয় মানুষদের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সমাজে বাঁচার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল অর্থনীতি। এই আর্থিক কারণেই মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষদের মধ্যে শ্রেণিগত ঐক্য ও দ্বন্দ্বের সম্পর্ক লক্ষ করা গেছে। তাই এদের মধ্যে ফুটে উঠেছে শ্রেণিবৈষম্য[১৪]—

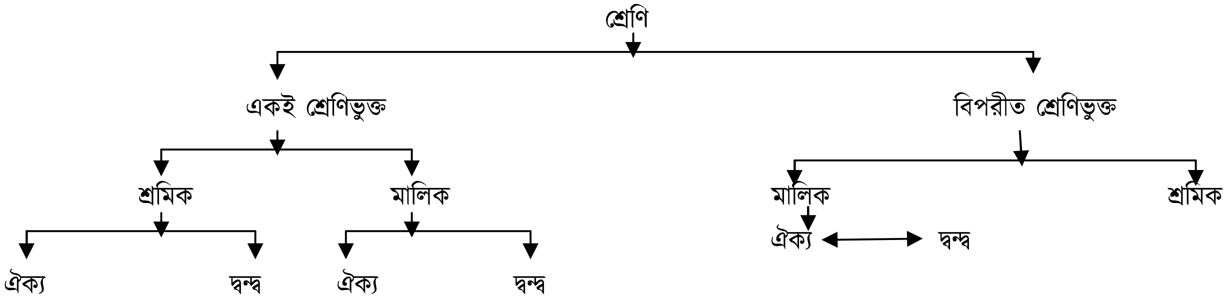

বাড়িওয়ালা—সদী বুড়ি—গোবিন্দ :

গোবিন্দ বস্তিতে আগন্তুক। সে এই মালিক শ্রেণি এবং শ্রমিক শ্রেণিকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে এবং তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। গোবিন্দ যে বস্তিতে উঠেছে সেই বস্তির মালিক অন্যান্য সমস্ত বস্তির মালিকের থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য বস্তি মালিকেরা শ্রমিকদেরকে যে অশ্লীল ব্যবহার করে এই মালিক তা করে না। যদিও স্বয়ং লেখক বস্তিজীবনে থাকাকালীন এই রকম বস্তি মালিক পাননি।[১৫] বরং বস্তি মালিকের দ্বারা সমরেশ বসুকে বারে বারে হেনস্থা হতে হয়েছিল। উপন্যাসে বাড়িওয়ালার মতো ভালো মানুষ থাকলেও বিরিজামোহনের মতো শহুরে স্বার্থান্বেষী বস্তি মালিককেও দেখা গেছে। সদী বুড়ির মুখ থেকে এই বস্তির বাড়িওয়ালা সম্পর্কে আরও জানা যায়- বাড়িওয়ালার বাবাকে খুন করলে এবং পরে মা মারা গেলে এই বাড়িওয়ালাকে সাধুরা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। পরে বড়ো হয়ে সে এখানে এসেছে এবং বাড়িওয়ালা হয়ে গেছে। তাই সে এখন নিজে বাড়িওয়ালা হয়ে গেলেও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে ভুলতে পারেনি। এ সম্পর্কে সদী বুড়ি গোবিন্দকে বলেছে—

"হেন বাড়িওয়ালা নেই যে ওর দুশমন নয়, ওর নতুন জমিদার ওকে কাবু করবার তালে আছে। সবে এসেছে, এখন দেখবে একা বিরিজামোহনই ওকে পাগল করে দিতে পারে। ও যে একেবারে বোকা... বোকা। ও যদি বাড়িওয়ালার মতো বাড়িওয়ালা হত! পাগল!"[১৬]
এর থেকে বোঝা যায় এই বাড়িওয়ালা চরিত্রের সঙ্গে অন্য বাড়িওয়ালাদের স্বার্থান্বেষী চরিত্র মেলে না। শুধু তাই নয়, বাড়িওয়ালা মালিক সম্প্রদায়ের হয়েও শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে বলে অন্যান্য মালিকরা এর প্রতি রাগান্বিত হয়েছে। এই বাড়িওয়ালা মাঝে মাঝে বস্তির ভেতরে গিয়ে রেগে বলেছে—

"সব কটাকে হটাবো এখান থেকে দাঁড়াও।"[১৭]

এই বক্তব্য বললেও শ্রমিকরা সকলেই জানত এই কথা মানুষটির মনের কথা নয়; রাগের কথা। তাই এই বস্তিবাসীরা বাড়িওয়ালার এহেন বক্তব্যে কান দিত না।

দুলারী—গণেশ—গোবিন্দ:

গোবিন্দ এই বস্তিতে শ্রমজীবী মানুষের জীবন চিত্রের পাশাপাশি কয়েকজন শ্রমিকের প্রেমের চিত্রও দেখেছে। সে দুলারী ও গণেশের প্রেমচিত্র যেমন দেখেছে তেমনি লোটন বউ ও হরিশ-নন্দের সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম, আবার ফুলকির জন্য কালোর সারা জীবনের আত্মত্যাগ এই বস্তিজীবনেই প্রত্যক্ষ করেছে। এই প্রেমের চিত্রের মধ্যেও বারে বারে উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয়দের অভাব-অনটনের কথা। যে দুলারী গোটা বস্তিকে একদিন মাথায় করে রাখত সেই দুলারী অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখানোর পয়সা পর্যন্ত পায় না। এই অসুস্থতা দেখে কালো গোবিন্দের কাছে প্রতিবাদ করে। বলেছে—

"কিন্তু বউটা ব্যামোয় পড়ল আর ডাক্তারও শালা তেমনি এত এত টাকা চায় খালি। বলে আজ দশ, কাল বিশ, কী ব্যামো রে বাবা।"[১৮]দুলারী অসুস্থ হয়ে পড়লে গণেশও কাজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। সারাদিন শুধু দুলারীর পাশে বসে থাকে এবং শুশ্রূষা করে। শ্রমিকের জীবন এমন জীবন যেখানে কাজে না গেলে তাদের দিন যাপন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাই এই দৃশ্য দেখে গোবিন্দ গণেশকে বলেছে—

"তোর কথায়... তোরই একটা বউ আছে, আর যেন কারো নেই, ছিলও না। লোকে তো চেষ্টা চরিত্তিও করে, বলি তোরা দুটোতে মলে এ সমসারে কার কী আসবে যাবে।"[১৯]

গোবিন্দ চেয়েছে গণেশ কাজে যাক এবং তার দুলারীকে সুস্থ করে তুলুক। পরবর্তীক্ষেত্রে গোবিন্দের কথা গণেশ ফেলতে পারেনি। সে কাজে গেছে। এদিকে দিনে দিনে দুলারী সুস্থ হতে থাকে। তাদের এই জীবনেও এসেছে হঠাৎ দুর্যোগ। একদিকে এসেছে বস্তি ওঠাবার নোটিশ অন্যদিকে, এসেছে কলকারখানায় ছাঁটাই-এর ঘোষণা। এই দুটি বিষয়ের ফলে দুলারী এবং গণেশের সংসারসহ অন্যান্য শ্রমিকদের জীবনেও ঘনিয়ে এসেছে বিপর্যয়। কলকারখানার মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য যখন গণেশ গ্রেপ্তার হয়েছে তখন আর্থিক কারণের জন্যই তাকে আর বস্তিতে ফেরানো যায়নি। দুলারী প্রত্যহ গণেশের মুক্তির আশায় বসে থেকেছে।

লোটন বউ—হরিশ—গোবিন্দ:

গোবিন্দ যেদিন এই বস্তিতে প্রথম এসেছে পরের দিনই সে দেখেছে নন্দ- হরিশের ঝগড়া। কালোকে গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে কালো বলেছে লোটনের দুই ভাই হরিশ আর নন্দ। বউটা বিধবা হলে এরা দুই ভাই এরকমই ঝগড়া করে এবং লোটন বউ যখন রাগান্বিত হয়ে যায় তখন এরা ঝগড়া বন্ধ করে ঘরে ঢুকে নিজেদের দরজা বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনা উপন্যাসের অনেকবার দেখা গেছে। এ সম্পর্কে গোবিন্দ একবার ভেবেছে—

"নন্দ-হরিশকে সে মারুক ধরুক, লড়িয়ে দিক পরস্পরের মধ্যে, ঘৃণা করুক,তবু হয়তো তাকে বাধ্য হয়েই এঘরে থাকতে হয়।...নিরন্তর প্রেমহীন জীবন, তাই তো সবচেয়ে বড় অভিশাপ।"[২০]

কারণ অর্থনৈতিকভাবে শ্রমজীবী মানুষের কোনো উপায় থাকে না। তার ওপরে লোটন বউ বিধবা তাই—

"হয়তো পেটের জন্যই তাকে নন্দ-হরিশের ঘরে থাকতে হয়। তবু নন্দ আরে হরিশকে দেখে মায়া লাগে। যেন দুটো অভিশপ্ত জানোয়ার বহু লোকের সামনে চুপচাপ পড়ে আছে।"[২১]

এই জানোয়ারদের সন্তানকেই লোটন বউ গর্ভে ধারণ করেছে। শুধু তাই নয়, এই সামাজিক অপরাধের জন্য বস্তিবাসীদের কাছে ভোজের জরিমানা দিতে হয়েছে। সমাজে যে প্রচলিত নিয়ম বা লোকচক্ষুর ভয় রয়েছে তা বস্তিবাসীদের মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। যখন প্রশ্ন উঠেছে

এই বাচ্চা কার? তখন লোটন বউ কোন দিক চিন্তা না করেই বলেছে- "কারুর নয়। আমাদের তিনজনের।"[২২] একজন বিধবা নারীর মুখে এহেন বক্তব্য আমাদের আশ্চর্য করায়। শ্রমিকদের ছাঁটাই-এর সময় গর্ভে সন্তান নিয়ে লোটন বউ যখন পরিশ্রম করেছে এবং সে সময়েও বাড়িতে এসে যখন দেখে নন্দ-হরিশের মারপিট তখন সে এই বস্তি ছেড়ে পালিয়ে গেছে—

"লোটন বউ পালিয়ে গেছে।

নন্দ-হরিশ পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করল এখানে সেখানে, মহল্লায় এলাকায়।.... নেই কোথাও।"[২৩]

কোথায় গেছে তার খবর উপন্যাসে আর পাওয়া যায়নি। হয়তো ভেবেছে যে এই মারপিট সব সময় তার জন্য। সে চলে গেলে এই দুই ভাইয়ের মারপিট বন্ধ হয়ে যাবে।

ফুলকি—কালো—গোবিন্দ:

গোবিন্দ ফুলকিকেও এই বস্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে দেখেছে। এই বস্তিতে ফুলকির নাম প্রেমযোগিনী। নামের ক্ষেত্রেও চরিত্রের সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। পূর্বপরিচয়ে যতটুকু জানা যায় বড়ো ঘরের মেয়ে ছিল। মনের মানুষ মরে যাওয়ার পর পথে ঘুরতে ঘুরতে এই বস্তিতে এসে হাজির হয়েছে। রাত্রিবেলায় মদ্যপ অবস্থায় এলে কালো তার প্রতীক্ষায় বসে থেকেছে ভাত নিয়ে। এই কালোর পুরো জীবনটাই যেন প্রেমযোগিনীর প্রেমে উৎসর্গ করে দিয়েছে। অন্যদিকে, নগেনও ফুলকিতে ভালোবাসে। তাই নগেন ফুলকিকে সেল সাহেবের বাংলোতে যেতে আটকালে ফুলকি রাগান্বিত হয়ে সেল সাহেবকে জানায়। অর্থাৎ একজন শ্রমজীবী মানুষের হাতে যখন টাকা আসে তখন সে আরেকজন শ্রমজীবী মানুষকে দেখতে পারে না। বরং তার পেছনে লাগারই চেষ্টা করে। তাই সেই সাহেব নগেনকে রাস্তায় জুতো মারলে নগেন বস্তিতে এসে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে—

"নগেন তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে চিৎকার করে উঠল, দেখা সবাইকে, সেল সাহেবের কাছে বিকোনো চেহারাটা সবাইকে দেখা।"[২৪]

মূল শহর থেকে বাইরে এর অবস্থান বলে বস্তিতে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে না। তার পরিচয় এই দৃশ্য। কারণ কোনো ভদ্র সমাজের পুরুষদেরকে নারীর এই অবস্থা করতে দেখা যায় না। যদিও পর মুহূর্তে গোবিন্দ পুরো ব্যাপারটা সামলেছে এবং নগেনকে বলেছে—

"শালা দুনিয়াভর তো রেণ্ডি আছে, সে সবার পয়সায় খায়, তুই বাড়িওয়ালাকে বললি না কেন ওকে তাড়িয়ে দিতে। বলেই সে আচমকা একটা ঘুষি বসিয়ে দিল নগেনের চোয়ালে।"[২৫]

গোবিন্দ কোনোদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিত না। তাই সে এই চিত্র দেখার পর আর রাগ না সামলাতে পেরে নগেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এরপর ফুলকি রাগান্বিত হয়ে এই বস্তি ছেড়ে চলে যায়। সে যাওয়ার সময় এই বস্তির মানুষদেরকে অভিসম্পাদ করে যায়। কিন্তু ভবিতব্যের বিধান কে খণ্ডাতে পারে! কিছুদিনের মধ্যেই শোনা গেল, ফুলকির 'কালরোগ' হয়েছে এবং কালো ছাড়া সেই বস্তিতে সবিশেষ কেউ দেখাশোনা করে না। সেই বস্তির খোঁজ নিয়ে গোবিন্দ একদিন হাজির হয়েছে ফুলকি ও কালোর কাছে। ফুলকি নিজে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সাহেবের বাংলোর সৌন্দর্যময় চিত্র গোবিন্দকে শুনিয়েছে। অর্থাৎ প্রান্তীয় মানুষের যে উচ্চে ওঠার বহু কালের আশা-আকাঙ্ক্ষা তা এই উপন্যাসেও ফুলকির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ফুলকি মারা যাবার আগে কালোকে তার শরীর সমর্পিত করতে চাইলে কালো তাকে বলেছে—

"না। এ তো তুমি অনেককে দিয়েছ। যা তুমি কাউকে দাওনি, তাই আমি চাই!

সে কী বস্তু কালো?

তোমার মহব্বৎ।"[২৬]

দু'দিন পরেই ফুলকি মারা যায় গোবিন্দ আসাতে তার সৎকার হয়। সৎকারের পর কালো গোবিন্দকে বলে—

"আমার শেষবার শেষ হয়ে গেল।"[২৭]

বস্তিজীবনে এই শাশ্বত প্রেম যে ঘটতে পারে তারই নিদর্শন দেখিয়েছেন লেখক।

এই উপন্যাসে শুধু যে বড়োদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, শিশুদের কৌতূহল মনে নানা রঙের আকাঙ্ক্ষা এই বস্তিজীবনে দারিদ্র্যের জন্য হারিয়ে গেছে। যে আশা নিয়ে রুগ্ণ ছেলেকে মা বিলেত যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে, সেই স্বপ্ন ও আর্থিক দায়বদ্ধতায় ভেঙে[২৮] চুরমার হয়ে গেছে।

প্রান্তীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় গেলে অন্য প্রান্তীয় মানুষকেই দোষারোপ করে নিজের বেদনাকে ভুলতে চেষ্টা করেছে। ছেলেটির মৃত্যুতে মায়ের এই দৃশ্য দেখে গোবিন্দ হতবাক হয়ে গেছে। গোবিন্দের কাছে এ যেন আর এক জীবন অভিজ্ঞতার ফসল ।

গোবিন্দের যাপনচর্চা ও প্রতিবাদী সত্তা:

গোবিন্দ এই বস্তিতে এসে শ্রমিকদের রান্নার কাজ পেয়েছে। তার বস্তিতে নাম ছিল 'ফোর-টুয়েন্টি'। এই নামটির মধ্য দিয়ে একটি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন লেখক। যার অর্থ 'ধোঁকা দেওয়া'। তবে গোবিন্দকে বস্তিতে অনেকে ধোঁকাবাজ মনে করলেও সে কিন্তু কাউকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেনি। উপন্যাসে গোবিন্দের পূর্ব জীবনের কথা তার নিজের স্মৃতিচারণ থেকেই উঠে এসেছে—

"সেদিন সে ছিল একটা আগুনের মতো মিস্তিরি ছোকরা।...ম্যানেজার হৃষ্ট চিত্তে অফিসে ডেকে তাকে পুলিসের হুকুমনামাটি দিয়ে বলল, ঘরের ডাক এসেছে, এবার সরে পড়।"[২৯]

এই ঘটনার পর গোবিন্দকে সেই জায়গা থেকে নির্বাসিত হতে হয়—

"দশ বছর আগে একদিন তাকে এখান থেকে পুলিশ বার করে দিয়েছিল, বার করে দিয়েছিল এই চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে। জেলা খারিজ করে দিয়েছিল। একলা নয়, আরও দুজনের সঙ্গে।"[৩০]

নিজেকে অপরাধী মনে করে সে গাঁয়ের পথ ধরল। কারখানার জীবনকেও সে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘর সংসার সব হারিয়ে পথকেই সম্বল করে কলকাতা শহরের পথে পা বাড়াল। শহরে এই নিম্নবর্গীয় বস্তিজীবনে এসে সে পুনরায় এই শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গী হয়ে উঠল। সে এই বস্তিতে কখনো কালোকে, কখনো নগেনকে আবার কখনো গণেশের মতো শ্রমজীবী মানুষকে বাঁচার প্রেরণা জুগিয়েছে। শুধু তাই নয়, দুলারীর মতো মৃতপ্রায় মানুষকেও স্বচ্ছল জীবনে ফিরিয়ে এনেছে। যে গোবিন্দকে উপন্যাসের শুরুতে বস্তিবাসীরা 'ফোর-টুয়েন্টি' বলে হাসি ঠাট্টা করেছে পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই 'ফোর-টুয়েন্টি'কেই তাদের পথপ্রদর্শক মনে করে আন্দোলনে নেমেছে।এই একাকীত্ব জীবনে গোবিন্দ সঙ্গী করেছে সকল বস্তিবাসীকে। এমনকি বিরিজামোহনের মতো বাড়িওয়ালা যখন অর্থের জোর খাটিয়ে বস্তিটাকে নিজের কব্জায় নিতে চেয়েছে তখন এই বস্তির বাড়িওয়ালার সঙ্গে গোবিন্দ সঙ্গ দিয়েছে। বিরিজামোহন বস্তি মালিকের ওপরে মামলা করে। এই মামলা চলাকালীন প্রায় সময় গোবিন্দের নামে শাসানি আসে। তবুও গোবিন্দ সবকিছুকে উপেক্ষা করে তার প্রতিবাদী লড়াই চালিয়ে গেছে। এদিকে আবার নতুন সমস্যা বস্তিতে দেখা দেয় শ্রমিকদের ছাঁটাই। ছাঁটাই হওয়াতে গোবিন্দ সেই সকল শ্রমিকদেরকে উদ্দীপনা জাগিয়েছে এবং বলেছে—

"ছাঁটাই আসছে, আবার, দোস্ত তোমার ফের খেপে যাবে। খেপবে কেন? খিলাফ লড়বে।"[৩১]

তাই শ্রমিকরা মালিকদের বিপক্ষে আন্দোলন করতে গেছে তখন অর্থের দাপটে মালিকরা শ্রমিকদেরকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার করায় এবং এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়।

যে মানুষেরা গোবিন্দকে একদিন বন্ধু ভাবত উপন্যাসের শেষে অনেকেই তার প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছে। এ যেন গোবিন্দের দোষ নয়, তার ভাগ্যের দোষ। এই সময় এমনকি মাদারি খেলোয়াড়ের মতো লোকেরাও গোবিন্দকে অপদস্থ করতে বাধেনি। শুধু তাই নয়, বিরিজামোহন যখন গোবিন্দের বিরুদ্ধে বলেছে—

"আপনি চটে যাচ্ছেন বাবুসাহেব। কিন্তু আমি ভালো মনেই বলছি তা সে চারশো বিশ আপনার মামলাটা কী রকম চালাচ্ছে।"[৩২]

এই কথা শুনে বাড়িওয়ালা গোবিন্দকে ভুল বুঝেছে এবং গোবিন্দকে বলেছে—

"ফোর-টুয়েন্টি, তা হলে মামলাটা একেবারে ধোঁকা দিচ্ছিস্ আমাকে।"[৩৩]

এখানেই মালিক শ্রেণির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। কারণ গোবিন্দ বস্তিবাসী, শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ। তার কাছে অর্থের দাম অনেক। বাড়িওয়ালা ভেবেছে যে মামলার টাকা বুঝি গোবিন্দ নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। যা কিন্তু সত্য নয়। বরং এই মামলার জন্য উকিলের পরামর্শে সে দোল উৎসবকেও উপেক্ষা করে কলকাতায় 'ব্যারেস্টারে'র সঙ্গে দেখা করতে গেছে। যদিও কিছু ফল হয়নি। বিরিজামোহনের মতো লোকেরা স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আর্থিক প্রভাব খাটিয়ে বস্তির চারপাশে শহরের ময়লা ফেলে দিয়ে গেছে। পরে যখন মিউনিসিপ্যালিটির হেল্থ অফিসার এখানে এসে অনুসন্ধান করেছে এবং রিপোর্টে বলেছে—

"এরকম একটা নোংরা আস্তানা বিশেষকে রাখা স্বাস্থ্য ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। যত শীঘ্র এর অপসারণ হয়, ততই মঙ্গল।"[৩৪]

গোবিন্দসহ অন্যান্য বস্তিবাসীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। বিরিজামোহন আদালতের এই রায় শুনে তার গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে বস্তির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোটা বস্তি ভেঙে চুরমার করে দেয় এবং সুযোগ পেয়ে গোবিন্দের মতো মানুষকে সে (বিরিজামোহন) খুন করে— "নির্বাক গোবিন্দ, সারা গা মাথা রক্তারক্তি।... বিরিজামোহন চিৎকার করে বলল, ভূত। ভূতে মেরেছে ওকে।"[৩৫]

এই বিরিজামোহন একদিন শ্রমিকদের প্রতিনিধি ছিল সে মালিক হয়ে গিয়ে সেই শ্রমিকদেরকেই উচ্ছেদ করতে গিয়ে খুন করতেও তার বিবেকে বাধেনি। বিরিজামোহন চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়ে দেন যে আর্থিক ক্ষমতা থাকলে শ্রমজীবী মানুষেরা যতই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করুক না কেন সে আন্দোলন একদিন না একদিন ব্যর্থ হয়।

এইভাবে কলকাতা শহর জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভাব বারে বারে এই নিম্নবর্গীয় বস্তিবাসীদেরকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। তারা ভালো শহর সংলগ্ন পরিবেশ তৈরি করতে চাইলেও তাদের সেই অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অভাব। গোবিন্দ এই শহরের বস্তি জীবনকে নানাভাবে দর্শন করেছে, বাঁচার তাগিদে লড়াই করেছে এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। গোবিন্দের মৃত্যু শুধু একজন মানুষের মৃত্যু নয়, শ্রমজীবী মানুষের নিম্ন ক্ষমতার মৃত্যু। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী শ্রেণিকে যেন এভাবেই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান মানুষেরা নিরস্ত্র করে দেয়। যা এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ও ভদ্র,গৌতম (সম্পাদনা), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ-৩
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি,বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, icbs, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ-৬৩
৩. বসু, অজিতকুমার, *কলিকাতার রাজপথ সমাজে ও সংস্কৃতিতে*, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ-৮৬
৪. তদেব, পৃ-৮৬
৫. পাল, রীতা, *বস্তিজীবন ও বাংলা নাটক*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, পৃ-৩৫
৬. তদেব, পৃ-৩৫
৭. তদেব, পৃ-৩৫
৮. বসু, সমরেশ, *নিজেকে জানার জন্যে, দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২ (বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. নিমাই, *প্রাক্-বিবর পর্বে সমরেশ বসু*, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬)
৯. বসু, সমরেশ, *বি.টি.রোডের ধারে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সং, ২০০৮, পৃ. ৬-৭
১০. চক্রবর্তী, বিপ্লব, *ভারতীয় উপন্যাসে কলকাতা সমাজতত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮, পৃ-২১৫
১১. বসু, সমরেশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৫
১২. তদেব, পৃ-৬
১৩. তদেব, পৃ-৯
১৪. লাহিড়ী, তারাপদ, *মার্ক্সীয় অর্থনীতি (প্রথম খণ্ড)*, লোকায়ত সাহিত্য চক্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩, পৃ-২৫৫
১৫. চৌধুরী, সত্যজিৎ, *সমরেশ বসু আমাদের বাস্তব*, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ-৪৭
১৬. বসু, সমরেশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৯
১৭. তদেব, পৃ-৪২
১৮. তদেব, পৃ-৩৮
১৯. তদেব, পৃ-৫৭

২০. তদেব, পৃ-৩১
২১. তদেব, পৃ-৪৭
২২. তদেব, পৃ-৮৩
২৩. তদেব, পৃ-৯১
২৪. তদেব, পৃ-৮৪
২৫. তদেব, পৃ-৮৫
২৬. তদেব, পৃ-১০৫
২৭. তদেব, পৃ-১০৫
২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, *সমরেশ বসু: সময়ের চিহ্ন*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্জিত সং, ২০১০, পৃ-৪৪
২৯. বসু, সমরেশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৫৪
৩০. তদেব, পৃ-৫৩-৫৪
৩১. তদেব, পৃ-৭৩
৩২. তদেব, পৃ-৯৬
৩৩. তদেব, পৃ-৯৭
৩৪. তদেব, পৃ-১০৯
৩৫. তদেব, পৃ-১১১

....

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিরোধ

ড.শুভেন্দু মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ইংরেজি 'Resistance' কথার অর্থ 'প্রতিরোধ'। অন্যদিকে, 'Protest' কথাটির অর্থ 'প্রতিবাদ'। এই প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ শব্দটি একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। মানুষেরা প্রতিবাদ করে যখন সফলতা পায় না তখন প্রতিরোধ গড়তে বাধ্য হয়। আমরা দেখেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবিত্ত মানুষেরা উচ্চবিত্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সমাজ এবং সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পেছনে গ্রামসি, মিশেল ফুকো, মার্কস এবং অনেক পরে রণজিৎ গুহ ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের অবদান অনস্বীকার্য। এঁরা যে তত্ত্বের সৃষ্টি করেছেন তাতে অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবর্গীয়দের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা বারে বারে উঠে এসেছে। কিন্তু কালের পরিবর্তনের আজ প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের স্বরূপ অনেকখানি বদলে গেছে। কারণ, কোনো কোনো সময়ে উচ্চবিত্তরা উচ্চ-উচ্চবিত্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, আবার নিম্ন-নিম্নবিত্তরা নিম্নবিত্তদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। ফলে মূল প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধের তত্ত্বের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। পূর্বতনদের তত্ত্বের মূল সূত্রের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে একবিংশ শতাব্দীতে। যা মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে তা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের মূল আধার।

সূচক শব্দ

নিম্নবর্গীয় মানুষের অধিকার, প্রতিবাদ- প্রতিরোধ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, উলগুলান, ফিউডাল ব্যবস্থা, মুণ্ডা সমাজ ও সংস্কৃতি।

মূল প্রবন্ধ-

'সাবলটার্ন' ইংরেজি ভাষার শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হত সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। রণজিৎ গুহ 'সাবলটার্ন' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নিম্নবর্গ'[১] শব্দটি ব্যবহার করেন। এই নিম্নবর্গচর্চা এখন ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানের পরিধিকে অতিক্রম করে সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এই ধারণাটি যদিও মার্কসীয় চর্চার সূত্র ধরে এসেছে তবুও ইতালিয়ান কমিউনিস্ট নেতা আন্তেনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর 'Prison Notebooks' (১৯২৯-৩৫) গ্রন্থে 'প্রলেতারিয়ের' শব্দ বোঝাতে 'সাবলটার্ন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইতালিও 'সুবলতের্নো' শব্দটি গ্রামসি ব্যবহার করেছিলেন মূলত দু'টি অর্থে। প্রথমটি প্রলেতারিয়েতের প্রতিশব্দ হিসেবে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সাবলটার্ন শ্রেণি হল 'শ্রমিক শ্রেণি'। এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে দ্বিতীয় শ্রেণিটি 'হেগেমনিক'। অর্থাৎ 'বুর্জোয়াসি'। এই পুঁজিবাদী শ্রেণির দ্বারা নিম্নবর্গীয় মানুষরা বিভিন্ন সময় শোষিত ও অত্যাচারিত হয়। যদিও এরা সর্বদিক থেকে পরনির্ভর। তবুও গ্রামসি আমাদের দেখালেন যে, পরনির্ভরতা সত্ত্বেও এই নিম্নবর্গ শ্রেণির মানুষরা সময় মতো প্রতিবাদ-প্রতিরোধে গর্জে ওঠে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে, এর দ্বারা তারা কখনও কখনও শাসক শ্রেণিকেও বিপদে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। বিশ শতকের ছয়ের দশকে নিম্নবর্গ ইতিহাসচর্চায় পৌরাণিক থেকে মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চার ধারা অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, সেই ইতিহাসে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণির যুক্তিবাদ-ই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[২] যদিও মার্কস কিছুটা নিম্নবর্গের ইতিহাসকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই ১৯৮২ সালে একদল ঐতিহাসিক (রণজিৎ গুহ, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড হার্ডিমান, ডেভিড আর্নলন্ড, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, গৌতম ভদ্র প্রমুখ) ইতিহাসের অতল গভীরে ঢাকা পড়ে যাওয়া নিম্নবর্গ মানুষদের বিদ্রোহ ও আন্দোলনগুলিকে তুলে আনার চেষ্টা করলেন 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'[৩] গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। ইনারাই প্রথম আদিবাসীদের সংগ্রাম ও কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাসের নবদৃষ্টিভঙ্গি জনসমক্ষে নিয়ে এলেন। সাহিত্যের অঙ্গনে নিম্নবিত্ত মানুষদের যাপন চিত্র আর্য যুগ থেকে বহমান হলেও আধুনিক যুগে অনার্যদের নিয়ে বিশেষ চিন্তাচর্চা করলেন যে সাহিত্যিক তিনি হলেন মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)। যদিও এর পূর্বে বিভূতিভূষণ কিংবা তারাশঙ্কর এই সকল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে

সাহিত্য রচনা করেছেন তবুও মহাশ্বেতা দেবীর রচনাতে নিম্নবর্গীয় এইসকল মানুষদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নবচিত্র যেন উদ্ভাসিত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'(১৯৭৭) উপন্যাসটি রচনার জন্য কুমার সুরেশ সিং রচিত 'The Dust Storm and the Hanging Mist' বইটির কাছে সবিশেষ ঋণ স্বীকার করলেও উপন্যাসের কাহিনিভাগে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস ও কল্পনা। উপন্যাসটি রচনা করতে গিয়ে মহাশ্বেতা ফিরে গেছেন ইতিহাসের সেই 'মুণ্ডা বিদ্রোহে'র পাতায়। কাহিনির সময় ভাগে এসেছে ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সাল। উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে নায়ক বিরসার মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে। এরপর লেখিকা আমাদের নিয়ে গেছেন কাহিনির 'Flash-back'-এ। উপন্যাসের শেষে একটি 'উপসংহার' অংশেরও সংযোজন করেছেন। যেটি 'অমূল্যের নোটবুক' নামে পরিচিত। উপন্যাসের মূল আখ্যানে রয়েছে মুণ্ডাদের বাড়ির সাধারণ ছেলে বিরসা কীভাবে বিদ্রোহী বিরসাতে পরিণত হল তার বর্ণনা। উপন্যাসটির শুরুতেই দেখি বিরসা ৯-জুন ১৯০০ সালে রাঁচি জেলে সকাল ৯টায় মারা গেছে। বিরসার সৎকারের সময় ছিল সালী ও শিবনেরা। সেই চিতার আগুনের ছাই নিয়ে সালী জঙ্গলে গেছে বিরসার কথা রাখার জন্য। সালী জঙ্গলে যাওয়ার সময় শিবনকে আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখার কথা বলে গেছে। সালীর মধ্যে বিরসার এই উদ্দীপ্ত প্রতিবাদী চেতনা যেন এই সকল নিম্নবিত্ত মানুষদের কাছে চিরকালের প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিরসার বাবা সুগানা মুণ্ডা এবং মা করমি 'খুটকাট্টি' গ্রাম 'উলিহাতু'তে এসে ঘর বাঁধে। সেখানে 'বিষ্যুৎবারে' জন্মগ্রহণ করে বিরসা। বিরসাসহ গোটা পরিবার চালকাড়ে আসার আগে খ্রিস্টান হয় 'জার্মান মিশন' থেকে তখন বিরসার নাম হয় 'দাউদ বিরসা' বা 'দাউদ মুণ্ডা'। বিরসার ছোটবেলা থেকে মনের মধ্যে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। কোমতা ও বিরসা দুই ভাই বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীর ধারে ঘুরে বেড়াত। 'টুইলা' আর 'বাঁশি' বাজাত। সঙ্গে থাকত ধানী। ধানী বিরসাকে প্রথম থেকেই অধিকার বোধ জাগাবার চেষ্টা করেছে। ভগবানের খোঁজে আরও ছেলেদেরকে ধানী খ্যাপায়। বিরসাকে দেখতে যেহেতু মুণ্ডারী ছেলেদের থেকে একটু আলাদা ধরনের ছিল সেহেতু ধানী তাকেই বেশি করে বিদ্রোহে উৎসাহিত করার চেষ্টা করত। কুমার সুরেশ সিং বিরসা সম্বন্ধে বলেছেন—

"Birsa's early years were spent with his parents at Chalkad. His early life could not have been much different from that of an average munda child. Later folk lores refer to his rolling and playing in sand and dust with his friends and his growing up strong and handsome in looks. ... Exciting moments of his childhood were spent on the akhara (the village dancing ground) one of his contemporaries who went out with him, however, heard him speak of strange things."[8]

বিরসা প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে জয়পাল নাগের পাঠশালায়। ইতিমধ্যে মাসি জোনীর বিয়ে হয়ে গেলে বিরসা সমস্ত গ্রামের মানুষের বাধাকে উপেক্ষা করে 'আয়ুভাতু' থেকে চলে যায় 'খাটাংগায়'। সে গ্রামের পাঠশালায় ছেড়ে দেয় এবং ছেলেদেরকে বলে— "অনেক বড় হতে হবে না আমাকে।"[৫] বিরসাকে যেন প্রবল আকর্ষণই বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই আকর্ষণ বলেই সে হাজির হয়েছে মাসি জোনীর বাড়িতে। সেখানে জোনীর স্বামী তাকে গাইচরীর কাজ দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই বিরসা বুঝতে পারে তার লক্ষ্যের বিচ্যুতি ঘটছে। লুকাস প্রচারক তাকে বলেছিল গাইচরী করে জীবন না কাটিয়ে চলে আয় লেখাপড়া শেখ কত কাজ করতে পারবি। বিরসা তা চাইলেও অভাবই সেই পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিরসার গাইচরীতে মন বসত না। গাইচরীর ভুলে মেসোর কাছে মার খেয়ে সেই বাড়ি ত্যাগ করে। পরে লুকাস প্রচারকের প্রচেষ্টায় পড়াশোনার জন্য ভর্তি হয় 'বুরজুর' জার্মান মিশনে। এখানে পড়া শেষ করে অনেক কষ্টে বাড়ির মত নিয়ে পড়াশোনার জন্য 'চালকাড়' থেকে 'চাইবাসা' মিশনে বিরসাসহ গ্রামের তিনজন ছেলে যায়।

এই 'চাইবাসা'র মিশনে বিরসার বন্ধুত্ব হয় অমূল্যের সঙ্গে। বিরসার এখানকার পড়াশোনাও বেশিদিন স্থায়ি হয়নি। একদিন ফাদার নট্রটের সঙ্গে তার মতবিরোধ হয়। প্রচণ্ড ক্ষোভ, অসন্তোষ নিয়ে বিরসা বন্ধু অমূল্যের কথা উপেক্ষা করে এই মিশন ত্যাগ করে। বিরসা গ্রামে ফিরলে ধানী মুণ্ডা তার অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে চেয়েছে। অর্থাৎ বিরসাকে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন করে তুলতে চেষ্টা করেছে। এই সময় ১৮৭৮ বন ও ভূমি সালের আইন অনুযায়ী সরকার মুণ্ডাদের কাছ থেকে জমি ও জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেয়। এই পরিস্থিতি থেকে মুণ্ডা জাতিকে বাঁচাতে বিরসা সরকারি অফিসে আর্জি করে। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয় না। পরবর্তীক্ষেত্রে বিরসা ধানীর দেখানো পথকে অনুসরণ করে মুণ্ডাজাতিকে অরণ্যের অধিকার এনে দিতে চেয়েছে। বিরসা মুণ্ডাদের কাছে 'ভগবান' হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে 'ধরতি-আবা'।

১৮৯৭ সালে বিরসা জেল থেকে ছাড়া পায়। সে ইতিমধ্যে বুঝেছিল খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের কাছ থেকে প্রাপ্য অধিকার পাবে না। তাই নিজেই মুণ্ডা জাতিকে ন্যায্য অধিকার দিতে 'উলগুলানে'র ডাক দেয়। বিরসা গ্রামে আসাতে খ্রিস্টান হওয়া মুণ্ডারা মিশন ত্যাগ করে তাদের 'ভগবানে'র কাছে চলে আসে। বিরসার এতদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটল এই 'উলগুলানে'। বিরসা সকল মুণ্ডাকে একত্রিত করতে সিমবুয়া পাহাড়, ডোমবারি পাহাড়ে সভা করে। শুধু তাই নয়, বাড়ির সভাতে মা করমি উপস্থিত থেকে গর্ব অনুভব করেছে। এইসব সভাতে বিরসা কীভাবে বিদ্রোহ করবে তার পরিকল্পনা বিরসাইতদের জানায়। পুলিশ 'চিরুণি তল্লাসী' করেও বিরসাইতদের ধরতে পারে না। বিরসাইতরা বিদ্রোহের গান গেয়েছে—

"চল, তুলে নাও ধনুক, তীর ও বলোয়া
আজ বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল"[৬]

বিরসা বুঝতে পেরেছে যে এই গান তাদের সময়-ই শিখিয়েছে।

এই মুণ্ডা জনগোষ্ঠী কেন প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছে তার কিছু কারণ আমরা 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে দেখতে পাই—

১। সরকার ১৮৭৮ সালে আইন অনুসারে অরণ্যের অধিকার থেকে মুণ্ডা জাতিকে বঞ্চিত করে।
২। দিকুরা মুণ্ডাদের ওপর নানাভাবে শাসন ও শোষণ শুরু করে।
৩। ব্রিটিশ সম্প্রদায় এবং খ্রিস্টান মিশনারীরা মুণ্ডাদের সংস্কৃতিকে আক্রমণ করে।
৪। ব্রিটিশরা মুণ্ডাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করতে শুরু করে। নিজেদের জমিতে নিজেরাই ক্রীতদাসে পরিণত হয় যৌথ মালিকানা হারিয়ে।

মুণ্ডা জনগোষ্ঠীরা বঞ্চিত অধিকারকে ফিরে পাওয়ার জন্য ইংরেজ এবং তৎকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এই বিদ্রোহে বিরসা মুণ্ডার পাশাপাশি গোটা মুণ্ডা জাতি সামিল হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'প্রতিরোধ' সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

"আমাকে সমালোচনা করা হয়: আন্দোলন যেখানে নেই সেখানে তিনি মানুষের প্রতিরোধ দেখাচ্ছেন, উনি বোধ হয় ইতিহাসের মধ্যে একটা উইশ ফুলফিলমেন্ট ঢুকিয়ে দিচ্ছেন- ইচ্ছা পূরণ জাতীয় জিনিস। কিন্তু এই প্রতিরোধ তো আমি সর্বদা দেখতে পাই।...প্রতিরোধ আমি নিরন্তর দেখি। পায়ে হেঁটে দেখি, ঘুরে দেখি, খবর পোঁছে যায়, নানাভাবে দেখি। প্রাচীন দিন আজকের দিনেরই মতো- এই বঞ্চনা, এই অসাম্য, ভূমিপুত্রদের ভূমি থেকে বঞ্চিত করা।"[৭]

এই বঞ্চনা থেকেই সৃষ্টি হয় নিম্নবর্গীয়দের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে দুই ধরনের প্রতিরোধের স্বর শোনা গেছে—

'অরণ্যের অধিকার' প্রতিরোধের উপস্থাপন

পুরুষের প্রতিরোধ	নারীর প্রতিরোধ
উদাহরণ: বিরসা মুণ্ডা, ধানী মুণ্ডা,জোনীর স্বামী	উদাহরণ: জোনী, সালী, করমি

ক। পুরুষের প্রতিরোধ:

বিরসার প্রতিরোধ:

উপন্যাসে বর্ণিত সুগানা মুণ্ডা ও করমির ছেলে বিরসা ছেলেবেলা থেকেই পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। বিরসার মনের মধ্যে প্রথম থেকেই বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। সেই সূত্রে সে গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে মাসীর বাড়ি আসে এবং কিছুদিন পর লুকাস প্রচারকের প্রচেষ্টায় ভর্তি হয় 'বুরজুর' জার্মান মিশনে। সেখানে পড়াশোনা শেষ করে ১৮৮৬ সালে 'চাইবাসা মিশনে' ভর্তি হয়। এই মিশন থেকেই বিরসার মনে প্রথম অসন্তোষের জন্ম নেয়। বিরসার বিদ্রোহের আগে থেকে সর্দারেরা তৎকালীন ইংরেজ ও ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'মুক্তি লড়াই' চালাচ্ছিল। এই লড়াইয়ে যখন সর্দারেরা দেখল মিশন কোনো সাহায্য করছে না, তখন তারা মিশন ছেড়ে

চলে যায়। তাই ফাদার নট্রট সর্দারদের 'জোচ্চোর' বলেছিল। এই কথা শুনে বিরসা মুণ্ডা ছেলেদেরকে বলে 'ফাদাররা বদমাস'। বিরসার এই আচরণে অসন্তুষ্ট ফাদার নট্রট তাকে (বিরসা) ডেকে পাঠায় এবং বলে—

" 'বিরসা দাউদ! তুমি মিশনের নামে নিন্দা করছ কেন?' "[৮]

বিরসা তার উত্তরে বলে—

"আপনারা সর্দারদের জোচ্চোর বলছেন কেন?"[৯]

এই জিজ্ঞাসাবাদে তাদের (নট্রট ও বিরসা) মধ্যে মতবিরোধ ঘটে এবং বিরসার অসন্তোষের স্পৃহা স্ফুলিঙ্গ ধারণ করে যখন ফাদার নট্রট বলেছে সকল মুণ্ডা বেইমান। তখন বিরসা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফাদার নট্রটের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করে বলে—

"বেইমানী জানে না হে মুণ্ডা। জানলে পরে তারা মিশনকে মিশন উড়ায়ে দিত।"[১০]

বিরসা আরো বলে—

"সাহেব-সাহেব এক টোপি। সরকার যা, মিশন তা, এক সমান।"[১১]

এই ঘটনার ফলে বিরসা বুঝতে পারে মিশনে থাকলে তাদের অধিকার ফিরে পাওয়া যাবে না। কারণ, মিশন ও সরকারের মধ্যে যে যোগাযোগ রয়েছে সে কথা অনুভব করেছিল। এই জন্য বন্ধু অমূল্যের বাধাকে সে উপেক্ষা করে মিশন ত্যাগ করে।

উপন্যাসে দেখা যায় বিরসা মিশন ছেড়ে চলে আসে গ্রামে। এখানে এসে সে দেখে যে জঙ্গল ও ভূমিতে মুণ্ডাদের অবাধ বিচরণ ছিল, যার থেকে তারা কাঠ, মধু সংগ্রহ এবং গাইচরী করে জীবন কাটাত সেই জঙ্গল ও ভূমির অধিকার সরকার ১৮৭৮ সালের আইনের বলে কেড়ে নিয়েছে। তখন বিরসার মনে অধিকার বোধের ক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। সে বলেছে—

"অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ-ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমোচ্ছিল, তখন থেকেই কৃষ্ণ-ভারতের কালো মানুষরা জঙ্গলকে মা বলে জানে।"[১২]

এই অধিকার ফিরে পেতে বিরসা প্রথমে আইনের দ্বারস্থ হয়। সেই অফিসের লোকেরা বিরসা 'মুণ্ডা' বলে তাকে অপদস্ত করতে চাইলে সেই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছে—

"-'এই দিকু। আমার নাম বিরসা। আমি সাহেব ডরাই না। ঠিকভাবে কথা বল্।'... 'নইলে কুচিলা বাণ ফুড়ে দিব।'"[১৩]

এর ফলে বিরসা বুঝেছিল তার এই আর্জিতে কোনো কাজ হবে না। যা করতে হবে তাকে একাই করতে হবে, এই ভেবে সে গ্রামে গিয়ে সার্বিক শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বলেছে—

"আমি ভগবান। আমিই ভগবান। আমি মুণ্ডাদের ছেলে ভুলাব না, কোলে দুলাব না। আমি সকলের জন্য এই জঙ্গল মাটি জিনে এনে দিব।"[১৪]

বিরসা 'ভগবান' হয়ে তৎকালীন আইনকে না মেনে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে অরণ্য জননীকে 'দিকু'দের হাত থেকে রক্ষা করার আশ্বাস দিয়েছে।

উপন্যাসে বিরসা এই অরণ্য জননীকে রক্ষা করতে বিদ্রোহ করে এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বিচারে তার দু'বছর কারাদণ্ড হয়। জেলে বিরসার সঙ্গে দেখা হয় বন্ধু অমূল্যের। অমূল্য তখন প্রশাসনের প্রতিনিধি। অমূল্য রাত্রিবেলা বিরসার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং যখন তার হাত ধরতে যায় তখন বিরসা তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে—

"'আমাকে ছুঁয়ো না তুমি। তুমি দিকু।'... 'কিসের জন্য দিকু হলে বলতে পার?...'"[১৫]

বিরসা ভেবেছিল বন্ধু অমূল্য মুণ্ডাদের বিদ্রোহে যোগ দেবে। কিন্তু অমূল্য তা না করাতে এবং 'দিকু'দের দলে যোগ দেওয়াতে বিরসার মনে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষই প্রকাশ পেয়েছে।

ধানীর প্রতিরোধ:

ধানী চরিত্রটি উপন্যাসে একটি অনবদ্য প্রবীণ চরিত্র। মুণ্ডা সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা অনেক। তার দীর্ঘ জীবনে মুণ্ডাদের ওপর নেমে আসা অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন হওয়া ও অরণ্যের অধিকার হারানো মুণ্ডাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছে। শুধু তাই নয়, সর্দারদের 'মুল্কি লড়াই', 'খোয়াব লড়াই', 'সাঁওতাল বিদ্রোহে' প্রত্যক্ষ ভাবে তীর ছুঁড়ে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেছে। মুণ্ডা আদিবাসীরা তার কাছ থেকেই শুনেছে তাদের অতীত জীবনের কথা। ধানী প্রথম থেকেই বিরসাকে অরণ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন

করার চেষ্টা করেছিল। সে নিজে নেতৃত্ব না দিয়ে বিরসার মাধ্যমে সেই বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বালানোর চেষ্টা করে। বিরসা যখন 'উলগুলানে'র ডাক দিয়েছে, সেই ডাকে পরোক্ষ ভাবে সামিল হয়েছে ধানীও। ধানী চায় বিরসা ইংরেজ ও তৎকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুক। বিরসার মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা গড়ে তুলেছে এই ধানী-ই। সে বলেছে–

"'নিয়ে যা তোরা! আজ পাঁচ বছর ধরে আমি অনে-ক তীর তৈয়ার করছি রে। আমি জানতাম বিরসা একদিন তীর ভেজা দিবে।'"[১৬]

এই ধানীর তৈরি তীর মুণ্ডাদের সবগুলো গ্রামে পৌঁছানোর আগেই প্রশাসনের টনক নড়তে শুরু করেছিল। কারণ, প্রশাসন বুঝতে পেরেছিল মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

জোনীর স্বামীর প্রতিরোধ:

উপন্যাসে দেখা গেছে জোনীর বিয়ে হওয়াতে শ্বশুরবাড়ি 'খাটাংগা'য় এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে বিরসাও। বিরসা এখানে এসে গাইচরীর কাজ করে। প্রথমে পড়াশোনা বিষয়ে মেসো বিরসাকে সাবধান করে বলেছে–

"লিখিপড়ি মুণ্ডা দেখতে পারি না আমি। গাইচরাই কর, পেটভরে খা, আখরা যেয়ে নাচ-গান কর। মুণ্ডা যখন লিখিপড়ি করে দিকু হতে যায় তখন মরে। মুণ্ডা হয়া জন্মাব, আবার লিখিপড়ি করব, উ সব চালকাড়ের চাল।"[১৭]

এই সাবধানতার মধ্য দিয়ে মেসোর অসন্তোষই প্রকাশ পেয়েছে। মুণ্ডাজাতিরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জগৎ থেকে বেরিয়ে অন্য জগতকে ধরার চেষ্টা করে না। মুণ্ডাদের সমাজে পড়াশোনা না করলেই চলে, কিন্তু বিরসার পড়াশোনার কথা মেসো জানতে পারলে বিরসাসহ অন্য মুণ্ডাদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছে। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায়, একই সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও কোনো মুণ্ডার বিশেষ উন্নতি সাধনকে মেসো ভালো চোখে দেখেনি।

খ। নারীর প্রতিরোধ:

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে দেখা গেছে মুণ্ডা বিদ্রোহে পুরুষদের পাশাপাশি সামিল হয়েছে মুণ্ডা নারীরাও। এই উপন্যাসে মুণ্ডা নারীদেরকে তিন ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে দেখা গেছে –

১। ফিউডাল ব্যবস্থা ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুণ্ডা নারীর প্রতিরোধ;

২। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রতিবাদ;

এবং ৩। সন্তানের প্রতি মাতৃত্বের প্রতিরোধ।

সালীর প্রতিরোধ:

সালী চরিত্র উপন্যাসে এক অনবদ্য নারী চরিত্র। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নারীত্বের দু'টি রূপ ফুটে উঠেছে–

(১) প্রতিবাদী নারীসত্তা

(২) সাংসারিক নারীসত্তা

উপন্যাসে দেখা গেছে সালী প্রথমে 'বিরসাইত' হতে চায়নি। পরে বিরসার মহত্ত্ব বুঝতে পেরে 'উলগুলানে'র সঙ্গী হয়েছে। শুধু তাই নয়, জেল থেকে পালিয়ে আসা ধানী মুণ্ডাকে সালী জঙ্গলের গুহার ভিতর লুকিয়ে রেখে এসেছে। নিজে গর্ভবতীর অভিনয় করে বিভিন্ন গ্রামে 'কুচিলা তীর' পাচার করেছে। রাত্রিবেলায় ভয়-ভীতিকে ভুলে ধানীকে খাবার দিয়ে এসেছে। এই সব কাজ করেছে সে প্রশাসনের চোখকে এড়িয়ে। তবুও কোন কোন সময়ে ভরত দারোগা তার পিছু নিয়েছে। তাই একদিন ভরত দারোগার বিরুদ্ধে ধানীর কাছে প্রতিবাদ করে বলেছে–

"উ শালাকে আমি একদিন বলোয়া ফুঁকে দিব।"[১৮]

এই সাহসিকতার কাজ করতে করতে সালী বিরসার আন্দোলনে সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হয়েছে এবং বিরসার জীবনের সমাপ্তিতে এই বিদ্রোহকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। তাই সে বিরসার কথা মতো চিতার ছাই জঙ্গলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং বলেছে–

"'উলগুলানের শেষ নাই। ভগবানের মরণ নাই।'"[১৯]

এইভাবে সালী মুণ্ডাদের কাছে এই বক্তব্য প্রচার করে বিরসার মৃত্যুর পর 'উলগুলান' কে সুদূর প্রসারী করতে চেষ্টা করেছিল।

বিরসা যখন প্রথামবার জেলে যায় তখন মুণ্ডাদের গ্রামে অভাব অনটন দেখা দেয়। এই অভাবের তাড়নায় অনেক মুণ্ডা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও সালী তার প্রতিবাদী সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—

"সালী ক্রিশ্চান হতে যায়নি।"[২০]

অন্যদিকে, পুলিশের চোখকে এড়িয়ে ধানী মুণ্ডাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। সালীকে টাকার লোভ দেখিয়ে পুলিশ তার প্রতিবাদী সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। সালী প্রথমে বিরসার পথ অনুসরণ করতে চায়নি কারণ সে ভেবেছিল তার সোনার সংসারে আগুন লাগাচ্ছে বিরসা। তাই তার স্বামী ডোনকা 'বিরসাইত' হয়েছে বলে তার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করে বলেছে—

"'আমি হব বিরসাইত? আমার সোনার সংসারে আগুন লাগায়ে দিয়াছে বিরসা।'"[২১]

অর্থাৎ, অভাবের সংসারে স্বামীর এই আচরণকে সালী মেনে নিতে পারেনি।শুধু যে ফিউডাল ব্যবস্থা ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুণ্ডা নারীদের প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে তা কিন্তু নয়, স্বামীর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছে। যা উপন্যাসে জোনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে।

জোনীর প্রতিরোধ:

এই উপন্যাসে বিরসা পড়াশোনার জন্য মাসি জোনীর বাড়িতে যায়। সেখানে গিয়ে সে প্রায়ই দেখতো মেসো জোনীকে অত্যাচার করে। প্রথমে জোনীর মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হলেও কোনো প্রতিবাদ করেনি। একদিন বিরসা গাইচরী করতে গিয়ে অজান্তে ভুল করে। তাই মেসো বিরসাকে প্রচণ্ড মারধর করে। এই দৃশ্য দেখে জোনীর মন থেকে ভয়ের আড়াল সরে যায়। সে সহ্য করতে না পেরে স্বামীর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করে বলে—

"'হতভাগা! বুড়ো ভাম যেন! জানে ছেলাটা মোর ছেলার মতো। গায়ে হাত তুলল।...উয়ার ভাত খাব না আমি! দাদার কাছে চলে যাব।"[২২]

এই দৃশ্য দেখে বিরসা বুঝেছিল জোনী মনে অসম্ভব আঘাত পেয়েছে। তাই সে সমস্ত ভয়-ভীতিকে ভুলে এতদিনের মনের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে প্রকাশ করেছে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ বিশ শতকের শেষ দিকে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর এই প্রতিবাদ সমাজে অন্য বার্তার সঞ্চার করেছে।

করমির প্রতিরোধ:

উপন্যাসে দেখি বিরসার মা করমি মুণ্ডা জননীকে বাঁচাতে বিরসা যে 'ভগবান' হয়েছে তাতে সে গর্ভ অনুভব করেছে। কিন্তু সব সন্তান-ই যদি বিরসার 'উলগুলানে'র ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে মা বাঁচবে কী নিয়ে? তাই তার মাতৃময়ী মন বিরসার বিরুদ্ধে বলে উঠেছে —

"'তুই ভগবান হয়াছিস, হ। কোমতা কনু আরান্দি করাছে, মেয়েগুলো স্বামীর ঘর গিয়াছে, সকলরে টানিস কেন?'"[২৩]

এ যেন মাতৃত্বের অন্য এক প্রতিরোধের চিত্র।

এইভাবে মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসটিতে নিম্নবর্গীয় মুণ্ডা জনজাতির মধ্য দিয়ে প্রথমে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সবশেষে সশস্ত্র সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। মুণ্ডাদের 'উলগুলান' প্রকৃত অর্থে ফিউডাল ও ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বর্ণনা উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। যারা সম্মিলিতভাবে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দেয়, তারা সকলেই হয় বিরসার দ্বারা অথবা তাদের মতো অধিকার সচেতন নেতার দ্বারা চালিত। এই নেতাদের শৃঙ্খল, কারাগারে মৃত্যু কোনো কিছুই চলার পথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। তাই বিরসার মৃত্যুতে এই বিদ্রোহের আগুন কিছুটা স্তিমিত হলেও পুরোপুরি দমিত হয়নি। কারণ, সালীর মতো চরিত্ররা বিরসার বাণীকে চির জীবনের সঙ্গী করে জনমানসের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই শেষে অমূল্যের মুখেও শোনা গেছে সেই প্রতিধ্বনি—

"উলগুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ নাই।"[২৪]

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ও ভদ্র,গৌতম (সম্পাদনা), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ-৪

২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-৫৯

৩. Guha, Ranjit, *SUBALTERN STUDIES I: Writings on South Asian History and Society* , Oxford University Press, Oxford, 1982, p.-8

৪. Singh, Suresh, *The Dust-Storm and the Hanging Mist*, Firma Klm Private Limited, Calcutta, Frist

Edition,1966, p-34,
৫. দেবী, মহাশ্বেতা, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ঊনবিংশ মুদ্রণ, ১৪১৫, পৃ-৪৮
৬. তদেব, পৃ-১৫২
৭. ঘোষ, নির্মল, *মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৮, পৃ-১২৫
৮. দেবী, মহাশ্বেতা, *প্রগুক্ত,* পৃ-৬৫
৯. তদেব, পৃ-৬৫
১০. তদেব, পৃ-৬৫
১১. তদেব, পৃ-৬৫
১২. তদেব, পৃ-৭০
১৩. তদেব, পৃ-৭০
১৪. তদেব, পৃ-৭৬
১৫. তদেব, পৃ-৯৪
১৬. তদেব, পৃ-৮৭
১৭. তদেব, পৃ-৪৮-৪৯
১৮. তদেব, পৃ-১১০
১৯. তদেব, পৃ-২৮
২০. তদেব, পৃ-১০৪
২১. তদেব, পৃ-১০৭
২২. তদেব, পৃ-৫২
২৩. তদেব, পৃ-১২৬
২৪. তদেব, পৃ-২১৬

....

রাজশেখর বসুর 'দক্ষিণ রায়' ছোটোগল্প : নিম্নবর্গের অবস্থান ও উচ্চবর্গের রাজনৈতিক বোঝাপড়া

সোমনাথ চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ-

গল্পকথক কেদার চাটুজ্যে মশায় ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে সুন্দরবন অঞ্চলের বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় উচ্চবর্গের প্রতিনিধি হলেও কেদার চাটুজ্যে দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি খুব নিষ্ঠাভরে পড়েছে। দক্ষিণ রায়ের মধ্যেও 'জাতে' ওঠার একটা সার্বিক প্রয়াস দেখা গেছে। 'অতি হতভাগা' বকুলাল দত্তকে কেদার ব্রাহ্মণ ও দক্ষিণ রায় দুজনেই রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে। বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি কীভাবে এই গল্পে দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সহযোগী ও সমন্বিত হয়ে উঠেছে, তা দেখানো হয়েছে। নিম্নবর্গের অবস্থান ও উচ্চবর্গের রাজনৈতিক বোঝাপড়া এই গল্পে পাঁচালির অলৌকিকতার সঙ্গে বন্ধন স্থাপন করেছে। গল্প শেষে বকুলাল দত্তকে 'ব্যাঘ্ররূপী' বরদানে ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার দুই বর্গের প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে।

সূচক শব্দ-

দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি, উচ্চ ও নিম্নবর্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ষের রাজনীতির কূট-বিচারণা, জাতে ওঠার প্রয়াস, অলৌকিকতা, ধর্ম।

মূল প্রবন্ধ-

বাস্তব সমাজ ব্যবস্থা থেকেই বিভিন্ন (**ব্রাহ্মণ** , ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের জীবন-জীবিকা, রীতি-নীতি, ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তবে আজও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, উল্লিখিত এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা 'ভারত ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।'[১] 'নিম্নবর্গ' বা ইংরেজিতে 'Subaltern' শব্দটি দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) ব্যবহার করেছেন। এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ও বর্গের মধ্যে কারা কারা আসবে-এ নিয়ে প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত অবস্থায় থেকে গেছে। সমাজে বসবাসকারী কিছু মানুষ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ও বর্গ ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চলেছে। আবার প্রয়োজনে তারা সমন্বিত ও সমীকৃতও হয়েছে। গল্পকার রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) 'দক্ষিণ রায়' গল্পটি এই সমন্বয়ের ফল। রাজশেখর বসুর 'কজ্জলী' (১৯২৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'দক্ষিণ রায়' ছোটোগল্প। গল্পের কথক ব্রাহ্মণ কেদার চাটুজ্যে মশায় তার বিদ্যার পরিচয় দিয়েছে। সে গল্পটি উপস্থাপনের সময় সকলকে দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি পড়ে শুনিয়েছেঃ **"পরম পণ্ডিত তেঁহু ভেদজ্ঞান নাঞি, / সকল জীবের প্রতি প্রভুর যে খাঞি।"**[২] এই পাঁচালি পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে দেবতার কাজকর্মে সকলের প্রতি একটা সমান ভাব বজায় রাখার চেষ্টা দেখানো হয়েছে। তবে প্রশ্ন জাগে কে এই দক্ষিণ রায় ? এই দক্ষিণ রায় হল বাঘের দেবতা। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেনঃ **"বাংলার দক্ষিণ দিকের অধিকারী দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়।"**[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি কৃষ্ণরাম দাস, হরিদেব প্রমুখ কবিদের দ্বারা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য নিয়ে পাঁচালি তথা 'রায়মঙ্গল' কাব্য লেখা হয়েছিল। দক্ষিণ রায় যে বাঘের দেবতা, এ কথা চাটুজ্যে মশায় নিজেই বলেছে। দক্ষিণ রায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে চাটুজ্যে মশায় পাঁচালি গেয়ে উঠেছে। বকুলাল দত্তের জীবন কাহিনিকে বলতে গিয়ে তার দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি পড়া গল্পটির আলাদা তাৎপর্য বহন করেছে। এই তাৎপর্যের সারবস্তু দক্ষিণ রায়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। চাটুজ্যে যে পাঁচালি পড়েছে তাতে বোঝা গেছে যে, এই দক্ষিণ রায় সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের দেবতা। এ ব্যাপারে কেদার চাটুজ্যে নিজের পণ্ডিতসুলভ মূল্য নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে বলেছেঃ

"রায়মঙ্গল। আমার একটা পুঁথি আছে, তিন শ বছরের পুরনো। সেটা নেবার জন্যে চিমেশ মিত্তির ঝুলোঝুলি। ছোকরা তার ওপর প্রবন্ধ লিখে ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তার উপাধি পেতে চায় । দেড় শ অবধি দিতে চেয়েছিল, আমি রাজী হইনি। প্রবন্ধ লিখতে হয় আমিই লিখব। নাড়ীজ্ঞান আছে, ডাক্তার হতে পারলে বুড়ো বয়সের একটা সম্বল হবে।"[৪]

তার কথায় বোঝা গেছে যে, দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি সম্পর্কে আলোচনা খুব কম পাওয়া যায়। তাকে সুযোগ করে দিলে সে এই ব্যাপারে গবেষণা করে তার নিজের দক্ষতা দেখাতে পারত। আরও একটা বিষয় লক্ষ করা গেছে যে, চাটুজ্যে মশায় অন্য কাউকে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা 'রায়মঙ্গল'-এর পুঁথি দিতে চায়নি। তার মতে, চিমেশ মিত্তিরকে পুঁথি দিলে সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডাক্তার' উপাধি পেয়ে যেতে পারে। সে অনুমান করেছে যে, তা হলে পুঁথি সংগ্রাহক হিসেবে তার নিজের কৃতিত্ব ঢাকা পড়ে যাবে। দক্ষিণ রায়ের পুরোহিত হিসেবে সে তার নিজের অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত নয়। গল্পে কেদার চাটুজ্যে বর্ণ ব্রাহ্মণ। দক্ষিণ রায়ের পুজোয় দেখা গেছে বর্ণ ব্রাহ্মণরাই এই দেবতার পুজো করে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে, কোনো শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই দেবতার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। তবে তাঁর মতে, এই দেবতার শাস্ত্রীয় বিধানে পূজা হয় এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা পুজো প্রচার করেন।[৫]

চাটুজ্যে মশাইয়ের দক্ষিণ রায়ের ব্যাপারে অধিক আগ্রহ গল্পটির বিশেষ উদ্দেশ্যকে শ্রোতার কাছে বড় করে জাহির করেছে। 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু আমাদের জানিয়েছেনঃ

"দক্ষিণবঙ্গের 'দক্ষিণ রায়' মানুষ নন, দেবতা এবং শুধু দেবতা নন, বাঘের দেবতা। বাঘের দেবতা অর্থাৎ ব্যাঘ্ররূপী দেবতা নন। বাঘের উপর আধিপত্য যাঁর বেশি তিনিই বাঘের দেবতা রূপে কল্পিত দক্ষিণ রায়।"[৬]

তাঁর এই বক্তব্যে দক্ষিণ রায়ের কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। এক) সে মানুষ নয়, দেবতা শুধু। দুই) দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা। তিন) তবে বাঘের মতো রূপ তার নয়। বাঘের উপর তার আধিপত্য বেশি অর্থাৎ বাঘেদের রাজা বিশেষ। প্রাকৃতিক বন্য প্রাণীদের ও অনিষ্ট দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ব্যাঘ্র দেবতার পুজো করত। গল্পকার তাঁর 'দক্ষিণ রায়' গল্পে নিম্নবর্গের এই লোক প্রচলিত আখ্যানকেই বেছে নিয়েছেন। গল্পে কেদার ব্রাহ্মণ হওয়াতে দক্ষিণ রায়ের পুজো প্রচারের উদ্দেশ্যে বকুলাল দত্তের 'অতি হতভাগা'[৭] জীবনের কাহিনি বর্ণনা করেছে। গল্পকার পাঠককে গল্পই শোনাতে চেয়েছেন। গল্প শোনাতে গিয়ে গল্পকার মাধ্যম গ্রহণ করেছেন।

'দক্ষিণ রায়' গল্প শুরু হয়েছে বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানায় গল্প বলার মধ্যে দিয়ে। সেই বৈঠকখানায় চাটুজ্যে মশায়, বিনোদ উকিল, বংশলোচন বাবুর শালা নগেন হাজির হয়েছে। গল্পের প্রথম থেকেই পাঠকের কাছে একটা কৌতূহল বজায় থেকেছে। এই কৌতূহল চাটুজ্যে মশাইয়ের আচরণের প্রতিক্রিয়ায় ধরা পড়েছেঃ

- **"চাটুজ্যে উঠিয়া দরজা ও জানালায় উঁকি মারিয়া দেখিলেন।"[৮]**

- **"ঠিক কথা। আর ব্যাপারটাও বড় অলৌকিক, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। নাঃ, যাক ও কথা।"[৯]**

চাটুজ্যে মশায় 'বড় অলৌকিক' শব্দটি ব্যবহার করেছে। তার এই শব্দটির দ্বারা বোঝা গেছে যে, সে একটি গল্প শুরু করতে চলেছে। তার আলোচনাকালে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা ও জানালায় 'উঁকি' দেওয়াটা এবং 'অলৌকিক' শব্দের ব্যবহার করাটা দুটোই 'দক্ষিণ রায়' গল্পের বাতাবরণ তৈরি করেছে। তার পূর্বে বংশলোচনের শালা নগেন 'রাউলাট' আইনের কথা তুলেছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের চেহারাটি গল্পের শুরুতেই উঠে এসেছে। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা রাওলাট আইন জারি করা হয়েছিল। এই আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারী, যারা ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য বিদ্রোহ করেছিল, তাদের কঠোর হাতে দমন করার জন্য আইন জারি করা হয়েছিল।[১০] ব্রিটিশ শাসনের এই রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে গল্পের চাটুজ্যে মশায় তার এক জানা 'অলৌকিক' কথা টেনে এনেছে। তার এই অলৌকিক গল্পের এক চরিত্র হল মজিলপুরের চরণ ঘোষের মেসো বকুলাল দত্ত। সকলের কাছে সে মারা গেলেও চাটুজ্যে মশায় বলেছেঃ **"ছাই শুনেছ। বকুলাল আছেন, তবে এখন চেনা দুষ্কর। একআনা খরচ করলেই দেখে আসতে পার, কেবল রবিবার বিকেলে এক টাকা।"[১১]** বকুলাল মারা গেছে। তার সঙ্গে বকুলাল বেঁচে আছে- এই দুরকম ভাবনা সমাজে দেখা গেছে। গল্পের উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে চাটুজ্যে মশাইয়ের এই ধরনের কথা গল্পটিকে 'অলৌকিক' করে তুলেছে। তার এই অলৌকিকতার পরিচয় সমগ্র গল্পে ফুটে উঠেছে। এই বকুলাল দত্তের সামান্য পরিচয় দিতে গিয়ে উকিল বিনোদ জানিয়েছে যে, তার এক মস্ত বাড়ি আছে। তার কথা থেকে এটাও জানতে পারা গেছে যে, সে তার মনের দুঃখ নিয়ে মারা গেছে। এই মারা যাওয়ার কারণ কাউন্সিলে না ঢুকতে পারার জন্য।[১২] বকুলালের সম্বন্ধে সমাজের অন্যান্য মানুষের কাছে এটুকুই তথ্য আছে। চাটুজ্যে মশায় এরপরেই তার গল্প শুরু করেছে। সে বলেছে যে, পনের বছর আগে বকুলাল তার বন্ধু রামজাদুর অফিসে কাজে ঢুকেছিল। বিপক্ষের 'ঘুষ'[১৩] খেয়ে একটা সমন ধরাতে দেরি করলে তার বন্ধু তাকে

'যাচ্ছেতাই'[১৪] বলে অপমান করেছিল। বকু এরপরেই রাগের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকেই তার বন্ধুর ওপর বকুলাল দত্তের প্রচন্ড 'আক্রোশ'[১৫]। এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার অতি হতভাগা জীবন। বকুর হুগলিতে থাকা এক বিধবা পিসি তার অনেক সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও বকুর দিকে ফিরিয়েও তাকায়নি। কয়েকটি বাক্যের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ মশায় খুব তাড়াতাড়ি বকুর জীবনের কাহিনি শুনিয়েছে। বকুর কাহিনিটিকে অতি বড় করে তোলার কোনো ইচ্ছে চাটুজ্যের মনে আসেনি। পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য সে সমস্ত ভগবানকে ডেকেছে। নিম্নে গল্পের কিছু অংশ তুলে ধরা হলঃ

"নগেন রোমাঞ্চিত হইয়া আবার বলিয়া ফেলিল— 'দক্ষিণ রায় !'

চাটুজ্যে মশাই মুখ খিচাইয়া ভেংচাইয়া বলিলেন— 'দ্যাক্ষিণ রায় ! তোমার ম্যাথা ! গ্যাল্পটা তুমিই ব্যালো না, আমি আর বঁকে মরি কেন।'

উদয় খুশী হইয়া বলিল- 'নগেন মামার ঐ মস্ত দোষ, মানষকে কথা কইতে দেয় না। আমার শালীর পাকাদেখার দিন—'

চাটুজ্যে অস্থির হইয়া বলিলেন— 'আরে গ্যালো যা ! একজন থামলেন তো আর একজন পোঁ ধরলেন ! যা- আমি আর বলব না।'

বিনোদবাবু, বলিলেন— 'আহা কেন তোমরা রসভঙ্গ কর ! ব্রাহ্মণকে বলতেই দাও না।' "[১৬]

নগেন 'দক্ষিণ রায়'-এর কথা তুলেছে। তবে কে এই দক্ষিণ রায় ? উদয় বলেছে, তার এক পিসশ্বশুরের নাম দক্ষিণ রায়। চাটুজ্যে মশাইয়ের মুখ ভ্যাংচানো, 'আমি বকে মরি কেন', 'আমি আর বলব না' কথাগুলি তার গল্প বলার একটি কৌশল। সে এই সমস্ত কথা শুনিয়ে এটাই বলতে চেয়েছে যে, এই 'দক্ষিণ রায়'-এর গল্পটির সে একজন দ্রষ্টা। সে সবই জানে। শ্রোতারা যেন গল্পটির মূল কথক হিসেবে সকলে তাকেই বাহবা দেয়। বিনোদ উকিল তার মনের কথাটি ধরতে পেরেছে বলেই বলে উঠেছে যে, 'আহা কেন তোমরা রসভঙ্গ কর ! ব্রাহ্মণকে বলতেই দাও না।' তবে বিনোদের মনেও কৌতূহল দেখা গেছেঃ " **'কই চাটুজ্যেমশায়, বাঘ কই ?'** "[১৭] 'রাউলাট' আইনের কথা বলতে বলতে দক্ষিণ রায়ের কথা তুলে চাটুজ্যে মশায় কিছু একটা সূত্র তুলে ধরতে চেয়েছে গল্প শ্রোতার কাছে। বিনোদ চাটুজ্যে মশায়ের গল্প বলার পেছনের উদ্দেশ্যটি ধরতে পেরেছে। কেননা একটু আগে তার সঙ্গেই চাটুজ্যে মশায়ের দেশের রাজনীতি সম্পর্কে কথাবার্তা চলেছিল। চাটুজ্যে মশায়ের দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি পড়ার পরেই কিন্তু বিনোদ বাঘের সন্ধান পেতে চেয়েছে। চাটুজ্যে মশায় বলেছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে বকুর কাছে বঙ্গমাতা জানতে চেয়েছে সে **'দেশের কাজ'**[১৮] কি করেছে ? উত্তরে বকু বলেছে যে, সে বক্তৃতা দিতে পারে না। ম্যালেরিয়ার ভয় তার আছে। খদ্দরের ধুতি তার সয় না। দেশের মিলের ধুতিতেই তার বয়স্ক জীবন কেটে চলেছে। খাটুনির কাজও সে করতে পারে না। এমনকি 'ভুঁই-পটকা ছোঁড়বার সাহসও'[১৯] তার নেই। বকুর 'ভুঁই-পটকা'-র উল্লেখে তৎকালীন দেশের রাজনীতির চেহারাটির সঙ্গে অবগত হওয়া গেছে। গল্পের শুরুতেই দেখা গেছে যে, উকিল বিনোদ দেশের স্বাধীনতার জন্য গোটাকতক 'খাসা বাঘ'-এর সন্ধান করেছিলঃ " **. . . চটপট স্বরাজ হয়ে যেত,—স্বদেশী, বোমা, চরকা, কাউন্সিল ভাঙা, কিছুই দরকার হ'ত না।'** "[২০] আবার এই বঙ্গমাতাই তাকে 'কাউন্সিলে' ঢুকে যেতে বলেছে। তৎকালীন রাজনীতির অভ্যন্তরীণ চিত্রটি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উঠে এসেছে। যেমনঃ

এক) বকু এক মাতব্বরকে তিন হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল এই কারণে যে, যদি গভরমেন্স তাকে কাউন্সিলে নমিনেট করে।[২১]

দুই) একজন রাজনৈতিক চাঁই বকুকে লাখ টাকা দিতে বলেছিল তার 'নিখিল বঙ্গীয় সর্পনাশক' ফান্ডের জন্য।[২২]

এখানে চাটুজ্যে মশায়ের অসাধারণ গল্প বলার কৌশল ধরা পড়েছে। সে বকুলালের মনের কথাকে বাইরে বের করে সকলকে শুনিয়েছে। উপস্থিত গল্পের শ্রোতাদের মন ও আগ্রহকে কীভাবে তার দিকে নিয়ে আসা যায় সেই চেষ্টা সে সবসময়ই করেছে। লেখকের এখানেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যে, তিনি গল্প শ্রোতাদের অন্য কাউকে বলতে না দিয়ে চাটুজ্যে মশায়ের মুখের কথাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গল্প কথক জাতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হিসেবে সব সময় সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে সকলের উপরে। সেজন্যই তো বিনোদ উকিল তাকে প্রশ্ন করেছে যে, সে কীভাবে বকুলাল দত্তের মনের কথা জানতে পেরেছে ?[২৩] তখন বকুলালের বক্তব্যটা ছিল নিম্নরূপঃ

"গরিব বটি, কিন্তু কাশ্যপ গোত্র, পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান। কেদার চাটুজ্যের এই বুড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্তমান। একট চেষ্টা করলে লোকের হাঁড়ির খবর জানতে পারি, মনের কথা তো কোন্ ছার।"[২৪]

ধার্মিক হিসেবে সে নিজেকে চিনেছে। সে নিজেও জানে যে, সে একজন ব্রাহ্মণ। তার নিজের বিদ্যার উপর সে বিশ্বাস রেখেছে। শ্রোতাকে গল্প বলার কৌশল সম্বন্ধে চাটুজ্যে মশায় সিদ্ধহস্ত। গল্পকার তৎকালীন রাজনীতির অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে তুলে ধরতে কথক চাটুজ্যে মশায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বকুলালের 'অতি হতভাগা' জীবনকে উদ্ধার করতে গিয়ে বঙ্গমাতা তাকে রাজনীতির পথে নামতে

বলেছে। বকুলাল দত্তকে রাজনীতিতে নামাবার লেখকের চমৎকার কৌশল ধরা পড়েছেঃ **“বঙ্গমাতা বললেন- কাউন্সিলে ঢুকে পড়।”**[২৫] তবে বকুলাল কাউন্সিলে ঢুকে নিজের খুব একটা ‘সুবিধা’[২৬] করতে পারেনি। ব্রাহ্মণের মুখে ব্যবহৃত এই ‘সুবিধা’ শব্দটি রাজনীতির প্রতি তার অভিজ্ঞতার স্পষ্টতা হাজির করেছে। তাই বকুলাল ঠিক করেছে যে, সে সাউথ সুন্দরবন এলাকা থেকে ভোটে দাঁড়াবে। তবে সেখানে দেখা গেছে বকুলালের পুরোনো শত্রু রামজাদু সুন্দরবন থেকেই তার বিপক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছে। ভোটে দাঁড়ালেও বকু ক্রমে বুঝতে পেরেছে যে, তাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। **“. . . তিনি হটে যাচ্ছেন, ভোটাররা সব বেঁকে দাঁড়াচ্ছে।”**[২৭] মানুষের মনের ভেতরকার প্রশ্নগুলিকে চাটুজ্যে মশায় রূপ দিয়েছে। এই প্রশ্নগুলি হল নিম্নরূপঃ চোদ্দ বছর আগে সে কার কাছে চাকরি করত ? তার চাকরি গেলইবা কেন ? একজন সামান্য কেরানির অত পয়সা হল কি করে ? বকুর বাগানবাড়িতে রাত্রে আলো জ্বলে কেন ? বকুলাল কালো, কিন্তু তার ছোটো ছেলে ফরসা হল কেন ? শুধু এখানেই শেষ নয়। খবরের কাগজে তার নানা রকম কেচ্ছা বার হতে শুরু করেছিল।[২৮] বকু পাল্টা জবাব দিলেও ততো জুতসই হয়নি। কারণ তার পক্ষে তেমন জোরালো ‘সাহিত্যিক গুন্ডা’[২৯] ছিল না। এই ‘সাহিত্যিক গুন্ডা’ শব্দবন্ধটি বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে। একটা ব্যাপার অনুমান করা চলা যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির মধ্যে ‘সাহিত্যিক গুন্ডারাও’ ছিল। সাহিত্যিক গুন্ডাদের পরিচয় কথক চাটুজ্যে মশায় দেয়নি। কথক চাটুজ্যে মশায়ের অনুমান মতে, এই রাজনীতি গুন্ডারা চিরকাল রাজনীতির কূট-বিচারণা ও কৌশলের সঙ্গে গভীর নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। বকুলাল সাহিত্যিক গুন্ডাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহুল ছিল না। অর্থাৎ দেশের রাজনীতির কলাকৌশল সম্বন্ধে বকুলালের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব লক্ষ করা গেছে। পাশাপাশি কথকের পরিমিত বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেছে।

এরপরেই রামগিধড় বলে একজন ‘পলিটিকাল পরিব্রাজক’[৩০] বকুলালকে তার দলে নাম লেখাতে বলেছে। তার দল হচ্ছে ব্যাঘ্র পার্টির। রামগিধড়ের সঙ্গে বকুলালের কথোপকথন নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

“বকুর ভরসা হ’ল না। বললেন—তা পেরে উঠবেন কি ক’রে ? শত্রু, অতি প্রবল, ইটাতে পারবেন না। নিখিল বঙ্গীয়-সর্পনাশক ফান্ডের সমস্ত টাকা ওরা হাত করেছে।

রামগিধড় খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বললেন— আমরা সর্প নই। ফাণ্ড না থাক, দাঁত আছে, নখ আছে। বাবা দক্ষিণরায় আমাদের সহায়। তাঁর কৃপায় সমস্ত শত্রু নিপাত হবে ।

তিনি কে ?

চেন না ? তেত্রিশ কোটির মধ্যে তিনিই এখন জাগ্রত, আর সবাই ঘুমচ্ছেন। বাবা তোমার ডাক শুনতে পেয়েছেন। নাও, এখন ক্রীডে সই কর। ক্রীড—কেবল বাবার নিত্যিকার খোরাক যোগাতে হবে—তার বদলে পাবে শত্রু, মারবার অতি সোজা ক্ষমতা আর কাউনসিলে অপ্রতিহত প্রতাপ

কিন্তু গবরমেন্টে ?

গবরমেন্টের মাংসও বাবা খেয়ে থাকেন—’ ”[৩১]

‘বাবা’ বলতে দক্ষিণ রায়ের কথা বলা হয়েছে। বাঘ যেমন শিকারির মাংস খেতে অভ্যস্ত, তেমনি রামগিধড়ের দল। সে বলেছে যে, সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তারাও বাঘের মত শত্রু হত্যা করবে। সে বলেছেঃ **“শত্রুর বংশ লোপাট, সবাই ভাই-ব্রাদার। দিব্বি ভাগ-বাটোয়ারা ক’রে খাবে।”**[৩২] এই অংশে গল্পকারের ব্যঙ্গ লক্ষ করা গেছে। এই ব্যঙ্গ সেইসমস্ত নেতাদের প্রতি যারা সাধারণ জনগণের দারিদ্র্যকে বুঝতে চায় না। রামগিধড়ের কথায় বোঝা গেছে যে, রাজনীতি এখানে নিছকই ভোটসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। সে অনুমান করেছে, বকুলালের মতো সম্পত্তির মালিকদের ভোটে দাঁড় করিয়ে আসন জেতাতে পারলেই দেশের ক্ষমতা তাদের হাতে চলে আসবে। তবে এই বকুলাল নিজেও বুঝতে পেরেছে যে, রামগিধড় তাকে ব্যবহার করেছে ভোটের স্বার্থে। কেননা তার মতে, সে ভোটে দাঁড়িয়েছে একমাত্র রামজাদুকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য। **“রামরাজ্য, কাউনসিলে অপ্রতিহত প্রতাপ, লাট, মন্ত্রী— এসব বড় বড় কথা তাঁর মনে ঠাই পায় নি।”**[৩৩] এই ‘রামরাজ্য’-এর উল্লেখ দেশের রাজনীতির জাতীয় কংগ্রেস দলের নেতা মহাত্মা গান্ধির অনস্বীকার্য অবদানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য গান্ধিজি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। গল্পের শুরুতেই বলা ‘রাউলাট’ আইনের প্রসঙ্গ এখানে আলোচনার দাবি রেখেছে। দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের বিদ্রোহ দমন করার জন্যে এই আইন জারি করা

হয়েছিল। এই আইনের প্রতিবাদে গান্ধিজির নেতৃত্বে হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষকে অহিংসার উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করানো। তিনি নিজেই বলেছেনঃ

"অহিংসার চরিত্রানুযয়ী, সে ক্ষমতা 'দখল' করতে পারে না বা এটা তার অভীষ্টও নয়। কিন্তু অহিংসা এর চেয়েও বেশি কিছু করতে পারে। সরকারি যন্ত্র দখল না করেও অহিংস ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চালিত করতে পারে। এখানেই অহিংসার সৌন্দর্য।"[৩৪]

কোনো রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার বা দেশের মঙ্গলের জন্য নয়। বকুলাল রামজাদুকে জব্দ করবার জন্য ও তার নিজের উপর ঘটা পুরনো অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। বকুর কাছে দেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা নিজের জীবনের অবস্থা উন্নতি করার ঝোঁক দেখা গেছে। গল্পের শেষে এসে দেখা গেছে দক্ষিণ রায় ব্রাহ্মণের 'সৌম্য'[৩৫] মূর্তি বেশে তাকে ধরা দিয়েছেঃ

"বকুলালকে বললেন— বৎস, আমি তোমার প্রার্থনায় খুশী হয়েছি। এখন বর কি নেবে বল।

বকুবাবু, বললেন—বাবা, আগে রামজাদুটাকে মার, ও আমার চিরকালের শত্রু।

বাবা বললেন—দেশের হিত ?

বকু উত্তর দিলেন—হিত-টিত এখন থাক বাবা। আগে রামজাদু।

বাবা বললেন—তাই হ'ক। ক্রীড সই করেছ, এখন তোমায় জাতে তুলে দি।"[৩৬]

দক্ষিণ রায় এই বেশেই তাকে জাতে তুলে দিয়েছে। এরপরে বকুলাল ব্যাঘ্র রূপ ধারণ করেছে। দক্ষিণ রায় এখানে তার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। সে বুঝেছে যে, বকুলাল দেশ হিত করতে চায় না। সে চেয়েছে তার পুরোনো বন্ধুর অপমানের প্রতিশোধ নিতে। বকুলালের মনে জন্ম নেওয়া এই হিংসাকে দক্ষিণ রায় সমর্থন করতে পারেনি। সেজন্য তাকে জাতে তুলে দিয়েছে। তবে এই অনুমান যে সর্বাংশে সত্য নয়, তা বোঝা গেছে বাবা দক্ষিণ রায়ের 'অন্তর্ধানে'[৩৭]। দক্ষিণ রায়ের 'অন্তর্ধানে' বোঝা গেছে যে, তাকে রাজনীতির আসরে অন্যতম ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অধিক কিছু বকুলালের কাছে সে প্রত্যাশা করে না। বোঝা গেছে যে, এই দক্ষিণ রায় রামগিধড়ের ব্যাঘ্র পার্টির দেবতা। বকুলাল দেবতার বরদানের ব্যাপারে রামগিধড়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সে বকুর পায়ে 'ঘ্যাক'[৩৮] করে কামড়ে দিয়েছে। গল্পে দক্ষিণ রায় যেন লেখকের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাঘ্ররূপী বৃদ্ধ বকুলালকে দেখে ডেপুটি বাবুর উক্তিঃ **"এমন বাঘ তো দেখিনি, গাধার মতো রং। আহা শেয়ালে কামড়েছে, . . . ।"**[৩৯] এই শেয়াল হল রামগিধড়। কিছুক্ষণ আগেই দেখা গেছে যে, সে বকুর পায়ে তার দাঁত বসিয়েছে। সে দক্ষিণ রায়ের মতো নেতাদের কর্মী হয়ে উঠেছে। গল্পকার সমাজে দক্ষিণ রায়ের মতো নেতাদের যে একটা প্রভাবশালী ভূমিকা আছে, এই কথাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। গল্পের শুরুতে দেখতে পেয়েছি যে, এই দক্ষিণ রায় সকল জীবের বাঞ্ছাপূরণের প্রতি নিজের কর্তব্যকে তুলে ধরেছে। গল্পের শেষে এসে দেবতার এই ইমেজ অনেকটা চমকপ্রদ হয়ে উঠেছেঃ

"বিনোদবাবু, বলিলেন— 'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, বাবা দক্ষিণ রায় কখনও গুলি খেয়েছেন ?"

[চাটুজ্যে মশায়] 'গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।'

[বিনোদ] 'তিনি না খান, তাঁর ভক্তরা কেউ খান নি কি ?"

[চাটুজ্যে মশায়] 'দেখ বিনোদ, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে তামাশা ক'রো না, তাতে অপরাধ হয়।"[৪০]

ঠাকুর দেবতা নিয়ে তামাশা না করার কথাটি বড়ই হাস্যকর হয়ে উঠেছে। চাটুজ্যে মশায় যেন এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে, দক্ষিণ রায়ের মতো সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় মানুষদের ব্যাপারে কথাবার্তায় একটু সজাগ হতে হয়। তারা বকুলালের মতো মানুষের মনের মধ্যে জন্ম নেওয়া রিপুকে খুব চালাকির সাহায্যে নিজেদের কাজে লাগায়। দেশের রাজনীতিতে রামগিধড়ের ব্যাঘ্র পার্টি নতুন নেমেছে। এর সদস্য সংখ্যাও খুব বেশি নয়। তিনশো তেষট্টি। এই পার্টি নির্দিষ্ট কোনো মতবাদে বিশ্বাসী নয়। বকুলালকে পার্টির সদস্য হিসেবে যোগ করার আগে রামগিধড় বকুলালের কাছে তার রাজনীতিক মতামত সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে। রামধিগড় যখন বুঝেছে যে বকুলালের কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ নেই, তখনই সে বকুলালকে তাদের ব্যাঘ্র পার্টিতে যোগ করিয়েছে। বকুলাল যখন রামগিধড়ের কাছে তার নিজের পরিচয়ের কথা তুলেছে তখন রামগিধড় বকুলালকে ধমক দিয়েছে এই বলেঃ **"আবার ক্যা হুয়া ? গোল মত কর।"**[৪১] তার একটা বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হয়েছে। বকুলালকে দলের কাজে লাগিয়ে আসন জেতাতে পেরেছে। মন্ত্রী পরিষদে নিজেদের দলের সদস্যদের বসাতে পেরেছে। সেজন্য বকুর আর কোনো দরকার নেই। 'আবার ক্যা হুয়া ? গোল মত কর।"-রামগিধড়ের

এই বক্তব্যে এটাও বোঝা গেছে যে, দক্ষিণ রায় রামগিধড়ের কাছে বকুলালের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিল। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে রামগিধড়ের সরাসরি যোগাযোগ ছিল।

গল্পের শুরতেই বলেছি যে, এই ব্রাহ্মণ কেদার চাটুজ্যে তার সংগ্রহে থাকা দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি চিমিশ মিত্তিরকে দেয়নি। মঙ্গলকাব্যের পুরুষ দেবতা হিসেবে দক্ষিণ রায় পরিচিত হলেও সে নিম্নবর্গের দেবতা হিসেবেই থেকে গেছে। এই কথাটিকে পরিপুষ্ট করেছে দক্ষিণ রায়ের ব্রাহ্মণ 'সৌম্য' বেশ ধারণ। অরণ্য বেষ্টিত সমাজে অবস্থান করার ফলে দক্ষিণ রায়ের প্রচার অতটা (নিম্নবর্গের দেবতা বলে) ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তার দরকার ছিল কেদার চাটুজ্যের মতো ব্রাহ্মণের। নিম্নবর্গের দেবতা হিসেবে তাকে এই তুলে ধরার মধ্যে সাহিত্যিক গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) কথিত **"নিজেদের মতো করে, নিজেদের শক্তি অনুযায়ী"**[৪২]-এর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। 'ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে তামাশা' না করতে বলে কেদার উচ্চবর্গের অধিপত্য বজায় রাখতে নিম্নবর্গের সঙ্গে রাজনৈতিক সমন্বয় করে নিয়েছে। তার মতে, দক্ষিণ রায় নিম্নবর্গের অধিষ্ঠিত দেবতা হলেও তার পুজো প্রচারের একমাত্র অধিকার ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কাছে। কেদার চাটুজ্যের এই আধিপত্যের বিস্তার তার গল্প বর্ণনার মধ্যেই ধরা পড়েছে। সমগ্র গল্পটি ব্রাহ্মণ কেদার চাটুজ্যের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে। বিনোদ উকিল ও নগেন যখনই তার গল্পের মাঝে এসে কথা বলতে চেয়েছে, সে তাদেরকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ রায় নিম্নবর্গের দেবতা হিসেবে সমাজে পরিচিত হলেও ব্রাহ্মণ ধর্মকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছে। গল্পের শেষে এসে দেখা গেল যে, সে তার এই পরিচয়কে সমাজের কাছে ব্রাহ্মণ ('সৌম্য') বেশে তুলে ধরেছে। জাতে তোলার ব্যাপারটির পেছনেও গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। দক্ষিণ রায়ের বর্গ পরিচয়ের সঙ্গে রাজনীতির বর্গ পরিচয় এখানে মিশে গেছে। দক্ষিণ রায় জাতে উঠতে গিয়ে ব্রাহ্মণ কেদার চাটুজ্যেকে সিঁড়ি করেছে। আর দেশের রাজনীতিতে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়ে ব্রাহ্মণ কেদার চাটুজ্যে তেমনি দক্ষিণ রায়কে 'সৌম্য' বেশ ধারণ করিয়ে গল্পে হাজির করেছে। নিম্নবর্গের অবস্থান ও উচ্চবর্গের রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় রাজনীতির অন্তর্নিহিত সত্য শ্রোতা ও পাঠক চিত্তে নাড়া খেয়েছে। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস ও অলৌকিকতা 'দক্ষিণ রায়' গল্পটির শরীরে গেঁথে গেছে।

তথ্যসূত্র

১) রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালির ইতিহাস, দে'জ, ১৩ বঙ্গিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা ১৬।

২) বসু রাজশেখর, (সম্পাদনা- দীপংকর বসু) পরশুরাম গল্পসমগ্র, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, নতুন সংস্করণ, আশ্বিন ১৪৭০, পৃষ্ঠা ১৩৮।

৩) ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, সপ্তম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৯২৪।

৪) বসু রাজশেখর, (সম্পাদনা- দীপংকর বসু) পরশুরাম গল্পসমগ্র, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, নতুন সংস্করণ, আশ্বিন ১৪৭০, পৃষ্ঠা ১৩৮।

৫) বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, মে, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫১।

৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৩।

৭) বসু রাজশেখর, (সম্পাদনা- দীপংকর বসু) পরশুরাম গল্পসমগ্র, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, নতুন সংস্করণ, আশ্বিন ১৪৭০, পৃষ্ঠা ১৩৯।

৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৬।

৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭।

১০) চট্টোপাধ্যায় ব্রজদুলাল (অনুবাদক) চন্দ্র বিপান, ত্রিপাঠী অমলেশ, দে বরুণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, এ-৫ গ্রীন পারক, নিউ দিল্লী-১৬, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৬৪।

১১) বসু রাজশেখর, (সম্পাদনা- দীপংকর বসু) পরশুরাম গল্পসমগ্র, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, নতুন সংস্করণ আশ্বিন ১৪৭০, পৃষ্ঠা ১৩৭।

১২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭।
১৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮।
১৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮।
১৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮।
১৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০।
১৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১।
১৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১।
১৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১।
২০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৬।
২১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১।
২২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১।
২৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০।
২৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০।
২৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১।
২৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১।
২৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪২।
২৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১।
২৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১।
৩০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩।
৩১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩।
৩২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩।
৩৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪।
৩৪) দেবী মহাশ্বেতা (অনুবাদক) ,প্রভু আর কে ও রাও ইউ আর, (সংকলিত ও সম্পাদিত) গান্ধী মানস, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, এ-৫, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি ১১০০১৬, একশ পঁচিশতম জন্ম জয়ন্তী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১০৮।
৩৫) বসু রাজশেখর, (সম্পাদনা- দীপংকর বসু) পরশুরাম গল্পসমগ্র, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, নতুন সংস্করণ আশ্বিন ১৪৭০, পৃষ্ঠা ১৪৪।
৩৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪।
৩৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫।
৩৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫।
৩৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫।
৪০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫।
৪১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫।
৪২) হালদার গোপাল, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খণ্ড), অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, ষষ্ঠ প্রকাশ, মাঘ ১৪১৯, পৃষ্ঠা ৪৩।

আকর গ্রন্থঃ

১) বসু রাজশেখর, (সম্পাদনা- দীপংকর বসু) পরশুরাম গল্পসমগ্র, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, নতুন সংস্করণ, আশ্বিন ১৪৭০।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১) রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালির ইতিহাস, দে'জ, ১৩ বঙ্গিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০।

২) ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, সপ্তম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৯।

৩) বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, মে, ২০১৮।

....

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দলিতদের অবস্থান

ড. ব্রততী রানী মাইতি সাহু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার:

শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিফলন হল সমাজে দলিত শ্রেণির গড়ে ওঠা। দলিত শব্দটি এক অর্থে বঞ্চিত। নিপীড়িতের অন্যরূপ। যে সমাজ সভ্য বলে, শিক্ষিত বলে দর্প করে, সেই সমাজেই প্রান্তিক পর্বে রয়েছে দলিত শ্রেণি। যে শ্রেণির মধ্যে বিশেষ জাতি, বিশেষ ব্যক্তি এবং অসহায় নারী-পুরুষের দল অবস্থান করছে। দলিত শব্দটি বর্তমান সমাজের কাছে কোন এক নির্দিষ্ট সমাজভুক্ত গোষ্ঠী বা দল নয়। যে কোন ব্যক্তি, যে কোন গোষ্ঠী দলিত হতে পারে। সমাজে দলিত শ্রেণির কুৎসিত ফলকে আমরা প্রতিবাদ বা প্রতিরোধে নয় শুধুমাত্র মানবতাবোধ জাগরণের দ্বারা উচ্ছেদ করা সম্ভব। হিংসা-ক্রোধ ও স্বার্থপরতা মুক্ত মানব সমাজে 'দলিত' শব্দটি অবস্থান করতে পারে না। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে বঞ্চিত, দলিতদের নিপীড়নের কাহিনি তুলে ধরেছেন।

সূচক শব্দ:

আদিমতা, দলিত, মৃত্যু, অমৃত, প্রাণভিক্ষা, ধর্ষণ, তাণ্ডব, ব্যভিচারী, অন্ধকার, হিংসা, করুণা, ছুঁত-পতিত, আত্মরক্ষা, অধিকার, অপমান, রক্ত।

মূল প্রবন্ধ:

দলিত সাহিত্য রচনা করার পেছনে প্রত্যেক সাহিত্যিকের একটা উদ্দেশ্য থাকে। সমাজের কুৎসিত দিকগুলিকে সংশোধন ও পরি মার্জনের সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক দলিতদের আর্ত কাহিনিকে তুলে ধরেন। দলিতদের নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীও এক সময় গর্জে উঠেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পগুলিতে মানবহৃদয়ের মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করে গেছেন। তিনি অনুভব করেছেন সমাজের ভিতর প্রতিনিয়ত যে অন্যায়-অবিচার ঘটে, সেগুলিকে মেনে নিলে চলে না, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে রোধ করতে হবে। আরণ্যক যুগের মানুষের জীব-যাপনের মধ্যে যে সুখ ছিল সেই খাঁটি আনন্দকে লেখক তারাশঙ্কর সভ্যসমাজ থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে দেখেছেন। মানুষের মধ্যে ক্রোধ ও স্বার্থপরতা যত বেড়েছে, সমাজও ততখানি মানুষের প্রতি নির্দয় হয়ে উঠেছে। মানুষ অতীতকে মুছে ফেলতে হয়ে উঠেছে বিষময়। মানুষ আদিম স্বভাবকে ত্যাগ করতে পারেনি। মানুষের মানুষের আদিমতা শোষণতার, বঞ্চনার রূপ নিয়ে আরেক আদিমতার বেশ নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জীবন সাধনা কি?—এ বিষয়ে চোখে আঙুল দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি দেখছেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কিংবা উচ্চ-নীচ জাতিভেদে তৈরি মানুষের সমাজ মানুষ মানুষকে ভালোবাসে না। করুণা ও সহানুভূতির বিষয়ে কারোও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রকৃতপক্ষে মানুষ বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে লক্ষ্যহীন মানব সমাজেই গড়ে উঠেছে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, দলিতদের নিপীড়নের ইতিহাস। ক্যাপিটালিস্ট সমাজের মানুষ সর্বদা স্বার্থ কায়েমিতে প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। ফলে পিছিয়ে পড়া দলিতরা নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে কেউ কেউ আত্মহত্যার পথে পা বাড়িয়ে দেয়। 'কয়ে ফোঁটা রক্ত' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছেন—

"হায় রে হায়! এই তাঁর জীবন-সাধনা? মৃত্যু কবলিত প্রিয়জনকেই অমৃতে সঞ্জীবিত করতে পারলেন না; বুলুকে মেরে ফেললে নিষ্ঠুর কৌতুকে—তাঁর অধিকারের মধ্যে তিনি বর্তমানে! এর থেকে উপহার—এর থেকে পরাজয় আর কি হতে পারে? অমৃত নেই—অমৃত মিথ্যে। মানুষ জানোয়ার! মানুষ জানোয়ার! মানুষ জানোয়ার!"[১]

যশ-খ্যাতিমান হয়ে ওঠার লালসাই হল বর্তমান সমাজ ও সময়ের মানুষের কাছে অমরত্ব লাভ। কীর্তিমান হওয়ার প্রচেষ্টা মানুষের হৃদয়ের বাসনাকে কুৎসিত লালসায় পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে লড়াইয়ের হিংস্রতায় পরাজিতরা নিষ্ঠুর বিজয়ীর হাতে দলিত প্রাণকে বলিদান করে।

লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তি। যিনি দেশাত্মবোধের মহৎ সাধনার পেছনের গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র শক্তির মানুষগুলির আত্মবিসর্জনের আর্তনাদ দেখেছেন। 'কলকাতার দাঙ্গা ও আমি' গল্পে তিনি কলকাতার অসংখ্য মানুষের নৃশংস নারকীয়

কাহিনি লিখেছেন। একদল হিংস্র পৈশাচিক মানুষের আক্রমণে নিরীহ নরনারীদের প্রাণজ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। এই কাহিনি ছিল অত্যন্ত মর্মন্তুদ। হিংস্র পাশুরূপী মানুষদের কাছে বস্তির নিরীহ মানুষরা প্রাণত্যাগ করেছিল। দলিতদের বস্তিতে আগুন জ্বলিয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু দেখে পৈশাচিক মানুষের দল উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তিবাসী দলিত মানুষদের মৃত্যুর সকরুণ বর্ণনা করেছেন—"বস্তিতে আগুন জ্বলছে, চারিদিকে হিংস্র মানুষ উল্লাস করেছে, তারই মধ্যে ঘরের ভিতর থেকে অসহ্য তাপে আর্ত মানুষ বেরিয়ে এল, পালাবার জন্য পাগল হয়ে লাফিয়ে উঠল চালের উপর, চারিদিকের মানুষকে সে করজোড়ে বশ্যতা জানালে, প্রাণভিক্ষা চাইলে, তার বদলে চারদিক থেকে নিক্ষিপ্ত হল ইট। ইট মাথায় লেগে চেতনা হারিয়ে হতভাগ্য পড়ল অগ্নিকুণ্ডে।"[২]

এত নিপীড়ন, এত বঞ্চনা কেবল দলিত মানুষদের জন্য বোধ হয় মানুষ তৈরি করতে পারে। লেখক তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে কলকাতার বস্তিবাসী মানুষদের রক্তাক্ত ও অগ্নিদগ্ধ পোড়া মাটির নিদারুণ শোষণের কাহিনি লিখেছেন। তিনি হিংসার জ্বলন্ত চিত্র কলকাতার রাজপথের মধ্যে যা ঘটতে দেখছেন, তাকেই সরাসরি গল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন। মেকি সভ্য মানুষদের মুখোশ খুলে আসল রূপকে সামনে নিয়ে এসেছেন। অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে লোভার্ত স্বার্থলিপ্সু মানুষদের উগ্র গর্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লেখক তারাশঙ্কর এই সব মানুষের কুৎসিত চেতনাকে তীব্র ঘৃণা করেছেন। গল্পে নিপীড়নের, অত্যাচারের কাহিনি লিখে মানুষের মনুষ্যত্বহীনতাকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন। আসলে, আবর্জনা স্তূপের নোংরা, পচা, গলিত বীভৎস ঘৃণার চেয়েও জঘন্য হল মানুষের ভয়ংকর হিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা। নিরীহ ও গরিব বলেই এই মানুষের উচ্চ, ধনী মানুষের হাতে দলিত, পীড়িত ও মৃত্যুর শিকার হয়েছে। এই অত্যাচারের কাহিনি নিষ্ঠুর ও কঠিন ছিল।

"রক্তে মাটি ভেসে গেল, পোড়া ছাই সে রক্ত শুষে নিলে। মায়ের কোল থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে আকাশস্পর্শী অট্টালিকার ছাদ থেকে পাথরে বাঁধানো রাজপথে। নারীকে ধর্ষণ করে ধারালো অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করে কাটা হল। অসহায় শান্তিপ্রিয় গৃহস্থকে হত্যা করলে। লাঠির আঘাতে কুকুরের মতো মারলে নিরীহ গরিবের দলকে।"[৩]

লেখক তারাশঙ্কর দেখেছেন সমাজে মানুষ অর্থ ও রাজনীতির ক্ষমতা হীনতার কারণে কিছু মানুষ ভয়ার্ত। তিনি বুঝেছেন বিলাসিতা না হোক, সকল মানুষের বাঁচার সমান অধিকার নেই। মানুষের সমাজে হিন্দু না মুসলিম—এই ধর্মীয় পরিচয় টুকুও সোজাভাবে বজায় রাখা কঠিন ব্যাপার। নর-নারী-শিশু প্রত্যেকের মুখেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আতঙ্ক লেগে রয়েছে। আত্মপ্রতারণা ও অন্যায়ের প্রতিশোধ—দুটিই সমাজের কাছে সমান অভিশাপের। কিছু কিছু মানুষ পরাজয়ের লজ্জাতে আত্মপ্রতারণার পথ খুঁজে নিয়েছে। শুধু সমাজ নয়, দেশ ও সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। দেহের সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যেমন, পাকিস্তান ও বাংলা—উভয়ের মধ্যে ধর্মের নয়, ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, ভাষাবোধের দ্বন্দ্বও প্রবল রূপ ধারণ করেছে।

'পাটনী' হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা অন্তর্চেতনামূলক একটি অসাধারণ গল্প। এ গল্পে তিনি আত্ম দংশনের কলঙ্কিত রূপকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখেছেন, সমাজে যার ধনসম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে, সেই ব্যক্তিরা নিম্নবিত্ত মানুষদের আত্মসাৎ করে চলেছে। যদিও সমাজের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে উচ্চবিত্ত নেতারা ধর্মঘট তৈরি করে, তবে সে ধর্মঘটের দাবীর অধিকার ভোগ করে কপিলের মতো সুবিধাভোগী মানুষেরা। এরা মদপান করে নেশার আয়েস করে, মিল-মালিকের পক্ষে থেকে কালোটাকার ঘুষ খায় অথচ অভাবগ্রস্ত শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে মিটিং মিছিল করে, ধর্মঘট করে। অন্যদিকে সুবিধাভোগীরা ফায়দা লুফে নেয়। প্রবঞ্চনায় বঞ্চিত মানুষেরা কেবলই হাহাকার করে। প্রবঞ্চক কপিলের মতো মানুষের বর্ণনা করেছেন লেখক—

"ইতি মধ্যেই কপিল মিল মালিকের তরফ থেকে ঘুষ খেয়েছে; অন্যদিকে শ্রমিকদের জন্য সংগৃহীত খোরাকির তহবিল থেকেও টাকা আত্মসাৎ করেছে। কর্মী যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ধর্মঘট মিটমাটের প্রস্তাবের মধ্যে কপিলই কিন্তু সর্বাপেক্ষা লাভবান হল। তার মাইনে বেড়ে গেল আট টাকা। কপিল প্রচুর মদ্যপান করে প্রায় তাণ্ডব জুড়ে দিল।"[৪]

মানুষ স্বার্থের জন্য বিশ্বাসঘাতক। প্রতিটি মানুষকে একদিন শ্মশানের বুকে যেতে হবে। তবুও মানুষ মানুষকে অবহেলা করে চলে। ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে লড়াই রে। 'পাটনী' গল্পের পাটনী চরিত্ররা পল্লী জীবনের আসল সত্যিকে অনুভব করেছে। তাই জীবনের শেষ রঙ্গস্থল শ্মশান ভূমিতে পাটনীরা সমারোহের সঙ্গে অন্তিম সম্পর্ককে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এখানেই তারাশঙ্কর দলিত মানুষদের মধ্যে আসল জীবন দর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে চণ্ডাল পল্লীরা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না সেখানে তারাশঙ্কর গভীর জীবনবোধের সত্যকে প্রকাশ

করেছেন। মানুষের হিসাব-নিকাশ, ভাগাভাগি, দাবি-দাওয়ার মধ্য থেকে অনেক দূরে তিনি অন্তরঙ্গতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে—তাকেই দেখাতে চেয়েছেন। সেখানে বঞ্চিত ও শোষিতের ইতিহাস নেই, কেবল মানুষই সত্য।

মানুষ ব্যভিচারী, মানুষ পৈশাচিক, মানুষ বিশ্বাসঘাতক। 'নব মহাপ্রস্থান উপাখ্যান' গল্পের পটভূমিতে তারাশঙ্কর গান্ধী হত্যার হত্যাকারীকে অনুসন্ধান করেছেন। হত্যাকারী কে? কেন মানুষ মানুষকে হত্যা করে? একজন ক্ষমতাবান মানুষ কখন অন্য মানুষের কাছে শোষিত ও দলিত হয়ে ওঠে? আসলে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অসংখ্য পাপের বোঝা বহন করে চলে তখন মানুষের হৃদয় পাপের বিষে বিষময় হয়ে ওঠে। গান্ধী হত্যা হল সে ধরণেরই এক জঘন্য প্রকাশ—যা নরহত্যা। ক্রোধের জ্বালায় মানুষ মানুষকে হত্যা করে, প্রবঞ্চনা করে। ছদ্মবেশে মানুষ কর্মের পতাকা, ধর্মের পতাকা হাতে বহন করলেও, আসলে মানুষ বুকে বহন করে চলছে ক্রোধ ও হিংসার অনল। হিংসায় মানুষ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বিবেকহীন হয়ে অন্যকে হত্যা করে। হাস্যসুন্দর লেখক তারাশঙ্কর মানুষের মধ্যে সারল্য, সংযম ও স্নেহের দৃষ্টি প্রত্যাশা করেছেন। তিনি মানুষের নিষ্ঠুর প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন—

"অন্ধকার থেকে সৃষ্টি হল—ভয়, লোভ, মোহ। এদের নেতা রূপে আবির্ভূত হলাম আমি। আমার নাম হিংসা। স্বার্থবুদ্ধি আমাদের শাস্ত্রে। আলোক সন্তান শৌর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী আমি। ক্রোধ, ঘৃণা, লোভ, স্বার্থ, মোহ আমার সহোদর; অন্ধকার থেকে আমাদের সৃষ্টি।"[৫]

সমাজে সাম্যতা আনতে হলে মানুষকে বিবেকবান হতে হবে। তারাশঙ্কর 'নব মহাপ্রস্থান উপাখ্যান' গল্পে সুবিবেচক সম্পন্ন মানুষের গুণগুলির উল্লেখ করেছেন। মানুষ যখন করুণা ও প্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে, তখনই সে মহাশক্তিমান হয়। তখন মানুষের নয়ন দিব্যদ্যুতি লাভ করে। দিব্যদ্যুতি চোখের দ্বারা অধরে শান্ত হাস্য বিকশিত হয়। অধরে ও জিহ্বায় মধুর ভাষা প্রকাশিত হয়। ত্যাগের দ্বারা তখন মানুষ অন্তরে অহিংসা লাভ করে। তখন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। মৃত্যুর যেমন কোন জাতিভেদ থাকে না, তেমনি জন্মের মধ্যেও জাতিভেদ দেখা দেবে না। জন্ম ও মৃত্যুর ঊর্ধ্বে মানুষ অহিংস লাভ করবে। এটাই হল মানুষের অমৃতময় প্রেম লাভ। লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই সমাজের মানুষকে পরিশুদ্ধ দেখতে চেয়েছেন।

"রাজার ছেলে গৌতম তৃতীয় নয়নের তপস্যার করুণাকে অজস্র ধারায় অমৃতের মত বিতরণ করে দিলেন আমার প্রভাব জর্জর মানুষের সমাজে। রাজচক্রবর্তী অশোক করলেন সর্বস্ব ত্যাগ, কলিঙ্গ যুদ্ধে আমার ক্রীড়নক চণ্ডাশোক—ওই অমিতাভ বুদ্ধের অমৃত স্পর্শে আমাকে ত্যাগ করে হল ধর্মাশোক।"[৬]

স্বার্থ দম্ভের মত্ততা কৌরব বংশকে ধ্বংস করেছিল। নরমাংস ভক্ষণের রুচি, রক্তপানের প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে থেকে গেছে। তাই কালে কালে মানুষ ভয়ানক দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছে। রক্তবীজ জন্মের অবসান এখনো ঘটেনি। মানুষের মধ্যে মমতার বেদনাকে লেখক দেতে চেয়েছেন। তাই লেখক প্রথমেই মানুষের মধ্যে রাক্ষসরূপী হিংসাকে নাশ করতে চেয়েছেন। তবে মানুষের মধ্যে প্রেম ও আত্মজ্ঞানের জাগরণ হবে। লেখক তারাশঙ্কর নব মানব সমাজ দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তারাশঙ্কর প্রত্যাশা করেছেন—

"রচিত হোক অহিংসার সাধকের নবজন্মের জীবন ক্ষেত্র। সমগ্র মানব সভ্যতা অহিংসা চায়, শান্তি চায়। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে সেতুবন্ধনে উত্তীর্ণ হতে চায় অমৃতলোকে। আলোক এবং অন্ধকারের সংযোজনে মানুষের অন্তরে অন্তরে উদ্ভাসিত হোক উদয়—অস্তহীন জ্যোতির্লোক। বহু বিলম্ব আছে জানি, তবু, হে মহাত্মা, তোমার আত্মদানের ভরসায় অকুণ্ঠ ঘোষণায় বলতে চাই—সে দিন আসবে।"[৭]

লেখক মানুষের কাছে অহিংসা প্রত্যাশা করেছেন। মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও চৈতন্য বোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। লেখক তারাশঙ্কর 'বিধাতা ও মানুষ' গল্পে মানুষকে ক্ষুদ্র বিধাতা বলেছেন। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র শক্তি মানুষেরা গায়ের জোর ও বুদ্ধির অহংকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে হিংসার লড়াই করে থাকে। এটা মানুষের শক্তিত্বের পরিচয় নয়, এ হল ক্রোধ ও হীন নিষ্ঠুরতার প্রকাশ মাত্র।

"আরম্ভ হয়ে গেল মারামারি কাটাকাটি। সে এক ভীষণ কাণ্ড। পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল মানুষ, ক্ষোভে যন্ত্রণায় অপমানে এ ওকে আঘাত, ও একে আঘাত করে—রক্তে রক্তে লাল হয়ে যেতে লাগল মাটি।"[৮]

'বেদের মেয়ে' গল্পে তারাশঙ্কর সমাজের তীক্ষ্ণ বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন। যারা সমাজে ভদ্র পোশাক, চোখে চশমা নিয়ে বাবুই হিসেবে পরিচিত, তারাই সমাজে সবচেয়ে নোংরা ক্রিয়াকলাপ করে থাকে। অসহায় নারীদের টাকার লোভ দেখিয়ে দেহ উপভোগ করে। বেদের মেয়ে শিবি এই ধরণের বাবুদের ঘেন্না করে। বেদে সমাজ চিরকালই সভ্য সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করে। তারা চিরদিন দলিত। সেই সমাজেরই শিবি বুঝেছে তাদের মতো নারীদেরকে বাবুবেশী মানুষেরা কেবলই উপভোগ করতে জানে, কিন্তু নারীর বুকের ভিতর যে

এক মানুষ বসে আছে—তাকে মূল্য দেয় না বাবুরা। বেদের মেয়ে শিবির মধ্যে অন্তর্চেতনা জেগে উঠেছে। দলিতা শিবি বাবুদের প্রতি অভিযোগ তুলে বলেছে—

“ওরা বড় সাধু, সাজে। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে খেলা খেলে কাল তোমায় দেখেও বসে থাকবে গম্ভীর হয়ে, যদি তোমার বুকের ভিতরের হাসির মধু উপচে এসে ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ে তবে সে হাসির মধুকে মদ বলে ঘেন্না করে শাসন করে বলবে নচ্ছার, এখানে এসেছে মদ বেচতে, এই ঠাকুর—বাড়ির উঠানে।”[৯]

‘ছুঁত-পতিত’ শব্দটি বাবুদের কাছে কেবল সমাজে লোক দেখানো বিষয়। কিন্তু অন্ধকারের আড়ালে বাবুদের ব্যভিচারী হয়ে উঠতে সামাজিক মর্যাদার প্রয়োজন লাগে না। ‘শিলাসন’ গল্পে তারাশঙ্কর আরণ্যক মানুষদের সঙ্গে শিক্ষিত সভ্য মানুষদের চারিত্রিক পার্থক্য তুলে ধরেছেন। পণ্ডিতেরা জানে অরণ্যচারী মানুষদের সহনশক্তি বেশি। অনার্য কাঁদনের সঠিক অধিকারকে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারটিকে আর্যেরা মেনে নিতে পারেনি। বন্য মানুষেরা উদ্ধত আর্যদের শাসনকে ভয় পায়। শাসনের নিষ্কৃতি থেকে বাঁচতে দলিত অনার্য আর্যদের সভ্য সমাজ থেকে বহু দূরে থাকে। আর্যদের অহংজ্ঞান অনার্যদের আত্মরক্ষার অধিকারকে বর্বরতা মনে করে। বর্বর মধ্যে স্নেহ ও হিংসা দুটিই প্রবল ও ভয়ংকর। কিন্তু সভ্যদের বৈদগ্ধ্য মুহূর্তের মধ্যে নগ্ন রূপ ধারণ করে। অধিকারের লড়াইয়ে অনার্যদের তুলনায় আর্যদের অহংবোধ অনেক বেশি। আর্যদের প্রতিশোধস্পৃহ দুর্বিনীত—

“তখন আমার বৈদগ্ধ্যের খোলস খসে পড়েছে গাম্ভীর্য সত্ত্বেও। কণ্ঠস্বর উত্তেজিত এবং উচ্চ হয়ে উঠেছে। আত্মরক্ষার প্রেরণার সঙ্গে অগ্নির সহচর বায়ুর মত হিংস—প্রবৃত্তিও জেগেছে। কাঁদনের সম্মুখের আমি অন্যায়ের ভূমিতে দাঁড়িয়েও তাকে ন্যায্য শাস্তিদাতা ভাবতে পারছি না। ভাবছি, আমার শত্রু সে, তাকে আঘাত করবার অধিকার আমার আছে।”[১০]

‘জটায়ু’ গল্পে তারাশঙ্কর পৌরাণিক চরিত্র জটায়ুর মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মদান ও যথার্থ প্রতিবাদ করার সাহসিকতা ফুটে উঠেছে। রাবণ চরিত্রের প্রতিভূ পাপচারী, পিশাচ মানুষদের সংখ্যা সমাজে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। দলিত হচ্ছে নিরীহ সাধারণ মানুষ। যেমন, নামে কালা গোঁসাই, কিন্তু প্রকৃতিতে বিখ্যাত গুণ্ডা, রাহাজানি, ডাকাতি, মেয়ে ছেলে চুরি সবরকম অপকর্মেতে সিদ্ধহস্ত। কালা গোঁসাই চরিত্রদের লোভের সীমা অপরিসীম। এদের লোভের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে চলে। কালা গোঁসাই শিবনাথের স্ত্রীর প্রতি দুরাচারিতা করেছে। সাধুর সাজে সমাজের কিছু মানুষ ভণ্ডামি করে বেড়ায়। থানার দারোগা পর্যন্ত কালা গোঁসাইকে কায়দা করতে পারে না।

“ওদিকে কালী গোঁসাইয়েরও চেহারা বের হতে লাগল। লোককে গালিগালাজ, অপমান ক্রমে চড়-চাপড়-ঘুষি, গলা টিপে ধরে শাসানো—নিত্যাকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।”[১১]

কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়ে অন্যকে কালা গোঁসাই আক্রমণ করে থাকে। ধর্মানুরাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদির অজুহাত দেখিয়ে কালী গোঁসাই নিজের পরাক্রমকে সমাজের ভিতর প্রতিষ্ঠা করেছে। চিমটে দেখিয়ে, পাপ হরণের লোভ দেখিয়ে, ভাণ্ডার ভয় দেখিয়ে মানুষকে নিজের দলে দেনে রাখে। কালা গোঁসাইয়ের শক্তি ও সাহস ভীতির সঙ্গে মানুষের মধ্যে প্রচারিত। পাষণ্ড কালা গোঁসাই চরিত্ররা সমাজকে কলুষিত করে। সাধারণ শ্রেণির মানুষকে দমিয়ে রাখে।

“কারও ডালা থেকে বেগুন, কারও ডালা থেকে মুলো, কারও কাছ থেকে কুমড়ো, কারও কাছ থেকে লাউ আলু, কপি নিলে টেনে তুলে এবং সঙ্গের চেলার ঝুড়িটায় চাপিয়ে আর বার—দুই হাঁক দিয়ে চলে এল।”[১২]

শুধু তাই নয়, কালা গোঁসাই কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আদালতে গেলেও, সাক্ষীরা কালা গোঁসাইর ডাণ্ডার ভয়ে যথার্থ অন্যায়ের কথাকে প্রকাশ করতে পারেনি। অন্যায় চিরকাল এভাবেই বয়ে চলছে। শেষপর্যন্ত অন্যায় তখনই শেষ হয় যখন দলিতরা মাথা তুলে প্রতিরোধ করে। জটা পাগলার হাতে কালা গোঁসাইর নিহত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিবাদের সফলতা এসেছে। সমাজের কল্যাণের জন্য লেখক সচেতন করে দিয়েছেন শোষিত মানুষদেরকে যে, বাঁচার জন্য, অধিকারের জন্য প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রয়োজন।

‘কমল মাঝির গল্প’তে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের হৃদয়ের গুণাগুণ সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। মানুষের স্বভাব কি কারণ দুষ্ট হয়ে ওঠে তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। মানব হৃদয়ের ক্রোধ-লোভ-হিংসার পরিণাম কি হতে পারে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এ সাবধান বাণী তো তারাশঙ্করের সমাজের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী—

“বুড়াবুড়ীর ছেল্যা-পিলাদের বুকের ভিতর একটো করে পিরেত আছে। তারাই রক্ত খায়। ই উয়াকে মেরে খায়, উ উয়াকে মেরে খায়। কিন্তুক শুধু রক্ত খেতে পারে না। রক্তর সঙ্গের রাগের ফোড়ন না থাকলে সি রক্ত পিরেতের তেতো লাগে। হয় রাগের ফোড়ন লয়

লোভের ফোড়ন। রাগ করে ল্যাই করে আমরা এ উয়ার মাথা ফাটাই, কাঁড় দিয়ে বিঁধেঁ মারি। আর লোভ করে মদের সঙ্গে মাস (মাংস) খাবার লেগ্যা পাখি মারি, হরিন মারি, বরা মারি, জানোয়ার মারি। কিন্তক যার লোব নাই—যার রাগ নাই—তার লহু, তিতো লাগে পিয়েতের।”[১৩]

গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। মানুষের এখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্থের উপর নির্ভরশীল। টাকা-পয়সা-বাড়ি-গাড়ি-বাইজী—এসব নিয়ে মানুষ মেতে থাকলেও আসলে এগুলি ‘বিষপাথর’।

‘মানুষের মন’ গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন অর্থের অহংকারে অন্যকে ছোট করে দেখা হল মানুষের অন্তরের একটি কদর্য রূপ। সুভাষিণী ও তার বাপের মধ্যে ধনীর দাম্ভিকতা ফেটে পড়েছে। দরিদ্র শিক্ষিত ভবেনকে সুভাষিণীর নির্গুণ মনে হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পগুলিতে অন্যায়ের ছবিগুলিকে তুলে ধরে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছে (তৃতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলি-০৯, ৫ম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৪০৮।

২.তদেব, পৃ. ১৩।

৩.তদেব, পৃ. ১৩।

৪.তদেব, পৃ. ৩৩।

৫.তদেব, পৃ. ৪১।

৬.তদেব, পৃ. ৪৩।

৭.তদেব, পৃ. ৪৭।

৮.তদেব, পৃ. ৫১।

৯.তদেব, পৃ. ৯১।

১০.তদেব, পৃ. ১৪১।

১১.তদেব, পৃ. ২৫৫।

১২.তদেব, পৃ. ২৫৬।

১৩.তদেব, পৃ. ৩১৯।

....

নিম্নবর্গীয়দের জীবনকথায় সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’

ছন্দা পাল
স্বাধীন গবেষক , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ-

সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে মাছমারাদের গল্প রয়েছে, কিন্তু শুধু গঙ্গা নদীতে ইলিশের মরশুমে মাছমারাদের কাহিনিই নয়, “গঙ্গায় আপনার যাত্রা, আপনাকে সভার সঙ্গমে দেখতে চাই”— বলেছিলেন বিষ্ণু দে। ‘গঙ্গা’ উপন্যাসের নায়ক বিলাস সমুদ্র যাত্রার স্বপ্ন দেখে, সমুদ্রে যাবার জন্য ছটফট করে। তার বাবা নিবারণ ছিল সাঁইদার— যে সমুদ্রযাত্রায় গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল, তখন বিলাস মায়ের গর্ভে কিংবা সদ্যোজাত। নিবারণের মৃত্যুর পর কাকা পাঁচুর কাছে বিলাস মাছ মারা শেখে। কিন্তু বাপের রক্ত যে বিলাসের গায়ে তাই সে বাপের মতোই দুঃসাহসী, কাকা পাঁচু সদাই চিন্তিত তার ভাইপো বিলাসকে নিয়ে, বিলাস তার জীবনের যে কোনোরকম সফলতায় তুষ্ট নয়, মহারাণীর (হিমি) মন জয় করেও গঙ্গায় সে থেমে থাকেনি, সে সমুদ্রে যাত্রা করে— ‘তেঁতলে বিলাস সমুদ্রে যায়’। ফডেনি দামিনীর নাতনি হিমির সঙ্গে ভাব-ভালোবাসায় বিলাসের প্রতি ক্ষোভ ছিল কাকা পাঁচুর, শেষপর্যন্ত এক আকালে নদীবক্ষেই পাঁচু মৃত্যুবরণ করে, তবে মৃত্যুর আগে ভাইপো পাঁচুকে হিমির সঙ্গে মিলিত হবার অনুমতি দিয়ে যায়। আকাল কেটে যাবার পর মাছমারাদের জীবনে সুখের সময় ফিরে আসে, যদিও তা সাময়িক কারণ লেখকের ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে মাছমারাদের জীবনে নিত্য অভাব-অনটন, ঋণে জর্জরিত নিম্নবর্গীয় জেলেদের কথা বিস্তারিতভাবে ফুটে উঠেছে। পাঁচুর মত পেয়ে বিলাস হিমিকে নিয়ে তার গ্রামে মায়ের কাছে যাবার জন্য রওনা হয়, কিন্তু কিছু পথ পেরিয়ে এসে হিমি আবার ফিরে যায় তার পুরনো জায়গায়। বিলাসকে পেয়েও শেষ অবধি হিমি ধরে রাখতে পারেনি। সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে মূল বিষয় চরিত্র চিত্রণ নয়, মূল বিষয় জেলেদের জীবনের ইতিহাস, জেলেদের জীবন ধারদেনায় মহাজনদের কাছে বাধা হয়ে থাকে সারাবছর।

সূচক শব্দ

গঙ্গা, সাঁইদার, মাছমারা, সমুদ্র, ইলিশ, অনিশ্চিত, মহাজন, বিলাস।

মূল প্রবন্ধ

ইতালির অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তাবিদ আন্তেনিয় গ্রামশি তাঁর ‘Prison Notebooks’ (১৯২৯-১৯৩৫) গ্রন্থে ‘সাবলটার্ন’ শব্দটি প্রয়োগ করেন। দক্ষিণ ইতালির দক্ষিণ অংশের অনুন্নত কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী যারা ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, এদের গ্রামশি ‘সাবলটার্ন ক্লাসেস’ বলে অভিহিত করেছেন। এই ‘সাবলটার্ন’ শব্দটি তিনি দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। (১) সরাসরি প্রলেতারিয়েতের প্রতিশব্দ রূপে (২) ‘সাবলটার্ন’ শিল্প শ্রমিক শ্রেণি নয়, সমাজের বিন্যাসের স্তরে ডমিন্যান্ট শ্রেণির অপর মেরুতে অবস্থিত অধীনস্থ শ্রেণি।

‘সাবলটার্ন স্টাডিজে’র অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন রণজিৎ গুহ। তিনি প্রথম ‘সাবলটার্ন’-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘নিম্নবর্গ’ শব্দটি প্রয়োগ করেন। আবহমানকাল ধরে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আধিপত্যবাদের শাসনে, শোষণে নিপীড়িত, বঞ্চিত অসহায় কৃষিমজুর, ভূমিদাস, শ্রমিক, জীবিকাহীন ভাসমান মানুষই ‘নিম্নবর্গ’ বা ‘প্রান্তিক’।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নিম্নবর্গীয়দের চরিত্র নিয়ে বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু তার সংগত রূপ পেতে আমাদের আরো বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের প্রথম ও সার্থক স্থপতি বলা হয় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। তবে তাঁর উপন্যাসে ‘নিম্নবর্গীয়’দের তিনি নিষ্প্রভ করে এঁকেছেন। রাজা, জমিদার, অভিজাত, বিত্তবানদের ভিড়ের মাঝে তিনি ‘নিম্নবর্গীয়’দের বড্ড ম্রিয়মাণ চরিত্রে রূপ দিয়েছেন।

এর পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) রচিত গল্প, উপন্যাসে আমরা 'নিম্নবর্গীয়'দের জীবনকথা বিস্তারিতভাবে জানতে পারি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'কবি' উপন্যাসে আখ্যান বিশ্ব অধ্যয়ন দেখা যায়। ডোম বংশজাত 'নিতাই'-এর কবি হয়ে ওঠার পথে ছিল জাতপাতের কাঁটা ছড়ানো। রাঢ় বাংলার নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের কবিয়াল নিতাই যেন অভিশপ্ত সিসিফাসেরই সন্তান এবং অভিশপ্ত প্রমিথিউস। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় কাহার শ্রেণির জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন সুচারুভাবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে লেখক উপন্যাসের শুরু থেকেই দারিদ্র্য, বঞ্চিত, অসহায় মানুষদের জীবনের কথায় প্রস্ফুটিত করেছেন 'নিম্নবর্গীয়'দের কথা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হার্দিক মমতা দিয়ে এঁকেছেন তাঁর 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) ও 'আরণ্যক' (১৯৩৯) কেবল প্রকৃতি ও মানবপ্রেমের আখ্যান নয়, আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে লেখা জীবনের শোষণ বঞ্চনার নিদারুণ ইতিহাস।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জেলে জীবনের সংগ্রামের কথা জেনেছি। অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম', বিভূতিভূষণের 'ইছামতী', হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' এই সকল নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে জেলে জীবনের অনিশ্চয়তার কথা জেনেছি। ঘর-সংসার ছেড়ে জেলেরা নদী, খাল, বিলে নৌকায় তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেয় কতো কষ্টের মধ্যে। এরপর আমরা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে দেখেছি মাছমারাদের নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের জীবনগাঁথা। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস খুব বেশি মানুষ (পাঠক) পাঠ করেছেন এবং প্রচারিত হয়েছে অনেক বেশি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি যথেষ্ট সাড়াজাগানো উপন্যাস। এখানে তিতাসই মুখ্য। প্রধান চরিত্র তিতাসকেই বলা যায়। তবে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসখানি বোদ্ধামহলে সবচাইতে বেশি প্রশংসা কুড়িয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। এই 'গঙ্গা' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে লেখক, বরেণ্য কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। গঙ্গা সম্পর্কে লেখক সমরেশ বসু বলেন— "বাপ ছেলে মারামারি করছে, বউ-সোয়ামি ছাড়াছাড়ি করছে। এই না মাছমারার জীবন! এক কোটালে বাঁচে, এক কোটালে মরে। মাছের প্রাণের চেয়েও তার আয়ু টলোমলো।" ('গঙ্গা', সমরেশ বসু, পৃ. ১৫৩)

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে আমরা পাই জেলে জীবনের অলৌকিক সংস্কার বিশ্বাসে আবিষ্ট, নদী, খাল, সমুদ্রের জোয়ারভাটা টান আবর্ত। বয়ে চলা নদী ও রহস্যময় সমুদ্রের মধ্যে যাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয়, তাদের মনের ভেতর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অতিপ্রাকৃত অনুভব যেন একই অভিজ্ঞতার ভেতর ও বাহির বলে মনে হয়।

Coleride-এর 'The Ancient Meriner' হতে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' পর্যন্ত জলচর মানুষের একইরকম মানস প্রবণতা। সমরেশ বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, লব্ধ প্রতিষ্ঠ সমালোচক শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "তাঁর সাহিত্যিক জীবনে 'গঙ্গা' একটা মাইলস্টোন।"

'গঙ্গা' উপন্যাসে নিবারণ সাঁইদার সমুদ্র-রহস্যের তত্ত্বজ্ঞ, গহীন জলের সমস্ত লুকানো বিপদ সংকেতের দিশারী, সুদৃঢ় জীবন-দর্শনের বর্মে সুরক্ষিত। কিন্তু সমুদ্রের অপার রহস্য থেকে উৎক্ষিপ্ত। একটা তরঙ্গের উচ্ছ্বাস নিবারণকে কোন অতলের মৃত্যুপুরীতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তাঁর সুদীর্ঘ নাবিক জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, তার অপ্রাকৃত মন্ত্রতন্ত্র জ্ঞানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং তার অন্তিম অদৃষ্টের সম্বন্ধে বোবা হয়, তার শেষ স্মৃতিচিহ্ন রূপে ভাই ও ভক্তশিষ্য পাঁচুর মনের অন্তঃস্থলে সংরক্ষিত রইল। পাঁচু, দাদা নিবারণের চিরবিদায় নেবার পর জালবাহীদের নেতা কিন্তু দাদার মতো অদম্য ব্যক্তিত্ব, প্রচণ্ড দুঃসাহস দূরাভিযানের আমন্ত্রণ স্বীকৃতির মনোবল এসব কিছুই নেই। পাঁচু জানে যে সে যে নিয়মে মাছ মারে ঠিক সেই নিয়মের অনিবার্যতায় একদিন মাছ ও তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পাঁচুর ভাইপো, নিবারণের ছেলে বিলাস মাছমারাদের সমাজে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তার।

মাছমারাদের সামাজিক রীতি প্রথার প্রতি বিলাসের যথেষ্ট মৌখিক আনুগত্য আছে। কিন্তু ঐকান্তিক নিষ্ঠা নাই। তার খুড়ো পাঁচুর সঙ্গে এখানেই পার্থক্য। বিলাসের মানসিক দিগন্ত সুদূর প্রসারিত। লৌকিক কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার পিতার অশান্ত রক্তধারা তার হৃৎস্পন্দনকে দ্রুততর করে তোলে। এবং সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্যে প্রবলভাবে তাকে আকর্ষণ করে। তার অন্তর যৌবনরসে পরিপুষ্ট, তার খুড়ো পাঁচু তার জন্য সদা চিন্তিত এবং উৎকণ্ঠিত থাকে। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য গবেষণায় এবং সহনশীল অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে সমরেশ

বসু 'গঙ্গা'র উপাদান সংগ্রহ করেছেন, লেখকের নিজের ভাষায়— "...আতপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাস, পরেশ দাস এবং হালিশহরের নিমাই অধিকারী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং পিতা। এঁদের সঙ্গে অনেক দিন ও রাত্রি কেটেছে আমার গঙ্গার বুকে।"

শহর-শহরতলী, কলকারখানা, বস্তি-জীবনের বাইরে মাছমারা গোষ্ঠীর জীবন জীবিকা নিয়েই রচিত হয়েছে 'গঙ্গা' উপন্যাস। 'গঙ্গা' সমরেশ বসুর বলিষ্ঠ ভাষায় রচিত কাহিনিধর্মী একখানি অনন্য উপন্যাস। দক্ষিণবঙ্গের মাছমারা, এরা মাছ মারে খাল, বিল, গাঙ নদীতে আবার সমুদ্রেও। মাছমারাদের দলে থাকে— জেলে, কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালো এরা সবাই। গঙ্গার নানা শাখানদী, উপনদী জলপথ বেয়ে উত্তরে বাগবাজারের খাল পেরিয়ে মাছমারা আরো উত্তরে চলে যায় মাছ মারতে মারতে এভাবেই। মাছ ধরা নৌকার সেই মিছিলে চলেছে এক বাছাড়ে পাঁচু আর তার ভাইপো বিলাস। জাতে তারা মালো। এই 'গঙ্গা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিলাস। বসিরহাটের ধলতিতা গ্রামের তেঁতুলতলার বিলাস যে তাই 'গঙ্গা' উপন্যাসে সে 'তেঁতলে বিলাস', আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চার মাস মিষ্টি জলে গঙ্গায় মাছ ধরে এরা। আর সেই মাছ বিক্রি করে পাইকার ফড়েদের কাছে। শুধু পাইকার, ফড়ে নয় এরা, এরা টাকাও ধার দেয় মাছমারাদের। এদের অনেকে মহাজন। যেখানে দরিদ্র, অনিশ্চিত আয়ের মানুষ, সেখানেই মহাজন।

'গঙ্গা' উপন্যাসে লেখক সমরেশ বসু মাছ ধরার কৌশল, কারিগরি, জোয়ারভাটার ছলাকলা সকল কিছুর উল্লেখ করেছেন নিখুঁতভাবে। নদীর প্রতিকূলতা তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মৃত্যুবোধ গঙ্গার মূল চেতনা— বলেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'গঙ্গা' উপন্যাসে দেখেছি লেখক এই মৃত্যুবোধকে অস্তমিত করে এনেছেন হিমির খাতিরে, উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাস লেখকের জীবনের এবং পঞ্চম ষষ্ঠ দশকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সৃজনের মধ্যে অন্যতম এক চরিত্র। সমরেশ বসু বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিপরীতমুখী এক অভিনব সমাবেশ। সমুদ্রের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য বিলাস সতত উন্মনা থাকে। হিমিকে দেখলেই মনে হয় সমরেশ বসুর সৃষ্ট নারী চরিত্র একেবারেই কল্পনাপ্রসূত নয়। একই নারীকে বিভিন্ন ঘোরফেরকে তিনি বিভিন্ন নামে হাজির করেন। কিন্তু পাঁচু? লেখকের বাস্তব জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় হতবাক্ হতে হয় পাঁচুর মৃত্যু বিষয়ে।

পাঁচু তার ভাইপো বিলাসকে নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকে। বিলাসের উথালি পাথালি বুকের কারণ গঙ্গা যাত্রার প্রাক্কালে ঘটে যাওয়া অঘটন হতে পারে। পাঁচু সেই অঘটনকে পাপ কাজ বলে মনে করে। কারণ সেই কাজ অবৈধ। তবে এই জগৎ-সংসারে কতো ধরনের দোষগুণ তো রয়েছে ছড়িয়ে। তার থেকে কেউ কি রেহাই পায়! শুধু দোষের মানুষকে নিয়ে ঘৃণা। গুণের মানুষকে নিয়েও যে শুধু সংসার ধর্ম পালন করতে হয়। বিলাস দোষে গুণেই মানুষ তাই ওর উপর রাগ করতে পারেনি পাঁচু। পাঁচু বিলাসের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে— বিলাসের চেহারা অবিকল বাপের মতো স্বভাব চরিত্রও বাপের মতো। তাইতো পাঁচুর বিলাসের জন্য বড্ড ভাবনা হয়।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস জুড়ে শুধু মাছমারাদের ভাষাই নয়, মাছমারাদের সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং কিংবদন্তি অবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। নৌকো বেয়ে আসতে আসতে পাঁচু বিলাসের নৌকো যখন দামিনীর ঠেকে এসে লাগল সেখানে তখন গ্রামের আরো অনেক নৌকো লাগানো ছিল। দশ বিশ গণ্ডা জেলে মালোর সর্দার হয়ে এতবার নিবারণ সাগরে গিয়েছিল, যে তার নামই হয়ে গিয়েছিল সাঁইদার নিবারণ। আর তার ছেলে তেঁতলে বিলাসকে যে সাগর হাতছানি দিয়ে ডাকবে সে তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এমন প্রাণচঞ্চল বিলাসের প্রাণের সুখ উড়ে গিয়েছিল সেই অমর্ত্যের বউয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার পরে। চিরকালের বেতো রোগী, ন্যালাপ্যাংলা অমর্ত্য বাপের কিছু জমির দৌলতে বিয়ে করে ফেলল এক জাঁহাবাজ মেয়েকে। কিন্তু অমর্ত্য যে সংসারধর্ম করতে পারে না, জোয়ান মেয়েমানুষ তা মানতে পারে না। "আদর সোহাগ ভাব ভালোবাসা ছেড়ে সে চাইল শরীর জুড়োতে। সে হল বাঘিনী। বাঘিনী দিবানিশি থাবা মেরে ফেলে রাখে অমর্ত্যকে। রক্ত খোঁজে বাইরে...সে মেয়ে লাগলে বিলাসের পেছনে। তেঁতলে বিলাসকে বলবে, দেখতেই পাওনা যে গো! বিলাস বলবে, এই তো দেখছি। আবার কেমন করে দেখব। ...পাশ কাটায় বিলাস। অমর্ত্যর বউ বলে, কি হলো গো তেঁতুল বিছে? বিলাস বলে, হুল খাওনি তো তেঁতুল বিছের? খেলে মজাটা টের পাবে।" ('গঙ্গা', সমরেশ বসু, পৃ. ২৭) বিলাস তো হাসতে জানে না। মেয়েমানুষটাও রেগে যায়, ভ্রু কুঁচকে বিলাসকে আরো কতকিছু বলে। সন্ধ্যাবেলা যদি বিলাসের ও পথে ফেরার কথা থাকে তবে শহরের মতো কাপড় পরে, পায়ে জুতো চাপিয়ে দাঁড়ায় দরজার কাছে এসে। বিলাসকে দেখে বলে— "আহা সাঁঝবেলায় এট্টু দাঁইড়েই যাও না হয়।

-গেলে কি হবে?

...বলে কতো দেমাগ তোমার, তাই এট্টু দেখব চেয়ে চেয়ে। - আরো কিছু দেখাতে পারি। বলে বিলাস চলে যায়। অমর্ত্যর বৌ বলে দূর থেকে, খ্যামতা আছে?

তারপর একদিন...বিলাস কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো তার হাত ধরে বলল— পালাচ্ছ কেন, কাঁটার গুণ দেখে যাও। বলে টেনে নিয়ে ফেলল গোয়ালের বিচুলি গাদার অন্ধকারে...। ('গঙ্গা', সমরেশ বসু, পৃ. ২৯-৩০) এরপর থেকে বিলাসের উথালি পাথালি বুক, সাগর ছোঁয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। খুড়ো পাঁচু তাকে সাগরে যেতে দিতে চায় না কোনোভাবেই।

পাঁচু-বিলাস, দামিনীর ঠেকে এসে পৌঁছে নৌকো নিয়ে। দামিনী মহাজন হলেও নিজে মাছও বেচে। সে ফড়েনি তবু তার প্রাণে সাধ ছিল সাগরের ফড়েনি হবার। আর তার চেয়েও বেশি সাধ ছিল নিবারণের জীবনসাথী হবার, বড় টান ছিল নিবারণের প্রতি। সে বহুদিন আগের স্মৃতিমাত্র। তবুও নিবারণের ছেলে বিলাসকে দেখে নিবারণের কথা খুব মনে পড়ে যায়।

দামিনীর কাছে মাছ বেচতে এসে বিলাস প্রথম দেখে দামিনীর নাতনি হিমিকে। আর প্রথম দেখাতেই বিলাস ও হিমি দুজন দুজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিলাসের মনে প্রেমের জোয়ার আসে। ধীরে ধীরে দুজনে দুজনার মনের কাছাকাছি চলে আসে খুব সহজেই। সেজন্যে খুড়ো পাঁচুর গালমন্দ কম খেতে হয় না বিলাসের।

এরপরে গঙ্গার কতো জোয়ারভাটা এলো। এবার মাছমারাদের জালে মাছ ধরা দিল না, গঙ্গায় এবার টোটা, টোটা অর্থাৎ আকাল। সেই পাঁচ বছর আগের মতো আবার টোটায় ভেসে গেল অসহায় মাছমারাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা। অর্ধাহারে, মানসিক পীড়নে অসুস্থ হয়ে পড়ল অনেকেই। পেটের অসুখে সেই টোটায় মারা পড়ল বিলাসের খুড়ো পাঁচু। মাছমারাদের এই দুরবস্থা, দুর্দশার ছবি লেখক সমরেশ বসু অসামান্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন, যা শুধু সমরেশ বসুর বলিষ্ঠ কলমের আঁচড়েই ফুটে বেরোতে পারে।

এই দুরবস্থার মধ্যে থেকেও বিলাস-হিমির প্রেম-ভালবাসায় এতটুকু চিড় ধরেনি বরং অনেক বেশি করে তারা দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরেছে। মারা যাওয়ার আগে পাঁচু বিলাসকে মত দিয়ে গিয়েছে হিমিকে আপন করে নেবার জন্য যদিও প্রথম দিকে তার আপত্তি ছিল। বিলাস-হিমের প্রেম 'গঙ্গা' উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য একথা সত্যি হলেও 'গঙ্গা'য় মাছমারাদের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা দোলায়মান দুর্দশাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। অসামান্য প্রাকৃতিক বর্ণনা রয়েছে উপন্যাস জুড়ে কিন্তু সেও প্রকৃতির জন্য কেবলমাত্র নয়। মাছমারাদের জীবনের ইতিহাস বোঝাতেই এই বর্ণনার ছবি আঁকা।

"মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে। এই রোদ দেখতে বড়ো মিষ্টি। কিন্তু কেমন যেন একটু হলুদের ছোঁয়া লেগে থাকে 'সোনার মতো' বৃষ্টিভেজা গাছের পাতায়, মাটিতে সবখানে চোখ জুড়ানো সোনার ঝিকিমিকি। দেখতে বড়ো ভালো লাগে, কিন্তু গায়ে লাগাও জ্বলে যাবে। মনে হবে যেন ধানি লঙ্কা ঘষে দিয়েছে তোমার সারা গায়ে। খানিকক্ষণ রোদটি লাগলেই ভিন্ন মূর্তি হবে। নেশা-ভাং না করলেও চোখ দুটি কোকিলের চোখের মতো লাল হয়ে উঠবে। মাথায় চাপবে গরম। খেঁকতুড়ি হয়ে উঠবে মেজাজটি।" ('গঙ্গা', সমরেশ বসু, পৃ. ৯৮)

সময়ের সাথে সাথে মাছের আকাল কেটে যায়। সময়ের মতোই বয়ে চলে গঙ্গার জলধারা। গঙ্গায় আবার দেখা যায় সুখ। পাঁচু খুড়ো চলে যেতে চিরতরে, সে আর কখনো ফিরবে না কখনো আর তার প্রাণের অধিক ভাইপো বিলাসকে স্নেহের ধমক দেবে না 'শোরের লাতি' বলে। কিন্তু মাছমারাদের জীবনে সুখের কাল ফিরে আসে কিছুটা হলেও। পাঁচু খুড়ো মারা যাবার পরে বিলাসের নৌকোর সাথী এখন সায়ারাম। বিলাস-হিমির ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে।

লেখক সমরেশ বসু এই পর্বে মেছুনী, ফড়েনি জীবনের কথায় গুরুত্ব দিয়েছেন। নদী তীরের এই সকল দরিদ্র, নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনের কতগুলো রীতিনীতি, পুজো-পার্বণের কথা, আটকৌড়ে বিয়ে, শ্রাদ্ধশান্তি এইসব এবং এদের একটি আনন্দের উৎসব গঙ্গা পুজো এই সকল কিছুর বিবরণ দিয়েছেন অতি সুচারুভাবে, বিস্তারিত কথায়। তবে পাঁচু-বিলাসের গ্রামের বারোমাসের পূজা-পার্বণের কোনো কথা এই উপন্যাসে পাওয়া যায় না। সেখানের দুঃখ-দৈন্যদশার কথাই বড় কথা। পূজা-পার্বণ সেখানে হেরে যায়। সে সকল চুপিসারে আসে আবার সকলের অলক্ষ্যে চলেও যায়। একদিকে সমুদ্রের অমোঘ টান, আর একদিকে হিমির প্রতি টানে। এই দুই টানের মধ্যে দিয়ে বিলাস গঙ্গা পুজো পার করে দেয়। ধীরে ধীরে গঙ্গার মিঠে জলের দিন শেষ হয়ে আসে। এবার বিলাসের সাগরে যাবার পালা। সমুদ্রের টান হিমিকেও টানে। হিমির মনেও বড় সাধ জাগে বিলাসের সঙ্গে সেও সমুদ্রে যাবে। শেষপর্যন্ত তার কি যাওয়া হবে তার মনের মানুষ বিলাসের সঙ্গে!

সমরেশ বসু তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসের জেলেপাড়ার কাহিনি তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এতটাই ফুটিয়ে তুলেছেন, উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে পাঠক আর তার নিজের মধ্যে থাকতে পারে না। সেও ধীরে ধীরে মাছমারাদের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। জেলেপাড়ায় একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা দুই পরতে সাজানো এক পাশ যতটা নিখাদ, অন্য পাশে ততটাই দায়সারা। শোষক শ্রেণির কাছে মাথা নত করতে হয়, এটাই নিয়ম। তোমার জীবন যতটা না বিধাতার কাছে বাঁধা, তার চেয়ে অনেক বেশি বাঁধা মহাজনের কাছে। মাছমারাদের জাল দড়ি কিছুই নেই সেভাবে। তাদের জাল কোনো না কোনোভাবে বাঁধা পড়ে যায় মহাজনের কাছে। যতই জালের খুঁটলি জেলের কব্জিতে জড়ানো থাক না কেন। অনেক সময় ক্ষেত্রবিশেষে মহাজনদের কাছের অসহায় মাছমারাদের বাঁধা পড়ে ঘরের বৌ, সেয়ানা মেয়ে পর্যন্ত।

'গঙ্গা' উপন্যাসে সকল চরিত্রই এক অমোঘ নিয়মে বাঁধা। হাসিকান্নার দেবতা নিজেই রচনা করেছেন মাছমারাদের সমাজে এক অলিখিত সংবিধান। এই সংবিধান তাদের সারাজীবনের পুঁজি। তাইতো দামিনী ও হিমি যতই সাংসারিক কামনা-বসানোর ঊর্ধ্বে না উঠতে পারুক তারপরও এরা ফড়েনির বাইরে যেতে পারেনি। সমরেশ বসু আতরের কথা বলেছেন— 'আতর সধবা নয়, বিধবা নয়, শুধু ফড়েনি। ফড়েনি জীবনের এর চাইতে বাস্তব কথা আর কিছু হতে পারে না। জেলেপাড়ায় যতই শোকের ছায়া নেমে আসুক তাদের গলা ছেড়ে কাঁদতেও নেই। কাঁদলে নাকি সমুদ্রে ভাসমান যসমের অকল্যাণ হবে। তাইতো রাতের আঁধারে যখন মাছমারার বৌয়েরা বিনিদ্র রাত কাটায় তাদের নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়াও হিসেব করে করতে হবে।

নিবারণ মালোর পরিবারের এক রাতের কথায় জানতে পারি— বউ তার ঘুমন্ত সন্তান বুকে নিয়ে জাগে ঘরে। অন্ধকারে দু'চোখ মেলে সেও ভেসে বেড়ায় ঘরের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে। এ বিধির বিধান নয়। বিধি দেয় রাত আর ঘুম। এই ধরণী জাগে পোড়া প্রাণের বিধানে।... নিজের শ্বাস একটু লম্বা করে ফেলবার অধিকার নেই জেলে বৌয়ের। নিঃশ্বাস চেপে সে শুধু প্রহর গোনে। মানিক কুসুমকে (পুতুল নাচের ইতিকথা) ডোবালেন সামাজিক অসমে। শরৎ অচলাকে (গৃহদাহ) মারলেন আপন খেয়ালখুশিতে। আর 'গঙ্গা'র লেখক সমরেশ বসু হিমি-বিলাসের প্রেমকে মারলেন জেলে জীবনের অমোঘ নিয়মে।

'গঙ্গা' উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন গঙ্গার মিঠে জলের দিন একসময় শেষ হয়ে আসে, এমনই এক সময় বিলাস রওনা হল নিজের গাঁয়ে সঙ্গী হল হিমি। একে একে চেনা জায়গা ছেড়ে নৌকো চলল ভেসে ভেসে। হিমির মনের ভেতর চলছে অনাগত অনিশ্চিত জীবনের দোলাচল। নৌকো এসে বাগবাজারের খালের মোড়ে লাগাল যখন— "হিমি মুখ তুলল— ঘুমোওনি মহারাণী? হিমি বলল, না। ওই দেখা যায় খাল। শহরের ভিতর দিয়ে চলে গেছে দূর দূরান্তে। হিমি তার টিনের বাক্সখানি খুলল। জামাকাপড় বের করে গহনা সব খুলল একটি একটি করে। খুলে বাক্সে ভরল। ভাটার টানে নৌকো খালে ঢোকানো যাবে না। জোয়ারের অপেক্ষায় নোঙর করে, কাছে এসে বলল, একি হল মহারাণী? হিমি মাথা নিচু করেই বলল, এসব রইল। ট্যাকা পয়সা, সোনা-গয়না। তুমি রাখ।

- আর তুমি? নীলাম্বুধি বিশাল বিলাসের পায়ে ফুঁপিয়ে উঠল হিমি, ওগো ঢপ আমি যেতে পারব না তোমার সঙ্গে। সমুদ্রে যেন আবর্ত উঠল। - কেন গো মহারাণী? পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে বলল হিমি, সাহস পাইনে ঢপ। আমি এতটুকু পাণী, তোমার অকূলে আমি বেড় পাব না। এই আমার বড় মন চনমনানি ছিল। তুমি যাবে অকূল সমুদ্রে, আঁধার রাতে আমার পাণ পুড়বে, তোমার নাগাল তো আমি পাব না।

বিলাস শান্তভাবেই বলল, আমি মাছমারা মহারাণী, অকূল আমার জীবন, অকূলে আমার মরণ।

হিমির চুল খুলে গেল, কাজল ধুয়ে গেল চোখের রুদ্ধ কান্নায় বলল, পারব না, পারব না গো। আমি এতটুকু, এত বড়কে পাওয়ার ভাগ্যি আমি করিনি।...

বিলাস অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু হেসে হিমির মুখখানি তুলে ধরল। বলল, কেঁদো না মহারাণী। - আর মহারাণী বোলো না ঢপ। - তা বলব, তুমি যে সত্যি মহারাণী। বুঝলুম, এই উচিত হয়েছে। কিন্তু এই বাক্সখানি নে যাও মহারাণী। হিমি বলল, পায়ে পড়ি, নিয়ে যাও। - না গো, না। আমি মাছমারা। এসব আমার থাকতে নেই। এই তেঁতলে বিলাসকে তুমি যা দিয়েছ, তা আর কেউ কাড়তে পারবে না। সে যে মহারাণীর দান গো, মহারাণীর দান। আমার পাণ জুড়িয়েছ তুমি, জুড়িয়েছ বলেই আমি সমুদ্রে যাব।" ('গঙ্গা', সমরেশ বসু, পৃ. ১৮৯)

সমরেশ বসু রূঢ় বাস্তবতার নিখুঁত কারিগর। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলো মূলত সমাজের নিচুতলার মানুষদের নিয়েই রচিত। 'গঙ্গা' একটি আর্থ-সামাজিক কাহিনিধর্মী উপন্যাস। এবং এখানে প্রচুর উপকথা-মিথের ব্যবহার রয়েছে। আর সেটাই 'গঙ্গা'কে বিশিষ্টতা দান করেছে। এই

উপন্যাসের চরিত্র এবং সম্পর্কগুলো আশ্চর্যরকম পরিমিত ও বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্রের এক অসামান্য প্রকাশ আর তাইতো 'গঙ্গা' এক অনন্য সাধারণ।

'গঙ্গা' উপন্যাসের কথক বলা চলে পাঁচু। সেই হিসেবে চরিত্রটি অবশ্যই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচু বড় সহজ-সরল মানুষ, তার মুখে লেখক তেমন জটিল কথা বসাননি। অন্যদিকে দামিনী ফড়েনি হলেও তার জীবনের অভিজ্ঞতা সে বড় আন্তরিকভাবে পাঁচুর কাছে প্রকাশ করেছে। জীবন সম্বন্ধে অনেক বড় কথা দামিনী বলতে পারে না, আর বলার কথাও নয়। তবু জীবনকে যতটুকু বুঝতে পেরেছে সেটাই বলেছে পাঁচুর কাছে– "কপাল কাকে বলে তা জানিনে। এতখানি জীবন কাটল আমার। কত কী এলো, কত কী গেল, কিছুই তো ধরে রাখতে পারিনি দাদা। কপাল কাকে বলে, বুঝলুম না। খালি বুঝলুম, জীবনটা ফুটো কলসি, সে কখনো ভরে না।" ('গঙ্গা', সমরেশ বসু, পৃ. ১০১)

'গঙ্গা' উপন্যাসে সমরেশ বসু যে বার্তা দিয়েছেন, তা হল মাছমারাদের জীবন এক অনিশ্চিত ঋণে জর্জরিত অভাবগ্রস্ত জীবন। মাছেদের সঙ্গেও লেখক মাছমারাদের অনেকাংশে তুলনা করেছেন। লেখক সমরেশ বসু নিম্নবর্গীয়দের নিয়ে এই যে 'গঙ্গা' উপন্যাসটি রচনা করেছেন, তাঁর শৈল্পিক সৌন্দর্য অনবদ্য। অসাধারণভাবে মাছমারাদের দুঃখ-কষ্টে জীবনের ইতিকথা তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, সমরেশ; "গঙ্গা", মৌসুমী প্রকাশনী, কলেজ রো, কলকাতা-০৯, ২. তদেব, পৃ. ১৫৩

৩. তদেব, পৃ. ২৭

৪. তদেব, পৃ. ২৯

৫. তদেব, পৃ. ৩০

৬. তদেব, পৃ. ৯৮

৭. তদেব, পৃ. ১৮৯

৮. তদেব, পৃ. ১৯০

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", অবসরপ্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

২. উইকিপিডিয়া

....

শবর চরিত এক নিম্নবর্গীয় আখ্যান : কথাশিল্পী নলিনী বেরা

জাহানারা খাতুন
গবেষক , বাংলা বিভাগ ,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

'শবর চরিত' লোধাশবরদের জীবন সংগ্রামের আখ্যান। লোধাশবরদের জীবন মূলত আবর্তিত হয় জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই। জঙ্গলেই তাদের বসবাস। জঙ্গল থেকেই তারা জীবনধারণের রসদ সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু অরণ্য সংরক্ষণ আইনের ফলে লোধাশবরা আর জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারে না। স্বভাবতই তাদের অনিশ্চিত বাসস্থান, পেশাগত অনৈতিকতা তাদের জীবনের গতিকে রোধ করেছে। এই পরিস্থিতিতে মাতব্বর রাইবু তার স্বজাতির জন্য কিছুই করতে পারে না। সে ব্যর্থ হয়। তাই লোধা শবররা নিজেদের জঙ্গলমহালের বাসস্থান ছেড়ে একে একে 'পুবাল' দেশে 'নামাল' খাটতে চলে যায়। এমন পরিস্থিতি থেকে লোধাদের উত্তরণের প্রচেষ্টা, শিক্ষিত নুকু ওরফে লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের একক সংগ্রাম, জঙ্গলের প্রতি লোধাদের অধিকারবোধ, লোধা সমাজের নানান রীতিনীতি, সামাজিক আচার-আচরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লোধাশবরদের সামাজিক অবস্থান প্রবন্ধের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ :

নলিনী বেরা, শবর চরিত, লোধাশবর, জঙ্গল, জঙ্গল আইন, শিক্ষা, ভাষা, গেঁড়াশবর, রাইবুলোধা, শিশুবালা, ফুলটুসি, গুড়গুড়িয়া, নৃসিংহ গার্ড, পুলিশের বড়বাবু, বঙ্কা মাহাতো, আদিত্য স্যার, নুকু ওরফে লক্ষ্মীরাণী মল্লিক ইত্যাদি।

মূলপ্রবন্ধ-

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার ফলস্বরূপ নিম্নবর্গীয় জীবনে ক্রমাগত ঘটে চলেছে অবক্ষয়। অপরদিকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে উচ্চবর্গীয়দের সারা বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন। বহমান জীবনে মার্জিত সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী শবর সম্প্রদায়ের মানুষেরা এক হতে পারেননি। তারা এখনও সভ্যতার-সংস্কৃতির মূলস্রোত থেকে অনেক দূরে সভ্যতার প্রান্তে অবস্থান করছেন। বাসস্থানগত, পেশাগত এবং শিক্ষাগত দিক থেকে তাদের যে জীবনসংগ্রাম তারই কাহিনি নলিনী বেরা নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'শবর চরিত' উপন্যাসে। শবরদের বসবাসের জায়গা, খাদ্যাভ্যাস এবং সর্বোপরি পেশাগত অনৈতিকতা সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছে বহুগুণ। 'শবর চরিত' মূলত লোধা-শবর সম্প্রদায়ের জীবনকে অবলম্বন করে লেখা উপন্যাস। 'শবর চরিত' যেন একটি জীবন্ত উপন্যাস। ঔপন্যাসিক স্বয়ং সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুন্ডা, শবর জাতির মানুষদের সঙ্গেই বড় হয়েছেন। ঔপন্যাসিক নিজেকেও ওই শ্রেণীর একজন মানুষ বলেই মনে করেন। লেখকের কথায় –"আমি জাতিতে বোধকরি আদিবাসী শূদ্রই হব।"[১] ঔপন্যাসিক নিজে এই মানুষগুলির সঙ্গে একত্রে বসবাসের কারণে লোধা-শবরদের জীবনযাত্রা, জীবনদর্শন যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তাই তিনি তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। 'শবর চরিত' উপন্যাসে লেখক নলিনী বেরা লোধা-শবর এই প্রাগার্য জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার তপোবন জঙ্গলমহালে বসবাসকারী শবর জনগোষ্ঠীর মধ্যে। জনৈক সমালোচকের মতে, ---"এই অঞ্চল সম্পর্কে আমার বিশ্বস্ত কোন ধারণা নেই।... তবে বুঝতে পারছি মেদিনীপুরের একটি অঞ্চলকে তিনি আঞ্চলিক ভূখণ্ড বা উপন্যাসের স্থান পরিসর হিসেবে ব্যবহৃত করেছেন।"[২]

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শবররা 'এক অপরাধ প্রবণ' জাতি হিসেবে পরিচিত। শবরদের মূল জীবিকা চৌর্যবৃত্তি। শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন দ্বিতীয় প্রকারের শূদ্র এক আদিম প্রাগার্য জাতি। চতুরবর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী এদের বসবাস নগরের সীমান্তে। সাধারণত বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, গুহায় প্রকৃতির গর্ভে এদের বসবাস। প্রকৃতি থেকেই এরা জীবনধারণের রসদ সংগ্রহ করে থাকেন। অরণ্যই তাদের একমাত্র আশ্রয় তাদের জননী স্বরূপা। এই শবররা 'ঋগ্বেদে' 'অসুর', 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' 'শবর', 'অমরকোষে' 'ম্লেচ্ছ', 'মৎস্যপুরাণ' ও 'বায়ুপুরাণ'-এ 'ক্ষত্রিয়' হিসেবে পরিচিত। শাস্ত্র মতে অসুর কারা তার পরিচয় আমরা 'রামায়ণ-মহাভারত' বিভিন্ন পুরাণাদি গ্রন্থ থেকে জানতে পারি।

সমাজে তাদের অবস্থান কীরূপ তারও পরিচয় পাই। তবে পুরাণ মতে বিভিন্ন গ্রন্থ মতে যে শবরদের পরিচয় আমরা পূর্বে পেয়েছি আমাদের মনে হয় তাদের সঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের যে শবরদের নিয়ে কথাশিল্পী নলিনী বেরা তাঁর এই উপন্যাস 'শবর চরিত' নির্মাণ করেছেন তারা কোথাও যেন আলাদা। কারণ বেদ-পুরাণ-মহাকাব্যে যে অসুররূপী শবরদের পরিচয় আমরা পাই যুগ বিভাগে তারা কোথাও যেন আলাদা। তারা যে যুগে অবস্থান করছেন তা হল ধর্মযুগ। আর নলিনী বেরা যে শবরদের নিয়ে তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন তারা স্বাধীনতা পরবর্তী বর্তমান গণতান্ত্রিক সভ্যতার অধিবাসী। তাই আমরা এই উপন্যাস বিশ্লেষণ করার সময় স্বতন্ত্রভাবেই যুগের নিরিখে এই শবরদের জীবন সংগ্রাম, খাদ্যাভ্যাস, কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনায় যাব। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে-গুহায় বসবাসকারী এই প্রাগার্য জাতি সম্পর্কে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আরণ্যক উপন্যাসে বলেছেন ---"যাযাবর আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মতো অনার্য আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন.....ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস ---এই আর্য সভ্যতার ইতিহাস ---বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই --কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরি গুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থিকঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যাস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনিই অবহেলিত, অপমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না।"[৩]

বিভূতিভূষণ যথার্থই বলেছেন তাদের ইতিহাস লেখা আছে বিভিন্ন গিরি-গুহায়, পাহাড়ে-পর্বতে। তবে তাদের ইতিহাস সন্ধান করতে কেউ চায়না। তারা আজও লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপমানিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত। ঔপন্যাসিক এই সকল মানুষদের জীবন ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন তাঁর 'শবর চরিত' উপন্যাসে।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ শবরপাদের লেখা ২৮ ও ৫০ নম্বর পদে শবরজাতির প্রাথমিক পরিচয় পাই আমরা। ২৮ নম্বর পদে শবর-শবরীর প্রেম মিলনের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে ---

"উঁঞ্চা উঁঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরিহণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।ধ্রু।।"[৪]

এই পদের গূঢ়ার্থে না গিয়ে আমরা সাধারণ অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখি যে, উঁচু-উঁচু পাহাড় নগর প্রান্তে। সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। পরিধানে তার ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা। শবর তার জন্য উন্মত্ত হয়, পাগল হয়। তারা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয় ও মহাসুখে দিন কাটায়। নগরের প্রান্তে অর্থাৎ সমাজ বহির্ভূত পর্বতে-পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে এই শবরজাতির বসবাস। চর্যাপদের এই পদগুলি থেকে সেই সময়ে শবরজাতির সামাজিক অবস্থান কীরূপ তা আমরা জানতে পারি। এছাড়া ৫০ নম্বর পদেও পাহাড়ের টিলায় বসবাসকারী শবর-শবরীর প্রেম-মিলনের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে ---

"...কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা।।ধ্রু।।"[৫]

উল্লেখ্য চর্যাপদের দুটি পদে শবরজাতির জীবনচিত্র ধরা আছে। শবর-শবরীর জীবনের সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ এই পদগুলিতে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও এই পদগুলিতে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধ্য-সাধন তত্ত্বের গূঢ় ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। যদিও তা আমাদের আলোচ্য নয় তবুও এ কথা না বললেই নয় যে, তৎকালীন সমাজে বৌদ্ধদের অবস্থান কীরূপ ছিল? কেন তাদের এই হেঁয়ালির আশ্রয় নিতে হয়েছিল? কেনই বা তারা তাদের কথা সরাসরি সমাজবক্ষে রাখতে পারেনি? কাদের ভয়ে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেছেন? তৎকালীন সমাজ কাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তা এই পদগুলি বিশ্লেষণ করলেই আমরা জানতে পারি। আমাদের আলোচ্য 'শবর চরিত' উপন্যাসে গণতান্ত্রিক সমাজে লোধাশবরদের অবস্থান কীরূপ তারই স্বরূপ সন্ধান করা। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে লোধাশবরদের নিয়ে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে তারা কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের অংশ নন। তারা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের মানুষ। ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে ওই মানুষগুলির জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর এই উপন্যাসে।

শবরজাতিকে নিয়ে লেখা উপন্যাস 'শবর চরিত'। এই শবরজাতির দুটি বিভাগ, একটি হল খেড়িয়া শবর ও অন্যটি লোধা শবর। 'শবর চরিত' মূলত এই লোধা শবরদের নিয়ে লেখা উপন্যাস। এই লোধাশবররা বাস করে তপোবন জঙ্গলমহালের দোরখুলির লোধাবস্তিতে। উপন্যাস জুড়ে বিভিন্ন চরিত্রের আনাগোনা। উপন্যাসে আমরা এই অঞ্চল সম্পর্কে অবগত হই লোধাশবর সমাজের প্রচলিত ছড়ার মাধ্যমে,

"রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া/ তপোবনের কাননে
বাল্মীক তপোবনে---/লবকুশ ধরেছেন ঘোড়া হে
বিনা রণে নাই ছাড়েন।"[৬]

জঙ্গলকে ঘিরে আদিবাসী জীবনের বিশ্বাসে, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, মেয়েলি লোককথায়-লোকাচারে, ছড়ায়-ধাঁধায়, গানে, প্রবাদ-প্রবচনে, কিংবদন্তী-জনশ্রুতিতে তাদের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। লোধারা জানে জঙ্গল তাদের মা-বাপ। উপন্যাসের নায়ক রাইবু নিজেকে জঙ্গলের রাজা মনে করে। গুড়গুড়িয়া যেন রাইবুর অনুচর। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি রাইবু আর গুড়গুড়িয়া দুজনে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো মাথায় করে 'শালবল্লা' নিয়ে। গোঠটাঁড়ের মাঠ পেরিয়ে লবকেশরপুরে যাবে মনা সাউ -এর বাড়িতে শালবল্লা বিক্রি করতে। পাঠক তাদের পেশা সম্পর্কে অবগত হন। লোধানারী-পুরুষেরা নিত্যদিনের আহার সংগ্রহের জন্য জঙ্গল মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে সেখান থেকেই তারা ফল-মূল, পাকুর, শাক-সজি, শামুক-ঝিনুক, গেঁড়ি-গুগলি, মাছ, জন্তু-জানোয়ার সংগ্রহ করে থাকে। তারা জানে, "এখন জষ্টিমাস, জাম-জামরুলের কাল। খুঁজলে বন-আলু, নানাবিধ ফলমূলও পাওয়া যাবে।"[৭] এছাড়াও বহু মূল্যবান গাছ-গাছালি চুরি করে স্বল্পমূল্যে তারা স্থানীয় মহাজন দশরথ ও বঙ্কা মাহাতকে বিক্রি করে। তাদের পুলিশ বা অন্য কেউ ধরতে এলে তারা জঙ্গলমায়ের গর্ভে আত্মগোপন করে। রাইবু মনে মনে ভাবে, "জঙ্গল হল মা! তাবৎ লোধামানুষ ত তার ছা-ছানা। সেই জঙ্গল-মায়ের রাজত্বে চরাচর সুখে আছে, সর্বলোক কুশলে আছে, কারো কোনো বিঘ্ন নেই!"[৮] লোধারা পুলিশকে 'কাঁকড়' বলে ডাকে। এরা জানে পৃথিবীর যেখানে যা কিছুই চুরি যাক না কেন পুলিশরা চুরির মাল সন্ধানের জন্য তল্লাশি চালাবে লোধাশোলের লোধাপাড়াতেই। কারণ সমাজে লোধারা "অপরাধ প্রবণ জাতি" হিসেবে খ্যাত।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির মানুষের বসবাস। তাদের প্রত্যেকেরই জীবন প্রণালী কৃষ্টি-সংস্কৃতি ভিন্ন-ভিন্ন। তবে শবররা যেন একটু স্বতন্ত্র। তাদের বিশ্বাসে পুরাণ, মিথ, কিংবদন্তী মিশে আছে। ক্রমশ সভ্যতা এগিয়ে চলেছে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তারা কৃষিকাজ জানে না। খাদ্য উৎপাদন করতে পারেনা। তারা খাদ্য সংগ্রহ করে বেড়ায় বনে-জঙ্গলে। লোধাদের জমি-জমা নেই। তাদের চাষাবাদ না জানার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন রাইবুর বাপ গেঁড়াশবর --

"লদ্ধাদের চাষবাস শিখাতে পেথ্থমে গরু-হাল দিল শিবঠাকুর। দিয়ে বলল, চাষবাস কর। জঙল কেটে চাষের জমি তৈয়ারী কর। ত জঙল কাটতে কাটতে শব্বরের খিদা-তেষ্টা পায়। কী খায়, কী খায়-ন, হালের বলদটাকেই কেটে খেয়ে ফেলল।... যাকে দিয়ে চাষবাস করবি, তাকেই কীনা কেটে খেয়ে ফেললি! হায় হায়রে বোকার জাত! রাগে কাঁই শিবঠাকুর তেখন অভিশাপ দিল, বনেজঙলেই ঘুরে ঘুরে মরবি তোরা। তোদের কপালে চাষবাস নাই।"[৯]

এই জন্যই নাকি লোধাদের কৃষিকাজ শেখা হয়নি। এসব কথা শুনে রাইবুরও মনে হয় সত্যিই কী বোকা লোধা-জাতটা। যাকে দিয়ে চাষবাস করবে সেই চাষের বলদটাকেই কেটে খেয়ে ফেলল। এবার বনে-জঙ্গলে, 'আঁউলা' 'বাঁউলা' ঢুন্ডে মর। 'অরণ্য সংরক্ষণ আইনে'এর ফলে লোধা-শবর, কুম্ভকার, সাঁওতাল, ভুমিজদের জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ করা শুরু হয়। লোধাদের একমাত্র জীবিকা ছিল শালপাতা দিয়ে শালপাতার থালা বোনা, "দশটা বারোটা পাতা জুড়ে দিলেই থালা। আর এই থালা বাবুদের বিয়ে-সাদিতে লাগে, শহর-বাজারে, হোস্টেলেও চলে, রাইবু আপনার মনে বুনছিল, বড় সুখেই বুনছিল।"[১০] এই তপোবন জঙ্গলমহলে সাঁওতাল, তাঁতি, মাহাতো, ভূমিজরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে। তাদের নিজস্ব জমি-জমা রয়েছে। তারা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে। পেশা হিসেবে শালপাতা বোনা ছাড়া লোধাদের আর কোন জীবিকা নেই। কিন্তু জঙ্গল আইনের ফলে জঙ্গল থেকে শালের পালহা-পতর, শালের ডগ্, শাল বীজ, কেঁদপালহা, কেঁদফলও সংগ্রহ করার অধিকার লোধাদের আর থাকল না। স্থানীয় মহাজনদের জঙ্গলের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লোধাশবরদের জীবনে নেমে এল ঘোর বিপর্যয়।

রাইবুর বউ শিশুবালা, বোন সোমবারি, জটালোধার বউবুড়ি, ভুবনলোধার বউ ফুলটুসি, এই লোধা মেয়ে-বউরা দলবেঁধে হল্লা করতে করতে জঙ্গলে যায় ঝাঁটি কুড়াতে-পাতা ছিঁড়তে, নানাবিধ ফল-মূল, শাক-পাতা খাদ্যের সন্ধানে। কাছাকাছি খাবারের সন্ধান না পেলে তারা 'দোরখুলির' জঙ্গল পেরিয়ে দূর 'নারদায়' যায় অন্নের সন্ধানে। এই জঙ্গল পথে নানারূপ বাধা-বিপত্তি আছে। প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি সাপ-খোপ তো আছেই তবে তার থেকেও বড় বিপত্তি নরসিংহ গার্ড। ক্ষুধার তাড়নায় অথবা বাধ্য হয়ে এই লোধাশবর নারীদের ইজ্জত হারাতে

হয় কখনও মহাজন, কখনও গার্ডবাবু, কখনও পুলিশের কাছে। কী দুর্বিসহ তাদের জীবন সংগ্রাম তা 'শবর চরিত' চরিতমালায় চিত্রিত হয়েছে।

অরণ্য সংরক্ষণ আইনের ফলে স্থানীয় মহাজনরা জঙ্গলের ক্ষমতা দখল করে। লোধাশবরদের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগের কালো মেঘ। লোধা নারী-পুরুষদের লুকিয়ে-চুরিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করতে হয় জীবন-ইজ্জত হাতে করে। তবে পঞ্চায়েত থেকে লোধাশবরেরা ছাগল কেনা, ঘুরকা কেনা, বাঁশ কেনা, বাবুই চাষ প্রভৃতির জন্য লোন পেয়ে থাকে। যে টাকা দিয়ে তারা হাঁস-মুরগি চাষ, গবাদি পশু পালন, বাবুই ঘাস থেকে দড়ি তৈরি, বাঁশ কিনে খাঁচী করা, ঘুসি-ঘুনি তৈরি করা, আড়-পাটা মাছ ধরার খলুই ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের জন্য জীবিকা নির্বাহের কিছু পথ তৈরি করতে পারত। কিন্তু কাজ করা যেহেতু তাদের ধাতে নেই তাই লোনের টাকায় তারা পেট পুজো করে। সুতরাং লোনের টাকা তারা শোধ দেবে কীভাবে? পঞ্চায়েত থেকে ডেকে পাঠালে তারা হাজির হয় না। তাদের বাড়ি তল্লাশি চালানো হলে তারা আত্মগোপন করে বনে-জঙ্গলে। এরপর তারা স্থানীয় মহাজনদের কাছে চড়া সুদে দাদন গ্রহণ করে আর সেই দাদন শোধ করার জন্য গাছকাটা, চুরি করার মতো অপরাধমূলক কাজে নিযুক্ত হয়।

লোধাদের জীবন নানারকম সমস্যায় পরিপূর্ণ। সেই সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সংকট। লোধাপাড়ায় আজ পঞ্চায়েতের লোক হানা দেয়, তো কাল নরসিঙা গার্ড তল্লাশি চালায় । অপরদিকে জঙ্গলে প্রবেশের অধিকারও হারিয়েছে তারা। তাই লোধা নারী-পুরুষেরা মিলে সিদ্ধান্ত নেয় এখন তারা 'নামাল' খাটতে যাবে পুবাল দেশে। লোন শোধ করতে না পারলে 'কোরক' হবে, অর্থাৎ পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে, সারাটা জীবন জেল খেটে মরতে হবে। তাছাড়া তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যে কেউ যখন তখন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। বসন্ত কামিল্লা এই লোধাপুরুষ ও বউড়ী-ঝিউড়ীদের নিয়ে চলল 'পুবের দেশে' মজুরি খাটতে ধান কাটার কাজে। লোধা বউড়ি-ঝিউড়িরা ধান কাটা, বিড়া-বাঁধা, বাঁউক সাজানোর কাজে যুক্ত হয়। অরণ্য সংরক্ষণ আইনের ফলে জঙ্গলের গ্রাম উচ্ছেদ। বেনামী জমি স্থানীয় মহাজন ও গার্ডবাবুদের লিজে দেওয়া হয়। লোধারা এতদিন জেনে এসেছে জঙ্গল তাদের মা। আর সেই মাকে-মাতৃভূমিকে যখন তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তখন তাদের অধিকারবোধ জাগ্রত হয়। তারা উপলব্ধি করে তাদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। আর সেই বোধেই জঙ্গলের প্রতি দাবি তুলে রাজা রাইবু বলে ---

"জঙল আমাদের হকের ধন, জঙলের গাছপালহা আঁউলা-বাঁউলা কুরকুট-মুরকুট সব আমাদের, আমরা বলে সেই কুন মান্ধাতার আমল থিক্যে--- সে ত তোর বাপও বলত বড়সোলের গজনাও বলে। কিন্তক গেঁড়াবুড়হা কী পারল হাঁটুয়াদের হাত থিক্যে জঙলকে বাঁচাতে? বেবাক লদ্ধা জাতকে বাঁচাতে? নাই, পারল নাই।"[১১]

লোধারা নিজেদের অধিকারের দাবি নিয়ে হাজির হয় মহাজন দিল্লেশ্বর, বঙ্কা মাহাতো এবং সবশেষে বিট অফিসার নৃসিংহ রাওয়ের কাছে। কিন্তু এদের কথা কেউ শোনে না, ভাবে না, এদের অধিকার রক্ষার জন্য কেউ লড়াই করে না। রাজারাইবু তার স্বজাতিকে জঙ্গলের অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে না। রাইবু ব্যর্থ হয়।

জঙ্গলে প্রবেশের জন্য বাকি লোধাদের মত রাইবুরও পারমিট লাগে। পারমিট ছাড়া কেউ জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবে না। এ হল জঙ্গল আইন। লাইসেন্স ছাড়া ধরা পড়লে গার্ডবাবুদের অত্যাচার সহ্য করতে হয় অথবা চালান করে দেওয়া হয় পাঁচকাহিনার সরকারি বিট অফিসে। বিনা বিচারে জেলবন্দী হয়ে দীর্ঘদিন হাজতবাস। আবার কখনও কখনও গুম করে দেওয়া হয় তাদের। এই গার্ডবাবুদের অত্যাচারের হাত থেকে লোধামেয়েরাও রক্ষা পায় না। জঙ্গলে ফল-মূল, শাক-পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে গার্ডবাবুদের হাতে ধরা পড়লে তাদের পোশাক খুলে নেওয়া হয়, উলঙ্গ করে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়, কখনও কখনও তাদের ধর্ষিতও হতে হয়। আবার গৃহে পুলিশের অত্যাচারও সহ্য করতে হয় এই লোধাশবর মহিলাদের। লোধাপাড়ায় পুলিশ এলে লোধাপুরুষেরা আত্মগোপন করে অরণ্য-গর্ভে। লোধামেয়ে-বউরা থাকে ঘরে। অনেক ক্ষেত্রে লোধামেয়ে-বউরা নিরুপায় হয়ে নিজেদের সম্মান, ইজ্জত বিসর্জন দেয় সমাজের এই ধ্বজাধারীদের কাছে। পুলিশের লালসার শিকার হতে হয়। সমাজে তাদের অবস্থান কী করুণ তা আমরা বুঝতে পারি যখন রাইবুর বউ শিশুবালার সম্মান ভুলুণ্ঠিত হয়। শিশুবালার ঘরে পুলিশের বড়বাবু ঢুকে তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করতে চাইলে শিশুবালা বাধা দেয়। তখন এই উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণ্য সমাজের ধ্বজাধারী বড়বাবু তাদের আভিজাত্যের ব্যাখ্যান করে বলে ---"ছিঃ দুষ্টু করে না, ছিঃ। বলতে বলতে দারোগা শিশুবালাকে বুকের ভিতর জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি শুরু করল, এক সময় নাজেহাল হ'য়ে বলল, ইডিয়েট, বুঝিস না আমার ঔরসে তোর পেটে লোধাবাচ্চা হবে না, হবে বামুনবাচ্চা, ---এসব ভেবেও তোর সুখ হচ্ছে না, সুখ? বামুন? বিশ্বাস করলি না, তবে এই

দ্যাক--- দারোগা জামার ভিতর থেকে ধপধপে সাদা পৈতেটা টেনে এনে শিশুবালার চোখের সামনে তুলে ধরল। শিশুবালা দু'চোখ বুঝে ফেলে, যেন দেখতে পায়--- ভগবান স্বয়ং গাছে বসে আছেন পা ঝুলাঞে, পদ্দোফুলের পারা রাঙা পা দুখান, ত রাইবুলোধা কাঁড়বাঁশ লিয়ে ইদিক-সিদিক ঘুরছে, ঘুত্তে ঘুত্তে গাছের উপর মিরগির কান দেখে কাঁড় ছেড়ে দিল্ল-অ, সেই কাঁড়ে ভগবান মরে যাচ্ছেন, আর বলে যাচ্ছেন, রাইবু রে তুঁই বেড়ে পুন্নবান, ইবার থিক্যে তোর জাত হবে বেরাম্ভণের থিক্যেও বড়।"[১২]

কী করুণ চিত্র! একজন নারী যার কিনা সম্মান হরণ করা হচ্ছে। সে বুঝতেও পারছে না যে তার সাথে কী হচ্ছে! তার জীবনের চরমতম পরিস্থিতিতে সে চোখ বুজে এক কিংবদন্তী কল্পনার জগতে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর সমাজের উচ্চশ্রেণীতে অবস্থান করে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীর শরীরের লালসা ত্যাগ করতে পারেনা এই সমাজের পৈতেধারীরা। এই উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা যেন স্তব্ধ হয়ে যাই। এ কোন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করান ঔপন্যাসিক আমাদের। এ কী সভ্য-শিক্ষিত সমাজ? এরাই কী মার্জিত সংস্কৃতির ধারক-বাহক? এরাই সমাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে নিরন্তর? সমাজের বড়-বড় সিদ্ধান্ত এদের দ্বারাই কী সংঘটিত হয়? এরকম বহু-বহু প্রশ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করান ঔপন্যাসিক আমাদের। যে মানুষগুলোর শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে-ধর্মাচরণে-পেশায় সমান অধিকার নেই। নীচু জাত বলে, কালোচামড়া বলে যাদের মার্জিত সমাজ-সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। 'সাবলটার্ন', 'প্রান্তিক', 'অন্ত্যজ' এই শব্দগুলি যাদের 'সিম্বল'। 'অপরাধ প্রবণ জাতি' বলে যাদের দাগিয়ে দিয়েছে এই তথাকথিত সভ্যসমাজ। যারা একরকম অস্পৃশ্য-ঘৃণ্য জীব। সমাজের মাতব্বরেরা যাদের সঙ্গে পশুসুলভ আচরণ করে থাকে। তাদেরই সমাজের মেয়েদের সঙ্গে সম্ভোগে কোন বাধা নেই উচ্চবর্ণীয়দের। তাদের সকল ব্রাহ্মণত্ব , আভিজাত্য এই অন্ত্যজ-কৃষ্ণাঙ্গ নারীর দেহতত্ত্বের গহ্বরের নিমজ্জিত।

এই অন্ত্যজ লোধারমনী যারা নিত্যদিন খাবারের সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তারা আবার স্বপ্ন দেখে গৃহস্থ্য মহাজন ঘরের বউ হওয়ার। শিশুবালা বঙ্কা মাহাতোর দোকানে সরু চাল কিনতে গিয়ে মনে মনে ভাবে ---"আচ্ছা সে যদি বঙ্কার বউ হতো? বঙ্কা মাহাতোর বউ? তার খুবই সুখ হত। হতো কী? বনে-জঙ্গলে সাপখোপের ভিতর এটা-ওটা ঢুঁড়তে হত না, দিব্যি খেতে পেত, সরু সরু চিকন 'চাউরের' ভাত। শাড়ি ব্লাউজ, কত কী পরতে পেতো কাপড়-চোপড়। ভরপেট খেয়ে দুপুরে ভাতঘুম, রোদে-রোদ্দুরে ঘুরতে হত না।...খালি যা রাত হলে তুলোর তুল্য বিছানায় বঙ্কার দরুন শুয়ে থাকা---।"[১৩] এই অন্ত্যজ রমণীরাই আবার জঙ্গলের অধিকারের জন্য এই মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

এই লোধাজাতির জীবনে নানারূপ দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের পাশাপাশি তাদের সমাজের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান লোকাচার যেমন, গামহা পূর্ণিমা, বাঁধনা পরব, বড়াম পূজা, টুসু পরব, চাঙুনাচ, পাতানাচ ইত্যাদি উৎসবের পরিচয় পাই। এই উৎসবগুলি তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের জনপ্রিয় উৎসব 'বাঁদনা পরব'। গ্রামীণ শ্রমজীবনের শ্রেষ্ঠতম শরীক গাই-বলদ। বাঁদনা পরবের মধ্যে দিয়ে গাই-বলদকে সম্মান-শ্রদ্ধা জানানো হয়। কামার-কুঁম্ভার-ভূঁইয়া-ভূমিজ, মাহাতোরা বাঁদনা পরব পালন করে। গামহা পূর্ণিমায় শবরেরা বরামথানে 'বনদুর্গা'কে ভক্তি ভরে পুজো করেন। লোধাদের বিশ্বাস তাদের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগ ছিল এখন তাদের কলিকাল। নানান তিথি নক্ষত্র জানার জন্য লোধাদের পঞ্জিকার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির পরিবর্তন দেখেই দিনক্ষণ স্থির করে নিতে পারে তারা, বলে – "কুড়চিফুল ফুটে বন-জঙ্গল ডোবকা-ডুংরি ধবোয় ধব হয়ে গেল,... এখন খরার কাল।...পাঁজি পুঁথি কী করবে?"[১৪] এই সমস্ত দিনক্ষণের বিষয়ে বড়শোলের গজনালোধাই একমাত্র ভরসা। আবার পৌষমাসের মকরসংক্রান্তিতে টুসু পূজার উৎসব শুরু হয়। চাঙ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বৃত্তাকারে লোধা নারী-পুরুষরা মিলে চাঙ-নৃত্য প্রদর্শন করে। এই চাঙ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে 'পাতা-নাচ' বা পংক্তি নাচ ও 'ঝুমুর নাচের' সময়ও।

আদিবাসী সমাজের ভাষা আমাদের মার্জিত ভাষার থেকে স্বতন্ত্র। ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো জাতির সংস্কৃতিকে জানার জন্য। কোনো জাতির সমাজে অবস্থান কীরূপ তা তাদের ভাষার দ্বারা জানা যায়। লোধাশবর জাতির মানুষদের নির্দিষ্ট ভাষা আছে। এছাড়া তারা কথোপকথনের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়ার ব্যবহারও করে থাকে। লোধাদের ভাষা সভ্যসমাজে মর্যাদায় উন্নীত নয়। উপন্যাসে আমরা তাই নুকুর ভাষা নিয়ে তার সহপাঠীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে দেখি।

আদিবাসী সমাজের চাষিমানুষদের হেঁয়ালির মধ্যে তাদের জীবনবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে। কলাগাছের চাষ সম্পর্কে তারা বলেছেন, পাতা না কাটলে কলার কাঁদি 'পুরুষ্ট' হবে এবং তাতেই তাদের ভাত কাপড়ের দুঃখ-কষ্ট যাবে দূর হয়ে। এখানে মনে পড়ে যায় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর মুখে উচ্চারিত সেই শাশ্বত উক্তি ---"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।"[১৫] মা অন্নদার কাছে

ঐশ্বর্যের দাবি না করে সর্বকালের সর্বসেরা পিতার আর্তি তার সন্তানের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চিন্ততা। অতিরিক্ত কিছু চায় না এই আদিবাসী সমাজের মানুষেরাও তাদের ভাত-কাপড়টুকু জুটলেই চলে যাবে। স্বল্প আকাঙ্ক্ষা তাদের। ঐশ্বর্যের কোন মোহ নেই তাদের। জঙ্গলই তাদের ঐশ্বর্য। জঙ্গলকে ঘিরেই তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা আবর্তিত হয়। 'অরণ্য সংরক্ষণ আইন' তাদের অরণ্যমা'কে হরণ করেছে। সভ্যতা তাদের করেছে অসহায়, বিপন্ন, আশ্রয়হীন।

উপন্যাসে আমরা দেখি দরিদ্র লোধারা বনের মধ্যে ছোট ছোট কুঁড়েঘরে বসবাস করেন। ঘরগুলি প্রায় ছ'ফুট চওড়া আয়তকার। এই দুচালা কুঁড়েঘরগুলি নির্মিত গাছের ডাল/ বাঁশ, লতা বা বাবুই দড়ি, বুনো ঘাস, খেজুর পাতা বা খড় সংযোগে ছাউনি তৈরি করা হয়। তিন থেকে চার ফুট উঁচু করে মাটির দেয়াল বা ছিটে বেড়া দেওয়া হয় 'মুধুন' পর্যন্ত। ঘরের দুটি চালের সংযোগকারী শক্ত কাঠের দণ্ডকে বলা হয় 'মুধুন'। এই হল ঘরের চিত্র। এছাড়া তাদের জীবনধারণের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম গুলি হল, রান্নার জন্য মাটির হাড়ি, খাপরি/সরা/ঢাকনা, অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি, লোহার কড়াই, জল রাখার জন্য মাটির কলসি, লবণ রাখার জন্য কাঠের খুপরি বা বাঁশের ফাঁপা চোঙ্গা এছাড়া অ্যালুমিনিয়ামের বড় জামবাটি, থালা, গ্লাস ব্যবহার করেন আহারের পাত্র হিসেবে। কৃষিকাজের জন্য লাঙ্গল, মই, কোদাল, কাস্তে, দা, খন্তা, শাবল ও সেঁচের জন্য তেঁড়া বা ডোঙ্গা বালতি প্রভৃতি এবং শিকারের জন্য ব্যবহার করেন তীর-ধনুক, ফাঁদ/ফাঁস, ক্যাঁচা, ছুরি, আঠা, টাঙি, বল্লম, গণহাকাঁটা, চোঙ্গা, প্রভৃতি। এছাড়া লোধাদের জীবন নানারকম সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। লোধাশবর জাতির ইতিহাস কীভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সমাজ থেকে তারা কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সমাজে তাদের অবস্থান কীরূপ তা উপন্যাসে খুব নিখুঁত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঔপন্যাসিক। লোধাশবর সমাজ মূলত পরিবার কেন্দ্রিক, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। লোধাশবর সমাজ মন্ডলরা নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ডলের সদস্যগণ মূলত পুরুষ। বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ যেমন পূজা-পার্বণ, মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে মন্ডল পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে। নারীরা সাধভক্ষণ, একুশা, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কর্ম ও সংসার পরিচালনার মুখ্য দায়িত্ব পালন করে। এই লোধাশবর সম্প্রদায়ের পূজিত দেব-দেবীরা হলেন চন্ডী-কালি-দুর্গা, শিব, জগন্নাথ, কালুয়া ষাঁড়, বসন্ত বুড়ি/মা শেতলা, বসুমাতা, গুপ্তমনি, ধরম দেবতা/ধর্ম ঠাকুর, মনসা, পবনবীর, যুগ্নি প্রভৃতি। কালক্রমে বর্ণহিন্দুরা সমাজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এই অন্ত্যজ দেবীদের গোত্রান্তর ঘটালেন, তাঁদের জাতে তুললেন। অর্থাৎ এই অন্ত্যজ মানুষগুলির দেব-দেবীদের উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুরা হরণ করলেন। পরবর্তীতে শক্তিশালী বর্ণহিন্দুরা এই শবরদের উপর অত্যাচার শুরু করে ফলে তাদের আরাধ্য এই দেব-দেবীদের পূজার্চনা বন্ধ করে দিতে হয়। আমরা দেখি এই আদিবাসী মানুষদেরকে সমাজের ধ্বজাধারীরা সবদিক থেকে বঞ্চিত করেছে। এই উচ্চশ্রেনীর মানুষেরা ক্ষমতার জোরে লোধাশবর মানুষদের বিশ্বাস তথা এদের দেব-দেবীদেরও হরণ করেছে। এদের মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। এদের "অপরাধ প্রবণ জাতি" তকমা দিয়ে অপরাধে লিপ্ত থাকতে বাধ্য করেছে। সর্বোপরি এদের জঙ্গল থেকে উৎখাত করে এদের আশ্রয়হীন করে দিয়েছে।

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী পরাধীন ভারতবর্ষের মুন্ডা সম্প্রদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন। মুন্ডাজাতির সংগ্রামও ছিল অরণ্যের অধিকারকে নিয়ে। মুন্ডা জাতির নায়ক বিরসা মুন্ডা। তবে সে সংগ্রাম ছিল মূলত ইংরেজ সরকারের ও স্থানীয় দিকু/মহাজনদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র সংগ্রাম। নলিনী বেরা 'শবর চরিত' উপন্যাসে স্বাধীনতা পরবর্তী লোধাশবরদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন। মুন্ডা এবং লোধারা উভয়ই আদিবাসী সমাজভুক্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। নলিনী বেরার উপন্যাসে পাই লোধাশবরদের বাসস্থানগত, পেশাগত, ধর্মীয়, শিক্ষাগত সংগ্রামের কথা। উপন্যাসের শুরু থেকেই আমরা মূলত রাইবুকেই খুব অসহায় ভাবে লড়াই করতে দেখি। আর তাকে কেন্দ্র করেই গুড়গুড়িয়া, শিশুবালা, সোমবারি, ফুলটুসি ও বাকি লোধাদের জীবন আবর্তিত হলেও আখ্যানের দ্বিতীয় পর্ব থেকে উপন্যাসের স্বাদ যেন বদলে যেতে থাকে। পাঠক যতই উপন্যাসের গভীরে প্রবেশ করে ততই যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে এ সংগ্রাম আসলেই ভুবনলোধার মেয়ে নুকুর ওরফে লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের। তার সংগ্রাম কোন ঢাল-তলোয়ার নিয়ে নয় বরং কলম নিয়ে তার সংগ্রাম, কলমের লড়াই। উপন্যাসে আমরা দেখি অরণ্য আইন লাগু হওয়ার ফলে লোধারা আর জঙ্গলে বিনা পারমিটে প্রবেশ করতে পারে না। জঙ্গল ছিল তাদের একমাত্র আশ্রয়, জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। লোধারা জঙ্গলের অধিকার হারিয়ে ফেলছে। জঙ্গল থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ কুদরা সাঁওতালের মেয়ে মরনী জঙ্গলে ধান কাটতে গেলে কারা যেন তাকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় সমগ্র সাঁওতালপাড়া স্বর-গরম হয়ে ওঠে। কোন প্রমাণ ছাড়াই শুধু সন্দেহের বশে আর যেকোনো অপরাধ সংগঠিত হোক না কেন লোধাদের নামেই দোষ হয়, এই ভাবনাকে সত্যি

করার তাগিদেই হয়তো এক রাতের অন্ধকারে সাঁওতালরা লোধাপাড়া আক্রমণ করে। ঘুমন্ত নুকুকে তুলে তারা বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয়। তার চিল চিৎকার কান্নার সামনে তার বাবা ভুবন লোধাকে তারা দুই টুকরো করে ফেলে। ধর এবং মুন্ডু দুই দিকে ছিটকে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে সোমবারি জঙ্গলের ভিতর এক দৌড়ে পালিয়ে যায়। রাইবু, গুড়গুড়িয়া তো অনেক আগেই গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে। লোধাবস্তির কাউকে আর দেখা যায় না। কে কোথায় যে পালিয়েছে কারোও আর খোঁজ মেলে না। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলায়। পরবর্তিতে আমরা দেখি ভুবনলোধার মেয়ে নুকু হোস্টেলে থাকে। সে পড়াশোনায় খুবই ভালো। মাঝে মাঝে সে বাড়ি আসে। সে খুব মেধাবী, খুব ভালো কবিতা লেখে। তবে তার ছাত্রজীবন খুব সরল হয়নি। তার উচ্চবর্ণের সহপাঠীরা তাকে পছন্দ করেনা, তাকে ঘৃণা করে, হিংসে করে, তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। এমনকি আদিত্য স্যার নুকুর প্রশংসা করলে তার উচ্চবর্ণের সহপাঠীরা আদিত্য স্যারের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে অপবাদ ছড়ায়। এইসব কারণে আদিত্য স্যার বাধ্য হন স্কুল ছেড়ে চলে যেতে । নুকুর সাথে কেউ কথা বলে না একমাত্র তাঁতিদের মেয়ে শিল্পী ছাড়া। তবে এইসব প্রতিকূলতাকে নুকু তোয়াক্কা না করে নিজের বিশ্বাসে নিজের লক্ষ্যে অটল থেকে তার পড়াশোনা চালিয়ে যায়। একের পর এক পরীক্ষায় সে সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে থাকে। সে মাঝে মাঝে তার গ্রামে আসে এবং 'লোধাজড়মাড়ষ'কে তাদের অধিকার, জঙ্গলের প্রতি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করে থাকে। তার স্বরচিত প্রতিবাদী কবিতার মাধ্যমে সে লোধাদের মধ্যে অধিকারবোধ জাগিয়ে তুলতে চায়, সে বলে---

"ভখলাতে আলু-তুণ্ডা যদি ধরে নরসিঙা/ বল্ রাণী বল্ মুনু একসঙে চেঁচাঞে---/ বনে জনম বনে মরণ বন লোধাদের হকের ধন।।/ কহে দে রাণী, কহে দে মুনু, বন আমাদের মা বঠে।।"[১৬]

এছাড়া সে আরও বলে – "মানুষ জাতি এরাও, মানুষ এদের নাম,/ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় শিকার ওদের কাম।/ জাতিতে ওরা লোধা ছোট্ট ওদের ঘর,/ তালপাতাতে ছাওয়া কিম্বা কিছু খড়।"[১৭]

কেবল লোধা বস্তিতেই নয়, মাহাতোদের পাড়ায়, সাঁওতালদের পাড়ায় সব জায়গায় লক্ষীরাণী মল্লিকের নাম ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই তাকে ভালোবাসে সম্মানের চোখে দেখে। লক্ষীরাণী মল্লিক এই সম্মান নিজের যোগ্যতা দ্বারা অর্জন করেছে। লক্ষীরাণী মল্লিক তার সমাজের উদাহরণ হয়ে ওঠে। নুকুর মা ফুলটুসি নৃসিংহের অত্যাচারের প্রতিবাদে বলে আজ যদি আমার মেয়ে নুকু থাকতো না, একটা 'পিটিশন' করে দিত ওদের বিরুদ্ধে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'পিটিশন' অর্থাৎ প্রতিবাদের ভাষা শিখিয়েছে লক্ষীরাণী মল্লিক। বসন্ত কামিল্লার প্রলোভনে পড়ে অসহায় লোধারা পুবাল দেশে নামাল খাটতে গেছে। নুকু পুবাল দেশে গেছে লোধাদের ফিরিয়ে আনতে তার রক্তের টানে। সে লোধাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে কেন তারা তাদের দেশ, গ্রামের মাটি ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়ে আছে। নামাল যদি খাটতেই হয় তবে পাশের গ্রামেই খাটুক। এত দূরে নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে, জঙ্গলের অধিকার ছেড়ে কেন পড়ে থাকা। কিন্তু লোধারা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সে মন খারাপ করে চলে এসেছে। তবে নুকুর ভাবনার গুরুত্ব মূর্খ লোধারা চাঁদবদনির ইজ্জত ও মৃত্যুর বিনিময়ে বুঝতে পেরেছে। আর তাই তারা বিদেশ-বিভুঁই ছেড়ে নিজেদের গ্রামের মাটিতে, নিজেদের জঙ্গলে ফিরে এসেছে। বিনা অপরাধে রাইবু-গুড়গুড়িয়া জেল খাটছে। নুকু একাই রাইবু, গুড়গুড়িয়াকে একবার মেদিনীপুর একবার ঝাড়গ্রাম কোর্টে খুঁজে বেরিয়েছে। তবে সে তাদের খুঁজে পায়নি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু নুকুর সংগ্রাম থেমে থাকেনি। নুকু ব্যর্থ হয়নি। নুকু আবার গ্রামে ফিরছে। তাদের দোরখুলিয়ার জঙ্গলে ফিরছে সে। অশিক্ষিত রাইবুর পরে লক্ষীই হয়তো হবে লোধা সমাজের প্রতিনিধি তথা শিক্ষিত মাতব্বর । তার শিক্ষা তার জ্ঞান তার আগামী প্রজন্মদের তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করার পথ দেখাবে এই আশার আলো উপন্যাসের আকাশে বহমান।

তথ্যসূত্র:

১. বেরা, নলিনী, সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৩২

২. কর্মকার, লক্ষণ, সৃজন, কুশপাতা, ঘাটাল, ২০১৯ পৃ. ১১

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৪২

৪. দাস, নির্মল, চর্যাগিতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৪, পৃ. ১৯০

৫. তদেব পৃ. ২৩৬

৬. বেরা, নলিনী, শবর চরিত(অখণ্ড সংস্করণ), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৩

৭. তদেব পৃ. ১২

৮. তদেব পৃ. ১৮
৯. তদেব পৃ. ৬৩
১০. তদেব পৃ. ৩৫
১১. তদেব পৃ. ৩৫৪
১২. তদেব পৃ. ৫২
১৩. তদেব পৃ. ২৫
১৪. তদেব পৃ. ৫৯
১৫. মুখোপাধ্যায়, তরুণ, অন্নদামঙ্গল(প্রথম খন্ড) দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৫৫
১৬. বেরা, নলিনী, শবর চরিত দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৫৬
১৭. তদেব পৃ. ৩৭২

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪
২. বেরা, নলিনী, উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯
৩. ঘোষ, তপনকুমার (সম্পা.), প্রাচীন ভারতে বর্ণ শ্রেণী ও জাত, ছোঁয়া, শেওড়াফুলি, হুগলি, ২০১৬
৪. দাস, নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮
৬. ঘোষ, প্রদ্যোত, বাংলার জনজাতি (প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭
৭. ঘোষ, প্রদ্যোত, বাংলার জনজাতি (দ্বিতীয় খন্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩
৮. ভক্তা, প্রহ্লাদকুমার, লোধাশবর জাতির সমাজজীবন, মারাংবুরু প্রেস, পূর্ব মেদনীপুর, ২০০৯
৯. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ(প্রথম খণ্ড), বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯১
১০. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, তথ্য ও সংস্কৃত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০৪
১১. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.) নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২৩

....

শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা' : নিম্নবর্গীয় মানুষের আত্মজাগরণের ইতিহাস

ড. মাগফেরা বেগম
সহকারী অধ্যাপিকা,বাংলা বিভাগ, রাজগঞ্জ কলেজ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক ও বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্ব শেখর দেবরায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুন শিলচর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত হন। 'অন্তিমের সুর' (১৯৮৭) নাটকটি তাঁর প্রথম নাটক হিসাবে আমরা পেয়ে থাকি। ১৯৯২-এ নূতন দিল্লিতে 'সফদর হাশমি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' আয়োজিত পথ নাটক বিষয়ক কর্মশালায় তিনি প্রশিক্ষিত। আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন শহর, নূতন দিল্লী, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, ইম্ফল এবং বাংলাদেশের সিলেট ও মৌলবী বাজার প্রভৃতি শহরে তিনি নাট্যাভিনয় করেছেন। এই সূত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্ব - সেলিম আলদীন, রসিদ হারুণ (বাংলাদেশ), বিভাস চক্রবর্তী (কলকাতা), রতন থিয়াম, কাহ্নাইলাল, দোরেন্দ্র সিংহ (মণিপুর), হাবিব তনবীর (দিল্লী) প্রভৃতি ব্যক্তির নাটক, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও উপস্থাপন কৌশল তাঁকে নাটক রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

বিশ শতকের শেষ পর্ব ও একুশ শতকের সূচনায় বাংলা নাটকের যাত্রা যে কত বিচিত্র পথে এবং বৈচিত্র্যময়ভাবে অগ্রসর হতে পারে, তার একটি বলিষ্ঠ নিদর্শন শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা' (২০০২) নাটকটি। 'অথ মনসাকথা' নামক লোকপুরাণের কাহিনীকে আশ্রয় করে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন নতুন আঙ্গিকের এই নাটক। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'উজান' পত্রিকায় ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ২০০২-এর ডিসেম্বরে শিলচর কালচারেল ইউনিট, শিলচর, কাছাড় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এককভাবে অথবা দলগত ভাবে অভিনয় উপযোগী এই নাটক বাংলা নাট্যমঞ্চ ও অভিনয় জগৎকে এক অভিনব মাত্রায় পৌঁছে দেয়। একুশ শতকের সূচনা পর্বে একদিকে তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও ভুবনীকরণের এককেন্দ্রিকতা, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। অন্যদিকে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজনে চলছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্যের বিচার বিশ্লেষণ। এই প্রেক্ষিতেই শেখর দেবরায় রচনা করেন 'মনসাকথা' নাটক। মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারী পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠায় রচিত এই নাটকের প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায়— গায়েন, বায়েন ও দোহার কর্তৃক দিক বন্দনা ও মনসা বন্দনা। কোটিশ্বরের পুত্র চম্পকনগরের অধিপতি চন্দ্রধরের পরিচয়সূত্রে আমরা শিববন্দনা পেয়ে থাকি। পরিবেশক গায়েন, বায়েন ও দোহারদের সহায়তায় নাট্যকার কাহিনী পরিবেশন করলেও তার কেন্দ্রে রয়েছে চাঁদ, মনসা, সনকা, বেহুলা, লখীন্দর, লেংগা, মাঝিমাল্লা প্রভৃতি চরিত্রগুলি। উক্ত চরিত্রগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকটি এগিয়ে যায়। মনসার বন্দনা গান শেষ হলে গায়েন জানিয়ে দেন 'চান্দের' চৌদ্দডিঙা মধুকর যারা বেয়ে যায়, সেই জলে জঙ্গলায় থাকা মাঝিমাল্লারা তাদের বংশের দেবী মনসা তথা নাগমাতা জরৎকারুর পূজা করতে পারে না চাঁদ সদাগরের ভয়ে। যে দেবীকে স্মরণ করলে আপদ নাশ হয়। তাদের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় সপ্তডিঙার বৈঠা হাতে তুলে মনে মনে তাকে স্মরণ করতে হয়। দেবীকে অমান্য করার যে অপরাধ তা মাঝিমাল্লারা মেনে নিতে নারাজ। তাই সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে সামনের শ্রাবণের পঞ্চমী তিথিতে মাতা মনসার পূজা করবে। মাঝিমাল্লাদের ঐক্যবদ্ধভাবে নাগমাতা মনসার পূজা করার সংকল্প চাঁদের মোটেই মনঃপুত হয় নি। তাই সভার মধ্যে সকলের সামনে বলেন জোরগলায়—

"খবর আছে শাওন্যা পঞ্চমীতে নাকি লঘুজাতি কানীর পূজার উজ্জোগ চইলতেছে! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! চেঙ্গমুড়ি কানীর পূজা! নাগ কইন্যারে মাইন্যতা জানাইয়া ফুল-জল তিনি চায়। কিন্তু শুইন্যা রাখ । আমি দেবাদিদেব মহাদেবের ভক্ত চান্দ সদাগর—-আমার ক্ষ্যামতার সীমানায় বাবা ভোলানাথ ছাড়া আর কারো পূজা-আচ্চা করা নিষেধ।"[1]

এই সময় লেংগার মুখে শুনতে পাওয়া যায়-- তাঁর স্ত্রী সনকাই বাড়িতে মনসাপূজার আয়োজন করেছে এবং স্বচক্ষে সনকাকে মানতের 'বারা' নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে মনসাকে ভর্ৎসনা করেন এবং হেমতালের লাঠির আঘাতে মনসার 'বারা' ভেঙে ফেলেন। মাঝিমাল্লারা মনসার এই অপমানে বেদনাগ্রস্ত হয় এবং সকলে একত্রিত হয়ে চম্পক নগরে সনকার কাছে অভিযোগ জানায়। আজ থেকে চাঁদ সদাগরের মধুকরের কাড়া ধরবে না এবং ডিঙ্গার বৈঠা ধরবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। জল-জঙ্গলায় বসবাসকারী এই দরিদ্র লোকেরা

ধীরে ধীরে চম্পকনগরে আগত বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যে মোহগ্রস্ত হয়ে মনের খুশিতে বণিকদের ইচ্ছে মতো প্রাণ তোয়াক্কা করে ডিঙ্গার কাড়া ধরেছে। দিন-রাত একাকার করে বণিকের ধনদৌলত পারাপার করেছে, তারপর বোধবুদ্ধি হলে বুঝতে পারে নিজের জীবন কাদের জন্য উৎসর্গ করেছে এই সরল মানুষজনেরা। তাদের শরীরের ঘাম দিয়ে বণিকের দালান গড়ে উঠেছে। হিসেব নিকেশের খাতা খুললে দেখা যায় সদাগররা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়েছে, অন্যদিকে দরিদ্র মাঝিমাল্লা মানুষেরা অমাবস্যার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। তাই নাটকে ১ম মাঝির সংলাপে শোনা যায়—

"মাগো! জোয়ার ভাঁটা জগতের নিয়ম। মোদের জীবনে জোয়ার কই? কেবল দেখি ভাঁটার টান। আগে আইত না, কিন্তু এখন মনে অয়, বণিকের দল বুঝি মোদের ঠকাচ্ছে। মুখে মা মনসার নাম লইয়্যে মোরা বুকে জোর পাই। কেউ যদি মোদের সেই ভাব-ভক্তি নষ্ট করবার চায়— তে অইলে গো মা! তার উপর কি ভরসা রাখন যায়?"[২]

মনসাদেবীই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, আশার আলোর দিশারী। সেই দেবীর পূজা-অর্চনায় বাধাপ্রাপ্ত হলে তাদের মুখে উঠে আসে বিদ্রোহের ভাষা। সনকার অনুরোধে মাঝিমাল্লারা শান্ত হলেও বিদ্রোহের সুর তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই লখীন্দরের বিয়েতে মনসার পূজা-অর্চনা করা নিষিদ্ধ হলে জালু-মালু এবং অন্যান্য মাঝিরা সাঁতালি পর্বতে মা মনসার কাছে যায়— 'চান্দো' সদাগরের অন্যায়ের সুবিচারের জন্য। চাঁদসদাগর হেতালের লাঠি নিয়ে লঘু জাতি চেঙ্গমুড়িকানী বলে অপমানিত করলেও মনসা আপোষেই বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে। তাঁর মতে উজানের দিকে নৌকা বাইতে গেলে শুধু জোর থাকলে হবে না কৌশলও জানতে হয়। লড়াই-এ কায়দাটাই আসল, গায়ের বলে লোককে বশে আনতে যারা চেষ্টা করে তারা ভুল করে। মাঝিমাল্লারা যে মাথা নুইয়ে আদেশ মানতে নারাজ মনসা সেটা চাঁদকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তার সঙ্গে তাঁরা যাতে মনসাপূজা করতে পারে দেবী স্বয়ং চম্পাই-এর সমাজপতির কাছে আবেদন করেন। অন্যদিকে চম্পক নগরের সমাজপতি চাঁদ সদাগরকে ন্যায়-অন্যায়ের উপদেশ দেন। দরিদ্র মাঝিদের ধর্মসংস্কারকে মর্যাদা দেওয়ার অত্যন্ত বিনীতভাবে চাঁদকে বলেন। মনে কুটিলভাব রেখে লাভের হিসেবে করলে, অহংকার নিয়ে মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই হবে না মনসা অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে চাঁদ সদাগরকে নৈতিকতার দিকটি দেখানোর চেষ্টা করেন। সময় যে একজায়গায় থেমে থাকে না, তাই চৌদ্দ পুরুষের ভাবনা চিন্তা মনে জমিয়ে না রেখে বর্তমানকে মেনে নেওয়াই ভালো। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় মাঝিরা মনসার নাম নিয়ে যদি মনে বল পায় তাহলে আপত্তি কিসের? মনসার সন্তানেরা ডিঙ্গা বাইলে দোষ হয় না, কিন্তু ডিঙ্গায় মনসার নাম নিলেই চাঁদের অসুবিধা। এই অনার্য্য আচরণ করতে নিষেধ করেন মনসা। এর প্রত্যুত্তর হিসেবে চাঁদের সংলাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

"আরে যা যা। এত নায্যি অনায্যি দেখলি আমার চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর পুন্ন অইবা না। আমার ডিঙ্গার মাঝি যে অইব— তারে আমার মতেই চলতে অইব। আমার রাইজ্যে তোরনামে কোন পূজা পাঠ, গান বাদ্যি করতে দিমু না। এইটাই আমার আদেশ।"[৩]

মনসাও নায্য পাওনা আদায়ের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই-এ নামতে বাধ্য হন। লড়াই শেষ না হওয়া অব্দি চুপ করে থাকবে না এবং চম্পক নগরের অধিপতি চাঁদ সদাগরের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেন মনসা। নেতার সঙ্গে যুক্তি করে মনসা চাঁদের ছয়পুত্রকে দংশন করেন। শঙ্ক ওঝাকে বিষ দেয় তবুও চাঁদ চেঙ্গমুড়িকানীর পূজা কাউকে করতে দেয় না। অন্যদিকে সতী লক্ষ্মী মা সনকার অনুরোধে মাঝিমাল্লারা চাঁদের চৌদ্দডিঙ্গা ভাসিয়ে দক্ষিণ পাটনে যায়। মধুকর, শঙ্খচূড়, সিংহমুখী ইত্যাদি সহ চৌদ্দটি ডিঙা বাণিজ্য থেকে ফেরার সময় কালিদহ থেকে হরণ করে পাতালে লুকিয়ে ফেলেন মনসা। চাঁদ সমস্ত কৌশল বুঝতে পেরে কোন দুঃখ না করে কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের বিয়ের আয়োজন করেন এবং সেখানে মনসার নামে কোন ফুল-জল দিতে নিষেধ করেন স্ত্রী সনকাকে। মনের দুঃখে মাঝিমাল্লারা মনসাদেবীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানায়। কালকূট দিয়ে সদাগরকে একেবারে শেষ করার কথা বললে মনসা মাঝিদের মনের উচাটন দেখে বলেন, লড়াই করতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, কৌশল করে চলতে হয়। সমাজপতিকে মেরে ফেললে সবাই এটাই বলবে মনসার পূজা করেনি তাই মারা পড়েছে। নাগগোষ্ঠীর অপমানবোধ ছাড়া সমাজে জিৎ হবে না এতে। যার সঙ্গে লড়াই সেই যদি না থাকে তাহলে পূজা আদায় করবে কার কাছ থেকে। মনসা এখানে কালনাগিনীকে পাঠিয়ে দেন লোহার বাসরে লখীন্দরকে দংশন করার জন্য। লখীন্দরের মৃতদেহ কলার মান্দাসে ভাসিয়ে নিয়ে স্ত্রী বেহুলা নাগলোকে মনসার কাছে উপস্থিত হয়। চম্পকনগরের সমাজপতি 'চান্দো সদাগর' ও সমাজের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বেহুলা মনের জোর ও নিষ্ঠা নিয়ে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। নাগবংশের সম্মান আদায় এবং চাঁদের পৌরুষত্বের দম্ভকে বিনাশ করার মনসার যে সংকল্প, তার সঙ্গে যোগ দেয় বেহুলা। বণিকের আর ছয়'টি পুত্রবধূর মতো নিয়তির কাছে হার মেনে

বিধবা হয়ে ঘরে বসে থাকেনি বেহুলা। শ্বশুরের বাক্য অমান্য করে নিজের ইচ্ছায় নাগমাতার কাছে আসে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মন বদলায়, সমাজকেও বদলাতে হয়। তাই বেহুলা নিয়তির নির্মমতাকে অগ্রাহ্য করে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারিত করতে চায়। সদ্য বিবাহিতা নারীর প্রতি যে অন্যায় এবং তার যে দুঃখ, এই প্রতিকার চাইতে এসেছে মনসার কাছে। একটি নারী এসেছে আরেকটি নারীর কাছে দুঃখ-কষ্ট মোচনের আশায়। নাটকে দেখা যায় বেহুলা মনসার দুঃখ-কষ্টেরও ভাগিদারী হতে চায়। কৌশলের সঙ্গে মনসার মনের কথা বলে যে, কায়দা করে চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা আদায় করতে হবে, দাম্ভিক পৌরুষত্বকে নষ্ট করতে হবে। তাকে হত্যা করে নয়। লখীন্দরকে জীবিত করে দিলে স্বামী-স্ত্রী মিলে পূজা প্রচার করবে। এইভাবে মানুষের মন জয় করলে চম্পকনগরে তো বটেই, অন্য সব জায়গাতেও মনসার মাহাত্ম্য প্রচারিত হবে। কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের সঙ্গে চাঁদের ছয়পুত্র, চৌদ্দটি ডিঙা, ধন-সম্পত্তি সবই ফিরিয়ে দেন মনসা। যার ফলে বাম হাতে হলেও চাঁদের পূজা আদায় করে মনসা।

মনসা পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও নাটকটি একটি মৌলিক শিল্প কর্মের দাবি রাখে। বাংলার সাধারণ মানুষজন যাদের লৌকিক স্মৃতি থেকে মনসাপুরাণের গভীর ব্যঞ্জনা এখনো মুছে যায়নি। মনসামঙ্গলের নতুন ব্যাখ্যা তাদের আত্মকথাকে ছুঁয়ে যায়। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্য যে শুধু সর্পদেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাব্য নয়, নিম্নবর্গের মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই-এ জয়ী হবার এক ঐতিহাসিক দলিল তা এই নাটকে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। চাঁদ সদাগরের বাম হাতে পূজা দেওয়া আসলে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অন্য এক কায়দা, এই কৌশল বর্তমান যুগেও যে রয়েছে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পরিমণ্ডলে শেষ হয়ে যায়নি। এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই নাট্যকার রচনা করেছেন 'মনসাকথা"। এই প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য 'মনসাকথা' বইটির মুখবন্ধ অংশে যা বলেছেন এখানে সেটি উল্লেখ করা প্রয়োজন—

"এই প্রেক্ষাপটে মনসাকে নাগ জনগোষ্ঠীর দেবী হিসেবে বিচার করাই অধিকতর সঙ্গত। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব স্বীকৃতি আদায়ের লড়াই। শেখর এভাবেই মনসামঙ্গল কাব্যকে দেখেছেন। নাটকটির বাইরের মোড়ক প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারী হলেও তৎকালীন সময়ের পটভূমিতে গড়ে তুলেছেন এক নতুন মনসামঙ্গল তথা মনসা কথা। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মনসাভীতি অথবা পৌরাণিক ভক্তিবাদ নয়, নাট্যকার লৌকিক ঐতিহ্যকে সমকালের সমস্যাদীর্ণ মানবচেতনার টানাপোড়েনে যাচাই করে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যুক্তিবাদ ও মানবতার আদর্শকে।"[৪]

নাটকটির প্রথমেই দরিদ্র মাঝিমাল্লারা আগে জলে-জঙ্গলে সাধারণভাবে বসবাস করত। সেখানে ধীরে ধীরে বণিক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। চম্পকনগরে ধীরে ধীরে দালান বাড়ি উঠতে থাকে। এক একটি বণিকের নামে ঘাট নির্মাণ হয়। যে দরিদ্র এই মাঝিমাল্লাদের পরিশ্রমে এতকিছু সম্ভব হয়। অথচ তারাই যেন ধীরে ধীরে দাসে পরিণত হয়, সর্বহারায় পরিণত হয়। একমাত্র সহায় তার বাপ-ঠাকুরদার আমলের দেবী মনসা । এই মনসার পূজাতেই চাঁদ বণিকের আপত্তি। মাঝিমাল্লাদের মাতা হিসেবে নাটকের প্রথম থেকে মনসার সঙ্গে চাঁদের সংঘাত। প্রথম থেকে দেখা যায় ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব, নায্য অনার্য্যের দ্বন্দ্ব যেটি শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রচলিত মনসাপুরাণের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে নাটকটি। চাঁদ সদাগরের অটল গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব, একক সংগ্রাম, মনসা নামের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রচলিত ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে ফেলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন। সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন, স্বার্থবাদী, কোপনস্বভাবা মনসা সম্পর্কিত ধারণাটি এখানে মুছে গিয়ে নতুন পাঠকৃতি উঠে আসে। মনসাকে এখানে সমাজের হিতকারিণী, কল্যাণময়ী, বিপদতারিণী নারী রূপে দেখা দিয়েছেন। মনসামঙ্গলের মনসাকে দেখি যেনতেন প্রকারে পূজা আদায়ের চেষ্টা করেন। নাটকে চাঁদের সাতটি পুত্রের প্রাণনাশ, চৌদ্দটি ডিঙা সমুদ্রে নিমজ্জিত করলেও শেষ পর্যন্ত মনসা আপোষের কথা বলেন। নাট্যকার প্রচলিত পাঠকে বিশ্লেষণ করে মনসা চরিত্রের মধ্যেও এনেছেন নতুন ঐতিহ্য। এই সূত্রে বিশিষ্ট সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের উক্তিটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে-

"নাগ গোষ্ঠীর দেবী মনসা এখানে কল্যাণময়ী তাঁর উগ্র তেজ বা কপটতা নেই, নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদলে যায় নিষ্ঠুরতাও। এইভাবেই প্রচলিত পাঠের বিশ্লেষণের মাধ্যমে একসময় তিনি সহজেই হয়ে ওঠেন মাঝি-মাল্লাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের উৎস।"[৫]

দেবী মনসা এখানে মাঝিদের জীবনে আশার আলো। তাদের সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ ঐতিহ্যের দিশারী। এই দেবীর মর্যাদা রক্ষার জন্য চাঁদের বিরুদ্ধাচারণ করতে পিছুপা হয় না। প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যের যে মনসাভীতি এখানে তা সরে গিয়ে সাধারণ মানুষের রক্ষা ও আশ্রয় দেওয়া তাঁর শ্রেয় হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের পরিত্রাতা হিসাবে দেবী মনসার আবির্ভাবের ঘটনাটি নাট্যকারের অভিনব

সংযোজন। বেহুলা কর্তৃক চাঁদের মনসা পূজা করানোর প্রতিজ্ঞা মনসার কৌশল বলে চাঁদ মনসাপূজা দিলেও বাম হাতে দেয়। বাম হাতের পূজা যে অমান্যের পূজা তবুও মনসা এই পূজা অস্বীকার করেননি। কারণ তিনি আশা রাখেন বাম হাতে হলেও চাঁদ পূজা দিয়েছে। এমন একদিন আসবে মনসা তথা নাগেদের মাহাত্ম্য মানুষের মুখে মুখে গান হয়ে ফিরবে। বাম হাতের যে পূজা আরম্ভ হয়েছে সেটি চলতে থাকবে। মনসার মতে লড়াই আরম্ভ করে একজন শেষ করে অনেকজন। শোষক শ্রেণীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তা চলতে থাকবে। এখানে মনসাকে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের নেত্রী রূপে দেখা যায়। তার উপদেশে মাঝিরা শরীরে বল পায়। নাটকের শেষে মাঝিদের উক্তিটি গায়েনের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে—

"মা গো! আরম্ভ করেছ তুমি, কিন্তু শেষ করব আমরা। যতদিন বাম হাতের মাইন্যতা ডাইন হাতে আনতে না পারছি ততদিন আমরাও ক্ষান্তি দিমু না! কোনদিন না! জয় মা বিষহরি! জয় মা অমৃতনয়নী! জয় মা মনসা ! জয় মনসার জয়!"[৬]

মনসাদেবী নিজেকে শিবকন্যা বলে জানেন, সেখানে পূজা পাওয়ার চেষ্টাকে কোন অন্যায় মনে করেন নি। নিজের অধিকার আদায়ের লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই দেখা যায়। 'মনসা কথা' নাটকটিতে মনসা কাহিনীর অনেকগুলি ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। একটি হল নারীবাদী ব্যাখ্যা। চাঁদ বণিক স্পষ্ট জানিয়ে দেয় দেবাদিদেব মহাদেবের পূজক হয়ে নারী দেবতা চেঙ্গমুড়ি কানীর পূজা কিছুতেই করবে না। এখানে নারী হিসাবে মনসার লড়াই-এ সঙ্গী হয় চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ বেহুলা। লখীন্দরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে বেহুলা মৃতদেহ নিয়ে বিষবদি নাগেদের দেশে যেতে চাইলে নারীজাতির তেজ দেখে যেতে দিতে নারাজ চাঁদ সদাগর। নারীজাতির এভাবে গৃহের বাইরে যাওয়া নিষেধ, বংশের ইজ্জত বলে কথা। কিন্তু চাঁদ যত বাঁধা দেয় বেহুলা ততই জেদ ধরে। সমাজ বিধানের নামে ভাসুরের বিধবা বউদের মতো ঘরে থাকতে নারাজ। সে কিছুতেই তা মানবে না। নেতা ধোপানীর সাহায্যে মনসার কাছে উপস্থিত হয়। পুরুষ চম্পক অধিপতি মনসা নারী বলে তাকে অমান্য করে, এই অন্যায়ের বিরোধিতা বেহুলাও নিঃসঙ্কোচে করে। মনসার কাছে তাই সে অনায়াসেই বলে—

"চান্দ বণিক্য আমার শ্বশুর বটে, কিন্তু আমি তো শ্বশুরের বাক্যি মান্যি করি নাই। আমি এয়েছি নিজের ইশ্চায়। আমার অদ্দিষ্ঠ নিজেই ঠিক করমু। আমি উজানী নগরের কইন্যা চম্পকের সমাজপতির পুতের বউ এয়েছি নাগমাতার কাছে। এক নারীর কাছে আরেক নারী এয়েছে তার দুক্ষের পিতিকার চাইতে!"[৭]

চম্পক নগরের ঘাটে চাঁদের ছয়পুত্র, লখীন্দর, চৌদ্দটি ডিঙা, ধন-সম্পত্তি ফিরে পেলে, সব কিছুর মূলে যে বেহুলা সেটি বুঝতে পারেন। শেষে চাঁদ কিছুটা কৌশল অবলম্বন করলেও বেহুলার অনুরোধে পূজা দিতে বাধ্য হয়। বেহুলা চরিত্রকে এখানে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক।

মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা দেখি দেবতা ও মানুষের সংগ্রামে মনসার জয়লাভ হলেও চাঁদসদাগরের পরাজয় হলেও যে মানুষের জয় লাভ হয়েছে— শেখর দেবরায় এই সত্যটি পরিবর্তিত করে চাঁদের যে পৌরুষত্ব, আদর্শ এবং একক সংগ্রামের ঐতিহ্যগুলি এখানে মুছে ফেলেন। চাঁদ সদাগরকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভূ রূপে দাঁড় করান। তাঁর বাম হাতের পূজা দেওয়া সামন্ততান্ত্রিক কৌশল রূপে তুলে ধরেন নাট্যকার। অন্যদিকে মনসার পূজা তথা সেবক সাধারণ মানুষের সংগ্রাম এই নাটকে গৌরবান্বিত হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষের অধিকার আদায় ও সংগ্রামে জয়ী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করে এখানে তিনি প্রচলিত পাঠকেই সরিয়ে দেন। এ এক নতুন মঙ্গলকাব্য হয়ে ওঠে। আসলে নাটকটিতে দুই যুগের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে— মনসামঙ্গল কাব্য লিখিত হওয়ার সময়কাল এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তৎকালীন সমাজকালের প্রেক্ষাপটে কাব্য রচনা করেছিলেন। অন্যদিকে শেখর দেবরায় বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে, বর্তমান মানসিকতায় নাটক লিখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই নাটকটি প্রচলিত পাঠ থেকে সরে এসে এক নতুন পাঠ হিসেবে বিরাজমান হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নাট্যপ্রেমী এবং নাট্যকারের বন্ধুবর অমিতাভ দেবচৌধুরীর 'মনসা কথা : প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা' অংশের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা প্রয়োজন—

"সবচেয়ে ভালো লাগে যখন নাট্যকার তাঁর স্বঘোষিত কথকের অবস্থান থেকে, মধ্যযুগীয় সময়-বলয় থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক যুগের দর্শকদের সম্বোধন করে আধুনিক যুগের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যুগের দ্বন্দ্ব ও মিলনকে চোখের ওপর আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেন।"[৮]

তিনি আরো বলেন যে, মনসাকে নাট্যকার বর্ণনা করেন মাঝিমাল্লাদের, অত্যাচারিত মানুষের মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাদের মনসাকন্যা রূপে। তাদের শোষিত, বঞ্চিত, জর্জরিত জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, দৈনন্দিন মালিন্যের উর্দ্ধে একমাত্র প্রেরণা রূপে। আসলে দেবতা মানুষেরই রূপক। মানুষ যা হয়ে উঠতে পারত, যা হয়ে উঠতে চাইত কিন্তু পারেনি। তাকেই সে দেবতা রূপে কল্পনা করেছে।

নাট্যকার পরিবেশক গায়েনের সংলাপের মধ্যে যে যুক্তি-বুদ্ধি, তর্ক, দ্বন্দ্ব নিয়ে এসেছেন সেটিও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রাখে। আঙ্গিকের দিক দিয়েও এটি নতুনতর হয়ে উঠেছে। চাঁদ মনসা পূজায় বাধা দিলেও সাধারণ মাঝিমাল্লারা যেখানে চাঁদের ডিঙা বেয়ে রোজগার করে, জীবনধারণ করে সেখানে তাঁর আদেশ অমান্য করা উচিত নয়। আবার চাঁদ সদাগরের উচিত মাঝিমাল্লাদের নিজের মতো করে বাঁচতে দেওয়া। কারণ নিজের সমাজ, আচার, আচরণ, ধর্ম, সংস্কারকে বাদ দিয়ে কোন মানুষই সুস্থভাবে বাঁচতে পারে না। ভব নদীতে ডিঙ্গা বাইতে বাইতে মন যখন অশান্ত হয়ে আসে, ঝিমুনি আসে তখন সমাজ ধর্মের বিশাল বৃক্ষ মানুষের মনে শান্তির জল ছড়ায়। জন্মের পর থেকে যে বৃক্ষের সঙ্গে আমাদের চেনাজানা, কেউ যদি শেকড় উপড়ে ফেলতে চায় তা হলে তা মেনে নেওয়া যায় না। মেনে নেওয়া উচিত নয়। একজনের ধর্ম অন্যের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার যে মৌলবাদ, তা নাটকে ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে জীবন সম্পর্কিত নৈতিক প্রশ্নগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। যা মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা দেখতে পাই না।

মনসামঙ্গল কাব্য বাংলার সব অঞ্চলেই প্রচলিত। মূলত নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যেই কাব্যটির জনপ্রিয়তা ব্যাপক। সাধারণ মানুষদের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যেই এক ঔপভাষিক রীতি ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। তিনি বরাক উপত্যকার বহমান এক লোকভাষাকে, পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে, অন্য এক ভাষারূপ দিয়েছেন। বিশেষ কোন একটি ঔপভাষিক রীতি অবলম্বন করলে, অন্য ঔপভাষিক অঞ্চলে সেটি আয়ত্ত করতে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই নাট্যকার নিজস্ব একটি সংলাপভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, যা উপভাষাকে ইঙ্গিত করলেও আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এইভাবে সংলাপের মধ্যেও অভিনব মনস্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষার জন্য দু-একটি কাব্যাংশ নাট্যকার কর্তৃক রচিত হলেও বাকি যে পয়ার ত্রিপদীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা মনসামঙ্গল কাব্যের স্মরণীয় কবি-ব্যক্তিত্ব বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেবের কাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং ধর্মচেতনার প্রেক্ষিতটি নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নাট্যকার মূল পাঠকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। বরাক উপত্যকার লোকজীবনকে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে, লোকনাট্যের আদলে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নাটক রচনা করেন। মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নিয়ে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে তৈরি করেছেন এক নতুন নাট্যরূপ। পরিবেশন রীতির বৈচিত্র্যে, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়, গীতাবদ্যের ব্যবহার পটভূমি সৃষ্টির অভিনবত্বে তৈরি শেখর দেবরায়ের এই 'মনসা কথা' তাই আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠে বাংলা নাট্যশিল্পের আধুনিক পুনর্নির্মাণ।

তথ্যসূত্র:

১. শেখর দেবরায় : মনসাকথা, শিলচর কালচারাল ইউনিট, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, শিলচর-৭৮৮০০৭, কাছাড়, ২০০২, পৃ. ৪
২. তদেব, পৃ. ১২
৩. তদেব, পৃ. ২২-২৩
৪. তদেব, পৃ. মুখবন্ধ অংশ
৫. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য : 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাক্‌প্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, জুলাই, ২০১২, পৃ. 222
৬. শেখর দেবরায় : মনসাকথা, শিলচর কালচারাল ইউনিট, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, শিলচর- ৭৮৮০০৭, কাছাড়, ২০০২, পৃ. ৪৬
৭. তদেব, পৃ. ৩৫
৮. তদেব, পৃ. (মনসাকথা : প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা)

গ্রন্থপঞ্জি

১. দাশগুপ্ত, শ্রী জয়ন্তকুমার (সম্পা.): কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, পুণর্মুদ্রণ : ২০০৯।

২. দাশগুপ্ত, শ্রী তমোনাশচন্দ্র (সম্পা.): সুকবি নারায়ণদেবের ‘পদ্মাপুরাণ’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ: ১৯৪২, পুণর্মুদ্রণ-২০০৯।
৩. দাস, ড. আশুতোষ; ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র (সম্পা.): কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬০।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ ও দে, ড. সন্ধ্যা (সম্পাদনা): নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, ১৮/ এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১।
৫. মিত্র, শম্ভু :চাঁদ বণিকের পালা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮৪।
৬. ইসলাম, রেজওয়ানুল (সংকলন ও সম্পাদনা) : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য, পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন, বুকস স্পেস, ২২এ, কলেজ রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১২।
৭. খালেৎ, মুহম্মদ আবদুল : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ,প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫।
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ : 'বাংলা সাহিত্য : একাল ও সেকাল' (ঊনবিংশ/বিশ শতকের রচনার মধ্যযুগের কাব্যের প্রভাব) পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, ১৫ এপ্রিল 2012।
৯. চক্রবর্তী, গোপিকারঞ্জন : বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯।
১০. চৌধুরী কামিল্যা, মিহির : আঞ্চলিক দেবতা: লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ডাকসূচক সংখ্যা-৭১৩১০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০০।
১১. নস্কর, সনৎকুমার : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, দিয়া পাবলিকেশন, ১৪৪/১ এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৫/০৮/২০১২।
১২. নস্কর, সনৎকুমার : সাহিত্য-বীক্ষণ : উৎস থেকে মোহনায়, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৯ ।
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পা.): বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, বঙ্কিমচ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ: ১৯৮৬, তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০২।
১৪. মিশ্র, ড. অশোককুমার : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস (আধুনিক পর্ব: ১৮০০-২০১২), সাহিত্য সঙ্গী, ৬ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০০৮।
১৫. মুখোপাধ্যায়, সুখময় : ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথ্য ও কালক্রম', ভারতী বুক স্টল, ৯৩ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭।
১৬. রায়, নীহাররঞ্জন : ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৬।

....

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পঃ অবহেলিত মানুষের প্রতিবেদন

প্রসেনজিৎ সরকার
গবেষক , রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

বিংশ শতাব্দীর বাংলা ছোটগল্প ধারার অন্যতম প্রধান ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র(১৯০৪-১৯৮৮)।তিনি ছিলেন কল্লোল গোষ্ঠীর প্রধান লেখক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের বেদনা, হতাশা,দৈনতা, ক্রন্দনের ছবি তাঁর ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে।যে নতুনের স্বপ্নে মশগুল হয়ে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা কলম চালিয়ে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। জীবনে দেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের কথাই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে।জীবন জটিলতা ও মর্মাহত বাস্তবের কথা তাঁর সাহিত্যে ছড়িয়ে রয়েছে। জীবনে তিনি দুই বিশ্বযুদ্ধেরই সাক্ষী বলা চলে। আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষের, দেশভাগের, উদ্বাস্তু সমস্যা তিনি জীবনে দেখেছিলেন। মানুষকে চোখ দিয়ে দেখেছেন এবং অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন সাহিত্যে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপন্নতার কারণে মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসা সমস্যার কথাকে ছোটগল্পে চিহ্নিত করেছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে স্বপ্নের বাসা বাঁধা ও ভাঙচুর দেখিয়েছেন তিনি। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ,আশা আশঙ্কা, বেদনা – দৈন্যতা , মর্মাহত, হতাশা, বিশ্বাস হীনতা, কখনও জীবন বলিষ্ঠতার ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর ছোটগল্প গুলিতে। কল্লোল কেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলনকে বলা হয় বিদ্রোহের মুখ।এই যুগের ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বোহেমিয়ান রোমান্টিসিজম,নবীনতার সাধনা, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং সমাজের অবহেলিত মানুষের প্রতি আগ্রহ। তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ছোটগল্পকার। অস্থির উত্তাল সময়, বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বস্ততা, ভগ্ন রোমান্টিকতা, নৈরাশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সকল ক্রিয়াকর্ম মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়।আর সমাজে থাকে বিভিন্ন মানুষের বসবাস।জাতি, বর্ণ, ধর্ম, অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে মানুষের নানা স্তর থাকে। সমাজের কেউ উচ্চতর আসন লাভ করে,কেউ লাভ করে মাটির সান্নিধ্য। সাহিত্যিকা সমাজের মানুষের কথা বলতে গিয়ে তুলে ধরেন বিভিন্ন মানুষের কথা। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ও মন কল্পনার ফসল তাঁদের রচিত সাহিত্য। তাঁর সাহিত্যর বিষয় হয়ে উঠে রাজা, জমিদার, কৃষক, শ্রমিক,কুলি,গনিকার ইত্যাদি মানুষের কথা উঠে এসেছে। অবহেলিত মানুষের কথা ও উঠে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে ধরা পড়ে। অবহেলিত তারা সমাজ থেকে, অধিকার থেকে, মানুষের চোখে তারা হীন চিরকাল।সমাজই তাঁদের অবহেলিত করে রাখে। মানুষ হয়ে জন্মানোর পর মানুষের মতো করে তারা বাঁচতে পারে না। তাঁদের অবস্থান হয় সমাজের অতল গভীর অন্ধকারে।আর প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের কথাই মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের পাশাপাশি তুলে ধরেছেন তার ছোটগল্পে। সমাজের মানুষের জীবন ও জীবিকার কথা বারেবারে ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে। মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রুপকার তিনি। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের সার্বিক বিচারে উঠে এসেছে যে জীবন তা শুধুই মধ্যবিত্তের নয়। সেখানে দারিদ্র্য আছে, হতাশা আছে,নিম্নবিত্তের বেদনা আছে, মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব সংশয় আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন-

“ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে, কল্লোল গোষ্ঠীর বিশেষ প্রবণতা অনুযায়ী – মধ্যবিত্ত চরিত্রের পাশাপাশি নিম্ন-মধ্যবিত্ত,নিম্নবিত্ত এবং অন্ত্যজ চরিত্র ও স্থান পেয়েছে।”[১]

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত অবহেলিত মানুষের ছবি সাধারণত খুঁজে পাওয়া যায় ‘বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে’,’মোটবারো’,’সংসার সীমান্তে’ ইত্যাদি ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে।

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদেঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে গল্পটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট এক জীবন সংগ্রামের ইতিহাস।এই ক্ষুধা মূলত যৌন ক্ষুধা।আর এই যৌনতাকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে বেগুন। বেগুনের জীবনের চরম দুর্ভাগ্য, দুর্দশার কথা ব্যক্ত হয়েছে গল্পটিতে। গল্পের শুরুতে দেখা যায় সন্ধ্যা বেলায় দরজা বন্ধ করে শাড়ি সেলাই করছে বেগুন। বিগত যৌবনা

নারী বেগুন। শুধুমাত্র যৌবন গেছে এমন নয় তার সঙ্গে তাঁর প্রতিপত্তি ও গেছে।তাই তাকে দরজা আড়াল করে শাড়ি সেলাই করতে হচ্ছে। লেখকের ভাষায়-

" প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক, সিল্কের একটা শাড়ি সেলাই করছিল।"[২]

বেগুনের শারীরিক ও আর্থিক বিবরণ স্পট হয়ে উঠেছে।বাড়িউলী প্রবেশ করলে ছেঁড়া শাড়িটা লুকাতে চেষ্টা করে। ফলে বোঝা লোককে তার গোপনীয়তা জানাতে চাই না। বেগুনের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছু নেই। একজন পুরুষ কিছু দিন আগেও আসতো,আজ অনেক দিন আর তার দেখা নেই। বেগুন অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে, অপেক্ষা করা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।বাড়িউলীর কাছে তাঁর দুই মাসের ভাড়া, খাওয়া দাওয়া খরচ বাকি পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেও পরিশোধ করতে সফল হয়নি।কারণ তাঁর কাছে আজ আর মানুষ আসে না। তাঁর বতর্মান পরিস্থিতির পরিচয় মেলে বাড়িউলীর একটি বক্তব্য থেকে-

" দু মাসে একটি মিনসে ওর চৌকাঠ মাড়াল না ওর আবার রোখ।"[৩]

এখন পুরুষের আগমন ঘটে যৌবনাবতী শশীর কাছে।তাই শশী বাড়িউলীর খুব প্রিয়। শশীর যৌবনের কমনীয়তা কিছু কম থাকলে ও বাধুনী ছিল, উগ্রতা ছিল। অনেক অপমান সহ্য করে বেগুন বলে আজই সমস্ত বাকি টাকা দিয়ে দেবে।আজ একজিবিশন দিনে সেখানে যাওয়ার জন্য পরিধেয় কোন বস্ত্র নেই। বহুদিনের পুরনো সিল্কের শাড়ি যা সে এতক্ষণ ধরে সেলাই করছিল।রাতে খাবারের মতো সামান্য টাকা টুকু ও তার হাতে নেই।একজিবিশনের টিকিট কাটবার মতো টাকাটা আছে শুধু।একজিবিশনে গিয়ে তাঁর লক্ষ্য পূরণ করতে হবে, তাহলে তার কিছু দিনের দৈন্যতা দূরীভূত হবে। বেগুনের একটি শেমিজ ছিল।ধোপাকে দীর্ঘদিন ধরে পয়সা দিতে না পারলে সে আর ফেরৎ দেয় নি।পাউডারের কৌটা খালিই পরে আছে।পুরুষ মানুষের মন টলাতে তাদের কাজে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হয়।তাই বিশেষ করে ভালো পোশাক, শেমিজ পরবার প্রয়োজন হয়।তারই সাথে সাথে প্রয়োজন বিভিন্ন সাজাবার উপকরণ যা বেগুনের কিছুই নেই।

পুরুষেরা তাকে ভালোবাসে নানা উপহার দিত মাঝে মাঝে। কিন্তু আজ তাঁর এতই দুর্দিন যে সেই সমস্ত উপহার বিক্রি করে নিজের পেট চালাতে হয়েছে।আজ তাঁর সমস্ত গহনা নকল গিল্টি করা। একমাত্র সে ছাড়া একথা আর কেউই জানে না।তাই বাড়িউলী মাসি সোনার তাগা বিক্রি করবে কিনা জানতে চাইলে সে উওর দিতে পারেনি। লেখকের ভাষায়-

" কেন সে তাগা বিক্রি করতে চায় না,তাই যদি মাসি জানত। তাঁর শেষ সোনার অলঙ্কার সে বহুদিন আগে অভাবের তাড়নায় বিক্রি হয়ে গেছে – একথা জানিয়ে, তাঁর তাগা জোড়া এবং গহনাই যে গিলটি- এই সংবাদ দিয়ে,সে তার বাড়ির সবার কাছে ছোট হতে চায় না।"[৪]

এক শৌখিন সাহেব তাঁর সঙ্গে প্রনয় করে তাকে এক জোড়া জুতা দিয়েছিল। বয়সের ভারে শরীরের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে বুকের ব্যাথা বেড়েছে। তবুও জীবনের জন্য তাকে করতেই হয়।একজিশনের চারিদিকে আলোয় আলোকিত।কম আলোতে একটি বেঞ্চে বসে বেগুন তাঁর পাশে বসা একটি পুরুষ। পুরুষটিকে নানা অছিলায় আকর্ষিত করতে থাকে বেগুন। অবশেষে যখন লক্ষ্য পূরণ হয়েছে তখন ঘটেছে এক অভিপ্রেত ঘটনা।

" ঘৃনায় বিতৃষ্ণায় আতঙ্কে লোমশ হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেগুন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার উপরের ঠোঁট একেবারে নেই -মাড়ি থেকে লম্বা অপরিস্কার দাঁতের পাতি, ভয়ঙ্কর ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত মুখটাকে বীভৎস করে তুলেছে,আর তাঁর বাঁ দিকের সমস্ত গাল কবে যেন আগুনে ঝলসে পুড়ে বিবর্ণ মাংসপিন্ড হয়ে গেছে।" [৫]

বেগুন সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। লোকটার কাছে নিজেকে ধরা দিতে পারেনি। এরপর বেগুন জুয়ার আস্তানায় গেছে শিকার ধরতে কিন্তু বিফল হয়েছে।এক বয়স্ক ভদ্রলোককে অনেক কৌশল করে বাগে আনতে গিয়ে হাত ধরলে তুমুল কান্ড সৃষ্টি হয়েছে। বেগুনকে নিতে হয়েছিল মিথ্যার আশ্রয়। তবুও কোন ফল নেই। বেগুন আরও নানা চেষ্টা করেও একটি পুরুষ মানুষকে বংশ করতে পারিনি। পরিশেষে দায়বদ্ধ ভাবে ফিরে গেছে প্রথম শিকারের কাছে। তাঁর মনে হতে লাগলো প্রথম শিকারকে অবহেলিত করা উচিত হয়নি তাঁর। খাবার খাওয়ার টাকা তাঁর হাতে অথচ খিদে পেয়েছে। অন্যকে স্বামী বলতে ও কুণ্ঠিত বোধ করেনি তবুও কোন লাভ হয়নি।তাই ফিরে এসেছে কুৎসিৎ, বিকৃত মানুষটির কাছে। তাই মনে মনে বেগুন বলেছে-

" যাকে দেখে সে কিছু পূর্বে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল তার সেই বীভৎস মূর্তিই খানিক পরে তা এত আনন্দের কারণ হবে একথা সে কল্পনাও করতে পারেনি।"[৬]

দায়বদ্ধ হয়ে বেগুন কিছুক্ষণ পূর্বে কাছে ত্যাগ করা কুৎসিৎ মানুষটিই আনন্দের কারণ হয়েছে। লোকটিকে ঘুম থেকে তুলে হাত ধরে পথে নেমেছে বেগুন। বলেছে ' চল যাবে না?' ক্ষুধায় ক্লান্তিতে বেগুনের পা চলতে চায় না।একটি রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বেগুন কিছু খেতে চাইলে লোকটি তিনটি পকেট উল্টে দেখিয়েছেন দেশলাই বিড়ি ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু বেগুন

" মিনি পয়সায় ইয়ার্কি দিতে এসেছে,হারামজাদা চোর।"[৭]

কিন্তু মুখে কটুক্তি উচ্চারণ করলেও হাত ছেড়ে চলে যেতে পারেনি বেগুন।যখন কোন মানুষ বেগুনকে চাননি, তখন ও এই মানুষটি তাকে চেয়েছে। সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি ঘৃনা ধরে গেছে বেগুনের।এই বিকৃত, কুৎসিৎ, অর্থ শূন্য মানুষটির হাত ধরে এক সমবেদনায় মন ভরে গেছে বেগুনের।তাই বেগুন বলতে পেরেছে 'চল'। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের কর্ম বৃত্তি আর একটি সমস্যায় জর্জরিত মানুষের প্রতি সমবেদনা গল্পটিকে মানবিক করে তুলেছে। গল্পে সে একজন নারী ও একজন পুরুষের পরিচয় পেলাম তাকে অবহেলিত ছাড়া আর কি বা বলা যায়।

সংসার সীমান্তেঃসংসার সীমান্তে গল্পটিতে গনিকা রজনী ও চোর অঘোর দাসের জীবনের ভালোবাসার এক বেদনাদায়ক কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে।এ ধরনের মানুষের হৃদয়ের অনুসন্ধান করা খুবই কঠিন কারণ তাঁর জন্য যে হৃদয়ানুভূতি প্রয়োজন তা সকলের থাকে না। মানুষ নিজের বাইরে অপরকে নিয়ে ভাবতে পারে না।তারও বিশেষ কারণ রয়েছে। কথকের অনুভবে

" হৃদয়ের উদ্বৃত্ত আমাদের আর কতটুকু! নিজেকে ছাড়াইয়া আশপাশের কয়েক জনকে বিলাইতেই তাহা তো ফুরাইয়া যায়।"[৮]

বিশ্রী বাদলের গভীর রাত পর্যন্ত লণ্ঠনের আলো জালিয়ে বসে থাকতে হয় গনিকা রজনীকে। শুধুমাত্র উপার্জনের জন্য। বিগত যৌবনা নারী সে।দেহ বিক্রি করে উপার্জন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। যৌবন বিগত হবার ফলে মানুষ তাকে আর বিশেষ চায় না। কিন্তু তাই বলে তো আর পেট কথা শুনবে না।তাই চেষ্টার ত্রুটি করে রজনী। মনে মনে ভাবে মদের নেশায় যদি কেউ ভুল করে চলে আসছে পারে,সে তখন আর ভালো- মন্দ বিচার করবে না।তাই গভীর রাত পর্যন্ত বসে থাকে নিজেকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করে করে সঙ সেজে বসে থাকে। লেখকের ভাষায়-

" ধূম ও কালিই এখন তাহার সর্বস্ব। নারীত্ব ও যৌবনের সে একটা কুৎসিত বিকৃতি মাত্র।"[৯]

বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা ঘুমিয়ে পড়লে তাই রজনী ঘুমাতে পারে না। ভেজা কাপড়ে বসে থাকে খরিদ্দারের আশাতে। অনেক কষ্ট করে ও নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারছিল না রজনী।নারীর সবচেয়ে প্রিয় হল তাঁর আত্মসম্মান।তা আর রজনীর নেই।তাই মানুষের কাছ থেকে ভয় পাবার মতো কিছুই নেই। লেখকের ভাষায়-

'জীবনের চরম ক্ষতি তাহার তো হইয়া গিয়াছে।'[১০]

রাতের শেষের দিকে তাঁর ঘরে আশ্রয়ের জন্য অঘোর দাস এসেছে। অঘোর দাস এসেছে দায়বদ্ধ হয়ে,উপাযাচক হয়ে নয়। বিপদের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে রজনীর ঘরে।একে অপরের অপছন্দের হলে ও একত্রে রাত কাটিয়েছে। রজনীর ঘরের কোনো শ্রী নেই, টিনের পার্টিশন দেওয়া সামান্য একটু জায়গা। নোংরা বিছানা ও ভাঙা তোরঙ্কই তাঁর সম্বল। অঘোর দাস ভেজা কাপড় বদলের কথা বললে জানা যায় আর কোন পরবার মতো কাপড় তাঁর নেই। সকালে দেখা যায় অঘোর দাস রাতে দেওয়া টাকা ও চাবি দিয়ে ঘর খুলে চলেগেছে। প্রথম মিলনের সমাপ্তি এই ভাবেই ঘটেছে। দ্বিতীয় মিলনে দেখা যায় রজনী অঘোর দাসকে গতরাতের চুরির জন্য চোর সাব্যস্ত করেছে। ফলে তাকে প্রচন্ড ভাবে মারা হয়েছে। রজনী ও তাঁর রাগ উসুল করতে ছাড়েনি। পুলিশের ভয়ে রজনী অবশেষে নিজের ঘরেই জায়গা দিতে বাধ্য হয়েছে অঘোরকে।অঘোরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও সে এখান থেকে নড়তে চাই না। অঘোর বলেছে-

" থানায় যাব নারে,যাব না।ভয় নেই! পেটটায় বড় বেদনা,বেটারা বড় জোর লাথি মেরেছে, একটু সেঁক দিতে পারিস?"[১১]

রজনী ঔষধ ও আহারের আয়োজন যেমন করেছে তেমনি ঝগড়া করতে ও ছাড়ে নি। গালিগালাজ করছে,ঝাঁটার বারি দেবে বলে শাসিয়েছে বারবার করে।বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলেছে। কিন্তু একদিন অঘোর অনেক গুলি টাকা আনলে রজনীর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একসঙ্গে থাকবার ফলে তাদের মধ্যে এসেছে সরলতা, স্বাভাবিকতা। নতুন করে জন্মেছে ভালোবাসা।তাই ভালোবেসে রজনী যখন বলেছে চুরি করা ছেড়ে দিতে তখন অঘোর বলেছে-

" কাজকর্ম পাওয়া কি এতই সহজ রে! আর তা ছাড়া দলের লোকেরা ছাড়বে কেন? যদি বা একটা ভাল কাজ পাই, পুলিশ আর দলের লোকেরা পেছু লেগে অস্থির করে দেবে না?"[১২]

চুরি করবার ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে একাজ তাকে করে চলতে হয়।তাই দলের লোক ও পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে সে রজনীকে নিয়ে আগ্রা দিল্লিতে চলে যাবে। রজনীর সমস্ত দেনা অঘোর শোধ করে দিয়েছে। সংসার করবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমস্তই কিনে এনেছে অঘোর। তাদের দুজনের মনেই এক নতুন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন ফুটে উঠেছে। লেখকের ভাষায়-

" গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যাহাদের ক্লেদপঙ্কিল,তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নরনারীদের জীবন লীলার অনুকরণ করিতে তাহাদের ও সাধ যায়।"[১৩]

নতুন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন তাঁরাও দেখে।একে অপরকে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলোর বদলের কথা বলেছে। নতুন এক জীবন হবে তাদের। কিন্তু ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে অঘোর শেষ বারের মত চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আদালতের বিচারে তাঁর হয়েছে পাঁচ বছরে জেল। স্বপ্ন ভেঙে গেছে,ঘর বাঁধা তাঁর আর হল না। অঘোর জেলে বন্দি আর বিকৃত যৌবনা রজনী আজও গভীর রাত পর্যন্ত বসে থাকে কেরোসিনের ডিবিয়া জ্বালিয়ে।

গল্পে যে দুই নর-নারীর জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরা খুবই নিম্নশ্রেনীর। একজন গনিকা অন্যজন চোর। সমাজের চোখে দুজনেই ঘৃণিত। তাঁরা সমাজের ঘন অন্ধকারে বসবাসকারী দুজন মানুষ। সমাজে তাদের কোন মর্যাদা নেই, সন্মান নেই, মূল্য নেই। সমাজের মানুষের কাছে তাঁরা দৃষ্টিকটু। প্রেমেন্দ্র মিত্র দরদ দিয়ে তাদের কথা ছোটগল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।গনিকা রজনী ও চোর অঘোর একে অপরের হাত শক্ত করে ধরতে চেয়েছে। দুজনের মনেই দুজনের জন্যই ভালোবাস জন্মেছে। তাঁরা সম শ্রেনীর বলেই।

মোটবারোঃ মোটবারো গল্পটি নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের গল্প। গল্পটিতে পরশু এবং মানুষ মিলিয়েই মোট বারোটি প্রাণী। পশু এবং মানুষের মধ্যে কোন বিভেদ রাখা হয়নি। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের দুঃখ দারিদ্রতা সংগ্রাম অবিশ্বাস অসাধুতা ভালোবাসার চিত্র এঁকেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ঘমন্ডি পরিচয় সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন-

"আরা জেলার কোন গান একদিন শৈশবে বর্ষার বাঁধ ভাঙ্গা শোন নদীর বন্যায় তাকে বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন আশ্রয় সমস্ত আপদ বালাই থেকে একেবারে মুক্ত করে কৌতুহলহীন সংসারের মাঝে ভাসিয়ে এনে ফেলেছিল।"[১৪]

শোন নদীর বন্যার ফলে সে একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে। সামান্যতম পিছুটান ও তার আর নেই। তারপর কুড়ি বছর ধরে বন্যার জলে ভাষা কচুরিপানার মত বিভিন্ন জায়গায় ভেসে ভেসে বেরিয়েছে সে। অবশেষে ত্রিশ বছর বয়সে এক ছুটন্ত ঘোড়া ধরার দৌলতে মিলেছে স্থায়ী আশ্রয়। গঙ্গাযাত্রীদের আশ্রয়স্থলেই তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।তারই সঙ্গে এসেছে একটি ঘরে ঘোড়া অন্যটিতে ঘোড়ার গাড়ি, তিনটি ছাগল, চারটি ছোট বড় মাঝারি কুকুর, একটি পুরুষ ও একটি নারী। আরও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কুকুর ও ছাগলের স্থান হয়েছে তার ঘর গুলো। ঘোড়ার সহিস হিসাবে ঘোড়ার সঙ্গেই সে বুড়ো হয়েছে। দুলালীর একটি ছাগল আছে। বাবুদের বাড়িতে কাজ পর্যন্ত করে দুলারী। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেই ঘমন্ডির সাথে সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে দুলারী। অনেক দিন গল্প করতে করতে সখ্যতা গড়ে উঠে। দুলারী টাকা ধার নিয়েছিল ঘমন্ডির কাছ থেকে তা আর শোধ দিতে হবে না মনে হয়। দুলারী বলে-

"টাকা!টাকা!রোজ রোজ তাগাদা! টাকা যেন আমি দেব না।বলছি এই ছাগলের দুধের টাকা, বাবুদের বাড়ির মাইনের টাকা সব এক সঙ্গে পেলে দেব।"[১৫]

টাকা দেওয়া কোন লক্ষণই দেখা যায় না, বরং খাতির যত্নের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। ঘমন্ডির খাওয়া শেষ হলে দুলারী বলে-

"তু রখদে। বর্তন হম মলি।"

খাবারের বাসনপত্র গুলো দুলারী উপযাচক হয়ে ধূয়ে দেয়।এতে ঘমন্ডির ও ইচ্ছা আছে। দুলারী জানাই তাকে বিবাহ করবার জন্য প্রস্তাব দেয় হরদুঙ্গি নামে একটি ছোকরা।রাতেও ঘমন্ডির বাড়িতে দুলারীকে দেখা যায়। দুজনের জন্যই রুটি তৈরি করে দুলারী। ছাগলের দুধের সের দু টাকা, আর ঘমন্ডির মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা বলে দুলারী ঘমন্ডির ঘরে উঠে আসে। স্বাভাবিক বিবাহ উৎসবের মতো কোন অনুষ্ঠান নয়,শাঁক, শঙ্খ, উলুধ্বনি কিছুই নেই শুধু পাগলীটাকে নিয়ে ঘমন্ডির ঘরে এসে উঠে পড়া। কিছু দিন পর নিজেরাই বুঝতে পেরেছিল দুলারীর ছাগলীর এক সের দুধের দাম দুই টাকা নয়, ঘমন্ডির বেতন ও ত্রিশ টাকা নয়।এক মিথ্যার জাল বুনে তাঁরা দুজনই

এক সঙ্গে মিলেছিল। মিথ্যা খোলসা হয়ে গেলেও তারা একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করছে। মানুষ ও পশুর মিলেমিশে দিন রাত একসঙ্গে থাকে তারা। লেখকের ভাষায়-

"মানুষ ও পশুর জাগে, মানুষ ও পশু আবার রাত্রে গায়ে গায়ে তাল পাকিয়ে নিদ্রা যায়।"[১৬]

এগারো বছর ধরে একসাথে থেকেছে, ঝগড়া করেছে, নানা আহ্লাদ করেছে। কিন্তু হঠাৎ দুলারী তার ভৌজইনের শরীরের অসুস্থতার জন্য তাকে দেখতে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করতে লাগল। এত দিন ধরে কোন ভৌজাইনের খবর ছিল না,আজ হঠাৎ কি করে এলো বলে ঘমন্ডি চিন্তা করে। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যাবার সময় বলে যায় সে ফিরবার আগে যেন দুলারী বাড়ি থেকে না রায়। সাধারণত নিয়মের ব্যতিক্রম ভাবেই সেদিন ফিরে আসে ঘমন্ডি।এসে দেখতে পায় পুঁটলি বাঁধা দুলালীর। পুঁটলি খুলে এক এক করে থালা ঘটি বার করে বলে এগুলো কার?আর কিছু চুরি করেছে কিনা দেখতে পড়নের কাপড়ের মধ্যে প্রায় উলঙ্গ করে খোঁজ করতে থাকে।দুলারীর কোমড় থেকে সাতটি দশ টাকার নোট ও খুচরা সাতটি টাকা পাওয়া যায়। তারপর ঘমন্ডি দুলারীকে মেরে তারিয়ে দেয়। দুলারী জমায়েত লোকের সামনে বল-

"ডাকাত তাঁর টাকা কেড়ে নিচ্ছে;তাঁর অনেক কষ্টে ছাগলের দুধ, ঘুঁটে বেঁচে মেহনৎ করে জমানো টাকা।"[১৭]

হরদুঙ্গি, রামজীবন তারা সকলেই বলেছিল মিটমাট করে নিতে। ঘমন্ডি বলে-

"এগার বছর তো কি হয়েছে!ও চোর আর এ চৌকাঠ মাড়াতে আসুক দেখি! বেইমান।ভৌজির বাড়ী যাবার ছুতোয় চুরি করা।ভ্যাগ্যিস সে সময় মতো এসেছিল!"[১৮]

দুই ভিন্ন নর-নারী একত্রে এগারো বছর একসঙ্গে বসবাস করেছে। তাদের মধ্যে কোন ভালোবাসা ছিল না। দুলারী যেমন নিজের ভবিষ্যতের ভাত, কাপড়ের সুবিধা নিতে ঘমন্ডির কাছে এসেছিল। তেমন ভাবেই ঘমন্ডি নিজের প্রয়োজনে ও ছাগলের দুধের দাম দুই টাকা সের চিন্তা করে দুলারীকে আশ্রয় দিয়েছিল। গল্পের শেষে দেখা যায় দুলারী ঘমন্ডির গচ্ছিত টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে চিন্তায় দুলারী চুরি করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। অন্যদিকে ঘমন্ডির টাকা আদায়ের জন্য পশুবৃত্তি অবলম্বন করেছে। মানুষিক বোধ লোপ পেয়েছে, পশুর মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে ঘমন্ডি। পশুদের মধ্যে বাস করে পশুর মতো হয়েছে মন মানসিকতা। ভালোবাসার ছলনা করে দুজনেই, আসলে একে অপরকে ভালবাসেনি কখনো। স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়েছে দুজনেই। জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে পশুদের সঙ্গে মানুষ্য সমাজ বহির্ভূত যেন তাঁরা। পশুদের নিয়ে দিন যাপন করতে করতে মনুষ্যত্ব, মানবিকতা লোপ পেয়েছে।

১। বন্দ্যোপাধ্যায় অনিন্দিতা, প্রেমের মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২
২।মিত্র প্রেমেন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত,ওরিয়েন্ট লংম্যান, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫
৩। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫
৪। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭
৫। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯
৬। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২
৭। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৩
৮। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৫
৯। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৫
১০। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৬
১১। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭১
১২। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৩
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৪
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৭
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫১
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৩
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৩

....

তারাশঙ্করের উপন্যাস : নিম্নবর্ণের জীবন-বেদ

সুনীল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের একজন বড় মাপের শিল্পী। রবীন্দ্র-শরতোত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পথিকৃৎদের মধ্যে তিনি অন্যতম। শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের অনেক লেখায় গ্রাম-বাংলার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তারাশঙ্করের অনেক উপন্যাসে গ্রাম-বাংলার ছবি ধরা পড়েছে কিন্তু সেখানে গ্রামের মানুষ, তাদের জীবনচিত্র, সমাজ ও প্রকৃতি যেন একত্রে ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন—

"গ্রামের প্রকৃতি, জীবন ও সমাজ-এর সমগ্রতাকে ধরাবার জন্য অবিরাম চেষ্টা তাঁর। শেষ অবধি কোনো জীবিকা, কোনো ধর্ম, কোনো বর্ণ, কোনো উৎসব-আচার, পরিবারের এবং পরিবারচ্যুতদের সব কাজ সব খেলা সব সুখ সব শোক লেখায় ধরে না রাখলে যেন তিনি মহা-অপরাধী হবেন।"[১]

তারাশঙ্করের নিজের গ্রাম লাভপুর এবং তার আশেপাশের পল্লীসমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে রূপদান করেছেন। গ্রাম্য সমাজ-জীবনে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পূজা-পার্বণ, ধর্মাচরণ ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা প্রবাহমান সেগুলিকে অনুসরণ করে তিনি তাঁর কথাসাহিত্যকে বাস্তবমুখী করে তুলেছেন। ফলে, তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প গ্রামের সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার এক বিশ্বস্ত দলিলে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ খুব সঙ্গত কারণেই লিখেছেন—

"বিশেষ করে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত ও নীচুতলার অন্ত্যজ মানুষকে তাদের দুঃখ-বেদনাকে মহিমাময় শিল্পরূপ দিয়েছেন।"[২]

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালীঘূর্ণি' থেকে শুরু করে 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি উপন্যাসে গ্রাম্য সমাজ জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটের বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। রাঢ়বঙ্গের মাটি ও মানুষ তাঁর উপন্যাসের প্রাণ। সেখানে আছে ডোম, কাহার, বাগদী, বাউরি, সাঁওতাল, সাপুড়ে, বাজিকর, হিন্দু-মুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। এইসব নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের গ্রাম্য মানুষের জীবন-যন্ত্রণার কথা তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে।

তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের শিবনাথ কখনো আদর্শ জমিদার হতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন একজন আদর্শ মানুষ হতে। এই আদর্শবাদের শিক্ষা তিনি যার কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন তাঁর জন্মদাত্রী মা। অর্থের লালসা যাদের বেশি তারা কখনোই মানব-দরদী হতে পারেন না। শিবনাথের মধ্য দিয়ে এখানে মানব-দরদী তারাশঙ্কর চরিত্রেরই প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে, গ্রামের নিম্ন শ্রেণির ও নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিও তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। নানা দুঃখ-যন্ত্রণা, ঘাত-প্রতিঘাত, দারিদ্র্য ও মহামারী গ্রাম্য জীবনে নিত্য সঙ্গী। তারাশঙ্কর ছিলেন এই গ্রাম জীবনযাত্রার এক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিত্ব। ফলে, তাঁর গল্প-উপন্যাসে গ্রাম-বাংলা তথা রাঢ়বঙ্গের অতি বাস্তব চিত্রেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

তাঁর 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই কবিয়াল হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। আসলে সে ছিল এক ডোমের ছেলে। তার পিত্রালয়ে ও মাতুলালয়ে চুরি ও ডাকাতি ছিল তাদের একমাত্র জীবিকা। কিন্তু মানুষ কখনোই চোর বা ডাকাত হয়ে জন্মায় না। পরিবেশ ও পরিস্থিতিই মানুষকে চোর বা ডাকাতে পরিণত করে তোলে। সঙ্গদোষকেই এক্ষেত্রে দায়ী করা যায়। নিতাই কবিয়ালের অত্যন্ত আপনজনেরাও চেয়েছিল, সে নামকরা ডাকাত হয়ে গ্রামে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আশেপাশের দশ গ্রামের লোকেরা যদি বলে নিতাই ডোম হল নামকরা ডাকাত, তাহলেই তার পিতৃ ও মাতৃকুলের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু নিতাই তাদের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করে হলেন একজন বিখ্যাত কবি। কিন্তু চোর-ডাকাতের বংশ থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ করে কবি হওয়া তো মুখের কথা নয়। কারণ তাদের সমাজ

তার কবি হওয়াকে সহজে মেনে নেবে না। অনেকদিন পরে নিতাই তাদের গ্রামে প্রবেশ করলে তার মামা এজন্য তাকে মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আর তাদের পাড়ায় যেতে নিষেধও করেছিল। কারণ ডাকাতদের সমাজে কবিত্বের কোনো মূল্য নেই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে এক আধুনিক লেখক। রবীন্দ্রনাথ ও শরতোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে পথিকৃৎদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম বলা যায়। গ্রামের বাস্তব চিত্র অনেকেই এঁকেছেন। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাস থেকে শুরু করে অনেক লেখায় গ্রাম-বাংলার বাস্তব ছবিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'ইছামতী' প্রভৃতি উপন্যাসে পল্লী বাংলার প্রকৃতি ও বাস্তব চিত্রের সঠিক রূপায়ণ ঘটেছে। কিন্তু তারাশঙ্কর তাঁর গল্প ও উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির সহযোগে একটি মিশ্র ও অভিনব রসানুভূতির সৃষ্টি করলেন। আর এই লোকসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হল গ্রামের সাধারণ মানুষ বা নিম্নবর্ণের মানুষজন। সাঁওতাল, বাগদী, ডোম, কাহার, বাউরি, বেদে, সহজিয়া বৈষ্ণব, ঝুমুর সম্প্রদায় এরা সকলেই তাঁর উপন্যাসে মর্যাদার আসন লাভ করেছে। তার মূল কারণ হল, তারাশঙ্কর জমিদার বংশের সন্তান হলেও ভদ্রলোকি দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। আসলে তারাশঙ্করের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। গ্রামের নিম্নবর্ণের মানুষদের সঙ্গেও ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। যখন তিনি কলকাতায় বসবাস করতেন তখনো গ্রামের বাড়িতে এলে গরীব ও নিম্নবর্ণের মানুষদের নিয়মিত খোঁজ-খবর নিতেন। আসলে তারাশঙ্কর মনে-প্রাণে ছিলেন তাদেরই একজন। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত খুব সঙ্গত কারণেই লিখেছেন—

"শিল্পী হিসেবে নিজের জাত্যন্তর ঘটানো - অন্য ধরনের ব্যাপার। তারাশঙ্করই একমাত্র লেখক যাঁর এ-জাতীয় গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা অনেক, যেখানে তিনি ভদ্রলোকের পাড়া থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়ে ওদের একজন হয়ে উঠেছিলেন।"[৩]

নিতাই কবি এবং তার কবি জীবনের পূর্ণতা পেয়েছে প্রেমে। যাদের সমাজে নর-নারীর মধ্যে সম্পর্ক শুধু কাম ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাদের সমাজে ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তারা অপরাধ জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত। এমন বংশের একটি ছেলে হল একজন আদর্শ প্রেমিক। আর শুধু একজন নয়, তার দু'জন প্রেমিকা। অথচ তাদের প্রেমে কোনো আঘাত বা প্রত্যাঘাত নেই। কারণ, তাদের প্রেম নিকষিত হেমের মতো উজ্জ্বল। তাদের এই প্রেম কামনার রঙে রঞ্জিত নয়। এ প্রসঙ্গে ড. অমরেশ দাশের কথা খুবই প্রণিধানযোগ্য—

"যে প্রেম তাদের জীবনে উদ্ভূত হয়েছে, উদ্ভূত হয়ে পরকীয়াকে পাগল করেছে এবং বারাঙ্গনার নারীত্বকে তথা মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করেছে, তার তুলনা নিকষিত হেম ছাড়া কিছু ভাবা যায় না।"[৪]

বাস্তবিক নিতাইয়ের প্রেম পূর্ণতা লাভ করেছিল এই প্রেমের পরশে। তার দুই প্রেমিকার মধ্যে একজন হল তার মর্মসঙ্গিনী এবং অন্যজন হল তার কর্মসঙ্গিনী। এই দুই প্রেমিকাই তার কবি জীবনকে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করেছে। আমাদের সমাজে কতো নারীকে কতো রকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। সেই লাঞ্ছনার কথা অনেকের দৃষ্টিপথ এড়িয়ে যায়। কিন্তু নিতাই কবিয়ালের কাছে তা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এমন এক পরস্ত্রী ঠাকুরঝির ক্রন্দনে নিতাইয়ের মন ভারাক্রান্ত হয় এবং আপন মনে সে গেয়ে উঠল—

"আমি ভালবেসে এই বুঝেছি—
সুখের সার সে চোখের জলে রে।"

ঠাকুরঝিও নিতাইয়ের কথা ও গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে একে অপরের কাছে প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে যায়।

আমাদের সমাজে উঁচু-নিচু জাতের মধ্যে ভেদাভেদ চিরকালই প্রবাহমান ছিল, এখনো আছে। কবিয়ালদের মধ্যে এক পক্ষের প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা হল তাদের পেশাগত ধর্ম। আর যদি তাদের মধ্যে জাত্যভিমান থাকে তাহলে এই আক্রমণের মাত্রা আরো তীব্র হয়। তাই মহাদেব কবিয়াল এই জাত-ধর্মের সুযোগকে হাতিয়ার করে নিতাই কবিয়ালকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়ে না। মহাদেব কবিয়াল নিতাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন— 'আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা- স্বগ্‌গে যাবার আশা গো'। আমাদের সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর তারাশঙ্কর দিয়ে গেলেন তাঁর 'কবি' উপন্যাসে মহাদেব কবিয়ালের কথায়। আমাদের সমাজের অনেক উঁচু বর্ণাভিমানের জন্য নিম্নবর্ণের মানুষকে কীভাবে হেয় করে তারই বাস্তব চিত্র এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

তাঁর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হল কোপাই নদের তীরবর্তী 'বাশবাদী' গ্রাম। এই গ্রামে ৩০ টির মতো পরিবার বসবাস করে। একটি পুকুরের দুই পাড়ে তাদের বসতি। আমাদের সমাজে জাতিভেদ প্রথা যে কতটা প্রবল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাস থেকে। অপেক্ষাকৃত উঁচু বর্ণের মানুষেরা সবসময় নিচু বর্ণের বা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের হেয় জ্ঞান করতেন। এই কাহার সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে দুটি শ্রেণি— বেহারা কাহার ও আটপৌরে কাহার। তার মধ্যে বেহারা কাহারেরা

পালকি বহন করে বলে আটপৌরে কাহারেরা তাদেরকে অবজ্ঞা করে। এমনকি তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনেও নানা রকম আপত্তি দেখা যায়।

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত আমাদের সমাজ জীবনের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব যে নিচু শ্রেণির মানুষদেরকেও প্রভাবিত করেছিল, তার প্রমাণ মেলে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিতে। যুদ্ধের পরে যখন চারিদিকে অর্থের ভাণ্ডারে টান পড়েছে তখন গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরাও কলকারখানায় কাজের জন্য শহরমুখী হতে শুরু করেছে। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃত জগতকে আশ্রয় করে উপন্যাসের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে দুই কালের দ্বন্দ্ব— সেকাল ও একালের দ্বন্দ্ব। একে অন্যভাবেও বলা যায়— রেলপথ ও আলপথের দ্বন্দ্ব। সেকালের প্রতিনিধি হল বনওয়ারী, আর একালের প্রতিনিধি হল করালী। এই করালী কাহার সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত অন্ধ-কুসংস্কার থেকে তাদেরকে আলোর পথের সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু কাহার সম্প্রদায় মাতব্বর বনওয়ারীর কথাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। কাহার সম্প্রদায় তথা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি, উৎসব-সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতিকে খুব গুরুত্ব দেয়। তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতিকে তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করে। যখন তাদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠত তখন তাকে দমন করার জন্য মাতব্বর বনওয়ারী তার দলবল নিয়ে উঠে-পড়ে লাগত। করালী কত্তাবাবার বাহনকে পুড়িয়ে মারার ক্ষমতা দেখায় এবং মনিব শ্রেণির মাইতো ঘোষকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। কাহার সমাজে সে এক প্রতিবাদী চরিত্র। তাদের সমাজে প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে সে তোয়াক্কা করে না। তার শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় মেলে স্বয়ং তার কথাতেই— 'যে আসেঙ্গা সে আসেঙ্গা, হাম কেয়ার করতা নেহি হ্যায়'।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র কাহারেরা অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। ভরা বর্ষায় কখনো কখনো তাদের ঘরবাড়ি ভেসে যায়। কিন্তু কাহারেরা কখনোই তাদের বাশবাদী গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতো না। তারা তাদের গণ্ডির মধ্যেই থাকতে ভালোবাসত। নিচু কুলে জন্ম হলেও এ নিয়ে তাদের কোনো রকম শোক-তাপ ছিল না। এ প্রসঙ্গে ড. অমরেশ দাশের মন্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত—

"নিজেদের জন্মের নীচতায় তাদের বিশ্বাস ছিল বদ্ধমূল। সামাজিক হীনাবস্থাকে তারা দৈববিধান ব'লে জানত।"[৫]

বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বেহারা কাহারেরা ডাক পায় পালকি বহন করার জন্য। কিন্তু চন্দনপুরে কারখানা তৈরি হওয়ার পর থেকে তাদের পালকি বহন করার কাজও বন্ধ হয়ে যায়। পাগলের কথায় তার সমর্থন মেলে—

"জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
ও পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।
মেয়েরা ও পথে গেলে, ফেরে নাকো ঘরে –
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে।"

বাস্তবিক কাহার সম্প্রদায় যতদিন নিজেদের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাদের সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। অর্থের অভাব অনেক সময় মানুষকে বিপথে চালিত করে। এই অর্থের অভাবে শেষপর্যন্ত তারা কারখানার কাজে যোগদান করতে বাধ্য হয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। কাহার সমাজেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। একসময় তারাও এই পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গে ড. অমরেশ দাশ লিখেছেন—

"প্রাণের দায়ে যখন তারা বাধ্য হল পরম্পরা ভেঙে পরিবর্তনকে মেনে নিতে, তখন তাদের হারাতে হল সামাজিক স্বরূপ ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি।"[৬]

বনওয়ারী এই কাহার সমাজের প্রধান মাতব্বর। ফলে, তার কথা সকলেই মেনে চলে। একমাত্র ব্যতিক্রমী চরিত্র হল করালী। সে বনওয়ারীকে অমান্য করলে একসময় তাদের মধ্যে মারামারি হয় এবং বনওয়ারী করালীর কাছে পরাজয় বরণ করে। গোটা কাহারপাড়ায় এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু একসময় এই বনওয়ারীই করালী ও পাখীকে কাহারপাড়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। কারণ, বনওয়ারী সমাজের মাতব্বর হিসেবে কখনোই চায় না যে, কাহার সম্প্রদায় তাদের পিতৃপুরুষের কুলকর্মকে পরিত্যাগ করে কলকারখানায় কাজ করুক।

আঞ্চলিক সাহিত্যের এক বিশ্বস্ত দলিল হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটি। এখানে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ— মা ভাগীরথীর কূলে হিজল বিলের কথা ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কোনো ভৌগোলিক সীমারেখায় এই হিজল বিলের কোনো অস্তিত্ব নেই। সাঁওতালি বেদে সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক ঘটনাকে এই উপন্যাসে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে ড. নিতাই বসু লিখেছেন—

"এককথায়, এই উপন্যাসখানিকে বিষবেদেদের জীবনের মহাকাব্য বলা চলে। কতকগুলো লৌকিক কুসংস্কারে নিজেদের আনন্দ ও বেদনা, আশা ও আকুলতাকে বন্দী করে এরা যেন একটি আদিম অন্ধকার জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে যুগ যুগ ধরে বাস করে এসেছে।"[৭]

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটি দুটি পর্বে বিভক্ত। এর প্রথম পর্বে স্থান পেয়েছে শিরবেদে মহাদেব এবং নাগিনী কন্যা শবলার প্রসঙ্গ। নাগিনী কন্যা হিসেবে ওই সাঁওতাল বেদে সমাজ থেকে একটি মেয়েকে তারা নির্বাচন করত। এই মেয়েটিকে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাদের কিছু প্রাথমিক শর্ত আছে। যেমন— মেয়েটির স্বামী মৃত হতে হবে অর্থাৎ কোনো বিধবা সাঁওতাল রমণীকে নাগিনী কন্যা হিসেবে বেছে নেওয়া হবে। এছাড়া মেয়েটিকে দেখতে সুন্দরী হতে হবে এবং তার যৌবনশোভা থাকাটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু নাগিনী কন্যার ভূমিকায় যে অবতীর্ণ হবে তাকে অনেক নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। প্রথম প্রথম এই জীবনকে মেনে নিলেও পরে তার জীবনে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ, মেয়েটির অতৃপ্ত যৌবনবাসনা তাকে অস্থির করে তোলে। সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল শিরবেদে মহাদেব। মহাদেব শবলার যৌবন-সুধা পান করার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাই ড. নিতাই বসু খুব সঙ্গতভাবেই শবলা ও মহাদেব প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"সে যৌবনের ফেনিল উদ্দামতাকে অবাধে মুক্ত করে দিতে চেয়েছে, এ ব্যাপারে সমাজপতি মহাদেব গোপনে তার আসঙ্গ কামনা করে আহ্বান জানায়।"[৮]

শবলা নাগিনী কন্যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও তার একজন প্রেমিক ছিল। ফলে, শবলার প্রেমিক ও শিরবেদে মহাদেব তথা সমাজপতি মহাদেবের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘাত শুরু হয়। পরিণতি হিসেবে শবলার প্রেমিকার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এর পরেও শবলা কখনো মহাদেবের লালসার শিকার হয়নি, বরং তাকে ছুরিকাঘাতে বিদ্ধ করে নিজে পলায়ন করেছে।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে 'নাগিনী কন্যা'র পদে মনোনীতা হয়েছে পিঙ্গলা। এই পর্বে শিরবেদে হিসেবে মনোনীত হয়েছে গঙ্গারাম। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে গঙ্গারাম সহ একাধিক পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভাদু ও রাঢ়দেশের নাগু ঠাকুর তাকে দেখে কিছুতেই লোভ সংবরণ করতে পারছিল না। শিরবেদে গঙ্গারামও প্রচণ্ডভাবে পিঙ্গলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে গঙ্গারাম ও নাগু ঠাকুরের মধ্যে চরম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এরপর একদিন পিঙ্গলা জমিদার বাড়িতে সাপ ধরার সময় সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সাপ ধরতে যায়। যৌবনবতী পিঙ্গলার এই নগ্ন রূপ দেখে নাগু ঠাকুর ও গঙ্গারাম দু'জনেই কামার্ত হয়ে উঠেছিল। সমাজপতি গঙ্গারাম প্রথমেই নাগু ঠাকুরের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে এবং তাকে প্রহার ও অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর খুব চতুর ও কামার্ত গঙ্গারাম পিঙ্গলার ঘরের আশেপাশে আতরের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে তাকে রাত্রিবেলা ঘরের বাইরে বের করার ফন্দি করে। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, পিঙ্গলা ঘরের বাইরে বের হলেই তাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত নাগু ঠাকুর ফিরে এসে প্রচণ্ড আক্রোশে গঙ্গারামকে হত্যা করল কিন্তু পিঙ্গলাকে কিছুতেই পেল না। উপন্যাসের শেষ পর্বে শবলা ফিরে এলেও সে অন্যত্র বসতি স্থাপন করার কথা জানায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের এক অমর শিল্পী। বীরভূমের রাঙামাটি ও মানুষ তাঁর উপন্যাসের প্রাণ। সমাজের উঁচু-নিচু সকল শ্রেণির মানুষকে তিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ লিখেছেন—

"জাতিগত পেশাকে হীনদৃষ্টিতে দেখেননি - ডাকাত ঠেঙারাকে, বেদে-স্বৈরিণীকে, ডোম-বাগদি-কাহার-সাঁওতাল-সাপুড়েকে অত্যন্ত মমতা দিয়ে বর্ণনা করেছেন।"[৯]

সূত্র সন্ধান :

১. তারাশঙ্কর অনুসন্ধান ৯৮, ক্ষেত্রগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৯০

২. বিচিত্র তারাশঙ্কর, ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ, মান্না পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ১০৮

৩. তারাশঙ্কর অনুসন্ধান ৯৮, ক্ষেত্রগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৮৭

৪. তারাশঙ্করের উপন্যাস, ড. অমরেশ দাশ, বামা পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ১১৮
৫. তারাশঙ্করের উপন্যাস, ড. অমরেশ দাশ, বামা পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ১৩৫
৬. তারাশঙ্করের উপন্যাস, ড. অমরেশ দাশ, পৃ. ১৩৬
৭. তারাশঙ্করের শিল্পীমানস, ড. নিতাই বসু, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ: বৈশাখ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ১৯২
৮. তদেব, পৃ. ১৯৩
৯. বিচিত্র তারাশঙ্কর, ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ, মান্না পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ৬৩

....

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি : নিতাই কবিয়াল

ড.উত্তম দাস
সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ , বীরভূম মহাবিদ্যালয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসের ধারায় ‘কবি’ একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস। কারণ- **“তাঁর অন্য উপন্যাসে দেখা যায় পট এবং ব্যক্তি সমান প্রাধান্য পায়। এই উপন্যাস একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে পটকে তিনি স্বল্প মূল্য দিয়ে ব্যক্তিকেই মুখ্য করেছেন”।**[১] জেনে রাখা ভালো এই উপন্যাসটি প্রথমে গল্প আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ১৩৪৭ সালে। ‘কবি’ গল্প ও ‘কবি’ উপন্যাসের কিছু পার্থক্য রয়েছে। কেননা ‘কবি’ গল্পে ঝুমুর দল ও বসন্তের কথা নেই। বরং ঠাকুরঝির অসুখের সংবাদ পেয়ে নিতাই কবিয়াল চলে গেল— এই রকম একটি ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষ হয়েছে। ‘প্রভাতী’ পত্রিকার সম্পাদক মণি সমাদ্দার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি উপন্যাস লেখার অনুরোধ জানালে লেখক ‘কবি’ গল্পটিকে উপন্যাস আকারে সাজিয়ে ফেলেন। এবং সেটি ‘প্রভাতী’ পত্রিকায় ১৩৪৭ সালের চৈত্র থেকে ১৩৪৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। **“বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের প্রভাব কেমন করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, আপামর জনসাধারণের মনে সৌন্দর্যবোধ ও সরলতার সঞ্চার করিয়াছে, বাংলার কবিয়াল- সম্প্রদায়ই তাহার চমৎকার প্রমাণ”।**[২] মানুষ ও প্রকৃতিকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন । আর ব্যক্তিকে মুখ্য করে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈপরীত্যের নানা ছবি তুলে ধরেছেন আলোচ্য উপন্যাসে । একুশটি পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি সমাপ্ত। কবি উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হল অন্ত্যজ শ্রেণির একজন কবিয়ালের (উপন্যাসের নায়ক নিতাই কবিয়াল) স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের ছবি । নিতাই কবিয়ালকে নায়ক বলছি কারণ- নায়ক তাকেই বলা হয় যে কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে এবং তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে সমগ্র উপন্যাস।নিতাইকেও সেভাবেই উপন্যাসে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলি হলো- নিতাই কবিয়াল, ঠাকুরঝি , বসন্ত বা বসন।এখন প্রশ্ন হলো এইচরিত্রগুলি ঔপন্যাসিকের কাল্পনিক চরিত্র? না, বাস্তবে চোখে দেখা চরিত্র? আসলে বাস্তববাদী শিল্পীরা যে উপকরণ সংগ্রহ করে থাকেন, তা অবশ্যই চেনা সমাজজীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে। তারাশঙ্করও এর বাইরে নয়। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর রাজনীতির সূত্রেই হোক, সমাজসেবার সূত্রেই হোক, তিনি কিন্তু গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়িয়েছেন। গ্রামের মানুষের কাছাকাছি এসেছেন এবং তাদের দুঃখের সমব্যথীও হয়েছেন।বিশেষ করে তারাশঙ্করের মানস গঠন হয়েছে রাঢ় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে । রুক্ষ মাটির জীবন চিত্র নির্মাণে তিনি ছিলেন পটু । বর্ধমান-বীরভূমের রুক্ষ ও লাল মাটি প্রভাবিত মানুষের জীবনাচারই তারাশঙ্করের লেখায় জীবন্ত হয়ে ওঠেছে বারবার। মোটকথা রাঢ়বঙ্গের সংগ্রামী মানুষদের জীবন-জীবিকা কেমন, কেমন করে তাদের জীবন সংগ্রাম চলে , তা তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে বার বার । আর তাঁর সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র গ্রামজীবন হওয়ার ফলে সাধারণ ভদ্র চরিত্রের পাশাপাশি বেদে, সাপুড়ে, যাদুকর, ডোম, জুয়াড়ি, কাহার ইত্যাদি নিম্নশ্রেণির অন্ত্যজ চরিত্রগুলি তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।আর এই কবি উপন্যাসে এসেছে কবি , ঝুমুর দলের কথা। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর কেন এদের কথাই বললেন ? আসলে সেই সময়ের সামাজিক যে প্রেক্ষাপট , তার সূত্র ধরেই লেখকের সাহিত্যে এইসব চরিত্র ও সম্প্রদায়ের কথা এসেছে। কারণ- “দুর্বল কৃষির ওপর নির্ভরশীল গ্রামীণ বেকারের অজস্র টাইপ স্বভাবতই বাঁকুড়া বীরভূমের বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ববঙ্গের তুলনায় অধিকতর গ্রামমুখিতা এবং অধিকতর আলস্য এই বৈশিষ্ট্যকে আরো উজ্জ্বল করেছে (অগ্রদানী এবং কবির বিপ্রপদ)। কৃষি দুর্বল বলেই জীবিকাহীন অনন্যোপায় বাউরী প্রভৃতি শ্রেণীর তথাকথিত "স্বভাব অপরাধিত্ব” এখানে অধিকমাত্রায় প্রকট। আবার অপরদিকে একই কারণে বাউল, বৈরাগী, বোষ্টম এবং কবির দল, ঝুমুরের দল প্রভৃতির আধিক্য তথাকথিত “স্বভাব অপরাধী” শ্রেণীর সঙ্গে একটা বৈপরীত্য সৃজন করে রয়েছে (রাইকমল ও কবি)”।[৩]

এবার আসা যাক কবি উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল, ঠাকুরঝি , বসন্ত বা বসন প্রভৃতি চরিত্রগুলি ঔপন্যাসিকের কতটা বাস্তবে চোখে দেখা চরিত্র। কবি উপন্যাসের চরিত্র তো বটেই , অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পের কিছু চরিত্র যে তারাশঙ্করের একেবারে কাছ থেকে

দেখা **'আমার কালের কথা'** গ্রন্থে সে কথা বলে গেছেন। যেমন— 'বেদেনী' গল্পের রাধিকা বেদেনী, 'পাষাণপুরী'র নায়ক কালী কর্মকার লেখকের নিজের চোখে দেখা চরিত্র। 'ডাক হারকরা'র দীনু ডোমকেও তিনি চিনতেন। নাগিনী কন্যার শবলাকেও নিজের চোখে দেখেছেন। এমন প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায়।

প্রথমে আসা যাক উপন্যাসের নায়ক নিতাই চরিত্রটির কথায়। নিতাই চরিত্রটি তারাশঙ্করের চোখে দেখা বাস্তব চরিত্র সতীশ ডোমের আদলে রচিত।**'আমার সাহিত্য জীবন'** গ্রন্থে তারাশঙ্কর বলেছেন- **"সতীশ ডোমও সতীশের বংশ পরিচয় যা দিয়েছি তাতে এতটুকু অনুরঞ্জন নেই। ...সতীশ কবি যশপ্রার্থী ছিল— এই আকাঙখাতেই সে ওই পরিবার ও গোষ্ঠীগত চৌর্যবৃত্তির প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য স্টেশনে এসে রাজা পয়েন্টস্‌ম্যানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল।"**[৪] এই সতীশ কিন্তু লাভপুরেরই মানুষ। আলোচ্য উপন্যাসে সে হয়ে উঠেছে নিতাই কবিয়াল। অন্যদিকে 'কবি' উপন্যাসে দ্বিজপদ বিপ্রপদ হয়েছে। **'আমার কালের কথা'** গ্রন্থে তারাশঙ্কর বলেছেন- **"আমার কবি উপন্যাসের বিপ্রপদ দ্বিজ পদরই অক্ষম রুগ্ন অবস্থার চরিত্র।"** [৫] অন্যদিকে রাজা পয়েন্টস্‌ম্যানের চরিত্রে তারাশঙ্কর কিছুটা রঙ মিশিয়েছেন। এই উপন্যাসে ঠাকুরঝি চরিত্রটি তারাশঙ্করের দেখা বাস্তব চরিত্র। - **"ঠাকুরঝি একজন গোয়ালিনী— অন্য একটি গ্রাম থেকে রেললাইন ধরে এখানে দুধ বিক্রি করতে আসত। নিতাই সেই সময়টিতে রেললাইনের ধারে গাছের তলায় অপেক্ষা করত— কখন ঠাকুরঝি দুধ নিয়ে আসবে। গল্পের এই ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।লাভপুর সংলগ্ন দোনাইপুর গ্রাম। এই গ্রাম থেকে মাখনী নামে এক মহিলা লাভপুরে দুধ বিক্রি করতে আসত। ওর ভালো নাম ছিল ভানু। লাভপুর স্টেশনে রাজা নামে এক রেলকর্মী ছিল। রাজা ও ভানুর মধ্যে ভগ্নিপতি ও ঠাকুরঝি সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রেই ভানু লাভপুরে ঠাকুরঝি বলে পরিচিত ছিল। 'কবি' উপন্যাসের ঠাকুরঝি বাস্তবে দোনাইপুর গ্রামের এই ভানু গোয়ালিনী"।**[৬] উপন্যাসে তারাই হয়ে উঠেছে নিতাই কবিয়াল ও ঠাকুরঝি।

অন্যদিকে কবি উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বসন্ত । সে দেহ ব্যবসায়ী এবং ঝুমুর দলের নর্তকী ও গায়িকা। তারাশঙ্করের চোখে দেখা মানুষ বসন। ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লাভপুরে গ্রামের স্টেশন চত্বরে তারাশঙ্কর বসনকে দেখেছেন এবং কথাও বলেছেন । উপন্যাসের বসন প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের ঝুমুর দলের নায়িকা। এই বসন সম্পর্কে 'আমার সাহিত্য জীবন' বইতে তারাশঙ্কর বলেছেন। " **আমাদের গ্রামে স্টেশনের ধারে কোনো মেলা ফেরত একদল ঝুমুর এসে নামল। বড়ো বটতলায় ঘর পাতলে। তাদেরই একটি মেয়ের হল কলেরা। এই মেয়েটির নামই বসন। ... দেহটা দেখে মনে হয়, কোনো রক্তপায়ী সরীসৃপ নিঃশেষে ওর দেহের শুধু রক্তই নয়— সারাংশও টেনে নিয়েছে। আমি তখন কলেরা-ম্যালেরিয়ার সেবা করে বেড়াই। কলেরার ওষুধ আমার কাছে আছে। .... সকলে সরে দূরে বসে আছে, মেয়েটি ছটফট করছে—জল আর জল শব্দ। কাছেই অদূরে বসে আছে মাসি। আর একটি পুরুষ, সে বসনের ভালোবাসার জন। মদও রয়েছে দেখলাম।যথাসাধ্য চিকিৎসা করে এলাম। ওই সময়েই বসনের অস্থিরতা দেখে মাসি বলেছিল, ভগবানকে ডাক বউ, ভগবানকে ডাক।সে বলেছিল না"।**[৭] উপন্যাসেও এই রকম ঘটনা রয়েছে ।

এবার মূল উপন্যাসে আসা যাক । উপন্যাসের শুরুটা হয়েছে ঠিক এইভাবে - **"শুধু দস্তুর মত একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয় রীতিমত এক সংঘটন। চোর-ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল। নজীর অবশ্য আছে বটে, - দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। রামায়ণের কবি বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন বটে তবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। ...অশিক্ষিত হরিজনরা বলিল নেতাইচরণ তাক্ লাগিয়ে দিলে রে বাবা ! যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোম বংশ, তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায় ইহারা সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল - প্রাচীনকাল হইতেই বহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ । ইহাদের উপাধিই হইল বীর বংশী। নবাবী পল্টনে নাকি একদা বীর বংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানির আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে।"** [৮] কিন্তু উপন্যাসের নায়ক নিতাই দস্যুবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছেন। আর এভাবেই তার শুরু হয় স্বপ্ন দেখা । কিন্তু সেই স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কখনো সমাজ কখনো অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনো সামাজিক অস্পৃশ্যতা । কবিতা রচনার জন্মগত একটি ক্ষমতা ছিল তার। জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে সে বছর কয়েক পড়াশোনা করেছে; রামায়ণ ও মহাভারতের মতো বহু গল্প মুখস্থ করেছে গ্রামের ভদ্র সন্তানদের মতো সৎ জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখেছে।বন্ধন মুক্তির আশা ও স্বপ্ন নিতাইকে শিল্প সাধনার জগতের অধিবাসী করেছে। পাঠশালা বন্ধ হলে পড়াশোনারও ইতি ঘটে। তার সমস্তই মুখে মুখে রচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে সুর দিয়ে গেয়ে মনে রাখা। তার গ্রামে যে মেলা বসত, সেই মেলার কবিগানের আসরে সে নিয়মিত উপস্থিত থেকেও কবিগান শুনত । আর এই কবিগানই তাকে ভবিষ্যতে কবিয়াল হওয়ার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করে। এ যেন 'গোবরে পদ্ম

ফুলের' মতোই অবস্থা নিতাইয়ের। কবি প্রতিভাকে নিতাই স্রষ্টাপ্রদত্ত অলৌকিক এক ভাবনা মনে করেছিল।কিন্তু সমাজ পরিবেশের বাধা, জাতপাত, সংস্কার বোধ এসবকেই ছাপিয়ে ওঠে নিতাইয়ের উচ্চাশা ও মুক্তি অবজ্ঞা আর বিদ্রূপকে। নিতাইয়ের আত্মাবিষ্কার, ডোম-জীবনের অন্ধকার পট, বসনের মাসির দলের ডোরাকাটা জীবন— এরই মাঝখান দিয়ে নিতাইকে চলতে হয়েছে। চিনতে হয়েছে নিজেকে। ফলে সৎভাবে সেই প্রতিভার বিকাশে পিতৃ ভিটা ছেড়ে স্টেশনে চলে যায়। ওইখানে তার বন্ধু রাজা (স্টেশন পয়েন্টসম্যান) নিতাইকে উদ্বাস্তু সম্বোধন করে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নিতাই কবিগান করে এবং কবি হিসেবে তার প্রতিভা নাম ছড়াতে থাকে। কবি গানের পাশাপাশি সে কুলিগিরিও করেছে। এর মধ্যেই তার কবি হওয়ার যে স্বপ্ন তা পূরণের সুযোগ আসে। গ্রামের মেলায় কবিগানের আসরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একজন উপস্থিত না থাকায় সেই জায়গায় নিতাই মিষ্টি গলায় গান গেয়ে সকলের মন জয় করে। কলকাতাবাসী চাকুরে বাবু, জমিদার নায়েব সকলেই প্রশংসা করে। এই প্রশংসার পাশাপাশি নিতাইকে অনেক অপমানও সহ্য করতে হয়েছিল – **"শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরনের। যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাহারা বলিল দূর দূর! ভিজে ভাতের মত গান! এই শোনে!"** [৯] অন্যদিকে মহাদেব ছড়ায় বলেছে-

"সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল ।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল।।
ও- বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর , কর্তা-বাবা ঠ্যাঙারে ।
মাতামহ ডাকাত বেটার – দ্বীপান্তরে মরে।
ডোমের ছেলে রত্নাকর , চিংড়ির পোনা রুই" [১০] ।।

-------শুধু তাই নয়, নিতাইকে ব্যঙ্গ করে মহাদেব আরো বলেছে – **"আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতা – স্বগগে্ যাবার আশা-- গো।"** [১১] অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ নিতাই এভাবেই সমাজের অপরিসীম অবজ্ঞা ও ঘৃণার শিকার হয়েও নিজেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়।কিন্তু নিতাই প্রতিমুহূর্তে সমাজের উচ্চবর্গীয় মানুষের আনুকূল্য কামনা করে বারবার আঘাত পেয়েছে।যা তার স্বপ্নপূরণে বাধা সৃষ্টি করেছে। নিতাইয়ের গান শুনে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় রাজা এবং তার স্ত্রী আর শ্যালিকা ঠাকুরঝি। এই ঠাকুরঝির বাস্তব পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। এখানে দেখে নেব উপন্যাসের সাথে তার মিল কতটা। মিল অনেকটাই কেননা – **" রাজা এই শ্যালিকাটিকে বলে – ঠাকুরঝি! নিতাই ও তাহাকে বলে ঠাকুরঝি। শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ পাশের গ্রাম হইতে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে। নিতাই নিজেও তাহার কাছে এক পোয়া করিয়া দুধের 'রোজা লইয়া থাকে"** [১২] । এই ঠাকুরঝির নিবিড় সাহচর্য নিতাইয়ের অফুরন্ত গানের ভাণ্ডার খুলে যায়। শেষে কুলিগিরি ছেড়ে দিয়ে কবিগানকেই সে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। ঠাকুরঝিকে নিয়েই নিতাই স্বপ্ন রচনা করে। তাকে ডেকে চা খাওয়ায় ও গল্প করে। নিতাইয়ের গানের নীরব ভক্ত সে। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠল। রাজা ঠাকুরঝিকে **"আলকাতরার মতো রঙ , বলে রসিকতা করলে নিতাইও কষ্ট পায় ও গান রচনা করে – "কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো - চুল কালো আহা হয়। আহা। বড় সুন্দর, বড় ভাল একটি কলি মনে আসিয়া গিয়াছে রে। হায় হায় হায় – " কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেন?"** [১৩] **নিতাইয়ের চোখে সে -" কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"** [১৪] নিতাইয়ের **'কালো যদি মন্দ তবে ......"** এই উক্তির মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর যেন কৌশলে বর্ণবাদের টুঁটি চেপে ধরেছেন। নিতাই ও ঠাকুরঝির প্রেমের যখন পরিণত অবস্থা তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ এবং নিতাইয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব। কেননা, তার মনে জেগে ওঠে আত্মগ্লানি – ঠাকুরঝি পরস্ত্রী, সে তার ঘর ভাঙতে চায় না। তার কামনা ঠাকুরঝি সুখে থাকুক। এর পরেই সে ভেবেছে ঠাকুরঝির কল্যাণের জন্যই মা চণ্ডীকে প্রণাম করে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে।যাবার আগে ঠাকুরঝির দুধের দাম পাঁচটি টাকাও রাজনের হাতে দিয়ে গেল। যেতে যেতে ট্রেনের ভেতরেই নিতাই সুর তুললো। যে সুরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঠাকুরঝির স্মৃতি---

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক আমি তোমায় দেখবো খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে -- সোনার অঙ্গে লাগবে কালি"। [১৫]

ঠিক তখনই এক ভ্রাম্যমাণ ঝুমুর দলের আবির্ভাব ঘটল। এই ঝুমুর দল নিতাইয়ের জীবনের গতিকে অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে দিল। এই ঝুমুর দলের বসন্ত ছিল প্রধান নর্তকী। অত্যন্ত মদ্যপ, খামখেয়ালি, দেহব্যবসায়িনী। ঘটনাচক্রে এই বসন্তই এলো নিতাইয়ের জীবনে। পূর্বে এই বসনকে নিয়েই ঠাকুরঝির ভুল বোঝা ও চরম ঈর্ষা ও তার মর্মান্তিক পরিণতি। বসন্তের মধ্যে নিতাই ঠাকুরঝির ছবি দেখতে পায়।

তাই বসন্তের পেশা কদাকার হলেও নিতাই সেই দলেই ঝুঁকে পড়ে। নিতাই বসন্তের আহ্বানেই ঝুমুর দলের সঙ্গে যোগ দেয়। অশ্লীল গান বাজনা এবং গানের সঙ্গে নারীদের অশ্লীল নৃত্য ছিল এই ঝুমুর দলের কাজ। ঝুমুর দল সারা বছর দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, তাঁবু ফেলে কিছুদিন পর এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যায় এবং নাচ, গান, কখনো পালা, কখনো কবিগান ইত্যাদি করে বেড়ায়। বিশেষ করে মধ্যযুগের শেষদিক থেকে আধুনিক যুগের একটা সময় পর্যন্ত রমরমা ছিল । ঝুমুরদল সে ধারাবাহিকতারই অংশ মাত্র। এদের বাইরের খোলস নাচ, গান, ঢোল, তবলা । এর ভেতরের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ।এদের রোজগারের মূল সূত্র মূলত মেয়েদের দেহব্যবসা। অর্থাৎ সেকালের রাঢ় বঙ্গের মানুষের জীবন-জীবিকা যে কত কঠিন ছিল এটাই তার জলন্ত প্রমাণ।

বসন্তের সঙ্গে ঝুমুর দলে গান গাওয়ার সময় ঠাকুরঝিও উপস্থিত ছিল। আসরের শেষে অসুস্থ বসন্তের মাথা টিপে দেওয়ার দৃশ্য ঠাকুরঝি জানালা দিয়ে দেখে ফেলে এবং এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে সে চলে যায়। অন্যদিকে বসন্তও নিতাইয়ের অন্য মনের মানুষ আছে জানতে পেরে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যায়। তারও জ্বালা ঈর্ষার জ্বালা। তারাশঙ্কর বাস্তবে বসনকে যেমন দেখেছিলেন উপন্যাসেও সেইভাবেই চিত্রিত করেছেন। ঝুমুর দলে এসেও নিতাই রুচিবোধকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। বিপক্ষ দলের কাছে তার পরাজয় হয়। রাগে ক্ষোভে দুঃখে বসন্ত তার গালে চড় মারে। অপমানের জ্বালায় নিতাই সেদিন প্রথম মদ খায়। সে তার শরীরের শিরায় শিরায় বীর বংশী উন্মত্ততা অনুভব করে। এবং আসরে অশ্লীল গান গেয়ে আসর জমিয়ে তোলে। তারপর বসন্তের ঘরে গিয়ে চরম উত্তেজনায় তাকে জড়িয়ে ধরে। ঘরে রাত যাপন করে। মাঝে মাঝে নিতাইয়ের মনে ঠাকুরঝির স্মৃতি ভেসে ওঠে। সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বসন্তকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে নিতাই। কিন্তু দেহব্যবসায় জড়িত থাকার ফলে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয় বসন্ত। দুরন্ত কালব্যাধি এসে বসন্তকে নিতাইয়ের জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ফলে ঝুমুর দল ত্যাগ করে নিতাই। বসন্ত ছিল তার কাছে পবিত্র গিরি শৃঙ্গের ঝর্ণার মতো । বসন্তের মধ্যে নিতাই খুঁজে পেয়েছিল আবহমানকালের এক শাশ্বত নারী প্রকৃতি। নিতাই যখন বসনকে হারায় তখন তার পুরো জগত সংসার ছোট হয়ে যায়। জগত তার কাছে তুচ্ছ হয়ে ওঠে। সে গেয়ে ওঠে -

"এই খেদ মোর মনে মনে,
ভালবেসে মিটল না আশ - কুলাল না
এ জীবন।
হয়! জীবন এত ছোট কেন!
এ ভুবনে?"
কিংবা –
সে বিনে প্রাণে বাঁচিনে - ভবনে ভুবনে রহি
কেমনে?
আমি যাব সেই পথে, যে পথ লাগে ভাল নয়নে।" [১৬]

এরপর ঝুমুরের দল দেশের পথ ধরল। **"নিতাই কোন পথে কোথায় যাইবে তা ঠিক করে নাই, তবে ওই দলটির সঙ্গে থাকিবে না তাহা ঠিক। কিন্তু সেই কারণেই দলের বন্ধন কাটাইবার অন্য একটা পথ ধরিল। কাটোয়া হইতে ছোট লাইন ধরিয়া ইহারা চলিল মল্লারপুরের দিকে। নিতাই বড় লাইন ধরিয়া উত্তরমুখে চলিল। শেষ মুহূর্তে ঠিক করিয়া ফেলিল সে কাশী যাইবে।"** [১৭] সে চঞ্চল অস্থির মন নিয়ে কাশীর দিকে চলে গেল। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ তার অনুকূলে ছিল না। নিতাইয়ের কবিগান কাশীবাসীদের মন মতো হয়নি। সে সময় তার প্রথম জীবনের বন্ধু রাজন, বিপ্রপদ ঠাকুর, ঠাকুরঝির কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে কিছুদিন কাটাবার পর মাতৃসমা এক বাঙালি মহিলার অনুরোধে সে ফিরে এল গ্রামে। গ্রামে ফিরে এসে বন্ধু রাজনের কাছে ঠাকুরঝির মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় নিতাই। নিজের মনের মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে। নিতাইয়ের আবারও জীবনকে ছোট জ্ঞান হল। নিতাইয়ের সামনে 'তখন কৃষ্ণচূড়া গাছ, যে গাছে মিশে আছে ঠাকুরঝি ও বসন্তের স্মৃতি।এই স্মৃতি ও না পাওয়ার অতৃপ্তি নিয়েই চলতে হয়েছে নিতাইকে। **"নিতাইয়ের জীবন বৃত্তের দুই অংশ— ঠাকুরঝি ও বসন নিজেরাই যেন নিতাইয়ের পটভূমি। ঠাকুরঝি ও বসন নিতাইয়ের কাছে জীবনের দুই রূপের সন্ধান দিয়েছে। ঠাকুরঝি ও বসন যেন দুটো পাখি— একজন খাঁচার শিকে মাথা কুটে নিঃশেষ, আর একজন উড়ে উড়ে নীড় খুঁজে পেল না"।** [১৮] আলোচ্য উপন্যাসে ঠাকুরঝি চরিত্রটি পূর্ণবিকশিত হওয়ার আগেই তারাশঙ্কর নির্মমভাবে যেন মাঝপথে তাকে একটু আড়ালেই রেখে

দিলেন। এর পশ্চাতে মনে হয় অন্য কারণ রয়েছে। আসলে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর প্রথমত তাঁর লেখা কবি গল্পকে উপন্যাসের রূপ দিতে গিয়ে নিতাতাইয়ের জীবনে অন্য নারীর (বসন্তের) আগমন ঘটানোর জন্য কিংবা প্রেমের বিশুদ্ধ রূপ দেখানোর জন্যই মনে হয় ঠাকুরঝিকে আড়ালে রেখেছেন । " তাহার প্রেম (নিতাই) পরস্পরের পিপাসাতৃপ্তির প্রেম নয়—সকল পিপাসা জয় করার প্রেম।) তাই সে ঠাকুরঝির প্রতি একটি অতিমধুর প্রীতির ব্যথায় উন্মাদ হইয়া উঠিলেও তাহার কল্যাণ কামনা করিয়া সে তাহাকে ফিরাইয়া দিল। সে বুঝিল, এ প্রেমের পরিণাম কি ; ……… ঐরূপ প্রেমের তুলনায় ধর্ম্মই বড় ঠাকুরঝির পক্ষে ঐরূপ প্রেমের পরিবর্তে গৃহধর্ম্মচারিণীর ব্রতই কল্যাণকর। ঠাকুরঝিকে সে তাহার নিজের প্রেম-শক্তির বলেই ত্যাগ করিল … ইহাই তাহার প্রথম পরীক্ষা। তাহার দেশবাসী সেই দেবতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, সে অতঃপর সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল, ইহার পর সে যে-অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ না দিয়া পারিল না, তাহাতেই এই কাহিনী জটিলতর ও গভীরতর হইতে পারিয়াছে—ছোট গল্পের নদীটি উপন্যাসের সাগরাভিমুখিনী হইয়াছে"। [১৯]

নিতাই সমাজের অস্পৃশ্যতার অভিশাপ অনুভব করেছে প্রিয়জন বসন্তের মৃত্যু উপলক্ষে। বসনের শবদাহ করে নিতাই – **"কিন্তু আশ্চর্যের কথা পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। এক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিল।"**[২০] একি সমাজের অস্পৃশ্যতার করুণ ও নির্মম ছবি নয়? এই ধরণের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেই উপন্যাসে বংশ বিরুদ্ধ চরিত্র নিতাই কবিয়াল সবসময় উচ্চাশা ও স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু নিতাইয়ের স্বভাব সুলভতা, বিবেক ও পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিস্থিতি সেই স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে তার কবি প্রতিভা পারিপার্শ্বিকতার জালে আটকে থাকে। কখনো বা নিজের ভুল সিদ্ধান্ত । যেমন - **"যে যে বড় বড় কবিয়ালদের সঙ্গে কবিগানের আসরে অংশ নিয়েছে তাতে তার সামাজিক সম্মান কিছুটা বেড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু ঝুমুর দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে উর্ধ্বমুখী বিকাশকে কিছুটা নিম্নমুখী করে ফেলেছে।"** [২১] আসলে ঝুমুর দলে নিতাই কবিয়ালের অন্তরের কবিয়াল সত্তাকে চেপে রেখে দলের চাহিদা অনুযায়ী গান রচনা ও গাওয়ায় ফলেই তার এই অবস্থা। একেও আমরা তার কবি হওয়ার যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নভঙ্গের একটা কারণ বলতেই পারি। তাই নিতাইকে কবি নিতাইয়ের থেকে মানুষ নিতাই বললে মনে হয় খুব ভুল হবে না।

আলোচ্য উপন্যাসে ঠাকুরঝি ও বসন্তের পাশাপাশি নির্মলা ,ললিতা , মাসি –সকল চরিত্রের মধ্যদিয়েই উপন্যাসের নায়ক নিতাইয়ের বিকাশ। উপন্যাসের শুরু অনুযায়ী মনে হতেই পারে নিতাই গৃহ ,জ্ঞাতি ও পরিবেশের উচ্চশিখরে মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। নিতাইয়ের মধ্যে বড় শিল্পী হওয়ার সমস্ত গুন থাকলেও কুল বিষয়ে তার যে হীনতাবোধ , তা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।যা তার রুচিতে আটকাত, তা সে করল ঘটনাচক্রের প্রভাবেই।সে মদ খেল ,পশুশক্তি জেগে উঠলো।যদিও নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছায় সে নিজেকে কখনো অতিক্রম করতে পারেনি ,যা তার ব্যক্তিত্বের একটি বড় পরিচয় ।শেষ পর্যন্ত নিতাই নিজের ভাগ্যকে মেনেই নিয়েছিল ।নিতাই ঠাকুরঝিকে ছাড়লো , আর বসন ছাড়লো নিতাইকে । কেউ কাউকে নিজের কাছে পেলো না । এই না পাওয়ার যে অতৃপ্তি এই তিনটি চরিত্রকেই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল । আর এই অতৃপ্তি নিয়েই নিতাইকে বেঁচে থাকতে হয়েছে ।তাই উপন্যাসে নিতাইয়ের শেষ বাণী- **'জীবন এত ছোট কেনে'?** আর এই ধ্রুব সত্য বাণী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জীবন নাট্যের শেষে বোধোদয় হয় । আসলে জীবন কী ? সারাজীবন ধরে মানুষ যা চায় , তা কী পায় ? আর না পেলেই বা কেমন লাগে ? সেই অতৃপ্তি , অন্তর্দ্বন্দ্ব , সামাজিক অস্পৃশ্যতা , সমাজের উচ্চবর্গীয় মানুষের অসহযোগিতা , ভুল সিদ্ধান্ত--- শুধু নিতাইয়ের স্বপ্নপূরনে বাধা সৃষ্টি করেনি, এমন অনেক নিতাই আমাদের চারপাশে ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিবেশে সংগ্রাম করে আজও বেঁচে আছে নতুন ভোরের স্বপ্নে ।

তথ্যসূত্র-

১/ বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ , বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং ,কলকাতা-৭০০০৭৩ পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর-২০০৩ পৃ- ২৫৬

২/বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার , বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা , মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা -৭০০০৭৩ , পুনর্মুদ্রণ ২০১১-১২ পৃ- ২৯৮

৩/ বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ , বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং , কলকাতা-৭০০০৭৩ পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর- ২০০৩ পৃ- ২৪৩

৪/ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , আমার সাহিত্য জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭ , পৃ- ১৮৯

৫/ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , আমার কালের কথা , তারাশঙ্কর রচনাবলী , দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: ,চতুর্থ মুদ্রণ - ১৪০০ , কলকাতা -৭০০০৭৩, পৃ-৪২২-২৩

৬/ মুখোপাধ্যায় ড দেবাশিষ , তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বাস্তবের নরনারী রুবী পাবলিশার্স , কলকাতা ৭০০০০৯ প্রথম প্রকাশ- ২০০৯ , পৃ- ১৬২
৭/ ঐ পৃ- ১৯৬
৮/বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , তারাশঙ্কর রচনাবলী , ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা -৭০০০৭৩, এপ্রিল -১৯৮৫ পৃ-৩
৯/ঐ পৃ-৮
১০/বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , কবি , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতাতা-৭০০০৭৩, এপ্রিল-২০২২ পৃ-১৩
১১/ ঐ পৃ-১৩
১২/বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , তারাশঙ্কর রচনাবলী , ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা -৭০০০৭৩, এপ্রিল -১৯৮৫ পৃ-৮
১৩/ ঐ পৃ-৩০
১৪/ঐ পৃ-৩৩
১৫/বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , কবি , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা -৭০০০৭৩, এপ্রিল-২০২২ পৃ-৬০
১৬/বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , তারাশঙ্কর রচনাবলী , ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা -৭০০০৭৩, এপ্রিল -১৯৮৫ পৃ-১২২
১৭/ঐ পৃ-১২৭
১৮/ বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ , বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং , কলকাতা-৭০০০৭৩ পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর-২০০৩ পৃ- ২৫৬
১৯/ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , কবি , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা-৭০০০৭৩, এপ্রিল-২০২২ পৃ- ভূমিকা অংশ ।
২০/ ঐ পৃ- ১৪৬
২১/ চক্রবর্তী বিপ্লব , তারাশঙ্কর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য পুস্তক বিপণি , কলকাতা -৭০০০০৯ এপ্রিল -১৯৯৯ পৃ ১০৮

সহায়ক গ্রন্থ-

১। মুখোপাধ্যায় ড. নিশীথ , তারাশঙ্করের কবি ,বামা পুস্তকালয় , কলকাতা- ৭০০০৭৩

....

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে মালো সম্প্রদায়ের জীবনবেদ

দেবলীনা বিশ্বাস
প্রাক্তনী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে মালো সম্প্রদায়ের জীবনকে সুদক্ষ শিল্পীর মতো এঁকেছেন ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ থেকে শুরু করে মালোদের সংস্কৃতি, সংস্কার, পূজাপার্বণ, বিনোদন, জীবিকা সবটাই ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। কি করে তিতাস নদীর পাড়ের মালোরা ধীরে ধীরে নব্য সভ্যতার করালগ্রাসে পড়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারাল, কি করে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ এসে মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন করে তুলল তা সুন্দর ভালে লিখেছেন লেখক। শেষে তিতাস নদীর বুক যেমন শুকিয়ে যায় তেমনি মালো পাড়া ধ্বংস হয়ে যায়, চারিদিকে ভেসে আসে নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস।

সূচক শব্দ :

মালো, তিতাস, নৌকা, নদী, জেলে, জাল, মাছ

মূল প্রবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি একটি কালজয়ী উপন্যাস রূপে স্থান দখল করে নিয়েছে। লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার রঙ মিশিয়ে উপন্যাসটি এঁকেছেন। বাংলায় নদীকে কেন্দ্র করে আরো উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসটি। এছাড়া তারাশঙ্করের ‘হাঁসুলী বাকের ইতিকথা’ অথবা সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসেও নদী একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। তবে এই উপন্যাসগুলি থেকে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটির স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে রয়েছে কারণ এখানে লেখক নিজে সরাসরি মালো সম্প্রদায় ভুক্ত তাই মালো সম্প্রদায়ের জীবনবেদ লেখার ক্ষেত্রে ওনার নিজের জীবন অভিজ্ঞতাই পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মালো সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য সম্পর্কে জানতে হলে সবার আগে আমাদের জানা দরকার মালোরা কারা এবং এদের উৎস কোথায়? মালো সম্প্রদায়কে বর্তমানে অনুন্নত পিছিয়ে পড়া জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও ‘মালো’ একটি প্রাচীন আর্যতর জাতি। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে মৎস্যগন্ধা সত্যবতী পরাশর মুনির আশীর্বাদে পদ্মগন্ধা নারীতে পরিণত হয় এবং পরবর্তী সময়ে রাজা শান্তনুকে বিবাহ করেন। কিন্তু সত্যবতী ও পরাশরের পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাস হলেন মহাভারতের পাণ্ডব ও কৌরবকুলের পিতা। কারণ ব্যাসের ঔরসজাত সন্তান হল ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু। অর্থাৎ ধীবর সম্প্রদায়ের একটি অংশ হল মালো সুতরাং ব্যাসদেবের রক্তে যে ধীবর সম্প্রদায়ের রক্ত মিশে রয়েছে তা সর্বজন স্বীকৃত। মালো মানে আরবিতে ‘নৌকাওয়ালা’। এই সম্প্রদায়ের মানুষরা নৌকা করে জালের সাহায্যে নদীতে মাছ ধরে, এটাই এদের জীবন ও জীবিকা। এরা মূলত বঙ্গোপসাগর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের নদীতে মাছ ধরে জীবন নির্বাহ করে। মালোদের জীবনের গতি নদীর স্রোতের সাথে বয়ে চলে, জীবনের যাবতীয় ওঠানামা, আচার-অনুষ্ঠান সবটাই নদীকেন্দ্রিক।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম অবিভক্ত ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের গোকর্ণগ্রামে, যা বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত। যেহেতু জন্মসূত্রেই তিনি তিতাস নদীর সাথে একাত্ম ছিলেন তাই এর প্রভাব সম্পূর্ণভাবে তাঁর লেখাতে পড়েছে। এই একটিমাত্র উপন্যাসের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এই মালোদের বাসস্থান মালোপাড়াকে সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষরা ‘খাবরপাড়া’ বলতেন এবং যথাসম্ভব মালোদের প্রভাব এড়িয়ে চলতেন। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে মালোপাড়ার মালোদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ থেকে শুরু করে যাবতীয় জীবনবেদ লিখে রেখেছেন লেখক। জন্মের ঠাসা বুনোট বুনে রেখেছেন মালোজীবনের বহতা। নদী যে মানুষের জীবনের ভাগ্য নির্ধারক এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে তা এই উপন্যাস না পড়লে বোঝা সম্ভব হতো না। নদীর যেমন বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রূপ দেখা যায়, মানুষের জীবনও অনেকটা সেই রকম, নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে করতে জীবন একসময় মোহনায় এসে মিলিত হয়।

সমগ্র উপন্যাসটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের বা পর্বের আবার দুটি উপপর্ব। প্রথমটির নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' অন্যটি হল 'প্রবাস খণ্ড'। দ্বিতীয় পর্বটি আবার দুটি খণ্ডে বিভক্ত যথা- নয়াবসত এবং জন্ম মৃত্যু বিবাহ। তৃতীয় অংশটিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, প্রথম খণ্ড রামধনু এবং দ্বিতীয় খণ্ড হল রাঙা নাও। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের সর্বশেষ পর্বটিই দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম দুরতা প্রজাপতি এবং শেষ অংশের নাম ভাসমান। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক জীবন ও নদীকে একাকার করে দিয়েছেন। লেখক বলেছেন— "তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুক ভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে যে বহিয়া যায়।"[১]

অর্থাৎ প্রথমেই লেখক তিতাস নদীকে একটি জীবন্ত চরিত্র হিসেবে আমাদের সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বছরের বারো মাসে বিভিন্ন ঋতুতে তিতাস ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তিতাস সম্পর্কে লেখক বলেছেন তিতাস হল মাঝারী নদী, পদ্মা বা মেঘনার মতো প্রকাণ্ড বিশালতা তিতাসের নেই। লেখকের ভাষায়— "তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই। কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।"[২] এই তিতাসের পাড়ের মানুষগুলোর জীবনও সরলতায় গাঁথা, যেখানে কোনো জটিলতা, কুটিলতা নেই। নদীর স্বতঃস্ফূর্ত স্রোতের মতোই বয়ে যায় তাদের জীবন।

তিতাস বর্ষায় প্লাবিত হয়, দুকূল ছেপে জল থই থই করে আবার জল কমলে বাঁশের সাঁকো দিয়ে মানুষ পারাপার করে। মানুষ স্নান করে, গা ধোয়। আবার শীতকালে কষ্ট বাড়ে কারণ নদীর জল একদম কমে আসে, চৈত্রের দাবদাহে নদীর বুক শুকিয়ে খাঁ খাঁ করে, জেলেরা যতটুকু মাছ পেত তাও সবার অধরা হয়ে যায়। আমাদের জীবনও তো ঠিক এইরকম যৌবনে যেন দুকূল ছাপিয়ে বন্যা আসে আর শীতের রুক্ষতায় আর জ্যৈষ্ঠের শুষ্কতায় সব জীর্ণ হয়ে যায়। উপন্যাসে নিটোল কাহিনির বুনোটের অন্তরালে মালোপাড়ার মানুষদের জীবনালেখ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে কারণ মালোদের যেন জীবনটাই বাধা হয়েছে নদীর সাথে। জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই মালোরা নদী দেখে আসলে নদীর সাথে আত্মীয়তা তাদের মজ্জাগত। আসলে এই নদীর মাতাই তো মালোদের জীবনের রসদ, তাদের খোরাকের জোগানদার। শুধু কি তাই মালোদের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, আচার, অনুষ্ঠান সবকিছুই তো নদীকে ঘিরে। নদী ছাড়া মালোদের অবস্থা জল ছাড়া মাছের মতো। লেখক তাই লিখেছেন— "তাদের দিনে রাতের সাথী বলতে এই নদী, এই মনের অলিতে গলিতে তাদের আবার পথচলা। এর নাড়ি নক্ষত্র তাদের নখদর্পণে। কাজেই স্রোতের একটুখানি আড় টিপিরাই বুঝিতে পারে কোথায় এর ব্যাধি ঢুকিয়াছে। বুঝিতে পারে এর বুকের কাছেই কোথাও খুব বড় একটা চড় আসিয়াছে।"[৩]

এই উপন্যাসে লেখক বলেছেন তিতাস নদী তেমন এটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে না কারণ এই নদীর তীরে মোঘল পাঠানের মহাযুদ্ধ হয়নি আবার ব্রিটিশ স্থাপত্যের কোনো কালজয়ী চিত্র এখানে ফুটে ওঠেনি। এই নদী তাই অবহেলিত এবং অনাদৃত। এই অবহেলিত নদীর চির অবহেলিত বাসিন্দা হল মালো সম্প্রদায় 'এই মালো সম্প্রদায়ের কাছে কিন্তু তিতাস অবহেলিত নয় বরং পরম শান্তির আশ্রয়। মেঘনা অথবা পদ্মার মতো বড় নদী তিতাস নয় তাই তিতাসকে নিয়ে আতঙ্কের অবকাশ নেই! বড় নদীতে যেমন বড় বড় ঝড় হয় তেমন কিন্তু তিতাসে হয় না। সেই কারণেই অনেক রাতে অথবা কালবৈশাখীর দিনে তিতাসে মাছ ধরতে গেলে বাড়ির লোকেরা চিন্তা করে না। উপন্যাসিক এই স্বস্তির বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন— "তিতাস কত শান্ত, তিতাসের বুকে ঝড় তুফানের রাতেও স্বামী-পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বউরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে। মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্ত মনে মাছ ভরা জাল গুটাইতেছে।"[৪] এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে মালো সম্প্রদায়ের জীবনে তিতাস নদী কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিতাস নদী চলতে চলতে এক জায়গায় ধনুকের মতে বাঁক নিয়েছে; সেই বাঁক থেকেই গ্রামের শুরু হয়েছে আর সেই গ্রামের দক্ষিণ পাড়াতেই রয়েছে মালোদের বাস। একজন স্রষ্টা যেমন নিজের মন, মনন, বোধ, অভিজ্ঞতা দিয়ে সৃষ্টি করেন তেমনই অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন এই উপন্যাস লেখার সময়। ওনার নিজের জীবনের প্রথম কুড়ি বছর মালোপাড়ায় কেটেছিল তাই ওনার উপন্যাসে মালো সম্প্রদায়ের জীবনযাপন যেভাবে উঠে এসেছে তা এর আগের কোনো উপন্যাসে দেখা যায়নি। মালো জনজাতির পূজা-পার্বণ, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব অনুষ্ঠান গান বাজনা, ক্রীড়া ভাষা প্রায় সবটাই তিনি তুলে ধরেছেন উপন্যাসের মধ্যে। তিতাসের ঘাটে নৌকা বাঁধা, মাটিতে জাল ছড়ানো, উঠানের কোণে গাবের মটকি, প্রতিটি ঘরে চরকি, টেকো, সুতা কাটার তকলি, জাল বোনার সরঞ্জাম— এসব হল মালোদের সম্পত্তি। মালোদের সামাজিক

গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে মালোদের এই সম্পত্তির ওপরে। মালোদের যা কিছু অস্তিত্ব টিকে থাকে এই সব জিনিসের জন্য। মালোরা আর্থিক ভাবে দরিদ্র হতে পারে কিন্তু নিজেদের সংস্কৃতি, আচার, অনুষ্ঠানকে ধারণ করে রেখেছে। মালোরা কখনও নিজেদের শিকড়কে অস্বীকার করেনি। কোনো জনজাতির সংস্কৃতির বিসর্জন মানে নিজেদের অস্তিত্বের সংকটকে ডেকে আনা। এই মালোরা সব সময় নিজেদের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করেছে। এই উপন্যাসের প্রথমদিকেই রয়েছে মালোর মেয়ে বাসন্তীর মাঘ মণ্ডলের ব্রত-এর কথা। মালো সম্প্রদায়ের কুমারী মেয়েরা মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত করে যাচ্ছে। মালোপাড়ার কুমারী মেয়েরা কখনো অরক্ষণীয়া হয় না। এর থেকে বোঝা যায় যে অনেক কম বয়সে মালো মেয়েদের পাত্রস্থ করে দেওয়া হয়। এই সময়টিকে উপন্যাসিক খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন— "এ পাড়ার কুমারীরা কোনোকালে অরক্ষণীয়া হয় না। তাদের বুকের উপর ঢেউ জাগিবার আগে, মন যখন থাকে খেলার খেয়ালে রঙিন, তখনই একদিন ঢোল সানাই বাজাইয়া তাদের বিবাহ হইয়া যায়। তবু এই বিবাহের জন্য তারা দলে দলে মাঘ মণ্ডলের পূজা করে।"[৫]

মাঘ মণ্ডলের ব্রতের সময় মালোপাড়া উৎসবের মতো সেজে ওঠে। চারিদিকে ঘাট গুলো সেজে ওঠে। মালোপাড়ার নারীরা গান গায়, ঢোল সানাই বেজে ওঠে। মালোর কুমারী মেয়েরা নতুন শাড়ি পড়ে, তেল জবজবে মাথায় চিত্র বিচিত্র চৌয়ারি তুলে নিয়ে এসে তিতাসের বুকে ভাসিয়ে দিত, এই চৌয়ারি ভাসিয়ে দেওয়ার পর ছেলেরা সেটিকে ধরার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। উপন্যাসের শুরুতেই মাঘ মণ্ডলের ব্রতের কথা বলতে গিয়ে লেখক আমাদের উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, দীননাথ মালোর কুমারী মেয়ে বাসন্তী এবং তার চৌয়ারী বানিয়ে দিয়েছিল দুই বন্ধু কিশোর ও সুবল। তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের সমগ্র ঘটনা, মালোদের জীবনপ্রবাহ আবর্তিত হয় এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে।

প্রবাস খণ্ডে দেখা যায় মালোপাড়ার দুজন আশৈশব বন্ধু সুবল ও কিশোর মাছ ধরার জন্য উত্তরে রওনা হল। কিশোরের নৌকার যাত্রী হল তিনজন। কিশোর, সুবল এবং প্রবীণ জেলে তিলকচাঁদ। তারা সকলে রওনা হল শুকদেবপুর গ্রামের উজানিনগরের খলার উদ্দেশ্যে। সেই গ্রামের মোড়ল ছিল বাঁশিরাম মোড়ল। ওদের এই নৌকা যাত্রার পথে অনেক ছোট ছোট জিনিস চোখে পড়ে যা মালো জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভৈরবের ঘাটে এসে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মালো জনজাতির কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। যেমন— "এখানে কয়েক ঘর মালো থাকে। ঘাটে খুঁটি বাঁধা কয়েকটি নৌকা, পাড়ে বাঁশের উপর ছড়াইয়া দেওয়া কয়েকটি জাল। এখানে সেখানে মাটিতে কালো চারকোনা গর্তে গাবের দাগ, মাঝে গাবের মটকি গামলা বেতের ঝুড়ি- দেখিলেই চেনা যায় এখানে মালোরা থাকে।"[৬] এই উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বার বার লেখার মাধ্যমে মালোদের জীবন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিশোর জেলে হলেও তার মধ্যে একটি প্রেমিক মন দয়ালু মন সব সময় উঁকি দিতে চাইত। সেই কারণেও নৌকোয় চলতে চলতে নদীর উদার রূপ দেখে যে গান গেয়ে ওঠে।

"উত্তরের জমিনেরে সোনা বন্ধু হাল চষে
লাঙ্গলে বাজিয়া ওঠে খুয়া
দক্ষিণা মলয়ার রায় চান্দ মুখ সুখাইয়া যায়
তার ঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া।"[৭]

এই প্রবাস খণ্ডেই বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে থাকার সময় কিশোর ভালোবেসে ফেলে এক মেয়েকে, সকলের সম্মতিতে তাদের মালাবদল করে বিয়ে হয় এবং কিশোর দীর্ঘ প্রবাস কাটিয়ে নতুন বউ নিয়ে নিজের গ্রামে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা হয় কিন্তু ঘটনার ট্র্যাজিক মোড় আসে যখন নৌকার ভেতর থেকে ডাকাতরা যাবতীয় টাকাপয়সা সহ নতুন বউকে হরণ করে নিয়ে যায়। এই শোক কিশোর সহ্য করতে পারে না এবং সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যায়।

সার্থক জীবনশিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে মালোদের জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত যেমন দেখিয়েছেন তেমনই দেখিয়েছেন মানবমনের নানা জটিলতা, প্রেম-বিরহ। উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে লেখক দেখিয়েছেন নয়া বসত এবং জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ। নয়া বসত অংশ পড়তে গিয়ে আমরা মালো সমাজের অনেক কুসংস্কার নিয়ম নীতির কথা জানতে পারি। এখানে দেখা যায় অনন্তর মা তার ছোট ছেলেকে নিয়ে কিশোরদের গ্রামে থাকতে এসেছে। এই অনন্তর মা-ই যে কিশোরের হারিয়ে যাওয়া বউ তা কেউ জানতো না। এদিকে অনন্তর মা-এর কিছু মনে নেই ঐ গাঁ-এর নাম ছাড়া। এমনকি কিশোরের নামও সে ভুলে গিয়েছে। অনন্তর মা আসার পর মালোপাড়া কিন্তু তাকে

আশ্রয় দিল। মালোপাড়ার সম্ভ্রান্ত গিন্নি কালোর মা কম দামে জমি নিল অনন্তর মাকে। আর সব মালোরা মিলে মহা আনন্দে তাদের ঘর বানিয়ে দিল।

এই অংশে মালো মহিলাদের কিছু স্বভাব চোখে পড়ে যেমন পান, তামাক, হুক্কা, কলকি এসব মালো মহিলাদের কাছে অবশ্যই থাকতো, এছাড়া মালো নারীরা কিছু কু-সংস্কারে আবদ্ধ ছিল, যা বেশ মজার। এক নারী পানকে বলে বটপাতা কারণ তার শ্বশুরের নাম পাণ্ডব, শ্বশুরের নাম মুখে আনতে হয় না জন্য সে এই বিকল্প নাম রেখেছে। এছাড়া মালোদের মধ্যে ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র তুমড়ি খেলা এসব প্রচলিত ছিল।

ঘটনা চক্রে কিন্তু সেই বাসন্তীর সাথে অনন্তর মায়ের সাক্ষাত হল। এই সাক্ষাতের লগ্নটিও লেখক খুব সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন— "হরিণী যেমন নিজের কস্তূরীর গন্ধ অনুভব করে, সবুলার বউয়ের আবির্ভাব অনন্তের মা তেমনি করিয়া অনুভব করিল। জেলে রমণীর ঘরে থাকিবে কাটা=আ-কাটা এক আধখানা অসমাপ্ত জাল, আর সুতাকাটার জাল বোনার নানা কিসিমের সরঞ্জাম এই যদি না রহিল তো জেলেনির ঘরে আর কায়স্থিনীর ঘরে আর তফাৎ রহিল কোথায়।"[৮]

নয়া বসত অংশে মালোপাড়ার আর একটি জিনিষ চোখে পড়ে তা হল- 'দশজনের বিচার'। গ্রামের মাতব্বরেরা মিলে গ্রামে কোথায় কি হচ্ছে, গ্রামে নতুন কে আসল, কে কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে তা সমস্তটাই ঠিক করত। তিতাসের মালিক জেলেরা হলেও কাগজপত্রের মালিক ছিল আগরতলার রাজারা আর মাছ ধরার মালিক ছিল জেলেরা।

"জন্ম মৃত্যু বিবাহ তিন ব্যাপারেই মালোরা পয়সা খরচ করে, পাড়াতে ধুমধাম হয়।"[৯]

এই অংশে মালোদের পার্বণ, আচার অনুষ্ঠানের সুন্দর চিত্র এঁকেছেন লেখক। অন্নপ্রাশনের সময় মালো নারীরা জোগাড় দেয়। সেই জোগাড় দেওয়ারও নিয়ম আছে। লেখক লিখেছেন— "ছাইলা হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়"[১০] আবার সন্তান জন্মানোর ছয়দিনের মাথায় ঘরে দোয়াত কলম রাখা হয় এই বিশ্বাসে যে সেই কলম দিয়ে চিত্রগুপ্ত বাচ্চার ভাগ্য লিখবে। অষ্টম দিনে আট-কালাই, সেদিন পাড়ার বাচ্চাদের খাওয়ানোর রীতি রয়েছে। তেরদিন পর সন্তান জন্মের অশৌচ কেটে যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানেও মালোরা ভীষণ আনন্দ করে। গান বাজনার মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়। কালীপূজার সময় মালোপাড়াতে উৎসবের ঢল নামে। বাইরে থেকে শিল্পী এসে মূর্তি বানায়। উৎসবের সময় মালোপাড়াতে সারাদিন কবিগান আর রাতে যাত্রাগান হয়। মালোরা কালীপূজো খুব বড় করে করলেও খাওয়া-দাওয়াতে টাকা খরচ করে উত্তরয়ন সংক্রান্তির দিনে মানে পৌষ মাসের শেষ দিনে।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের শুরুতেই দেখানো হয়েছে কিশোর আর সুবলের প্রবাস যাত্রা। কিশোরের বিয়ে এবং বিয়ের পর বউ হারিয়ে যাওয়া। তারপর কিশোর পাগল হয়। কয়েক বছর পর কিশোরের গ্রামেই বাস করতে আসে অনন্তর মা আর অনন্ত। এই অনন্ত আর কেউ না কিশোরের ঔরসজাত সন্তান। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে বাপ থাকতেও অনন্ত পিতৃ পরিচয়হীন ভাবে বেড়ে ওঠে। শেষে মা এবং বাবা ভয়কেই হারিয়ে অনন্ত অনাথ হয়। উপন্যাসের পরবর্তী কাহিনির গতি সেই অনন্তকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, এই অনন্ত যেন ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের সত্তা হয়ে উঠেছে। অনন্তের বড় হওয়ার সাথে সাথে মালোপাড়াতেও অনেক পরিবর্তন আসে এবং সব শেষে একদিন মালোপাড়া অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

জন্মালে মরতে হবে এই সহজ সত্যিটা মালোরা বিশ্বাস করে আর সেই জন্যই মৃত্যুকে ভয় করে না। আসলে জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেই প্রতি রাতে মালোদের নদীর বুকে ঝাঁপ দিতে হয়। মালো জীবনে সে প্রতিনিয়ত মৃত্যু থাবা বসায় তা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসেও দেখা যায়। ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করে মালোদের জীবন কাটাতে হয়। তাই তাদের জীবন সংশয় কোনদিন শেষ হয় না। বিয়ের আনন্দ যেমন তাদের মনকে রঙিন কর তোলে তেমনই বেশির ভাগ বিয়ের পরিণতি এক অনন্ত দুঃখ বয়ে আনে।

তিতাস পাড়ের মালো সম্প্রদায় কিন্তু সহজ-সরল, অহংকার বর্জিত। তাদের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন আছে, তবুও সভ্যতার ফসল, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা তাদের হৃদয় থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তার পরেও উচ্চ বর্ণের মানুষের চাইতে মনের সম্পত্তিতে তারা অনেক বেশি ধনী তার প্রমাণ দেয় বাসন্তী, উদয়তারা, জমিলা, কাদির, অনন্তবালা চরিত্রেরা। এই চরিত্রগুলি আছে জন্যই বোঝা যায় মালো সম্প্রদায়ের জীবনের মূল সুর হল মানবতার জয়গান। প্রথম যখন অনন্তর মা মালোপাড়ায় আসল তখন মালোরা কীভাবে তাকে আপন করে নিল তার বর্ণনাতেই বোঝা যায় মালোদের মনের উদারতা-

"এ গাঁয়ে একজন নতুন বাসিন্দা আসিয়াছে। খবরটা যারাই পাইল তারাই খুশি হইল। মালোপাড়ার সবচেয়ে যে ধনী ছিল, তারই গিন্নি কালোর মা ছেলেদের বলিয়া একখানা পোড়া ভিটি কমদামে ছাড়িয়া দিল, ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করিয়া তার আগাছা সাফ করিল, তারপর পাড়ার পাঁচজনে মিলিয়া তার উপর একখানা ঘর তুলিয়া দিল।"[১১]

সারা পৃথিবী যখন শোষক আর শোষিতের সম্পর্কে জেরবার তখন মালোপাড়াও ব্যতিক্রম ছিল না। সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা ধীরে ধীরে মালোপাড়ায় এসে মালোদের বিশুদ্ধ সংস্কৃতি গ্রাস করতে শুরু করলো। আসলে মালোদেরকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা অদৃশ্য মনে করতো। মালোপাড়ার মধ্যে একমাত্র তামসীর বাপ বামুন কায়েতের সাথে সম্পর্ক রাখত। কিন্তু এই তামসীর বাপও মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবত। ঔপন্যাসিকের ভাষায়— "তামসীর বাপের কানে এসকল কথা ঢুকিতেছিল না। সে নিজের কথা ভাবিতেছিল। এই বৈঠকে তার কথাও উঠবে। মনে মনে সে নিজেকে অপরাধী স্থির করিয়া রাখিল। সত্যই ত পাড়ার মধ্যে ঐক্য রাখা ও পাড়ার স্বার্থ দেখাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। তারা আমারকে? তারা মালোদের ঘরে নেয় না, মালোরা কোনো জিনিষ ছুঁইলে সে জিনিস তারা অপবিত্র মনে করে। পূজাপার্বণে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইয়ে এঁটো পাতা নিজে ফেলিয়া আসিতে হয়। সে পাতা ওরা ছোঁয় না, জাত যাইবে। এরা মালোদের কত ঘৃণা করে। মালোরা লেখাপড়া জানে না। তাদের মতো ধুতি-চাদর পরিয়া জুতা পায়ে দিয়ে বেড়ায় না, কিন্তু তাই বলিয়া কি তারা ছোঁয়ারও অযোগ্য? মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে?"[১২]

এই উক্তি থেকে মালোদের সামাজিক অবস্থান খুব ভালো ভাবে বোঝা যায়। মালোদের মধ্যে সত্যি পড়াশোনা বা স্কুলে যাওয়ার চল ছিল না। লেখকের ভাষায়— 'আর ইস্কুল। মালোরা পুলকে বাঁচে না, তারা দিব ইস্কুল।' পড়াশোনা না জানলেও মালোরা নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। রামপ্রসাদ, বাহারুল্লা সবাই মিলে জারিগানের আসর জমিয়ে নাচ গান করতো। কিন্তু নাগরিক সভ্যতার করালগ্রাস থেকে শেষপর্যন্ত মালোরা নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে পারেনি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে দেখা যায় মালো সংস্কৃতি শেষপর্যন্ত কৌমার্য হারায়। উচ্চবর্ণের মানুষরা নানা কৌশলে মালোদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নেয়। মালোরা ছিল অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, উচ্চবর্ণের মানুষেরা মালোদের টাকা ধার দিয়ে সুদের জালে জড়িয়ে ফেলে। মালোরা ঐক্যবদ্ধ ছিল কিন্তু বামন কায়েতরা এসে এদের নিজেদের মধ্যে ফাটল তৈরি করে দিল। নাগরিক সমাজের নানা নেশায় জর্জরিত হয়ে উঠল মালো সমাজ। সরলতার রসে জারিত ছিল মালো সম্প্রদায়ের জীবন কিন্তু ধীরে ধীরে সেখানে নাগরিক সভ্যতার বিষাক্ত দংশন প্রবেশ করে সব ধ্বংস করে দিল। যাত্রাদলের গান এসে মালোদের নিজস্ব জারিগান, মালোদের সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করল। মালো ছেলেরা হুঁকা ছেড়ে সিগারেট ধরল। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি থাকল না। এদিকে দেনার দায়ে জড়িয়ে মালোদের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল।

একদিকে সামাজিক পালাবদল যেমন শুরু হয়েছিল তেমনই প্রাকৃতিক পট পরিবর্তনও শুরু হয়ে গেল। প্রকৃতির পরিবর্তন স্বরূপ তিতাসের বুকে চর জেগে উঠল। এই চর দখল করা নিয়েও মালোদের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। কিন্তু যুগে যুগে প্রমাণিত যে জোর যার মুলুক তার, উচ্চবর্ণের শক্তির কাছে মালোরা হেরে গেল এবং যারা বিত্তবান মাটি তাদের দখলেই থাকল। তিতাস নদী মালো সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তিতাসের জল শুকিয়ে গেলে মালোদের অবস্থা জলবিহীন মাছের মতো হয়ে গেল। মালোদের তখন মৃত্যুর অপেক্ষা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকল না।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় পেটের দায়ে মালোরা বিকল্প জীবিকার সন্ধানে বের হয়। উপন্যাসিক লিখেছেন— "অনেক মালো পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যারা আগেই গিয়াছে তারা ঘরদুয়ার, জিনিসপত্র ফেলিয়াই গিয়াছে। তারা কোথায় গেল যাহারা রহিয়া গিয়াছে তারা জানিতেও পারিল না। তারা কতক গিয়াছে ধানকাটায়, কতক গিয়াছে বড় নদীর পাড়ে। সেখানে বড় লোকেরা মাছ ধরার বড় রকমের আয়োজন করিয়াছে। মালোরা সেখানে খাইতে পাইবে আর নদীতে তাদের হইয়া মাছ ধরিয়া দিবে।"[১৩]

উপন্যাসের শুরুতে প্রাণোচ্ছল যে মালোপাড়ার চিত্র লেখক এঁকেছিল, উপন্যাসের শেষে এসে সেই চিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। দরিদ্র, লাঞ্ছিত, অস্পৃশ্য মালো সমাজের জীবনবেদ লিখতে গিয়ে তাঁদের মর্মবেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, শোষণ সর্বজনবিদিত, সেই অত্যাচার অথবা নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে ধীরে ধীরে তিতাস নদীর শুকিয়ে যাওয়ার মতো মালো সম্প্রদায়ের জীবনরসও শুকিয়ে গিয়ে জেগে উঠেছে মৃতের বালুচর। উপন্যাসের একদম শেষে তাই লেখক বলেছেন— "ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। চরে আর একটিও ধান গাছ নেই। সেখানে এখন বর্ষার সাঁতার জল। চাহিলে কারো মনেই হৈবে না যে এখানে একটা চর ছিল। জল থই থই করিতেছে যতদূর চোখ যায় কেবল জল, দক্ষিণের সেই সুদূর হইতে ঢেউ উঠিয়া সে ঢেউ এখন

মালোপাড়ার মাটিতে আসিয়া-লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু এখন যে মালোপাড়ার কেবল মাটিই আছে, সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে, তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি নিঃশ্বাস ফেলে।”[১৪]

তথ্যসূত্র :

১. তিতাস একটি নদীর নাম, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৮, মলয় প্রকাশনী,
রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ. ১১

২. তদেব, পৃ. ১২

৩. অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র, সম্পাদনা- অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০০, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪০২

৪. তিতাস একটি নদীর নাম, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৮, মলয় প্রকাশনী, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ. ১৬

৫. তদেব, পৃ. ১৫

৬. তদেব, পৃ. ৩১

৭. তদেব, পৃ. ৩৩

৮. তদেব, পৃ. ৮০

৯. তদেব, পৃ. ৯৯

১০. তদেব, পৃ. ১০০

১১. তদেব, পৃ. ৭৬

১২. তদেব, পৃ. ৮৯

১৩. তদেব, পৃ. ২৫২

১৪. তদেব, পৃ. ২৫৬

………………………………………………

মতি নন্দীর 'কোনি' - প্রত্যয় ও প্রাণশক্তির আশ্চর্য ঐকতান

ড. অচিন্ত্য মাজী
সহকারী অধ্যাপক, চিত্ত মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ জার্গো, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ-

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মতি নন্দী এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। মতি নন্দীর উপন্যাস সত্তা সামাজিক সম্পর্কগুলোকে আত্মস্থ করে সেই সম্পর্কের বহুগামী ও বহুমাত্রিক সুরটিকে ধরার চেষ্টায় আত্মনিয়োজিত। মতি নন্দীর উপন্যাসে তাই আমরা লক্ষ্য করি ঘটনার স্রোতের অন্তরালে কোনো একক প্রাণের আত্মবীক্ষা, সময়ের স্রোতে সফেন হওয়া কোনো চরিত্রের অন্তরিন লড়াই। জীবনের চলার পথে এই লড়াই তার অঙ্গীকার নিয়ে নির্মাণ করে মানবিকতার প্রকৃত উদ্ভাস। মতি নন্দী অঙ্গীকারের এই আদলটিকে আঁকেন সততার মন্ত্রে, জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া নাবিক যখন চারপাশের উতরোল ঢেউয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সততার ভেতরকার ওমে সে পায় ভিন্ন শপথ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সমাজের শিরদাঁড়া যখন ক্ষয়িষ্ণু, পরিবারের কেন্দ্রে যখন চিড় ধরেছে তখন মতি নন্দী ঘুণধরা দেওয়ালটিকে আপন প্রাণের বলিষ্ঠতা দিয়ে সুস্থতার প্রলেপ দিলেন। আমাদের আলোচ্য 'কোনি' উপন্যাসটি এই প্রেক্ষাপটেরই ফসল যেখানে কোনঠাসা কোনি বিধ্বস্ত কোনি গুরু ক্ষিতিশের সাহায্যে খুঁজে পায় ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি, পায় নিজেকে জাগানোর সাহস। নামহীন পরিচয়হীন অভাবী কোনির পাশে দাঁড়ানোর জন্য ক্ষিতিশকেও সহ্য করতে হয় অপমান আর লাঞ্ছনা। কিন্তু কোনো বিপর্যয় আর বিরোধিতা এদেরকে টলাতে পারেনি। সায়াহ্নের আলতো শিখাটির কোমলতা হয়ে রচনা করেছে এদের স্পর্ধার ইতিহাস। আমরা এই প্রত্যয়, এই অভিযাত্রাকে সন্ধানে ব্রতী হয়েছি এই আলোচনায়।

সূচক শব্দ

মতি নন্দীর উপন্যাস, কোনির আত্মবীক্ষণ, ক্ষিতিশের সংহতি, প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই

মূল প্রবন্ধ

খুব গভীর এক আত্মবীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা এক প্রাণ যার প্রতিটি উন্মোচনের ভেতর ধরা থাকে বির্বতনের ক্রম অগ্রসরমান পথে চৈতন্যের ভিন্ন নির্মাণ এবং এই জাগরণ গড়তে থাকে মানব অস্মিতাকে, মননের মধু আর ব্যাক্তিত্বের ইন্দ্রজালকে। উপন্যাসিক মতি নন্দীর উপন্যাস পাঠে আমাদের এই কথা মনে পড়ে। দেখতে পাই ভেঙে যাওয়া দুমড়ে যাওয়া বাঙালির ক্ষয়িষ্ণু সত্তার বিচিত্র ঘরানা, আবিষ্কার করি মধ্যবিত্ত আত্মার পরিকাঠামোয় কোনো অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হাওয়া এক অভিযাত্রিকের শপথের দিকে। মতি নন্দী এই দার্শনিক বোধে আমাদের নিয়ে যান। তিনি আমাদের বোধের বিশ্লেষণ করেন, ভেঙে যাওয়া মূল্যবোধগুলির সংকুচিত ক্ষয়ের ভেতর প্রত্যয়ের গোপন প্রবাহকে চালিত করেন। এবং এই প্রবাহে মিশে থাকে খেলার একটি প্রসঙ্গ। কেননা সংগ্রামের ভেতরে শপথের রূপরেখা, শ্রমের দুর্নিবার আবেগে প্রত্যয়ের স্পন্দনকে শোনা আর সমস্ত বিরোধের মাঝখানে একাগ্রতার দ্যুতি যেভাবে ম্রিয়মাণ চৈতন্যকে খুব গভীরভাবে দোলা দেয় তার প্রকাশের সৌন্দর্য আদি ও অকৃত্রিম। তাই ক্রীড়ার একটি ভূমিকা তাঁর উপন্যাসে নিবিড় হয়ে ধরা দেয়, ক্রীড়াকে ঘিরেই আবর্তিত হয়ে ওঠে অসুন্দরের মাঝে সুন্দরকে জাগানোর অন্যতম অভিজ্ঞান।

মতি নন্দীর উপন্যাসিক হিসেবে আবির্ভাব স্বাধীনতা লাভের পরে। তখনও একটি দেশের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে ওঠেনি। পরাধীনতার গ্লানি আর জীর্ণতা তখনও মুছে যায়নি। শুরু হয়েছিল সমাজ ও জীবনে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। একইসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা লাভ, আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং ভারতকে ভেঙে দুটুকরো করে দেওয়া- এই অন্তর্গত বিভাজনের শরিক থাকলেন শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা। দেশভাগের ক্ষত সিগারেটের ছ্যাঁকার মতোই জ্বালা দিতে লাগলো ভারতীয়দের। অন্যদিকে 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে স্রোতের মতো লক্ষ লক্ষ উদ্‌বাস্তুর আগমন এ রাজ্যকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি করে তুলল। শুরু হল হরতাল, মিছিল, ধর্মঘট, বিক্ষোভ, আন্দোলন, কালোবাজারিদের ভুঁড়িফোলা। এই টালমাটাল নাভিশ্বাস অবস্থা থেকেই জন্ম নিল নবীন

জীবনবোধ। দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব জীবনে নিয়ে আসে অসহনীয় বিড়ম্বনা। অন্যদিকে সামাজিক অচলায়তনকে গতিদান করার লক্ষ্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যেমন হিন্দু কোড বিলের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের সমান অধিকার, বিয়ের বয়স নূন্যতম আঠারো নির্ধারণ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ নিরোধ, হিন্দু ম্যারেজ আক্ট (১৯৫৪) ও অস্পৃশতা বিরোধী আইন পাশ ইত্যাদি।

একদিকে সমাজ পরিবর্তন অন্যদিকে সমাজ জীবনের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ এ দুয়ের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের চলার পথটিকে খুঁজে নিলেন। মতি নন্দী যেমন এই বিক্ষোভ কে, অন্তর্গত সমাজের আলোড়নকে শিল্পে ধরেছিলেন তেমনি মধ্যবিত্ত বাঙালির সত্তার রূপ ও নানামাত্রিক বিভাজনকে তিনি তুলে এনেছেন। অশ্রুকুমার সিকদারের মতে " এখানে এমন এক জগতে আমরা প্রবেশ করি যেখানে বিশ্বের আলোক লুপ্ত হয়ে গেছে – হিংস্র রাত্রি সব কিছুকে আকীর্ণ করে ফেলছে; পৃথিবীতে এক অদ্ভুত আঁধার এসেছে, যখন সততা মহত্ত্ব মানবিকতাবোধ সব শকুন ও শেয়ালের খাদ্য"।[১] সমাজের অসুস্থতা ও অসহায়তা, বিকার আত্মরতি, ভাবাবেগ আর শৈথিল্য যেভাবে বড় উদ্যম ও সংগ্রামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই জড়ত্বগুলিকে মতি নন্দী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি খুঁটিয়ে দেখেছেন আমাদের চেনা জীবনের বৃত্তে কত উথান-পতন, ভালো মানুষের মুখোশের আড়ালে বীভৎস কদর্যতা। আবার সমষ্টির বহুরৈখিক প্রতিসাম্যের ভেতর যে ব্যক্তিগত একক অভিজ্ঞানের মাত্রা আন্দোলিত হয়ে উঠতে চাইছে সেই কাঁপনগুলিও দ্যুতিময় হয়ে ধরা দিয়েছে।

মতি নন্দীর কোনি উপন্যাস এক মেয়ের নিরলস অধ্যবসায় আর লড়াইয়ের কাহিনি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "স্ট্রাইকার উপন্যাসে এবং 'কনি'তেও বাস্তব আলেখ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মধ্যবিত্ত জীবনের অপরাজেয় লড়াইয়ের মূল চরিত্র। চারিদিকে সবাই যখন হতাশার কথা বলে, 'অবক্ষয়' যখন একটা 'ক্লিশে' হয়ে যৌনবিকার প্রদর্শনীর অবাধ্য অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে – তখন এইসব উপন্যাসে শ্রী নন্দী অবিরাম লড়াই ও জয়ের কথা বলেছেন"।[২] বহু প্রতিকূলতা, বাধা বিপত্তির পথ পার হয়ে কোনি শেষ পর্যন্ত লড়াইতে জেতে। বাইরের প্রবল ঝড় তার সাধনাকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। অভাব, দারিদ্র্য, অপমান তাকে তৈরি করেছে, চারপাশের চোখরাঙানি তার বিশ্বাসকে আরো গভীর করেছে, মানুষের উপহাস আর বিদ্রুপ তার রক্তের ভেতরে জ্বালিয়েছে জেদের অগ্নিশিখা। আত্মবিদ্রুপ নয় বরং অসহায়তার প্রতিটি মুহূর্তে কোনি আত্মবিশ্বাসই অর্জন করেছে। আর কোনির এই লড়াইয়ের পেছনে আছে আর একটি মানুষের অবদান। স্বার্থপর মানুষের শঠতা আর ছলনা যখন মানবিকতাকে বিধ্বস্ত করেছে তখনই এই মানুষটি তার আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দ্যোতমান হয়ে উঠেছে। তাই কোনির হয়ে ওঠার প্রতিটি মুহূর্তে, সংগ্রামের সকল স্পন্দনে এই মানুষটি দীপশিখার মতোই মেলে ধরেছে, অথচ উন্মোচনের অহংকার তার ভেতরে ছিল না। সমস্ত উদ্বেগ সংশয় দ্বিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনিকে শোনাতে পেরেছিলেন আশ্চর্য জীবনমন্ত্র।

কোনি উপন্যাসটির প্রথমেই আছে এই মানুষটির প্রসঙ্গ। নাম তার ক্ষিদা অর্থাৎ ক্ষিতিশ সিংহ। নামের মতোই চরিত্রের ঝাঁঝ তার। বলিষ্ঠ, লম্বা, দৃঢ়চেতা, পেশিবহুল এই মানুষটি নিত্য ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে দিয়েছে এক অদ্ভুত প্রাখর্য এবং দৃঢ়তা। অথচ মজবুত কাঠামোর আড়ালে স্নিগ্ধ সুন্দর অনুভূতিও তার মধ্যে বিদ্যমান। ছাপোষা মধ্যবিত্তের আলস্য ও কর্মবিমুখতার বাইরে এই চরিত্রটি অনবদ্য প্রাণের প্রতীক। একগুঁয়েমি, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার সমবায়িক প্রতিন্যাসে গড়ে তোলা তার মানবিক প্রত্যয়গুলি আপাতদৃষ্টিতে কারও কাছে বিদ্বেষের চিহ্ন হিসেবে প্রতিপাদিত হলেও তার মধ্যে আছে অনির্বচনীয় অধরা মাধুরী। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি ব্যবসাদার বিষ্টুচরণের প্রতিপক্ষে। মোটা হাতির মতো চেহারার এই বিষ্টুধর সহ্য করতে পারছে না ক্ষিতিশকে-

কিন্ত বিষ্টু বিরক্ত হচ্ছে যেহেতু এই লোকটা মোটেই বাচ্চা নয়। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো মেশালে যেমন দেখায়, মাথার কদমছাঁট চুল সেই রঙের। বয়সটা পঞ্চাশের এধারে বা ওধারে বছর পাঁচেকের মধ্যে হতে পারে। লোকটার গায়ের রঙ ধুলোমাখা পোড়ামাটির মতো; আর চোখের চাহনি! ধূসর মনি দুটো দেখলে মনে হবে বোধ হয় সূর্যের দিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাকিয়ে থেকেই মনির কালো রং টা ফিকে হয়ে গেছে। চাহনিটা এমন, দেখলে মনে হয় যেন তার মনের সঙ্গে মেলে না সেইসব ব্যাপারগুলো ব্লোটর্চের মতো পুড়িয়ে দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। চোয়াল দুটোকে শক্ত করে ধরে আছে জেদ।[৩]

উপন্যাসিক এইভাবে চরিত্রটিকে তৈরি করে নিচ্ছেন যেন বাইরের সমস্ত ঝঞ্ঝা তার ধ্বসকে অপরিসীম মনোবল আর মানসিক কাঠিন্য দিয়ে মোকাবিলা করবে, বিপদে পিছুহটা নয় বরং বিদ্রোহের ধ্বজাটিকে মেরুদণ্ডে গেঁথে নেওয়া। বিষ্টুর থলথলে মেদবহুল জর্জর শরীরকে সে আক্রমণ করে সরাসরি। হোক বিষ্টুধর তার কাছে অচেনা, বিষ্টুধরের মুখমণ্ডল অপ্রতিভ আর বিরক্তিতে ছেয়ে এলেও সে বেপরোয়া, তাঁর ধর্ম কাপুরুষতাকে প্রত্যাঘাত করা, অলসতার সেয়ানা বাহানাগুলিকে পর্যুদস্ত করা। বিষ্টুধরের খাবারের বহর শুনে ক্ষিতিশ বিস্মিত

হয়ে ওঠে, আমোদ আর আরামের যাবতীয় ফিরিস্তি তার কাছে পরিশ্রম বিমুখতার অনন্য নজির রূপে প্রতিপন্ন হয়। নাছোড় ক্ষিতিশ সিংহ শেষমেষ বিষ্টুধরকে তার অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করতে চায়।

জোরে বলতে শুধু গায়ের জোরই বোঝায় না। মনের জোরেই সব হয়। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে শরীরের দুর্বলতা ঢাকা দেওয়া যায়। শরীর যতটা করতে পারে ভাবে, তার থেকেও শরীরকে দিয়ে বেশি করতে পারে ইচ্ছার জোর। সেজন্যে শুধু শরীর গড়লেই হয় না, মনকেও গড়তে হয়।[৪]

ক্ষিতিশ সিংহের এই অদম্য প্রাণশক্তিই তাকে জীবন সম্পর্কে গভীরতর দার্শনিক উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছে। আসলে সফলতার প্রতিটি কনকরূপের ছটার আড়ালে যে আত্মবিয়োজনের চিহ্ন রয়ে যায়, থেকে যায় যে দগ্ধতার ইস্তেহার, ক্ষিতিশ সিংহ তার প্রকৃত প্রতিমূর্তি। ক্ষিতিশের জীবন ও যাপন এই মূল্যবোধের গভীর উৎস থেকে জাত। তুচ্ছের মধ্যেও আছে বিরাটের ইঙ্গিত এবং সে বিরাটের পরিচয় পেতে হলে তুচ্ছের ভেতরকার স্বরূপকে আগে সন্ধান করতে হয়। তাই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ক্ষিতিশ আবিষ্কার করে কোনিকে। গঙ্গার ঘাটে দুরন্ত সাঁতারে রত কোনিকে। প্রক্ষিক্ষণহীন, শৃঙ্খলাহীন কিন্তু দুর্মর প্রাণের আবেগে তার ভিত ছিল বাঁধা। তাই জহুরী ক্ষিতিশের রত্ন চিনতে বেগ পেতে হয় নি। দীর্ঘ সরু দেহ, সরু পা, সরু হাত অথচ গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীর ফেলে যাওয়া আমের জন্য তীব্র জেদ। ক্ষিতিশ সিংহ বাড়িতে এসে এই কথাই ভাবতে থাকে, ঘুম আসার ঠিক আগের মুহুর্তে ক্ষিতিশের আবছায়া চেতনায় ফুটে ওঠে 'ফণা তোলা কেউটের মতো হিলহিলে কাদায় লেপা সরু একটা দেহ' লম্বা হাত এলোপাথাড়ি ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। 'ফাইট কোনি ফাইট'।

কিন্তু ক্ষিতিশের এই স্পষ্টতা, চাঁছাছোলা জবাব, দৃঢ় পৌরুষময় অভিব্যক্তি, রাখঢাক না করে অন্যের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দেওয়া এ সকল কিছুর মধ্যে সৎ মনোবৃত্তি প্রকাশ পেলেও এগুলোর জন্যেই তাকে বিরাগভাজন হতে হচ্ছিল সবার কাছে। তথাকথিত 'চালাক চতুর' এর দলে সে কোনোদিন পড়ে নি। কারণ ধূর্তামি করে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া ছিল তার স্বভাবের বিরুদ্ধে। অর্থনৈতিক উন্নতি সিদ্ধির জন্য যে বাকচাতুর্যের প্রয়োজন তার কোনো ধার ধারত না ক্ষিতিশ। জুপিটার ক্লাবকে সে ভালোবাসত ভেতর থেকে, এই ক্লাবেরই সে ছিল এক প্রশিক্ষক। সৎ সাহসী নির্লোভ এই চরিত্রটির উদ্যম আর একাগ্রতাকে সইতে পারত না অলস ফাঁকিবাজ অন্যান্য কর্মচারীরা। কারণ আঁতলামির কণামাত্র উল্লাসও তার মধ্যে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে না আর তার ফলে অদ্ভুত এক বিদ্বেষের শিকার হত ক্ষিতিশ। সুইমিং ক্লাবের নতুন প্রেসিডেন্ট এবং এম এল এ বিনোদ ভড় আর সম্পাদক ধীরেন ঘোষ এবং আরো সবাই মিলে যে বৃত্তটি তৈরি করেছিল সেখানে ছিল না ক্ষিতিশ। ক্ষিদা সম্পর্কে অভিযোগ নাকি ছেলেদেরই অর্থাৎ সুইমারদের। আসলে দু একটি মেডেল আনা বাদে সুইমাররা আর কিছুই করতে পারেনি। উপরন্তু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারা, পড়াশোনা না করা, ট্রেনিং না করা এগুলো ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক রুটিন যা ক্ষিদার পছন্দের বাইরে ছিল। তাই ক্ষিদা কে শুনতে হয়েছে- "ওদের মন মেজাজ বোঝার ক্ষমতা, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ক্ষিদার নেই"।[৫] এরকম আরো কত ধরনের অভিযোগ। জুনিয়ার ছেলেদের সামনেই শ্যামলকে তার সময় জ্ঞান সম্পর্কে অপমান করা, বেস্ট স্ট্রোকে বেঙ্গল রেকর্ড হোল্ড করা গোবিন্দকে কান ধরে ক্লাব থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি, কামাই করার কারণে সুহাসের ঘরে গিয়ে তার বাবাকে যা তা বলে আসা, চুল ছাঁটতে বলার জন্য অমিয়া আর বেলার জুপিটার ছেড়ে জলে যাওয়া ইত্যাদি শত সহস্র অভিযোগের তীর চারিদিক থেকে বিদ্ধ করতে থাকে ক্ষিতিশকে। সহ্য করতে হয় বিদ্রুপের আর এক ধরন, ক্ষিতিশের কোনো মেডেল প্রাপ্তি নেই, রেপুটেশন নেই, সুইমারদের কাছে নিজের মহত্ব প্রমাণ করার জন্য ক্ষিতিশের ঝুলিতে কিছুই নেই যা দেখে ছেলে বা মেয়েদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে। বলাই বাহুল্য এমন কেজো কথায় টলার পাত্র নয়, কেননা ট্রেনার হতে গেলে নাম করা সাঁতারু হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবীর বড় বড় কোচেরা কেউ চ্যাম্পিয়ান নয়। একজন সুইমারের প্রতিটি অভিক্ষেপকে লক্ষ করতে পারে একজন দক্ষ কোচ যা জলের ওপর থেকেই সম্ভব। তাছাড়া-চ্যাম্পিয়ানরা জন্মায়, ওদের তৈরি করা যায় না। ওদের খোঁজে থাকতে হয়; লক্ষণ মিলিয়ে চিনে নিতে হয়।[৬]

শজারুর চোখ দিয়ে ধীর ভাবে অথচ অব্যর্থ পর্যবেক্ষণ করতে হবে সবকিছু তবেই অন্তরালের অবগুণ্ঠন ভেঙ্গে প্রকৃত সাহসের ইশারাগুলি বাঙময় হবে। ক্ষিতিশ বুঝতে পারে তার সত্তাকে মূল্য দেবে না এই জুপিটার ক্লাব কারণ আঁঠির ভেতর থেকে রস নিংড়ে বার করার মতো ক্ষমতা এবং ধৈর্য কোনোটাই নেই এদের। মধ্যমানের সুইমার কখনও তার অন্তরের আগুনের সাক্ষাৎ পাবে না। এজন্য চাই অন্বেষণ, প্রকৃত সুইমারের খোঁজ। তাকে তৈরি করতে হবে প্রথম থেকে এবং ভেতর থেকে। সস্তা কয়েকটি মেডেল প্রাপ্তি নয়, পুরস্কারের লোভ থেকে সরে দাঁড়িয়ে পেতে হবে চৈতন্যের ইন্ধন।

কোনিকে যেদিন প্রথম দেখে ক্ষিতিশ সেদিনই সে আবিষ্কার করে তার অন্তর্গত তুমুল তুফান। বিদ্রোহের যে ঝাঁঝ তার কব্জির মধ্যে ফুঁসে উঠেছিল ক্ষিতিশ প্রত্যক্ষ করে অদৃশ্য লড়াইয়ের বীজমন্ত্র। কিন্তু প্রথমে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে কোনি। সাঁতারও যে সুসংবদ্ধ প্রণালী, সাঁতারও যে শিখতে হয় এটা জানত না সে। তাই রবীন্দ্র সরোবরের একমাইল সাঁতার প্রতিযোগিতাতে সে সফলতা অর্জন করতে পারল না। এই সুযোগটিকে গ্রহণ করল ক্ষিতিশ। কোনির ব্যর্থতার অপমানই তাকে তার কাছে নিয়ে আসবে। দাদা কমলের উপস্থিতিতে কোনিকে শেখানোর প্রসঙ্গ পাড়ে ক্ষিতিশ। তারপর শুরু হয় আরেক পর্বান্তরের মোচড়।

কোনিকে সাঁতার শেখানোর বিষয়টি মোটেই সহজ ছিল না ক্ষিতিশের পক্ষে। অত্যন্ত দরিদ্র, কোনোরকমে একবেলা খেতে পাওয়া একটি মেয়েকে নিজের খরচায় গড়ে তোলা ছিল একেবারে দুঃসাধ্য। শুধু জেদ আর লক্ষ্যই ছিল পরম মূলধন। ক্ষিতিশের ঘরের অবস্থাও ছিল তথৈবচ, স্ত্রী লীলাবতী ‘প্রজাপতি’ নামে একটি টেলারিং এর দোকান চালায়, কোনোরকমে টেনেটুনে চলে সংসার। এমন এক অদ্ভুত প্রতিকূল পরিবেশে দাঁড়িয়েই ক্ষিতিশ চ্যালেঞ্জ নেয়, প্রখর বৈপরীত্য দিয়ে তৈরি করতে চায় সংগ্রামের ভূমিটি। তবে তঞ্চকতা কতটা অতলগামী হতে পারে তা তলিয়ে দেখে নি ক্ষিতিশ। কোনি জুপিটার ক্লাবে ভর্তি হতে পারে না বলা ভালো ভর্তি হতে দেওয়া হয় না। স্বার্থান্বেষী মানুষদের কূটনীতির প্যাঁচালো শিরায় পাক খেয়ে আহত হয় ক্ষিতিশের সংবেদনশীলতা। এতদিনের সম্পর্কের কোনো মূল্য পায় না সে, প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা, সমস্ত বাধার ভিতর জুপিটারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সবই আজ স্মৃতি। মিথ্যা আর চাতুর্যের হিংস্র ফণা বের হয়ে আসে মুখোশের আড়াল থেকে। ডুকরে কেঁদে ওঠে তাই ক্ষিতিশের অভিমানী সত্তা। শত্রুর ক্লাবে যোগদান করতে বাধ্য হয় সে, বিন্দুমাত্র ইচ্ছে না থাকলেও তাকে যেতে হয় যেভাবে ব্যর্থ প্রেমিক গোপনে গোপনে সরে পড়ে ঘৃণায় মাখা সম্পর্কের খোলস থেকে। এতে বুকের পাঁজর কেঁপে উঠলেও শপথের দ্যুতি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ভিন্ন অভিজ্ঞানে জেগে ওঠে স্পর্ধার আরেক ভুবন। কেননা এবার প্রয়োজন নিজেকে প্রমাণ করার, ঝুটা সস্তা কৌশলের খোলসগুলিকে ছিড়ে কোনো আগ্নেয় আয়োজনের লিপিমালাকে উদ্‌গার করার। কোনিকে সে মনের মতো করে গড়ে তোলবার একটি পীঠস্থান পেল অ্যাপোলো ক্লাবেই। শুরু হল সংগ্রাম, অজস্র চড়াই উৎরাই ঠেলে কোনিকে জাগানোর প্রয়াস, অজ্ঞানতার আঁধার ঠেলে প্রকৃত শৃঙ্খলতায় আনীতকরণের প্রচেষ্টা। এতো ভার কোনির শরীর সইতে পারে না। সবসময় জোরজবরদস্তিতেও কাজ হয় না তাই দিতে হয় ইন্ধন। ডিম, টোস্ট, কলা। অভাবের সংসারে কোনির তা বিলাসিতা মনে হয় তাই এর পরিবর্তে এক টাকা করে চেয়ে নেয়। লোভ দেখিয়ে ক্ষুধায় অবসন্ন কোনিকে অমানুষিক পরিশ্রম করার এই প্রচেষ্টা ক্ষিতিশকে মনে মনে ব্যথিত করে। কিন্তু সাধ্যের বাইরে যেতে না পারলে, নিজের গণ্ডিকে ছিঁড়ে ফেলতে না পারলে সত্তার প্রকৃত উত্তরণ সম্ভব নয়। তাই চাই পরিশ্রম, যে কোনো মুহূর্তকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, যন্ত্রণাকে সহ্য করার শপথ।–

খাটুক আরো খাটুক। যন্ত্রণায় ঝিমঝিম করবে শরীর, টলবে, লুটিয়ে পড়তে চাইবে যন্ত্রণার পাঁচিলের সামনে। আর তখন জেনেশুনেই চ্যালেঞ্জ দিতে হবে ওই পাঁচিলটাকে। এজন্য চরিত্র চাই, গোঁয়ার রোখ চাই।[৭]

বারবার আত্মপরীক্ষার সামনে উপনীত হয়ে আত্মশুদ্ধির আয়োজনে নিষিক্ত হওয়া তবেই চৈতন্যে জ্বলবে আত্মদীপ। ক্ষিতিশকেও দিতে হয় পরীক্ষা কখনো স্ত্রীর কাছে, বন্ধুর কাছে এমনকি নিজের কাছেও। কোনি সম্পর্কে লীলাবতীর কাছে বলে মেয়েটার মধ্যে জিনিস আছে একেবারে আঁকাড়া মাটি, গড়তে পারলে দারুণ সুইমার হবে। আসলে এই অনুনয়, এই কাতোরোক্তি, এই অভিলাষের পেছনে আমরা বুঝতে পারি প্রচণ্ড মহানুভবতাকে, হুজুগের পৃথিবীতে দ্যাখনদারীর বাজারে কোনো ভিন্ন প্রাণের প্রতিশ্রুতি। ক্ষিতিশের সৌকুমার্যের স্তরে স্তরে কঠোরতার ভাস্কর্য, ভিন্নভাবে বলা যায় কঠোরতার পরতে পরতে খেলা করছে কোমলতার দ্যুতি। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মুখ থুবড়ে পড়া কোনির প্রতিজ্ঞাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হয়, কখনও কখনও প্রয়োজন হয় আঘাতেরও, যে আঘাত অক্ষমতাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে চেনাবে প্রকৃত পথের পরিচয়। এ সকল কিছুই যা সংকীর্ণতা আছে তাকে ধুয়ে ফেলার জন্য, যেটুকু কলুষতা রয়েছে তাকে মুছে ফেলার জন্য। ক্লান্ত অবসন্ন শীর্ণ কোনি যখন সইতে পারে না ভীষণ পরিশ্রম ক্ষিতিশ তখনই বোঝায় যন্ত্রণার তাৎপর্য-

জানি রে কষ্ট হচ্ছে, হাত পা খুলে খুলে আসছে, কলজে ফেটে যাচ্ছে। যাক্ যাক্, তুই যন্ত্রণা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যা। তুই জানিস ক্ষিদে যখন থাবা মারে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, - তখন কেমন লাগে। তুই পারবি বুঝতে যন্ত্রণা কী জিনিস। ফাইট কোনি ফাইট।

মার খেয়ে ইস্পাত হয়ে উঠতে হবে। যন্ত্রণাকে বোঝ, ওটাকে কাজে লাগাতে শেখ, ওটাকে হারিয়ে দে... কাম অন কোনি, জোর লাগা, আরো জোরে।[৮]

যারা বিত্তশালী, ঐশ্বর্যের মধ্যে যাদের যাপন সুরভিত তারা ক্ষিদের সৌন্দর্য বুঝতে পারে না, জানতে পারে না ক্ষিদের জোর। কোনি জানে ক্ষিদের সৌন্দর্য ক্ষিদের জুলুম কতটা ব্যাপক ও গভীর হতে পারে। যারা না চাইতেই হাতের কাছে সব পায় তারা জানে না শ্রমের অঙ্গীকারে গড়ে ওঠা সফলতার তুর্যধ্বনি। কোনির সমস্ত না পাওয়াগুলি কোনিকে সম্মুখীন করবে আশ্চর্য প্রতিজ্ঞার কাছে। এই স্পৃহাকে ক্ষিতিশ ছড়িয়ে দিতে চায় কোনির রক্তে রক্তে-

শরীরটাকে যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় ঘষে ঘষে শানিয়ে তোল। দেখবি কী অবাক তোকে করে দেবে ওই শরীর, যা অসম্ভব ভাবছিস তাকে সম্ভব করে দেবে। সোনার মেডেল ফেডেল কিছু নয় রে, ওগুলো এক একটি চাকতিমাত্র। ওগুলোর মধ্যে যে কথাগুলো ঢুকে আছে সেটাই আসল – মানুষ পারে, সব পারে।[৯]

ক্ষিদ্দার এখানেই শক্তি ও সামর্থ; সে কোনিকে শরীর দিয়ে শুধু লড়াইয়ে দোসর হতে বলেনি, শরীরের পরিধি পার হয়ে মনের যেখানে প্রকৃত বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গেরা জন্ম নেয় সেই কোষ কোরকের কোণে কোণে কথা বলে। শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় আর স্বপ্ন- এই ত্রিবেণীসঙ্গমে যে বৈদূর্যের আভা বিচ্ছুরিত হয় সেখানেই আছে আত্মআবিষ্কার। লীলাবতির 'প্রজাপতি'তে কাজ করতে দেখে অমিয়া তাকে ঝি বলে। অপমানিত কোনির অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ক্ষিদ্দার জবাব – 'তোর আসল লজ্জা জলে, আসল গর্বও জলে'।[১০]

সবচাইতে বড় বাধা জুপিটারের ক্লাব মেম্বারদের ঈর্ষা। কোনির লড়াইয়ের প্রতিটি পদক্ষেপে যে অমানবিকতার নির্যাতন বাইরে থেকে তার সকল সুষমার কোরকগুলিকে বিধ্বস্ত করছিল তা হল এদের বীভৎস হিংসার নিশানাগুলি। সকল পরিস্থিতিতে তাদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল কোনিকে পর্যুদস্ত করা। কোনি বাংলা সাঁতার দলের জায়গা পেলেও নিয়মের নানা ফাঁক ফোঁকরে জুপিটারের সদস্যরা পেতে রেখেছিল ফাঁদ, কোনির প্রতিটি প্রচেষ্টায় তারা দেখছিল খুঁত, ত্রুটির অজস্র চিহ্ন। ক্ষিতিশ বুঝতে পারে এর আড়ালে আছে বর্বর আক্রমণের খেলা, আছে প্রতাপের সুনিপুণ ফাঁদ। হিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনির সমান্তরাল পারফর্ম্যান্স করলেও – "একই সঙ্গে কোনি আর হিয়া ৫০ মিটার টার্ন নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বদু চাটুজ্জে লাল ফ্ল্যাগ নাড়তে শুরু করে। রেফারি ধীরেন ঘোষ ছুটে গিয়ে ফ্ল্যাগ দেখাবার কারণটা জেনে বলল 'কনকচাঁপা পাল ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে। টার্ন করেই আণ্ডার ওয়াটার ডাবল ক্লিক নিয়েছে'।[১১] এভাবেই ছল ও কৌশলে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছিল কোনির প্রতিজ্ঞা আর প্রত্যয় এমনকি এসব প্রত্যক্ষ করে হিয়ার বাবারও উক্তি – 'এভাবে মেডেল জেতায় কোনো আনন্দ নেই'।[১২] এত সকল বিপত্তির মধ্য থেকেই কোনি মাদ্রাজে যাওয়ার মনোন্নয়ন পায়, কিন্তু ম্যানেজার হয় ধীরেন ঘোষ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই মাদ্রাজে যাওয়া প্রথমদিকে সার্থক হয়নি কোনির। এখানেও কোনি সেই তীব্র দলাদলি আর ষড়যন্ত্রের শিকার। কোনির প্রত্যয়ের প্রতিমাটি যেন খানখান হয়ে ভেঙে যায় হরিচরণের মন্তব্যে – "তোর নাম চারটে ইভেন্টে পাঠান হয়েছিল, অথচ কোনোটাতেই নাম দেখছি না। নিশ্চয় গোলমাল হয়েছে কোথাও। খোঁজ নিয়ে দেখব খন"।[১৩] এই গোলমাল যে তাদেরই তৈরি করা, অনর্থক উটকো এক ঝামেলা সৃষ্টি করতে যে এদের জুড়ি মেলা ভার তা আর কারোর বাকি থাকে না বুঝতে। এসকল আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই কোনি পেতে থাকল বিভিন্ন সব লাঞ্ছনা আর অপমান, বিত্তশালী ইজ্জতদার বান্ধবীদের কাছ থেকে অন্তঃসারশূন্য হৃদয়ের কদর্যতা, তুচ্ছ ছোট ছোট মহূর্তগুলিকে কেন্দ্র করে বাদ বিবাদ, বড়োলোকি চাল ও দেমাকে অন্ধ হওয়া সঙ্গীদের বিত্তের প্রকাশে আত্মশ্লাঘা 'অন্ত্যজ' ছোটোলোক কোনিকে আহত করে তুলেছিল। অথচ কোনির অন্য কোনো উপায় ছিল না। তার আহত অভিমানী জেদী সত্তা এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সতত তৎপর হলেও রণক্ষেত্রে প্রকৃত যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করার সে সুযোগ পায় নি। ক্ষিতিশ না আসাতেও তার অভিমান তীব্র হয়ে নাড়িতে মোচড় দিচ্ছিল, সে তো জানে না ক্ষিতিশ টিকিট কাটতে না পেরে চেকারের দৌরাত্ম্যে জেলে আছে। এতদূরে এসে চ্যামপিয়নশিপে সে নামতে না পেরে আস্তে আস্তে একটা কান্না তার সারা শরীরটাকে ঝাঁকাতে শুরু করল।

কোনি অবশেষে জলে নামার সুযোগ পায় সাঁতারের শেষ দিন, যখন বাংলার ভাগ্যাকাশে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিই নাম নিশানা হারিয়ে নিজেদের অক্ষম বলে প্রতিপন্ন করল। এবার বাকি শুধু কোনি। বাধ্য হয়ে ধীরেন ঘোষের কাতরোক্তি "কোনি, আর সময় নেই, তোমায় নামতে হবে রীলেতে অমিয়াদির জায়গায়"।[১৪] কিন্তু কোনির অভিমানী সত্তা অতটা সস্তা নয় যে ডাক পেলেই ছুটে যাবে। সে খুঁজছিল ক্ষিতিশকে, প্রায় শেষ মুহূর্তে ক্ষিতিশকে পায় সে- আলুথালু বিধ্বস্ত অসহায়। তার 'ফাইট, কোনি ফাইট' আহ্বান শুনে বুকের অন্তঃস্থল থেকে তীব্র এক আগুনের ঝিলিক বেরিয়ে আসে। জলে নামে কোনি। মারাঠি প্রতিপক্ষ রমা যোশীর সঙ্গে শুরু তীব্র লড়াই। কোনি তার সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দেয়, এতদিনের তিল তিল করে লালিত হওয়া স্বপ্নকে সফল তাকে করতেই হবে। মরণপণ লড়াইয়ে অবশেষে জেতে কোনি।

জেতে একটি সুস্থ ও সুন্দর প্রতিজ্ঞা, জেতে অপমান ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে একটি উত্তর, জেতে মানবিকতার সুষমা আর ক্ষিতিশের সততা। জেতে দীর্ঘদিন ধরে লালিত হওয়া নাছোড় সেই স্বপ্ন।

উপন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেবেশ রায় বলেছেন "'আখ্যান' শব্দটির অর্থ বিপরীতময়, সংঘর্ষসঙ্কুল, রহস্যাকীর্ণ – নামপরিচয়, সংজ্ঞাপরিচয়, ইতিহাস, গল্পকথা, পুরাণ। আমাদের যে-জীবনের কথা এই গল্পগুলিতে ছড়িয়ে আছে তার ভিতর দিয়ে এই আখ্যানই তো রচিত হয়েছে। এ-আখ্যান বাঙালি-ভারতীয়ের সেই নিজেকে খোঁজার আখ্যান- একই সঙ্গে সংজ্ঞা ও কল্পনা, ইতিহাস ও উপন্যাস, পুরাণ ও বর্তমান"।[১৫] কোনি উপন্যাস যেন এই চারপাশের অবিরত সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে নিজেকে খোঁজার আখ্যান। আত্মখননের মধ্য দিয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওয়া। এ উপন্যাসে কথক কোনির উত্তরণের পথে জ্বেলেছেন অঙ্গীকারের এক আজনবি প্রদীপ। সাধারণত বাংলা ভাষায় ক্রীড়াকেন্দ্রিক সাহিত্য কম, মতি নন্দীর এ উপন্যাস ক্রীড়া সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। তাছাড়া শুধু ক্রীড়া সাহিত্য হিসেবেই নয় কোনির আত্মউন্মোচনের পরতে পরতে মিশে আছে যে বিদ্রোহের ইস্তাহার সেই প্রতিবাদী মোচন, অনাচার মাড়িয়ে বিভ্রান্তির আগল ঘুচিয়ে স্বপ্নকে লালন করার মন্ত্র, সর্বোপরি বিপর্যস্ত সময়ের পটে দাঁড়িয়ে ঈর্ষার ছোবল বাঁচিয়ে মানবিকতাকে আলিঙ্গন করার যে সাহস উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা থেকে জাত যে মানস জন্ম দিয়েছিল আত্মদ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত সত্তার নানামাত্রিক ভাঙচুর এবং বিষণ্ণতার নিরানন্দ স্বরলিপি মতি নন্দী সেই আত্মব্যবচ্ছেদ আর মশগুল রতি নিয়ে মাথা ঘামাননি, তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন মানবিকতাকে, সার্বভৌম মানুষের উত্থানকে, মানুষের ভালোবাসাকে। তাঁর 'কোনি' উপন্যাসটি মহৎ এক সত্তার জয়গানে মুখর, অহং এর প্রাচীর ধ্বসিয়ে সত্যের প্রতি বিশ্বাসে অকৃপণ। লড়াইকে লালনের এই অঙ্গীকারে, জীবনতৃষ্ণার প্রাখর্যে, লক্ষ্যকে পুরণ করার ঐকান্তিক অভিলাষে 'কোনি' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র হয়েই থাকবে।

তথ্যসূত্র

১) সিকদার অশ্রুকুমার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৮, পৃ- ২৮৭.

২) বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ২০০৩, পৃ- ৩৩৫.

৩) নন্দী মতি, 'কোনি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৫, পৃ- ২

৪) তদেব, পৃ- ৫

৫) তদেব, পৃ- ১৩

৬) তদেব, পৃ- ১৭

৭) তদেব, পৃ – ৪০

৮) তদেব, পৃ- ৪৮

৯) তদেব, পৃ- ৪৮

১০) তদেব, পৃ- ৫০

১১) তদেব, পৃ- ৬২

১২) তদেব, পৃ- ৬৪

১৩) তদেব, পৃ- ৭০

১৪) তদেব, পৃ- ৭৯

১৫) রায় দেবেশ, উপন্যাস নিয়ে, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩, পৃ- ৯৪

………………………………………………

মনস্তত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা'

বাণী রায়

বাংলা কথাসাহিত্যে বিশ শতকের চতুর্থ দশকটি বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসের একটি সমন্বয়ী দশক রূপে পরিগণিত হতে পারে, তা আমরা আগেই বলেছি। এই দশকের প্রথম বছরটি হল ১৯৩০। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সমগ্র বিশ্বে মানুষের চিন্তনলোকে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল তার ফলে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ব্যক্তির পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখা হত বেশি। পারিবারিক চিত্র ও ব্যক্তি-চরিত্রের ব্যাখ্যা করবার পথ ধরেই সমাজকে তুলে ধরা হত উপন্যাসে। বিশের দশকে অর্থাৎ ১৯২০-২৯-এর মধ্যে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের যে নতুন সৃষ্টিধারা দেখা দিল সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছিল মানবসমাজের কঠিন ও নির্মম দিকটি; সেই সঙ্গে উঠে এসেছিল শোষিত শ্রেণির দারিদ্রের পরিচয়। বিশের দশকের আগেই সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)-এর মনস্তত্ত্ব বিষয়ক নতুন ধারণার প্রকাশ ঘটেছিল একাধিক গ্রন্থে। সেই ধারণাগুলি, অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের এই নতুন দিক সর্বত্রই বিশেষভাবে উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছিল। সেজন্য মনের জটিলতা, বিভিন্ন কূটগ্রন্থি এবং অবদমিত যৌনবাসনার উল্লেখ ও প্রকাশ দেখা দিয়েছিল বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসের নাম করতে পারি।

১৯৩০-এর পর বাংলা ভাষায় সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার আখ্যানের বাইরেও এক নতুন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিকে উপন্যাসের কথনে গ্রহণ করা হল। এই রীতিকে বাংলায় বলা হল — চেতনাপ্রবাহমূলক রীতি। ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্ট্রিম অব্ কনশাস্নেস'।

বিশ্বসাহিত্যে 'স্ট্রিম অব্ কনশাস্নেস' (Stream of Consciousness) বা চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির উপন্যাস লেখার সূত্রপাত হয় বিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই। প্রধান লেখকেরা ছিলেন ফ্রান্স-এর মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২), ইংল্যান্ড-এর জেমস্ জয়েস্ (১৮৮২-১৯৪১), ডরোথি রিচার্ডসন (১৮৭৩-১৯৫৭) এবং ভার্জিনিয়া উল্ফ্ (১৮৮২-১৯৪১)। এই লেখকদের প্রয়াণের পরেও এই রীতির মূল প্রবণতা উপন্যাস-কথনের বৈচিত্র্যের মধ্যে গৃহীত হয়ে গেছে।

এই চেতনাপ্রবাহ রীতি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেরই একটি বিশেষ রচনাশৈলী। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেরই অন্তর্গত এই রীতি। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলতে আমরা কী বুঝি? বস্তুত যে কোনো উপন্যাসের কথনশৈলীতে মনস্তাত্ত্বিকতার চিহ্ন অপরিহার্য। উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সকলেই বলেছেন যে, উপন্যাস হল মানুষের বাস্তবজীবনের আখ্যান। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন বন্ধন, বৈচিত্র্য ও জটিলতা থাকবেই। সেই জন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হওয়ায় সব উপন্যাসই কমবেশি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রূপে অভিহিত হতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের চতুর্থ দশকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের বিশেষ একটি শাখা হিসেবে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস দেখা দিল। যদিও এই ধারায় অনেক উপন্যাস লেখা হয়নি। কিন্তু এমন দুটি উপন্যাস লেখা হয়েছে, যেগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

এই চেতনাপ্রবাহমূলক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের একটি নিদর্শন হল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫)। বাংলা সাহিত্যে এই ধারায় রচিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'অন্তঃশীলা'-র মতো শিল্প-সার্থক রচনা আর পাওয়া যাবে না বললে, অসত্য বলা হবে না। সাহিত্যিক সমাজে ধূর্জটিপ্রসাদের পরিচিতি মূলত একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী রূপেই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) ছিলেন একজন সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্বান এবং অধ্যাপক। তিনি লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন দীর্ঘ বত্রিশ বছর। তার পরেও তিনি বিভিন্ন সরকারি পদে সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল ইংল্যান্ড, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং সোভিয়েত রাশিয়া। সেই সঙ্গেই সাহিত্য, সংগীত এবং বিভিন্ন দর্শনের চর্চাতে তিনি খ্যাতনামা। তাঁর জীবনের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম করা যায়, তাঁরা হলেন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী তথা বীরবল এবং

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্নেহ করতেন। তিনি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করেন। তখন থেকেই সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ। দেশি, বিদেশি সাহিত্য পাঠ ছাড়াও মৌলিক লেখাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল, বিশেষ করে বুদ্ধিবিত্ত এবং আধুনিক। এছাড়াও তিনি ছিলেন ইউরোপীয় সাহিত্যেও একজন অভিজ্ঞ, মননশীল ভাষা-শিল্পী। 'অন্তঃশীলা'-র 'বাক্' সংস্করণের ভূমিকায় লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন — "সকলেই জানেন যে আমি বীরবলের শিষ্য, অযোগ্য হলেও শিষ্য।"[১]

তিনি যখন কলেজের ছাত্র, সেই সময়ই প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' (১৯১৪) পত্রিকার আবির্ভাব। এই পত্রিকা থেকেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক জীবনভাবনার প্রতিষ্ঠায় লেখালেখির চর্চা শুরু করেন প্রমথ চৌধুরী। একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি, অন্যদিকে সমকালীন শিক্ষিত তরুণেরা সকলেই ছিলেন 'সবুজপত্র'-এর পাঠক। কেউ কেউ হয়ে উঠেছিলেন লেখক। তাঁদেরই একজন ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। উপন্যাসটির বিশদ বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে বলে নেওয়া যেতে পারে ব্যতিক্রমী ধরনের লেখা হলেও সমকালীন পাঠকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল 'অন্তঃশীলা'। বিশেষ দর্শনীয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিষয়ভাবনা ও রীতির সঙ্গে 'অন্তঃশীলা'-র মিল নেই। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ লেখাটির প্রশংসা করেছিলেন — "আমের ভিতরে আছে একটি অনবচ্ছিন্ন শাঁস, আর তার মাঝখানটিতে একটি মাত্র আঁটি। দাড়িমের শক্ত খোলার মধ্যে শত শত দানা; এবং প্রত্যেক দানার মধ্যেই একটি করে বীজ। তোমার 'অন্তঃশীলা' সেই দাড়িম জাতীয় বই। বীজ-বাণীতে ঠাসা। তুমি এত বেশি পড়েছ এবং এত চিন্তা করেছ যে তোমার ব্যাখ্যান তোমার আখ্যানকে শতধা বিদীর্ণ করে বিস্ফুরিত হতে থাকে। আমার বোধ হচ্ছিল তোমার এই গল্পটি তোমারি চরিত কথা, গল্পের দিক থেকে নয়, আচরণের দিক থেকে।"[২]

'অন্তঃশীলা'-র উৎস সম্পর্কে গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে লেখক জানিয়েছেন — " 'অন্তঃশীলা'র উৎস তার প্রথম অধ্যায়। সেটি 'এই জীবন' নামে গল্পের আকারে 'পরিচয়ে' (মাঘ, ১৩৪০) প্রকাশিত হয়, গল্পটিতে লেখকের ছদ্মনাম ছিল যুধিষ্ঠির দাস। শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী গিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি বন্ধুরা গল্পটির সম্ভাব্যতা লক্ষ করে তাকে পূর্ণায়ত নভেলের আকার দিতে আমাকে প্রবুদ্ধ করেন। একজন তথাকথিত ইন্‌টেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ বা ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। নিজের অজ্ঞাতে খগেনবাবুর রমলাদেবীর প্রতি আকর্ষণ হ'ল অন্তঃশীলার বিষয়।"[৩]

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায়। বিশ শতকের তিনের দশকে যে নতুন প্রজন্মের কবি ও গদ্যকারেরা নতুন যুগের ভাবনা ও লিখনশৈলী নিয়ে রবীন্দ্র-পরবর্তী কালের সাহিত্যধারার সূচনা করেছিলেন তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তিনিও ছিলেন অধ্যাপক, কবি এবং এক ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিক। ১৯৩১-এ তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকা 'সবুজপত্র'-এর উত্তরসূরি বলেই অনেকে মনে করেন। সেই পত্রিকাতেই 'অন্তঃশীলা'-র প্রকাশ। এখানে বলে নেওয়া যায় যে, 'অন্তঃশীলা'-র পরেই এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিয়ে আখ্যান বিস্তৃত হয়েছিল আরও দুটি খণ্ডে। 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) এবং 'মোহানা' (১৯৪৩)।

ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। সচেতন মন নিয়ে তিনি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যেমন চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তেমনই পাঠককেও ভাবতে শিখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই 'অন্তঃশীলা' গ্রন্থ প্রসঙ্গে লেখককে শুনিয়েছেন — "আমার পাত্ররা আমারই মতো কল্পনাশীল, তোমার পাত্ররা তোমারই মতো চিন্তাশীল; ---অথচ এই বইয়ের প্রত্যেক পাতায় তুমি লোককে ঠেলা মেরে বলেচ, ভেবে দেখো।"[৪]

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র খগেনবাবু। আত্মঘাতী স্ত্রী সাবিত্রীকে ঘিরে খগেনবাবুর মনের অবস্থা বিশ্লেষণ, অতীত থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে এবং তাঁর মনের বিচরণ, কখনো কখনো অতীত স্মৃতিচারণা মূলত হয়ে উঠেছে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। উদাহরণ হিসেবে আমরা উপন্যাসটির প্রথম দিকের একটি অংশ তুলে ধরতে পারি। প্রথম পরিচ্ছেদে স্ত্রী সাবিত্রীর শবদাহ পরিদর্শন কালে খগেনবাবুর মনের মধ্যে যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হতে দেখি তা চেতনাপ্রবাহেরই নামান্তর। "কাঠ ক্রমে ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে, অতি শীঘ্র দাউদাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ। যেন উনুনে ফ্যান পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল, তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন — 'যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না।' সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেন — 'এখান থেকে চলে যাও।' চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে। --- প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুটপুট করে শব্দ হতে লাগল। গা ফেটে জল বেরোচ্ছে।" (প্রথম পরিচ্ছেদ)

এরপরেই উপন্যাসের কথনরীতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। উপন্যাস শুরু হয়েছে অত্যন্ত বাস্তব একটি ঘটনা দিয়ে, তা হল — এক বিবাহিতা নারীর আত্মহত্যা। তারপরই উপন্যাসে দেখানো হয় আর একটি বাস্তব ঘটনা, তা হল — শবদাহ। কিন্তু উপন্যাসটি যেহেতু ঘটনাপ্রধান, আখ্যানধর্মী লেখা নয়, সেজন্য সাধারণ সংসারে আত্মহত্যার পরেই সাধারণত যা ঘটে — ঘটনার আকস্মিকতা, বিহ্বলতা, আত্মীয়বন্ধুদের আসা-যাওয়া, কখনো কখনো থানা-পুলিশ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ — এসব কিছুই উপন্যাসে নেই। কাজেই এটি যে সাধারণ ঘটনানির্ভর কাহিনি নয়, তা এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপরেই উপন্যাসের কথন প্রবিষ্ট হয়ে যায় স্মৃতির গহনে। শুরু হয়ে যায় চেতনাপ্রবাহ রীতির শিল্পশৈলী।

স্ত্রী-র শবদাহকালে গন্ধের প্রসঙ্গে খগেনবাবুর মনে পড়ে যায় সাবিত্রীকে ঘিরে অনেক স্মৃতি। সুখস্মৃতি না হলেও সেইসব স্মৃতিকে তিনি মন থেকে সরিয়ে ফেলতে অক্ষম। শেষে চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে। এখানে দেখতে পাই খগেনবাবুর মন অতীত থেকে ফিরে আসে বর্তমানে, যা চিন্তাস্রোতের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত।

এই উপন্যাসটিতে ধূর্জটিপ্রসাদ পশ্চিমি লেখক প্রুস্ত, জয়েস, উলফ্ বা ব্রখের প্রমুখের মতো চেতনাপ্রবাহ বা অন্তর্মুখী সংলাপের রীতিকে গ্রহণ করেছেন। বহমানতা যেমন নদীর ধর্ম, তেমনই বহমান মানুষের চিন্তাস্রোতও। তাই তাকে অনেকটা নদীর সঙ্গেই তুলনা করা হয়ে থাকে।

'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) উপন্যাসে মৃত স্ত্রী সাবিত্রীদেবীকে ঘিরে নানা পূর্ব-প্রসঙ্গ অনবরত খগেনবাবুর স্মৃতিতে এসে ভিড় করেছে। এই কারণেই হয়তো লেখক উপন্যাস-ত্রয়ীর নামকরণেও নদীর প্রসঙ্গ এনেছেন। সময়ও নদীর স্রোতের মতোই নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলে, বহমানতাই তার ধর্ম। কাজেই দেখা যাচ্ছে নদী এবং সময় কিছুই থেমে থাকে না। সমালোচক তাই মন্তব্য করেছেন — "একই কারণে সমধর্মী ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস-ত্রয়ীর নামকরণে নদীর উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। সময়ও এক প্রবাহ, কালও এক স্রোত। এও আশ্চর্যের নয় যে, চেতনাপ্রবাহের উপন্যাসের প্রধান প্রসঙ্গই এই কালের প্রবাহ।"[৫]

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটিতে অবশ্যই একটি আলগা কাহিনি আছে। কিন্তু এখানে একটি সাজানো-গোছানো গল্পের প্লট আমরা খুঁজে পাই না। উপন্যাসের প্রধান তিন চরিত্র — খগেনবাবু, তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীদেবী এবং সাবিত্রীর বন্ধু রমলাদেবী। স্ত্রী সাবিত্রীদেবীর স্থূল শৌখিনতা, খগেনবাবুকে ঘিরে সন্দেহপরায়ণতা এবং প্রবল জেদ খগেনবাবুর মতো একজন বুদ্ধিজীবী মানুষের মনোজগতে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই সব কারণেই সাবিত্রীদেবীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে যে তিনটি চরিত্রের কথা আমরা আগে বলেছি, সেখানে প্রধান চরিত্র খগেনবাবু এবং তাঁর আত্মনিমজ্জিত মনোভুবন পরিক্রমাই উপন্যাসের মূল বিষয়। অপর দু-জন দুটি নারী চরিত্র। একজন উপন্যাসের আখ্যান শুরু হবার আগেই আত্মঘাতী; অপর জন রমলাদেবী, খগেনবাবুর চোখে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু চরিত্রটির গুরুত্ব কম নয়। তিনি উপন্যাসে পাঠকের সামনে উপস্থিত।

এই রমলা, সাবিত্রীর বান্ধবী এবং খগেনবাবুর কাছেও তিনি এক বিশেষ চরিত্র। তার প্রতি খগেনবাবুর গোপন কামনা ঘনীভূত হয়েছে। রমলাদেবীর সঙ্গে খগেনবাবুর অবৈধ সম্পর্ককে ঘিরে একদিন সাবিত্রীর মনোজগতেও এক ঝড়ের আবির্ভাব হয়। এই কারণেই তিনি বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন।

এই ঘটনার পর থেকেই 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটির সূচনা। এরপর সাবিত্রীদেবীর শবদাহন কালে তাঁকে ঘিরে খগেনবাবুরর চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে একই রকমভাবে। ঘরে নিঃসঙ্গ থাকাকালীন অবস্থায় সাবিত্রীকে ঘিরে নানারকম স্মৃতি তাঁর মনে ভিড় করে এসেছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন — " 'অন্তঃশীলা'র ঘটনা সমাবেশ সামান্য, চরিত্র সমাবেশও গৌণ। চিন্তা-সমাবেশই এর প্রধান ও অমূল্য সম্পদ্। ...চিন্তাও ধারাবাহিক নয়, চিন্তা অবিচ্ছিন্ন অথচ, সবকিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। চিন্তা না বলে বলা যেতে পারে চেতনার বিকাশ।"[৬]

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটির শেষদিকে একটি স্বপ্নের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্র খগেনবাবু স্বগতোক্তি করেছেন — "কালের পারম্পর্য ভেঙে নিয়তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার অন্য উপায় খুঁজে পেলাম স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে। বুঝলাম সময়ের হার এক নয়, কদম এক নয়, কখনও সময় চলে দ্রুত পদক্ষেপে, কখনও ধীরে, কখনও গতি তার রুদ্ধ। গতির হার বাড়ায় কমায় ভাবগুচ্ছ, আগ্রহ ঔৎসুক্য, যাকে ভালোবাসি তার জন্য যখন প্রতীক্ষা করি তখন মনে হয় সময় যেন আর কাটতে চায় না, যখন সে এসে হাজির তখন মনে হয় সময় কোথা দিয়ে চলে গেল। সময় ধূনে চলবে না ঠায়ে চলবে নির্ভর করে আমার আগ্রহের ওপর।" (অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৪৮)

‘স্ট্রিম অব্ কনশাসনেস’-ধর্মী উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, চিন্তাশীল ব্যক্তির সচেতন এবং অবচেতন উভয় মনের প্রকাশ। আর এই চেতন-অবচেতন মনের অভিব্যক্তিগুলির প্রকাশ ঘটাতে লেখককে সাধারণ প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের পরিকাঠামোয় আখ্যান বিন্যস্ত করলে চলবে না। তাই দেখা যায়, এই ধরনের মননধর্মী উপন্যাসে কাহিনি বা চরিত্রগুলি আপাতভাবে কিছুটা অসংলগ্ন, অবিন্যস্ত।

সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী তাঁর একটি গ্রন্থে এই ‘স্ট্রিম অব্ কনশাসনেস’ বা ‘চেতনাস্রোত’ তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা উইলিয়াম জেমস্-এর ‘দ্য প্রিন্সিপ্যালস্ অব্ সাইকোলজি’ (১৮৮৪) গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেটি হল —

“Consciousness, then does not appear to itself chopped up in bits... It is nothing, jointed, it flows. A ‘river’ or ‘stream’ are the metaphors by which it is most naturally described. In talking of it hereafter, let us call it the stream of thought, of consciousness or of subjective life.”[৭]

এই অংশটি থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, মানুষের মনের কোনো নির্দিষ্ট গতিপথ নেই। বাস্তবের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সে একইসঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিচরণশীল। ‘অন্তঃশীলা’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র খগেরনবাবুও নিঃসঙ্গ, একাকী। লাইব্রেরির চার দেওয়ালের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁকে জীবন কাটাতে হয়। যেহেতু তিনি আত্মকেন্দ্রিক মানুষ তাই তাঁর পড়াশোনার বিষয়বস্তুও আত্মসমীক্ষামূলক। তিনি কেনেন পাস্কালের Pensees, মার্কাস অরেলিয়ান, মঁতেইন প্রমুখ লেখকের বই।

লেখক স্বয়ং এবং ‘অন্তঃশীলা’ উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবুকেও আমরা দেখি ভার্জিনিয়া উলফ্ এবং প্রুস্ত-এর কথা স্মরণ করতে। তিনি নিজেই প্রুস্ত-এর মতো জীবন থেকে নির্বাসিত। স্ত্রী সাবিত্রীদেবীর মৃত্যুর পর খগেনবাবু হয়ে যান নিঃসঙ্গ। অবশ্য স্ত্রী জীবিত থাকতেও তিনি যে মনে মনে নিঃসঙ্গ ছিলেন না তাও নয়। খগেনবাবু চাইতেন স্ত্রী শুধু সহধর্মীই হবে না, হবে সহমর্মী। সেই জায়গাটাই তিনি স্ত্রী-র কাছ থেকে কখনো পাননি।

তৃতীয় যে ব্যক্তিকে নিয়ে খগেনবাবুর সঙ্গে সাবিত্রীদেবীর মানসিক অশান্তি ছিল, তিনি হলেন সাবিত্রীদেবীর বন্ধু রমলাদেবী। রমলাদেবীর সংস্পর্শে এসেই সাবিত্রীদেবী হয়ে ওঠেন আধুনিক। বিদেশি মহিলাদের মধ্যে রোগা হওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রমলাদেবী মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে রাতে খান না। তাই দেখে সাবিত্রীদেবীও রাতে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রমলাদেবীর মধ্যে খগেনবাবু এমন কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছিলেন যা সাবিত্রীর মধ্যে ছিল না। লেখক খুব সুন্দরভাবে রমলাদেবীর সঙ্গে খগেনবাবুর পরিচয়ের প্রসঙ্গটি ব্যক্ত করেছেন — “পরিচয়ের জন্য ধীর, শান্ত ও মৌন প্রতীক্ষার প্রয়োজন, চারপাশের ভিড় সরানো দরকার, গোধূলির নীরব অবসরে একটি তারা ফোটার মতন। সাবিত্রীর সঙ্গে পরিচয় ঝড়ের মধ্যে — ভাবপ্রবণতার আবর্তে, তাই আলাপ জমল না। রমলাদেবীর সঙ্গে পরিচয় ঝড়ের পরে, ভাব যখন নিঃশেষিত হয়েছে, তখনও ঝড়ের স্মৃতি রেশ টানছে।” (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

প্রেমও মানব মনস্তত্ত্বের একটি অঙ্গ। স্ত্রী সাবিত্রীদেবীর আকস্মিক মৃত্যুর পর থানা, কোর্ট, মর্গ থেকে একেবারে শবদাহ পর্যন্ত খগেনবাবু এতটাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন যে নিজের দিকে তাকানোর সময়ই পাননি। তখন তাঁর সমগ্র মনোরাজ্য জুড়ে শুধু প্রবাহিত হয়ে চলেছে নানা রকম চিন্তার স্রোত। মনে মনে তাঁকে যখন একাকিত্ব এসে গ্রাস করেছে তখন সেখান থেকে মুক্তি পেতে, রমলাদেবীর সাহচর্যের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন অস্ফুট প্রেমের ইঙ্গিত — “প্রেম জীবনের বিরোধ ঘুচিয়ে সামঞ্জস্য আনে — এই আশায় আন্দোলিত হয়েছে তাঁর অবসন্ন সত্তা।”

এরপর থেকেই রমলাদেবীর সাহচর্য, ক্রমে ক্রমে প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। নিজের নিঃসঙ্গ জীবনে, রমলাদেবীকে নিজের অজান্তেই কিছুটা অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন খগেনবাবু। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন অল্পবয়সি যুবক সুজন, রমলাদেবীর বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে যাওয়া-আসা করে, তখন ক্ষণিকের জন্য আন্দোলিত হয় তাঁর মন। সুজন অনেকটা রমলাদেবীর বিশ্বস্ত কর্মচারীর মতো, যদিও কর্মচারী নয়। সুজনের সঙ্গে রমলাদেবীর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তাও তিনি ভাবলেন। তাই রমলাদেবীর ওপর দীর্ঘদিন নির্ভরশীল হয়েও থাকতে পারেননি তিনি।

উপন্যাসের আখ্যানে একটি নিবিড় পুনরাবৃত্ত উপাদান হল যৌনচেতনা। ‘স্ট্রিম অব্ কনশাসনেস্’ রীতির উপন্যাসের পরিকল্পনায় সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর তত্ত্বের প্রগাঢ় প্রভাব আছে তা আমরা আগে বলেছি। ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের প্রধান দুটি দিকের একটি হল — অবচেতন স্তরের অস্তিত্ব ও রহস্য। দ্বিতীয়টি হল — মানুষের মনের অবদমিত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে যৌনচেতনার প্রাধান্য ও স্বীকৃতি। ‘অন্তঃশীলা’ উপন্যাসের ভাববস্তু প্রধান প্রবণতাই হল যৌনতাবোধ ও যৌনচেতনার বিভিন্ন দিক। প্রথমত, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ। রমলাদেবীর

প্রতি খগেনবাবু আকর্ষণ বোধ করেছেন। পরে দেখেছি, রমলাদেবীও খগেনবাবুর সঙ্গে যৌনচেতনাময় মানসিক সম্প্রক্ স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসে ঈর্ষার ভূমিকা অনেকটাই। ঈর্ষাবশতই সাবিত্রীদেবী আত্মঘাতী হয়েছেন। ঈর্ষাবশতই খগেনবাবু রমলাদেবী ও সুজনের সম্পর্ক নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন।

উপন্যাসটির শেষের দিকে তাই দেখি রমলাদেবীর সংসর্গ কিছুটা কাটিয়ে উঠে খগেনবাবু কাশীবাসী হয়েছেন। যদিও একটা টান তাঁর অবশ্যই ছিল রমলাদেবীর প্রতি। এই ভোগপিপাসু জীবন থেকে মুক্তি পেতেই তিনি কাশী যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি স্থির থাকতে পারেননি। কাশী থেকে চিঠি, ডায়েরি ইত্যাদি রমলাদেবীকে পাঠিয়েছেন সুজনের হাত দিয়ে। তা সত্ত্বেও 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটিতে দেখা যায় খগেনবাবু নিজেকে ধীরে ধীরে অনেকটাই সংযমশীল করে তুলেছেন। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন — "অন্তঃশীলা উপন্যাসে লেখকের শৈল্পিক অভিপ্রায়টি কী — এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে — প্রথম উদ্দেশ্য হল আধুনিক যুগের তিরিশের দশকের একজন 'ইনটেলেকচুয়াল টাইপ্' মানুষের মননক্রিয়ার বিশিষ্টতাটি তুলে ধরা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অবশ্যই চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা দান। ইনটেলেক্ট অর্থাৎ বুদ্ধিবাদী মানসিকতার দাবির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিলতা, সুপ্ত কামনা, খানিকটা সমাজেরও অনুশাসন। রমলাদেবীকে যেভাবে চেয়েছিলেন খগেনবাবু তা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল। ফলে তাঁদের দুজনকেই কলকাতা ছাড়তে হল এক অতৃপ্তি নিয়ে।"[৮]

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটিতে একটি কাহিনি অবশ্যই আছে, তবে তা প্রথাগত ছাঁচে গড়া নয়। খগেনবাবুর ভাবনায় আমরা যে সাহিত্য প্রসঙ্গ আসতে দেখি বারবার, তাঁকে বলতে শুনি — "সত্যিকার নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিতও নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই থাকবে না।" (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'চিত্রালী' পত্রিকায় লিখেছিলেন — "বইখানির গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক না হলেও, বঙ্গসাহিত্যে নতুনতর। Virginia Woolf-এর Mrs. Dolloway-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়কই প্রধান বক্তা বা মূল গায়েন। অন্যান্য চরিত্র দোহার মাত্র। সত্য ঘটনাও মেজ্‌রাফের মতো কেবল মনের তারে অনুরণন তোলবার জন্য যতটুকু থাকা আবশ্যক, তাই আছে।"[৯]

এই সমালোচনার উত্তর দেন ধূর্জটিপ্রসাদ 'বয়ান-ই তহরিরি' নামক রচনার মাধ্যমে। ওই পত্রিকাতেই ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে সহমত পোষণ করে তিনি লেখেন — "আবার বলি বইখানিতে চিন্তার চেয়ে তার সংযোগই অনুধাবনযোগ। এক্ষেত্রে প্রুস্ত ও উলফ্-এর পন্থাই লেখকের একমাত্র পন্থা। খগেন intellectual giant মোটেই নয়। এ যুগের intellectual type মাত্র, যার মননক্রিয়া বিশুদ্ধ নয়, স্মৃতি এবং ভাবমিশ্রিত।"[১০]

সামগ্রিক বিচারে বলা যেতে পারে যে, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটি আকারে ও প্রকারে প্রকৃত চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। আর কোনো বাংলা উপন্যাসে এ জাতীয় সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের কথা-শরীরে পাশ্চাত্য চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের ছাঁদ অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কথা সত্য এবং তা নিতান্তই স্বাভাবিক কারণ, সেই আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এ ধরনের সাদৃশ্য পাশ্চাত্য উপন্যাসগুলিতেও একটির সঙ্গে অপরটির মধ্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু 'অন্তঃশীলা' কোনোভাবেই অন্য উপন্যাসের অনুকরণ নয়। বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিকোণের দিক থেকে ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিকতা উপন্যাসটিতে অনুভব করা যায়। সবদিক থেকেই আমরা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা'-কে 'চেতনাপ্রবাহমূলক' উপন্যাস রূপে সার্থক বলতে পারি। বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে ধূর্জটিপ্রসাদের এই সৃষ্টি। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'অন্তঃশীলা' প্রসঙ্গে তাই যথার্থই বলেছেন — " 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত', এবং 'মোহানা'য় — তিনি অনুকরণ কাটাইয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। উপন্যাস ত্রয়ীতে তীক্ষ্ণ মননশক্তির সহিত খাঁটি ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সমাবেশ হইয়াছে। খগেনবাবুর আত্মসন্ধান ও জীবন-সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার দাম্পত্য-বিরোধের যে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ও হ্রস্ব সংকেত মিলে সেগুলি বর্ণৌজ্জ্বল্যে ও নির্বাচন-সার্থকতায় এক সম্পূর্ণ চিত্রে সংহত হইয়াছে।"[১১]

উল্লেখসূত্র :

১. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্তঃশীলা, 'বাক্' সংস্করণের ভূমিকা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ মে, ২০০৯, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১৯

২. এক-এর অনুরূপ, অন্তঃশীলা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

৩. এক-এর অনুরূপ

৪. এক-এর অনুরূপ

৫. অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৫, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৬৯

৬. পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩২ (পুস্তক পরিচয়, সমালোচক শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য)

৭. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, (উদ্ধৃতি William James, Principles of Psychology), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ; মাঘ ১৪২৪, জানুয়ারি ২০১৮

৮. সুমিতা চক্রবর্তী, উপন্যাসের বর্ণমালা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, অগাস্ট ২০১৬, পৃ. ১৩৮

৯. চিত্রালী পত্রিকা, মাঘ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ সংখ্যা

১০. নয়-এর অনুরূপ

১১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ বইমেলা ২০১৪, পৃ. ২৬৯

....

স্বার্থপরতাই স্বর্গে পৌঁছানোর সোপান (সসস)

ড. দীনবন্ধু বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, কালনা কলেজ, পূর্ব বর্ধমান

বিষয় সংক্ষেপ :

মান্ধাতার আমল থেকেই কিছু বক্তব্য বেদবাক্য হয়ে উঠেছে, তা হল- আপন স্বার্থ ত্যাগ করো। পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করো। পরের হিতই তোমার হিত। কর্ম করো ফলের আশা কোরো না। 'তোমার হৃদয়কুসুমকে অন্যের জন্যে প্রস্ফুটিত করিও'।[১] এগুলি আসলে মধ্যমেধার ছেঁদো যুক্তি অথবা লোকশিক্ষা দিতে প্রকৃত সত্যের কাছে পৌঁছাতে মিথ্যার আবরণ। প্রকৃতপক্ষে জীবনভর মানুষ আপন স্বার্থই চরিতার্থ করে চলছে। মানুষ আমের চারা লাগায়। চারিদিকে বেড়া দেয়। ছাগলের মুখ থেকে গাছকে রক্ষা করে। এটা ওই চারাগাছের প্রতি দরদ নয়। আসলে ওই গাছ বড়ো হলে প্রচুর মিষ্টি আম দেবে। মিষ্টি আমের স্বার্থেই ওই চারাগাছের প্রতি তার দরদ। বনালো আপাত অপ্রয়োজনীয় গাছকে মানুষ পরিচর্যা করে না।

পাশের বাড়ির বাচ্চা আর নিজের সন্তান একই সঙ্গে বিপদে পড়লে আপনি আপন সন্তানকেই কোলে নেবেন। কারণ আপন সন্তান বড়ো হয়ে আপনাকে দেখাশোনা করবে। আর সেই ভেবেই আপন সন্তানকে স্বার্থপরের মতো বড়ো করে তোলেবে। এটাই তো স্বাভাবিক। এতে দোষের কিছু নেই। অন্যের ক্ষতি না করে স্বার্থপরের মতো বড় হওয়া এই তো উন্নত প্রাণির লক্ষণ। গোরু, ছাগল, মোষ দুধ দেয় বলেই সে গৃহে পালিত। বাঘ, সিংহ, ভাল্লুককে কেউ বাড়িতে পোষে না। এদের থাকার জন্য আলাদা আস্তাবলও নেই। কারণ ওসব প্রাণি মানুষের প্রত্যক্ষ স্বার্থে কাজে লাগে না।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মানুষ আপন স্বার্থেই কাজ করে চলেছে। পরিবার থেকে সমাজ, দেশ, বিশ্ব সবেতেই মানুষের আপন স্বার্থপরতাই প্রকটিত। দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, সাহিত্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই সত্যই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

আকর শব্দ :

স্বার্থপর, ত্যাগ, মানুষ, শিক্ষা , চেতনা, বোধ, স্বার্থহীন

মূল প্রবন্ধ

প্রবন্ধের শুরুতেই একটা তর্কের আবহ তৈরি হল, তাই না? চিরকাল চলে আসা বিশ্বাসের সাথে একটা বিরোধ ঘটল। তা হল, স্বার্থহীন বলে কি কিছু হতে পারে না? এর উত্তর একশ শতাংশ 'না। কারণ স্বার্থের প্রকৃত স্বরূপ জানলে বোঝা যাবে বড়ো স্বার্থের কারণেই আমরা ছোট স্বার্থ ত্যাগ করি। একশো কুড়ি বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ 'শুদ্র জাগরণ' প্রবন্ধে ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন। তাঁর মতে- 'স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনমতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব।'[২] আর এই কারণেই বৃহত্তর স্বার্থের জন্য মানুষ ক্রমশই ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করে।

এবার আলোচনার একটু গভীরে ঢোকা যাক। ধরা যাক বঙ্কিমবাবুর 'অন্যের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও'।- এই কথাটি। এখানে 'অন্য' বলতে অপর নয়, তুমি আপনার স্বার্থে অন্যের হিতসাধনে মেতে ওঠো। এটা বলা অধিকতর সঙ্গত। অন্যকে ভালো করে তোলার মধ্যে রয়েছে আপন স্বার্থের চরিতার্থতা। কারণ আমরা কেউ একা বাঁচতে পারি না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের কোনো এক অংশের স্খলন ঘটলে, তার ঢেউ অন্যত্র আঁচড়ে পড়বেই। ভাববাদী আলোচনা ছেড়ে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

নিজের বাড়ির সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিবেশী বা দেশের ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিতে আমরা এগিয়ে যাই। আপাত নিঃস্বার্থে সরকারকে কর দিই। সেই করের টাকায় স্কুল কলেজ তৈরি করি। যাতে সমাজের অন্যান্য ছেলেমেয়ে সেখানে পড়ে মানুষ হতে

পারে (নীতি নৈতিকতা নিয়ে)। এ কর্ম ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ছাড়া আর কী? কিন্তু না, এ বনের মোষ তাড়ানো নয়, গভীরভাবে অনুভব করলে বোঝা যাবে নিজের পরিবারকে সুন্দর সুস্থ রাখতে অন্যদের মানুষ হয়ে ওঠার দায়িত্ব নেওয়া আপন স্বার্থে। সমাজে নীতি নৈতিকতা আছে বলেই আমরা ঘুম থেকে সকালে উঠে দেখি আমার বাড়ির আমগাছটার সব আম অন্যে এসে পেড়ে নেয় নি, পুকুরে বিষ ঢেলে সব মাছ কেউ মেরে দেয় নি। আখ ক্ষেতের সব আখ কেউ চুরি করে নেয় নি। স্টেশন ও প্রতীক্ষালয়ের ফ্যানগুলো কেউ খুলে নেয়নি। এগুলো সব আমার স্বার্থের বস্তু। এগুলো তালামেরে রাখা সম্ভব নয়, তবুও এরা অক্ষত। কারণ, আমরা সবাই সবাইকে শেখাতে পেরেছি এ অনৈতিক কাজ, অন্যায় কাজ। নিজের স্বার্থেই আসলে আমরা অন্যের হিতসাধন করি।

আপনি হয়তো বলবেন, পুলিশের ভয়ে মানুষ অনৈতিক পথে হাঁটছে না, এতে আমার স্বার্থ কী? আমি বলি, এ সমাজে পুলিশ বেশি নাকি মানুষ বেশি? রাস্তায় চলতে চলতে আমি যে বাঁ পাশ দিয়েই হাঁটতে থাকি, খানিক অসুবিধা হলেও (জ্যামে আটকে) ডানপাশে ঢুকে পড়ি না, বরং ডান পাশের মানুষগুলোকে সাইড দিই আগে বেরিয়ে যেতে। সেকি তার প্রতি দয়া দেখাতে? নাকি পুলিশের ভয়ে? এ দুয়ের কোনোটিই নয়। এমন আচরণ করি আপন স্বার্থেই। কারণ, ডানদিকের লোকটাও আমার পথে এসে পথকে আটকে দিতে পারে।

এবার পথ ছেড়ে ঘরে আসা যাক। বৃদ্ধ বাবা মাকে সন্তান সেবা করে। একি পিতামাতার প্রতি শুধুই নিঃস্বার্থ কর্তব্য পালন? মোটেও তা নয়। বুদ্ধিমান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দম্পতি ঠিক বুঝেছে বৃদ্ধ বাবা মায়ের প্রতি দম্পতির আচার আচরণ কেউ একজন আড়ালে বসে দেখছে। সে কে?... ধুর! ঈশ্বর হতে যাবে কেন? সে হচ্ছে ওই দম্পতির সন্তান-সন্ততি। অর্থাৎ ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নাতি-নাতনী। দম্পতি (দূরদর্শী) বেশ বুঝতে পারে তারাও একদিন বৃদ্ধ হবে। এখন বৃদ্ধ বাবা মাকে তারা যেমন সেবা করছে, এটা তাদের সন্তান সন্ততি দেখে নিক এবং শিখে নিক, তাহলে আখেরে তাদেরই লাভ। তারাও (দম্পতি) সময়ের পথ ধরে থুরথুরে হবে। অসহায় অসময়ে ছেলেমেয়েরাও যেন তাদের দেখে। ভবিষ্যতে সেই ভালো থাকার স্বার্থেই বর্তমানে বৃদ্ধ বাবা মায়ের প্রতি এমন উদার আচরণ। এ প্রসঙ্গে গায়ক নচিকেতার 'বৃদ্ধাশ্রম' গানটির অন্তিম অংশ খুব তাৎপর্যপূর্ণ- 'একশ বছর বাঁচতে চাই এখন আমার ষাট/ পঁচিশ বছর পরে খোকার হবে ঊনষাট।/ আশ্রমের এই ঘরটা ছোট, জায়গা অনেক বেশি/ খোকা-আমি দু'জনেতে থাকবো পাশাপাশি।/ সেই দিনটার স্বপ্ন দেখি ভীষণ রকম/ মুখোমুখি আমি, খোকা আর বৃদ্ধাশ্রম!'[৩] অভিমানী বৃদ্ধার অন্তিম আকুতি আমাদের দূরদর্শী হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ বোঝা গেল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বার্থপরতাই জীবের পরম ধর্ম। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই অন্যের হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করা দরকার।

এ প্রসঙ্গে চৈতন্যজীবনীতে আলোকপাত করা যাক। তাঁর জীবনে দুটি পর্ব। তিনি চব্বিশ বছর গৃহী এবং চব্বিশ বছর সন্যাসী। প্রথম পর্বে চৈতন্যদেব গৃহী, পণ্ডিত, শিক্ষক। দুবার দ্বারপরিগ্রহ করেন। প্রথম স্ত্রী সর্পদংশনে মারা গেলেও দ্বিতীয় স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে গৃহেই ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব সংসারধর্ম পালন করলেন না। তিনি মাতা এবং পত্নীকে সংসারে রেখে গৃহত্যাগ করলেন। একবিংশের আলোকে বলা যায় পত্নীকে সামাজিকভাবে ত্যাগ (ডিভোর্স) করলেন। পারিবারিক দৃষ্টিতে এর থেকে বড়ো স্বার্থপরতা আর কী হতে পারে? যুবতী স্ত্রীকে কোনো কারণ না দেখিয়ে ত্যাগ করা তো ক্রাইম। এমন ঘটনায় যেকোনো যুবক যুক্ত হলে তাকে সমাজ ও প্রশাসন দোষী সাব্যস্ত করতো। ছিছিক্কার পড়ে যেত গ্রামে-গঞ্জে। কিন্তু মানুষ কী কারণে চৈতন্যদেবের এমন অপরাধ ও নিন্দাজনক কাজ মেনে নিল? এর একমাত্র উত্তর মানুষ সবথেকে বেশি স্বার্থপর প্রাণি, তাই। মানুষের ধ্যান জ্ঞান সাধনা আপন স্বার্থ চরিতার্থের জন্য। চৈতন্যদেবের নীতি আদর্শ বাণী দ্বারা হাজার হাজার মানুষের হিতসাধন হল। তারা নিজের স্বার্থের কথা ভেবে চৈতন্যদেবকে মাথায় তুলে নিলেন। পারিবারিক অপরাধ গ্রাহ্যই করলেন না। বিরাট গঙ্গানদীর ঘোলা জলে ছোট শাখানদী এসে মিশলে যেমন গঙ্গার ঘোলাটে রঙ পাল্টাতে পারে না, তেমনি অনেকের স্বার্থসিদ্ধিকৃত সুনামে চৈতন্যদেবের পারিবারিক দুর্নাম ঢাকা পড়ে গেছে। তিনি বুঝেছিলেন নবদ্বীপের টোল আর মিশ্র-পরিবারের মধ্যে আটকে থাকলে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং পরিবারের কল্যাণসাধন হবে, বৃহত্তর সমাজে তাঁর আদর্শ প্রচারিত হবে না। আর সেই আপন স্বার্থেই তিনি পরিবার ও অঞ্চল ত্যাগ করেছেন। তাঁর খ্যাতি বাংলা ও বাংলার বাইরে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

'স্বার্থপর' এই শব্দের সাথে নিকট যোগ খ্যাতি, প্রতিপত্তির। যে যত বেশি স্বার্থপর সে তত বেশি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। এর বড়ো প্রমাণ, পৃথিবীর অজস্র প্রাণির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানুষ। সে বনের বাঘ, সিংহ এবং প্রাকৃতিক সম্পদকেও কাজে লাগিয়েছে আপন স্বার্থে। মানবসভ্যতার সকল উন্নয়নের পেছনে রয়েছে এই স্বার্থপরতা। একে খারাপ বলা যায় না। বরং যে যতটা দূরদর্শীভাবে নিজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে নিতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে এই পৃথিবীতে সে তত পরিমাণে খ্যাতি সুখ

যশ ভোগ করবে। তাই 'মানুষ স্বার্থপর' এই শব্দবন্ধে মানুষকে গালি দেওয়া হচ্ছে এই প্রবন্ধের লেখক তা বিশ্বাস করে না। এবার আসা যাক 'স্বার্থহীন-মানুষ' এই সমাসবদ্ধ পদের ব্যাখ্যাতে। এই পদার্থের গভীরে ঢোকার আগে প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো এমন শব্দবন্ধের কোনো অর্থ নেই। গৃহত্যাগি হাজী, মৌলবী, গোঁসাই, নাগাসন্ন্যাসী অথবা যোগীবাবা এঁরা সকলেই স্বার্থহীন ব্যক্তি বলে আরাধিত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাখ্যায় বোঝা যাবে এঁরা অধিকতর স্বার্থপর। কারণ, এরা সাংসারিক সুখস্বার্থ অপেক্ষা বেহেস্ত বা স্বর্গের অথবা নির্বাণের চির প্রশান্তি, সুখ, ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে চান। তাই তাঁদের এমন ধ্যান, জ্ঞান, পূজা, রোজা, সংকীর্তন ও নামাজ পড়া। এঁদের সকল কর্মের পেছনে রয়েছে একটি উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যর অর্থই স্বার্থ। বিভিন্ন সাহিত্যে ও সমাজে এর নিদর্শন রয়েছে। যেমন মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য়[৪] যাদব পণ্ডিত গাওদিয়া গ্রামের ত্রিকালদর্শী বাবাজি হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। কারণ তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল মৃত্যুর পরেও লোকে তাঁকে যেন সিদ্ধযোগী বা ত্রিকালদর্শী সাধক হিসেবে মনে রাখতে পারে। এই অমরত্ব পাওয়ার স্বার্থেই তার আত্মহত্যা।

এবার আসা যাক ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের দু-একজন নামজাদা ব্যক্তিত্বের কথায়। রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ বিশ্বের দরবারে একনামে উচ্চারিত। ভারতবর্ষের ঐক্যের সুরটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারততীর্থ' কবিতায় অতি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এইভাবে- 'হেথায় আর্য হেথায় অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চিন/ শক হুন দল পাঠান মোঘল একদেহে হল লীন'।[৫] এই কবিতার মূল কথাটি বিবেকানন্দ বিংশ শতাব্দীর ন'য়ের দশকে (শিকাগো বক্তৃতায়) বিশ্ববাসীর দরবারে তুলে ধরেন। আন্তরিক দরদী সুরে ভারতবর্ষের আর্থিক দৈন্যতার কথা প্রকাশ করেন এবং ভারতবর্ষের দৈন্যতা ঘোচাতে বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। বলেন এই ভারতবর্ষের মুচি মেথর সব আমার ভাই। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতির কথা বলেন। তাই তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসী। তাঁর একমাত্র স্বার্থ ছিল ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন এবং সনাতনী হিন্দুর স্বরূপ বিশ্বদরবারে তুলে ধরা। পৃথিবীর আরো যে দুশোর অধিক দেশ রয়েছে তাদের স্বার্থের কথা তিনি ভাবেন নি। আর ভাবেননি বলেই ভারতবর্ষের পাড়ায় পাড়ায় স্বামীজির মূর্তি স্থাপিত ও পূজিত হলেও বিশ্বের অন্য কোনো দেশে বিবেকানন্দকে নিয়ে এত মাতামাতি নেই। জাপান, কানাডা, ইজরাইল, চিন, ইরাক, ইরান, কুয়েত কোনো দেশেই ভক্তিভরে স্বামীজি পূজিত নন। কারণ, সে দেশের উন্নতির স্বার্থে, হোমে ও যজ্ঞে কোনো কাজেই স্বামীজি লাগেননি।

অর্থাৎ মোদ্দা কথা এই, মানুষজাতি এক নীতিতেই এগিয়ে চলেছে। তা হল- 'Give and take policy' অর্থাৎ তুমি আমার জন্য ভাবলে আমিও তোমার জন্য ভাববো। মানুষের শুধু দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক, স্বার্থহীন সম্পর্ক ভূত বা ভগবান দেখার সামিল। ভারতবর্ষের স্বার্থের কথা বিবেকানন্দ আজীবন ভেবেছেন। তাই ভারতের মানুষ তাঁকে পুজো করেছে। এর থেকেও আশ্চর্য (স্বার্থপরতার ইতিবাচক নিদর্শন) ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে ভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হল। সেখানে একচ্ছত্র মুসলিম শাসন কায়েম হয়েছে। তাদের স্বার্থানুসারে দেশটা গঠন করতে চেয়েছে। সেখানেও বিবেকানন্দ কোথাও চর্চিত ও পূজিত নন। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষের (স্বাধীনতার আগে) সব মানুষের জন্যেই তিনি ভেবেছিলেন। সেখানে পাকিস্তানিরাও ছিলেন, বাংলাদেশীরাও ছিলেন। তাহলে তাদেরও উচিত বিবেকানন্দকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করা।

কিন্তু উচিত অনুচিতের মূলেও সেই একই সূত্র কাজ করছে। তা হল- স্বার্থপরতা। পরাধীন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের দরবারে ভারতকে স্বামীজি পরিচিত করেছেন হিন্দু সনাতনী আদর্শের পথ ধরে। মুসলমানের কোরান হাদিজের মহিমাকীর্তন তিনি করেন নি। সেখানে বেদ পুরাণ আর গীতার মাহাত্ম্যই প্রচারিত। আর সেই কারণেই কট্ঠোরপন্থী মুসলিম সমাজে তিনি ব্রাত্য। এখানে একটা সত্য স্পষ্ট, স্বামীজির চেতনাতেও ছিল গণ্ডিবদ্ধতা। তিনি গীতাকে সামনে রেখে স্পষ্ট প্রচার করলেন- ব্রহ্ম এক আর আমরা সবাই তাঁর অমৃত সন্তান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তিনি শুধু ভারতবর্ষের দুঃখ যন্ত্রণার উদ্ধারকল্পে ব্রতী হলেন। বিশ্বের আর সকল মানুষও যে ঈশ্বরের সৃষ্টি বা অমৃতের সন্তান (তাঁর মতে) তা তিনি কোন অজ্ঞাত কারণে ভুলে গেলেন? তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। এতদিন সে প্রশ্নও কেউ তোলেনি। অথচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠ্যারে ঠোরে প্রতক্ষে পরোক্ষে ভক্তকে এই কথায় বলেছেন- ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।/ অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।[৬] অর্থাৎ এ গোটা বিশ্বের সৃষ্টি ধারণকর্তা ও লয়ের কারণ তিনি নিজেই। ব্রহ্মসংহিতার এ সব শ্লোক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রচার করার পরেও কোন স্বার্থপরতার কারণে বিবেকানন্দ শুধু ভারতবাসীর? আরও সংকীর্ণভাবে বললে ভারতীয় হিন্দু সনাতনীদেরই প্রচার ও বিকাশ ঘটালেন। অন্য জাত রয়ে গেল উপেক্ষিত। আর এই কারণেই বিবেকানন্দের বিস্তার ভারতবর্ষের সনাতনী সমাজে, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তত নয়। একই কারণে বিরসামুণ্ডা আদিবাসীদের কাছে পূজিত 'ধরতী আভা'[৭] নামে। শেখ

মুজিবর রহমান[৮] শুধু বাংলাদেশের জাতীর জনক। ন্যালসেন মেন্ডেলা[৯] কালো মানুষের নেতা, হজরত মহম্মদ[১০] মুসলিমের মুক্তিদূত, গৌতম বুদ্ধ[১১] বৌদ্ধদের দ্বারা পূজিত, যিশুখ্রিষ্ট[১২] শুধু খৃষ্টানদের উদ্ধারকর্তা, গুরু নানক[১৩] শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু।

এঁদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল আপন আপন জাতীর অগ্রগতি সাধন। তাঁদের ব্যক্তিগত প্রেমপ্রীতি, ভালোলাগা, ভালোবাসা স্বজাতির মধ্যেই বিকশিত আবদ্ধ। আর সেই কৃতজ্ঞতার কারণেই বোধহয় স্বার্থপরের মতো এঁরা শুধু আপন আপন জাতীর কথায় বলেছেন। আর যে মানুষ বা জাতি যার কাছ থেকে বেশি লাভবান হয়েছে সেই লাভের স্বার্থে তাঁকেই পুজো করেছে। এখানে স্বার্থহীনতা, পরোপকারী, উদার... এসব কথা শুধু কথার কথা ছাড়া কিছু নয়।

একবিংশে মানুষ আপন স্বার্থপরতায় স্পষ্ট বুঝেছে নিজের সমাজ, দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে অন্য দেশ ও সমাজের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয়তাবাদ যদি দেশাত্মবোধের স্বার্থ হয়, আন্তর্জাতিকতাবাদ তাহলে আরো বড় (আপনকে বাঁচানোর) স্বার্থপরতা। ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জোরে মানুষ স্পষ্ট বুঝেছে স্বদেশের সুখে শান্তিতে থাকতে হলে অন্য দেশকেও অপমান, অসম্মান করা যাবে না। এখন আর শুধুমাত্র আপন দেশের সীমান্তে তারকাঁটা মোটা করে বা পাঁচিল উঁচু করে দেশের শান্তি বজায় রাখা যাবে না। সকল দেশের হাতেই রয়েছে পারমাণবিক বোমা। এই বোমা বিস্ফোরণের ক্ষতিকর প্রভাব দেশের গণ্ডি মানে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে 'লিটল বয়'[১৪] আর 'ফ্যাট ম্যান'[১৫] এই দুই বোমার বিস্ফোরণে আজও গোটা বিশ্বের এখানে সেখানে পঙ্গু সন্তানের জন্ম হচ্ছে। জাপানের মানুষ শিক্ষা ও কর্মের উদ্দেশে যেখানে গেছে, সেখানেই এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এখন বৈদেশিক নীতি (সকল শক্তিধর দেশে) অনেক উদার। এই উদারতা কোনো দেশ বা জাতির নিঃস্বার্থ ব্যবহার নয়। এ প্রকৃত অর্থে নিজের দেশের প্রতি চরম স্বার্থপরতা। গোটা পৃথিবীতে তাই এখন আর আলাদা আলাদা দেশের ধারণা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। গোটা পৃথিবী এখন মনুষ্য বসবাসের একটাই দেশ। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘটে যাওয়ার ঘটনার প্রভাব ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, এক্স হ্যান্ডেল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। তাই এখন গোটা পৃথিবীকে সুস্থ রাখাই মানুষের আপন স্বার্থসিদ্ধির নামান্তর। খরা, বন্যা ভূমিকম্পে এক দেশ অন্য দেশকে সাহায্য করছে। এর মধ্যেও রয়েছে চরম স্বার্থপরতা, বৈদেশিক কূটকৌশল। নিজের দেশ চিরকাল এমনই থাকবে, প্রাকৃতিক ও বৈদেশিক আক্রমণ আমার দেশে হবে না, একথা কে বলতে পারে? তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আমি সুসম্পর্ক রাখি আপন স্বার্থে।

আসলে স্বার্থপরতার ব্যপ্তময় গভীরতা অনুভব করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, স্বার্থপরতা কোনো দোষের না বরং গুণের। যে জাতি যতবেশি দূরদর্শী সে তত স্বার্থপর, তত উন্নত। নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার সঠিক উপায় স্বার্থপরতার স্বরূপ জানা। বৃহত্তর দৃষ্টিতে সেই স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পেরেছে যে জাতি, তারাই স্বর্গীয় সুখের জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. কমলা কান্তের দপ্তর (একা কে গায় ঐ) - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অদ্রিশ পাবলিকেশন, কলকাতা ৭০০০৭৩, পাতা- ৫৭

২. শূদ্র জাগরণ - স্বামী বিবেকানন্দ। উনুচ্ছেদ সংখ্যা ৭

৩. নচিকেতার জীবনমুখী গান- 'ছেলে আমার মস্ত মানুষ, মস্ত অফিসার..'

৪. পুতুল নাচের ইতিকথা- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউ লতিকা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১৭, পাতা- ১৩৯

৫. সঞ্চিতা (ভারত তীর্থ) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পাতা ৩৪৮

৬. ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)

৭. অরন্যের অধিকার - মহাশ্বেতা দেবী, করুনা প্রকাশনি , কলকাতা ৭০০০০৭৩, পঞ্চবিংশ মুদ্রণ, পাতা ১২৭৭.

৮. শেখ মুজিবুর রহমান (১৭ মার্চ ১৯২০ – ১৫ আগস্ট ১৯৭৫), তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। তিনি ভারত বিভাজন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কেন্দ্রীয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। (তথ্য - উইকিপিডিয়া

৯. Nelson Mandela- '20 Great Persons of The World'- Edit by Sumer Chand, Manas Publications, Darya Ganj, New Delhi-11002, page- 137

১০. Prophet Mohammad- Do, page- 16
১১. Gautam Buddha- Do, page- 29
১২. Jesus Christ- Do, Page- 9
১৩. Guru Nanak- Do, Page- 48
১৪. লিটিল বয়- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একদম শেষের দিকে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট বেলা আড়াইটায় জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর পারমানবিক বোমা 'লিটল বয়' ফেলা হয়। ওজন ছিল ৪৪০০ কেজি, ভূমিতে পতিত হতে সময় নেয় ৫৭ সেকেন্ড। বিস্ফোরনের সময় তাপমাত্রা হয়েছিল ৩৯০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিস্ফোরনের পর ১ মাইল ব্যস্যার্ধের এলাকা জুরে ধ্বংশলীলা শুরু হয়ে যায়, হিরোশিমার প্রায় ৯০ ভাগ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাণহানি ঘটে প্রায় ১৪০,০০০ লোকের। (তথ্য উইকিপিডিয়া)
১৫. ফ্যাট ম্যান- ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট জাপানের নাগাসাকি দ্বীপপুঞ্জে দ্বিতীয় বিস্ফোরন ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই বোমাটি ছিল ৪,৬৩৩ কেজি ওজনের 'ফ্যাট ম্যান'। এই বিস্ফোরনের ১৩৫,০০০ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। (তথ্য-উইকিপিডিয়া)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

* লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক), চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ , রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা ২৯
* রায়, নীহাররঞ্জন বাঙ্গালীর ইতিহাস , দেজ পাবলিশিং কলকাতা-৭৩।
* সেন পৃথ্বীরাজ - চাণক্য শ্লোক, লতিকা প্রকাশনী, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯
* বঙ্কিম রচনাবলী (প্রবন্ধ), দেজ পাবলিশিং কলকাতা-৭৩।
* বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক - পুতুল নাচের ইতিকথা, রত্নাবলী, ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯
* শ্রীমদ্ভাগবত – মহাপুরাণ, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-২৭৩০০৫(ইন্ডিয়া)
*ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – সঞ্চয়িতা, দেজ পাবলিশিং কলকাতা-৭৩
* ইসলাম, নজরুল- সঞ্চিতা - ডি. এম. লাইব্রেরী / ৪২ বিধান সরণী / কলকাতা-৭০০০০৬
* দেবী, মহাশ্বেতা - অরণ্যের অধিকার, দেজ পাবলিশিং কলকাতা-৭৩
* Chand, Sumer - 20 Great Persons of The World- Manas Publications, Darya Ganj, New Delhi-11002
* Desai, Mahadeb -Mahatma Gandhi an Autobiography - FP Classics, Darya Ganj, New Delhi-11002
* Website – Google - Wikipedia

....

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শোচক

হুমায়ুন কবির
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম

সংক্ষিপ্তসার

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনায় অবহিত হওয়া যায়, সামাজিক অবস্থায় সেসময় মানুষ একান্নবর্তী হয়ে বসবাস করতেন। একের উৎসবে যেমন সমবেতভাবে যোগ দিতেন, তেমনি একান্নবর্তী পরিবারের প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতেন। মানবহৃদয়ের সহজাত প্রবৃত্তি শোক। মৃত্যুশোক নিয়ে লেখা কোনো রচনা এই সময়পর্বে পাওয়া না-গেলেও প্রিয়জনের মৃত্যুতে চরিত্রের শোক ও বিলাপ করুণ রসের আধারে ফুটিয়ে তুলে কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কবিগণ। ফলে সেসব চরিত্রের ব্যক্তিগত শোক তখন কবিপ্রতিভা বলে বিশ্বজনীন মাত্রা লাভ করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যে পুত্র হারানোয় সকল সংসার শূন্য হওয়ার বেদনা জননী সনকা ও পিতা চাঁদ সওদাগরের শোকানুভূতি করুণ রসে কবি বর্ণনা করেছেন। প্রিয়া বিয়োগের বেদনাবিধুর শোকোচ্ছ্বাস রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের মজনু, রাজা লোর, পূর্ববঙ্গ গীতিকার দুলাল চরিত্রে পাই, তেমনি স্বামী বিয়োগে সন্ন মালা, মহুয়া, চাঁদ সওদাগরের সাত পুত্র বধূর শোক কবিপ্রতিভা বলে আস্বাদনাত্মক হয়ে উঠেছে।

সূচকশব্দ :

শোচক, মধ্যযুগ, বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, মঙ্গলকাব্য, প্রণয়কাব্য, গীতিকা।

মূল আলোচনা :

ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে শোক কবিতা রচনা করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও মধ্যযুগের দেব নির্ভর সাহিত্যে শোচক পরিলক্ষণ করতে পারি। 'শুচ' ধাতু থেকে এসেছে 'শোক' শব্দটি, এর আভিধানিক অর্থ চিত্তপ্রীড়া, খেদ প্রভৃতি (বঙ্গীয় শব্দকোষ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'বাংলা শোচক সাহিত্য' গ্রন্থের লেখক ড. অমলকুমার ঘোষ জানিয়েছেন— "কোনো প্রিয় ব্যক্তির বা বস্তুর বিনাশ ঘটলে (বা বিনাশের সম্ভবনা থাকলে) আমাদের মনে এমন এক অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম হয়, যখন সাময়িকভাবে হলেও আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। দুঃখের এই চরম অনুভূতিই শোক।"[১] মিত্রাদি বিয়োগে প্রিয়জনের অর্থাৎ ভাইবোন, মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্র, গুরুজনের মৃত্যুকে ঘিরে শোক ব্যক্ত করে কবিতা রচনা করেছেন মহিলা কবি রহিমুন্নিসা, শ্যামপ্রিয়া প্রমুখ। রহিমুন্নিসা অনুজভ্রাতা আবদুল গফুরের মৃত্যুতে রচনা করেন শোককবিতা (সম্পাদক এনামুক হক নাম দিয়েছেন 'ভ্রাতৃবিলাপ'), আবার ভগ্নী নৃপবালার মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে কবিতা রচনা করেন অচর্চিত সাহিত্যিক তথা জমিদার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী (১৮৭৬-১৯২৯ খ্রি.)। বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪ খ্রি.), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯ খ্রি.) প্রমুখ চর্চিত কবিদের নাম এখানে বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করা হল মাত্র।

আদিকবি বাল্মীকি এক নিষাদের শরে ক্রৌঞ্চমিথুন নিহত হইলে উদ্‌বেলিত হৃদয়ের বাণীরূপে এক শ্লোকের সৃষ্টি করেছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রচিত শোচক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, মহিলা কবি শ্যামপ্রিয়ার রচিত শোচক কবিতা, গুরু রসিকানন্দের মৃত্যুতে তিনি এটি রচনা করেন। চণ্ডীদাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লেখা পঞ্চদশ শতাব্দীর রজকিনী রামীর শোক গীতিকাটির কথাও এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। করুণরস শোক কবিতার মুখ্য অবলম্বন। প্রাগাধুনিক একান্নবর্তী পরিবারে প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে শোকবিলাপ কবি বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে করুণরস ফুটে উঠে সার্বজনীনতা লাভ করেছে। প্রিয়বিচ্ছেদে মধ্যযুগীয় কাব্যের চরিত্রের চিত্তপীড়া কবি যেভাবে বর্ণনা করেছেন নিম্নে বিভিন্ন সাহিত্য শাখা অবলম্বনে আলোচনা করা হল—

মঙ্গলকাব্য শাখার বসিরহাটের পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর 'মনসাবিজয়' (১৪৯৫ খ্রি.) কাব্যে চাঁদ সওদাগরের ছয় পুত্রের মৃত্যুতে তাঁদের বধূদের রোরুদ্যমানা শোকোচ্ছ্বাসের উল্লেখ কয়েক পঙ্‌ক্তিতে করেছেন। ছয় পুত্রের নাম যথাক্রমে— সর্বানন্দ, পুরন্দর, সুন্দর, বিদ্যানন্দ, নারায়ণ ও জনার্দন। বাল্যেই তাঁদের বিয়ে হয়, ভার্যাদের নাম জানা যায় না। পালায় দেখা

যায় ছয় ভাই প্রভাতে গুরুর কাছে পড়তে যাবে, কিন্তু তাঁদের ইচ্ছা অন্ন খেয়ে পড়তে যাবে। কালনাগিনীর বিষমিশ্রিত অন্ন খেয়ে ছয়ভাই ছটফট করতে লাগলে বালিকা বধূরা দেখে 'হাসিয়া বিকল'। একসময় ছয়পুত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে ছয় বধূদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

"ছয় কুমারের মৃত্যু ছয় বধূ দেখিয়া। উচ্চস্বরে কান্দে মৃত পতি কোলে লৈয়া।।
রোদন্তি যুবতী অতি পতি করি কোলে। রূপ গুণ ভাবিতে বুড়িল শোকজলে।।"[২]

ছয়পুত্রের মৃত্যুর পর চাঁদ সওদাগরের অবর্তমানে সনকা সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের জন্ম দেন। পিতার অবর্তমানে পুত্রকে জননী সনকা লেখাপড়া শেখান, তারপর তাকে রাজপদে বরণ করা হল। চাঁদ সদাগর বাণিজ্য থেকে ফিরে এসে একমাত্র জীবিত কনিষ্ঠ পুত্রের পরিণয় সম্পন্ন করেন উজানি নগরের সাহে ও সুমিত্রার কন্যা বেহুলার সঙ্গে। লোহার বাসর ঘরে বিবাহের রাত্রে লখিন্দর সর্পদংশনে মৃত্যু বরণ করেন। লখিন্দরের মৃত্যুতে সদ্য পরিণীতা বধূ বেহুলা ও জননী সনকার শোকতপ্ত বিলাপের ছবি কবি তুলে ধরেছেন। স্বামীর মৃত্যুতে বেহুলার করুণ ক্রন্দন—

"কোলে করি ধরি প্রভু নেহালে বদন। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক চেতন।।
নিশ্চয় মরিল প্রভু হইনু অনাথিনী। প্রভু প্রভু বলি ডাকে লোটায়ে ধরণী।।
কান্দয়ে বেহুলা কর হানিয়া কপালে। এত দুঃখ বিধি মোর দেয় কর্মফলে।।
জনমে জনমে কতো খণ্ডব্রত কৈনু। অখণ্ড শ্রীফল পত্রে হর না পূজিনু।।..."[৩]

বেহুলা স্বামী লখিন্দরকে কোলে করে কাঁদতে লাগলেন, বিয়ের রাত্রিতে বাসরঘরে নববধূর কান্না উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। ক্রন্দনের রোল সনকার কর্ণগোচর হলে তিনি দাসী মারফত খোঁজ নিয়ে পুত্রের মৃত্যু সম্পর্কে অবগত হন। একমাত্র জীবিত পুত্রের মৃত্যুতে শুরু হয় জননীর বিলাপ—

"হাহাকার সনকা লখাই করি কোলে। বদনে বদন দিয়া সঘন নেহালে।।...
কে মোরে ফেলিল বাঁধি এ শোকসাগরে। কতেক পুত্রের শোক সহিব শরীরে।।
উঠ লখিন্দর কত নিদ্রা যাও। তোমার জননী ডাকে উত্তর না দেও।।
পূর্ণ শশধর সুধা বদন তোমার। দুঃখিনীরে মা বলিয়া ডাকো একবার।।..."[৪]

পুত্রশোকাতুরা সনকার দুঃখও মর্মস্পর্শী। পুত্র শোকে তিনি ধরাতলে থাকতে চান না— জলে ডুবে, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে বা 'গলে দিয়া কাতি'-তে আত্মহত্যা করে যমপুরে পুত্রের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছেন। ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর লখিন্দরকে ঘিরেই ছিল তাঁর জীবনস্পৃহা, যাবতীয় মায়াবন্ধন কিন্তু সেই পুত্রের মৃত্যু সনকার মনে চরম আঘাত হানে, পুত্র শোক কোনোভাবেই প্রশমনের নয় তাই তিনিও মৃত্যু বরণ করে স্বর্গবাসী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে শোক কবি সেভাবে পরিসর জুড়ে ব্যপ্ত করে প্রকাশ করেননি কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু বেদনায় তাঁর শোকবেদনা বাঙালি জননীরই প্রতিচ্ছবি। পুত্রশোকে পাগলপ্রায় চাঁদ সদাগরের ভূমিতে লুটিয়ে ক্রন্দন ও বিলাপ সর্বকালের হয়ে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে ফুল্লরার বারোমাসি অংশে ফুল্লরার দুঃখময় জীবনের বর্ণনা পাওয়া গেলেও 'পশুগণের ক্রন্দন' অংশে বরাহের দেবী চণ্ডীর কাছে করুণ বিলাপ লক্ষ করি। ধর্মকেতু নন্দন ব্যাধ কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ট বিজুবনের পশুগণ তমাল তরুতলে দেবী চণ্ডীর দ্বারস্থ হয়ে অতিষ্ঠের কথা ব্যক্ত করেন। বরাহের দেবীর কাছে বিলাপ—

"শাশুড়ি ননদ মরে দেওর ভাসুর। পতি গেল রতি সুখ বিধি কৈল দূর।।
ছিল মাত্র অভাগীর কোলে এক পো। পাশরিতে নারি গো তাহার মায়া মো।।"[৫]

এখানে পতি ও পুত্রের মৃত্যু বেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। জীবনরসিক কবি মুকুন্দ এখানে যেন ব্যক্ত করেছেন সমাজ-সংসারের আপনজন হারানো কোনো এক নারীর বেদনাঘন নিবেদন। কেবল বরাহ নয়, এখানে ভালুক, শজারু, হস্তী প্রভৃতির নিবেদনও লক্ষ করি। এসবের মধ্যদিয়ে কবি সেই সময়ের উৎপীড়িত মানুষদের প্রতিচ্ছবি প্রকারান্তরে এঁকেছেন।

রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের মধ্যেও আমরা প্রিয়জনের মৃত্যুতে উত্থিত শোকের বর্ণনা হতে দেখি। ষোড়শ শতাব্দীর 'লায়লী-মজনু', সপ্তদশ শতাব্দীর 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' কাব্যে প্রিয়ার মৃত্যুতে প্রিয়ের শোকবেদনা লক্ষণীয়। দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-

মজনু' কাব্যের লায়লী ও মজনুর মধ্যে পাঠশালায় প্রথম প্রেমের সঞ্চার হয়। তাঁদের প্রেম একনিষ্ঠ হলেও ধর্ম, সমাজ সচেতন লায়লী-মজনুর মিলন হয়নি। লায়লীকে পিতা-মাতা ঘরের বাহির হতে দিতেন না, তাঁর অন্যত্র বিয়ে দেওয়া হয়। মজনুগতপ্রাণা লায়লী বাসর ঘরেই স্বামীকে চরণ প্রহার করেন। শেষপর্যন্ত মজনু বিরহে লায়লী মৃত্যু বরণ করেন। শেষশয্যায় লায়লীকে দেওয়া কথার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে জননী নজদবনে মজনুকে মৃত্যু সংবাদ দেন। প্রিয়া মৃত্যুর সংবাদে মজনু হয়ে পড়ে অবচেতন। দৈবের কৃপায় চেতনাপ্রাপ্ত হয়ে নজদবন থেকে আরব দেশে লায়লীর কবর ঘিরে নানাভাবে বিলাপ করেন। মজনুর শোক কবি দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের ধীর লয়ে বর্ণনা করে পাঠকের সামনে প্রকটিত করেছেন। শিশুকালের ভালোবাসা থেকে যৌবনে বিরহে বিচ্ছেদের প্রেমতাপ, বনেবাস সব কিছুই উঠে এসেছে মজনুর বিলাপে। কুসুম কোমল জিনি শরীর খাট পালঙ্ক ছেড়ে কীভাবে মাটির শয্যায় শুয়ে রয়েছেন ? মজনু বিশ্বাস করতে পারেছেন না, প্রিয়ার মৃত্যু এমনভাবে তাঁকে আঘাত দিয়েছিল যে মজনু নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি, সেও পরপারে গিয়ে মিলিত হয়ে 'বক্ষে বক্ষে' সবসময়ে 'মন সুখে' মজে থাকতে চেয়েছেন। লায়লীর কবর কোলে নিয়েই সে প্রাণত্যাগ করেছেন—

"দুই ভুজ প্রসারিয়া কবর কোলেতে লৈয়া
প্রেমভাবে মজনু সুজন।
লায়লীর নাম ধরি হাহাকার শব্দ করি
ততক্ষণে তেজিলা জীবন।।"[৬]

মৃত্যুকালে ভগবানের নাম উচ্চারণ নয়, লায়লীর নাম উচ্চারণে প্রাণ ত্যাগ করে একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। লায়লীকে ঘিরে মজনুর বিলাপ হৃদয় ব্যথিত করে তোলে। সন্তান হারানোর বেদনায় লায়লীর মাতার মধ্যে মাতৃসত্তার শোক উত্থিত হতে দেখা যায় নজদবনে মজনুকে সংবাদ দেওয়ার সময়। একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে সে নিজেকে 'অভাগিনী' জ্ঞান করেন। তাঁর 'অমূল্যরতন' কন্যা লায়লীর মৃত্যুতে সে বিধাতাকে তাঁর উপর কঠিন বলে দোষারোপ করেন। প্রিয় কন্যা লায়লীর জন্য শোকার্ত মায়ের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই তাঁর আক্ষেপার্তি— "প্রাণের দোসরী সুতা বিধি নিল হরি।" কন্যাকে তিনি একসময় ঘরের বাহির হতে দিতেন না, গঞ্জনা দিতেন—এসব কঠিন আচরণ ভুলে কন্যা বিয়োগের বিলাপে তাঁর মাতৃসত্তা বড়ো হয়ে উঠেছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র কয়েকটি পালাতেও আমরা করুণরসপূর্ণ কাহিনি পাই। সে করুণরস সিঞ্চিত হয়েছে বিভিন্নভাবে— স্ত্রীর মৃত্যুতে, প্রেমিক বা দয়িত বিয়োগে, সখীর মৃত্যু প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। দ্বিজ কানাই রচিত 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালাতে নায়িকা সুন্দরী মহুয়াকে কেন্দ্র করে হুমরা বেদে ও তার অপর এক পালিতা কন্যা পালং-এর শোকবিহ্বল অভিব্যক্তি বর্ণিত হয়ে পালায় করুণ রসের সঞ্চার ঘটেছে। যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের দলের সর্দার হুমরা বেদে, যার জীবিকা খেলা দেখিয়ে রোজগার করা, সুযোগ বুঝে দস্যুপনাও করে থাকে। সর্দার দলবল নিয়ে ধনু নদীর পারে কাঞ্চনপুর গ্রামের ব্রাহ্মণের পল্লিকুটির থেকে এক ছয় মাসের শিশুকন্যাকে তমসাঘন নিশীথে চুরি করে, নাম রাখে মহুয়া। পিতৃমাতৃস্নেহেই বড়ো করে এবং শারীরিক কসরত শেখায়। যদিও এসবের বর্ণনা কবি দেননি তবুও ষোড়শী মহুয়াকে নিয়ে বর্ণিত পালার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে এমনটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ষোলো বছরের যুবতী সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে হুমরা বেদের দল প্রায় একমাসের পথ অতিক্রম করে বামনকান্দা গ্রামে উপনীত হয়।

বামনকান্দা গ্রামের জমিদার নদেরচাঁদের সঙ্গে বেদে কন্যা মহুয়ার প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন হলে তারা হুমরা বেদের শঙ্কায় গৃহত্যাগ করে নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে নির্জন বনভূমিতে আশ্রয় নিয়ে ছয় মাস মতো সুখে অতিবাহিত করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। অন্বেষণরত হুমরা বেদে সদলবল উপনীত হয়ে নদেরচাঁদের প্রাণ সংহারে উদ্যত হয়, পালিতা কন্যা মহুয়ার হস্তে দেয় বিষলক্ষের ছুরি। প্রাণপ্রিয় নদেরচাঁদকে ছুরিকাঘাত যেমন মহুয়ার অসম্ভব ছিল তেমনি অসম্ভব ছিল হুমরা বেদের অনুজ ভ্রাতা সুজনকে উদ্বাহ করা। মনের সুতীব্র টানাপোড়নে সে নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করে ইহলোক ত্যাগ করেছে।

মহুয়ার মৃত্যুতে নিষ্ঠুর হুমরা বেদের মনে সন্তান হারানো পিতৃসত্তার শোক বেদনার প্রকাশ লক্ষ করি। সে ছয়মাস থেকে পিতৃমাতৃস্নেহে মহুয়াকে বড়ো করেছে। সেই কন্যার মৃত্যুতে শোকাকুল হুমরা বেদ দল ত্যাগ করে বনবাসের সংকল্প করেছে। এতদিন যে দলের সঙ্গে মহুয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল সে আর দলে নেই, সেই দলের সঙ্গে হুমরা থাকতে চায় না, দেখতে চায় না। চুরি করে নিয়ে এলেও শিশুকাল থেকে পিতার মতো পালনে তার মনের মধ্যে গড়ে ওঠে কন্যাবাৎসল্য, স্নেহ-ভালোবাসা।

হুমরা বেদের অপর এক পালিতা কন্যা পালং ছিল মহুয়ার সখী এবং হিতৈষিণী। হুমরা বেদে তাকেও মুক্তি দিয়েছে। সখীর মৃত্যুতে তার অভিব্যক্তি পালায় করুণরস সঞ্চারিত হয়েছে। তার বিলাপের পঙ্‌ক্তিগুলো মর্মস্পর্শী—

"উঠ উঠ মহুয়া সখী
তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি পালং সই
উইঠ্যা একবার কথা কও।।...
উইঠ্যা আইস পরাণ সইলো
মোরা ফুল তুলবাম গিয়া।।..."[৭]

পালং ছিল মহুয়ার 'সুখ দুঃখের সাথী'। সখীর মৃত্যুর পর তার বিলাপকে পালাকার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। মহুয়ার বেদনায় পালং সইয়ের মতো বনের পশুপাখিরাও সমান দুঃখী। ময়ূর-ময়ূরী পেখম মেলে না, অশ্রুসিক্ত নয়নে হরিণ এসে দাঁড়ায়, এমনকি গাঙ্গের ঢেউ কেঁদে ফিরে মহুয়ার মৃত্যুতে। তাই পালং সই মহুয়াকে চিরনিদ্রা থেকে উঠে আসতে বলেছে প্রাণের দোসর নদের চাঁদকে নিয়ে। বেদের দল আর সেখানে নেই, চলে গেছে, এখন তাদের আর কোনো শঙ্কা থাকবে না। পালার নায়িকা চরিত্রে মহুয়ার মৃত্যুকে ঘিরে হুমরা বেদে এবং পালং সই-এই দুই চরিত্রের বিলাপ প্রসঙ্গে ড. অমলকুমার ঘোষ তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন— "একদিকে পালিতা কন্যা মহুয়ার মৃত্যুতে হুমরা বেদের কাতরোক্তি ও বিলাপ অন্যদিকে বন্ধুবিয়োগে শোকাকুল সখী পালং এর বেদনার্ত হৃদয়ের প্রকাশ— পালাগানের এই দুইটি চিত্রকে মধ্যযুগের শোকসঙ্গীতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবেই ধরা যায়।"[৮]

'দেওয়ান মদিনা' পালায় পত্নীর মৃত্যুতে পতির অনুশোচনাদগ্ধ হৃদয়ের বিলাপ বর্ণিত। বিমাতার চক্রান্তে সোনাফর মিঞার ঔরসজাত সন্তান আলাল ও দুলাল সংসার থেকে বিতাড়িত হয়। দুলাল কাজলকান্দার ব্যাপারী হীরাধরের গৃহে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে হীরাধর তনয়া মদিনার সঙ্গে পরিণয় সম্পন্ন হয়। সুখী দাম্পত্যজীবন থেকে ভাই আলালের প্রলোভনে দুলাল পত্নী, সুখীপরিবার, সংসার ত্যাগ করে বান্যাচঙ্গে এসে দ্বিতীয় বিবাহ করে সংসার গড়ে তোলে। পতিগতপ্রাণা মদিনা স্বামী বিরহে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করে। বিবেকের দংশনে জর্জরিত দুলালের শুরু হয় স্মৃতিরোমান্থন— স্ত্রী মদিনার প্রেমের মর্যাদা সে রক্ষা করেনি, আশ্রয়দাতা হীরাধরের প্রতিও সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে কাউকে না-জানিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে কাজলকান্দায় ফিরে গেছে কিন্তু গিয়ে দেখে মদিনা কবরে চিরনিদ্রিত। শুরু হয় তার বিলাপ—

"ভালো যুদি বাসো মদিনা
মোরে দয়া না করিয়া।
তোমার কাছেতে মোরে
নেও রে টানিয়া।।...
তিলেক না থাকিতা তুমি
আরে ছাড়িয়া আমারে।
পায়ে ঠাই দিয়া রাখ
তোমার কাছারে।।"[৯]

পত্নী মদিনার বিরহে দুলালের কাছে জগতজীবন পরম শূন্য বলে মনে হয়। সেও পরলোকে মদিনার সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছে। 'বুকের কলিজা' বিশেষণে সম্বোধন করে বিলাপ করে নিজকৃতকর্ম সম্পর্কে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। পত্নী মদিনাকে হারিয়ে দুলালের 'বুক হইল চির'। দুলালের এই বিলাপ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডে সংকলিত অজ্ঞাতনামা কবি রচিত 'সন্ন মালার পালা'য় সোনার বরণ কন্যা সন্ন মালার পতি-মৃত্যু জনিত বেদনা ও বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। বনবাস থেকে সন্ন মালাকে এক সওদাগর উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। অপর এক রাজপুত্রের চক্রান্তে সর্পাঘাতে সন্ন মালার পতি তথা সওদাগর পুত্র মৃত্যু বরণ করে। পতির মৃত্যুতে সন্ন মালার শোক ব্যক্ত করেছেন কবি। যে নদীতে স্বামীকে ভেলায় করে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তার কূলে দিবানিশি কেঁদে ফিরে সন্ন মালা।

দেবদেবী নির্ভর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবিক সুখ-দুঃখের আবেদনও বিদ্যমান। এই সময়েই রচিত হয়েছে মানব-মানবীর রোমান্টিক প্রণয় কাহিনি। প্রণয়কাব্য 'সতীময়না', 'লায়লী-মজনু' কাব্যে দয়িতের শোকানল তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে। মনসামঙ্গল কাব্যে পুত্র মৃত্যুর দুঃখে মাতাপিতার শোকতপ্ত হৃদয় যেমন আলোড়িত, তেমনি স্বামী হারানো সদ্য বিধবাদের রোরুদ্যমানা শোকোচ্ছ্বাস উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। মানবেতর প্রাণীর শোকের বর্ণনা করে প্রচ্ছন্নভাবে সমাজের অবকাঠামোর দিকটিও দেখিয়েছেন জীবনরসিক কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। রাজা লোর, মজনু, দুলাল, মদিনা, সন্ন মালা প্রভৃতি চরিত্রের সংসারের প্রিয়জনের মৃত্যুতে আত্মমৃত্যুর কামনা সংসারের পরিচিত মানুষদের বিলাপ ও বাসনারূপে পাঠকের মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

অন্ত্যটীকা

১. ঘোষ, অমলকুমার, 'বাংলা শোচক সাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ-১১

২. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল', রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২২, পৃ-৩৮০

৩. তদেব, পৃ-৪৪৮

৪. তদেব, পৃ-৪৪৯

৫. মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), 'চণ্ডীমঙ্গল-পরিক্রমা', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ-৬৪

৬. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), 'লায়লী-মজনু', দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১১, পৃ-২২২-২২৩

৭. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (প্রথম খণ্ড), ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ-৮৫

৮. ঘোষ, অমলকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪১

৯. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১, পৃ-৩১২-৩১৩

সহায়ক গ্রন্থ

১। ঘোষ, অমলকুমার, 'বাংলা শোচক সাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৬।

২। বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল', রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২২।

৩। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), 'চণ্ডীমঙ্গল-পরিক্রমা', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩।

....

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলঃ উনবিংশ শতকের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

মহুয়া মুখার্জী
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার , নকশালবাড়ি কলেজ

সারসংক্ষেপ

উনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের নবজাগরনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর সৃজনশীল চিন্তা, বহুধাব্যাপ্ত প্রতিভা তাঁকে কিংবদন্তিতে পরিনত করেছে। জ্ঞানের এমন কোন দিক নেই যা তিনি স্পর্শ করেননি। যদিও তিনি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রূপেই অধিক পরিচিত কিন্তু তাঁর জ্ঞানচর্চার পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন তৎকালীন ভারতীয় জ্ঞানচর্চার জগতে এক অনন্য প্রতিভা।তাঁর শিক্ষাচিন্তা বর্তমান কালেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ব্রজেন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখার মধ্যে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা, পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার গুরুত্বের কথাও স্থান পেয়েছে। সর্বোপরি, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির সন্ধান এবং বিশ্লেষণ করতে তিনি গভীর আগ্রহী ছিলেন। বাংলার সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। আচার্য শীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন।এরূপ একজন প্রতিভাবান চিন্তানায়ক, নবজাগরনের একজন অসাধারন স্থপতি বিস্তৃতির অন্তরালে হারিয়ে যেতে বসেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে উনবিংশ শতকের এই প্রথিতযশা অধ্যাপকের কৃতিত্ব ও অবদান সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম অনেকটাই অজ্ঞ। উনবিংশ শতকে নবজাগরনের অসংখ্য মহান ব্যক্তিদের মধ্যিখানে গভীর পাণ্ডিত্য, সাংস্কৃতিক চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ব্রজেন্দ্রনাথ কিভাবে একটি স্থান অর্জন করতে পেরেছিলেন, তার অনুসন্ধানই এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

মূলশব্দঃ

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নবজাগরন, বৌদ্ধিক প্রভাব, বহুমুখী প্রতিভা, দর্শনচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা, মাতৃভাষা

উনবিংশ শতকের বহু গুনী ব্যক্তিদের মাঝে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাংলা তথা ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। দার্শনিক হিসেবে তিনি অধিক পরিচিত হলেও জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হিসেবেও আচার্য শীল সকলের কাছে সমাদৃত। তাঁর শিক্ষাচিন্তা বর্তমান কালেও প্রাসঙ্গিক। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী সত্যের পূজারি। আন্তর্জাতিক স্তরে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজি ও বাংলায় লেখা বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তাঁর বহুধাবিভক্ত জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে। অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভাষায় তিনি ছিলেন এক 'জ্যান্ত বিশ্বকোষ'।

রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে বাংলায় যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিলো সেই পথেরই পথিক হলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। রামমোহনের সার্বজনীন এবং সমন্বয়ী মানবতাবাদের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা রামমোহনের জীবনীগ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি অধ্যায় সংযোজন করেছিলেন যেখানে রামমোহনের আস্তিক্য বিশ্বাসের দার্শনিক চিন্তাভাবনা তিনি তুলে ধরেছিলেন।[১] যুক্তি ও ধর্মশাস্ত্রের মিলন ঘটিয়ে রামমোহন যে বিশ্বমানবিকতার স্তরে পৌঁছেছিলেন তার ব্যাখ্যা করেছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ১৯২৪ সালে যুক্তিবাদী মানব প্রেমিক রামমোহনকে নিয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ 'Rammohan Roy: The Universal Man' প্রকাশিত হয়।[২] যেখানে ব্রজেন্দ্রনাথের ওপর রামমোহনের মানবতাবাদের প্রভাব স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়েছে। রামমোহন ছাড়াও নবজাগরনের পথিকৃৎ দেবেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ব্রাহ্মধর্ম এবং দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিবর্তন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে ১৯১৬ সালে অজিত কুমার চক্রবর্তী প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথের জীবনীতে যেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ তিনটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করেন।[৩]

আরোও এক ব্যক্তির প্রভাব ব্রজেন্দ্রনাথের ওপর পড়েছিল, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। এই দুই বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির সাধনার মধ্য দিয়ে অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ এমন এক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখতেন যে প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-

সংস্কৃতির সাথে ভারতের যোগ স্থাপন করা যায়। বিশ্বভারতী সেই স্বপ্নেরই ফসল। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবসে ব্রজেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, সেদিন তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর অন্তরের কথা, বিশ্বমানবতার প্রতিধ্বনি।

উনবিংশ শতকের বহু দিকপাল মনীষীদের সাথে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছিল গভীর সংযোগ, যাঁদের প্রভাব তাঁর জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এই প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দ), স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, আরও অনেকে।

কলেজে পড়াকালীন নরেন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। নরেন্দ্রনাথের মানসিক সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁকে শেলীর কবিতা পড়ার পরামর্শ দান করেছিলেন। "শেলীর বুদ্ধিগ্রাহ্য সৌন্দর্য- দেবতার প্রশস্তি, তাঁর নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের বিশ্বব্যাপিতা, বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বশান্তির গৌরবময় মানবজাগরনের উজ্জ্বল স্বপ্ন তাঁকে (নরেন্দ্রনাথকে) অভিভূত করল, যেমনটি করতে পারেনি দার্শনিকগনের শুষ্ক যুক্তিবিচার। জগৎ তাঁর কাছে তখন আর প্রানহীন, বৈচিত্র্যহীন একটি যান্ত্রিক সৃষ্টি হয়ে থাকল না। জগৎ যে একটা আধ্যাত্মিক ঐক্যনীতিতে পরিচালিত, তা তিনি অনুধাবন করলেন"।[৪] নরেন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ একসময়ে উভয়েই ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন। পরবর্তীতে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ না করেও, রামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়েও এমন এক ধর্মীয় দর্শনের কথা বলেন যা তাঁকে বিশ্বমানবধর্মের পথে চালিত করে।

উনবিংশ শতকের আরও এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অনুরোধেই ১৯১৩ সালে আচার্য শীল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত দর্শন বিভাগে পঞ্চম জর্জ অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধ্রুপদি ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য তিনি ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিলেন। এই কাজে তিনি স্যার আশুতোষের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রাসবিহারী ঘোষ, বিনয় কুমার সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্রজেন্দ্রনাথের সহায়তায় ও সহযোগিতায় ১৯০৬ সালে গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। এই শিক্ষা পরিষদের কর্মসূচি রূপায়নের আলোচনা সভায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও তিনি ছিলেন ভারতের 'নতুন জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোহিত'। 'New India' পত্রিকার মাধ্যমে বিপ্লবী বিপিন চন্দ্র পাল জাতীয়তাবাদ প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হন। তাঁর এই কর্মকাণ্ডে সহযোগী ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এই পত্রিকায় আচার্য শীল, তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে এক দার্শনিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন যার ভিত্তি ছিল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বিপিন চন্দ্র পাল যে দার্শনিক ভিত্তির ওপর জাতীয়তাবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা মূলত ব্রজেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উদ্দীপনার ফল।

তাঁর মনন ও ভাবনায় বহু মনিষীদের প্রভাব থাকলেও নিজস্বতায় তিনি ছিলেন অনন্য সাধারন এক ব্যক্তিত্ব। বাল্যকাল থেকেই অত্যাশ্চর্য মেধার স্বাক্ষর তিনি রেখেছিলেন। সৃষ্টির ভুবনে তিনি ছিলেন অনবদ্য। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর জ্ঞানের চর্চা তাঁকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিল। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রই উজ্জ্বল হয়েছে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে।

সাহিত্য বিষয়ে তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'New Essays in Criticism'।[৫] এটি একটি সাহিত্য সমালোচনামূলক বই , যেখানে ফরাসি বিপ্লবোত্তর নবযুগের সাহিত্যে নব্য রোম্যান্টিক আন্দোলনের বিবরন ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি হেগেলীয় দান্দিকতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এছাড়া তিনি বাংলার লেখকদের সাথে ইউরোপের প্রখ্যাত কবি-লেখকদের তুলনামূলক বিচার করেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রনাথের এই পদার্পণ সত্যিই বিস্ময়কর। ব্রজেন্দ্রনাথের মাত্র উনিশ বছর বয়েসে এই গ্রন্থসংবদ্ধ লেখাগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করলেও তাঁর উনচল্লিশ বছর বয়েসে গ্রন্থ আকারে তা প্রকাশিত হয়। ইংরেজ কবি কিটস-এর সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। অথচ আচার্য শীলের পর ইংরেজি ভাষায় কিটস সম্পর্কিত যে সব অনুশীলনী ও গবেষণামূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার কোনটিতেই এই প্রবন্ধের উল্লেখ নেই বলে একটি নিবন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন লেখক সরোজ কুমার দত্ত। তিনি এও বলেন, এমনকি আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ইংরেজি কাব্যচর্চায় এই গ্রন্থটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না, সেদিক থেকে বিচার করলে এই প্রবন্ধ অত্যন্ত অবহেলিত।[৬]

১৮৯১ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গনিত বিষয়ে প্রকাশিত রচনা 'A Memoir of the Co-efficient of Numbers- Being a Chapter in the Theory of Numbers'।[7] গনিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ব্রজেন্দ্রনাথই প্রথম প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশকে Statistics বিষয়ে গবেষণা করার উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। আচার্য শীলের জীবনের আদর্শ ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায় কে নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ 'Hints on the Study of Raja Ram Mohun Roy' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ এ।[৮] এই বছরই আচার্য শীল কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজের(বর্তমানে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ) প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তৎকালীন কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়নের আহ্বানে সাড়া দিয়েই এই কলেজে তাঁর প্রবেশ। কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৮৯৯ সালে 'International Congress of Orientalist' এর পক্ষ থেকে তিনি রোমে আমন্ত্রন পান এবং তাঁর মূল্যবান ভাষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্রজেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ১৯০৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য তৈরি হয় সিমলা কমিটি। এই কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। ১৯০৭ সালে ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে লেখা একটি ছোট প্রবন্ধ'An Early Stage of Vivekananda's Mental Develeopment' নামে 'প্রবুদ্ধভারত'থেকে প্রকাশিত হয়। Universal Races Congress প্রথম অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনে, ১৯১১ সালে। সেখানে 'Race Origin' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করে আচার্য শীল বিদেশি পণ্ডিতদের দ্বারা সমাদৃত হন। ১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী ভারত পরিদর্শনে আসেন। তাঁদের সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এবং স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানস ও নৈতিক বিজ্ঞান বিষয়ে একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। এই পদটির নাম হয় রাজা পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক পদ, সেই পদের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচিত হন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদ অলংকৃত করেছিলেন।

শুধুমাত্র সাহিত্য বিষয়েই নয়, বিজ্ঞান বিষয়েও ছিল আচার্য শীলের অসামান্য দক্ষতা। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'The Positive Sciences of the Ancient Hindus' গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুরা বিজ্ঞানে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন সে বিষয়ে জানা যায়।আসলে এটি ছিল তাঁর গবেষণার বিষয় যা পরে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা ও অনুসন্ধানস্পৃহা যে কতটা প্রবল ছিল এই গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের শুরুতেই তিনি লিখেছেন- 'আমি এমন এক ছত্রও লিখিনি যা অতি- পরিস্ফুট নজিরের দ্বারা সমর্থিত নয়'।[৯] খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে খ্রিস্টাব্দ ৫০০ অবধি সময়কালে হিন্দুদের বিজ্ঞান ভাবনা এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কোন কোন অধ্যায়ের কিছু উপবিভাগ রয়েছে। প্রায় তিনশ পাতার এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে ভৌতবিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা) এবং পরের তিনটি অধ্যায়ে (৪র্থ- ৬ষ্ঠ) জীবনবিজ্ঞান(উদ্ভিদবিদ্যা, প্রানীবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা) আলোচিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়টিতে (৭ম) বিজ্ঞানের পদ্ধতী বিষয়ে আলোচনা আছে।[১০]এই গ্রন্থে আচার্য শীল দেখাতে চেয়েছেন, প্রাচীন গ্রীকদের মত প্রাচীন হিন্দুরাও যে কোন ভৌত ঘটনার বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতী ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও আচার্য শীল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'History of Hindu Chemistry' তে।

ধূর্জটিপ্রসাদ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "এ যুগে এ মানুষ হয়?এমন জ্ঞান-স্পৃহা, জ্ঞানের এমন বিশালতা, একটি বিদ্যার সঙ্গে অন্য বিদ্যার যোগ সম্বন্ধে এমন সচেতনতা, আর এমন বিনয় ও শিশুসুলভ সরলতা বর্তমান পণ্ডিতদের মধ্যে আছে কী?"[১১]প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয়ভাগে 'Dr. B.N Seal's Auto Biography- Seal's Plans of Self-Education'শিরোনামে তাঁর শিক্ষাভাবনার মৌলিক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আত্মজীবনীতে আত্মশিক্ষালাভের তত্ত্বকথা সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন।

এই সময় 'সবুজপত্র' পত্রিকায় শিক্ষা বিষয়ক তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ থেকে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তা- ভাবনার সম্যক ধারনা পাওয়া যায়। আচার্য শীলের শিক্ষা- চিন্তা বর্তমান পরিবেশ, পরিস্থিতিতেও স্বছন্দভাবে অনুসরনযোগ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে এবং লেখায় উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে। আর তারজন্য শিক্ষার বাহন করতে হবে মাতৃভাষাকে। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে 'সবুজপত্র' পত্রিকাতে 'শিক্ষাবিস্তার' শিরোনামে প্রবন্ধের শুরুতেই আচার্য শীল লেখেন "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবটি খাটাইবার জন্য দুইটি উপায় স্থির করা যাইতে পারে। প্রথম উপায়- মাতৃভাষায় সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ রচনা, যাহাতে

মাতৃভাষার ভিতর দিয়াই এই সকল বিষয়ের চর্চা হইতে পারে। দ্বিতীয় উপায়- মাতৃভাষায় এই সকল বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা, যাহাতে ছাত্র ও অধ্যাপক দুজনেরই যথার্থ মানসিক বিকাশ হইতে পারে এবং উদ্ভাবনী ও সৃজনীশক্তি স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে। বস্তুত এই দুইটি উপায়ের মধ্যেই একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। কারন, সাহিত্য ছাড়া শিক্ষা হয় না এবং শিক্ষা ছাড়া সাহিত্য হয়না"।[১২] শিক্ষাচিন্তাতেও এই দুই মহামনিষীর মধ্যে সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পাচ্ছে।

মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা যেমন তিনি বলেছেন তেমনি ইংরেজি ভাষার গুরুত্বের কথাও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি ভাষাকে রাখতে চেয়েছিলেন। কারন তাঁর মনে হয়েছিল, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে না রাখলে সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটছে, ভারত সেদিক থেকে পিছিয়ে পড়বে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত রীতি-নীতি প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইউরোপের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। নবজাগরনের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন যেরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রামমোহনের আদর্শে বিশ্বাসী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও একই পথ অনুসরন করতে চেয়েছিলেন।শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন মহীশুর, বোম্বাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁর অভিভাষণ, শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও তাঁর জ্ঞানের নতুন দিক উন্মোচিত করে। মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ১৯২৬ সালের ১৭ই অগাস্ট বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁর অভিভাষণ শিক্ষাক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ।[১৩]তিনি তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারন সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাত করেছেন সেইসঙ্গে সমস্যা সমাধানের উপায়ও নির্ধারণ করেছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠদান তাঁর অপছন্দ ছিল। তিনি চাইতেন শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে তিনি যথেষ্ট পরিমান স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তারফলে শিক্ষকরাও স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করার সুযোগ পাবে।সমাজের কারিগর শিক্ষকরা, এই অনুকূল পরিবেশে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা ও নতুন শিক্ষাপদ্ধতী প্রণয়নের মধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানকে আরও উন্নত করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষাও চালু করা উচিত বলে তাঁর মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন আঞ্চলিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে বিশ্বভারতীর পাশাপাশি শ্রীনিকেতন স্থাপন করেছিলেন, তেমনি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পথ অনুসরণ করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

আচার্য শীল বিজ্ঞানের সাথে মানবিকী বিদ্যার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে Inter Disciplinary Course প্রবর্তনের কথা তিনি ভেবেছিলেন, যার ফলে বিজ্ঞানের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে ছাত্ররা প্রবৃত্ত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যেন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত অর্থে একজন সমাজ সচেতন নাগরিক হয়ে ওঠার প্রেরনা দেয় সেটাই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। আজীবন সেই চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। একজন মানুষ শুধু নিজে শিক্ষিত হলেই চলবে না, সমাজের প্রতি কর্তব্য বশতঃ তাকে সেই অর্জিত শিক্ষা সমাজের বঞ্চিত প্রতিবেশী, দরিদ্র বস্তিবাসী, ও কলকারখানার মজুরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারজন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন চলচিত্র নির্মাণ, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাদান ইত্যাদি। তাঁর মত ছিল ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষাব্যবস্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক।

ব্রজেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহন করার কথা বললেও অন্ধভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুকরনের কুফল সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তুললেও প্রতিযোগিতামূলক এই শিক্ষামানুষের সুকুমারবৃত্তিগুলোর বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে পড়ে। ধ্রুপদি শিক্ষাপদ্ধতীর ত্রুটিগুলোকে বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের যৌক্তিকতার আদর্শের সাথে নিজস্ব সংস্কৃতির আদর্শকে সংযুক্ত করতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সার্থক হবে। ব্রজেন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কিত এই চিন্তা সাধারন মানুষকে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

আচার্য শীল শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান রেখেছেন ১৯১৭-১৯১৯ সালে গঠিত Sadler committee এর রিপোর্টে, একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে। ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞান ও মেধার প্রতি স্যাডলারের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তাই তিনি ব্রজেন্দ্রনাথকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করেছিলেন। [১৪]

১৯২১ সালের ১৪ই অক্টোবর মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁর অভিভাষণ শিক্ষা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য অনুধাবন করতে সহায়তা করে।[১৫] রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে মুগ্ধ হয়ে লেখেন, "মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সভায় আপনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া

বড় আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইয়াছি, বিদ্যা সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে সম্প্রতি যে ভেদবুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহাতে মনে বড় বেদনা পাইয়াছি, কোনকালেই বিদ্যাকে খণ্ডিত করে দেখা উচিত নহে- বর্ত্তমান কালে তাহা আরো অনুচিত। কারন,বর্ত্তমানে সকলজাতির মানুষ পরস্পরের গোচরে আসিয়াছে- এই ইন্দ্রিয়ের গোচরতাকে ভেদবুদ্ধির তিরস্করনিকার দ্বারা আবৃত করা, বিধাতার অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা"।[১৬] মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন তিনি কিছুকাল মহীশুরের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর একাগ্র কর্মসাধনার জন্য মহীশুর সরকার তাঁকে 'রাজতন্ত্রপ্রবীন' উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়া ১৯২৬ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে সম্মানিত করে। "তাঁহার মত মানুষকে (ব্রজেন্দ্রনাথ) স্যার উপাধি দেওয়ায় অনুগ্রহ প্রদর্শিত হয়নাই, উপাধিটিরই সম্মান বাড়িয়াছে"।[১৭] সে সময়ে বিশিষ্ট পত্রিকা 'প্রবাসী' তে এই ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া ছাপা হয়।

দার্শনিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করলেও ব্রজেন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা বিকশিত হয়েছে 'The Quest Eternal' নামক কাব্যগ্রন্থে।[১৮]অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৩৬ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। যদিও এই কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ১৮৮২ সালে। এই মহাকাব্যধর্মী গ্রন্থ ব্রজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই কবিতা আসলে ব্রজেন্দ্রনাথের গভীর দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন।

ভারতীয় দর্শনের এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় বেঙ্গালুরু থেকে প্রকাশিত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা ভারতীয় দর্শনের পাঠ্যতালিকা (Syllabus of Indian Philosophy)। বৈদিক ধর্ম ও তার দার্শনিক তাৎপর্য, উপনিষদের গভীর উপদেশাবলির প্রকৃতি, প্রাচীন ধর্মদর্শনতন্ত্র,চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, অদ্বৈত, ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় ভাবনা ইত্যাদি এই পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। এই পাঠ্যসূচী অবশ্যই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। এই গ্রন্থ সম্পর্কে বিশিষ্ট অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "এই সূচীটা (Syllabus of Indian Philosophy) দেখলেই বোঝা যায় যে একমাত্র ব্রজেন শীল ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই যে সে এই বই লেখে........ বস্তুত এজন্যই বাঙালি বিপ্লবের যুগে ব্রজেন শীলকে আমরা দার্শনিক বলতাম না- বলতাম লোকটা বিদ্যার জাহাজ, প্রকাণ্ড বিদ্যা- দিগ্গজ, সর্ববিদ্যা বিশারদ- পণ্ডিত- জ্যান্ত বিশ্বকোষ"।[১৯]

ব্রজেন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিত্ব এ দেশে বিরল। আচার্য শীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি মানব কল্যানের জন্য সমাজে শিক্ষা ও স্বাধীনতা অপরিহার্য বলে মনে করতেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সর্বোপরি তিনি ছিলেন মানবতাবাদী সত্যের সন্ধানী। মানুষ হিসেবেও ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্য। যশ ও প্রতিপত্তির প্রতি তিনি কোনদিনই লালায়িত ছিলেন না। মানবসেবাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। জ্ঞান অন্বেষণে তাঁর কোন আলস্য ছিল না। জ্ঞানতপস্বী, মনিষীর কাছে মানুষ আজও কৃতজ্ঞ কারন তিনিই প্রথম প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু বন্ধনের দিক নির্দেশ করে গেছেন।

সূত্রনির্দেশ

১।চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২।Seal, Acharya Brajendranath,*Rammohun: The Universal Man*, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1924

৩।চক্রবর্তী, শ্রী অজিত কুমার, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,* ইন্ডিয়ান প্রেস, কলকাতা, ১৯১৬

৪। মণ্ডল, হরিপদ, *আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখা, ২০০৯, ১৩৯

৫।Seal, Brajendranath,*New Essays in Criticism*, Som Brothers Publishers, Calcutta, 1903

৬।দত্ত, সরোজ, "ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রসঙ্গে", নির্মাল্য নারায়ন চক্রবর্তী (সম্পা.), *স্মরনে মননে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,* আলোচনা চক্র, কলকাতা, ৫২

৭। Seal, Brajendranath,*A Memoir on the Co-efficient of Numbers, being a chapter in the theory of numbers,* Hare Press, Calcutta, 1891

৮। Sil, Babu Brajendra Nath, "Hints on the Study of Raja Rammohun Roy",*The Queen,* September 28, 1896, 14-16

৯। Seal, Brajendanath,*The Positive Sciences of the Ancient Hindus,* Longmans Green and Co., London, 1915, iv

১০।কোঙার, অরিন্দম.বসু, অপরাজিতা.ভট্টাচার্য, দীপক.*আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,* পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, কলকাতা, ২০১৫, ২৮

১১।মুখোপাধ্যায়, শ্রী ধূর্জটিপ্রসাদ, *মনে এলো,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ৭১

১২।শীল, ব্রজেন্দ্রনাথ, "শিক্ষাবিস্তার".*সবুজপত্র.* পৌষ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ৬০৮

১৩।*Convocation Address to the University of Bombay*, Calcutta: October, 1926

১৪। Sadler, E. Michael, "Dr. Sir Brajendranath Seal: A Short Tribute of Gratitude and Admiration", *TheModern Review*, January 1936, 73-74

১৫। Rao, C. Hayavadana, .*Addresses delivered at Mysore University Convocations- 1918-1929,* Bangalore Press,Bangalore, 1930

১৬। পত্রালাপ, *বিশ্বভারতী পত্রিকা,* চতুর্দশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ- আষাঢ়, ১৮৮০ শক, ২৬৩

১৭। ঘোষ, তপন কুমার, *বাংলা রচনাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,* পত্রলেখা, কলকাতা, ১৯১৪, ২৪

১৮।Seal, Brajendranath.*The Quest Eternal,*Oxford University Pres, London, New York, Bombay, Calcutta and Madras, Humphrey Milford, 1936

১৯। সরকার, বিনয় কুমার, *বিনয় সরকারে বৈঠকেঃ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য জনের সঙ্গে কথোপকথন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, ৭৭

....

ঔপনিবেশিক পর্বের অভিনীত বাংলা নাটকে সঙ্গীত ও নৃত্য

ড. মানিক বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ,নগর কলেজ,নগর মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ-

ঔপনিবেশিকতা দখলকৃত ভূমি ও সম্পদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া, যা প্রাচীন রোমান, চেঙ্গিস খাঁর রাজ্য ও অটোমান সাম্রাজ্যে দেখা গেছে। ষোড়শ শতকের পর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিল, বিশেষত দাসত্বের কারণে। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন মূলত ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভের মাধ্যমে শুরু হয়। এ সময় বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। বিশেষত সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাটকের মধ্যে ইংরেজ শাসকদের প্রভাব ছিল প্রবল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকে গান ও নাচের ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেন এবং নিজেই এসব উপাদানকে নাটকে মিশিয়ে নতুন ধারা তৈরি করেন। ১৮ শতকের শেষ দিকে ইংরেজদের শাসন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার সমাজে মধ্যস্বত্বভোগী বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই বাবুরা নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। রুশ নাবিক লেবেদফ প্রথম বাংলায় নাটকের প্রচেষ্টা করেন এবং ১৭৯৫ সালে তাঁর অনূদিত বাংলা নাটক ‘কাল্পনিক সংবদল’ এ নাচ-গান ও বাজনার ব্যবহার করেন। ১৯ শতকে তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ও হরচন্দ্র ঘোষ ইংরেজি ভাবনায় নাটক লেখেন, যেখানে প্রচলিত গানের ব্যবহার ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার, দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাটকে গানের প্রচলন করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নৃত্যগীতিমূলক নাটকগুলি দর্শকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়। ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলার থিয়েটার সংস্কৃতি ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে নতুনভাবে গড়ে ওঠে এবং বাংলা নাটকের ধারা নতুন রূপে প্রকাশিত হয়।

মূল শব্দ :

ঔপনিবেশিকতা, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, রঙ্গমঞ্চ, বাবু সম্প্রদায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নৃত্যগীতিমূলক, যাত্রাপালা, অভিনয়,ইত্যাদি।

মূল প্রবন্ধ

সাধারণত উপনিবেশ শব্দটির অর্থ হল দখলকৃত ভূমি ও সম্পদ। এই দখলকৃত ভূমি,সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া হল ঔপনিবেশিকতা।এদিক থেকে দেখতে গেলে উপনিবেশ কোনো নতুন বিষয় নয়, রোমান সাম্রাজ্য, চেঙ্গিস খাঁর রাজ্য ও অটোমান সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা দেখেছে পৃথিবীর একটা বড় অংশ । কিন্তু ষোড়শ শতকের পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপের ঔপনিবেশিকতা পুরো দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে । কারণ এই পর্বে ঔপনিবেশিক জনগোষ্ঠীর দাসত্বের কথা বলা হয়েছে । ভারতবর্ষে মূলত ঔপনিবেশিক পর্ব শুরু হয়েছিল মুসলিম শাসনের হাত ধরে। মুসলিম শাসন পর্বে ভারতবর্ষ ভিন্ন ধরনের উপনিবেশ ছিল।কিন্তু ভারতের মূল ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয় ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে । যে সময় থেকে ইংরেজরা বাংলা,বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেল তারপর থেকেই মূলত ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হল । এই সময় বাংলার সাহিত্য,সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল । একই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে আসতে লাগল ভিন্নধারার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রভাব পড়েছিল ঔপনিবেশিক শক্তির। বিশেষতঃ ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য,সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল ।প্রাচীনকাল থেকে বাঙালির চিত্ত বিনোদনের অপরিহার্য অংশ ছিল সঙ্গীত,নৃত্য এবং নাটক । এর মধ্যে সবথেকে বেশি বাঙালির মনকে আকৃষ্ট করে সঙ্গীত ও নৃত্য।প্রথম দিকের নাটকে গানের ব্যবহার থাকলেও নাচের প্রসঙ্গ ছিল না বললেই চলে।যে সময় থেকে ইংরেজদের শৌখিন নাট্যশালা বাংলায় শুরু হল এবং কতিপয় বাঙালি সেখানে অংশগ্রহণ করল,তার পর

থেকেই বাঙালির মনে থিয়েটার সম্পর্কে এক নতুন ভাবনা দেখা দিল। এর ফলে তৈরি হল বাংলায় শৌখিন নাট্যশালা।এই শৌখিন নাট্যশালা বাঙালির দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে নাটকে গান ও নাচের ব্যবহার শুরু করল ।

নাটক,সঙ্গীত ও নৃত্য আলাদা আলাদা শিল্পকর্ম হলেও নাটককে কেন্দ্র করে গান ও নাচের ব্যবহার পাঠক ও দর্শকদের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করল । এই সূত্র ধরেই ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালির আনন্দদানের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠল থিয়েটার।উনিশ শতকের শৌখিন নাট্যশালায় প্রযোজক কোথাও কাহিনির প্রয়োজনে নাটকে গানের ব্যবহার করেছেন আবার কোথাও নাচের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন । নাটকে গান এবং নাচের প্রয়োগ দর্শকের কাছে নতুন রূপে প্রকাশিত হল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

“কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানেই তাহার পূর্ণ গৌরব । সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে।বিশেষতঃ সতীন যদি প্রবল হয়।” [১]

কলাবিদ্যা একেশ্বরী হোক রবীন্দ্রনাথ সবসময় তাই চাইতেন। সেই কারণে নাটকে গান, নাচ, ছবি সব মিলিয়ে ললিতকলার বারোয়ারি বিষয়কে তিনি হাটের জিনিস মনে করতেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই নাটকে সবগুলিকে মিশিয়ে রাজকীয় উচ্চাসনে বসিয়ে দিয়েছেন। আর সেই কারণে তাঁর নাটকে সেই গান ও নাচই প্রবলতর সতীন হয়ে উঠেছে। আধুনিককালে শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, প্রাচীনকাল থেকেই নাটকে গান ও নাচের ব্যবহারের বিষয়টি স্বীকৃত। বিশেষতঃ গানের ব্যবহার নিয়ে অ্যারিস্টটল তাঁর ‘পোয়েটিকস’ গ্রন্থে বলেছেন- সঙ্গীত নাটকের একটি প্রধান অলঙ্করণ।আবার হোরেস কোরাস গানকে বিশ্রাম-গীতি হিসাবে ব্যবহার না করে নাটকের মধ্যবর্তী অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন।সবদিক থেকে মিলিয়ে সহজেই একথা বলা যায়, শিল্পগত দিক থেকে নাটকের গঠন কৌশলকে অপরিবর্তীত রেখে নাট্য-প্রয়োজনার কথা ভেবে বা নাটকের রসের কথা মাথায় রেখে নাটকে সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নাটকে গান বা নাচের ব্যবহার শুধু ‘ড্রামাটিক রিলিফের’ জন্য নয়, তা কখনো কখনো চরিত্রের বিকাশ ও কাহিনিকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের শুরুর পর্বে ইংরেজদের হাতে ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার মূল রক্ষাকর্তা ছিল জমিদার। এই জমিদারি ব্যবস্থাকে ১৭৯৩ সালে ইংরেজরা তাদের বশ্যতা ধরে রাখতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন। ফলস্বরূপ বাঙালিদের মধ্যে জন্ম হল একশ্রেণীর মধ্য স্বত্বভোগীর।এঁরাই পরবরতিতে বাবু নামে পরিচিত। এই বাবু সম্প্রদায়ের হাত ধরেই বাঙালি অনুভব করল এক নতুন সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতিতে ছিল বিপর্যস্ত জীবনের ছবি । চারিদিকে শাসক নেই, নিরাপত্তা নেই, বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় বাবুরা মেতে উঠল কবিগান, খিস্তি-খেউড়,হাফ আখড়াই ইত্যাদি সংস্কৃতিতে । এইরূপ এক রুচিহীন সংস্কৃতির কবলে পড়ে বাঙালি প্রায় বিসৃতের তলে তলিয়ে যেতে লাগল।এই সময় কিছুটা হলেও বাঙালির সংস্কৃতি ও মননে উঠে এল ইংরেজদের প্রচলিত থিয়েটার। এই থিয়েটারে অভিনয় দেখে বাঙালি উপলব্ধি করতে লাগল তার পুরনো সংস্কৃতিকে।

বাঙালির সাহস না হলেও এই সময় এগিয়ে এলেন লেবেদফ।তাঁর পরিচালিত থিয়েটারে বাঙালির বাংলা নাটক অন্যমাত্রা যোগ করল। লেবেদফ রুশ দেশীয় নাবিক। বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্য প্রচেষ্টা তাঁর হাত ধরেই। বিদেশি রঙ্গালয়ের ধারায় বাংলা থিয়েটার সংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায় তুলে ধরলেন লেবেদফ। ১৭৯৫ সালে লেবেদফের হাত ধরে বাঙালি দর্শক পেল ভিন্ন এক সংস্কৃতির স্বাদ। লেবেদফ তাঁর অনূদিত বাংলা নাটকে ব্যবহার করেছেন নাচ-গান এবং বাজনা।‘The Disguise’ নাটকের বাংলা অনুবাদ ‘কাল্পনিক সংবদল”।নাটকের অভিনয়ের সময় লেবেদফ অনেক কিছু নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করেন ।এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা পাশ্চাত্য রীতির ধারাকে অনুসরণ করলেন। এই সময়কালে তিনি নব্য শিক্ষিত বাঙালি বাবুদের রুচির কথা মাথায় রেখে নাটকে নৃত্যগীত্রি জন্য বাজিয়া, নাচিয়া চরিত্রের সৃষ্টি করলেন। সেই সঙ্গে বাঙালির দীর্ঘদিনের রুচির কথা মাথায় রেখে তিনি নাটকে গানের ব্যবহার করলেন।যদিও মূল নাটকে শুধুমাত্র ‘মিউজিশিয়ানদের’ উল্লেখ ছিল।তাঁর অনুবাদকৃত নাটকে ‘পুরুষকান’ ও ‘ম্যায়াকান’ ইত্যাদি চরিত্র উল্লেখ করে তিনি নাটকে গান-বাজনা ও নাচের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। নাটকে কোথাও শুরু করেছেন ‘আরম্ভ করিল নাচিতে’ কিংবা বলেছেন ‘দুই ম্যায়াকান গান বন্দী করে’। লেবেদফের অনূদিত নাটকটিতে নাচের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সমানতালে গানের ব্যবহার ঘটেছে।তবে নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও অনুমান করা যায় ‘রাম সন্তোষের’ মুখে (১/২ দৃশ্যে) প্রথম গানটি হল- ‘প্রাণ কেমন করে না দেখে তাহারে।যে করে আমার প্রাণ কহিবো কাহারে’। দ্বিতীয় গানটি ম্যায়াকানের মুখে শোনা যায় - ‘ গুণ সাগর নাগর রায় । নগর দেখিয়া যায়’। এ ছাড়া বিভিন্ন

অংকের মাঝে মাঝে,এবং বিরতির সময় তিনি গান-বাজনার ব্যবহার করেছিলেন। নাচ-গানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি দেশি-বিদেশি উভয় বাজনার ব্যবহার করেছিলেন। 'বেঙ্গলি থিয়েটারে' গান বাজনার প্রয়োগ সম্পর্কে ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র বলেছেন-

"সোজা কথায় যা যাত্রায় প্রচলিত ছিল, সেই নান্দীমুখ এবং ঐক্যতান বাদন সহযোগে পালা শুরু হল।.....পরবর্তীকালে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য যে অর্কেস্ট্রা দল গঠন করেছিলেন তাঁর আদর্শ এখানে রয়েছে,.... প্লটভিত্তিক নাটক, মঞ্চ, ঐকতান-বাদন-ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি বাংলা নাট্যশালার জন্য তিনি দিয়ে গেলেন।" [২]

উল্লেখ্য লেবেদফ তাঁর অনুবাদকৃত নাটকে যে গানগুলি ব্যবহার করেছিলেন তা ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থ থেকে নিয়েছিলেন। এরপর উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে তারাচরন শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ও হরচন্দ্র ঘোষ ইংরেজি ভাবনাতে নাটক লেখার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের নাটক অভিনীত না হলেও সেই নাটকে প্রচলিত ধারার গানের ব্যবহার করেছিলেন 'ভদ্রার্জুন'(১৮৫২) এবং 'কীর্তিবিলাস'(১৮৫২)-এর ভূমিকাতে নাট্যকারদ্বয় উল্লেখ করছেন- 'কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীতের দ্বারা ব্যক্ত করে'।

বাবুদের উদ্যোগে শখের নাট্যশালাগুলিতে যখন বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু হল ,তখন সেখানে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও মৌলিক রচনারও আধিক্য দেখা গেল। নাটকে নাচ -গানের আধিক্য বাঙালি রুচির সঙ্গে মিশে গেল। সেই কারণে বাঙালি বাবুরা অপ্রচলিত যাত্রা, কবিগান বা আখড়াইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থিয়েটারের দিকে ঝুঁকলেন এবং সেখানে রুচিসম্মত ভাবে গান ও নাচের ব্যবস্থা করলেন।এই ধারাতেই পেলাম নবীন বসুর বাড়িতে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়। নাটক অভিনয়ের সময় সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ ইত্যাদি দেশীয় যন্ত্র দিয়ে ঐক্যতানবাদন করেছিলেন । ব্রজনাথ গোস্বামী নামে একজন বেহালা বাজান এবং জয়দুর্গার কণ্ঠে গান ও সখির ভূমিকায় রাজুর গান ও উল্লেখযোগ্য ছিল। 'শকুন্তলা'ও 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয়ে গানের প্রয়োগ সম্পর্কে এই নাটকের অভিনেতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন-

"এক ব্যক্তি শকুন্তলার গান বাঁধিয়া দিয়েছিলেন, তাহাকে আমরা কবিচন্দ্র বলিয়া ডাকিতাম । .... কবিচন্দ্র ছাতুবাবুর নিকটে আসিলে বাবু বলিলেন 'দেখ কবিচন্দ্র, গানগুলি যেন সুন্দর সুরুচিসঙ্গত হয়'।।.... আমি কি জানি না যে আপনি যে, আপনি সপরিবারে এখানে বাস করেন'?এমন গান গাহিব যে মেয়েরা উঠিয়া যাইবেন?" [৩]

সমকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশিবার অভিনীত নাটক রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। নাটকটির প্রথম অভিনয় থেকে শেষ অভিনয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গানের সংযোজন ঘটেছে। প্রথম অভিনয়ে এখানে নটীর গান ছাড়া অন্য কোন গান ছিল না । নটীর কণ্ঠে গানটি ছিল- 'চ্যূত মুকুল কুল সঞ্চল দলিকুল/ গুন গুন রঞ্জন গানে।' আবার নাটকটি বাবু গধাধর শেঠের বাড়িতে অভিনয়ের সময় তৃতীয় অঙ্কে ব্রাহ্মণী বলছে- 'আজি কি আনন্দ দিন, মেয়েদের বিয়ে/ শরীর জোড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে।' বা রসিক কণ্ঠে শোনা যায়- 'কমল কোমল ফুল মধু দানে অনুকূলে/ দশদিকে করে আমদিত।'এভাবেই তখনকার দিনে পাশ্চাত্য রীতিকে অনুসরণ করে নাট্যকার চরিত্রের মুখের কথাকে গানে রূপান্তর করতেন । রাম নারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকে কোন গান না থাকলেও 'রত্নাবলী'তে ১২টি গানের ব্যবহার আছে। এখানে নাট্যকার প্রেমের গান, টপ্পা গান ও যাত্রারীতির গানকে খুব সহজে এবং সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন।অন্যদিকে 'মালতীমাধব'- এ বেতালিক ও মাঙ্গলিক গীত ছাড়াও অনেক গানের ব্যবহার হয়েছে যা রামনারায়ণের নয়,বনোয়ারিলাল রায়ের রচনা। এ ছাড়াও 'নবনাটক', 'রুক্মিণী হরণ' এবং 'কংস বধ'-এ নাট্যকার প্রয়োজনে গানের প্রয়োগ করেছেন।

এরপর বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য ভাবনার নাট্যরস নিয়ে এলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা নাটকে গানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি রুচি ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নাটকে মঞ্চের প্রয়োজনে গানের ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে অনিচ্ছার উপর তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল । মধুসূদন তাঁর নাটকে তিনি নিজে গান রচনা করলেও তা ব্যবহার না করে কর্তৃপক্ষ সেই নাটকে দর্শকের কথা মাথায় রেখে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনা ও উপসংহারে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান ব্যবহার করলেন ।এছাড়াও 'পদ্মাবতী'র সমাপ্তি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন। এক্ষেত্রে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মহারাজের মন ভোলানোর জন্য যে গানটি গাওয়া হয়েছিল সেটি বসন্ত ঋতুর গান। 'রত্নাবলী' নাটকের ক্ষেত্রেও একটি নর্তকীদের জন্য গাওয়া গান ছিল। মধুসূদনের নাটকে নেপথ্য গানের ব্যবহার যথেষ্ট ছিল। তাঁর'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ব্যবহৃত সব গানই নেপথ্য সঙ্গীত। নাটকে গানের ব্যবহার প্রসঙ্গে রামনারায়ণ বলেছেন-

"যাত্রারীতির প্রতি আপাতত অশ্রদ্ধা থাকলেও -তথাপি এককালে সঙ্গীত মাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটকের অভিনয়ে সঙ্গীত সম্পদ নিতান্ত পরিবর্জিত হইলেও তাহাতে রস ও সৌন্দেযের বিশেষ হানির সম্ভবনা।" [৪]

তৎকালীন প্রচলিত যাত্রার অশ্লীলতা এবং কুরুচির জন্যেই শিক্ষিত মহল থেকে যাত্রা ক্রমশ অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠতে লাগল। এই সময়ই যাত্রার যে বিষয়টি বাংলা নাটকে সব থেকে বেশি গ্রহণ করা হল তা হল গান। আর এই গানগুলির বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে যাত্রার ধরনকে সামনে রেখে। যাত্রায় ব্যবহৃত নাচ-গানের ব্যবহারের ফলে সৃষ্টি হল গীতিকা ।এই ধরনের গানের ব্যবহার দেখলাম নাট্যকার মনোমোহন বসুর নাটকে। তাঁর ' রামাভিষেক' 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে গানের বহুল ব্যবহার দেখা গেল। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁর নাটকে গানের বাহুল্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন এবং 'পার্থ পরাজয়' (১৮৮১) নাটকের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন- 'যাঁহারা প্রকৃত নাটক প্রণালীতে ইহার অভিনয় করিবেন তাঁহারা নাটকে অপ্রাযুজ্য গানগুলি ছাড়িয়া দিলে হানি হইবে না। যাঁহারা গীতাভিনয় করিবেন তাঁহারা সকল গানই ব্যবহার করিতে পারিবেন।' এছাড়াও সেই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাটকগুলিতে দেশাত্মবোধক কথা ও গানের প্রচুর ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'পুরুবিক্রম' নাটকে সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান -' মিলে সবে ভারত সন্তান/ একতান মনপ্রাণ/ গাও ভারতের যশোগান।' এই নাটকের ২য় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত করলেন- একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন/ এক কাজে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।' এ ছাড়া 'সরোজিনী' নাটকে - রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-' জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ-দ্বিগুণ' 'অশ্রুমতী'র জন্য লিখলেন-' গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে সে সময়ের নাটকে দেশাত্মবোধক ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।এই সময় বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশানুরাগের প্রাথমিক ঢেউ উঠেছিল সেখানে ঠাকুর পরিবারের পাশাপাশি রঙ্গালয়েও তার প্রভাব পড়েছিল। এই সময় কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা', 'ভারতে যবন' এবং হরলাল রায়ের 'হেমলতা' প্রভৃতি নাটকে বাংলা ও বাঙালি গর্জে উঠেছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে।

১৮৭২ সালে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পরে বাংলা থিয়েটারে নাটক উপস্থাপনায় বাধ্য-বাধকতা অনেকটাই খুলে গেল।নাট্যশালার পেশাদারিত্বের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের চাহিদা অনুসারে নাটক লেখা হল এবং অভিনীত হতে লাগল। এই সময়ের প্রথম দিকে আমরা দীনবন্ধু মিত্রকে পাই। তাঁর নাটকে নিরপেক্ষ গানের বহুল প্রচলন বাংলা নাটকের মুক্তি দিল। 'নীলদর্পণ' নাটকে শুধু একটি নেপথ্য সঙ্গীত ছিল।কিন্তু তাঁর 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী' এবং 'কমলে কামিনী' নাটকে অনেকগুলি গান যোগ হয়েছে। একই সঙ্গে এই নাটকে বাঁশির সুর ও নৃত্য যোগে গানও রয়েছে। এই সময় অর্থাৎ ১৮৭৩ এর পর থেকে মঞ্চে অভিনেত্রী আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কণ্ঠে গান ও নাচের দৃশ্য অপরিহার্য হয়ে উঠল।

এই সময় পর্বের অন্যতম লেখক হলেন রাজকৃষ্ণ রায়। তাঁর বেশিরভাগ নাটকই ভক্তিমূলক।কিন্তু তাঁর নাটকগুলিতে নাচ-গানের প্রচুর ব্যবহার ঘটেছে।যেমন- 'ঋষ্যশৃঙ্গ'-এ ১৮টি গান।বেশ্যাদের চাটুল গানের সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গ ও বেশ্যাদের দ্বৈত গান ও নাচ তাঁর পরিণতি। শুধুমাত্র যে এই প্রয়োজনের তাগিদে নাটকে গানের ও নাচের ব্যবহার হচ্ছে তা নয়।সে সময়ে সব থেকে বেশী মঞ্চের প্রয়োজনে নাটকে গানের প্রয়োগ হচ্ছে । এই ধরনের প্রভাব সবথেকে বেশি দেখা যায় রাজকৃষ্ণের নাটকে - বালকের গান(ভীষ্মের শরশয্যা, গঙ্গা মহিমা) অপ্সরার গান (অনলে বিজলি, নরমেধ যজ্ঞ) সখীদের গান(দশরথের মৃগয়া) কন্যাদের গান, গপিদের গান, এমন কি নারদের কণ্ঠেও গানের ব্যবহার হয়েছে। শুধু গানের নয় তাঁর নাটকে দর্শকের কথা মাথায় রেখে নাচের দৃশ্যও দেখা যায় 'যদুবংশ', 'লক্ষপতি', 'লায়লামজনু' ইত্যাদি নাটকে।

এরপরে যার কথা বলতে হয় তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। যাত্রাপালায় গান লেখায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত ।পরে রঙ্গমঞ্চের চাহিদার দিকে তাল রেখে এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়ীক দিকটির কথা মাথায় রেখে তিনি তাঁর নাটকে গান ও নাচের ব্যবহার করলেন। গিরিশচন্দ্র নাটকের বহু ক্ষেত্রে বিচরণ করলেও তিনি ছিলেন মূলত পৌরাণিক নাটক রচনায় পারদর্শী। বিশুদ্ধ নাট্যরসের চাইতে তিনি দর্শকদের মনোরঞ্জনের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু নিজের নাটকেই নয়, অভিনয়ের প্রয়োজনে তিনি অন্য নাট্যকারের নাটকেও গানে্র প্রয়োগ করেছেন। গীতিনাট্য দিয়ে তাঁর জীবনের শুরু হলেও পরবর্তীতে তিনি এই ধরনের যাত্রারীতি থেকে সরে এসে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটককে গানে- নাচে ভরপুর করে তুলেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে সখীদের গান(ফনির মনি, আবু হোসেন, হীরার ফুল, মণিহরণ, ইত্যাদি)। শুধু গানই নয়, গীতিনাট্যে নর্তকী, বাঁদি, বেদেনী, নাচওয়ালী প্রভৃতি চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।এই চরিত্রগুলি নাটকে কখনো গান গেয়েছে আবার কোথাও নাচের প্রকাশ ঘটিয়েছে ।একই সঙ্গে গিরিশ ঘোষের 'মলিনা বিকাশ' নাটকে '

প্রথম নাচ গানের ব্যবহার করলেন । এখানে তবলা ও বিকাশ চরিত্র তারই প্রকাশ।পরে অবশ্য এই ধরার বহু প্রয়োগ দেখা যায় 'ফণির মণি'তে (শিক্ষা ও বারি)' মণি হরণে'(জাম্ববতী ও শ্রীকৃষ্ণ) 'দেলদারে' (নেসা ও পিয়াসা) ইত্যাদি ।

গিরিশের নৃত্যগীতি মূলক নাটক সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে-' অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রবর্তন হওয়ার ফলে এই ধরনের নাটক অভিনয় করা অনেক বেশি সহজ ছিল।সমকালীন পর্বে দর্শকরা যাত্রা রীতির নাচ- গান দেখতে বেশি পছন্দ করতো সেই কারণে গিরিশ ঘোষ তাঁর নাটকে নাচ -গানের উপযোগী সুরকার ও নৃত্য শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। সেই সময়ে দশ পনেরো দিন অভিনয়ের পর নাটকটি দর্শকরা আর দেখত চাইত না। ফলে তাঁকে অভিনয়কে সহজ করতে নতুন নতুন নাটক নাচ-গানের বিষয় বেশী করে ব্যবহার করতে হত।১৮৯০ সালে 'স্টার থিয়েটার'-এ 'মলিনা বিকাশ' অভিনয়ের সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন রমতরণ সান্ন্যালের মতো সুরকার এবং কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো নৃত্য শিক্ষক ।একই সঙ্গে আমরা পাই নৃত্যগীতি পটীয়সী অভিনেত্রী রূপে মানদা সুন্দরী ও সুকুমারী দত্তের মতো শিল্পীকে।

গিরিশ ঘোষের বহু পরিশ্রমের 'ম্যাকবেথ' এর মতো নাটক ' মিনার্ভা' থিয়েটারে দর্শক টানতে ব্যর্থ হলে তিনি 'আবু হোসেন'(১৮৯৩) নামক নাটক আনলেন' মিনার্ভা'তে। সেই সঙ্গে এই নাটকে তিনি ব্যবহার করলেন গান এবং নাচ। এই নাটকের সুরে দেব কণ্ঠ বাগচী এবং নৃত্য শিক্ষায় রানুবাবুর (শরৎচন্দ্র বন্ধোপাধ্যায়) যৌথ প্রয়াসই দর্শকের মনোরঞ্জন করেছিল। এর পরে 'ফণির মণিতে' নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসুর(নেপা বসু) নৃত্য পরিচালনা এবং তিনকড়ি, কুসুমকুমারি, হরিসুন্দরীর সুকণ্ঠ নাটককে উচ্চ আসনে নিয়ে যায়। এছাড়াও গিরিশের 'সীতাহরণ','’নল দময়ন্তী', 'সীতার বনবাস' প্রায় সব নাটকেই সখির গান আবার কিছু নাটকে উপযোগী গান ও বেশিরভাগ গানেই সুযোগ পেলেই অভিনেত্রীদের নাচ চলে এসেছে।যেমন- 'প্রফুল্ল'তে খেমটাওয়ালী ((২/৩ দৃশ্যে), মাতালে গান (৩/৪ দৃশ্যে) । একইভাবে 'বলিদান','’শান্তি কি শান্তি' ও 'হারানিধি' নাটকে গান ও নাচের ব্যবহার হয়েছে। এ ছাড়াও নর্তকী (সীতাহরণ) নারী ও কিঙ্করী (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) , যোগীগণ (কমলে কামিনি) নারী ও স্ত্রী, সঙ্গিনী ও বালিকাগণ (হরগৌরী) নাচ গানে মজেছে।১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের জোয়ারে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক লিখেছিলেন। এখানে নর্তকীদের দুটি ও নাগরিকদের তিনটি গান আছে। পাশাপাশি ' পলাশীর যুদ্ধ' ও 'মীর কাশিম' নাটকেও সমানতালে গান ও নাচের ব্যবহার করেছেন। এই সময়কার থিয়েটার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক নাট্য পরিচালক মন্তব্য করেছিলেন-

"সেকালের থিয়েটারে সখির দল ভাল না থাকলে দর্শক আসত না।...... এখন থেকে বছর ছত্রিশ পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ বিশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত) সখিদের প্রয়োজন ছিল খুব বেশী ।.... দু' তিনখানি নাটক, প্রহসন ও নাচগানের বই না থাকলে থিয়েটারে দর্শক যোগাড় করা অসম্ভব ছিল।" [৫]

শুধু গিরিশ ঘোষই নয়, এই সময়ের অমৃতলাল বসুর নাটক ও প্রহসনে গানের প্রয়োগ এসেছে সমান তালে। তাঁর 'কলঙ্ক ভঞ্জন', 'যাদুকরী', 'ব্রজবিলাস', 'খাস দখল','তরুবালা' ইত্যাদি নাটকে প্রচুর গানের ব্যবহার করেছিলেন।এছাড়া এই সময়ের নাট্যকার বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুল কৃষ্ণ মিত্র এবং সর্বোপরি ক্ষিরোদাপ্রসাদের 'আলিবাব' নাটকের নাচ-গানের কথা আমরা সকলেই জানি। সব মিলিয়ে বলা যায় নাটকে প্রয়োজনে- অপ্রয়োজনে যত্রতত্র নাচ-গানের বিষয়কে শুধুমাত্র দর্শকের ভালোলাগার উপরে জুড়ে দেওয়ার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে বলছেন-

"ছবিতে গানেতে কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে; কিন্তু সে কতকটা খেলা হিসাবে, তাহা হাটের জিনিস, তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।"[৬]

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'রঙ্গমঞ্চ' বিচিত্র প্রবন্ধ। পশ্চিমবঙ্গ শত বার্ষিকী সংখ্যা। ১৪ খণ্ড। পৃষ্ঠা- ৭৪৩।

২. মামুদ, হায়াৎ । গেরাসিম লিয়েবদফ। বসুমতী। ১৯৯৫। পৃষ্ঠা- ৪৭।

৩. মুখোপাধ্যায়,মহেন্দ্র। "স্মৃতিকথা পুরাতন প্রসঙ্গ-বিপিন বিহারী গুপ্ত" (বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)সংস্করণ ।১৩৭৩। কলকাতা। পৃষ্ঠা- ৮৭।

৪. ভট্টাচার্য,ড. আশুতোষ। "বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন" জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। কলকাতা। পৃষ্ঠা- ৩৯।

৫. ভদ্র। শ্রী বীরেন্দ্র কৃষ্ণ। “সেকালের থিয়েটার”। উল্টোরথ।১৮৯৪। অগ্রাহয়ণ। পৃষ্ঠা - ৪১-৪২।
৬. ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ। ‘রঙ্গমঞ্চ’ বিচিত্র প্রবন্ধ। পশ্চিমবঙ্গ শত বার্ষিকী সংখ্যা। ১৪ খণ্ড। পৃষ্ঠা- ৭৪৩।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. সান্যাল,কমলকুমার। “বাংলা নাটক সমীক্ষা”। বর্ণালী। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ। ১৯৭৬।
২. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ । “বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন”। জাতীয় সাহিত্যংস্করণ। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ। ১৯৬৪।
৩.বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত। শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। কলকাতা। ১৩৫৪।
৪. চৌধুরী, দর্শন। “বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস”। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ১৯৯১।
৫. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (২য় সংখ্যা) ।কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। কল্যাণী। নদীয়া। ১৯৮০-১৯৮১
৬. মামুদ, হায়াৎ। গেরাসিম লিয়েবেদেফ। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড। কলকাতা।১৯৯৫।
৭. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (চথুর্থ সংকলন)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। রাজবাটী। বর্ধমান।২০০৬।
৮. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (সপ্তম সংখ্যা)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।রাজবাটী।বর্ধমান।১৯৮৮।
৯. সরকার, পিনাকেশ। “হারানো দিনের নাটক”(সম্পাদিত)। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। ১৯৯৯।

....

'ঢোঁড়াই চরিত মানস ' উপন্যাসে তৎকালীন আঞ্চলিকতার প্রেক্ষাপটে তাঁদের জীবনচিত্র

মিতা বাগ
প্রাক্তন ছাত্রী, নেতাজী সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ -
'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি সতীনাথ ভাদুড়ীর এক অনবদ্য উজ্জ্বল সৃষ্টি। উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার বিশেষ ছাপ পড়েছে। আঞ্চলিক সাহিত্যে যে নিদিষ্ট ভূ-ভাগ বা আঞ্চলিক কথা বলা হয়, তার একটা নিজস্ব ভূগোল থাকে। আর অঞ্চল বিশেষে ভূগোলের মধ্যে অবশ্যই এক -একটি একক বর্তমান উপস্থিতি থাকে। সেই অঞ্চলের বিশেষের মানুষ, তাদের আচার -আচরণ, ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, প্রাকৃতিক পরিবেশ, লোকচার ইত্যাদি। বাংলা কথাসাহিত্যে অঞ্চলিকতার সূচনা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর 'কয়লাকুঠী'(১৯২৯)দিয়ে এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারার সাথক স্রষ্টা। আলোচ্য উপন্যাসে সতীনাথ যে বিশেষ আঞ্চলটিকে তাঁর কাহিনির পটভূমি হিসাবে নির্বাচন করেছেন তা নিশ্চিত রূপে বিহারের এক প্রান্তিক জনপদ পূর্ণিয়া।ঢোঁড়াই চরিত মানস'উপন্যাসে বিশেষ অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। সেই কেমন, কেমন তার ভূগোল, প্রকৃতি, প্রতিবেশ মানুষ বিশ্বাস সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ তুলে ধরা যেতে পারে।

লেখক উপন্যাসটিতে তৎমাটুলির পশ্চিমে আছে সিমুলগাছ ভরা বকরহাট্টার মাঠ, তারপর ধাঙড় টুলি। দক্ষিণ ঘেঁষে গিয়েছে মজা নদী 'কারীকোশী '-লোকে বলে মরণাধার। মাঠের বুক চিরে গিয়েছে কোশী শিলিগুড়ি রোড। তাৎমাটুলির লোকেরা এই রাস্তাকে বলে পাক্কী। তাৎমারা জাতে তাঁতি।'ঢোঁড়াই চরিত মানস 'উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয় বাল্য কান্ড থেকে ঢোড়াই যে দিন পাঁচ দিনের সেদিন শুরু হয়েছিল টৌন ঢোঁড়াইয়ের বাবা মারা যাওয়ার পর ঢোঁড়াই গানহী বাওয়ার সাথে বেড়ে ওঠা, রামিয়ার সাথে বিবাহ ও বিচ্ছেদ সাগিয়ার সাথে বিবাহ। উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ী নিম্নবর্গের মানুষের জীবন যাপনের ছবি প্রস্ফুটিত করেছেন।তাদের জীবিকা মধ্যে অনেক কিছু তুলে ধরেছেন লেখক -রোজা, রোজগার, রামায়ণ -এই তিনটি নিয়েই তাৎমাদের জীবিকা।

উপন্যাসে সমাজ পরিবেশের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সমাজের অন্ত্যজ কথা উল্লেখ করেছেন। তাৎমাটুলির, ধাঙড়টুলির, কোয়েরীটোলা, ও সাঁওতাল টৌলার কথা আছে। লোকেচারের প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় উপন্যাসটিতে। বিয়ে সম্বন্ধে পরিচয় দিয়েছেন উপন্যাসটিতে ব্যক্ত করেছেন । বৌকা বাওয়া টাকার জন্যই বিয়ে করতে পারে নি।উপন্যাসটিতে ধর্মবিশ্বাস সংকান্ত বর্ণনা রয়েছে। গোসাঁই, গুণী, জিন প্রতিটি বিষয়ে তাৎ দের অগাধ বিশ্বাস। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। যেমন হিন্দি শব্দের প্রয়োগ -গহকী, আফসর, আদমী, মুলাকাত ইত্যাদি।উপন্যাসটির মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে প্রবাদ -প্রবচন, লোকসঙ্গীত ছড়া। উপন্যাসটিতে দেখতে পাই বিল্টাদের আর একটি বিদেশিয়া গান।উপন্যাসটিতে গল্পগাথা যা উপন্যাসটির চরিত বর্ণন ও গঠন কাঠামো আরো সুন্দর করেছে।

ঢোঁড়াই চরিত মানস 'উপন্যাসটি অনবদ্য এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। বাংলা কথা সাহিত্যে অঞ্চলিকতার সূচনা শুরু মহা সমোত্তর পর্বে সার্থক প্রয়োগ উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার বিশেষ ছাপ পড়েছে। আঞ্চলিক সাহিত্যে যে নির্দিষ্ট ভূ -ভাগ বা অঞ্চলের কথা বলা হয়, তার একটা নিজস্ব ভূগোল থাকে। আর অঞ্চল বিশেষে এই ভূগোলের মধ্যে অবশ্যই এক -একটি একক বর্তমান উপস্থিত থাকে। সেই অঞ্চলের বিশেষের মানুষ, তাদের আচার -আচরণ, ধর্ম বিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, লোকাচার, ইত্যাদি। অধ্যাপক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন -'কবি বা ঔপন্যাসিক রচনায় যখন কোনো বিশেষ দেশাঞ্চলের জীবন যাত্রা, রীতিনীতি, সমাজ, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক পটভূমি অখণ্ড নিবিড়তায় ও সর্বব্যাপী তৎপর্য রূপ পায়,তখন আমরা সেই সাহিত্যকে আঞ্চলিক আখ্যায় অভিহিত করি।'[১]

এ প্রসঙ্গে আরো একটি অত্যন্ত সুন্দর উদাহরণ ব্যক্ত করা যেতে পারে। সমালোচনা আব্রাহামস্ এর মতে -'The regional novel emphasizes the setting, speech and customs of a particular locality, not merely as local colour, but as important conditions affecting the temperament of characters and their ways thinking, feeling and acting.'[২]

বাংলা সাহিত্যে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস 'উপন্যাসটিতে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন ইতিহাস সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটি দুটি চরণে মোট ৭টি কাণ্ডে বিভক্ত। বাংলা কথা সাহিত্যে অঞ্চলিকতার সূচনা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর 'কয়লাকুঠী'(১৯২৯) দিয়ে এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারার সাথক স্রষ্টা। আলোচ্য উপন্যাসে সতীনাথ যে বিশেষ আঞ্চলিকটিকে তাঁর কাহিনির পটভূমি হিসাবে নির্বাচন করেছেন তা নিশ্চিত রূপে বিহারের এক প্রান্তিক জনপদ পূর্ণিয়া। এখানে লেখক জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানকার আলো, জল, বাতাস, নিয়ে বড়ো হয়েছেন। দেশ ও দেশের মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন।রাঢ বাংলা তারাশঙ্করের মতোই সতীনাথ তাঁর জন্মভিটে, তাঁর গ্রাম, তাঁর দেশ, তাঁর দেশ, তাঁর দেশের মাটি, বিশ্বাস, তাঁদের সংস্কার,প্রথা,আচার -আচরণ, ভাষা সমস্ত কিছু কে খুব অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন। তিনি দেশ ও বহিবিশ্বাস সমস্তকেই তিনি জেনেছিলেন, চিনেছিলেন নিজের জন্মভূমিকে জানার মধ্যে দিয়ে। এই বিশেষ অঞ্চলের মাটি, জল, আলো, বাতাস, এখানকার প্রকৃতি পরিবেশ কিছুর সঙ্গেই সতীনাথের ছিলো আত্মীয়তার সম্পর্ক। যা পরিপূর্ণ বিকাশ ও বহিঃপ্রকাশ লাভ করেছে অবশ্য তার ' ঢোঁড়াই চরিত মানস ' উপন্যাসে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে বিশেষ অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। সেটি কেমন, কেমন তার ভূগোল, প্রকৃতি, প্রতিবেশ, মানুষে বিশ্বাস সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ তুলে ধরা যেতে পারে ও তার বিশ্লেষণ করতে পারি। উপন্যাসটি প্রথমেই আদি কাণ্ডের জিরানিয়া বিবরণ দেওয়া আছে, লেখক বলেছেন -'জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া '[৩](জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)তাৎমাটুলির লোকের একেই বলে টোন(টাউন)। সেই শহরটি যেমন তেমন ও নয় হেঁজিপেঁজি শহর নয় ভারী সাহার (প্রকান্ড শহর)পীরগঞ্জ থেকেও বড় যা লেখক উল্লেখ করেছেন উপন্যাসে। আরো জানা যায় বিসারিয়া থেকে বড়ো।তাৎ৭মাদের তুলনায় ধাঙদের জীবন-জীবিকা-সংস্কার অনেকটাই আধুনিক। নিম্নবর্গীয়, দরিদ্র, অশিক্ষিত-তবে তৎমাদের মতো জগৎ বিমুখও নয়। ধাঙড়দের মোড়ল বুড়ো এতোয়ারী।

লেখক উপন্যাসটিতে বর্ণনা করেছেন নিদারুন ভাবে -তৎমাটুলির পশ্চিমে আছে শিমূল গাছ ভরা বকর হাট্রা মাঠ, তারপর ধাঙড় টুলি। দক্ষিন ঘেঁষে গিয়েছে মজা নদী 'কারীকোশী '-লোকে বলে মরণাধার। মাঠের বুক চিরে গিয়েছে কোশী শিলিগুড়ি রোড। তাৎমাটুলির লোকেরা এই রাস্তাকে বলে পাক্কী। তৎমা জাতে তাঁতি। যখন তারা প্রথম এসেছিলো, তখন ছিলো খালি একজনের কাছে একটা ভাঙাচোরা গোছের গামছা কেনা তাঁত। উপন্যাসটি তে লেখক দেখেছেন তুলসীদাসজীর লেখা রামণের নাম 'রামচরিতমানস '। ভারতবর্ষের মধ্যে 'রাম চরিত মানস'ই সবচেয়ে জনপ্রিয় বই। রামচরিত মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল।

ঢোঁড়াইয়ের জীবন কাহিনি শুরু হয় বাল্য কান্ড থেকে ঢোঁড়াই যে দিন পাঁচ দিনের সেদিন শুরু হয়েছিলো টোনে (ধাঙড়দের ভাদ্র পূর্ণিমার দিনের উৎসব আর পূজা)ছিলো ভারী তামাশা।ঢোঁড়াইয়ের বাবা মারা যাবার পর ঢোড়াই গানহী বাওয়ার সাথে বেড়ে ওঠা, রামিয়ার সাথে বিবাহ ও বিচ্ছেদ সাগিয়ার সাথে বিবাহ।ঢোঁড়াইয়ের ভাগ্য বিড়াম্বিত জীবন প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি স্মরণ করায় -'যখনই ঢোঁড়াইয়ের জীবনটা চলনসই গোছের হয়ে আসে, অমনি একটা করে অধি উঠে সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে যায়।'[৪]

'ঢোঁড়াই চরিত মানস 'উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ী নিম্নবর্গের মানুষের জীবন যাপনের ছবি প্রস্ফুটিত করেছেন। আ কাশের তার উজ্জ্বল নক্ষএ হিসাবে দৃষ্টান্ত হয়ে গেছে। তাদের জীবিকা, মধ্যে অনেক কিছু তুলে ধরেছেন লেখক -রোজা, রোজকার, রামায়ণ -এই তিনটি নিয়েই তৎমাদের জীবিকা। এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য -'অসুখে বিসুখে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজা এদের 'ঘরামি'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাকার কাজ।'[৫] কার্তিক অঘ্রান মাসে তৎমা পুরুষদের রোজগার অনিশ্চিত হয়ে এলে এ সময় তৎমা মেয়েরা যায় ধান কাটতে। পৌঁষ মাসে আবার তারা ফিরে আসে যে যার ঘরে। এ থেকে বোঝা যায় পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও জীবিকার সন্ধানে বেরোয়।

তাৎমা সমাজ ও ধাঙর সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরকালের তা উপন্যাসটিতে লক্ষ্য করা যায়। তৎমাদের তুলনায় ধাঙ ররা পরিশ্রমী বেশি, শরীরেও তাদের জোর বেশ। ধাঙড়দের জীবিকা প্রসঙ্গে লেখক বলেন -'অধিকাংশ ধাঙড়ই সাহেবদের বাড়ি মালীর কাজ করে, যারা মালীর কাজ পায় না বা পছন্দ করে না তারা অন্য কোনো কাজকর্ম করে কুলের কাটা থেকে আরম্ভ করে মৌচাক কাটা পর্যন্ত কোনো কাজেই আপত্তি নেই। সকলের গায়েই অসীম ক্ষমতা আর কাজে ফাঁকি দেয় না বলে সকলেই তাদের মজুর রাখতে চায়।'[৬]

সমাজ -

উপন্যাসে লেখক সমাজ পরিবেশের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সমাজের অন্ত্যজো কথা উল্লেখ করেছেন,তা ৎমাটুলি, ধাঙড়টুলি কোয়েরীটোলার', ও সাঁওতাল টোলার কথা আছে। তাৎ মা টুলি, ধাঙড়টুলি, কোয়েরীটোলার সমাজের ভালো -মন্দ, সুখ -দুঃখ সমস্ত কিছুতেই জড়িয়ে আছে সমাজপতিরা গ্রাম্য ভাষায় যাদের বলে পঞ্চ। সমাজের প্রতিটি বিষয়ে ও প্রতিটি কাজের অসীম প্রভাব। তাৎমাটুলির মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে সতীনাথ সমাজ পতিদের উল্লেখ করেছেন, লেখাপড়া জানে না। কিন্তু রামণের নাজির এদের পুরুষের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের। এই নায়েব ছড়িদার থাকে। গ্রামের শালিশির নোটিশ দেওয়া, সভার আয়োজন করা ও সেই সঙ্গে মানুষজন ডেকে আনা সমস্তই কাজ করেন ছড়িদাররা।মহতো নায়েব আদির যন্ত্রনা, অংশে মহতো বলেছে -'বৃষ্টি যে কতদিন বাড়িতে বসে থাকি, সেটা দেখবে না, এক আনা বেশি চাইলেই চালার মাপের হিসেব দেখাবে।'[৭] সাধারণত পঞ্চায়েতের কাছে কেউ নালিশ করলে তাকে দু টাকা ছ আনা জমা দিতে হয়। এর ছয় আনা ছড়িদারদের প্রাপ্য, এক টাকা মোহতো আর এক টাকা বারোয়ারি ফান্ডের। এই ছিলো নিয়ম। রাতিয়া ছড়িদার তার কাজ পঞ্চায়েতের নোটিশ, বাদী, বিবাদী, সাক্ষী, নায়েব সকলকে জানালো, জরিমানার টাকা আদায় করা ইত্যাদি। আসলে কিন্তু সে মাতব্বরদের ঘুষের দালালী করে।

লোকাচার -

লোকাচার প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় উপন্যাসটিতে। বিয়ে সম্বন্ধে পরিচয় দিয়েছেন উপন্যাসটিতে তাৎমাদের বিয়ের সময় কন্যা পক্ষ টাকা পায় বর পক্ষের কাছ থেকে। বৌকা বাওয়া টাকার জন্যই বিয়ে করতে পারেনি। বধুনীর ফেলে যাওয়া টাকার জন্য বিয়ে করতে পারে নি। বধুনীর ফেলে যাওয়া ছেলেকেই পুএ স্নেহে পালন করে এবং বড়ো করেছে, ঢোঁড়াইয়ের সুখ চেয়েছে চিরজীবন। ঢোঁড়াই রামিয়ার বিয়েতে যারাই কন্যাপক্ষ তারাই বরপক্ষ।

ধর্মবিশ্বাস-

'ঢোঁড়াইচরিত মানস'উপন্যাসে ধর্মবিশ্বাস সংকান্ত বর্ণনা লেখক ভীষণ সুদৃঢ় ভাবে বর্ণিত করেছেন। গোঁসাই, গুণী, জিন প্রতিটি বিষয়ে তাৎমাদের অগাধ বিশ্বাস। কুসংস্কার আচ্ছন্ন তাদের জীবন 'বহরমপুরবালা বেলগাছ ', হাড়িকাঠ পুড়ে যাওয়া কিংবা বাঁশঝাড় ফুল গজানো প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাৎমা ধাঙড় সকলেই কোনো না কোনো দেবতার রোষ পায়।

তাৎমাটুলির বড়ো রাস্তার ধারে অশ্বথ গাছের নিচে সিঁদুর মাখানো উঁচু ঢিবিটাই হলো তাৎমাদের গোঁসাই।গোঁসাইয়ের সামনে পোঁতা আছে প্রকান্ড হাড়িকাঠ। এই জায়গাটিকে লোকেরা থান বলেই জানে। গোঁসাইয়ের বাবার যখন জ্বর হয়, তখন ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, জড়ীবুটি টোটকা টাটকা অনেক করা হয়, যা উপন্যাস টিতে লক্ষ্য করা যায়। নাপিত 'কিরিয়াকরম '(ক্রিয়াকর্ম)সব করিয়ে দেয় লেখককের কোথায় -'দেড় বছরের ঢোঁড়াই মাথা নেড়ে হাসে, আর গাঁসুদ্ধ লোকের লেড়া মাথা দেখে চেনা মুখকেও চিনতে পারে না।-বুধনী কপালে মেটে সিঁদুর দিয়ে আঁকা চাঁদটি মুছে বিনিয়ে কাঁদে।'[৮]

ঢোঁড়াইয়ের যখন অসুখ হয় তখন বুধনী রেবনগুণীর কাছে নিয়ে যায়। সেখানে রেবন গুণী চটে লাল হয়ে যায় কারণ সে বুঝতে পারে যে বুধনী খালি পেটে আসেনি। তাই রেবন গুণী বলে যে ,সাতকাল তাৎমা টুলিতে কাটিয়ে তুই জানিস ঝাড় ফুঁক করতে আসতে হলে খালি পেটে আসতে হয়। উপন্যাসটি আরো উক্তি লক্ষ্য করি-'আজকের রাতে শোবার সময় চোখে ধধুলের ফুলের রস দিয়ে দিস।'[৯]

ভাষা -

'ঢোঁড়াই চরিত মানস'উপন্যাসে দেখা যায় ভাষার বিবরণ যা উপন্যাসটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ব্যবহৃত ভাষার সার্থক প্রয়োগ। এক্ষেত্রে উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা যে নিম্নমানের হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি,কিছু কিছু ভোজপাড়ী শব্দের নিদারুন বর্ণনা ঘটেছে, যা উপন্যাসটিতে অঞ্চলিকতার রূপে রং আরো গাঢ়তর করে তুলেছে।

হিন্দি শব্দ-

হিন্দি শব্দের প্রয়োগ উপন্যাসটিতে প্রচুর আছে। গাহকী,আফসর, তখলিফ, পরফেজ, মূরত ,পাখণ্ডী, তৌহার, কিসান, বুড়বক কিরিস্তান, আদৌড়ি টৌন, দরবার, জুলুস, সনবেটা, খাতিরদারি, চৌপট, জনৌ, ভেট, মুলাকাত, কুটমৈতি, গদ্দাদার, পরমাৎসা, বড় আদমী, ইজ্জৎবালা আদমী,গাহকী,হিস্সা,তকদীর,বাগনর, পুতহুঁ ,ঝুট্রা, সমধীন,মাড়োরা,বোটহী,কনিয়া, সাগাই, ভিতরগুন্না, চুনৌতি,মোহব্বত,উজার, প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে।

প্রবাদ-প্রবচন -

উপন্যাসটিতে প্রবাদ-প্রবচন লক্ষ্য করা যায়, যা দর্পণের মতো -

১)'লোহা মানা -

বিলি ভকত আর বগুলা ভকত -

পেট কাটা -

হুক্কা পানি -

বুকের উপর মুগের দানা রগড়ানো -

খাইতো গেঁহু,নাহিতো এহুঁ

ফুলে কুপো -

ক্ষেতের মূলো -

ফুসফুড়ি খুঁটে ঘা করা -

না আগে নাথ, না পিছে পগাহা

পচা তেলী, নয়শ আধুলী

চার কাঙলা, তো এক বাঙলা

খিরা, সবেরে হীরা

টিয়াপাখি কথা বলে না -'[১০]

রামায়ণের প্রভাব -

উপন্যাসটিতে রামায়ণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।যেমন -

১)'গাই বাহোর গরীব নেবাজু।

সরল সবল সাহিব রঘুরাজু।।'[১১]

২)'শুভ আচরণ কতহুঁ নেহি হোই।

দেব বিপ্র গুরু মানই ন কোঈ।।'[১২]

৩)'ধূসর ধূরি ভরে তনু আয়ে।

ভূপতি পাপপরায়ণ ধর্মনহী।

করি দণ্ড বিড়ম্ব প্রজা নিতহী ।'[১৩]

গান -

'ঢোঁড়াই চরিত মানস'উপন্যাসে গান গুলি নিদারুণ গুরুত্ব পরিলক্ষিতা। গানগুলি লিপিবদ্ধ করা হলো -

১)'চায়েৎ সুভা দিনোয়া রামা, হে রামা,,,

আবি গেলে পিয়াকী গামানোয়া।'[১৪]

লোকসংগীত ছড়া -

লোকজীবনের গান লোকসংগীত হিসাবে পরিচিত। ধুলো,জল, মাটির গন্ধ ভরা হাওয়ায় এর সৃষ্টি, জীবনের আনন্দ-বেদনার শব্দ ও সুর ঐতিহ্য গতভাবে এর মধ্য দিয়ে আনুরণিত হয়। লোকসংগীত লোকসমাজের স্পন্দন ও বটে। লোকসমাজের যে কোনো উৎসব পূজো পার্বণ লোক সংগীতের সুরধ্বনি মুখরিত হয়ে ওঠে। লোক সংগীত ছাড়া লোকয়াত জীবনের কল্পনা আমরা করতে পারি না। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'উপন্যাসে নানা প্রসঙ্গে লোকসংগীত ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হলো -

১) ঢোঁড়াই এযখন ছোটো ছিলো তখন তার বাবা সন্ধ্যায় কাজ থেকে এসেই ঢোঁড়াই কে কোলে নিয়ে বসে থাকতো। ঘুম পাড়াতো সুর করে ঘুম পাড়ানি গানের মধ্যে দিয়ে -

'বকড় -হাট্রা -আ আ
বড়দ বাট্রা -আ -আ
সো জো পাঠ্ঠা -আ -আ -'[১৫]
এর অর্থ সুন্দরভাবে লেখক উপস্থাপন করেছেন -ছাগলের হাট, বলদের চলার পথ, শুয়ে পড়ো জোয়ান।
২)বাওয়া সঙ্গে ভিক্ষে করতে গিয়ে ঢোঁড়াই গান ধরেছে -
'সুন্দরা আ সু। ভূমি ভাইয়া -আ।
ভারাতা -আ কে, দেশা - বাসে।
মোরা প্রাণা -আ। বসে -হিম -আ!
খোহরে বটোহিয়া -আ -আ...।'[১৬]
সুন্দর সুভূমি ভারত দেশটা, আমার প্রাণে থেকে হিমালয় গুহায়,রে পথিক,
৩)ঢোঁড়াই এর গলা রীতিমতো ভালো।ভিক্ষে করতে গেলে মাইজিরা ওকে বাড়ির মধ্যে ডাকে। শোনে ওর গান -
'সীয় -রাম -পদ -অঙ্গ বরায়ে।
লক্ষমু চলাই মাগু দেহিনু বাঁয়ে।।'[১৭]
রাম ও সীতার পায়ের দাগ এগিয়ে লক্ষণ একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরে রাস্তা চলেছেন।
৪)'বিরৌলীকে হাটিয়ে- আ -
দৌড়ে নৌকানিয়া -আ -
ঠস ঠস রে বোলে বুনিয়া -আ -আ -আ -আ।'[১৮]
(বিরৌলীর হাটে দৌড় চ্ছে দোকানদার,
বোঁদে মিষ্টান্ন থেকে ঠস ঠস হচ্ছে)
৫)হিন্দু -মুসলমানের সম্প্রতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে একটি গানের মধ্যে। দুলদুল ঘোড়ার মেলায় ফুদী সিংহের দলের সঙ্গে ঢোঁড়াই গেয়ে ওঠে -'হিন্দু -মুসলমান ভাইয়া, জোরে হুরে পীরিতিয়া, রেভাই,হায় রে হায়!'[১৯] এর অর্থ হিন্দু -মুসলমান ভাই, প্রীতির বন্ধনে বাঁধোরে ভাই, ভায়রে হায়। 'মতুম' মহরমের লোকের গান। এই গানের প্রতি লাইনের শেষে 'হায় হায়' কথাটা যুক্ত থাকে, উপন্যাসে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রস্ফুটিত করেছেন।
৬)ধান কাটনীর রাজ্যে পানওয়ালার তেমনই একটি গান -
'আবকী সমৈয়া ধিরজা ধরেনি গে বেটী
নহী উপ্ জল্ ছেই পাটুয়া ধান,
কি রঙ্গ কে করবৌ বীহা দাম
অবকী সমৈয়া ধিরজা ধরেনি গে বেটী।'[২০]
৭)উপন্যাসটিতে দেখতে পাই বিল্টাদের আর একটি বিদেশিয়া গান -
'আজকাল মুন্সিজীর কুঠরীতে জজ সাহেবের কাছারি
নড়বে নাকো বচ্চন সিং মুন্সিজীর পা দাড়ি ;
কোথা গেল কুন্সি এখনো, কোথায় গেলি সেসরী?
ওরে বিদেশিয়া!'[২১]
-বিদেশিয়া গানের ওপর সরকার কিছু বিরক্ত ছিলো। এখন আর নয়। কেননা মহৎমাজির নিমক তৈরী গান, তালগাছ কাটার গান, চরকার সুদর্শন চক্র দিয়ে দুশমন তাড়াবার গান। মুনিয়ার গান,গরু বেচার গান আমদানি করেছে।
৮)' ঢোঁড়াই চরিত মানস'উপন্যাসটিতে ভেটে দেওয়ার প্রসঙ্গটি লক্ষ্য করা যায়। মহাৎমাজির চিঠি এসেছে ভোটের চিঠি, ভোট দিতে হবে, সাদা দেখ বাক্সে চিঠি ফেলতে হবে, মহাত্মাজির চিঠির জবাব। তাহলেই তিনি বুঝতে পারতেন মানুষ রামরাজ্য চায় কিনা। রামরাজ্য হলে

প্রথমেই তিনি খাজনা কমাবার আর জমিদারদের বাবু করবার কানুন করবেন ঢোড়াই খুশি উপন্যাসে দেখতে পাই। বলেন্টিয়রের হাতের চৌঙটা নিয়ে কান ফাটিয়ে চিৎকার করে গান ধরে,-

'মাগনা কুচরি খেয়ে নিও
মাগনা গাড়ি পাও চড়ে নিও
পয়সা পাও বটুয়াতে ভরে নিও
কিন্তু ভোটের মন্দিরে গিয়ে বদলে যেও ভাই হামারা
সাদা বাক্স মহাৎমাজীকা সাদা বাক্স।'[২২]

৯)' ঢোঁড়াই চরিত মানস'উপন্যাসে বিয়ের রীতিনীতি, প্রথা-প্রচলন বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত। বিয়ের পর কন্যা পক্ষ ও বরপক্ষের দুই বেয়াই পরস্পরকে ধান দেওয়া -নেওয়ার বিবাহ রীতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কন্যা পক্ষের মেয়েরা গান ধরে, পাএ পক্ষের বেয়ান দুখিয়ার মাকে লক্ষ করে -

'বুজরুকি রাখ 'সমধীন',
বল ছেলের বাপটি কে
উদি পরা চাপরাসি, না লেঙট - পরা সন্ন্যাসী?
না অন্য কোনো নাগর ছিলো,
বলেই ফেল ছাই?
খুসুর ফুসুর খুসুর ফুসুর
করো কনে?
অন্য কোনো নাগর ছিলো বুঝি
ভাঁটবনেতে তলুকিয়ে আছে?'[২৩]

প্রবাদ-প্রবচন -

সতীনাথ ভাদুড়ী উপন্যাসে লোক মানুষেরাও তার ব্যতিক্রম নয়। যে লোকজীবনের তিনি উপন্যাসের বিষয় করেছেন, তার চরিত্রকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে যেমন প্রবাদ -প্রবচন সাহায্য করেছে। তেমনি উপন্যাসে যে সমস্ত প্রবাদ -প্রবচন ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি হলো -

১)বাওয়া লক্ষ্য করে রোগা হয়ে যাচ্ছে। পাঁজড়ের হাড় গুলো গোনা যাচ্ছে 'মায়ে খেদানো বাপ মরা, ছেলেটির [২৪]

২)বাই উখড়োল(বায়ু উপড়োবার রোগ)রোগ হলে মুড়ি খাওয়া বারণ।কারণ 'পেট খারাপ করে মুড়ি, আর ঘর খারাপ করে বুড়ি' [২৫]

৩)জিরানিয়ার তৎমাটুলিতে ধাঙড়টুলিতে 'বাই উখড়োনোর অসুখ হয়েছে সঙ্গে জ্বর।এই অসুখ গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। যেমন 'তেমন অসুখ নয়, ঝটকে বিমার পটকে খতম'[২৬] লোকে অসুখে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মরে।

৪)'কাহুদি বাদি ন দেহিয়া দোষ দিও না।'[২৭]

৫)বিহারের প্রান্তিক মানুষের একটি বিশ্বাস প্রবাদে পরিণত হয়েছে -'বাজাছাজা কেস,তিন বাঙ্গালা দেস'[২৮] বাদ্য, ঘর ছাউনি (মেয়েদের)মাথায় চুল -এই তিনটি জিনিস বাংলাদেশের খুব ভালো।

৬)উপন্যাসটিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবাদ রয়েছে,

'বেড়ালের মতো গোঁফ' [২৯] এই কথার মধ্যে দিয়ে গোফ দেখলেই শিকারী বেড়াল চেনা যায়'-প্রবাদ খুব স্মরণীয়। যা সহজেই আঁখির পলকের উদয় হয়।

৭)আকাশের চাঁদ হাতে পায়। গহরী বওয়ার মূর্তির রাখার একটা হিল্লে হলো।

৮)উপন্যাসে আমরা একটি প্রবাদ লক্ষ্য করি। শনিচরা ধাঙড় মহতো আর ছড়িদারকে টিটকিরি মেরে বলে -

'বিলি ভকত আর বগুলা ভকত।
'বিড়াল তপস্বী আর বক ধার্মিক।'[৩০]

৯)'হুক্কাপানি'[৩১] হুঁকোর জল। এর অর্থ এক ঘরে করা।।
১০)'বুকের ওপর মুগের দানা রাগরাচ্ছে' [৩২] পাকা ধানে মই দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত।
১১)'কত ধানে কত চাল'[৩৩]
১২)'বদমাইসির জড়'-যত নষ্টের গোড়া'[৩৪]
১৩)'জাকে নখ আর জুটা বিশালা।'
সেই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা।'[৩৫] তুলসীদাস -যার নখ আর জটা বড়ো। সেই কলিকালে প্রসিদ্ধ তপস্বী।
১৪)'ভাদ্রের কুকুরের মতো'[৩৬]
১৫)'যে গাছে বক সে গাছকে খরচের খাতায় লিখে লিখে রেখে দাও।'[৩৭]
১৬)'জলু পয়সরিস বিকাই, দেখহু প্রীতিকি রীতি ভালো।'[৩৮] প্রীতির কি যথার্থ রীতি দেখ, জলও দুধের মতো ব্রিকি হয়।
১৭)'নাকের জলে চোখের জল'[৩৯]
১৮)'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'[৪০]
১৯)খোসা দেখে কি সব সময় ধরা বেগুনের ভিতরে পোকা আছে কি না।
২০)'যখের ধন'[৪১]
২১)'নিত্য ক্ষেতী দুসরে গাই।'[৪২] ক্ষেত দেখতে হয় রোজ, আর গরু একদিন অন্তর একদিন।
২২)'মনের মাখন গোলানো কথা।'[৪৩]
২৩)অউর করই অপরাধ কোউ আউর পাবো ফল ভেগু।'[৪৪] একজন দোষ করে একজন ফল পায়।
২৪)চার কাঙলা বা চারজন গরিব থাকলে তবে একটা ঘর হয়।
২৫)'ঘি আর আগুন।' [৪৫] ভিড় এত থাকাই আর সাগিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মোসম্মতের সঙ্গে দেখা হয় গিধরের। ঢোঁড়াই আর সাগিয়ার একসঙ্গে থাকাটা ঘি আগুনের প্রসঙ্গের উদ্ভাবন হয়েছে যা উপন্যাসে দৃষ্টিগোচর হয়।
২৬)ঢোল নেই ঢাক নেই, গোরার বাদ্যি-চাপরাশি নেই, নোটিশ নেই, নিলাম হলেই হলো আর কি।
২৭)'যে জাত ঘুমিয়ে থাকে, যে জাত বাঁচে না '[৪৬]
২৮)'যার নুন খায় তার গুণ গায়।'[৪৭]
২৯)'মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে।'[৪৮]
৩০)'ভাদ্রের শিয়ালি '[৪৯] (যার কিছু দেখার কথা নয়। সে বলে আমি তো দেখিনি)একটা শিয়াল ভাদ্র মাসে জন্মেছিলো। আষাঢ় শ্রাবণ দেখেইনি। জন্মে সে বলে এত বৃষ্টি তো কখনো দেখেনি।

উল্লিখিত প্রবাদ প্রবচন গুলি ছাড়াও আরো প্রবাদ -প্রবচন উপন্যাসের মধ্যদিয়ে চরিত্রের পরিচয় সুন্দরভাবে বর্ণনার করে তার প্রসারণ ঘটিয়েছেন লেখক। এ ব্যাপারে সতীনাথের কৃতিত্ব বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। লোক মানুষের মধ্যে প্রচলিত এতো বিশাল সংখ্যক প্রবাদ -প্রবচন কোনো বাংলা উপন্যাসে আছে কিনা বলা কঠিনতর।

গল্পগাথা -

'ঢোঁড়াই চরিত মানস'উপন্যাসে গল্পগাথা যা উপন্যাসটির চরিত বর্ণন ও গঠন কাঠামো আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে যা উপন্যাসটিকে নবতর রূপ দান করেছে।

নানা রকম ভূত প্রেত ইত্যাদি অশরীরী আত্মার গল্প রয়েছে উপন্যাসটিতে। মুরবলিয়া -কন্ধকাটা ভূতের গল্প।

এছাড়াও ভূমিকম্পের গল্প। ১৯৩৪ সালে বিহার বাসী ভূমি কম্পের রুপ দেখেছিলো, তার গল্প। ধরিত্রী মায়ের বুক থেকে এক কুড়ি মেঘের ডাক টগবগ করে তার বুকে। ধরতিমাই হুঙ্কার ছাড়লেন চড়মড় করে তামাক ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে জমিটা ফেটে গেলো। যার বর্ণনা লেখক দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছে উপন্যাসটিতে। ফোয়ারা দিয়ে বাতাস সমান উঁচু জল আর বালি বেরিয়েছে, ফাটলের মধ্য দিয়ে এখানে ওখানে অগুনতি জায়গায়, ভয়ানক শব্দ থামতেই চাই না।

লোকশিল্প -

উপন্যাসটিতে লোকশিল্পের মধ্যে দিয়ে লোকায়িত জীবনের নন্দনিক বোধের অজস্র পরিচয় গুরুত্বপূর্ণতা লাভ করেছে। উপন্যাসে লক্ষিত হয়েছে দৈনন্দিক জীবনযাপনের দরকারী নানা দ্রব্য সামগ্রী, অলংকার, আলপনা, পুতুল, কাঁথা, মাটির বাঁশের নানা জিনিস যা তারা তৈরী করতে দক্ষ ছিলো। কেয়েরী টোলার সব লোকেই জানে, যখন কোনো পরিবার চাল জোটাতে পারে না। তখন দেওয়ালের হাতি ঘোড়ার রঙ্গোলি গুলোতে ভালো করে রং করে। রঙ্গোলি হলো রঙিন আলপনা।

১)তারা ব্যবহার করে বেনাঘাসের কাঠা। সবুজ আর গোলাপি রঙে রাঙানো

২)রামিয়া 'হরশিঙ্গার'এর ফুল দিয়ে তাজা রাঙানো কাপড় পড়েছে।

৩)দরিদ্র লোক সমাজ তুলসীতলা গোবর মাটি দিয়ে লেপে পরিপাটি করে ।

৪)ঝকঝকে করে উনুন নিকানো।

৫)পরিস্কার করে নিকানো ধাঙড় দের খড়ের ঘর গুলো, যা উপন্যাসে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৬)ফোঁটা দেয়া আয়না।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর শিল্পির তুলির টানে আঞ্চলিকতার পরিমন্ডলের রূপ বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসটির মধ্যে নানা হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেছেন লেখক। ব্যবহার করেছেন প্রচলিত লোকোক্তি ও প্রবাদ -প্রবচন। উৎসব, কথা, বিশ্বাস, লোকাচার, রোগ, ভোগ প্রভৃতি বিষয় গুলি স্থানীয় পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। মুখের ভাষাগুলিকে তিনি অর্থ পূর্ণ তীক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই রকম কয়েকটি বাক্য সামনে উপন্যাসে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহ ধারাকে বজায় রেখে, সেখানে প্রান্তিক বিহারের চির রূপ দিয়েছেন তা মলিনতার ছড়িয়ে গেছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে,তা সন্দেহ নেই। অতএব, উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার রূপ বর্ণনা বিচারের দিক থেকে বলা যায় তা স্বাথর্কতম ও পরিপূর্ণতায় ভরা এক রাশ জলপূর্ন কলস।

তথ্যসূত্র-

১)বিশ্বাস, দেবব্রত, ঢোঁড়াই চরিত মানস অবতলের আত্মজিজ্ঞাসা, প্রজ্ঞাবিকাশ,৭০০০০৯,পৃ.২৭৬

২)পূর্বোক্ত পৃ.২৭৬

৩)ভাদুড়ী, সতীনাথ,ঢোঁড়াই চরিত মানস,বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯,পৃ.৩

৪)বিশ্বাস, দেবব্রত, ঢোঁড়াই চরিত মানস অবতলের আত্মজিজ্ঞাসা, প্রজ্ঞাবিকাশ,৭০০০০৯,পূর্বোক্ত পৃ.২৭৮

৫)পূর্বোক্ত পৃ.২৭৯ , ৬) পূর্বোক্ত পৃ.২৮০ , ৭)পূর্বোক্ত পৃ.৪২ ৮)ভাদুড়ী, সতীনাথ,ঢোঁড়াই চরিত মানস,বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৮৯)পূর্বোক্ত পৃ.১৯ , ১০)বিশ্বাস, দেবব্রত,ঢোঁড়াই চরিত মানস অবতলের আত্মজিজ্ঞাসা, প্রজ্ঞাবিকাশ,৭০০০০৯, পৃ.২৮২ ,১১)ভাদুড়ী, সতীনাথ, ঢোঁড়াই চরিত মানস,বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.৭৬

১২)পূর্বোক্ত পৃ.৫৭ ,১৩)পূর্বোক্ত পৃ.৯৪ , ১৪)পূর্বোক্ত পৃ.১০৪ , ১৫)পূর্বোক্ত পৃ.১০ , ৬) পূর্বোক্ত পৃ.২১

১৭)বিশ্বাস, দেবব্রত, ঢোঁড়াই চরিত মানস অবতলের আত্মজিজ্ঞাসা, প্রজ্ঞাবিকাশ,৭০০০০৯, পৃ.৩০৮

১৮)পূর্বোক্ত পৃ.৩০৮ , ১৯)পূর্বোক্ত পৃ.৩০৮ , ২০)পূর্বোক্ত পৃ.৩০৮ ,২১)পূর্বোক্ত পৃ.৩০৯, ২২)পূর্বোক্ত পৃ.৩১০ , ২৩)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১১ , ২৪)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৩ , ২৫)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৩ , ২৬)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৪ ,২৭)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৪ , ২৮)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৪ , ৯)পূর্বোক্ত পৃ.৩১৪ , ৩০)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৪ , ৩১)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৫ , ৩২)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৫ , ৩৩)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৫ , ৩৪)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৫ , ৩৫)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৫ , ৩৬)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৬ , ৩৭)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৬ , ৩৮)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৬ , ৩৯)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৭ , ৪০)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৭ , ৪১)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৭ , ৪২)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৮ , ৪৩)পূর্বোক্ত পৃ.৩১৮ , ৪৪)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৯ , ৪৫)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৯ , ৪৬)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৯ , ৪৭)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৯ ,৪৮)পূর্বোক্ত পৃ. ৩১৯

গ্রন্থনাম -

১)ভাদুড়ী, সতীনাথ,ঢোঁড়াই চরিত মানস,বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩

২)বিশ্বাস, দেবব্রত, ঢোঁড়াই চরিত মানস অবতলের আত্মজিজ্ঞাসা, প্রজ্ঞাবিকাশ,৭০০০০৯,

....

দেবদাসীদের শিকল ভাঙার আখ্যান - পারাবতের ‘বিজয়নগর’

মিঠুন মণ্ডল
গবেষক,বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ –

ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃন্য, অত্যাচারিত, নির্লজ্জ অধ্যায় রচিত হয়েছিল দাসপ্রথাকে কেন্দ্র করে। যার একটি ধারা দেবদাসী প্রথা। পৃথিবীর সকল বৃহৎ সভ্যতায় এই দেবদাসী প্রথার ইতিহাস লেখা আছে। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। বরং ভারতভূমিতে এই প্রথা স্থায়ীত্ব অনাদি অনন্ত। আইন এই প্রথাকে রদ করলেও নির্মূল করতে ব্যর্থ আজও। নারীর এই অসম্মানের ইতিহাস তাই ভারতীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েছে বহুবার। শ্রীপারাবত বিশ শতকে যখন তাঁর ‘বিজয়নগর’ উপন্যাস লিখছেন, দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন এক শহরের প্রেক্ষাপটে দেবদাসীদের অবস্থান নিয়ে। তখন আজকের দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত কোনো গ্রামে কোনো দেবদাসী নিজের অবস্থানের জন্য লড়ছে কি না জানা যায় না। কিন্তু নারীর এই লড়াই যে পুরাতন - ইতিহাস আর সাহিত্য দুইই তার সাক্ষ্য দেয়। *দেবদাসীদের শিকল ভাঙার আখ্যান – পারাবতের ‘বিজয়নগর’* শীর্ষক প্রবন্ধটি পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রথার বিরুদ্ধে মানুষের তিল তিল লড়াইয়ের স্মারক হিসাবেই লিখিত।

সূচক শব্দ –
দেবদাসী, দাসী, মন্দির, ক্রীতদাস, দেবতা, প্রথা, পেশা, বিজয়নগর, ইতিহাস, আখ্যান

মূল আলোচনা

हरि तुम हरो जन की पीर ॥
द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चिर ॥
भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर ॥
हरिणकश्यप मार लीन्हो, धर्यो नहिन धीर ॥
बूढ़ते गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर ॥
दास मीरा लाल गिरधर, दु:ख जहाँ तहाँ पीर -

মীরাবাঈয়ের লেখা এই গানটি একসময় মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়তম গানের তালিকায় স্থান পেয়েছিল। কারণ - জীবনে যতবার গান্ধীজী এই গান শুনেছেন ততবার তাঁর মনে হয়েছে স্বয়ং মীরাবাঈ এই গান গাইছেন। কিন্তু সে কণ্ঠ ছিল মাদুরাইয়ের এক মেয়ের। মাদুরাই সম্মুখাবদিভু সুব্বুলক্ষ্মী। যিনি বাঙালির কাছে পরিচিত হয়েছিলেন ‘শুভলক্ষ্মী’ নামে। গানের পাশাপাশি তাঁর প্রতিভার পরিচয় বিকাশিত হয়ে আছে অভিনয় জগতেও। ১৯৭৪ সালে যে মানুষটি র‍্যামন ম্যাগসেস পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন তাঁর জীবনের ছেলেবেলাটা লুকিয়ে আছে মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরের অন্দরে। কারণ শুভলক্ষীর মা সন্মুকাভাদিভের আম্মাল ছিলেন মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরের দেবদাসী। যে শব্দটা শুনলে আজও সমাজের এক বিভৎস সুন্দররূপ স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে। বিশ শতকে দাঁড়িয়ে শুভলক্ষী তাঁর দেবদাসী জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন শৈশবেই, তাঁর মায়ের প্রচেষ্টায়। নিজের শিশু কন্যাটির অঙ্গ থেকে ‘দেবদাসী’ এই শব্দটা মুছে দিতে, দেবদাসী আম্মালকে কতটা সমাজের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয়েছিল তা আজ সময়ের পটে বিলীন। তবে সব আম্মালরা মা হয়ে উঠতে পারে না। যুগ যুগ ধরে মীরাবাঈ এদের কণ্ঠে বারবার ফিরে এলেও সব শুভলক্ষীরা ‘তপস্বিনী’ বা ‘সঙ্গীতের রানী’ হয়ে উঠতে পারে না। সমাজের যূপকাষ্ঠে যে রোগ ঘুণপোকার মত বাসা বেঁধেছিল যুগ যুগ ধরে, তাকে সারিয়ে সুস্থ জীবনের অনুসন্ধান আম্মালরা করে গেছে বহুকাল ধরে। কিন্তু ব্যর্থতাই এদের জীবনে সত্যি হয়েছে বারবার। আসলে সব শুভলক্ষীরা জীবনে শ্রীমতির মত ক্রীড়াশক্তির সন্ধান পায় না। তাই ইতিহাসই বোধহয় জন্ম দেয় ক্রীড়াশক্তি, অমরু, অতীশদের - শ্রীমতি-মঞ্জরীদের জন্য।

পৃথিবীতে দাসপ্রথার ইতিহাসে সবচেয়ে নির্যাতিত, কলঙ্কিত অধ্যায় নারীর দাসত্বের ইতিহাস। দেবদাসী প্রথা বহিরঙ্গে তার ভিন্নরূপ মাত্র, অন্তরঙ্গে সে দাসীদের অকথ্য নির্যাতনের অধ্যায়। আবার দেবতা স্বয়ং এখানে সভাপতিত্ব করেন। যদিও তিনি অন্তরে এই পদ গ্রহণ

করেন কি না, তার অনুসন্ধান করা এই ক্ষেত্রে যুগ যুগ থেকেই নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীতে মানুষের অন্যায়ের যদি একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেত, তাহলে দেখা যেত দেবতার নামে আজ অবধি যত রকমের অপরাধ করা হয়েছে, তার সিকি ভাগ অপরাধও মানুষ নিজের নামে করেনি। দেবতার অক্ষমতা বোধকরি এখানেই।

দেবদাসী প্রথা যে পৃথিবীর আদিমতম প্রথাগুলোর একটি তা বলা অপেক্ষা রাখে না। আর এই দেবদাসী প্রথার সাথেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে, পৃথিবীর আদিমতম অপর একটি পেশা, নারীর দেহব্যবসা বা বেশ্যাবৃত্তি। দেহোপজীবিনীদের সাথে দেবদাসীদের তফাৎ কেবল এখানেই যে দেবদাসীরা দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হয়ে, ভোগ্য হতেন মানুষের। ইতিহাস বলে কখনও তা স্বেচ্ছায় আর কখনও সামাজিক রীতিতে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ মিশর। এই মিশরেই প্রথম দেবদাসী প্রথার প্রচলন। মিশরের রানী থেকে ক্রীতদাসী পর্যন্ত সকল নারীকেই দেবদাসীর পর্যায়ে পরিগণিত করা হত। অর্থাৎ সমাজের সকল স্তরের নারীই রাজা, পুরোহিত এবং সমাজের উচ্চশ্রেণির পুরুষের জন্য ছিল ভোগের বস্তু। এরপর আসীরিয় ও ব্যাবিলোনীয় সভ্যতায়ও নারী ছিল দেবদাসী। ব্যাবিলোনীয় সভ্যতায় প্রতিটি বিবাহযোগ্যা নারীকেই দেবী ইশতারের মন্দিরে বসে থাকতে হত, যে পুরুষ এসে প্রথমে তাঁর কোলে একটি রৌপ্যমুদ্রা ফেলবেন সেই নারীকে সেই পুরুষটির সাথেই মিলিত হতে হত। এই কারণে দেবদাসীদের বাধ্যতামূলক বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস প্রাচীন ব্যাবিলনেই পাওয়া যায়। ব্যবিলোনীয় সভ্যতায় নারীর জীবনের এই ইতিহাস যতই নির্মম হোক না কেন এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে বারবার, নানা সভ্যতায় নানারূপে। গ্রীসে Hierodule (মন্দিরবালা)-দের দেখা যেত প্রায় প্রতিটি দেবতার মন্দিরে। দেবতার সম্মুখে নৃত্য-গীত প্রদর্শন করার পাশাপাশি বেশ্যাবৃত্তি এদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের যে গ্রীস তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন চিন্তার জন্য আজও বন্দিত হয়, তারই পাদপ্রদীপের অন্ধকারে ছিল দেবদাসী প্রথার এক নির্লজ্জ ইতিহাস। গ্রীকদের পরেই আসে রোমানদের ইতিহাসের কথা। কিন্তু রোমান ইতিহাসের মূল ভিত দাঁড়িয়ে ছিল মূলত দাস সম্প্রদায়ের উপরেই। রোমান দেবী জুনো আর ভেনাস মন্দিরগুলোতে একাধিক দেবদাসী ছিল। তবে এই দেবদাসীরা প্রধানত পুরোহিতদের উপভোগ্যে ছিল বলে মনে করা হত। কারণ – রাজা কিংবা শহরের সম্ভ্রান্ত পুরুষদের উপভোগের জন্য তখন রাজনটী এবং নগরনটী নামক দুটি শ্রেণির নারীর আর্বিভাব ঘটেছে। তবে দেবদাসীদের সাথে রাজনটী বা নগরনটীদের প্রাথমিক তফাৎ ছিল এরা দেবদাসীদের মত দাস সম্প্রদায়ের ছিলেন না। দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সভ্যতায়ও এই দেবদাসীদের কথা পাওয়া যায়। সেখানে সুন্দরী মেয়েরা নির্দিষ্ট তালিমপ্রাপ্ত হয়ে 'Virgins at the Sun' রূপে মন্দিরে বাস করতে। রোমে দাস প্রথার অবসানের সাথে সাথে দেবদাসী প্রথারও অবসান ঘটে। ভারতবর্ষেও এই দেবদাসী প্রথার প্রচলনও অনেক প্রাচীনকাল থেকেই। 'সুতনুক নাম দেবদশিক্যি/ তম্ অকামরিথ বলনশেয়ে/দেবদিন্নো নাম লূপদখে' – সুতানুকা লিপিতে প্রাপ্ত এই কয়টি ছত্রই জানান দেয় ভারতবর্ষেও দেবদাসী প্রথা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেও প্রচলিত ছিল। হয়তো এই ইতিহাস আরো পুরানো, কিন্তু তার কোনো প্রমান আজ আর পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে যে এই প্রথার প্রচলন বেশ দীর্ঘস্থায়ী সেটা ভারতের সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজের ইতিহাস থেকেই জানা যায়। ১৯১৬ সালে জন্ম হয় ভারতীয় সংগীত শিল্পী মাদুরাই সম্মুখাবদিভু সুব্বুলক্ষ্মীর। সুব্বুলক্ষ্মী নিজেও নিজের ছেলেবেলা কাটান এক মন্দির প্রাঙ্গনেই। তার মাও জীবনের এক দীর্ঘ পর্ব কাটিয়েছেন মন্দিরের দেবদাসীরূপেই। এইরকম কত নামহীন নারী দেবদাসীরূপেই অতিবাহিত করে গেছেন তাদের জীবন কালের পর কাল ধরে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে ভারতবর্ষে এই দেবদাসীপ্রথার ইতিহাসের কালপর্ব ঠিক কতখানি দীর্ঘ। বহু প্রাচীন শিলালিপি থেকে ভারতবর্ষের দেবদাসীদের নৃত্য, গীতশিক্ষা লাভ এবং অন্যান্য নানা ধরণের শিক্ষালাভের কথাও জানা যায়। তারা বহুগুণের অধিকারী হলেও, ইতিহাস এই কথাই বলে, যে তারা মূলত পুরুষের লালসার শিকার হয়েই থেকে গেছেন। আজকের কর্মজীবী নারীকে দেখলে কল্পনা করা শক্ত এই নারীর কর্ম জীবনের সূচনা হয়েছিল দেবদাসীদের হাত ধরেই। দেবদাসীদেরা প্রথম সেই নারী যারা দেহকে জীবিকার উপাদান হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন সেই কোন প্রাচীনকালে।

সাহিত্যে দেবদাসীদের কথা এসেছে বারবার। তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না কাহিনির প্রেক্ষাপট হয়েছে নানা সাহিত্যে। তবে কোনো সমাজ, কিংবা কোনো সাহিত্য তাদের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি। তাদের জীবনের লড়াইটা চিরকাল তারাই লড়ে গেছে। পৃথিবীতে বোধহয় একমাত্র প্রথা যার কোনো অবসানের ইতিহাস নেই। কোনো প্রতিবাদের ইতিহাস নেই। আসলে নারী নিজেই তো এমন করে বেঁধেছে নিজেকে এই পেশায় যে, এখান থেকে মুক্তির কথা ভাবতে সে ভুলে গেছে। তাই সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের কোনো ইতিহাস এই প্রথায় খুঁজে পাওয়া যায় না। দেবদাসীরা আজ আর হয়তো মন্দিরে থাকে না, কিন্তু তাই বলে তাদের বিলোপ ঘটেছে এমন

নয়। তাদের জীবনের রূপরেখা বদল হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর আদিমতম পেশাটা তার নিজের রূপ বদল করেছে। সমাজের গভীরে আজও অন্তঃসলিলা থেকে বয়েই চলেছে দেবীদাসীরা নাম বদল করে। তবে এর বিরুদ্ধে কেউ যে কোনোদিন প্রতিবাদ করেনি এমন নয়। অত্যাচার সইতে সইতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে গর্জে উঠেছে কেউ কেউ। নিজের লড়াই নিজে লড়েছে, কিংবা হয়তো কোনো ক্রীড়াশক্তি বা অমরু কিংবা অতীশ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে লড়াইয়ের ইতিহাস আজ আর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বরং তাদের পাওয়া যায় সাহিত্যের পাতাতেই। যেখানে ক্রীড়াশক্তির মত পুরুষের হাত ধরে শ্রীমতির মত দেবদাসীরা হয়ে ওঠে আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ, মঞ্জরীরা হয়ে ওঠে সেবিকা। নারীকে যে কেবল প্রেমিকা নয় সেবিকাতেও পরিণত করে তোলা যায় - ইতিহাসে কয়জন ক্রীড়াশক্তি সে কথা ভেবেছিল তা আজ আর জানা যায় না। এটা কেবল শ্রীপারাবতের মত সাহিত্যিকের ‘বিজয়নগর’ নামক উপন্যাস থেকেই জানা যায়। সাহিত্য তো আসলে বাস্তব থেকে তিন ধাপ দূরবর্তী। তাই সাহিত্য যখন ক্রীড়াশক্তিদের নির্মান করে, তখন অনুমান করে নেওয়াই যায় বাস্তবের ক্রীড়াশক্তিরা বৃহৎ লড়াইয়ের আখ্যান না রচনা করে যেতে পারলেও, ক্ষুদ্র আখ্যান তো রচনা করেছিল। এবার ইতিহাস তা মনে রাখেনি। তার দায় ইতিহাসের, ক্রিয়াশক্তিদের নয়।

বিজয়নগর - দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম এই শহর বাংলা সাহিত্যরূপের কাহিনির প্রেক্ষাপটে স্থান করে নিয়েছে বারংবার। শরদিন্দুর ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’, সুনীল গাঙ্গুলীর ‘বিজয়নগরের হীরে’ থেকে শ্রীপারাবত-এর ‘বিজয়নগর’ একই স্থান ফিরে আসে নানা কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে। কখনও ঐতিহাসিক কাহিনি; তো কখনও রহস্য গল্প – ইতিহাসের রহস্যে মোড়া এই শহর প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছে অবলীলায়। শ্রীপারাবতের ‘বিজয়নগর’ উপন্যাসটি একটি ঐতিহাসিক কাহিনি। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে গড়ে ওঠা বিজয়নগরের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজত্ব, প্রথা, রীতি-নীতিকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসের ঘটনার ক্রম নির্মিত হয়েছে। যেখানে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছে পশুপতি মন্দিরের পুরোহিত ক্রীড়াশক্তি, বিজয়নগরের রাজা, সভাকবি অমরু, রাজকর্মচারী অতীশ, আর শ্রীমতি, মঞ্জরী, দয়াবতী, মাধবী, ভবানীর মত দেবদাসীরা। এই কাহিনি মূলত পুরোহিত ক্রীড়াশক্তির শ্রীমতির মত দেবদাসীদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাহিনি। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের অবস্থিত বিজয়নগর থেকে এক বহুদূরবর্তী গ্রামের তেরো বছরের মেয়েটি একদিন মায়ের হাত ধরে এসে উপস্থিত হয় বিজয়নগরের পশুপতি মন্দিরে। গ্রামে প্রবল দুর্ভিক্ষ, পিতার মৃত্যু শ্রীমতি আর তার মাকে ঠেলে দেয় একটা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। এই অনাহারে মৃত্যুর থেকে নিজের সন্তানকে বাঁচাতে, মেয়ের জন্য মা নিজের হাতে লিখে দেন দেবদাসী জীবন। তিনি জানেন দেবদাসী জীবনের অর্থ একটা নারীর জীবনে কি! তবু সন্তানের প্রাণের মায়া মাকে বাধ্য করে মেয়ের এই ভবিষ্যত লিখতে। তেরো বছরের মেয়েটিকে পুরোহিত ক্রীড়াশক্তি কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্দিরে আশ্রয় দেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় পুরোহিতের যে চরিত্র নির্ম্মিত আছে, ক্রীড়াশক্তি সম্পূর্ণ তার বিপরীত। প্রায় সন্ন্যাসী এই মানুষটার জীবনের লক্ষ্য - কেমন করে তার কাছে বড় হয়ে ওঠা মেয়েগুলোকে তাদের দেবদাসী জীবন থেকে মুক্ত করে, সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেবেন। নিজের বয়সের কথা চিন্তা করে তার এই প্রচেষ্টা আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন তিনি। ধীরে ধীরে তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বড় হয় শ্রীমতির মত তেরো বছরের মেয়েটি। নাচ, গান, শাস্ত্র সব শিক্ষাই দেবদাসীদের দিতে থাকেন তিনি। কিন্তু শ্রীমতিকে দিলেন এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা - চিকিৎসা বিদ্যা। গুরুদেবের কাছে থেকে শ্রীমতি ধীরে ধীরে এই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকলেন। শ্রীমতির পাশাপাশি মঞ্জরী পেল মানুষকে সেবা করার শিক্ষা। রাজপুরোহিত পশুপতি মন্দিরের গুরুদেব কখনও সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করে সুস্থ করে তোলেননি। গুরুদেবকে এই দুটি মেয়ে শিখিয়েছিল কেমন করে মানুষ হয়ে মানুষকে সেবা, শুশ্রূষা করতে হয়। একজন চিকিৎসকের কাছে রোগীর পরিচয় যে কেবল তিনি রোগী – এই তত্ত্ব বৃদ্ধ বয়সে গুরুদেব শিখলেন তার শিষ্যাদের থেকে। এক নতুন পথ দেখাল তারা। গুরুদেব যেন এক আশার আলো দেখতে পেলেন এই দুটি কন্যাকে কেন্দ্র করে। এদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে দিতে অমরু শতকের কবি অমরুকে তিনি নির্বাচন করলেন শ্রীমতির জন্য। আর রাজকর্মচারী অতীশকে নির্বাচন করেন মঞ্জরীর জন্য। একটা নতুন জীবন পায় শ্রীমতি আর মঞ্জরী। তবে ক্রীড়াশক্তি সবাইকে এই সুস্থ জীবন দিয়ে যেতে পারেন না। বিদেশী পুরুষের কারণে মাধুরী আত্মহননের পথ বেছে নেয় একদিন। সরস্বতী রূপে, গুণে সরস্বতী হয়েও তার পরিণতি হয় আত্মহনন। কারণ রাজ অবরোধে তাকে বন্দি হতে হয় কেবলমাত্র সে সুন্দরী বলে। রাজার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেও পরিত্যাজ্য হয়। নিজের এই পরিণতি মেনে নিতে অপারগ সরস্বতী শেষ করে নিজেকে। দেবদাসীদের পরিণতি যৌবন ফুরিয়ে গেলে হয় ভবানীর মত। ভবানী বিগত যৌবনা এক দেবদাসী, যে আজ পশুপতি মন্দিরের দেবদাসীদের রান্না করে। ভবানীর চেয়েও খারাপ অবস্থায় জীবন কাটে অনেকের। তারা বাধ্য হয় বেছে নিতে ভিখারীর জীবন। যৌবন ফুরিয়ে গেলে তাদের

দায় কোনো রাজসভা, কোনো সমাজ গ্রহণ করে না। দয়াবতী গান গায় তার ঈশ্বরের জন্য, দেবতাকেই সে তার স্বামী মানে। দয়াবতীর ভিতর থেকে আপনা হতে জন্ম নেয় ঈশ্বরের জন্য নিবেদিত স্তব। কিন্তু তার এই স্তবও একদিন স্তব্ধ হয়। ক্রীড়াশক্তির মৃত্যুর পরে যিনি মন্দিরের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব নেন, তার লালসার শিকার হতে হয় দয়াবতীকে। এটাই দেবদাসীদের জীবন। কখনও রাজা, কখনও রাজ কর্মচারী, অমাত্য, কখনও পুরোহিত। কারোর না কারোর লালসার শিকার হয় তারা। শ্রীমতিকে নিয়ে এই ভয় গুরু ক্রীড়াশক্তির ছিল, তাই যতদিন পর্যন্ত তিনি অমরুর হাতে শ্রীমতিকে সঁপে দিয়েছেন ততদিন অবধি তিনি রাজপরিবারের কোনো অনুষ্ঠানে শ্রীমতি কে পাঠাননি। উপন্যাসের কাহিনিতে রাজা শ্রীমতি আর মঞ্জরীর সুস্থ জীবন অবলীলায় মেনে নেয়। তাদের সম্মান করে তার অধীনস্থ কর্মচারীর স্ত্রী হিসাবে এবং আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ও সেবিকা হিসাবে। ইতিহাসের কোনো রাজা বোধহয় এত অবলীলায় দেবদাসীদের এই স্বাভাবিক জীবন মেনে নিত না। যদি নিত তাহলে ইতিহাসটা অন্যরকম হত।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম গ্লানিকর অধ্যায় এটি। ভারতবর্ষ সেই দেশ যেখানে এই দেবদাসীপ্রথা সব থেকে বেশিদিন কার্যকর ছিল। ১৯২৯ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট আইনত বন্ধ করে দেবদাসী প্রথা কে। এর পিছনেও ছিল ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী রেড্ডীর মত নারী। যারা নারী হয়ে নারীর জন্য লড়েন। ১৯৪৭ সালে সর্বভারতীয় স্তরে নিষিদ্ধ হয় দেবদাসী প্রথা। তবু আইন দিয়ে কি প্রথাকে রদ করা যায়! আজও কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, গোয়ার অনেক স্থানে দেবদাসীরা রয়ে গেছেন অন্ধকারেই। আসলে মানুষের ব্যক্তিগত সচেতনতাই পারে আইনকে সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে। নারী যদি আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়েও তার অধিকার বুঝে নিতে না চায়, তাহলে এই অপরাধ তার নিজের। জানা নেই আবার কবে এদের জন্য পুনর্জন্ম নেবেন মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি, ডা. হরি সিং গৌরী, আব্রাহাম লিঙ্কন, সেন্ট পিটার কিংবা ক্রীড়াশক্তিরা।

গ্রন্থপঞ্জী

১। গঙ্গোপাধ্যায় আরতী, প্রসঙ্গ দেবদাসী, রত্নাবলী, ১৭/৩ ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র, ১৩৭১।

২। শ্রীপারাবত, বিজয়নগর, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ – কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩।

……………………………………………

উত্তর আধুনিকতা ও ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা : একটি মূল্যায়ন

মৌসুমী নন্দী

গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ-

বাংলা কবিতার ইতিহাস মানেই পালা বদলের ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে আজ পর্যন্ত তার রূপান্তর অব্যাহত। এই বিষয় ও রীতির পরিবর্তনের সূত্রেই দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতা যেমন আধুনিক নাম পেয়েছিল, ঠিক তেমনই বিংশ শতকের ষাটের দশকে এসে তার আরও এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা যাকে উত্তর আধুনিকতা বা অধুনান্তিক বাংলা কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতা, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে যে স্থান বা পরিসর জুড়ে অবস্থান করেছে, তা এক কথায় বলাবাহুল্য। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে উত্তর আধুনিকতা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন কবি ও প্রাবন্ধিক অমিতাভ গুপ্ত। উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা আধুনিকতা থেকে “উত্তরণ” অর্থে নয়, বরং আধুনিকতার মধ্যে থেকেই কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক ভাবনায় নতুন রূপে নতুন চিন্তায় দেশীয় থেকে আন্তর্জাতিকতার প্রকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের কবিরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়েন; পাশ্চাত্য কবিদের কাব্য তাঁদের ideal হয়ে ওঠে। তাই আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকে যেসমস্ত নতুনত্ব দেখা গেছে তা অনেকটাই পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে। আর এখানেই উত্তর আধুনিক তথা অধুনান্তিক বাংলা কবিতার সাথে তার বৈসাদৃশ্য। কারণ উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা দেশীয় সাহিত্য, সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নবীনতর রূপে প্রকাশিত হল। তবে শুধুমাত্র প্রাচ্য সাহিত্য, দর্শন তার একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচ্য নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন উত্তর আধুনিক কবিদের দ্বারা গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছে। বিংশ শতকের ষাটের দশকের কবি হলেন ভাস্কর চক্রবর্তী। যাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ “শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা” প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। কবির কাব্যগুলি ঠিক যতটা আধুনিক ততটাই উত্তর আধুনিকও। অর্থাৎ কবি আধুনিক মনন ও মেজাজ নিয়ে তাঁর প্রথম কাব্যচর্চার সূত্রপাত করেন, ধীরে ধীরে কাব্যচর্চার গতিপথ যত দীর্ঘায়িত হয় কবির কবিতায় উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার লক্ষণগুলি আরও স্পষ্টতর হতে থাকে। সহজ সরল ভাষায় ছোটো ছোটো কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে আধুনিক বিশ্বের যা অভিশাপ তা আত্মস্থ করে নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতাকে সঙ্গী করে কবি আপামর জীবনের কথাগুলি বলেন নিঃশব্দে দেবতাকে সঙ্গী করে। কবি যেমন মৃত্যুর কথা বলেন, তেমনই বেঁচে থাকারও গান শোনান। ভাষাহীন মুখে ভাষা জোগান। “জিরাফের ভাষা” (২০০৫)-র কবিতা গুলি উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক ভাবনার প্রামাণ্য নিদর্শন।

মূল শব্দ-

উত্তর আধুনিকতা, দেশীয় সংস্কৃতি, বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক, কবি ভাস্কর চক্রবর্তী, নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতা, বিষয় ও আঙ্গিকে রূপান্তর

মূল প্রবন্ধ -

আজ এই একবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে উত্তর আধুনিকতা শব্দবন্ধটির মূল্য অপরিসীম। উত্তর আধুনিকতা শব্দবন্ধটির একাধিক সমার্থক শব্দ রয়েছে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয় ১৯৮০-র দশক থেকে। বাংলা সাহিত্যে উত্তর আধুনিকতা নিয়ে বহু পণ্ডিত সমালোচকগণ তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন (যথা অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন, তপোধীর ভট্টাচার্য প্রমুখ)। এই আলোচনাটিতে কবিতার পালা বদলের ইতিহাসটি মূল আলোচ্য বিষয়, তাই উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার সম্পর্কে এখানে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে। তবে উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা ও তার বিস্তার পর্বটি আলোচনার পূর্বে আমাদের অবশ্যই আধুনিক বাংলা কবিতার বিস্তার পর্বটি সম্পর্কে কিছু কথা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ভাষাতাত্ত্বিকদের যুগবিভাজনের নিরিখে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সময়কালকে তিনটি যুগে বিভাজন করেছেন—প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, আধুনিক যুগ। সময়ের নিরিখে, বাংলা ভাষার যে ইতিহাস এবং সাহিত্যের যে যুগবিভাগ তার যে আধুনিক যুগ তার সূচনাকাল বাংলা কাব্যসাহিত্যে কবি ঈশ্বরগুপ্ত থেকে (যিনি ‘যুগসন্ধির’ কবি হিসেবেও কথিত) শুরু করে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত কবিরা উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি

বাবুসমাজের কথা, তাদের চারিত্রিক অসংগতি ও বাবুয়ানার কথা, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের কথা ব্যঙ্গ করে বললেন তাঁদের কবিতার মধ্য দিয়ে। তবে সময় ও সংরূপ দুই দিক থেকেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে যিনি 'নবযুগের' সূচনাকার তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি তাঁর 'মেঘনাদবধকাব্য' এবং 'চতুর্দশপদীকবিতাবলী' দ্বারা বাংলা কাব্যসাহিত্যে নবযুগের সূচনা করলেন, পুরাণ ও দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বিনির্মাণ করলেন যার রেশ এখনও বিদ্যমান। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যথার্থ রূপকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি বিশ্বকবি, কবিগুরু, একাধিক উপাধিতে ভূষিত। তাঁর কাব্যসাহিত্য বাংলা কবিতার জগতে অনন্য সম্পদ। তাঁর কবিতার মধ্যে যে আন্তর্জাতিকতার প্রকাশ রয়েছে তাঁর মূলে রয়েছে দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি। বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গীতি, ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য তাঁকে ও তাঁর লেখনীকে প্রভাবিত করেছিল। আধুনিক যুগ ও আধুনিক বাংলা কবিতার যে পৃথক অস্তিত্ব তার প্রমাণ আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনাতেই পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন,

"এই কবিরা নতুন সুর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুর, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্রভাবে নতুন।"[১]

পরবর্তীকালে কাব্য সমালোচক দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন,

"আধুনিক বাংলা কাব্য মিশ্র সংস্কৃতির উপাসক। এর বর্ণ ধূপছায়া, মর্ম জঙ্গমতা, ধর্ম বহুদেব-বাদ।"[২]

অর্থাৎ আধুনিক বাংলা কবিতা রবীন্দ্রপরবর্তী রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত ভাবে ও আঙ্গিকে স্বতন্ত্র। কালের দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আধুনিক বাংলা কবিতা রচনার সূত্রপাত হয়। আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ। যাঁরা তাঁদের সৃষ্টির স্বতন্ত্রধারা নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার সংস্কারসাধন করেছেন। কবিতার বিষয় ও শৈলীতে যে বুদ্ধিদীপ্ত মনন ও শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ লক্ষ্য করা যায় তাতে তাঁদের নিজস্ব কবিধর্মের বৈচিত্র্য প্রকাশিত। আধুনিক বাঙালি কবিরা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিক্ষায় শিক্ষিত ও ইংরেজি দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তাঁদের কাব্যকে অনেকাংশেই মূল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে গড়ে তুললেন কবিতাগুলিকে। সময়ের সাথে সাথে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, আশা-আশাহীনতা, আনন্দ-আনন্দহীনতা সমস্ত কিছুই যেন এক পংক্তিতে আধুনিক বাংলা কবিতায় সহাবস্থান করেছে। বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক জুড়ে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপট নির্মাণ ঘটেছিল, অন্যদিকে শেষ দুই দশক জুড়ে উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপট নির্মাণ ঘটে। উত্তরাধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে কবি ও সমালোচক অঞ্জন সেন বলেছেন-

সাতের দশকে আবার নতুন কবিতায়, যাকে আমরা বলছি উত্তরআধুনিক কবিতার সূচনা হল নীরবেই। ঢাক ঢোল বাজিয়ে, আন্দোলন ঘোষণা করে, ম্যানিফেস্টো ছাপিয়ে উত্তর আধুনিক কবিতার সূত্রপাত হয়নি। তরুণ কবিরা রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকদের, পরবর্তী আধুনিকদের, চল্লিশের প্রগতিবাদীদের এবং কৃত্তিবাসের অতি আধুনিকদের কাব্যতন্ত্র লক্ষ্য করলেন আর নিজেদের পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।[৩]

আধুনিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতায় যে রূপান্তর ও কাব্যসাহিত্যে যে চেতনা বা দর্শন প্রতিফলিত হয় বাংলা কবি ও কবিতার মধ্যে সেই পরিবর্তমান ভাবনা ও আঙ্গিক লক্ষিত হয় বিংশ শতকের সাতের দশক থেকেই। যে সমস্ত উত্তর আধুনিক কবিগণ তাঁদের কাব্যকায়ায় ও ভাবনায় এই চেতনা বা দর্শনকে রূপ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অমিতাভ গুপ্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ, মনীন্দ্র গুপ্ত, উৎপল কুমার বসু, মৃদুল দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই উত্তর আধুনিক কবিদের কবিতার মধ্যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংশ্লেষণ, কালচেতনা, ভাষার ব্যবহারে আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ উত্তর আধুনিক বা অধুনান্তিক বাঙালি কবিরা আবার তাঁদের শিকড়ের সন্ধানে দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে সমকালীনতাকে নির্মাণ করেছেন, ঐতিহ্যকে স্মরণ করে। বাংলা সাহিত্যে কবি ভাস্কর চক্রবর্তী উত্তর আধুনিক কবি হিসাবে স্বতন্ত্র তার প্রমাণ, তাঁর কবিতাগুলি একরৈখিক থেকে বহুরৈখিক ভাবকে দ্যোতিত করে। তিনি যে ব্যক্তির অনুভূতির কথা বলেন তা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কথা হয়ে যায়। তাঁর কবিতা একটি বৃত্তের ন্যায়, যার কেন্দ্রবিন্দু একটি। কিন্তু সেই কেন্দ্রবিন্দুটি স্থির থেকেও বৃত্ত ক্রমশ বড় হতে থাকে; মহাশূন্যে ভাসমান তাই তাঁর কবিতা। কবির কবিতাগুলি এক নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ পৃথিবীর কথা বলে, যার ক্ষেত্রভূমি বিংশ ও একবিংশ শতকের আধুনিক বিশ্ব। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে উন্নত আধুনিক বিশ্বর পণ্যায়িত জীবনযাত্রা মানুষের অবক্ষয়িত রূপটিকে প্রকাশ্যে আনে। যেখানে সৌন্দর্যর অর্থ ও বর্ণামূলক রূপ দুই বদলে যায়। মানুষ এই বিশ্বে একা হতে হতে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। বিষণ্ণতা, একাকীত্ব ক্রমশ তাঁকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলে। কবিও যার

করাল ছায়ায় আত্মহননকে একমাত্র পথ বলে ভুল করে। স্বপ্নহীনতা তাঁকে, তাঁর বেঁচে থাকার অর্থকে নিরর্থ করে তোলে। এতকিছুর মধ্যে থেকেও ‘অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো’-র ন্যায় জীবনে একটা momentum তৈরী হয়, যখন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য কবির মতই বলেন

“নিরুপদ্রব পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি যা হয়ত হবার নয় কোনোদিনই।”

কিন্তু তার পরেই কবির প্রশ্ন-

“কিন্তু, বলুন আপনি, তা হবে নাই বা কেন?”

(“তিন রঙের আলোয়”, *স্বপ্ন দেখার মহড়া*)

কবি গড়ে তুলতে চান ‘তৃতীয় পৃথিবী’। প্রথম যে পৃথিবী তা হল শিল্প, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান নির্ভর জীবনের পূর্ববর্তী, সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আদিম, সবুজ ও সহজ মানুষের প্রকৃতি বেষ্টিত পৃথিবী। দ্বিতীয় যে পৃথিবী তা হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড। অর্থাৎ শিল্প, প্রযুক্তি বিজ্ঞানে উন্নত আধুনিক পৃথিবী যেখানে বিশ্বাসহীনতা, ভালোবাসার নামে ছলনা, এক ভাঙাচোড়া জীবন লক্ষ্য করা যায়। আর তৃতীয় পৃথিবী হল সেই উত্তর আধুনিক পৃথিবী যেখানে স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাসকে স্বপ্নময় করে তুলতে চায় সেখানকার অধিবাসীরা। সবুজ দিয়ে ঘেরা শাশ্বত ভালোবাসা দিয়ে ঘেরা আদিম পৃথিবীর শিকড়ে আবার ফিরে যাওয়ার প্রার্থনা যেখানে শুধুই শান্তি আর ভালোবাসার স্থির চিত্র।

“গাছ আর
গাছের ছায়ার নীচে দড়ির খাটিয়া
আমাদের তৃতীয় পৃথিবী।”

(“স্থিরচিত্র”, *স্বপ্ন দেখার মহড়া*)

বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য নতুন এই মানব বিশ্ব সম্পর্কে বলেছেন- “সূর্যালোকিত এই পুনর্নির্মিত জগতে বহু উচ্চারণে সংশ্লেষণ ঘটবে, লোকায়ত স্পন্দনে যুক্ত হবে মহাসময়ের বিপুল পরিসর, যেখানে ‘আমরা সবাই রাজা’।”[৪]

কবি ভাস্কর চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ ফেব্রুয়ারি। জন্মস্থান কলকাতার দর্জিপাড়া। কবি থাকতেন বরানগরে। কবির কবিতা রচনার সময়কাল ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ (১৯৭১) প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বাংলা কবিতার জগতে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। কবিকে বিশ শতকের ষাটের দশকের কবি বলে অভিহিত করা হয়। কবি যে সময়পর্ব থেকে তাঁর কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন সেই সময়পর্ব ও তার সমকালীন ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, স্বাধীনতা পরবর্তী এক যুগ অতিক্রমকারী দেশ ‘স্বাধীন ভারতের’ কালপর্ব চলেছিল, যেখানে তখনও ঘটে চলেছিল মানুষের সাধারণ চাওয়া-পাওয়াকে কেন্দ্র করে একের পর এক আন্দোলন, প্রতিবাদ; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানান ঘটনাকে কেন্দ্র করে যা সংঘটিত হয়েছিল। দেশটির নাম ভারত, তবে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে ‘কলকাতা’-কে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন ও প্রতিবাদ বারে বারে লক্ষ্য করা যায়। কবির জন্মস্থান এই কলকাতা, পরবর্তী সময়ে সারাটা জীবন তিনি এখানেই থেকেছেন। কবি তাই বলেছেন,

“ট্রাম থেকে নামতে-নামতে আমি বুড়ো হয়ে গেলাম কলকাতায়
আমার জীবন, আমি কার্পেটের মত কলকাতায় বিছিয়ে দিয়েছি।”

(“আজ অথবা কাল অথবা পরশু”, *রাস্তায় আবার*)

তাই কলকাতা শহর ও তার ঘাত-প্রতিঘাত কবির জীবন ও কবিতাতে প্রভাব ফেলেছে গভীর ভাবে। শুধুমাত্র দেশীয় রাজনীতি বা অর্থনীতি নয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এ এক অস্থির সময়পর্ব। ভিয়েতনামের যুদ্ধ, নাগরিক অধিকার আন্দোলন, সংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলন, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছিল ষাটের দশকে। বাংলা রাজনীতি ও সাহিত্য আন্দোলনগুলি বাংলা কাব্য সাহিত্যের পথ পরিবর্তনে সহায়ক ছিল। পাশ্চাত্য বিট সাহিত্য আন্দোলনের ন্যায় বাংলা সাহিত্যে হাংরি আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, কংক্রিট আন্দোলন প্রভৃতি আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা পরিবর্তন করে উত্তর আধুনিক বা অধুনান্তিক বাংলা কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেছিল।

ভাস্কর চক্রবর্তী তাঁর কবিতার রূপালেখ্য নির্মাণে সংযত ও সীমিত। মিতবয়ানে স্বতন্ত্র রীতিতে রচিত স্বল্প কথায় দীর্ঘভাব ব্যক্ত করেছেন। অনেক না বলা কথার বাণী দিয়ে তাঁর কবিতা সাজানো থাকে। কারণ কবি নিজেই জানান

"......ঠিক সময়ে চুপ করে থাকার দাম দুটাকা।' কবিতা লেখার ব্যাপারে আমি বরাবরই ওই দুটাকাকেই পেতে চেয়েছি।"[৫]

নৈঃশব্দ তাঁর কবিতার শৈলীতে নিয়ে আসে স্বতন্ত্র রূপায়ণ। কবিতার ভাষাতেও কবি উত্তর আধুনিক কাব্যশৈলীর লক্ষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষা সহজ সরল, প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত মানুষের মৌখিক ভাষাকেও এখানে ব্যবহার করা হয়। বাঁধনমুক্ত, শাসনমুক্ত অতি সহজ ভাবে ও ভাষায় কবি তাঁর কবিতাগুলি লেখেন ও পৌঁছে দিতে চান সকল পাঠকের কাছে। তবে কাব্যগুণ সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়না বলেই কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে। কবি প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে স্বাধীন করতে চান কবিতাকে, নিয়মের শাসন থেকে মুক্ত করতে চান কবিতাকে। কবি বলেছেন -

"সমস্ত রকমের শাসন থেকে কবিতাকে
স্বাধীন করতে হবে।"

("পথচলতি", *স্বপ্ন দেখার মহড়া*)

উত্তর আধুনিক কবি ভাস্কর চক্রবর্তী তাঁর কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে যেমন শাসন মানতে নারাজ, সাহিত্যের বাণিজ্যায়নেরও বিরোধিতা করেন, তেমনই সাহিত্যের শৈলীর ক্ষেত্রেও প্রথাবদ্ধ ছন্দ-অলংকার-চিত্রকল্পর ব্যবহারের বিরোধিতা করেন তিনি। আর এখানেই কবি অন্যান্য কবিদের থেকে পৃথক হয়ে অবস্থান করেন। তিনি বিখ্যাত হতে চাননি কারণ তাঁর মনে হয়

"বিখ্যাত বিখ্যাত আর বিখ্যাত হতে চাওয়ার মধ্যে একটা অশ্লীলতা আছে।"[৬]

কিন্তু এ তো তাঁর কথা, কবি বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর কবিতাগুলির মধ্য দিয়েই।

উত্তর আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম ব্যাধিই হল দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা, বিচ্ছিন্নতা আর নিঃসঙ্গতা। কবিও যার হাত থেকে রেহাই পান না,

"দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা আর বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, দেখ
আমাকে ঘিরেছে ঘরে, রাস্তা, রেস্তোরাঁয়।"

("৯", *দেবতার সঙ্গে*)

জীবনানন্দ দাশের "বোধ" কবিতার সেই কথকের মতই কবিও সকল লোকের মাঝে থেকেও যেন নিজের কোনো এক 'মুদ্রাদোষে' ক্রমশ একা হয়ে যান। যে একাকিত্ব থেকে আমরা যেমন রেহাই পাইনা, কবিও পান না। কবির 'আমি' ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনাগুলি ক্রমশ নৈর্ব্যক্তিক হয়ে সকলের কথা হয়ে যায় কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। যেখানে কবি দুশ্চিন্তাকে বলেন-

"দুশ্চিন্তা এ শতাব্দীর বিদ্যুৎচালিত অভিশাপ।"

("৭", *দেবতার সঙ্গে*)

এই পৃথিবীতে মানুষের চাহিদা ক্রমশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিজস্ব লোভের বশবর্তী হয়ে 'অপর মানুষের' প্রাথমিক চাহিদাগুলি থেকে তাদের বঞ্চিত করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। কবি বলেছেন-

"আমার তো মাথা গোঁজবার তবু কিছু জায়গা আছে
বস্তি ভেঙে যায়, দেখি, উঁচু বাড়ি, আরো উঁচু হয়—"

("৮", *দেবতার সঙ্গে*)

"দেবতার সঙ্গে" কাব্যগ্রন্থে কবি দেবতাকে সঙ্গী করে দেখাতে চান সাধারণ মানুষের ইতিহাস, 'অপরের' কথা যেখানে প্রাধান্য পায়। উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা যে 'অপরের' কথাকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে, গুরুত্ব দেয় তার ইতিহাসকে। কবি দেখাতে চান-

"তোমাকে দেখাতে চাই শহরে বাজারে গ্রামে জীবনকাহিনী
গঙ্গার নীরব স্রোতে আলো জ্বলে সে কোন নৌকোর
ভেসে যায় আরো দূরে, আলো শুধু, আজো আমি দূর থেকে দেখি।"

("৬", *দেবতার সঙ্গে*)

কবি নতুন করে আবিষ্কার করতে চান সেই চিরপরিচিত শব্দগুলিকে, তাঁর মাহাত্ম্যকে। সম্পর্কের গুরুত্বে তাকে ধরতে চান। তাই 'বন্ধুত্ব' এই সবুজ নিবিড় শব্দকে কবি মহাদেশ থেকে মহাদেশে পাচার করতে চান। যার মধ্য দিয়ে কবি এমন এক পৃথিবীর কথা ভাবেন যার

জন্য মৃত্যুকে উপেক্ষা করে আগুনের ভেতর দিয়ে কত হাজার বছর হেঁটে যান; শুধুমাত্র একটি শান্ত পৃথিবীর জন্য। তাই কবির কাছে মিথ বাস্তব হয়ে ওঠে।

"কার পায়ের কাছে বসে তথাগত আমরা
শেষবার ক্ষমা চাইবো
আমি একটা শান্ত পৃথিবীর কথা ভাবছিলাম।"

("ধ্যানবিন্দু", *স্বপ্ন দেখার মহড়া*)

কবির শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "জিরাফের ভাষা" (২০০৫)। এই কাব্যগ্রন্থের ভাব ও শৈলী সেই নৈঃশব্দতাকে প্রাধান্য দেয়। জিরাফের মত ভাষাহীন কণ্ঠস্বরে যা ভাষা জোগায়। এই কাব্যগ্রন্থের মোট ৪৮ টি কবিতার নামকরণও সংখ্যানুক্রমিক। প্রত্যেকটি কবিতায় পাঁচটি পংক্তি দ্বারা গঠিত মিশ্র কলাবৃত্তে রচিত নিরাভরণ কবিতা। যেখানে বিষয়বস্তু অতি সাধারণ, কিন্তু তার শৈলীনির্মাণ অতি চমকপ্রদ। আধুনিক কবিতা যে বোদ্ধার খোঁজ করে উত্তর আধুনিক কবিতা সেখানে জ্ঞানী, পণ্ডিত নির্বিশেষে সাধারণের খোঁজ করে। এই সাধারণের মধ্যেই আছে তার অসাধারণত্ব। শব্দচয়ন, অলংকার প্রয়োগের সীমিত ব্যবহার, ছন্দের নির্মাণ প্রত্যেকটি কবিতাকে এক সূত্রে গেঁথে বিনিসুতোর মালার ন্যায় পাঠকের সামনে হাজির করে। কবি এই কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটিতে যা বলেছেন তা সমস্ত কবিতাগুলির সার সংক্ষেপ বলা যায়। যথা-

"এই সব সারেগামা পেরিয়ে তোমার কাছে দুঘন্টা বসতে ইচ্ছা করে।
আমার তৃতীয় চোখ হারিয়ে গিয়েছে।
সিড়ি দিয়ে যে উঠে আসছে আজ আমি তার মুখও দেখিনি।
তোমাকে দুঃখিত করা আমার জীবনধর্ম নয়।
চলে যেতে হয় বলে চলে যাচ্ছি, নাহলে তো , আরেকটু থাকতাম।"

("৪৮", *জিরাফের ভাষা*)

উত্তর আধুনিকতা শব্দবন্ধটি পাঠকের কাছে দুই অর্থের দ্যোতনা বহন করে। যার একদিকে আছে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ, অপর দিকে আছে সংরূপগত আদল। কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা আধুনিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে সময়ের পরতে পরতে। বিশেষত ষাটের দশক থেকে তার কবিতায় ওই বাঁক বদলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যখন 'তুমি আমার ঘুম', 'নীল রঙের গ্রহ', 'কীরকম আছো মানুষেরা' ও 'জিরাফের ভাষা' কাব্যগ্রন্থগুলি লেখেন সেখানে তাঁর উত্তর আধুনিকতার স্বর অনেক বেশি স্পষ্ট ও উচ্চকিত। তাই বাংলা কবিতার উত্তর আধুনিকতার আলোচনায় তিনি ও তাঁর কবিতা অবিসংবাদী ভূমিকা নিয়ে প্রবহমান পাঠকের কাছে উপস্থিত হন।

তথ্যসূত্র

১. বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আধুনিক বাংলা কবিতা, ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৭
২. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, পৃষ্ঠা-১
৩. অঞ্জন সেন, ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তরআধুনিকতা, পৃষ্ঠা- ৩৫-৩৬
৪. তপোধীর ভট্টাচার্য, আধুনিকতা: পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃষ্ঠা- ২৫৬
৫. ভাস্কর চক্রবর্তী, কবিতা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, নিজস্ব মাদল, পৃষ্ঠা-২১
৬. ভাস্কর চক্রবর্তী, কবিতা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, নিজস্ব মাদল, পৃষ্ঠা-১৯

গ্রন্থপঞ্জি

১. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ (সম্পা), আধুনিক বাংলা কবিতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৪০
২. চক্রবর্তী, ভাস্কর, কবিতা সমগ্র-১ (সম্পাদনা- সুমন্ত মুখোপাধ্যায়), ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৭
৩. চক্রবর্তী, ভাস্কর, কবিতা সমগ্র-২ (সম্পাদনা- সুমন্ত মুখোপাধ্যায়), ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১০

৪. জানা, সুস্নাত, পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১০
৫. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৭৪
৬. বসু, বুদ্ধদেব, (সম্পাদিত), আধুনিক বাংলা কবিতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০
৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর, আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৫
৮. মজুমদার, অভিজিত, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭
৯. সিকদার, অশ্রুকুমার, আধুনিক কবিতার দিগবলয়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭
১০. সেন, অঞ্জন, ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তরআধুনিকতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ২০১১

...

ফিরে দেখা : সুলেখা দাশগুপ্তের জীবন-জিজ্ঞাসা

ড. নাজমা ইয়াসমিন
শিক্ষক, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ :
'নারী' সাহিত্যিক তকমা দিয়ে কিছুটা লঘু করে দেওয়া হয় যাদের, তাঁদের মধ্যে বিস্মৃতপ্রায় নাম সুলেখা দাশগুপ্ত। সাহিত্যিক হিসেবে সুলেখা সান্যাল যতখানি পরিচিত, ঠিক ততখানি অপরিচিত সুলেখা দাশগুপ্ত। কেবল গল্প-উপন্যাস নয়, তাঁর অবাধ ও অনায়াস বিচরণ ছিল প্রবন্ধ রচনাতেও। বক্তব্যের দৃঢ়তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর প্রবন্ধের মূল হাতিয়ার। এছাড়া পত্রিকার পুরুষশাসিত সম্পাদনা জগতেও তিনি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। সমকালীন রাজনীতি, সমাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সম্পাদকীয় কলাম লিখতেন। সেখানে পাঠকদের বক্তব্য ও ভিন্ন ভাবনাকে নির্দ্বিধায় স্থান দেওয়া হত। সুলেখা দাশগুপ্তের সাহিত্যচর্চার বহুমাত্রিকতার ফসল হিসেবে 'ফিরে দেখা : সুলেখা দাশগুপ্তের জীবন-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছি।

সূচক শব্দ :
বিস্তৃতপ্রায় সাহিত্যিক, সুলেখা দাশগুপ্ত, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, মননশীলতা, পত্রিকা সম্পাদনা, পারদর্শিতা, বহুমাত্রিক প্রতিভা।

মূল প্রবন্ধ -

বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজে নারীর অবস্থান যে অপরিবর্তিত নেই, তা বলা বাহুল্য। ইতিহাসের সূত্রে "ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে আমরা দেখি, গ্রামকেন্দ্রিক যাযাবর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যতটুকু প্রত্যাশা করা যায়, নারী সেই মাত্রাতেই স্বাধীনতা ভোগ করেছে। নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নানা চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"[১] নারী স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের এই চিত্র ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে মুছে যাচ্ছিল। সে নির্বাসিত হচ্ছিল অন্তঃপুরের অন্ধকারে। এই বিবর্তনের পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় রাজনীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। বিবাহ, মাতৃত্ব, নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, শ্রম বিষয়ক অধিকার- সব ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের সুস্পষ্ট নির্দেশনা শাস্ত্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে। গৃহকর্ম ও সন্তান উৎপাদন ছাড়া নারীর পৃথক অস্তিত্বের বিষয়টি যে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গিয়েছিল, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ। ক্রমশ 'সমাজ তাদের ব্যক্তি মানব হিসেবে স্বীকার করতে ভয় পেত।

সাহিত্য চিরকালই সমাজের ছবি এঁকেছে। সেই ছবি স্পষ্ট হোক বা অস্পষ্ট, উচ্চকিত হোক বা মৃদুভাষ্য, তাতে সত্যের টুকরো লেগেই থাকে। নিজের মতো করে বেঁচে থাকা জীবের মৌলিক ধর্ম ও অধিকার। অথচ মেয়েদের সেই ধর্ম ও অধিকার পেতে ও দিতে বারবার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দহনে দীর্ণ লেখকের রচনা মানবিকতার গভীরতর অনুভবকে লেখ্যরূপ দান করেছে। 'মহিলা' সাহিত্যিক বলে যাদের পৃথক শ্রেণিতে দেগে দেওয়া হয়েছিল তারা নারীর মানবিক অধিকারকে বাংলা সাহিত্য প্রাঙ্গণে বলিষ্ঠ বক্তব্য ও নির্ভীক উচ্চারণের দ্বারাই উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁদের অন্যতম স্বর্ণকুমারী দেবী। 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার গূঢ় দায়িত্ব সামলে তিনি নারীদের ঘরোয়া গল্পকে 'সাহিত্য'- হিসেবে রূপদান করতে সচেষ্ট হলেন। নারীর সেই জয়যাত্রা বর্তমানেও অব্যাহত।

সেই সূত্রেই আমরা ফিরে দেখতে পারি -"অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া যে নামগুলি, ভুলে যাওয়া যে আখ্যানগুলি কতদিন লুকিয়েছিল পুরোনো লাইব্রেরির ধুলোমাখা তাকে, বেশ কিছুদিন হল তারা অনেকেই আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে একালের পাঠকের আগ্রহের সীমানায়।"[২] –সুদক্ষিণা ঘোষ তাঁর 'মেয়েদের কলম ঘরে বাইরে' বইটিতে যে সত্যবচন করেছেন তাতে এতটুকু আতিশয্য নেই। পুরুষশাসিত সমাজ চিরকালই চেয়েছে পুরুষ জীবনেই আসুক যাবতীয় পরিবর্তন, নারীর মধ্যে থাকুক অকম্পিত স্থবিরতা। বাংলা

সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, প্রতিভাময়ী স্রষ্টাদের অনেকেরই সৃষ্টিকর্ম আজ তেমন চর্চিত নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে বিস্মৃতপ্রায় লেখক সুলেখা দাশগুপ্তের সাহিত্য সাধনার কথা।

"কখনও না খেলে স্বামীর অকল্যাণ কখনও খেলে তোমার পাপ - যেন খেলা - জীবনটা খেলা আরকি!"[৩] -বিস্মৃত প্রায় ঔপন্যাসিক সুলেখা দাশগুপ্তের 'মিত্রা' (১৯৬০) উপন্যাসের লাইন। সধবা এবং বিধবা -নারীর দুই বিপরীতধর্মী সামাজিক পরিচয়ে যখন সমস্যা দাঁড়ায় এক টুকরো মাছ নিয়ে তখন সমাজ ভুলে যায় বৈধব্য পালন শুধু শারীরিক অত্যাচার নয়, নারীর আত্মসম্মানকেও ক্ষুণ্ণ করে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর 'মিত্রা' উপন্যাস ছাড়াও অন্যান্য রচনাতে দীপ্ত হয়েছে তাঁর বহুমাত্রিকতার বীক্ষণ।

১৯৪৭-এর দেশভাগ পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে দুর্যোগ ও বাস্তবতার ছাপ সাহিত্য ক্ষেত্রে পড়েছিল। সুলেখা দাশগুপ্তের 'রচনা সংগ্রহ' থেকে জানা যায় তিনি দেশভাগের পরে কলকাতায় গুণীজনের সান্নিধ্যে সাহিত্য জগতে পা রাখেন। তাঁর রচনা সংখ্যা খুব বেশি নয়। 'মাসিক বসুমতী'র পাতায় প্রকাশিত 'জিজ্ঞাসা' নামে বড় গল্পটি পরপর চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে 'হৃদয় পাতো'- উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরা একই, শুধু চরিত্রের নাম পালটে গিয়ে আকারে বিস্তার লাভ করে। উপন্যাসে আপাত সুখী শিবানী নিজের ভোগবিলাসী জীবনে মত্ত। কিন্তু কোনও কিছুই তাকে পরিপূর্ণতা দিতে পারেনি। অমনোযোগী স্বামীকে নিজের করে পেতে চায় সে- "এক এক সময় ইচ্ছে করে, ভীষণভাবে ইচ্ছে করে ইন্দ্রনাথের মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্পিত ঠোঁটের ঝড় বইয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু পারে না, ভালবাসতে দেয় না ইন্দ্রনাথ।"[৪] চাকরি করাটা শিবানীর কাছে প্রয়োজন নয়, আয়োজন-স্বামীকে উপেক্ষা করার জন্য। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে কাহিনি এগিয়ে যায়। শিবানীর ভাগ্য অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়, পুত্রসন্তানের মা হয় শিবানী। পিতৃত্বের আনন্দে আত্মহারা স্বামীর পৌরুষ তৃপ্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সন্তানসম্ভবা হয় শিবানী, তখন তার পূর্ব মাতৃত্ব লক্ষণের বৈসাদৃশ্য সন্দেহের উদ্রেক করে ইন্দ্রের মনে। কাহিনি শেষদিকে সুখী দাম্পত্যে নির্মম আঘাত আসে, যখন জানা যায় তাদের প্রথম সন্তান আসলে স্বামীর ধর্ষণজাত অবৈধ সন্তান। শিবানীর বান্ধবীকে একসময় ধর্ষণ করেছিল ইন্দ্র। বান্ধবীর আবাঞ্ছিত মাতৃত্বই শিবানীকে ছলনার আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। স্ত্রীর মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে পড়ে ইন্দ্র। রূপকথার গল্পের মতো 'আমার গল্প ফুরাল, নটে গাছটি মুড়ালো' বলা যায় না।

উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি open ending। দুটি শিশু ও একটি নারীর মুখ চেয়ে ধর্ষণকারী পুরুষের প্রবল প্রতাপের ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে একক নারীর জীবন সংগ্রাম, যা সারাজীবন চলতে থাকবে। Ethical motherhood, যা নিজের গর্ভজাত নয়, এমন কারও প্রতি মাতৃভাব বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ নয়। অনুরুপা দেবীর 'মা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাস বা শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে এই বিষয়টি আছে। কিন্তু কেবল মাতৃত্বের সহজাত বোধে নয়, প্রকৃত মানুষের সহমর্মিতা ও ন্যায়বোধ থেকে জাত নারীর মনবিক আচরণ এই গল্পের অভিনবত্ব।

ঔপন্যাসিক হিসেবে সুলেখার 'মিত্রা' উপন্যাসটি একমাত্র গ্রন্থাকারে ছাপা হয় ১৯৬০ সালে। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র মিত্রা, বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত মা নাবালিকা কন্যার বিয়ে দিয়ে দেন। বিবাহোত্তর জীবনে মানসিকভাবে অসুখী মিত্রা পড়া চালিয়ে যেতে চায়, কিন্তু রক্ষণশীল বাড়ীর বউ এর পক্ষে তা কার্যত অসম্ভব। হঠাৎ স্বামীর অকালমৃত্যুতে মিত্রা যেন পায় মুক্তির স্বাদ। তার একমাত্র প্রশান্তির জায়গা শ্বশুরবাড়ির লাইব্রেরি। যদিও জেঠশ্বশুরের কাছ থেকে সে জানতে পারে – "বড়লোকের বাড়িতে একটা ভালো মূল্যবান লাইব্রেরী থাকা চাই- সেই প্রয়োজনেই একদিন এই ঘরের জন্ম।"[৫] তার তর্ক জমে যায় বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণকে নিয়ে – দৃঢ় কণ্ঠে ফুটে ওঠে মিত্রার আত্মপ্রত্যয়ের সুর। সেই সুর ঝড় তোলে দূরসম্পর্কের আত্মীয় তরুণ শমিতের মনে। শমিতের উদার ও বলিষ্ঠ ভালোবাসায় বিধবা বিবাহের 'ট্যাবু' ভেঙে মিত্রা দ্বিতীয় বিবাহে মত দেয়। কপালের দোষ, বিধিরবিধান এসব মধ্যযুগীয় চিন্তা মিত্রার ছিল না। সে প্রথম থেকেই আধুনিক মানসিকতার আলোকে স্নাত। পরিস্থিতির চাপে তাকে অনেক অন্যায় মেনে নিতে হয়েছিল। স্বামীর মৃত্যু তাকে নতুন করে আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। 'চিত্রশিল্পী' মিত্রাকে সে তখনই আবিষ্কার করে। আজন্ম সংস্কারে আবদ্ধ জীবনের বিপ্রতীপে নারীর স্বাধীন ভাবে পথচলার প্রসারিত ভাবনাকে সুলেখা এই উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। উচ্চকিত নারীবাদ কাহিনিতে নেই, মানবতাবাদী নারীবাদ গল্পে এসেছে প্রেমের হাত ধরে। পুরুষ এখানে নারী বিরোধী নয়, তার সহযোগী, সহযাত্রী।

পরবর্তী 'বর্ণালী' উপন্যাস দুইজোড়া নারী পুরুষের কাহিনি। নার্স মানেই 'খারাপ মেয়ে' এই সরলীকরণে বিশ্বাসী পরিবার 'মমতা' নামে এক নার্সের পাত্র বাসুদেবের সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়। পাত্রের বোন 'মৌরী' সেই একই সরলীকরণে 'চরিত্রহীন' ডাক্তার ছেলে সুদর্শনকে বিয়ে করতে অসম্মত হয়। নার্স যদি খারাপ মেয়ে হয়, তবে সেই একই যুক্তিতে ডাক্তারও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে

“what is sauce for the goose is sauce for the gander”[৬]। এর পরে নানা জটিলতা, প্রতিবাদ, মনোমালিন্যের পরে আত্মোপলব্ধি হয়। অবশেষে উপন্যাসে ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ ঘটে। মমতার সঙ্গে বাসুদেবের এবং মৌরীর সঙ্গে সুদর্শনের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

কেবল উপন্যাস নয় ছোটোগল্পের মধ্যেও সুলেখার মানবিক ভাবনা প্রতিফলিত হয়। সুলেখার ভিন্নধর্মী রচনার মধ্যে মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অধিকারের নম্র প্রকাশ। গল্পগুলির বিষয় বৈচিত্র্য ও ভাবনার অভিনবত্ব আমাদের বিস্মিত করে। ‘পারলাম না’ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে দেশভাগ ও তার বিষময় ফলকে। ঘটি-বাঙালের চিরন্তন তিক্ত সম্পর্ক প্রেমের পথে অন্তরায় হয়েছে। ‘মর্যাদা’ গল্পে পড়তি বনেদি পরিবারের মেকি মর্যাদার বিচিত্র রূপ চোখে পড়ে। ‘সব বয়েস বাজারে ছেড়ে দেবেন না’ –গল্পের নামটি বেশ মজাদার। গল্পে সমাজের বস্তাপচা মানসিকতার প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ অতি স্পষ্ট। বিয়ের বাজারে পাত্রী হিসাবে বয়স যাদের মূল বিবেচ্য, তাদের কপালে জোটে ছেলের থেকে বয়সে বড়ো পাত্রীই। এই হাস্যকর অম্লমধুর পরিণতি গল্পের মধ্যেকার বিদ্রুপকে স্পষ্ট করে তুলেছে। ‘ঝড় এসেছিল’ গল্প একান্তভাবেই নারীর গল্প, তার প্রেম ও প্রেমহীনতার গল্প। প্রেমহীন ময়ীর অভ্যস্ত দাম্পত্য জীবনে ঝড় তুলেছিল অমিতাভ নামে এক অতিথি পুরুষ। ময়ীকে ‘ভাল-বাসা’র আশ্রয়ে সুখী রাখতে চেয়েছিল অমিতাভ। কিন্তু ‘নিমগাছ’টির মতো ময়ীর দাম্পত্যের অভ্যস্ত শিকড় তার মনের বহুস্তরীয় গভীরতায় প্রোথিত ছিল। সেই শিকড় তুলে ফেলা সম্ভব হয়নি।

নারী-পুরুষের অবস্থান ও পরিস্থিতিগত বৈষম্য একই সমাজব্যবস্থার অংশীদার হিসেবে মেয়েদের পীড়িত করে তুলছিল। বাইরের ঝঞ্ঝা আলোড়ন নারীর চির মমতাময়ী আঁচলে ঘিরে সুখের দীপশিখাকে অকম্পিত রাখবে - ঊনবিংশ শতকের গল্প উপন্যাসে এমনই একটি আদর্শায়িত রূপ স্থান পেয়েছিল। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, গিরিবালা দেবীর উপন্যাসে নারীর এই রূপ স্থান পেলেও যুগের থেকে অগ্রবর্তিনী ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। সেই যুগান্তকারী মানসিকতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন সুলেখা দাশগুপ্ত। নারী বিষয়ে ভণ্ডামির মূল্যবোধকে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ কশাঘাতে আক্রমন করেছেন তাঁর প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয়তে।

প্রবন্ধ জ্ঞানের ও মননের সাহিত্য। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সুলেখা দাশগুপ্তের নাম আজ বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত। তিনি প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই সময়োপযোগী ঘটনাকে মেধা, মনন, বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবনার মৌলিকতার ছাপ রেখেছেন। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দর্শন আহরণ করে প্রাবন্ধিক তাঁর দার্শনিক বুদ্ধিতে পাঠককে একীভূত করে রাখেন, সুলেখা তার ব্যতিক্রম নন। প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর বাকবৈদগ্ধ, নৈপুণ্য, সৃষ্টিশীলতা ও যুক্তিশীলতা, মননধর্মী এই সাহিত্য আঙ্গিক সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর প্রবন্ধগুলির বিষয়বৈচিত্র দেখলে বিস্মিত হতে হয় - বিবাহবিচ্ছেদ বিল, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি, অল ইন্ডিয়া রেডিওর কবি সম্মেলন, পত্রিকা জগতে মেয়েদের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর লেখনির বলিষ্ঠতা, বুদ্ধিদীপ্ততা প্রবন্ধগুলিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

বিবাহবিচ্ছেদ বিল নিয়ে তিনি দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারত সরকার ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ‘হিন্দু বিবাহ আইন - ১৯৫৫’ নামে একটি যুগান্তকারী আইন পাস করায় হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে যে সমস্যা ছিল তার সমাধান হয়ে যায়। বহু পূর্বে আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয় ও বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়। প্রাবন্ধিক এই বিষয়টি আলোচনার জন্য রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সামাজিক ও আইনি ভূমিকার অবতারনা করেছেন। প্রাবন্ধিক নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলেও অত্যাচারিত নারীদের বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। ১৯৫৫- তে মাদ্রাজের ‘হিন্দু সাপ্তাহিক’ পত্রিকাতে শ্রী আচার্য কৃপালনী ‘marriage law reform in India’ নামে প্রবন্ধে এই বিলের বিরোধিতা করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সুলেখার ভাবনার সততা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা প্রবন্ধের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সব সমস্যার মূলে যে শিক্ষার অভাব তা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের শিরোনাম ‘বঙ্গ বিহার সংযুক্তি বিল’। এই বিষয়ে তিনি তিনটি প্রবন্ধ লেখেন। বিহারের বঙ্গভাষী অঞ্চলের বঙ্গভুক্তির ন্যায্য দাবি নস্যাৎ করার জন্য ১৯৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ উপস্থাপিত বাংলা-বিহার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাভাষী মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদের ফলে এই বিল প্রত্যাহার করা হয়। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রবন্ধে তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন। ‘বঙ্গ বিহার সংযুক্তি’(৩য়) প্রতিবাদ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- “লক্ষ বুকে সাড়া তুলবার মতো তেমনি কণ্ঠ আজ বাংলার নেই। আমরা বহু কণ্ঠ চয়ন করে তাই বলাকার

পাঠক- পাঠিকাদের কাছে ধরে দিলাম।”[৭] তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধেও সময়, সমাজ, স্বদেশ ভাবনা ছায়াপাত করেছে। সময়ের আগুন গায়ে মেখে বহমান ছিল তাঁর সৃজনশীলতার বলিষ্ঠ ও বৈচিত্রময় ধারা।

কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক সুলেখা দাশগুপ্তের সম্পাদক পরিচয়টি পাঠকের কাছে এক বাড়তি পাওনা। ঝকঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল ও সৎ সম্পাদনা আমাদের মুগ্ধ করে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পুরুষশাসিত সম্পাদনা জগতে তিনি পা রেখেছিলেন। যদিও সম্পাদনার জগতে তিনি প্রথমা ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহিলা সম্পাদক হিসেবে পাওয়া যায় মাসিক পত্রিকা ‘অনাথিনী’(১৮৭৫)-র থাকমনি দেবী, পাক্ষিক পত্রিকা ‘বঙ্গমহিলা’র (১৮৭০) সম্পাদক মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। ‘বঙ্গমহিলা’ পত্রিকার সমালোচনা করতে গিয়ে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা লিখলেন “স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদ-পত্র এদেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্তভাবে প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেরূপ পাইবে।”[৮] এই বক্তব্য যে শুধু পুরুষ পরিচালিত পত্রিকা থেকে অভিনন্দন বা আশীর্বাদ নয়, অযাচিত উপদেশও তা অস্পষ্ট থাকে না। মেয়েদের লেখালেখি সম্পর্কে অবজ্ঞা, অনাগ্রহ কিছুটা কমে এল সম্পাদনা জগতে প্রথম সার্থক মহিলা সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবীর আমলে (১২৮৪, শ্রাবণ, ‘ভারতী’ পত্রিকা)।

অনেক পরে সম্পাদক হিসেবে সুলেখা প্রথমে দৈনিক ‘বসুমতী’র মহিলা বিভাগ ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা ১৩৬২) সম্পাদনা করেছিলেন। সেই সূত্রে সম্পাদকের সমমনস্ক লেখক-পাঠক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমানে বাংলা ভাষার লেখক (মহিলা) সংগঠন ‘সই’, যার উদ্যোক্তা ছিলেন নবনীতা দেবসেন, সেই বহমানতারই উত্তরসূরি। ১৯৫৫-তে সুলেখা প্রকাশ করেন সাময়িক পত্র ‘বলাকা’। তাঁকে প্রেরনা জোগান তাঁর দাদা জ্যোতির্ময় রায়। ‘বলাকা’র সম্পাদকীয় ‘বলার কথা’ ও চিঠিপত্র বিভাগে তিনি হারিয়ে যাওয়া পাঠিকাদের সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র নতুন করে বেঁধেছেন। অর্থের অপ্রতুলতা, অনুন্নত প্রযুক্তি, সর্বোপরি দক্ষ লেখকের অভাবে প্রায়ই নির্দিষ্ট সময়ে ‘বলাকা’ প্রকাশ করা যেত না। কিন্তু সম্পাদকের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততার গুণে পাঠকমণ্ডলী সেই অপারগতা মেনে নিতেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে তাঁর কলমের মাধুর্য ছড়িয়ে পড়েছিল রাজস্থান, ত্রিপুরা এবং আসামে। ভিন্ন পাঠকের ভিন্ন প্রশ্ন, আবদার, মতামত তিনি সামলেছেন নিপুন সম্পাদকীয় দক্ষতায়। চিন্তা-চেতনার অভিনবত্ব, উপস্থাপন রীতিতে থাকত ‘বলাকা’ সম্পাদকের স্বকীয়তার ছাপ। সুরুচিপূর্ণ, বিদগ্ধ কাগজ হিসেবে গুণী জনের স্বীকৃতি লাভ করে প্রকাশনার প্রথম বছরেই। কোনও পাঠক পত্রিকার দাম কম করতে বলেছেন, কেউ বা অর্থনীতির ছাত্র হবার সুবাদে অর্থনীতি ও আয়কর নিয়ে বলতে চেয়েছেন, কেউ আবার নিজের লেখক সত্তাকে যাচাই করতে চেয়েছেন। নারী সম্পাদিত পত্রিকা মানেই ‘বলাকা’-ই কেবল নারীরাই লিখতেন এমন নয়, পুরুষরাও লিখতে পারতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ‘পুরুষ কথা’ বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেখানে নারীরাও লিখতে পারেন।

‘Sex’ অর্থাৎ জৈবিক লিঙ্গ এবং ‘Gender’ অর্থাৎ সামাজিক লিঙ্গ এই দুটি ধারণাকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করাই হল নারীবাদী তত্ত্বের মূল সূত্র। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা এই ‘জৈবিক নির্ধারণবাদ’কে আক্রমণ করেছেন। নারী ভূমিকার এই সামাজিক নির্মাণ মনে করিয়ে দেয় ‘সিমোন দ্য বোভয়া’ -র উক্তি “One is not born but rather becomes a woman”[৯] (“কেউ নারী হয়ে জন্মায় না বরং নারী হয়ে ওঠে”)। সুলেখা দাশগুপ্তের রচনাগুলির নিবিড় পাঠে অনুভূত হয় উদারনৈতিক নারীবাদের ভাবনাটি। উদারনৈতিক নারীবাদে ‘অর্ধমানব’ নারীরাও পূর্ণ ‘মানুষ’, তাঁরা নারীর আইনি অধিকার, শিক্ষার অধিকার ও শ্রমের অধিকার দাবি করেন। লেখকের গল্প উপন্যাসগুলিতে নারী পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে নিতে চেয়েছে। তাঁরা সমান অধিকার দাবি করেছে। পুরুষ সবক্ষেত্রে কেবল নিপীড়ক বা অত্যাচারী ভূমিকাতে আবদ্ধ নেই, সে প্রেম-ভালোবাসা ও সাহচর্যের পরশ ও দিয়েছে। অন্যদিকে, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় কলমে নারীবাদ নেই। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক বিষয়গুলি। এক্ষেত্রে বিষয় অনুযায়ী গাম্ভীর্য, গভীর অনুভূতি, উপলব্ধি ও মূল্যবোধের চেতনা সংযোজিত হয়েছে। সুলেখা দাশগুপ্ত সংবাদপত্রের মতো গণমাধ্যমকে সমাজের প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কর্মদক্ষ সম্পাদকের ব্যবসায়িক বুদ্ধিও সেক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩, তৃতীয় প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৩।

২। ঘোষ, সুদক্ষিণা 'মেয়েদের কলম ঘরে বাইরে', 'অবতরণিকা' অংশ, কারিগর, কলকাতা, ২০১৮।

৩। দাশগুপ্ত, সুলেখা, 'মিত্রা', সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ, সুদেষ্ণা বসাক (সম্পা.), পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০১০, ২০০১, পৃষ্ঠা ৪৬।

৪। দাশগুপ্ত, সুলেখা, 'হৃদয় পাতো', সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ, সুদেষ্ণা বসাক (সম্পা.), পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০১০, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩০৩।

৫। দাশগুপ্ত, সুলেখা, 'মিত্রা', সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ, সুদেষ্ণা বসাক (সম্পা.), পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০১০, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৪।

৬। চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা, 'বিস্মৃতপ্রায় নাম, অবিস্মরণীয় রচনা', সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ, সুদেষ্ণা বসাক (সম্পা.), পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০১০, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬।

৭। দাশগুপ্ত, সুলেখা, 'বঙ্গ বিহার সংযুক্তি(৩য়)', সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ, সুদেষ্ণা বসাক (সম্পা.), পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০১০, ২০০১, পৃষ্ঠা ৬২০।

৮। দাশগুপ্ত, সুলেখা, 'পত্রিকা জগতে মেয়েদের কাজ', সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ, সুদেষ্ণা বসাক (সম্পা.), পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০১০, ২০০১, পৃষ্ঠা ৬২৩।

৯। বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), 'প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা', উর্বী প্রকাশন, কলকাতা -৭০০০১৪, চতুর্থ মুদ্রণ- অগাস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা ৪১।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১। বসাক, সুদেষ্ণা (সম্পা.), সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ, পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডাঃ এস সি বানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০১০, প্রথম প্রকাশ- ২০০১।

সহায়ক গ্রন্থ

১। দাস, মলয় (সম্পা.), 'বাংলা উপন্যাসে নারী : বৈচিত্রের আলোকে', ধ্রুপদী, ১৭, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা ২০১৪।

২। ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'মেয়েদের কলম ঘরে বাইরে', কারিগর, ৩৫ বি ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০০৪, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা ২০১৫, পুনর্মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৮।

৩। ঘোষ, সুদক্ষিণা, " মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা : 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা' ", দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৮।

৪। বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), 'প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা', উর্বী প্রকাশন,২৮/৫ কনভেন্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৪, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৮, চতুর্থ মুদ্রণ- অগাস্ট ২০১৬।

৫। ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, 'লেখিকাদের লেখালেখি', কলকাতা- ৭০০০৫৯, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১৭।

৬। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩, তৃতীয় প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৩।

...

‘রাগশর’ উপন্যাস : গুরু-শিষ্য সম্পর্কের অনন্য আখ্যান : ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পায়েল হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ (Abstract):

আশুতোষ রচনাবলীর ২৬ তম খণ্ডের অন্তর্গত সর্বাণী মুখোপাধ্যায়ের ‘আশার বাসা (লেখকের বাড়ি)’ শিরোনামের লেখা থেকে জানা যায় লেখকের ‘২৮ প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা ২৬’-এর পুরাতন ধাঁচের সেই ‘লালবাড়ি’ বা ‘মুখার্জি বাড়ি’র ইতিহাস। সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সেই ‘আশার বাসাতে’ চাঁদের হাট বসত। শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার প্রায় পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল সেই বাড়িটি। সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব গুহ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, কিন্নর রায় প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের প্রায়শই দেখা মিলত সে বাড়িতে। সঙ্গীতের প্রতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর মাসকিউলার ডিস্ট্রফিতে আক্রান্ত পুত্র জয়ের ছিল বিশেষ অনুরাগ। সাহিত্যিকের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা ও সম্মানবশত সঙ্গীত জগতের একাধিক যশস্বী শিল্পিদেরও সমাগম ঘটত সইবাড়িতে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখার্জি, হৈমন্তি শুক্লা, সতীনাথ মুখার্জি, শ্যামল মিত্র, রাহুল দেববর্মন, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, কিশোরকুমার, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখ। ১৯৭৭ খ্রি. (আষাঢ়, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘রাগশর’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, যার বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সঙ্গীতের জগৎ। ‘২৮ প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা ২৬’- বাড়িটির একটি বাস্তব ইতিহাসও ছিল। সঙ্গীতশিল্পী প্রতীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় এককালে সেই লালবাড়ির দোতলার একটি ঘর নিগূঢ় সঙ্গীতসাধকের বাসগৃহ ছিল। ‘রাতের পর রাত ধরে রাগ-রাগিনীর সুরের আলাপে ওই ঘর ইন্দ্রলোকের অমরাবতী হয়ে উঠত’। কিন্তু সেই সঙ্গীতসাধক বেশিদিন বাঁচেননি। এরপর যতবার ওই বাড়ির হাতবদল হয়েছে ততবারই সেই ঘরে কাকতালিয়ভাবে সঙ্গীতানুরাগীদেরই বাস ঘটেছে এবং যারা অকালে প্রয়াত হয়েছেন। অবশেষে সেই ঘরের বাসিন্দা হয়েছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মাস্কিউলার ডিসট্রফিতে ভুগতে থাকা সঙ্গীতানুরাগী সন্তান জয়। তাঁর ভবিতব্যেও ছিল অকাল প্রয়াণ। অকাল মৃত্যু বা হারিয়ে যাওয়া, সঙ্গীতের ঘরানা –এইসব বিষয়কে ঔপন্যাসিক আশুতোষ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর ‘আশার বাসা’র দালানে বসেই। এখান থেকেই হয়ত তাঁর ‘রাগশর’ উপন্যাসের বিষয় নির্মাণের Concept তৈরি হয়েছিল। উপন্যাসটি প্রথমে বিশিষ্ট শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (সম্ভাবত ‘প্রসাদ’)। তারপর প্রথমে গ্রন্থপ্রকাশ প্রকাশনা সংস্থা থেকে গ্রন্থাকারে এই উপন্যাসের প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হয় এবং তার কিছুকাল পর পুনরায় সাহিত্যপ্রকাশ থেকে এই উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (আষাঢ়, ১৩৮৪)। সঙ্গীতের জগতের পটভূমিকায় নির্মিত এই উপন্যাসের মূল বিষয় হল ‘গুরু-শিষ্য সম্পর্ক’। এই বিষয়টির তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ মূল আলোচনার অন্তর্গত।

সূচক শব্দ (Keywords):

উপন্যাস, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত, ‘গুরু-শিষ্য সম্পর্ক’, শিক্ষানীতি, স্মৃতি, তানপুরা, যশ, প্রতিপত্তি, সংযম, খুন।

মূল আলোচনা:

‘বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্গীতের মহাভাবে সমুদ্ভূত। সঙ্গীতের তরঙ্গে মেতে আছে গ্রহ-নক্ষত্র, সঙ্গীতের লীলায় বিভোর সমুদ্র-তরঙ্গ। তটিনীর কলকল, বিহঙ্গের কূজন, বিরিহিণীর সন্তাপ, শিশুর হাসি-কান্না– সবই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি। জগৎ সঙ্গীতময়’[১]। -এই সঙ্গীতের জগতই ‘রাগশর’ উপন্যাসের পটভূমি। আর এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়টি হল গুরু চরিত্রের অবক্ষয় এবং শিষ্যর প্রকৃত গুরু সন্ধান করে চলার এক বিস্ময়কর যাত্রাপথ। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের আদর্শ অনুযায়ী একথা অনস্বীকার্য যে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের ভিত্তি হতে পারেনা কোনো ম্যাটিরিয়ালিস্টিক বা বস্তুবাদী আদান-প্রদানের জগৎ। অথচ কিছু অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ঘটনাও মানুষের জীবনে স্থান দখল করে নেয়। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের তেমন অপ্রত্যাশিত অবস্থানকেও ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপেক্ষা করতে পারেননি। ফলে সৃষ্টি করেছেন ‘রাগশর’-এর মতো উপন্যাস। যদিও এই উপন্যাসের মুখ্য তিন চরিত্র –অঙ্কু, অনুশ্রী ও বিভূতি; তবুও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে এই উপন্যাসের পরিবেশ নির্মাণ হয়েছে যে সঙ্গীতের জগৎকে কেন্দ্র করে তার সূচনা হয়েছিল অন্য আরেক চরিত্রের সঙ্গীত অনুরাগ এবং সেই

অনুরাগের জন্য ব্যথিত হৃদয় নিয়ে তার গৃহত্যাগের মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদের শুরুতেই ঔপন্যাসিক সেই চরিত্রটির অবতারণা করেছেন, যার নাম পান্নালাল। পান্নালাল ছিল গাইয়ে পিতার পুত্র, বাবার অবর্তমানে গান নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল সে। কিন্তু গান অপছন্দ করা মামা মৃগাঙ্ক গোস্বামীর অভিভাবকত্বে এসে তার সঙ্গীত সাধনার পথ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মৃগাঙ্ক গোস্বামীর পুত্র অঙ্কু এই পিসতুতো এই দাদা, পান্নালালের সান্নিধ্যে এসেই প্রথম গানকে চিনেছিল। আড়ালে আবডালে চলত তাদের সঙ্গীত সাধনার প্রয়াস। কিন্তু মামাতো পিসতুতো ভাইয়ের সাধারণ খুনসুটিই একদিন পান্নালালের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াল। পান্নালালের আড়ালে সঙ্গীতসাধনার কথা পিতা মৃগাঙ্ক গোস্বামীর কানে তুলে দিতে তিনি ভীষণ রাগে পান্নালালের পিতার শেষ স্মৃতি তানপুরাটি ভেঙে খান খান করে দিলেন। এরপর মামার প্রতি বিরাগ নিয়ে পান্নালালের গৃহত্যাগ এবং অনুশোচনার গ্লানিতে নিমজ্জিত হয়ে অঙ্কুর বিভিন্ন গ্রাম এবং শহরের সমস্ত সঙ্গীতের জলসাঘরে পান্নালালকে খুঁজে বেড়ানো। উপন্যাসে আর পান্নালালকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই ঘটনার জন্যই অঙ্কুর পিতার প্রতি ক্ষোভ ও তা থেকে দূরত্ব তৈরি হতে হতে ক্রমশ সেও পরিবার থেকে দূরবর্তী হয়েছে এবং সঙ্গীতের জগতের টানে অহরাত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। অঙ্কু, বিভূতি ও অনুশ্রী তিনজনে বাল্যকালের বন্ধু এবং তাদের মধ্যে ত্রিকোণ প্রেমের আবর্ত থাকলেও সে পরিসর খুব ক্ষুদ্র। সেই আবর্তে নর নারীর আকর্ষণকে বন্ধুত্ব মাত দিয়ে দিয়েছে বারঙ্গবার। উপন্যাসের মূল বিষয়গুলি হয়ে উঠেছে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, সঙ্গীতের অভিজাত ঘরানা, সেই ঘরানার কলুষতা এবং অবশেষে এই কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত গুরুর আশ্রয়লাভ। কাশী, লক্ষ্ণৌ এবং আরো দুরান্তে প্রায় সমগ্র দেশব্যাপী সঙ্গীত শিক্ষার ঘরানাগুলি গুরুর খোঁজে ঘুরে বেড়িয়ে অঙ্কুর সঙ্গীতসাধনার প্রয়াস ও বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়টিকে স্পষ্ট হতে দেখা যায়। অঙ্কু সঙ্গীত সাধনার জগতে যে একে একে সমস্ত গুরুদের সান্নিধ্যে এসেছে তাঁদের শিক্ষানীতির দিকগুলিকে এক এক করে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করলে বিষয়গুলি আরো স্পষ্ট হবে।

উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে অঙ্কুর একের পর এক প্রথিতযশা গুরুর সান্নিধ্যলাভের ইতিবৃত্তটি শুরু হয়েছে। অঙ্কু এই পরিচ্ছেদের শুরুতেই দু'বছর ধরে ছোট বড় অনেক ওস্তাদের সান্নিধ্যে থেকে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের যে কুরুচিকর রূপ প্রত্যক্ষ করেছে তাতে তার প্রতিক্রিয়া খানিকাংশে উল্লেখ্য –'ছোট ওস্তাদরা নিজেদের ছোট ভাবে না, আর বড় ওস্তাদদের বেশির ভাগই নাগালের বাইরে। তবু অঙ্কু এদের অনেকের নাগাল পেয়েছে। মন কারো পায়নি। ...হৃদয়ের দিকটা বড় নিঃস্ব মনে হয়েছে সকলের।... যে-সব ওস্তাদদের সে সসম্ভ্রমে ঈর্ষা করত, সুরলক্ষ্মীর অপার করুণার পাত্র স্বভাবত যাদের– কিছুদিন বাদেই মনে হত, বস্তুতন্ত্রীয় ঘাত প্রতিঘাতে ভিতরে ভিতরে তারাও হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। সদা সংশয়, সদা ভয় –যশ আর খ্যাতির ভিতটা কবে জানি নড়েচড়ে ওঠে। তাই সাধনার থেকে তাদের আড়ম্বর বেশি, দানের থেকে চাহিদা বেশি'[২]। এই বস্তুতান্ত্রিক দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে শিক্ষাদানের কলুষিত জগৎকে অঙ্কু চিনেছে নিজের একের পর এক অভিজ্ঞতা থেকে। প্রথমে একজন জনৈক গুরুর সান্নিধ্যে এসে আর্থিকভাবে গুরুদক্ষিণা না দিতে পারায় তাকে নিজের টিউশনি কামাই করে ওস্তাদকে সঙ্গ দিতে হত, কুলীর মতো ওস্তাদের বাদ্যযন্ত্র বয়ে নিয়ে বেড়াতে হত। কিন্তু এত করেও অঙ্কু গানের 'চীজ' চাইলেই সেই ওস্তাদ বিরক্ত হতেন, বক্রোক্তি করে উপহাস করতেন। ধনী ছাত্রকে যোগ্য মূল্যের বিনিময়ে যখন গান শেখাতেন তখন অঙ্কুর কাছে বসা বারণ, অপমান করে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন ওস্তাদ। এখানে গুরু-শিষ্যের নৈতিক সম্পর্কের থেকে বস্তুবাদী আদান-প্রদানের স্বার্থ প্রকট হয়েছে। সুতরাং গুরু-শিষ্য সম্পর্কের অবক্ষয়ের রূপটি এখানে স্পষ্ট। এমন ওস্তাদের সঙ্গ ত্যাগের পর উচ্চবিত্ত সমাজের বিশেষ মান্যগণ্য ব্যক্তি রাজেশ্বরবাবুর ছেলে মেয়েকে পড়ানোর সুবাদে রাজেশ্বরবাবুর সাহায্যেই অঙ্কুর দ্বিতীয় গুরু লাভ হয়। তিনি 'লাহোরের সেরা ওস্তাদ নূরনওয়াজ খাঁ'। তাঁর কাছে অঙ্কু একরকম শিখতে শুরু করলেও এই শিক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয় তার জন্য অঙ্কু শরণাপন্ন হয়েছে গুরুর একনিষ্ঠ শিষ্যা তারাবাঈয়ের কাছে। ক্রমে তারাবাঈও অঙ্কুর পুরুষকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং গুরুর কাছে যেন অঙ্কুর শিক্ষা ভালো হয় সেদিকেও নজর রেখেছে। কিন্তু প্রবীণ গুরু ও প্রেমিক নূরনওয়াজ খাঁ-এর চোখে শিষ্যা তারাবাঈ-এর এই ছলনার কিছুই এড়ায়নি। তারাবাঈ-এর উপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েম রাখতে তিনি অঙ্কুর কাছে নিজের প্রবৃত্তির অসংযমের দিকটি স্বীকার করে নিয়েছেন, অকপটে উন্মোচিত করেছেন তাঁর ও তারাবাঈয়ের সম্পর্কের কথা, এবং প্রবীণ বয়সে অসহায়চিত্ত প্রেমিকের ভাষায় তাঁর কাছ থেকে তারবাঈকে গুরুদক্ষিণা হিসাবে প্রার্থনা করেছেন –'গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়। দিবি?...একটা 'চীজ'ও যদি তোকে দিয়ে থাকি, তুই চলে যা এখান থেকে। তোর উমর আছে, রক্তের জোর আছে –আমার কি আছে?'[৩] যদিও এই সম্পর্কের ব্যাপারে অবহিত হয়েই অঙ্কু তারাবাঈকে ঢাল হিসাবে রাখতে চেয়েছিল গুরুর সামনে, এবং এরই বীপরীতে গুরু হিসাবে চিত্তের অসংযম ও নিজের দুর্বলতা ঢাকতেই নূরনওয়াজ খাঁ ভদ্রভাষায় অঙ্কুকে তার ঘরানা থেকে বিতাড়িত করেছেন, তবুও গুরু-

শিষ্যের মাঝে প্রবৃত্তির এই লড়াই কুরুচিকর এবং অপ্রত্যাশিত। এরপর তৃতীয় গুরু এলাহাবাদের ওস্তাদ জামাল খাঁ-এর ঘরানায় প্রবেশ করেছে অঙ্কু। সেখানেও একইরকমভাবে গুরুর প্রবৃত্তিগত কলুষতার মুখোশ খুলে গিয়েছে অঙ্কুর সামনে। এই তৃতীয় গুরুর প্রবৃত্তির অসংযম আরো সাংঘাতিক। বারাণসীর ওস্তাদ বন্ধু উপানন্দ ভাসের কন্যা কুন্তীবাঈকে পাঁচ বছর বয়স থেকে তালিম দিয়েছেন ওস্তাদ জামাল খাঁ। নিজের ঘরানায় নিয়ে এসে পরম স্নেহে তাকে একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ তৈরি করতে চেয়েছেন, করেওছেন প্রায়। কিন্তু এই করার বিনিময়ে বন্ধুর সন্তান কুন্তীবাঈয়ের কাছে গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ করেছেন প্রেয়সীরূপে তার সাহচার্য –'কুন্তীর মধ্যে তিনি নারীকে দেখলেন। দেখতে লাগলেন। শেষে একদিন গুরুদক্ষিণা দাবি করলেন'[৪]। এই সত্যও অঙ্কু জেনেছে। আর জানার পরে আবারো সে একইভাবে এই নারীকে ব্যবহার করে গুরুর কাছ থেকে সাধনার মূলধন আদায় করতে চেয়েছে। কিন্তু ওস্তাদ জামাল খাঁ-এর কাছেও অঙ্কুর এই প্রচেষ্টা ধরা পরেছে অবিলম্বেই। তিনি নূরনওয়াজ খাঁ-এর মতো ভদ্রভাষায় নয় বরং রূঢ়তার সঙ্গে বিতাড়িত করেছেন অঙ্কুকে। বেরিয়ে এল মুখোশের আড়ালে থাকা কপট গুরুর চারিত্রিক পাশবিকতা –'বেইমান –বেশরম –নিকল যা ইহাঁসে, অগর ফির তেরা চেহরা ইহাঁ দেখা তো জুতাসে খবর লুঙ্গা'[৫]। এরপর অঙ্কু সঙ্গীতসাধনার পথে গুরু খুঁজতে আর ব্রতী হয়নি, সে ফিরেছে নিজের গ্রাম যোগিন্দরপুরে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই কলুষতার জগতে সঙ্গীতসাধনার স্বার্থে নারীদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে সিদ্ধিলাভ করতে গিয়ে বিফল অঙ্কুও কী শিষ্য হিসাবে সৎ ছিল? অবশ্যই ছিল না। এই মর্মে যে বিষয়টি প্রকটভাবে স্পষ্ট হয় তা হল গুরু-শিষ্য দুই অবস্থানেরই অবক্ষয়। তবে আশুতোষ কখনোই শুধু নৈতিক অবক্ষয়ের রূপকে দেখিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি টানেননি। তাই এই উপন্যাসে নেতিবাচক চরিত্র ও পরিস্থিতির পাশাপাশি ইতিবাচক চরিত্র ও চেতনাকে প্রকট করে বিষয়ের বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের অপ্রত্যাশিত রূপের বিপরীতেই ঔপন্যাসিক দাঁড় করিয়েছেন গুরু-শিষ্য সম্পর্কের প্রত্যাশিত রূপকে। কুন্তিবাঈ সত্যিই অঙ্কুকে ভালোবেসেছিল এবং অঙ্কু যে গুরুর সন্ধান করে ফিরেছে বছরের পর বছর ধরে সেই গুরুর সন্ধান জানত একমাত্র কুন্তীবাঈ। অঙ্কুর জন্য সেই গুরুর কাছে গিয়ে যেন নিজের পাপের পায়শ্চিত্ত করেছে কুন্তীবাঈ। সে গুরু হলেন কুন্তীবাঈ-এরই পিতা ওস্তাদ উপানন্দ ভাস। উপানন্দ ভাস ফকিরের ছদ্মপরিচয়ে এসেছেন অঙ্কুর কাছে। পূর্বের সমস্ত শিক্ষা ভুলিয়ে নতুন করে তাঁকে তৈরি করেছেন। ঔপন্যাসিক অঙ্কুর মুখ দিয়ে গুরুর সংজ্ঞা দিয়েছিলেন –'গুরু হবে নারায়ণের মত শুচি দিয়ে ঘেরা –আনন্দময়, উদার'[৬]। এইরূপ গুরুকেই এনে হাজির করলেন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে। সেই গুরু অবসাদে ঘেরা 'মৃত্যুর বিবর থেকে জীবনের আলোয় টেনে তুলেছে তাকে'[৭]। এই গুরু খ্যাতির ধার ধারেন না, পরিচয় গোপন করে শিষ্যকে শেখান। তিনি শুধু গানই শেখান না, তিনি শিষ্যের মধ্যে ভবিষ্যতের গুরুর গুণ ভরে দেন। ধৈর্য্য দিয়ে, উদারতা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, শাসন দিয়ে অঙ্কুকে যোগ্য শিষ্যের মতো নিজের উত্তরসূরি বানিয়ে তবে তিনি বিদায় নিয়েছেন। উপন্যসের একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখা যায় নাম যশ প্রতিপত্তি কোনোটাই অঙ্কুর জীবনে থেকে থাকেনি। যোগিন্দরপুরের বাড়িতে 'পঞ্চবটি আশ্রম' নামে তাঁর নিজের সঙ্গীত ঘরানা তৈরি হয়েছে। কিন্তু এত প্রাচুর্যের মধ্যেও গুরু-শিষ্যের সংযম রক্ষার ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলেন –'বাইরের সাজও দরকার, ওটা ভিতরে না ঢোকে দেখিস'। শিষ্যও তা দেখেছে –'যশ আর খ্যাতির ডালি স্তূপের মত বাইরেই জমছে, ভিতরে জমছে না, নিজের এতটুকু আত্মবিভ্রম সম্বন্ধে সচেতন হলেই রীতিমতো প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে চায়, গুরুর ছবির নিচে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গুরু দিক-দিশারী'[৮]। তবে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের প্রত্যাশিত রূপের এই ছবি দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেনি। গুরুর শতর্কবাণী থেকে বিস্মৃত হয়েছিল অঙ্কু। নিজের রাগের প্রতি সংযম রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন গুরু। কোনো প্রকার সামাজিক অসংযমকে সহ্য করতে পারত না অঙ্কু। এমনি এক ঘটনা দেখে নিজেকে সংযত না করতে পেরে সে খুন করেছিল। সেই সত্য আর কেউ না জানলেও নিজেকেই সে নিজে ক্ষমা করতে পারেনি। এই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে অপরাধ বোধে ভুগে অঙ্কুর একপ্রকার মানসিক বিকার ও স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে অঙ্কুর এমন শোচনীয় পরিণতির কাহিনিটি পাঠকের কাছে অসংগত বা বাহুল্য মনে হলেও এই কাহিনির মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক গুরু-শিষ্য সম্পর্কের গুরুকে মঙ্গলময় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তা হল প্রকৃত গুরুই যে শিষ্যের চরিত্রের ত্রুটি এবং সুন্দর দিকগুলিকে চিনে নিয়ে তাঁকে সঠিক মার্গ দেখাতে পারেন এবং শিষ্যের সদগুরু ভিন্ন গতি নেই। গুরুর উপদেশের বিস্মৃতি যেখানে সেখানেই আত্মস্খলনের ভয়াবহতা প্রকট।

তথ্যসূত্র:

১. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-৫, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪০২, পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি-৭৩,পৃ.১২৬।

২. তদেব, পৃ. ১৬৯।

৩. তদেব, পৃ. ১৯৬।

৪. তদেব, পৃ. ২০২।

৫. তদেব, পৃ. ২১৯।

৬. তদেব, পৃ. ২১৪।

৭. তদেব, পৃ. ২৪৫।

৮. তদেব, পৃ. ২৫২।

অন্যান্য গ্রন্থ:

১. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী -১', প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৪০০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি-৭৩, পৃ.২১।

২. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী -২৬' (সমাপ্তি খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি-৭৩, পৃ.২১।

৩. অতনু শাশমল, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ, দোসর পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০২৪, কলকাতা-৯।

৪. অলোক চক্রবর্তী, আখ্যানের তত্ত্বভুবন, আশাদীপ, কলকাতা-৯।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা:

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ পৌষ ১৪২০, ১১ জানুয়ারি, ২০১৮।

২. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'সবিনয় নিবেদন', কলকাতা-০১।

৩. বইয়ের কাগজ, বিশেষ সংখ্যা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক- সলিল লাহিড়ী, অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ – জুন ১৯৮৯।

……………………………………………

সমরেশ বসুর 'এসমালগার' গল্পে উদবাস্তুদের ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রচেষ্টা

পিউ দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ , বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের ফলে বহু মানুষকে আশ্রয়হীন হতে হয়েছিল। তার ফলে উদবাস্তু মানুষগুলোকে খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক অসাম্যের সাথে জীবনে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার লড়াই করতে হয়। অর্থনৈতিক দুর্বলতার ফলে এবং পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই মানুষ অসামাজিক কাজ বাধ্য করতে হয়। উপায় নেই অনিচ্ছা থাকলেও এই কাজ তাদের করতে হয়। মন থেকে চাইলেও তাদের মুক্তি মেলে না। আর এই উদ্বাস্তু বা রিফিউজি মানুষের প্রতীক হিসাবে আমরা গোরাচাঁদকে লক্ষ করি। সমরেশ বসুর 'এসমালগার' নামক গল্পে দেখি গোরাচাঁদ নামে একটি তেরো বছরের কিশোর জীবিকা হিসেবে বেআইনিভাবে চাল বিক্রি করে বাবার পরিবর্তে সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। বাবা, অন্তঃসত্ত্বা মা, ছোটো পাঁচ ভাই-বোন, অর্থাৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী গোরাচাঁদ নিজেই। গোরাচাঁদের মতো মানুষেরা বেআইনি ভাবে চাল বিক্রি করে দুমুঠো খেয়ে পড়ে জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে। এবং রেল পুলিশের হাতে ধরা পড়লে অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তবুও এই কাজ সে পরিত্যাগ করতে পারে না। গোরাচাঁদের চোখে শুধুই ভাসে অভুক্ত মা-বোনের ছবি। অনন্ত অপেক্ষায় আছে তাঁর মা। সে কখন চাল নিয়ে বাড়ি যাবে সেই আশায়। সুবালা নামক আর একজন লড়াকু চরিত্রের পরিচয় পাই। বেআইনিভাবে চাল বিক্রির অপরাধে সে হাজত বাস করে। তার স্বামী তিন বছর হল নিখোঁজ। তার ছোটো দুই সন্তান তাদের মুখে একটু খাবার তুলে দেবার জন্য সুবালা এই বেআইনিভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। এখানে সুবালার মধ্য দিয়ে আমরা মাতৃশক্তি পরিচয় পাই। একজন মা তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত সব প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই করবার সাহস রাখে। গল্পের মূল বক্তব্য চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে বিকশিত হয়েছে। সমাজের পুঁজিবাদী মানুষেরা যখন নৌকোয় করে বস্তা বোঝাই করে চাল নিয়ে যায় বেআইনিভাবে, তখন তাদের কোনো শাস্তি হয় না কিংবা তাদের চাল বাজেয়াপ্তও করা হয় না। সমাজের এবং সরকারের যত নিয়ম-কানুন নিপীড়িত, অসহায় মানুষের জন্য। সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে এই জগত সংসারে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই তথা পরিবারের সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই এবং দুবেলা দুমুঠো খাবারের নিশ্চয়তা কথা ও যে কোনো রকম কঠিন পরিস্থিতিতে হার না মানার কথা স্পষ্ট ভাবে এই গল্পে লক্ষ করা যায়।

মূলশব্দ :

দেশভাগ, উদবাস্তু বা রিফিউজি, পনেরো সের চাল, **ক্ষুধা নিবৃত্তি, অন্নাভাব ,** অর্থনৈতিক অসাম্য, মাতৃশক্তি, খাদ্যাভাব, পুঁজিবাদী সমাজ, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ, বেঁচে থাকার লড়াই।

মূল প্রবন্ধ-

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৪-১৫-ই আগস্ট দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের জন্ম হয় — পাকিস্তান ও ভারত। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল পাঞ্জাব এবং বঙ্গদেশের কিছুটা করে অংশ। ফলে সেই সময় থেকে জন্ম হল পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ নামের দুটি অঞ্চল। দেশভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানি হিন্দুরা উদবাস্তু হয়ে আসতে লাগলেন ভারতে এই ঘটনা ঘটল পাঞ্জাবে এবং বাংলায়। এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বিপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে লাগলেন। অনেককেই ছেড়ে আসতে হল তাদের ঘর, বাড়ি, জমি, এমনকি পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি। দেশভাগের ফলে বহু মানুষকে উদবাস্তু হতে হয়েছিল। তার ফলে বহু মানুষকে শুধুমাত্র বাসস্থানচ্যুত হতে হয়েছিল তাই নয় বরং অনিশ্চিত জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। "এমনকি দুই বিশ্বযুদ্ধের অনুঘটকের সৃষ্টি ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের দেউলিয়া অর্থনীতি, দারিদ্র, বেকারত্ব, সব মিলিয়ে এক বিধ্বস্ত যুগের ধারক হয়ে উঠেছিল। এরপর চার পাঁচ ছয়ের দশকে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুস্রোত, স্বাধীন ভারতের দুর্বল অর্থাবস্থা, অশিক্ষার পাশাপাশি কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ ইত্যাদি আর এক

ধরনের সামাজিক পরিমণ্ডলের জন্ম দিয়েছিল। যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজরাষ্ট্রীয় পরিবেশে রূপায়িত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন প্রবাহ।”[১] মানুষ দুবেলা দুমুঠো ভাত খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে চায়। মানুষের প্রধান চাহিদা হল অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। সুতরাং প্রধান খাদ্য ভাত থেকে মানুষ বঞ্চিত হলে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে আর এই ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের জন্য মানুষ তখন যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পিছুপা হন না। তাই সমাজের নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষ দুমুঠো ভাতের জন্য হাহাকার করে। ইতিহাসে নানান ঘটনায় তার সাক্ষী রয়েছে। সমরেশ বসুর বহু গল্পে উঠে এসেছে বাসস্থানহীন, আশ্রয়হীন সেই সব উদবাস্তু মানুষের কথা। সরকারি খাতায় যারা রিফিউজি বা উদবাস্তু নামে পরিচিত। সমাজের নিচুতলার বসবাসকারি দুঃখী-অভাবী মানুষেরাই গল্পের প্রধান চরিত্র রূপে ধরা দিয়েছে। আর এই সমস্ত মানুষেরাই অন্যের দয়ায়, অন্যের কৃপায় সারা জীবন তাদের জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। জীবনধারণের জন্য এইসব মানুষেরা অবলম্বন করেছে ভিক্ষা থেকে শুরু করে নানা রকমের ঘৃণ্য অসামাজিক কাজকর্ম। “সমরেশ দেখেছিলেন ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এ কলকাতার রাজপথে রক্তাক্ত বিক্ষত মানুষের অগণিত মৃত্যুর পাহাড়। ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা উদ্বাস্ত মানুষজন কিভাবে ছড়িয়ে রয়েছে কলকাতা ও তার সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় বেঁচে থাকার অদম্য তাগিদে। ছিন্নমূল মানুষের দল তখন জমছে রানাঘাট কুপাস ক্যাম্পে, ধুবুলিয়া রিফিউজি ক্যাম্পে, ঘুষুড়ির ক্যাম্পে। আবার অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে উঠেছে কলকাতা ও শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে—তারও পরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। মানুষ ছাড়াও পৃথিবীর সকল অন্যান্য প্রাণীরাও জন্মের পর থেকে বাঁচার লড়াইতে তীব্রভাবে প্রচেষ্টা করে চলেছে আজও পর্যন্ত। আর এই বাঁচার তাগিদের জীবিকার সংস্থান করে, কঠোর পরিশ্রম করে, পাপ পুণ্যের ভয়কে দূরে রেখে যে কোনো প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে এমনকি মৃত্যুর কাছে পর্যন্ত মাথানত করেনি।শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য, একটু নিরাপদ বাসস্থানের জন্য। দু’মুঠো খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার তীব্র আশা নিয়ে সেই সব সহায় সম্বলহীন উদবাস্তু মানুষেরা স্থায়ী বাসস্থান পাওয়ার জন্য সপরিবারে উপস্থিত হয়েছে এপার বাংলায়। কিন্তু তারা স্থায়ী আশ্রয় পাওয়া তো দূরের কথা, বেঁচে থাকার জন্য যে কোনো জীবিকার পথ খুঁজতে ব্যর্থ হয়। তখন সমগ্র দেশ জুড়ে ভয়ংকর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা চলছে। একটা সময়ে মধ্যবিত্ত মানুষেরা নানা রকমের উঞ্ছবৃত্তি ও অসামাজিক কাজের সাথে যুক্ত হয়। মনের দ্বিধা, সংশয় সবকিছুকে এক সময় দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। কারণ পেটের খিদের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য চুরি, ডাকাতি, চোরাকারবারি এরকম অসামাজিক কাজের সাথে তারা নিজেদের যুক্ত করেছে। এক কথায় ভদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বিচ্যুত হয়ে নানা ধরনের হীনতর অসম্মানের জীবিকা গ্রহণেও বাধ্য হয়েছে তারা শুধুমাত্র জীবন সংসারে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।”[২]

কলকাতার শিক্ষিত মানুষজনের কাছে এই অসহায় মানুষগুলো কীটের সমতুল্য ক্ষুদ্র প্রাণী বলে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমরা অনেক সময় দেখি যে, এত মানুষের আগমন হয়েছিল যে তাকে প্রায় বন্যার সঙ্গে তুলনা করা যায় — “মানুষের বন্যা যেন পূর্ববঙ্গের সীমান্ত উপচে পশ্চিমবঙ্গ প্লাবিত করেছিল।” ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার দিনে ভারতবর্ষ নামক একটি ভূখণ্ডই কেবল যে দু টুকরো হয়েছে তা নয়, সমাজ জীবনে ও ব্যক্তিজীবনে এত প্রবল অস্থিরতা, প্রাণঘাতী দাঙ্গা, মেয়েদের চূড়ান্ত অসম্মান, মানব জীবনে প্রাণধারণ জনিত প্রবল সংঘর্ষ মানবিকতার সংজ্ঞাকে দিয়েছে পাল্টে। বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এই অবক্ষয়কে ধারণ করেছে। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটা খাদ্যসংকটে ত্রাণ ব্যবস্থা থেকেও বঞ্চিত হয় মানুষ। ফলে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আবার তারা পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করে ১৯৫২-তে পাসপোর্ট প্রচলন ঘটলে উদবাস্তু আগমনের হার বৃদ্ধি পায়। আবার ১৯৫০ থেকে ১৯৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কমিউনিস্টদের মূল বক্তব্য ছিল কংগ্রেস দলটি দেশভাগ ও উদবাস্তু সমস্যার জন্য দায়ী। বাংলা ও পাঞ্জাবে উদবাস্তু আগমনের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। ১৯৬৫ সালে পূর্ববঙ্গে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণেও দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। পাঞ্জাবে শুধু স্বাধীনতা তথা দেশভাগের সময়ে আগে পরে প্রায় ১৯৫০ সালের মধ্যেই উদবাস্তু আগমনের ব্যাপারটি সম্পন্ন হয়ে যায়। ১৯৭০ এর পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু লোক পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে এবং এখনো প্রত্যেক দিন ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে বহু মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসছেন।”[৩]

সেখানে পূর্ব প্রান্তিক রাজ্য বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বারে বারে সংগঠিত হয়েছে এবং ভিটেমাটি ত্যাগ করে আশ্রয়হীন মানুষ বারেবারে দেশান্তরী হয়েছে। ভিটেমাটি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা হারিয়েছেন তাদের জীবনের সুখ, শান্তি, ভালো থাকার এবং ভালোভাবে বাঁচার অধিকারটুকুও। এদেশে ভদ্রশ্রেণির কাছে তখন তারা চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে, আর উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা কখনই তাদেরকে মানুষ বলে মর্যাদা দেয়নি, বরং তাদেরকে সমাজের ইতর প্রাণী মনে করেছে। এমনকি কুকুর বলতেও তাদের বিবেকে বাঁধেনি। কখনো

সেই উদবাস্তু মানুষের দলের পরিচয় গড়ে উঠেছে হীনতর জীবিকার পরিচয়ে। আর লেখকদের লেখায় সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি হল তাদের শিল্প-সাহিত্য রচনা প্রধান উপাদান। যেহেতু সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ তাই সেখানে পৃথিবীর সর্বকালের সর্ব দেশের কথা উঠে এসেছে। আর সমরেশ বসুর বহু গল্পে তেমনই সব উদবাস্তু সহায় সম্বলহীন মানুষেরা স্থান পেয়েছে, স্থান পেয়েছে তাদের জীবনে বেঁচে থাকার করুণ লড়াই, আর এই সমস্ত মানুষেরাই হয়েছে তার গল্পে প্রধান চরিত্র। আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাদের হার না মানার জেদ। তেমনই একটি গল্প হল 'এসমালগার'। এই গল্পে উদ্বাস্তু মানুষের জীবনে খাদ্যাভাবের চিত্রের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে অর্থনৈতিক অসাম্য, এবং সকল কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁতে দাঁত চেপে বেঁচে থাকার লড়াই-এর অদম্য ইচ্ছা — "আমি পারবো আমাকে পারতেই হবে আমার পরিবারের জন্য।" এমন আত্মপ্রত্যয় স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় গোরাচাঁদের চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। লেখক সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন গোরাচাঁদ ও তার পরিবারের করুণ কাহিনিকে কেন্দ্র করে। জীবনে বেঁচে থাকার শক্তি হিসাবে দু'মুঠো ভাতের গন্ধকে নিশ্চিত করবার জন্য কঠিন লড়াই আমরা লক্ষ করি। গল্পটি নিবিড় ভাবে পাঠ করলে দেখা যায় যে, গোরাচাঁদ মাত্র তেরো বছরের একটি কিশোর। তার তীব্র শ্বাসরোধকারী একটানা ঘুংরি কাশি এবং চেহারার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে তার জীবনটাও একপ্রকার জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কিশোর বয়সেই তার মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই লেখক বলেছেন — "বয়স বিশ কি পঞ্চাশ কি বারো বোঝার উপায় নেই তবে আসল বয়স তেরো।"[৪]

গোরাচাঁদের কথায়, তার নাম গৌরাঙ্গ অর্থাৎ গোরা কিন্তু সে সকলকে পরিচয় দেয় গোরাচাঁদ এসমালগার। এসমালগার অর্থে স্মাগলার। অমনি শুনবে যাত্রা সুরে — "চাল চুলো নেই বেচালেরে আমি যোগাই চাল।"[৫] গোরাচাঁদ চোরাচাল পাচারের জন্য তিনবার জেল খেটেছি এবং জেলে থাকার সময় সে জীবনের নোংরামি ও সর্বনাশের এক ধরনের শেষতলা পর্যন্ত সে দেখেছে। এই গোরাচাঁদ ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে এসমালগার। দল বেঁধে তার নেতৃত্বে চাল পাচার করে আরো এক দল উদ্বাস্তু মানুষের দল। তারা ট্রেনের যাত্রী পুলিশ, ক্রু-ম্যান সবাই কার কাছে তাদের পরিচয় চোর, ডাকাত, দুর্বৃত্ত বলে। এই গোরাচাঁদের মতো মানুষদেরকে ট্রেনের যাত্রীরা কখনো শুয়োরের বাচ্চা কখনো বা কুত্তার বাচ্চা বলে সম্বোধন করে। এই গোরাচাঁদ বেআইনি চাল পাচারের জন্য তিনবার জেল খেটেছে। তার এই কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল তার পরিবারের সদস্যদের পেটের খিদের জ্বালা নিবারণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া। কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে দেশভাগের পর বিতাড়িত এই নিম্নবৃত্তের পরিবারের কর্তা অর্থাৎ গোরাচাঁদের বাবা এখন রোজগারে অপারক। তখন গোরাচাঁদই তাদের পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। যার উপর নির্ভর করছে তার পাঁচ ভাই বোন, অন্তঃসত্ত্বা মা এবং রুগ্ন বাবা। তার বাবার আশা ছিল বিত্তবান হওয়ার বরং এখন কলকাতার বাইরে রিফিউজি ক্যাম্পে বসে সে আশা কবে উধাও হয়ে গেছে। তাই শুধুমাত্র বাবা নয় পরিবারের সকলের মুখে দু-মুঠো খাবারের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রোগ, ওষুধ সবকিছুর দায়িত্ব এখন গোরাচাঁদের। আবার সে ট্রেনে ওঠার জন্য টিকিট পর্যন্ত কাটে না কারণ মূলধন তো সেই পনেরো সের চাল। গোরার কথায়— "এর উপরে ষাট মাইলের ভাড়া দুটো টাকা যদি গোরা খরচই করতে পারবে, তবে আর এসমালগার হওয়ার কি দরকার ছিল।"[৬] এই কথার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অসাম্যের কথা সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। আবার এলাকার রেশন ইন্সপেক্টর এসে যখন গোরার মাকে জিজ্ঞাসা করে তাদের সংসারের কর্তার কথা তখন গোরার মা তার হাত ধরে এনে দাঁড় করায় রেশন ইন্সপেক্টর এর সামনে তার মায়ের এই আচরণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সেই একমাত্র সংসারের উপার্জনকারী ব্যক্তি। গল্প যতই অগ্রসর হয়েছে ততই আমরা গোরা তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে জীবনে বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই আরো কাছ থেকে লক্ষ করি। একসময় দেখা যায় যে গোরা যখন ট্রেনে করে চাল নিয়ে ফিরছিল তখন ক্রুরম্যানের হাত থেকে তার চালকে রক্ষা করবার জন্য সে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেয়, যার ফলে — "তার গায়ে মাথায় অনেকগুলো ক্ষতের দাগ। সামনের মাড়ির একটা দাঁতের অর্ধেক নেই বাকিটা নীল হয়ে গিয়েছে।"[৭] আমরা গোরার কথাতেই জানতে পারি — "অথচ ওদিকে নদীর বুকে নৌকা বোঝাই হচ্ছে চাল। যাবে কলকাতায়, কালোবাজারে। যেমন যাবে গোরাদেরটা। ওদের নেই মোবাইল কোর্ট, পেছনে সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচর, পথে পথে পুলিশের জুলুম। গোরা বলে ওরা এসমালগার নয়, সরকারের বোনাই, তাই ঘর-কারবার।"[৮] অর্থাৎ এখানে আমরা গোরার কথায় স্পষ্ট ভাবে পুঁজিবাদী মানুষদের প্রভাবকে লক্ষ করতে পারি। পুঁজিবাদী মানুষেরা অর্থনৈতিকভাবে সবল বলে তাদের জন্য আইন-কানুনের কোনো বেড়াজাল নেই। যত আইন-কানুন, পুলিশ, ক্রু-ম্যান প্রভাব বিস্তার করে গোরার মত অসহায়, দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের উপর। আবার গোরার অন্যান্য সঙ্গীদের কথায় জানতে পারি যে, একসময় এই পনেরো সের চাল চড়ুই পায়রায় খেয়ে নষ্ট করত। আজকে সেই পনেরো সের চালের জন্য তাদের কঠিন লড়াই। যেখানে কেউ কাউকে এক অংশ ভাগ দিতে রাজি নয়।

গোরার কথায় আমরা এও জানতে পারি যে, গঞ্জের একটা হোটেলে একটু ডাল ও ভাতের রেট চার আনা। গোরা তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে ভাগ করে খাবার খায় আধ পেঠো খেয়ে তারা পেট ভরায়-"শালা কেষ্ট ঠাকুরের খুব খাওয়া হল। এই দ্যাখ। বলে পেটটা ফুলিয়ে দেখায়।"[৮] এই গল্পের মধ্যে উদ্বাস্তুদের স্থায়ী কর্মজীবনের অনিশ্চয়তার ফলে অর্থনৈতিক অসাম্যের দিক যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি আভাসে ইঙ্গিতে খাদ্যাভাবের কথা লক্ষ করি। শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তাদের একটাই ইচ্ছা জীবনে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। অবিরত তারা লড়াই করে চলেছে নিজেদের সাথে, পুঁজিপতি সমাজের সাথে, এমনকি দারিদ্রতার সাথেও। গোরার দল যখন গঞ্জে চাল কেনার জন্য প্রবেশ করে তখন সকলেই নিজেদের কোমরে পকেটে হাত দিয়ে দেখে মূলধন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গোনে কত টাকা আছে। জানে না কত টাকা আছে তবু তারা গোনে, প্রতিনিয়ত এ যেন এক অদৃষ্ট হিসাব তারা করে চলেছে। এটুকুই তাদের সম্পদ, তাই সন্তর্পনে মুঠো করে ধরে রাখে অর্থাৎ আগলে রেখেছে কারণ সেটুকু তাদের এবং তাদের সকলের জীবন। তারা সেটুকু মূলধন থেকে একটি পয়সা খরচা করবে না — "এমনকি এক পয়সার লজেন্স, দুটো মুড়ি বিস্কুট, কিংবা বুড়ির মাথার পাকা চুল কিছুই না। স্বাদ আস্বাদ খিদে ভালোবাসাও নয়।"[৯]

আবার গোরাচাঁদের মতোই আর একজন লড়াকু চরিত্রে সাথে আমরা পরিচিত হই গোরাচাঁদেরই সহযাত্রিনী সুবালা নামে এক এসমালগারিনীর পরিচয় পাই। সে-ও বেআইনিভাবে চাল বহনের অপরাধে সাত দিন হাজত বাস করে। তার স্বামী তিন বছর হলো নিখোঁজ সুবালা রিফিউজি কলোনি বাসিন্দা। গোরাচাঁদ তাকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলে ডাকে। তার ছোটো দুটি সন্তান আছে। সে তাদের মুখে একমুঠো ভাত তুলে দেবার জন্য, তাদের সুস্থভাবে জীবনে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একজন মা হয়ে এই কঠিন বিপদসংকুল অসামাজিক পেশাকেই আশ্রয় করেছে। সুবালার মধ্য দিয়ে মাতৃশক্তির প্রকাশ করি। সুবালার এক সময় ট্রেনে গোরাচাঁদকে দেখে মনে হয়েছে উসকো খুসকো ক্ষুধার্ত ছেলে। গোরাচাঁদ ও সেই একই কর্তব্য পালনের জন্য এই ধরনের পেশাকে বেছে নিয়েছে। নিজের জীবনকে বাজিয়ে রেখে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে সে রুচির রোজগার পনেরো সের চালকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য শেষ পর্যন্ত ট্রেনের পাদানিতে নেমে গেল পড়ে — "একগাড়ি লোককে অসহ্য কৌতুহল ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে পা-দানীর শেষ ধাপে নেমে গেল। নিমেষে হারানো পাথুরে খোয়ার স্তুপ যেন জমানো সিমেন্ট। তিন হাত দূরে লাইনের বুক কিসে চাকা ঘুরছে ঘরঘর করে। আধ হাত নিচেই মাটি। গোরার চোখ রক্তবর্ণ, মাথা চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। সারা মুখে ঘাম। হাতে নীল পেশিগুলো যেন ছিঁড়ে পড়বে। চকিতে মুখ বাঁধা চালের ব্যাগ হাতের মধ্যে গলিয়ে পা-দানির শেষ ধাপে ধীরে ধীরে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল আর একটু একটু করে তার দেহটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল গাড়ির তলায়। আস্তে আস্তে উঠে গেল ঠিক চাকার উপরে দুটো বাঁকানো রড ও সংক্ষিপ্ত রেলিং-এর মাঝখানে। চাকার দু-তিন ইঞ্চি উপরে তার একটা লিকলিকে ঠ্যাং ঝুলছে। কোনো রকমে একবার ছুঁতে পারলেই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত বাঘের মতন টুকরো টুকরো করে ফেলবে।"[১০]

গোরা একটা সময় রেলের চাকার গায়ে থুতু ছিটিয়েছে অত্যন্ত রাগে ও ঘৃণায়। তবে এ থুতু সে শুধুমাত্র রেলের চাকার গায়ে দেয়নি, দিয়েছে অপরাধীর মতো বেঁচে থাকা এই সমাজ, এই জীবন-সংসারকে। জীবনকে মৃত্যুর সাথে বাজি রেখেছে পনেরো সের চালকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু তবু সে শেষ রক্ষা করতে পারেনি — "অফিসারের সামনে গোরা, তাদের হিরো এসমালগার তারপর এলো একটা সরু বেত, খুলে দেওয়া হল জামা প্যান্ট। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল চালের স্তুপে তার পনের সেরের ব্যাগ।"[১১] অফিসার গোরাকে প্রশ্ন করে, সে আর এমন কাজ কোনো দিন করবে কি না। গোরাচাঁদ এর কোনো উত্তর দেয়নি। গোরা শক্ত নির্বাক থেকেছে। কারণ গোরা জানে পরিবারের প্রতি এই দায়িত্ব সে কোনোদিনও এড়িয়ে যেতে পারবে না। তখন তার চোখে ভেসে উঠেছে মা ও ভাইবোনের ছবি। পরমুহূর্তেই "বেতের ঘায়ে সপাং সপাং শব্দ এই মানুষের স্তুপটাকে, স্টেশনটাকে, সর্বচরাচরকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে শিউরে তুলল।"[১২] সে পুলিশের বেতের লাঠির শত শত আঘাত সহ্য করে কিন্তু চোখ থেকে এক ফোটা জলও বের হয় না — "উলঙ্গ সারা গায়ে চিতা বাঘের মতো লম্বা দাগ, হাতে জামা আর প্যান্ট। কিন্তু চোখের জল নেই, নাক দিয়ে শুধু সিগনি বেরিয়ে পড়ছে, ঠোঁটের দুই কষে ফেনা। ছায়াটা পড়েছে যেন উলঙ্গ আদিম কিম্ভুতাকৃতি একটা ওত পাতা মানুষের।"[১৩] গোরার কষ্ট দেখে আমাদের চোখে জল না আসে থাকতে পারে না। গোরার এই যন্ত্রণা সহ্য করার অমানুষিক ক্ষমতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পেটের খিদের জ্বালা এবং পরিবারের দায়িত্ব-কর্তব্যের কাছে এই বেতের দেওয়া যন্ত্রণা নিতান্তই নগণ্য। তার মা ও বোন অপেক্ষা করছে তার জন্য কখন সে চাল নিয়ে যাবে। গোরার শূন্য চোখে ভাসছে — "সেই কারখানার রাবিশের জলার ধারে, অন্ধকার আকাশের তলায় দুটো দিশাহারা চোখের অসহ্য প্রতীক্ষা। ঘরে ঘুমন্ত পুতুল, রুগ্ন একটা মানুষ, আর বাইরের অন্ধকারে বোবা মায়ের অপরিসীম তীব্র প্রতীক্ষা।"[১৪] ঘরে অনন্ত প্রতিক্ষারত মা-বোনেদের কথা

ভেবে, তাদের দু-মুঠো অন্নের নিশ্চিত করবার জন্য এবং আগামীদিনে বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছাকে বজায় রাখতে জীবনকে বাজি রেখে এমন সব বিপজ্জনক কাজে গোরাচাঁদ নিজেকে উৎসর্গ করতে দ্বিতীয়বার ভাবেনি।

তথ্যসূত্র :

১. দত্ত জয়িতা, বাংলা ছোটগল্প কালের বৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৪০
২. তদেব, পৃ. ২৩০
৩. দাশ উদয়চাঁদ, দেশ বিভাগ ও বাংলা আখ্যান, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, মে ২০১৬, দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০১৯, পৃ. ১৪০
৪. তদেব, পৃ. ১৪১
৫. তদেব, পৃ. ১৪২
৬. তদেব, পৃ. ১৪৩
৭. তদেব, পৃ. ১৬৯
৮. তদেব, পৃ. ১৭০
৯. বসু ড. নিতাই সম্পাদিত, এসমালগার, গল্প সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সমরেশ বসু। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১৮৫
১০. তদেব, পৃ. ১৮৬
১১. তদেব, পৃ. ১৮৮
১২. তদেব, পৃ. ১৮৯
১৩. তদেব, পৃ. ১৮৯
১৪. তদেব, পৃ. ১৮৯

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

বসু ড. নিতাই সম্পদিত, এসমালগার, গল্প সমগ্র, প্রথম খন্ড, সমরেশ বসু, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৫

সহায়ক গ্রন্থ

দত্ত জয়িতা, বাংলা ছোটগল্প কালের বৃত্ত, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২০
দত্ত জয়িতা, বাংলা ছোটগল্প কালের বৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২
দাশ উদয়চাঁদ, আখ্যান পরিক্রমা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
দাশ উদয়চাঁদ, দেশবিভাগ ও বাংলা আখ্যান, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, মে ২০১৬

....

দুঃখ ও তার অভিভবের উপায় : একটি সাংখ্যীয় সমীক্ষা

প্রসেনজিৎ খাঁ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ , বীরভূম মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় দর্শন জীবনের সঙ্গে যুক্ত। জীবনকে দুঃখমুক্ত করা ভারতীয় দার্শনিকদের লক্ষ্য। ভারতীয় দর্শনের সাংখ্য সম্প্রদায়ও দুঃখ ও তার অভিভবের কথা বলেছেন। বর্তমান নিবন্ধে সাংখ্য দর্শন সম্মত দুঃখের স্বরূপ ও দুঃখের অভিভবের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করার প্রচেষ্টা থাকল। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ তিনপ্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ ও আধিদৈবিক দুঃখ। সাংখ্য মতে দুঃখের অভিভব সম্ভব। তিনপ্রকার দুঃখের অভিভবের তিনপ্রকার উপায় রয়েছে, যথা— দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়, আনুশ্রবিক উপায় এবং ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। আনুশ্রবিক উপায় দৃষ্ট উপায়ের মতোই বিশুদ্ধ ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত। সেই জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তৃতীয় উপায়টাকে সবচেয়ে শ্রেয় বলেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান বা প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ উপায়। সাংখ্য শাস্ত্রে বর্ণিত পঞ্চ বিংশতি তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান লাভ হলে প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান হবে এবং এর ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে। ফলে পরিশেষে দুঃখের চিরকালীন এবং সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটবে।

সূচক শব্দ:

আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ, আধিদৈবিক দুঃখ, আত্যন্তিক নিবৃত্তি, আনুশ্রবিক, তত্ত্বজ্ঞান।

মূল প্রবন্ধ

মানুষ এই জগতে সুখ শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে বাঁচতে চায় ও বাড়তে চায়। কিন্তু এর অন্তরায় হল দুঃখ। ভারতীয় দর্শন জীবনের সঙ্গে যুক্ত। জীবনকে দুঃখমুক্ত করা সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকদের লক্ষ্য। দুঃখের সাময়িক মুক্তি হয় ঔষধ সেবনে। যে মুক্তিতে ভারতীয় দার্শনিকদের আগ্রহ নেই। তাঁরা অর্থনৈতিক দুঃখকে কার্লমার্ক্সের মতো সমস্ত দুঃখের মূল বলেও মনে করেন না। তাঁরা সত্য বা তত্ত্ব সম্বন্ধে অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে সমস্ত দুঃখের কারণ বলে মনে করেন। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তাঁদের পরম লক্ষ্য।

ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং বৌদ্ধ দর্শন দুঃখবাদকেই গ্রহণ করেছেন। ন্যায় মতে প্রমেয় পদার্থের পরিগণনার মতে দুঃখকে গ্রহণ করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনেও সমগ্র জগতকে দুঃখময় বলা হয়েছে। সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, দুঃখময়, স্বলক্ষণ এবং শূন্যস্বরূপ— এটাই বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ।[১] সাংখ্যদর্শনেও সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ— এই গুণত্রয় সমস্ত বস্তুর মৌলিক উপাদান। এদের মধ্যে রজোগুণ দুঃখময় বলে সমস্ত বস্তুর মধ্যেই দুঃখের স্বরূপ নিহিত রয়েছে। সুতরাং জগত দুঃখময় এইরূপ মতবাদ দার্শনিক মহলে প্রসিদ্ধ।[২]

বর্তমান নিবন্ধে সাংখ্যদর্শন সম্মত দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের প্রকারভেদ ও দুঃখের অভিভবের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করার প্রচেষ্টা থাকল।

দুঃখের স্বরূপ:

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর ‘সাংখ্যকারিকায়’ সুস্পষ্টভাবে দুঃখের স্বরূপ নির্দেশ করেননি। তবে সাংখ্যকারিকার অন্যতম টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁর ‘তত্ত্ব কৌমুদী’ নামক টীকাগ্রন্থে সাংখ্যকারিকার প্রথম কারিকা ‘দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ’[৩] ইত্যাদি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুঃখের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন এইভাবে— ‘দুঃখং রজঃ পরিণামভেদো’[৪] অর্থাৎ বাচস্পতির মতে দুঃখ হল রজগুণের পরিণাম বিশেষ। যেহেতু ঈশ্বরকৃষ্ণ ‘দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা’[৫] ইত্যাদি বাক্যে দুঃখের অভিঘাত থেকে তার অপঘাত বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হয় বলে স্বীকার করেছেন সেহেতু দুঃখ বিনাশযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন দুঃখ রজগুণের পরিণাম বিশেষ। রজগুণ নিত্য হওয়ায় দুঃখও নিত্য। তাই দুঃখের বিনাশ সম্ভব নয়। টীকাকারের মতে ‘যদ্যপি ন সন্নিরুধ্যতে দুঃখং তথাপি তদভিভবঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিত্যুপরিষ্টাৎ’[৬] অর্থাৎ

যদিও দুঃখের নিরোধ বা নাশ সম্ভব নয় তবুও তার অভিভব সম্ভব। রজগুণ থেকে পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে আবার দুঃখের রজগুণের পরিণাম প্রাপ্তিকেই দুঃখের অভিভব বলে।

দুঃখের প্রকারভেদ:

সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ'[৭] ইত্যাদি বাক্যে তিনপ্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। বাচস্পতির মতে এই ত্রিবিধ দুঃখ হল— আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ এবং আধিদৈবিক দুঃখ।

শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে আত্মা বলে, এই আত্মার নিমিত্ত যে দুঃখ তার নাম আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুইপ্রকার— শারীর ও মানস। শারীর শ্রেণিভুক্ত আধ্যাত্মিক দুঃখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্য-নিমিত্তং'[৮] অর্থাৎ বাত, পিত্ত শ্লেষ্মার বৈষম্যের ফলে শারীর শ্রেণিভুক্ত আধ্যাত্মিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। মানস শ্রেণিভুক্ত আধ্যাত্মিক দুঃখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'মানসং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ভয়েষ্যা-বিষাদ-বিষয় বিশেষা-দর্শন নিবন্ধনং'[৯] অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ এবং ইষ্ট বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা অদর্শনের ফলে মানস শ্রেণিভুক্ত আধ্যাত্মিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। এইসব দুঃখ আন্তর উপায়ে সাধ্য অর্থাৎ এরা শরীরের ভেতর থেকে উৎপন্ন হয় বলে এদের আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে।

বাহ্য উপায় সাধ্য আধিভৌতিক দুঃখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'মানুষ-মৃগ-পশু-পক্ষি সরীসৃপ স্থাবর নিমিত্ত'[১০] অর্থাৎ মানুষ, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, স্থাবর (ভূমি, পর্বতাদি) নিমিত্ত যে দুঃখ তা আধিভৌতিক দুঃখ। এই প্রকার দুঃখ প্রমাতার মন ও শরীরের বাইরের কোনো কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, এদের বাহ্য উপায়ে সাধ্য দুঃখ বলে।

বাহ্য উপায় সাধ্য আধিদৈবিক শ্রেণিভুক্ত দুঃখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'আধিদৈবিকং যক্ষ-রাক্ষস-বিনায়ক-গ্রহাদ্যাবেশ-নিবন্ধনম্'[১১] অর্থাৎ যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক (বিঘ্নকারী) শনি প্রভৃতি গ্রহস্থান বশত যে দুঃখ হয়ে থাকে তা আধিদৈবিক দুঃখ। এই প্রকার দুঃখও বাহ্য উপায়ে সাধ্য অর্থাৎ শরীরের বাইরের কোনো কারণ থেকে উৎপন্ন হয়।

দুঃখ নিবৃত্তির উপায়:

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় দুঃখের যে তিনটি প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন সেই তিনপ্রকার দুঃখের অভিভব বা নিবৃত্তির তিনপ্রকার উপায়ের কথা প্রথম ও দ্বিতীয় কারিকায় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দুঃখ নিবৃত্তির ত্রিবিধ উপায় যথাক্রমে— i. দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়, ii. আনুশ্রবিক বা বৈদিক উপায়, iii. ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান বা প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। প্রসঙ্গত ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন যে, দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক উপায়ের দ্বারা দুঃখের আংশিক নিবৃত্তি সম্ভব হলেও আধ্যাত্মিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি সম্ভব নয়।

দৃষ্ট উপায়:

দুঃখ নিবৃত্তির দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য তিন প্রকার দুঃখের অভিভাবকের তিন প্রকার দৃষ্ট উপায় আছে যেমন আধ্যাত্মিক দক্ষিণ অন্তর্ভুক্ত শরীর দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বৌদ্ধগণ দ্বারা উপরদৃষ্ট শত শত সহজসাধ্য উপায় আছে যেমন দুঃখ নাসের জন্য বৈদ্য গনের পরামর্শে ওষুধ সেবন করলে ব্যাধি দূরীভূত হয়ে দুঃখের নাচ ঘটে আবার মানুষ দুঃখ প্রতিকারের জন্য সহজসাধ্য উপায় হল স্ত্রী পানীয় ভজন বস্ত্র অলংকার প্রভৃতি বিষয়ের প্রাপ্তি আদি ভৌতিক দুঃখ নাসের জন্য নীতি শাস্ত্রে কুশলতা অর্জন নির্জন স্থানে বসবাস ইত্যাদি সহজসাধ্য ব্যবহারিক উপায় আছে। একইভাবে আধি দৈবিক দুঃখ নিবৃত্তের জন্য মনি মন্ত্র ঔষধির ব্যবহার রূপ নানা সহজসাধ্য উপায় আছে।

পূর্বপক্ষী মীমাংসকগণ বলেন দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা দুঃখের নাশ হয়। এই রূপ পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন বিবিধ দৃষ্ট উপয়ের দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হলেও ঐগুলি দুঃখ নিবৃত্তির আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক উপায় নয়। এখন প্রশ্ন হল দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলতে কি বোঝায়? বাচস্পতির মতে 'একান্তো দুঃখনিবৃত্তেরবশ্যম্ভাবঃ'[১২] অর্থাৎ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হল দুঃখের অবশ্যম্ভাবী নিবৃত্তি। অত্যন্ত নিবৃত্তি হল 'অত্যন্তো দুঃখস্য নিবৃত্তস্য পুনরনুৎপাদঃ।'[১৩] অর্থাৎ অত্যন্ত নিবৃত্তি হল নিবৃত্ত দুঃখের পুনরায় উৎপত্তি না হওয়া। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে দুঃখের সাময়িক আংশিক নিবৃত্তি দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা হলেও চিরকালীন ও সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না।

আনুশ্রবিক উপায়:

'অনুশ্রব' শব্দের অর্থ বেদ। গুরুর পাঠ হতে এটা শোনা যায় বলে একে অনুশ্রব বলা হয়। এই আনুশ্রবিক বা বৈদিক উপায়ে দুঃখের নাশ হয় বলে পূর্বপক্ষী মীমাংসকগণ মনে করেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ আনুশ্রবিক শব্দটি কেবলমাত্র যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

তত্ত্বজ্ঞান অর্থে নয়। যেমন— বেদে জ্যোতিষ্টোম যাগের কথা বলা হয়েছে। মীমাংসক মতে এই যাগ করলে শত্রু বধ হয় এবং তার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐতান্ত্রিক নাশ হয়। বেদে এইরকম অনেক যাগ উল্লিখিত আছে। শ্রুতিতে বলা হয়েছে 'স্বর্গকামো যজেত' অর্থাৎ স্বর্গকামনায় যাগ করবে। তবে সুখ স্বর্গপদবাচ্য হলেও যেকোনো স্বর্গপ্রাপ্তিতে সুখ আসে না। যেমন— 'পুত্রস্তে জাতঃ কন্যাতে গাভনী' এই বাক্যে শ্রবণযোগ্য সুখে দুঃখের মিশ্রণ থাকায় তা স্বর্গ নয়, ধারাবাহিক বা দুঃখবর্জিত সুখই হল স্বর্গ। এই স্বর্গ কর্ম জন্য হলেও ক্ষয়ী নয়, স্বর্গ হল অক্ষয়। এইরকম বৈদিক উপায়ের দ্বারা মীমাংসক মতে দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নাশ ঘটে।

এইরূপ পূর্বপক্ষীর উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন—

'দৃষ্ট বদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয় যুক্তঃ'[১৪]

অর্থাৎ দৃষ্ট উপায়ের মতো আনুশ্রবিক উপায়ও অবিশুদ্ধি ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে বৈদিক যাগাদি ক্রিয়া অবিশুদ্ধিযুক্ত। কারণ সোমযাগে পশুবিজাদি বধ বিহিত। পশুবিজাদি বধ হিংসার নামান্তর, তা পাপজনক। অর্থাৎ সোম যাগাদিও পাপজনক। সুতরাং যাগাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্যলাভ হয় সেই পুণ্য বিশুদ্ধ নয় কিঞ্চিত পরিমাণে হলেও তা পাপযুক্ত বলে অবিশুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে পঞ্চশিখাচার্যের একটি বিখ্যাত উক্তি হল—

'স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ ইতি।'[১৫] অর্থাৎ যাগাদি ক্রিয়া স্বল্প সঙ্কর সপরিহার এবং সপ্রত্যবমর্ষঃ। যাগাদি ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন প্রধান অপূর্ব পুণ্যের সঙ্গে স্বল্প পরিমাণ পাপ মিশ্রিত থাকে। তাই যাগাদি ক্রিয়া স্বল্প সঙ্কর। পশুবিজাদি বধ জনিত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কিছু পরিহার করা যায় বলে তা সপরিহার। এবং অসাবধানতার ফলে যাগাদি ক্রিয়া পশুবিজাদি বধের ফলে উৎপন্ন পাপ নাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করা হলে যে অনর্থ বা পাপ হয় তা সহজে সহ্য করা যায় বলে তা সপ্রত্যবমর্ষ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যাগাদি ক্রিয়া জন্য যে স্বর্গ তা অবশ্যই দুঃখমিশ্রিত।

বৈদিক উপায় সরাসরি ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত না হলেও ক্ষয় ও অতিশয় ফলরূপ স্বর্গের জনক বলে ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত। যা ভাবকার্য তা ক্ষয়ী, যেমন— ঘট। স্বর্গ ভাবকার্য বলে তা ক্ষয়ী।

বৈদিক উপায় অতিশয়যুক্ত। যেমন— শ্রুতিতে বলা হয়েছে, জ্যোতিষ্টোম যাগের দ্বারা স্বর্গলাভ এবং বাজপেয় যাগের দ্বারা স্বর্গলোক রাজত্ব লাভ হবে। এ বিষয়ে 'স্বর্গকামো জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' এবং 'স্বরাজ্যকামো বাজপেয়েন যজেত' এই শ্রুতিই প্রমাণ। এখানে বলা হচ্ছে— পর সম্পদ উৎকর্ষ দেখে অল্প সম্পদ বিশিষ্ট ব্যক্তির যেমন দুঃখ হয়, তেমনি স্বর্গলোকে রাজত্বকারী ব্যক্তিকে দেখে স্বর্গকামী ব্যক্তির দুঃখ হয়, তেমনি স্বর্গলোকে রাজত্বকারী ব্যক্তিকে দেখে স্বর্গকামী ব্যক্তির দুঃখ হয়। তাই বৈদিক উপায়ে ফলের অতিশয় বা উৎকর্ষ, অপকর্ষ আছে বলে তা অতিশয় যুক্ত। এইভাবে ঈশ্বরকৃষ্ণ তার সাংখ্যকারিকায় পূর্বপক্ষী মত খণ্ডন করে বলেন দৃষ্ট বা আনুশ্রবিক কোনো উপায়েই দুঃখের আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক নিবৃত্তি সম্ভব নয়।

বাজাব্যভজ্ঞবিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান:

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় দ্বিতীয় কারিকায় বলেছেন যে দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক এই দুটি উপায় ভিন্ন অন্য যে উপায় সেটি সব থেকে শ্রেয়। এবং এই উপায়টি হল ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান বা প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান। সাংখ্য শাস্ত্রে বর্ণিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান লাভ হলে প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান হবে এবং এর ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে। পরিশেষে দুঃখের চিরকালীন এবং সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কি সম্ভব? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন 'ন চ দুঃখান্তরোৎপাদঃ'[১৬] ইত্যাদি। একথা ঠিক যে, পুরুষের বিবেকজ্ঞান হলে প্রকৃতির বিলুপ্তি হয় না। তবুও পুরুষের দুঃখান্তরের উৎপত্তি হয় না। তখন প্রবৃত্তি থাকলেও প্রয়োজন না থাকায় প্রকৃতির প্রবৃত্তি থাকে না। মূল কারণ প্রকৃতির প্রবৃত্তি না হওয়ায় দুঃখ রূপ কার্যের উৎপত্তি হয় না।

তথ্যসূত্র:

১. 'সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যমিতি' – বৌদ্ধ দর্শন সর্বদর্শন সংগ্রহ

২. সাংখ্য দর্শনের বিবরণ, শ্রী বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৫

৩. সাংখ্যকারিকা-১, ঈশ্বরকৃষ্ণ, পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু সম্পাদিত, পৃ. ৪

৪. সাংখ্য তত্ত্বকৌমুদী, তদেব, পৃ. ৫

৫. সাংখ্যকারিকা-১, তদেব, পৃ. ৪

৬. সাংখ্যকারিকা, সাংখ্য তত্ত্বকৌমুদী, তদেব, পৃ. ৫

৭. সাংখ্যকারিকা-১

৮. সাংখ্যকারিতা ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, পৃ. ৫

৯. তদেব

১০. তদেব

১১. তদেব

১২. তদেব

১৩. তদেব

১৪. সাংখ্যকারিকা-২, ঈশ্বরকৃষ্ণ

১৫. সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী, তদেব, পৃ. ১৩

১৬. তদেব, পৃ. ১৪

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৮৮৩।

২. সাংখ্যসূত্র, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশনা, কলিকাতা, ১৯৯৭।

৩. ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, সাংখ্যদর্শনের বিবরণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৮৪।

৪. ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ, সাংখ্যদর্শন, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬৬।

৫. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৯৪।

৬. ঘটক পঞ্চানন, সাংখ্যদর্শন (১), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

৭. ভট্টাচার্য, শ্রী দীনেশচন্দ্র ষড়দর্শনযোগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ২০০৬।

৮. সায়ণ মাধবীয়, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ২০১৪।

....

অবিভক্ত মেদিনীপুরের ঐতিহ্য পটচিত্র ও পটুয়া সম্প্রদায়: একটি পর্যালোচনা

প্রভাস মাইতি
ইতিহাস বিভাগ , বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ-

শিল্প আন্দোলনের ইতিহাসে লোকশিল্প এক অতি পরিচিত নাম। লোকশিল্প যে মানব সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই লোকশিল্পের অন্যতম ধারাটি হল পট চিত্র। পট চিত্র ও পটুয়াদের নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তথাপি এক অনমনীয় তাগিদেই আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা। পট চিত্র ধারার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বহু গবেষক 'স্থানুবত' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। সে কথারই সুর খুঁজে পাওয়া যায় মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের পট চিত্রকর ও কালীঘাটের পট চিত্রকরদের কথায়। তারা কেবল 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' পট রচনা করেন বা করে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় 'মরা গাঙেও বান ডাকে'। 'স্থানুবত'অবস্থার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় চলমানতার উৎস। সম্প্রতি ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নবীনতম ধারাটি হলো 'ওরাল হিস্ট্রি'বা 'মুখের কথায় ইতিহাস রচনা'।এই ধারায় তাই একে একে ধরা দিচ্ছেপট -পটুয়া-পটগান প্রভৃতি। তার মাধ্যমেই ধরা পড়ছে পটুয়া জীবন বোধের ইতিবৃত্ত।তাই আজ গ্রাম বাংলার পট চিত্র সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে।এভাবেই পটচিত্র চর্চা ও চর্চারক্ষেত্র ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য পরম্পরাগত লোকশিল্পের এই বিশেষ ধারাটির ব্যাপ্তি পর্যন্ত প্রসারিত হবে।

সংকেত শব্দ :

পট, পটুয়া, মেদিনীপুর, নয়াগ্রাম, আন্তর্জাতিক, গবেষণা।

মূল প্রবন্ধ -

মেদিনীপুরের পটচিত্র এক ঐতিহ্যবাহী ধারা। 'পট' শব্দটি বেশিরভাগ গবেষকের মতে সংস্কৃত 'পট্ট' বা 'পট' জাত।'পট্ট' বা পট কিন্তু একই অর্থ বহন করে না, যদিও অর্থের মধ্যে একটা মিল রয়ে গেছে। লোকসংস্কৃতিতে পটের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। পট এমনই একটা লোকশিল্প, যেখানেচিত্র ও সংগীতের আশ্চর্য বন্ধন ঘটে। 'প্রকৃতপক্ষে, এমন লোকশিল্প বাঙালির জীবনে খুব কমই আছে'।[১] যারা পটচিত্র আঁকেন এবং পট দেখিয়ে গান করেন তাদেরকে 'পটুয়া' বলা হয়। 'এই পটুয়া সম্প্রদায় কত প্রাচীন এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না'।[২]বানভট্টের 'হর্ষচরিত' ও বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে পট প্রদর্শনের বিস্তৃত চিত্র রয়েছে। বৌদ্ধ আমলেই জড়ানো পট তিব্বত, জাভা, বোরনিওপ্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'তারপর দেখা যায়, হিন্দু আমলে পটুয়ারা কিভাবে পৌরাণিক কাহিনীর পট এঁকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতো'।[৩]

'বাংলাদেশে মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলামী ধর্মপ্রচারকদের আগমন ঘটে ঠিক যেমন ব্রিটিশ শাসনের পূর্বেই ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাব ঘটে এদেশে। এইসব পীরগাজিরা বাঙালি জনসাধারণের মধ্যেইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তৎকালীন দেশীয় প্রচার পদ্ধতির প্রচলিত মাধ্যম 'চিত্র প্রদর্শন কলার' সাহায্য নিয়েছিলেন। এদেশে তারাই প্রথম মুসলমানি পটের প্রচলন করেন'।[৪]আধুনিক যুগে নানা পৌরাণিক পটের সঙ্গে রসাস্বাদ পরিবর্তনের জন্য নানা সামাজিক কাহিনীর পটও যুক্ত হয়েছে যেমন- ডাক্তারবাবু খুন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, স্টিমার ডুবি, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।পদ্ধতি কিন্তু সেই পুরাতন গান গেয়ে ছবিগুলিকে জীবন্ত করে তোলা। 'পটুয়া সংগীতের এই বিষয়বৈচিত্রের মধ্যে ৪২ এর আন্দোলনের সময় হঠাৎ উলকার মত মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছিল 'সাহেব বট' বা 'ইংরেজের পট'। মানুষের হৃদয়ে এগুলি গভীর আবেদন সৃষ্টি করেছিল'।[৫] পট যে কত ধরনের আছে তা অনেকেরই অজানা। পুঁথীর পট চিত্র বা দেওয়ালের 'ফ্রেস্কো'এক ধরনের পট। চণ্ডীপট, মনসা পঠ, শিবপট, যমপট, গৌরিপট, ভগবতীপট, চাষপট প্রভৃতি নানা ধরনের পটের পাশাপাশি বিশিষ্টতা নিয়ে বিদ্যমান 'কালীঘাট পট' ও। আরও আছে আধুনিক পট- যার সূত্রপাত ঘটে ইংরেজ আগমনের পর থেকে এবং

যা একেবারে সাম্প্রতিকতম প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত। আমার স্থান বিশেষে পট কে ভাগ করা হয়ে থাকে, যেমন বীরভূমের পট, মেদিনীপুরের পট, কালীঘাটের পট। 'গানের দিক থেকেও পটকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে'।[৬]

মেদিনীপুরের পট বাংলার পটুয়া সমাজে বিষয় বৈচিত্রে অনন্য। তবে এটা সত্যি যে, এই পটুয়ার হিন্দু, মুসলিম, এমনকিখ্রিস্টীয় পট একে ভারতের মাটিতে এক নতুন ধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টান্ত হয়ে আজও বর্তমান। মেদিনীপুরের পটুয়াদের ছয়টি শ্রেণী রয়েছে-বসন্তরি, সাতকুড়ি,আটকুড়ি,চৌপলকাটা, কাটাকাটা এবং বেজো। বসন্তরীরা পট আঁকা, গান করা ছাড়া মূর্তিওগড়েন, আটকুড়ি ও সাতকুড়িরা মূর্তি তৈরি ও পুতুল গড়েন, চৌপলকাটারা তৈরি করেন দেশি লণ্ঠন। কামারের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন 'কাটাকাটা'রা। এছাড়া চাষের কাজে তুকতাক ঝাড়ফুক থেকে শুরু করে রিক্সা টানা, বাস-লরি তে কাজ সব দিকেই তারা এখন নিযুক্ত। পেটের ভাতের জন্যই ঘরামির কাজ, জাল বোনা কোন কাজেই তারা পিছপানন।'তবুও, পট দেখানো বা পট গান করা যে তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই'।[৭]

'মেদিনীপুরের সুতাহাটা থানার আকবরপুর, চৈতন্যপুর, কেশবপুর, খেজুরির দেউলপোতা, দাসপুর থানার বাসুদেবপুর ও নাড়াজোল, নন্দীগ্রাম থানার নানকারচক, কুলাপাড়া, কুমিরমারা, তমলুক থানার সিরুই, পাঁশকুড়ার কেশবপুর ও মাগুরা, পিংলা থানার নয়াগ্রামে প্রধানত চিত্রকর্দের বাস'।[৮]এইসব পটচিত্র মূলত রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত। এই পটের অংকন পদ্ধতি ও অভিনব। তুলোর তুলিতে নানাবিধ গাছ-গাছড়ার ফল, ফুল ও পাতা থেকে রস সংগ্রহ করে রং তৈরি করে পট গুলি মোটা রেখায় চিত্রিত হয়। নাড়াজোল ঘরানার দোসর হল দাসপুর থানার বাসুদেবপুর। এই ঘরানার প্রধান গুণ হল বিরাটত্ব। বিরাট পটভূমির উপর বহু মানবমূর্তির সমাবেশে গড়ে ওঠে গল্পের এপিসোড বা দৃশ্য। নীল-বাদামি প্রলেপের উপর সাদা রংয়েরধীর, সযত্নরচিত অলংকরণ দর্শকের প্রাণময়তা তাকে সম্মোহিত করে। 'চেতুয়া-বাসুদেবপুরে 'পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় সংগ্রহশালায়'এ ঘরানার বহুদিনের পুরাতন অনেকগুলিপট আছে'।[৯]

মহিষাদল থানার ঠেকুয়াচকে পাই দু'ধরনের পট।আহমদাবাদের ধাঁচে আঁকা পটও তৈরি হতো এখানে। ভূষণ, কালিপদ, সুরেন, বসন্ত এবং গুণধর চিত্রকরেরা ছিলেন দক্ষিণী ধারার বাহক। গুরুসদয় দত্তকে তারা পট সংগ্রহে অনেক সাহায্য করেছিলেন। এই গ্রামেই সম্পূর্ণ অন্য এক ধরনের পট তৈরি হত। এইসব পটের কয়েকটি নমুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়ামে রয়েছে।সবগুলি পটের মধ্যে বেহুলা পটটিই 'ঠেকুয়া ঘরানার' উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পিংলা থানার নয়াগ্রাম আর মালিগ্রাম 'ঠেকুয়া ঘরানার' দোসর। নাড়াজোল এর পটে আছে জমজমাটি রঙের উজ্জ্বল আর ঠেকুয়া-পিংলার পটে আছে হালকা ভাঙা রঙের প্রলেপ। 'সমুদ্রের নিকটবর্তী আহমদাবাদ গ্রামে বীরেন চিত্রকরের তৈরি আহমদাবাদ ঘরানার আর্ট উল্লেখ্য। এই গ্রামের ঘরানায় উজ্জল নীল রং এর উপর সাদা বুটির কাজ।তবে এ জেলার পটুয়ারা হলো লোকোমুখি'।[১০]

'আশুতোষ চিত্রশালার' পট চিত্র সংগ্রহ অবলম্বন করে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় একটি ইংরেজি নিবন্ধ লিখেছিলেন।সেই নিবন্ধে তিনি মেদিনীপুরের পটের কথাও বলেছেন।মেদিনীপুরের পটের প্রসঙ্গে বলতে গিয়েতিনি বলেন যে, এই জেলার জড়ানো পটেও এক একটি ফলক ভিড়ে পরিপূর্ণ, সেই সঙ্গে দেখা যায় বৃন্তিত অলংকরণ। এই জড়ানো পটের প্রথম ফলকে আঁকা দেবীবা দেবীর রূপ বলিষ্ঠভাবে চিত্রিত এবং বিরাটত্বে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।এই পটের এক আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য হল, বর্তনা বা Shading এর ব্যবহারযা ঘোড়া, হাতি ও গরুর ছবিতে খুবই স্পষ্ট।যেহেতু দেবপ্রসাদ ঘোষ রূপনির্মিতির মধ্যেই পটশৈলীর বিচার সীমাবদ্ধ রেখেছেন, সেহেতু হয়তো এই প্রকরণগত দিকটির উল্লেখ করেননি। 'অথচ মানতেই হবে, এই একটি চিত্রলক্ষণ মেদিনীপুরের পটকে বাঁকুড়া বা বীরভূমের পট থেকে অনেকখানি ভিন্ন করে তোলে'।[১১] স্থানের পরিবর্তনে পটের প্রকৃতিতেও বিরাট পার্থক্য ঘটে। বীরভূম জেলার ইটা-গড়িয়া, পাকুরহাস, সাতপলসা প্রভৃতি গ্রামে পটের ঘরানার সঙ্গে মেদিনীপুরের পটুয়াদের অনেক তফাৎ। মেদিনীপুরের চিত্রধারার সঙ্গে যেমন কালীঘাটের চিত্রধারার একটা মিল আছে, তেমনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার রীতির সঙ্গে মিল আছে মেদিনীপুরের।আসলে মেদিনীপুর, হাওড়া, কালীঘাটের পটুয়াদের আত্মীয়রাই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বসতি স্থাপন করেছেন। 'মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া, গোগ্রাস-কেশবগড়, চৈতন্যপুর, আকুবপুর, নাড়াজোল প্রভৃতি অঞ্চলে পটুয়ারা এক সময়ে যথেষ্ট খাতিমান ছিলেন'।[১২]

অবশ্য জীবনযাত্রা, সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্মাচরণে সব জায়গার পটুয়াদের সঙ্গেই অল্পবিস্তর মিল আছে বলেই মনে হয়। চলমান লোকসংস্কৃতির কোল থেকে বিলুপ্তপ্রায় 'সাহেবপট' এর গানকে আবিষ্কারের পশ্চাতে এক সাহেবের অবদান আছে। তিনি হলেন ডেভিড

জে. ম্যাক্কাচ্চন।মৃত্যুর সামান্যপূর্বে মোটামুটি ভাবে তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন 'The Patuas and the Patua songs of Bengal'এর পান্ডুলিপি।

মেদিনীপুর জেলার পরাধীনতার জালা ও স্বাধীনতার জন্য জীবনপন লড়াই-এর ভার সানন্দে নিয়েছিল পটুয়া সম্প্রদায়ও। পুরাতন পটুয়া দের কাছে এবং ম্যাক্কাচ্চন এর বই থেকে জানতে পারা যায় যে, ৪২-এর আন্দোলনে জোর করে 'সাহেবপট' বন্ধ করে দেয়া হয় এবংযারা দেখাবে তাদের শাস্তি দেবার ভয়ও দেখানো হয়। ফলে, পটুয়ারা এই পটের গান বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তারা পট লুকিয়ে ফেলে। তৎকালীন সরকার ও ওই পট সংগ্রহ করে নষ্ট করে দেয়। সাহেবপটের গান সংগৃহীত হয় ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে।এই গান তমলুক মহাকুমার নানকারচক গ্রামের মতিলাল চিত্রকর-এর কাছ থেকে ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন ও সুহৃদকুমার ভৌমিক মহাশয় সংগ্রহ করেছিলেন। ৪২-এর আন্দোলনের সময় ধর পাকর শুরু হতেই গানের ভাষা রূপান্তরিত হয়ে যায়। ডাকাতের পট যা সম্ভবত চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক যুগল কিশোরের কাহিনীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়। তবে সাহেব পটে যে সামান্য ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে ইংরেজরা আমাদের দেশে যে অত্যাচার করছে তার একটা সাধারণ বিবরণ। সিপাহী বিদ্রোহ, নীলচাষ ও তসর ব্যবস্থা, চুয়াড় বিদ্রোহ ইত্যাদি। এ বিষয়ে সুধাংশু কুমার রায়ের অভিমত হলো 'এক জাতীয় ডাকাতের পট ছিল, তাই পরে সাহেব পটে রূপান্তরিত হয়েছে। ডাকাতরাই রূপান্তরিত হয়েছে চুয়াড় বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে চরমপন্থী বিদ্রোহীরূপে। 'ডেভির ম্যাক্কাচ্চন এর ইচ্ছা ছিল সাহেবপট গানের ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলিকে সংগ্রহ করা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক উপাদান গুলিকে বার করা এবং এ বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ প্রবন্ধ রচনা করা। আকস্মিক মৃত্যু এই ভারততত্ত্ববিদ কে গ্রাস না করলে হয়তো এ বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম'।[১৩]

পটচিত্রকলার গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছে শৈলী বিচারকে যে কেবলমাত্র রেখা, রং, রূপবন্ধন ও রূপভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, একথা ভাবার কারণ নেই। 'বিনয় ঘোষ পটুয়া জীবনের সমাজ- নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরেছেন'।[১৪] তার একটি হল,বাংলার গ্রামীণ পটিদার বা পটুয়ারা সব জেলা বা অঞ্চলে পটুয়া নামে পরিচিত নন। স্থানভেদে পটুয়ারা দীর্ঘদিন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীভেদে তাদের চিত্রশৈলী যে ভিন্ন ভিন্ন হবে কোন সন্দেহ নেই।অঞ্চলভেদে পটুয়াদের সংস্কৃতি ভেদও বিনয় ঘোষ চিহ্নিত করেছেন। বিষয়ভাবনা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পটশৈলীর ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মেদিনীপুরের সাহেবপটের সঙ্গে কৃষ্ণলীলা পটের তুলনা করা হয়। সেখানেও দেখা যাবে বিষয়ভেদে শৈলীভেদ কতখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।শৈলীবিচারকে আরও নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞাননির্ভর করে তুলতে হলে আঙ্গিকগত বিচারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এই আঙ্গিক আবার অনেকক্ষেত্রেই ভৌগোলিক পরিস্থিতির দ্বারা বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়। 'আবার রঙের তারতম্য পটের শৈলীনির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে'।[১৫]

বর্তমানে মেদিনীপুরের পটচিত্র বিশেষ করে পিংলার নয়াগ্রামের পটচিত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে পিংলার নয়াগ্রামের পট বিক্রি হচ্ছে। পটুয়ারা আজ এক বিলীয়মান সম্প্রদায়, সম্ভবতই পটশিল্পও। তবুও তারা এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন এবং মেদিনীপুর জেলার নানা গ্রামে পট-শিল্পের শেষ প্রদীপটি জেলে রেখেছেন।তাদের কাছে রয়েছে বহুঘরানার ঘরোয়া কথা, পূর্বপুরুষদের নাম, কাহিনী ও ইতিহাস।যামিনী রায় বলেছিলেন 'পৃথিবীর বাকি সব জায়গাতেই প্রাগৈতিহাসিক ছবি লুপ্ত হয়ে গেছে, পটুয়াছবি সম্পূর্ণ মরেনি'। পিংলার নয়াগ্রামের পট সারা ভারত সহ পৃথিবীর শিল্পপ্রেমী মানুষদের কাছে নতুন আবেদন তৈরি করেছে যা হয়তো আগামী দিনের গবেষকদের কাছে নতুন পথ খুলে দেবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন লোকাল ট্রেনে এবং সরকারি অফিসের দেওয়ালে পট চিত্র আঁকা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১.ঘোষ, বারিদবরণ, পট, পটুয়া পটগীতি, জিজ্ঞাসা এজেন্সি লিমিটেড, মে, ১৯৯২, পৃ. ১।

২.পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৩.ভৌমিক, সুহৃদয় কুমার, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের পটুয়া (প্রবন্ধ)।

৪.রায়, সুধাংশুকুমার, পটশিল্পের ঘরানা (প্রবন্ধ), তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৯২।

৫.ভৌমিক, সুহৃদকুমার, পূর্বোক্ত।

৬.ঘোষ, বারিদবরণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

৭.ঘোষ, বারিদবরণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৮.Roy, Sudhangsu Kumar, The Artisan castes of West Bengal and their Craft, p.70; এবং দে, কৃষ্ণানন্দ: লোককান্ত মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৫, পৃ. ২২।

৯.রায়, প্রণব, পটশিল্প ও পটিদার সম্প্রদায় (সচিত্র), লোকশ্রুতি, অক্টোবর - ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ।তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১০.রায়, সুধাংশুকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-১০০।

১১.Ghosh, D.P, An Illustrated Ramayana Manuscript of Tulsidas and Pata of Bengal, Journal of the Indian society of Oriental art, Vol. 13, 1945, PP. 135-136.

১২.ঘোষ, বারিদবরণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

১৩.ভৌমিক, সুহৃদকুমার, পূর্বোক্ত।

১8. Ghosh, Binoy, Traditional Arts and crafts of Bengal, Calcutta, 1981, PP. 75-85.

১৫.ভট্টাচার্য, অশোক, পটচিত্র শৈলী বিচার (প্রবন্ধ), লোকশ্রুতি১০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদ, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ৮৯-৯০।

....

রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিল চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর

রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা
সহকারি অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সারসংক্ষেপ -
এই নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষদের সুখ-দুঃখের কথা, প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে এক দুঃসাহসিক লড়াই-সংগ্রামের ইতিবৃত্তের কথা। যারা শোষণ-শাসন-দমন পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতি নিয়ত বাঁচার লড়াই জারি রেখেছে। এই রকমই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এই কাহিনীর সূত্রে পাওয়া যায়। স্বাধীনোত্তর কালে যারা সংঘবদ্ধভাবে চোট্টির নেতৃত্বে শাসন-শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে পাল্টা লড়াই গড়ে তুলেছে। শোষণ মুক্তির লড়াই জারি রয়েছে। শোষণমুক্ত সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার কাজে সামিল হয়েছে। কোন কিছুর কাছেই অসহায়ভাবে মাথা নত না করে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছে। কোন প্রতিকূলতায় তাদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। জীবনপণ করে তারা লড়াইকে জারি রাখে। এইভাবে আজও ওরা লড়াই সংগ্রাম করেই বেঁচে রয়েছে। চোট্টি ছিলেন সেদিনের সেই আন্দোলনের পুরোধা ও নেতৃস্থানীয়। এই নিবন্ধে চোট্টি ও তার সমাজের মানুষদের লড়াই সংগ্রামের কথায় উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

সূচক শব্দ -
ক্ষেতমজুর, জোতদার-মহাজন, ঠিকাদার, পাট্টা, চক্রবৃদ্ধি সুদ ও বেঠবেগারি, চোট্টি, তীরথনাথ, চাঢা (লালা) ইত্যাদি।

প্রাককথন -

বহুকাল ধরে ছোটনাগপুর অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসী গ্রামগুলোতে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস। জীবন-জীবিকা সংস্থানের স্বপ্ন দেখিয়ে এক সময় যাদের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে কৃষি খামারে নামিয়ে আনা হয়। তারপর থেকেই তাদের শাসন-শোষণ-ধর্ষণ ও নানা জুলুমবাজির শিকার হতে হয়। এককথায় আদিবাসীদের সহজ সরলতার সুযোগ নিয়ে ভুল বুঝিয়ে বেঠবেগারি দিতে বাধ্য করা হয়।

আদিবাসীদের দিয়ে কাজ করানো বৈজ্যনাথের বেশি পছন্দ। আদিবাসীরা অবিশ্বাস্য রকম কম মজুরীতে কাজ করে। খ্যাঁচাখেঁচি পছন্দ করে না। যেমন কথা দেয় তেমন কাজ করে দেয়।

আদিবাসীদের ঋণে জড়ানো খুব সোজা। কাগজে একবার টিপ দিলে ওরা জন্ম জন্ম ধরে বেঠবেগারী দিয়ে চলে। অবশ্য একথা অন্তজ্যদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।[১]

এইভাবে বংশ পরম্পরায় শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা করাটা এরা দিনের পর দিন মেনে নিতে পারে না। এখান থেকেই সমস্যার শুরু। আর তা দিনের পর দিন চলতে থাকলেই ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখা দেয়। সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। লড়াই ভিন্ন বাঁচা যায় না। বাঁচতে গেলে প্রতি পদে পদে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। এইভাবেই তারা আজও বাঁচার লড়াই জারি রেখেছে।

কথন

দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বাধীনতার এত বছর পরেও এদেশে জুলুমবাজি বন্ধ করা গেল না। আজও স্বাধীন দেশে কখনো রাস্তা গড়ার নাম করে, কখনো বাঁধ নির্মাণের নামে, কখনো শিল্প স্থাপনার নাম করে, কখনো মূর্তি প্রতিষ্ঠার নামে, কখনো উন্নয়নের নাম করে আদিবাসীদের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাই আদিবাসীরা আজও –

কোথাও শান্তিতে থাকতে পায় না কেন ? যত নির্জন জায়গাতেই যাক না ও, সেখানে ঠিক কিছু না কিছু বেরুবে মাটির নিচ থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গড়ে উঠবে একটা মস্ত জনপদ।[২]

আর তখনই উচ্ছেদের চক্রান্ত শুরু হয়ে যায়। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। বাস্তুহারানোর যন্ত্রণা তাদের তাড়িয়ে ফেরে। এভাবে তাদের পৃথিবীটা ছোট হতে হতে আরও ছোট হয়ে যায়। পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দকৃত ছোট জায়গাতেই কোনরকমে তাদের ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হয়। ---

চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নেই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতলভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে।[৩]

আজও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি দেউচা পাঁচামিতে আদিবাসীদের সপ্ত পুরুষের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে কয়লা খনি স্থাপণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে। এ থেকেই বোঝা যায় যেন তেন প্রকারে উন্নয়নের নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদ আর নিধনই যেন রাষ্ট্র নেতাদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যুগযুগান্তর কাল ধরে আদিবাসী মানুষদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়ে থাকে। তা থেকেই একদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

আর আদিবাসীরা রুখে দাঁড়ালেই পুলিশ প্রশাসন তৎপর হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাণ্ডব চালানো হয়। মিথ্যা মামলা থেকে শুরু করে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উপর পাশবিক অত্যাচার কিছুই বাদ থাকে না। পুরুষশূন্য গ্রামগুলোতে এই সুযোগে ভূমির মালিকেরা আদিবাসীদের জমিগুলো জোরপূর্বক জবর দখল করে নেয়। ভূমির অধিকার সহ সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়ে ভূস্বামী লালারা বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে। ঋণের জালে জড়িয়ে বেগারি দিতে বাধ্য করে।

'মহাজন', 'সুদ' ইত্যাদি শব্দ মুন্ডাদের কাছে খুবই ঘৃণ্য। বড়ই দুঃখের কথা। মহাজনের কথা মত কাগজে টিপছাপ দিয়ে ওরা সুদের জালেই জড়ায়।[৪]

এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস! একবার কোন রকমে টিপছাপ খতে সই করিয়ে নিতে পারলেই কেল্লাফতে। তখন বংশানুক্রমে বেগার পরিশ্রম দিতে বাধ্য করা হয়।

এই অন্যায় জুলুমবাজির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়। পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কেউই পাশে এসে দাঁড়ায় না। হাজার প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাদের বাঁচার লড়াই চালিয়ে যেতে হয়।

তীরথনাথ দারোগাতে এককাট্টা। দারোগা এখনই যদি আর্জি দেয়, তবে কিছু খয়রাতি মিলে। তাহলে তীরথনাথ বেঠবেগারি খতে ই-গ্রামটা বাঁধতে পারে না।[৫]

এ থেকে বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হয় না যে কেউই আদিবাসীদের ভালো চায় না। তাই সব সময় তাদের দাবিয়ে রাখা হয়। কিছুতেই যেন মুক্তি না মেলে। সুযোগ পেলেই আদিবাসীদের টিপছাপ খতে সই করিয়ে বেগার পরিশ্রম দানে বাধ্য করা হয়।

আদিবাসীদের সমস্ত কিছুর উপর সে ভূমিই হোক আর নারীই হোক অসৎ জোতদার জমিদার মহাজনেরা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নেওয়ার জন্য। তাদের বিশ্বাস আদিবাসীরা একবার জমি চাষের স্বাদ পেলে আর রক্ষে নেই। কেউ আর লেবারের কাজে তাদের লাগাতে পারবে না। এমনিতে মজুরী কম তার ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো বেঠবেগারি তো আছেই। কোন এক সময় কোন কারণে কর্জ নিয়ে থাকলে বেঠবেগারি দেওয়াটা এক অমোঘ নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়।

এই যে আশেপাশে দেখছেন সাঁওতালরা কাজ করছে -- জন কতক উপু হয়ে হাত জোর করে বসে আছে, এরা সব হল কেনারামের দাদন দেনার মুনিষ।

বাবু, দাদন দেনার মুনিষ হল কেনা মুনিষ। দশ টাকা ধার নিলে একটা মুনিষ জনমকার মত বিকিয়ে যেত ; টাকায় মাসে ছ আনা সুদ, মাসান্তে দশ টাকায় তিন টাকা বারো আনা সুদ, সে সুদ আসলে ভুক্তান হয়ে তের টাকা বারো আনা। পরের মাসে কুড়ি টাকার কাছ বরাবর পৌঁছুত। ফেরা মাসে কুড়ি টাকা হত সাতাশ টাকা চার আনা। এই শোধ দিতে সাঁওতালরা মহাজনের বাড়ি খাটতো। পেট ভাতা। মজুরি নগদা নাই। তার মানে আজীবন টাকা শোধ হত না ; মরলেও না ; তার ছেলেপিলেদের শোধ দিতে হত। পালাবার জো ছিল না।[৬]

এই বেঠবেগারি নিয়েই চলে জীবনভোর জুলুমবাজি। লেবারদের হাতে বিকল্প কোন কাজ না থাকায় অগত্যা তারা এ জুলুমবাজি মেনে নিয়েই মুখ বুজে কাজ করে চলে।

আজও শাসন-শোষণ-অত্যাচারকে শাসক শ্রেণী অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগিয়ে চলেছে। অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করতে এই কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া গতি থাকে না। লালা যেমন মান্ধাতা আমলের ধারণা নিয়েই পড়ে রয়। তার বাইরে সে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না বলেই এই কথাটি বলতে পেরেছে –

আদিবাসী ঔর অছুত সে বেঠবেগারি লেনা তো মেরা ধরম হ্যায়।[৭]

এটাকে জোতদার জমিদারেরা নিজেদের হক বলে মনে করে। আর পুলিশ প্রশাসনও এটা অন্যায় জেনেও জোতদার জমিদারদের সাথে সাথ দিয়ে থাকে। এদিকে আদিবাসী মানুষেরা সহজ-সরল হওয়ার কারণে এসব মারপ্যাঁচ বুঝে উঠতে পারে না। তারা এভাবেই ঋণের জালে জড়িয়ে যায়। আর সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। পড়ে পড়ে মরা ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। যেমন দুখিয়া --

দুখিয়া নাকাটার রাজার বেঠবেগার। আমরাও। কিন্তু ওর কিছুই নাই। জমি জেরাত সব টিপছাপে বান্ধা।[৮]

বেঠবেগারি দিয়েও তাদের কামচোর অপবাদ শুনতে হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়ে অন্য কিছু করে খেয়ে পড়ে বাঁচতে চাইলেও বিপদ। তাতেও তারা চক্ষুশূল হয়ে যায়। সেরকমই দুখিয়ার সাথে ঘটেছে। সে হাটে শাক সবজি নিয়ে বসলে পরে জুলুমবাজির শিকার হয়েছে। আবার এরা বাজারে কোন জিনিস বেচার জন্য গেলে ন্যায্য দাম না দিয়ে ঠকানো হয়।

প্রথম সিধু এ দরে জিনিস দেয়নি ভকতকে। কিন্তু সকলেই বলেছিল সেই একদর। তার ওপর দিতে গিয়েও তার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। তার এক কেঁড়ে ঘিউ এক সেরের বেশি নয়। তার আন্দাজ ছিল, অন্তত আড়াই সের ঘি।[৯]

আবার নিজেরা কিছু জিনিস পসার করলে পরে কেউই দাম দেয় না। জোতদার-জমিদারদের গোমস্তারা হাটে গিয়েও জুলুম ওঠায়। জোর করে তাদের আনাজ সামগ্রী নিয়ে চলে যাওয়া, গালিগালাজ করা, পা দিয়ে মরিচের ঝুড়ি ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা এরা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তার প্রতিশোধও তারা নৃশংস হত্যার মধ্য দিয়ে নিয়ে থাকে। এদিকে উকিল দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হলেও মুণ্ডা সাচা বিনা ঝুট বলতে পারে না। আবার পালিয়েও যেতে পারে না। তাই সব দায় স্বীকার করে ফাঁসিতে চড়ে বসে। এভাবেই তারা যুগযুগান্তর কাল ধরে মুক্তি খুঁজে চলেছে। তবু বেঠবেগারির হাত থেকে মুক্তি কিছুতেই মেলে না। কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে বাঁচার বৃথা চেষ্টা করে থাকে। কেউ কেউ পড়ে পড়ে মরে। এই তো আদিবাসীদের জীবন। পূর্তি মুণ্ডা যেমন পালিয়ে গিয়ে নিজে ও পরিবারকে বাঁচাতে চেয়েছিল। তার পালানোর পিছনের কারণও বড় রহস্যময় --

একদিন ঝিকিমিকি বেলায় মাছ ধরতে গিয়ে ও অবাক হয়ে দেখল, ওর জালে যে বালি উঠেছে, তাতে সোনার কণা। ও বালির উপর বসে পড়ল। কয়লা এবং অভ্র দেখে সায়েব বিহারী যে রকম উদগ্র লোভে ঝাঁপিয়ে পড়ত, নিমেষে আদিবাসী ভূখন্ডকে এক ঘিঞ্জি টালি ও মকানে কুশোভিত জনপদ করে তুলত, তা ওর মনে আছে। সোনা দেখলে সে সব লোক কি কাণ্ড করবে কে জানে। এই পাহাড় বন নদী সব আবার নষ্ট হবে। প্রবল মনোভঙ্গে ও আবার আঁজলা ভরে বালি তুলল। তাতেও সোনা। এবার ও মনস্থির করল। হিন্দু সদান, ক্রিশ্চান মিশনারী ও চা বাগানের আড়কাঠি, তিনজনই ওকে পেতে চায়। পূর্তি মুণ্ডা আড়কাঠির খোঁজে চলল।[১০]

অসহায় আদিবাসীরা জোতদার জমিদারদের খপ্পড় থেকে বের হয়ে আসার নানা চেষ্টা করলেও পারে না। তার মধ্যেই চোট্টির এক ফালনা জমি কিনে নেওয়াকে ভালভাবে মেনে নিতে পারে না। তাদের যুক্তিতে লেবার মালিক হলে পরে অভ্যাস বদলে যেতে পারে। তখন আর কম মজুরীতে কাজ করানো যাবে না। এইভয়ে মালিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে আজীবন দাবিয়ে রাখার প্যাঁচ কষে যায়। ভূস্বামীদের এই অভিসন্ধির কথা জেনে বুঝেই চোট্টি বলেছে --

মোর জমিতে ধান হলে তুমার মনে হয় জমিটো কেড়ে লই। ফির জমি নিলে মনে হয় সকল পতিত জমি কিনে লই নয় তো লেংটা-কাঙালরা জমির সোয়াদ জানি যাবে।[১১]

আসলে এরা কোনদিন চায় না লেবার শ্রেণী স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠুক। আর এটা চোট্টি ভাল করেই জানে। তাই সে সনাকে জোরের সঙ্গে একথা বলেছে --

চাঢাবল, লালাবল, কুনো শালো মোদের জমি লওয়া ভাল চোখে দেখততেছে না।[১২]

জমি কেবলই লালাদের কুক্ষিগত থাকবে আর চোট্টিরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে সে জমিতে বেগার দিয়ে মরবে। এই সিস্টেমের অবসানের নিমিত্তে চোট্টি পাথুরে হলেও জমি কিনেছে। চোট্টির দেখা দেখি গ্রামের মানুষের মানসিকতা বদলে গেছে। এদের সবার স্বপ্ন তারাও চোট্টির মতো জমি কিনতে চায়। অনিশ্চিত জীবন ছেড়ে নিশ্চিত জীবন গড়তে চায়।

তারা এটাও জানে লালা বা চাঢা কেউই তাদের ভাল চায় না। জোতদার-জমিদার-মহাজনেরা বেঠ বেগার ছাড়া কিছু বোঝে না। তাদের একটিই আক্ষেপ ন্যায্য মজুরী দেওয়া হলে পরে তারাও জোত-জমি কিনতে পারত চোট্টি মুন্ডার মতো। এই আক্ষেপের কথায় ছগনের মুখে ধ্বনিত হয়েছে -

লালার ধার শুধতে সকল কামাই চলে যায়? নইলে জমি কি নিতাম না?[১৩]

চোট্টি কেনে নিজের নামে আর সনা কেনে ভাইয়ের ছেলে জিতার নামে। কারণ সে বেঠবেগার হওয়াই নিজের নামে কোন জিনিস কিনতে পারে না। সে জমির উপর অন্যের নজর পড়লে কার ভালো লাগে !

এই অভাগা দেশে আদিবাসীদের ভিটে মাটি জমি আর গতরের ওপর ভূস্বামীদের শকুনের নজর। সহজ সরল মুণ্ডাদের ভিটে মাটি কেড়ে নিতে লালা চাঢা সবাই লালায়িত বলা যায়। এদের নানা ঝুট ঝামেলার জালে জড়িয়ে অকারণে হয়রানির মধ্যে ফেলে ভয় পাইয়ে দিয়েই এরা বাজিমাৎ করে থাকে। পুলিশি ঝঞ্ঝাটের ভয়ে আদিবাসী মানুষেরা সাত পুরুষের ভিটে মাটি ফেলে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনটা পহানের গ্রামের মুণ্ডারা করেছিল --

তারপর একদিন সন্ধ্যার সময় সবাই গ্রাম ছাড়ল। গরুর পিঠে বেঁধে নিল দরজা-জানালার কপাট। ধান, ভুট্টা ও চাল। গরু-ছাগল-শুওর সব পথ চলতে চলতে বেচবে বলে সঙ্গে নিল। তারপর পহানকে প্রণাম করে ঘর ছাড়ল সকল মুণ্ডা। খুব জঙ্গুলে গ্রাম। চট করে খবর যাবে না কাছারীতে। সোজা পথে নয়, জঙ্গলের দুর্গম পথে ওরা চলে গেল।[১৪]

চিরকালের মতো। আর কোনদিন ফিরবে না। আদিবাসীদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা লড়াইয়ের মন্ত্রে বিশ্বাস করে না। বুক চিতিয়ে লড়াইয়ের পরিবর্তে ভয়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। আর যুগ যুগান্তর কাল ধরে এটাকে অস্ত্র করেই নায়েব-গোমস্তারা বাজিমাৎ করে থাকে। যখন তখন যাকে তাকে ভয় দেখিয়ে এরা ভিটে মাটি ছাড়া করে থাকে। এটা তাদের বহুদিনের অভ্যাস। তাই এদের সাথে লড়াইয়ে সাধারণ আদিবাসী মানুষেরা পেরে ওঠে না। যা ভরত মুণ্ডাদের পাড়ার মানুষের ক্ষেত্রে দেখে থাকি। আইনের মারপ্যাঁচ এরা বোঝে না। তাই তাদের প্যাঁচে ফেলে গ্রাম ছাড়া করতে খুব সহজ। এক্ষেত্রেও গোমস্তা তাই করেছে। আইনি ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে মুক্তি পেতে শেষ অবধি পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়ে বসে। এইভাবেই তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ইচ্ছে না থাকলেও তাদের পরিস্থিতির চাপে পড়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়।

দিকুদের জুলুমে সব যেয়ে মিশনে ঢোকে। নয় চা বাগান, নয় কলিয়ারী। কোথা বাংলা মুলুকে নাকি ক্ষেতমজুরে কামে বহুত মুণ্ডা চলি গিছে।[১৫]

তবু জুলুম কমে না। মুণ্ডা যেখানেই যাক না কেন সঙ্গে সঙ্গে জুলুমও যায়। দিকুর জুলুমের সাথে গোরমেনের জুলুম এক হয়ে যায়। জুলুম মাত্রা ছাড়ালেই মনে ঘিন চলে আসে। আর তা থেকেই মুণ্ডা রুখা চড়া হয়ে যায়।

নয়তো গ্রাম ছেড়ে তারা সবাই মিশনে যেতে চায়। গেলে সেখানে জমি পাবে বাড়ি পাবে। তাতেই তাদের চলে যাবে। এখানে থাকলে তাদের উপর জুলুম উঠাবে। তবু তারা আর কারোর বেঠবেগাড়ি দেবে না।

করমির মুণ্ডারা সহজে গ্রাম ছাড়েনি। ঘোর জঙ্গল কেটে গ্রাম পত্তন করতে বড় কষ্ট। সে গ্রাম ছাড়তে আরো কষ্ট। [১৬]

মুণ্ডারা কোনদিন গ্রাম ছাড়তে চায় না। তাদের এক রকম জোর করে গ্রাম ছাড়াতে বাধ্য করা হয়।

আদিবাসীদের লড়াই হকের লড়াই। হকের জন্য আজীবনকাল ধরে লড়াই চালালেও খেয়ে পড়ে বাঁচার জন্য যেটুকু অধিকার দরকার সেটুকুও তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। ঠাণ্ডা ঘরে বসে আদিবাসীদের জন্য নানা প্রকল্প বরাদ্দ করেই খালাস। সেগুলো তাদের হাতে এসে শেষ অবধি পৌঁছয় কিনা তা দেখার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই এ অভাগা দেশে। তাই এরা যুগ যুগান্তর কাল ধরে শোষিত বঞ্চিত হয়ে চলেছে। আর এখান থেকেই ক্ষোভের সঞ্চার হয়ে থাকে। তা থেকেই বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ---

ঘাটো খাব না। মহাজন-দিকু-পুলিশের জুলুম মানব না, আবাদী জমি আর পত্তনি গ্রামে দখল নিব, জঙ্গলের হক নিব বলে।[১৭]

উপসংহারে এসে একথাই বলতে হয়, এই দেশে আদিবাসী মানুষেরা লড়াকু ও সাহসী জাতিগোষ্ঠী বলে পরিচিত। পরাধীন ভারতে অরণ্য প্রকৃতিকে বাঁচানোর তাগিদে তাদের জান কবুল লড়াই ইতিহাস হয়ে রয়ে গেছে। বলা যায় তাদের হাত ধরে এদেশে লড়াই সংগ্রামের সূত্রপাত। পরাধীনতার গ্লানি থেকে শাসন-শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়ে প্রথম তারাই বিদ্রোহের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছিল। যা পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনোত্তর কালে স্বদেশীয় শাসক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যার

সমাধান করে উঠতে না পারার কারণে আবার আদিবাসী মানুষদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। তার ফলশ্রুতিতে তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন হয়ে বর্তমান সময়ে মাওবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখে থাকি। এই আখ্যানে জরুরী অবস্থার সময় আদিবাসী মানুষদের জীবনে নেমে আসা নিদারুণ বিপর্যয়ের চালচিত্র পাওয়া যায়। সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তারা চোট্টি মুন্ডার নেতৃত্বে যেভাবে লড়াই করে রুখে দাঁড়িয়েছিল তার জন্য কোন প্রশংসায় যথেষ্ট নয়।

উল্লেখপঞ্জি :

(১) চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর, মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮০, কলকাতা, (পৃষ্ঠা – ৩৪)

(২) পূর্বোক্ত, (পৃষ্ঠা -১)

(৩) পদ্মানদীর মাঝি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৩৬, কলকাতা, (পৃষ্ঠা -৪)

(৪) চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর, মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮০, কলকাতা, (পৃষ্ঠা -৩৫)

(৫) পূর্বোক্ত, (পৃষ্ঠা -৫৩)

(৬) অরণ্যবহ্নি, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৫৬, কলকাতা, (পৃষ্ঠা -৩৩৬)

(৭) চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর, মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮০, কলকাতা, (পৃষ্ঠা -৫৪)

(৮) পূর্বোক্ত, (পৃষ্ঠা ৭০)

(৯) অরণ্যবহ্নি, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৫৬, কলকাতা, (পৃষ্ঠা -৩৫৩)

(১০) চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর, মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮০, কলকাতা, (পৃষ্ঠা -২)

(১১) পূর্বোক্ত, (পৃষ্ঠা-২১৪)

(১২) পূর্বোক্ত, (পৃষ্ঠা-২০১)

(১৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ১৯৯

(১৪) পূর্বোক্ত, (পৃষ্ঠা -৯৬)

(১৫) পূর্বোক্ত, (পৃষ্ঠা -১২১)

(১৬) পূর্বোক্ত, (পৃষ্ঠা-৯৩-৯৪)

(১৭) পূর্বোক্ত, (পৃষ্ঠা -২০)

সহায়ক গ্রন্থ :

১) ঘোষ সুবোধ, ভারতের আদিবাসী, কলকাতা, ২০০০

২) দেবসেন সুবোধ, বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ, কলকাতা, ২০১০

৩) ঘোষ প্রদ্যোৎ, বাংলার জনজাতি, ১ম খন্ড, কলকাতা ২০০৭

৪) গঙ্গোপাধ্যায় বাসুদেব, পশ্চিমবঙ্গ পরিচয়, কলকাতা, ২০০০

৫) গুপ্ত প্রমথ, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী, কলকাতা ১৯৮২

৬) ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৯

৭) চৌধুরী অরুণ, নবজীবনের সন্ধানে উপজাতীয় জনগণ, কলকাতা ১৯৯১

৮) দাস ড. অমলকুমার, মুখোপাধ্যায় শঙ্করানন্দ (সম্পা), পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী আন্দোলন, কলকাতা ১৯৭৭

৯) ধর কমলেন্দু (সংকলিত), স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ১৯৮০

১০) রায় হিমাংশুমোহন, ভারতের আদিবাসী, কলকাতা, ১৯৮০

১১) সেন গোপীনাথ, স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৭৫

১২) সেন গোপীনাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী আন্দোলন, কলকাতা ১৯৭৭

....

দীপেন্দ্রনাথের ছোটগল্প : সমকালের প্রেক্ষিতে

ড.রাজীব ঘোষ
Assistant Professor (Contractual)
ICV College, Belonia, South Tripura

সারসংক্ষেপ :
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশ বিভাজন ও বাস্তুহারা সমস্যার উৎকট অবস্থার পর পঞ্চাশের দশক এক অস্থিরতার জন্ম দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ব্রিটিশ যুক্ত থাকায় যুদ্ধভার থেকে ভারত মুক্ত থাকতে পারেনি। এর প্রভাব সমাজ, ব্যক্তি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ১১৪৫ এর ২ সেপ্টেম্বর বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা উদ্‌বাস্তু সমস্যা নিয়ে পঞ্চাশের দশকের যাত্রা। এ-সবের অভিঘাত মিলেমিশে যুদ্ধ সমকাল বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক জীবনে আনে চরম অবক্ষয়, অবক্ষয় ঘটে নৈতিক আদর্শের। পূর্ববাংলা থেকে ভিটে মাটি ছেড়ে স্বাধীনতার বছর খানেক আগে থেকে হিন্দুরা এদেশে চলে আসতে থাকে নোয়াখালি দাঙ্গার পর। দেশ ভাগ হওয়ার পর দলে দলে মানুষ দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসতে থাকে। অপর সম্প্রদায়ের হুমকি, আতঙ্ক চাপা উত্তেজনা হিন্দুদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। এই রকম অস্থির পরিস্থিতিতে ৪০-৫০ এর দশকের ছোটগল্পকাররা পারিপার্শ্বিক যুগ ও সময়কে তাঁদের ছোটগল্পে স্বতন্ত্র ভঙ্গি ও রীতিতে ধরলেন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন যিনি অত্যন্ত দক্ষ শিল্পীর মতই সমকালের ছবিটি তাঁর গল্পে কি ভাবে তুলে ধরেছেন তা-ই উক্ত প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে।

বীজ শব্দ :
পঞ্চাশের দশক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশ ভাগ, সংকট, বেকারত্ব, সংগ্রামশীল মানসিকতা, উত্তরণ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা কথাসাহিত্য জগতে পঞ্চাশের দশকের একটি বিশিষ্ট নাম দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০ নভেম্বর, ১৯৩৩–১৪ জানুয়ারি,১৯৭৯)। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পরেন। ১৯৫৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়েই কথাসাহিত্যের জগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী দীপেন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা বলতে কিছুই ছিল না। স্ত্রী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলে শিক্ষকতা করে সংসারে সমস্ত দায়িত্ব সামলাতেন। ইতিমধ্যেই অবশ্য লেখক 'পরিচয়' পত্রিকার সাথেও যুক্ত হন এবং পরবর্তী কালে সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেন।

দীপেন্দ্রনাথ যখন বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিনায় পদার্পণ করলেন তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ইত্যাদি ঘটনায় ভারতবর্ষ উত্তাল। তাছাড়া বাংলা ছোটোগল্পের জগত তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র,সন্তোষ কুমার ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রমুখ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর শোভায় শোভিত। এই রকম অবস্থায় নবাগত কোনো লেখকের পক্ষে নিজেকে তুলে ধরার কাজটি মোটেই সহজ ছিল না; কিন্তু অত্যন্ত সহজ সরল জীবনের অধিকারী দীপেন্দ্রনাথ দক্ষ শিল্পীর মতোই এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন।

এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দীপেন্দ্রনাথের গল্পের মোট সংখ্যা একান্ন। তার মধ্যে যে গল্পগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল – 'গ্রহণ' ('নতুন সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯) 'মডেল' (ভাদ্র ১৩৫৯), 'বৃত্ত' (শারদীয় ঝরনা, ১৩৫৯), 'মহাকাব্যের ভূমিকা' (চৈত্র ১৩৫৯) 'সানাই' (নতুন সাহিত্য, আশ্বিন ১৩৫০) 'অমৃতকুম্ভ' (কল্পনাসাহিত্য, আশ্বিন ১৩৬৩) 'ভাসান' (নতুন সাহিত্য, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৬৩) 'সার্কাস' (শারদীয় যাত্রী, ১৩৬৩) 'ঘাম' (পরিচয়, নববর্ষ সংখ্যা ১৩৬৫) 'নরকের প্রহরী', চর্যাপদের হরিণী (শারদীয় পরিচয়', ১৩৬৬)

'জটায়ু' ('ছোটগল্প: নতুন রীতি', আষাঢ় ১৩৬৭) 'অশ্বমেধের ঘোড়া' (শারদীয় ছোটগল্প, ১৩৬৭) 'স্বয়ম্ভর সভা' (মানসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮) 'পরিপ্রেক্ষিত' (শারদীয় স্বাধীনতা, ১৩৬৮) 'অশোকবন' (মানসী দেওয়ালি সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৬৮), 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' (শারদীয় স্বাধীনতা) প্রভৃতি।

'মডেল' গল্পটি সুনন্দা নামের একটি মেয়ের কাহিনি। যে কঠোর সংগ্রাম করেছে জীবনের সঙ্গে। স্বামীর শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে চিরাচরিত নারীত্বসুলভ সমস্ত আচরণ বিসর্জন দিয়ে সে একজন মডেলে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয় অসুস্থ স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য তাকে পতিতাবৃত্তি পর্যন্ত অবলম্বন করতে হয়েছে। ফলস্বরূপ সে লাভ করেছে রক্ষনশীল স্বামীর তীব্র ঘৃণা। শুধু তাই নয় সমাজও তাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত করেছে। সমস্ত ফাই-ফরমাস পূরণ করতে সুনন্দার অন্তর ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠে। তাই একসময় সে বলে –

"আমি তো মডেল। আমার কি হৃদয় আছে, অনুভুতি আছে ? টাকা রোজগার করি। আয়া রেখেছি বাড়িতে। সে সূর্যকে দেখে। অরিন্দম কখনও পিতা, কখনও শিল্পী, কখনও বা দুই-ই। হোটেল থেকে খাবার আসে। জীবনযাত্রা সহজ হয়ে গেছে। শুধু আমার পরিবর্তন হলনা কোনও।" [১]

তবে অন্যান্য নারীচরিত্রের সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের এই নারীচরিত্রটির পার্থক্য হল শত অপমান বা লাঞ্ছনা সহ্য করেও সুনন্দা জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। প্রতিবাদী মানসিকতা নিয়েই নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে, ভালবাসতে চেয়েছে।

সামাজিক মূল্যবোধ যে ভয়ঙ্কর বিনষ্টির পথে এগিয়ে চলেছে তারই অন্যতম নিদর্শন লেখকের 'বৃত্ত' (১৯৫২) গল্পটি। গল্পে রানী নামের মেয়েটি নানা উথালপাতাল ও বিপর্যয়কে সহ্য করেও বেঁচে থাকতে চেয়েছে। যে মেয়ে একদিন সেবা দিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কল্যানদ্বীপটি জ্বেলে রেখেছিল, দেশভাগের অভিঘাতে, বাবার সামনে তাকেই ঠাকুরঘরে ধর্ষণ করেছে একদল সমাজবিরোধী। এই আঘাত তার চরিত্রে নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। সে ভয়ঙ্কর ভাবে প্রতিশোধ লিপ্সায় মেতে ওঠে। সেবার বিপরীতে এবার সে বিষ ছড়িয়েদেয় সমাজের বুকে, চারিত্রিক পরিবর্তনের এই ছবিটিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই চিত্রিত করেছেন গল্পকার।

'নরকের প্রহরী' (১৯৫৮) গল্পটিতেও সামাজিক নিষ্পেষণের নির্মম ছবি প্রতীকীরূপে তুলে ধরেছেন লেখক। ভুতো, গোবরা বা শশীর মত কিশোরদের নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে ব্যবহার করে একদল সমাজবিরোধী। গল্পের অমানবিক পরিবেশ, কিশোরদের নিষ্ঠুর পেশা, সবই যেন এক ভয়ঙ্কর অভিঘাত তৈরি করে দেয় পাঠকের মনে। তাছাড়া অত্যন্ত সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের জীবনধারার সঙ্গে যে লেখক অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে পরিচিত ছিলেন এই গল্পই তার প্রমাণ। একই শ্রেণির মানুষদের জীবন-কাহিনী নিয়ে রচিত দীপেন্দ্রনাথের আরও একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'সানাই' (১৯৫৩)। গল্পের নায়ক সুরঞ্জন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছে। ফলে গ্রামের প্রতিবেশীরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করে,

:"কী মানুষটাকে কী করে দিলে গো।

: আহাহা!

: মরণ হয় না মুখ পোড়াদের ?

....

এমন সোনার টুকরো ছেলে । এ কিনা করবে ডাকাতি?

তাও ভালো। মিনসেরা বলে রাজু নাকি আমাদের মানুষ খুন করে বেড়ায় গো। ঝাঁটা মারি আবাগীর বেটাদের।"[২]

সংলাপ থেকেই জানা যায় এদের শিক্ষাগত বা শ্রেণিগত অবস্থানের কথা, তবে গল্পকার দীপেন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত বিরুদ্ধ পরিবেশকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। তারা প্রত্যেকেই সংগ্রামশীল মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত; টিকে থাকার অদম্যবাসনায় তাদের জীবন নিয়োজিত; আর এখানেই দীপেন্দ্রনাথ অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র।

গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়ের একটি বিখ্যাত ছোট গল্প হল 'চর্যাপদের হরিণী' (১৩৬৬) বঙ্গাব্দে শারদীয়া 'পরিচয়' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পের সূচনাটি; কিছুটা দিনপঞ্জী ধর্মী। গল্পের শুরু থেকেই লেখকের বক্তব্যের মধ্যে একধরনের

অসংলগ্নতার ভাব দেখা যায়। তবে তাকে অর্থহীন বা প্রলাপ একেবারেই বলা যাবে না। মানুষ যখন মানসিকভাবে ভীষণ বিধ্বস্ত অবস্থায় থাকে, তখনই বহু অসংলগ্ন ভাবনা তার অন্তরজগতকে ক্ষত বিক্ষত করে। গল্পটিতে দেখা যায় এক গভীর নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে লেখক সময় অতিবাহিত করেছেন। এই নিঃসঙ্গতার কারণ হল সমকালকে নিজস্ব গভীরতম চেতনার দ্বারা উপলব্ধি করতে না পারা; স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ দেশ সমকালে যে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলছিল, সেই যুগযন্ত্রণার সুতীব্র চেতনা তার মনকে নাড়া দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে ঘুমের মধ্যেও যেন লেখক তার ভাবনার কাছে বিনীদ্র।

সমকালের অস্থিরতা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল যুবসমাজকে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান রোজগার সবকিছুরই অভাব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুধাময় চরিত্রটির আত্মকথন বা আত্মভাবনার মধ্য দিয়ে গল্পটিতেও অস্থিরতার ছবিটি স্পষ্টত ফুটে উঠেছে । গল্পের নায়ক সুধাময় তথা লেখক দীপেন্দ্রনাথ সময়ের গতিকে ধরতে পারছে না। সমকালীন পারিপার্শ্বিকের অস্থিরতা অবসানে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাহস যে তিনি যোগাতে পারছেন না তারই অসহায়তা এখানে স্পষ্টত ফুটে উঠেছে ।ভাবনার আবর্তে সুধাময় আজ ভীষণ ক্লান্ত। তাই বিছানায় সে শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমের চেষ্টা করে এবং ক্লান্তিতে সে'বোধ হয় ঘুমিয়ে পরে'। - কিন্তু বাস্তবে এমনটা ঘটেনি। সুধাময় ঘুমাতে পারেনি। আর তাই লেখক অত্যন্ত সচেতন ভাবেই প্রয়োগের দিক থেকেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। নতুন নতুন ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিধ্বস্ত মানুষদের ভাবনার জগতে যেমন জটিলতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি গল্পের বক্তব্যও আরও জটিল হয়ে উঠে।

'চর্যাপদের হরিনী' গল্পটিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন লেখক। প্রতিটি ভাগে একটি করে তারিখের ও উল্লেখ আছে । ভাগ গুলি হল যথাক্রমে –

পাতালের মরীচিকা (২৮-০৫-৫৯)

ভূর্জপত্র (১) ৩০-০৮-৫৯ । সকাল

(২) - ঐ - । দুপুর

একত্রিশে আগস্ট। রাত আড়াইটে-আহ্। আমি লিখব না, লিখব না। আমি পাগল হয়ে যাব।

শব্দের দর্পণ (০৯-০৯-৫৯)

যে সময়কালকে লেখক চারটি ভাগে ভাগ করেছেন, হিসাব করে দেখাযায় তাতে মোট ১০৩ দিনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যে 'আজ' শব্দের ব্যবহার তিনি গল্পটিতে করেছেন তা হচ্ছে লেখকের সমকালের কথা। যে সমকাল মানুষকে এক অস্থির যুগযন্ত্রণাময় পরিবেশের দিকে ঠেলেদিয়েছিল। লেখকের চিন্তায় সময়ের স্রোত বয়ে চলেছে । বর্তমানে আমরা যে সমাজে বসবাস করছি তাও একইরকম চিন্তা উদ্রেককারী। আজকের দিনেও যুগযন্ত্রণার অবসান ঘটেনি। গল্পটির চিন্তা আজকের দিনেও সত্য, একবারে বাস্তব। ঘুমের পরও যে আর একটা জগত রয়েছে, তাই এখানে স্পষ্টত দেখা যায়। বাস্তবের জেগে থাকার সাথে সুধাময়ের এই ঘুমের কোনো পার্থক্য নেই। এখানে লেখকের ভাবনায় ফ্রয়েডীয় চিন্তা চেতনারও কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

গল্পটির দ্বিতীয় স্তবকে দেখা যায় সুধাময়ের দিন কাটে অস্থির সময়ের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে, আর রাত কাটে এক অমোঘ আতঙ্কে। এখানে সুধাময়কে নিজের নাম নিয়েও খেলা করতে দেখা যায়। প্রথমে সে জানায় তার বয়স ৩১ বছর, কিন্তু অন্যান্য অসংলগ্ন ভাবনার মতোই তাকে নিজের বয়স সম্পর্কেও সন্দিহান হতে দেখা যায়। সুধাময়ের মানসিক অবস্থার সাথে জীবনানন্দ দাসের 'বোধ' কবিতার বক্তব্যের বেশ কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

"সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রা দোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?" [৩]

স্বাধীনতার পূর্বকালে সাধারণ মানুষকে, তথা সমগ্র পৃথিবীকে যে যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে জীবনানন্দ দেখেছিলেন, তারই চিত্র যেন দীপেন্দ্রনাথ উত্তরকালেও নির্মাণ করেছেন।

গল্পটিতে সুধাময়কে বলতে শোনা যায়, কোনো একসময় সে ছাত্র ছিল, আর তখনই সে সুখের দিন কাটিয়েছে। কিন্তু এরপরই শুরু হয় তার বিভীষিকাময় জীবন। একদা সে চাকুরিজীবি হলেও বর্তমানে সে কর্মহীন। অন্তহীন দুপুর আর বেকারত্বের জ্বালা নিয়েই এখন তার জীবন চলছে। ফলে তার ভাবনাগুলিও বর্তমানে ছেঁড়া-ছেঁড়া, টুকরো টুকরো, অসংলগ্ন, কখনো সে পালিয়ে যাবার কথা ভাবে

কিন্তু এই ভাবনাও তার মনে স্থায়ী হয়না। সুধাময় নিজে যেমন অস্থির, অসহায়, ঠিক তেমনি অপরের মধ্যেও সেই ভাবটুকু দেখার জন্য সে কোর্টে যায়। দীর্ঘসময় বসে, গল্প করে সুধাময়কে কিছুটা তৃপ্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই 'নিঃশব্দে হাহা করে' হাসতে দেখে ধারণা করা যায় তার এই আত্মতৃপ্তিটুকুও যেন অবাস্তব, অপ্রকৃতিস্থ। বিশুদ্ধ সময় সুধাময়ের মাথায় কোনো চিন্তাকেই দানা বাঁধতে দিচ্ছেনা। বাস্তব জীবনের অভিযানে সুধাময়ের শারিরিক বয়স খুব বেশি না হলেও মনের বয়স তার অনেকটাই বেড়ে গেছে। সে কফিনের গর্ভে থেকেও তমসার মরীচিকা দেখছে। এই অসংলগ্ন ভাবনা থেকেই সমকালের জটিল জীবন সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে, যেখানে মৃত্যুর মধ্য দিয়েও সম্ভবত সকল যন্ত্রণার অবসান হয়না।

দেশভাগ শুধু ভৌগোলিক ভাবেই দু'টো দেশকে ভাগ করেনি, বিভাজনটা ছিল সার্বিক। বহুমানুষ ছিন্নমূল হয়ে পরে, সহায় সম্বলহীন হয়ে পরে; কেননা নিজের প্রাণটুকু ছাড়া আর সবকিছুই তাদের ফেলে আসতে হয়েছিল। এই বিষয় নিয়েই লেখা দীপেন্দ্রনাথের 'জটায়ু' গল্পটি (১৩৬৭ উত্তরণ)। গল্পটির নামকরণে তথা কাহিনীতে পুরাণের অনুসঙ্গ রয়েছে। গল্পটির কাহিনি জুড়েই রয়েছে দেশভাগ, দাঙ্গা, দারিদ্র, নতুন কলোনী জীবন, লুণ্ঠন আর বীভৎসতা। অর্থাৎ সমকালকে অসাধারণ দক্ষতায় পুরাণ কথার পরিমণ্ডলে তুলে ধরেছেন লেখক।

রামায়ণে দশরথ বন্ধু জটায়ু আকাশ পথে যাচ্ছিলেন। আর তখনই দেখতে পান রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করার প্রাণপণ চেষ্টা করে ছিন্নপক্ষ হন জটায়ু। সীতাকে তিনি উদ্ধার করতে পারেননি। রাবণের আঘাতে ডানাকাটা মৃতপ্রায় অসহায় জটায়ুর মতই চরমতম অসহায়তা নিয়েই নিত্যচরণ আর দুর্গাকে সংসারে বেঁচে থাকতে হয়। কোনো একটি দুর্ঘটনায় ট্রেনের চাকার নীচে পড়ে হাত কাটা পড়ে নিত্যচরণের, ফলে নিজেদের পেটচালানোর জন্য বাধ্য হয়েই শহরের হোটেলে কাজ নিতে হয় দুর্গাকে। তাকেও নানা সন্দেহের শিকার হতে হয়, নানা প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হতে হয়; স্বামী তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "বউ এত রাইত্ অব্দি তুই কী করস? বউ তুই পান খাইয়া আস্ছস্ ক্যান্? বউ তুই নয়া শাড়ি পাস্ ক্যামতে? বউ, আমি তরে ছাড়া কিছু জানিনা।" (৪) আসলে দুর্গার মতো নারীরা তাদের অসহায়তার কথা কোনো ভাবেই সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারে না। তাছাড়া হাতকাটা নেত্যাচরণের অসহায়তার দিকটিকেও প্রতীকী ব্যঞ্জণায় প্রকাশ করতে গিয়ে বহুবারই লেখক তৈরি করেন এক অপূর্ব মায়াময় পৌরাণিক পরিমন্ডল।

গল্পটির শুরুতেই কালীপূজার উল্লেখ করেছেন লেখক। কালীমূর্তির যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, তাতে 'মা-কালী' যেন আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেন । এই বর্ণনা কিছুক্ষণ চোখের দেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও 'বুঝি এই মাত্র কেটে আনা হল' – কথাটির মধ্য দিয়ে লেখক বহুমাত্রিক একটি ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। অসহায় মানুষদের জীবন যন্ত্রণা নিজ চোখে দেখেছেন তিনি। তাতে লেখক উপলব্ধি করেছেন যে, বেঁচে থাকা এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ যেন আজ নিজের শরীরকে কেটে কেটে ব্যবহার করছে। "বুড়ো ঠাকুর কুশের আসনে উবু হয়ে বসে বিহ্বলভাবে প্রতিমার দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে গল্প বলার সুরে মন্ত্র পড়ছে"। (৫) পুরোহিত মন্ত্র পড়েই পূজা করবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু লেখক গল্পে পুরোহিতকে যে বিহ্বল বললেন সেটাই অস্বস্তিকর। পুরোহিত দেবীর পূজা করছেন, কিন্তু নিজে তিনি এক গভীর ঘোরে রয়েছেন; এই ঘোর সমকালের ঘোর। যা লেখক ও পাঠক সকলকে আচ্ছন্ন করছে।

কালীপূজার সমস্ত বর্ণনাটাই এখানে বাস্তব। এই চিত্রে যে পরিস্থিতি, সে সব মানুষদের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, তারা হল সেই সময়কালে শেয়ালদার ফুটপাথে, এন্টালীতে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষ যারা বিধ্বস্ত অবস্থায় মায়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। মায়ের মূর্তির সামনে হাতকাটা নিত্যচরণ এর আদিম নাচের আয়োজন হয়েছে; এই নাচ আসলে জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদের নাচ। দেবতা বা মানুষ কারও মনোরঞ্জনই উদ্দেশ্য নয়। অস্তিত্ব রক্ষা অর্থাৎ টিকে থাকার জন্য জীবিকার তাগিদে সে আজ নাচতে বাধ্য। নিত্যচরণের পাশাপাশি তার স্ত্রী দুর্গার জীবনের অন্ধকারময় দিকটিকেও স্পষ্টত ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। সে স্বামীর নাচ দেখতে এসেও দূরে অন্ধকারে আলাদা হয়ে বসেছে। এই অন্ধকার আসলে তার জীবনের অন্ধকার। সে যে কিছু ভাবতে পারছে না তা আসলে তার জীবন সংগ্রামেরই ইঙ্গিত বহন করে।

গল্পটির শেষ পর্যায়ে দেখা যায় সমসাময়িক পরিস্থিতির আগুনে পুড়তে পুড়তেও নিত্যচরণ দুর্গাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা বেঁচে থাকতে চায়। যে শত্রুর চেহারা সে এতদিন প্রত্যক্ষ করতে পারেননি, আজ নিত্য তার ভাঙ্গা হাত

উঁচিয়ে যেন স্পষ্ট করে দিয়ে গেল। লেখক এখানে শুধু ভাষ্যকারই নন তিনি নিজস্ব চেতনার মধ্য দিয়ে পাঠককেও ভাবতে বাধ্য করেন। আস্তিক্যবাদী দর্শন ও মার্কসবাদী চিন্তা ভাবনা উভয়ই দীপেন্দ্রনাথের লেখায় বর্তমান।

গল্পটিতে লেখক বহুবার ছাগল, কুকুর প্রভৃতি পশুর আর্তনাদের প্রসঙ্গ এনেছেন। আসলে এই প্রতীকের মধ্যদিয়ে লেখক বুঝিয়েছেন বেঁচে থাকার সুতীব্র সংগ্রাম আজ মানুষ, কুকুর ও ছাগলকে একই সারিতে নিয়ে এসেছে। গল্পটিতে লেখক মূলত জীবনের নানা খণ্ড চিত্রকে একত্রিত করেছেন। তাঁর রচনারীতি বা Style কে তাই চিত্রকরের ভাষায় কোলাজ এর নাম দেওয়া যায়।

সময়ের আঘাতে মানুষের প্রেম ভালোবাসা আজ পিষ্ট। ভলোবাসার বা আবেগের কোনো মুল্য যে অলীক কল্পনামাত্র তারই ছবিটি জীবন্ত ভাবে ফুটে উঠেছে লেখকের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' নামক গল্পটিতে। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'ছোটগল্প' শারদীয় সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। গল্পটির নামকরণে এবং গল্পের বিষয়বস্তুতেও প্রাচীন 'মিথ' ভাবনাকে অবলম্বন করেছেন লেখক। গল্পটিতে প্রাপ্ত বয়স্ক দু'টি নরনারী ভালোবেসে রেজেস্ট্রি বিয়ে করেছে। কিন্তু আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কারণে কেউ এই বিয়েকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। মাঝে মধ্যেই শহরের ক্লান্ত অসহায় জীবনে উভয়ে হাঁপিয়ে উঠে। তাই বিবাহ বার্ষিকীর দিনে তারা বেরিয়ে পরে একটু নির্জনতার খোঁজে। তবে বাস, ট্রাম বা ট্যাক্সি না ধরে ঘোড়ার গাড়িকে বেছে নেয় দু'জনে। বিয়েরদিনে যে মালাবদলটা সম্ভব হয়নি, ভেবেছিল নির্জনতায় এবার তারা সেটা করে নেবে। ঠিক তখনি গাড়োয়ানের চাবুকমারা তীর্ষক অশালীন মন্তব্যে সমস্ত পরিস্থিতি পাল্টে যায়। স্বামি স্ত্রীর, দু'জনের মনোজগতে যে বালির পিরামিড তৈরি হয়েছিল সহসাই তা ভেঙ্গে পরে। আসলে যে অভিশপ্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে সময়ও সমাজ এগিয়ে চলেছে তাতে মানুষের জীবন যে ক্রমশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছে, নিরাশ্রয়তার অন্ধকারে সবকিছু যে হারিয়ে যাচ্ছে তারই ভয়ঙ্কর রূপরেখা তৈরিহয়ে রয়েছে গল্পটিতে। মানুষের স্বপ্ন, আশা, প্রেম, আবেগ সব বুদবুদের মতো মিশে যাচ্ছে; শুকিয়ে যাচ্ছে। এইসবকিছুর মধ্যেই জীবনের সন্ধান পেয়েছে নবদম্পতি। তারা অপমানিত বা লাঞ্ছিত হয়েও হার মানবে না। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই অনিবার্য বিনাশের মুহূর্তেও বিধিলিপিকে মেনেই কাঞ্চন ও রেখা বেঁচে থাকবে। এই ভাবেই গল্পকার গল্পটিতে নেতিবাচকতার মধ্যেও ইতিবাচকতার সন্ধান দিয়েছেন।

'অশোকবন' (১৯৬১) দীপেন্দ্রনাথের আরও একটি বিখ্যাত ছোটগল্প। গল্পটিতে কয়েকজন কর্মহীন বেকার যুবক সামাজিক ব্যর্থতা বোধকে সঙ্গীকরেই যেন বেঁচে থাকতে চায়। জীবনে স্বার্থকতা চায়। চারদিক থেকেই তাদের ঘিরে রেখেছে বঞ্চনা আর না পাওয়ার যন্ত্রণাময় পথ। তারপরেও তারা একে অপরের জন্য বেঁচে থাকতে চায়। এমনকি কখনো কখনো তারা সমাজ সংস্কারও করতে চায়। সামাজিক ব্যথর্তাবোধ কেমন করে তাদের নির্যাতণ করে। গভীর সহমর্মিতায় লেখক তা প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলস্বরূপ তাঁর এই গল্পেও নেতিবাচকতার মধ্যেই সহমর্মিতাও ইতিবাচকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সমসাময়িক কালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাযে শিল্পী সাহিত্যিকদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল দ্বীপেন্দ্রনাথের 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' (১৯৬২) গল্পটি তার প্রমান। গল্পটিতে লেখক মানুষের মুল্যবোধের যে চরম অবক্ষয় ঘটে গেছে তার জীবন্ত ছবি উপস্থাপিত করেছেন। রাস্তায় এক্সিডেন্ট হয়ে পড়ে আছে একটি লোক অথচ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ নেই। কারণ সকলেই জানে লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা মানেই নিজেকে নানান বিপদের সম্মুখীন করা। যেমনটা হয়েছিল গল্প কথকের ক্ষেত্রে। তাই সবাই খুব সচেতন ভাবেই নিজেদের সরিয়ে নেয়। আজকের দিনেও এই চরিত্রের তেমন কোনো বদল হয়নি। সেই সঙ্গে সমকালীন সময়ে কলকাতার বুকে ঘটে যাওয়া ব্ল্যাক আউটের নির্মম ছবিও লেখক তুলে ধরেছেন। অথচ এই চরম অবস্থার মধ্যেও সাধারণ মানুষের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তারা যেন এমন ভাবে চলতে চলতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া গল্পের নামটিও বেশ ব্যঞ্জনাময়।

গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ নিপুন শিল্পীর মতোই ছোটোগল্পের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর গল্পে তিনি সমকালের ছবি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিপুণ ভাবে। গল্পে মাঝে মধ্যেই অত্যন্ত ছোটো ছোটো বাক্য, সংলাপ ব্যবহার করে একদিকে যেমন তিনি গল্পের শিল্পসুষমা বৃদ্ধি করেছেন অন্যদিকে তেমনি এই সংলাপগুলির জন্যই চরিত্রগুলিও পাঠকের কাছে একেবারে জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠে। প্রতিটি গল্পের সমস্যাই যেন ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেয়। তার মধ্যে গল্পকারের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত বিরুদ্ধ পরিবেশকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও

অনুকূলকে প্রতিষ্ঠিত করা। সময় যদি তাঁকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে না নিত তাহলে তিনি যে বাংলা গল্পের সমৃদ্ধ ভুবনকে আরও সমৃদ্ধতর করে তুলতেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

উল্লেখ পঞ্জি

১) দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মডেল' গল্পসমগ্র, একুশ শতক, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ: ৩২।

২) দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সানাই' তাদেব পৃ: ১০৬।

৩) জীবনানন্দ দাস, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' 'বোধ' ভারবি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২ পৃ: ১৮।

৪) দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জটায়ু' তদেব পৃ: ২৭৮।

৫) তদেব পৃ: ২৭৫।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দে'জ, তয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১১।

২) ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডাণ বুক প্রা.লি. পঞ্চম প্রকাশ(নতুন সংস্করণ) ২০০৩।

৩) রাজীব ঘোষ, বিমল করের ছোটগল্প বিষয় ও শিল্পরীতি, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯।

৩) রবিন পাল, বাংলা ছোটগল্প: কৃতি ও রীতি, ব্রহ্মাপুর প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ২৪০৯।

....

মতি নন্দীর রচনা : সাহিত্য ও বাস্তব ক্রীড়া-কাহিনির এক অভূতপূর্ব মিশেল

মহঃ রেজ্জাক আনসারি
গবেষক, বাংলা বিভাগ , বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

ক্রীড়া সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য রচনা – দুই ভূমিকাতেই সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন মতি নন্দী। তবে নিজের এই দুই সত্তাকে কখনই পৃথক করে দেখেননি তিনি, বরং সংযোজন, বিয়োজন ও আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে কল্পনার ক্রীড়া কেন্দ্রিক রচনা ও বাস্তবের ক্রীড়া কাহিনিকে এক সুতোয় বাঁধার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। তাঁর এই দুই সত্তার অভূতপূর্ব মিশেলে বাংলার সাহিত্য ভান্ডার এক নতুন শৈলীর সঙ্গে পরিচিত হয়, যেখানে কাল্পনিক ক্রীড়ার পরিসরে অবলীলায় অনুপ্রবেশ ঘটে বাস্তবিক নানা ক্রীড়া অনুষঙ্গের। তবে মতি নন্দীর মুন্সিয়ানা এখানেই যে কখনই তাঁর সাহিত্যের বাস্তবিক ক্রীড়ার অনুষঙ্গকে অতিকথন বলে বোধ হয় না অথবা প্রক্ষিপ্ত বলে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেকও ঘটায় না। ফলস্বরূপ মতি নন্দীর সাহিত্যে কাহিনির অনুষঙ্গে, চরিত্রের অনুষঙ্গে এমনকি কথোপকথনের অনুষঙ্গেও ফিরে ফিরে আসে বাস্তবিক ক্রীড়া জগতের নানা বর্ণময় ঘটনা, যা তাঁর সাহিত্যকে একই সঙ্গে করেছে মনোগ্রাহী এবং তথ্যসমৃদ্ধ।

Keyword

ক্রীড়া সাংবাদিক, ক্রীড়া-জগৎ , বর্ণময় ঘটনা, বিশ্বরেকর্ড, বিশ্বখ্যাত ক্রীড়াবিদ, অনুপ্রেরণা, ক্রীড়াইতিহাস।

Discussion

মতি নন্দী ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং ক্রীড়া সাংবাদিক।তবে ক্রীড়া সাহিত্যিক হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদন হল ক্রীড়া বা খেলা। এর কারণ একদিকে যেমন তিনি শৈশব কাল থেকেই খেলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন, অপরদিকে ক্রীড়া সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে তিনি ক্রীড়া সম্পর্কে ছিলেন সুবিজ্ঞেয়। তাছাড়া বিশ্ব তথা ভারতীয় তথা বাংলা ক্রীড়া-জগতে ঘটে যাওয়া নানা বর্ণময় ঘটনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। ফলস্বরূপ দেশ-বিদেশের নানা খেলায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনাগুলিকে মতি নন্দী তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্থান দিয়েছেন।তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নক্ষত্রের রাত' থেকেই তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে খেলার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

মতি নন্দীর প্রথম উপন্যাস 'নক্ষত্রের রাত'-এর মূল সুর মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লান্তি। সেই সূত্রে উপন্যাসটিতে সমকালীন বিভিন্ন বিষয় যেমন উদ্বাস্তুদের মিছিল, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন ইত্যাদি প্রসঙ্গের সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে স্বনামধন্য বাঙালি ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের প্রসঙ্গ। উপন্যাসটিতে লক্ষ করা যায় যে, দীনেশ-মাধবীর ছোটো ছেলে সানু ভাত দিয়ে দেওয়ালে বহু ছবি আঁটকেছে, যা ছিল তার এক ধরণের বাতিক। সেখানে বহু ছবির মধ্যে একটা ছবি ছিল পঙ্কজ রায়-ভিনু মানকড়ের ছবি।[১] ১৯৫৬ সালের ৭ জানুয়ারি মাদ্রাজের কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে (বর্তমানে চেন্নাইয়ের জহরলাল নেহেরু স্টেডিয়াম) পঙ্কজ রায় ও ভিনু মানকড় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪১৩ রানের বিশাল পার্টনারশিপের বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন যা ২০০৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁদের এই বিশ্বরেকর্ড গড়ার ছবিই মতি নন্দী উপন্যাসটিতে স্থান দিয়েছেন। আসলে বাল্যকাল থেকেই মতি নন্দীর আইকন ছিলেন পঙ্কজ রায়। ছোটবেলায় তিনি পঙ্কজ রায়কে কলকাতার যতীন্দ্র মোহন অ্যাভিন্যুয় মাঠে ফাইভ-এ সাইডে ফুটবল ম্যাচ খেলতে দেখেছেন। পরে ১৯৪৮ সালে মতি নন্দী প্রথম যখন টিকিট কেটে ইডেনেখেলা দেখতে গিয়েছিলেন সেখানে পঙ্কজ রায়ের খেলা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ম্যাচটি ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কার্তিক বসুর নেতৃত্বাধীনে রাজ্যপাল একাদশ দলের। এই ম্যাচে পঙ্কজ রায় সেঞ্চুরি করে রাজ্যপাল একাদশ দলকে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাছাড়া পঙ্কজের রায়ের এই সেঞ্চুরি ছিল কোনো বিদেশি দলের বিরুদ্ধে একজন বাঙালির প্রথম সেঞ্চুরি।এই ম্যাচের স্মৃতিচারণা করে মতি নন্দী পঙ্কজ রায়ের ব্যাটিং সম্পর্কে বলেছেন – "সেদিন আমরা নতুন একটা ব্যাটিং ধারার প্রকাশ ঘটতে দেখলাম যেটা ইতোপূর্ব উচ্ছ্বাসপ্রবল, শৌখিনতায় ভরা বাঙালি চেতনায় ছিল না। রোমান্টিকতা এবং স্টাইল বাদ দিয়ে

উদ্দেশ্যপ্রবণ কেজো ব্যাটিং সার্থকভাবে সেদিন পঙ্কজ রায় বাঙালিদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম দেখালেন।"[২] এরপর ১৯৫৬ সালে পঙ্কজ রায় ও ভিনু মাড়করের গড়া সেই বিশ্ব রেকর্ড। স্বাভাবিক ভাবেইপঙ্কজ রায় মতি নন্দীর মতো ক্রিকেটপ্রেমীর মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া এই মহান ক্রীড়া-কীর্তি বাঙালির একঘেঁয়ে নিস্তরঙ্গ ক্লান্তিকর জীবনকে বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে যায়। পরবর্তী কালে মতি নন্দীর ক্রীড়া সাংবাদিকতার পথচলাও শুরু পঙ্কজ রায়ের সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে। ফলে পঙ্কজ রায় ক্রীড়া-জগতের বাইরে মতি নন্দীর জীবনেরও নায়ক হয়ে উঠেছিলেন এবং তাই তাঁর পরবর্তী 'অপরাজিত আনন্দ' ও 'বুড়ো ঘোড়া' উপন্যাসেও পঙ্কজ রায়ের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বিশ্ব দরবারে ভারতীয় ক্রিকেটের নানা কৃতিত্বের কথা মতি নন্দী যেমন তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন তেমনই ভারতীয় ক্রিকেটের লজ্জাজনক ঘটনাগুলিকেওস্থান দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে অজিত ওয়াদেকরের নেতৃত্বে ভারত তিন টেস্ট ম্যাচের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ডে গেলে সেখানে ইংল্যান্ড দলের কাছে ভারত ০-৩ ব্যবধানেই শুধু পরাজিত হয়নি। তার পাশাপাশি দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত মাত্র ১৭ ওভারের মধ্যে ৪২ রান করে অল আউট হয়ে যাওয়ার মতো লজ্জাজনক রেকর্ডওস্থাপন করে। দিনটি ছিল ২৪ জুন। এই ঘটনাটি ক্রিকেটের ইতিহাসে 'সামার অফ ফরটি টু' নামে কুখ্যাত। এই লজ্জাজনক ঘটনার কথাই মতি নন্দী তাঁর ক্রিকেট বিষয়ক 'অপরাজিত আনন্দ' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন – "আনন্দ স্কোর জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, তার আগেই অরুণ বলে উঠল, "শ্যেম, শ্যেম। ওনলিফরটি টু—বিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না, মাত্র বিয়াল্লিশ !"/"অল আউট বিয়াল্লিশে !" আনন্দও বিশ্বাস করতে পারছে না।/"মাত্র সতেরো ওভারে, পঁচাত্তর মিনিটে ইনিংস খতম ! কী লজ্জা !""[৩]এই অপমানেরই 'রিভেনজ' নিতে চায় ফাস্ট বোলার আনন্দ ব্যানার্জি। আনন্দর এই প্রতিশোধ স্পৃহার মধ্য দিয়ে মতি নন্দী সকল ক্রিকেটপ্রেমী ভারতীয়দের মনোকামনাকে ব্যক্ত করেছেন।

ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত নাম হলো ডন ব্র্যাডম্যান। তিনি বহু রেকর্ডের অধিকারী। এই রকমই একটি রেকর্ড তিনি ১৯৩১ সালে গড়ে ছিলেন। নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্ল্যাকহিথ এবং লিথগো ব্যাকের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া এক ম্যাচে ২৩ বছর বয়সী ডন ব্র্যাডম্যান ব্যাকহিথের হয়ে খেলার আমন্ত্রণ পান। সেই ম্যাচে ব্র্যাডম্যান সেঞ্চুরি করেছিলেন মাত্র ২৪ বলে। ব্র্যাডম্যানের এই রেকর্ডের কথাই মতি নন্দী তাঁর 'অস্থায়ী পলায়ন' ছোটগল্পে উল্লেখ করেছেন গল্পের নায়ক অনাদির ঝোড়ো ব্যাটিং প্রসঙ্গে – "ব্র্যাডম্যানের চব্বিশ বলে সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটিনিশ্চয়ই ভাঙতে পারতেন, যদি না উইন হয়ে যেত।"[৪] এছাড়াও মতি নন্দীর ক্রিকেট বিষয়ক 'ননীদা নট আউট', 'অপরাজিত আনন্দ' উপন্যাসেও ভালো খেলোয়াড়ের উপমা হিসেবে ব্র্যাডম্যানের নামোল্লেখ লক্ষ করা যায়।

১৯৩৯-৪০ মরসুমে বাংলা দলের প্রথম রঞ্জি ট্রফি জয়, ক্রিকেটে বাংলার অবনমন ইত্যাদি বাংলা ক্রিকেটের তৎকালীন চিত্র মতি নন্দীর 'কলাবতী', 'বুড়ো ঘোড়া', 'ছায়া সরণিতে রোহিণী' প্রভৃতি উপন্যাস ও 'শূন্যে অন্তরীন', 'একটি ঐতিহাসিক সিচুয়েশন' প্রভৃতি ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার তাঁর ক্রিকেট সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতে সমসাময়িক বিখ্যাত ক্রিকেটারদের জীবনী ও তাঁদের নানা অভিজ্ঞতা, ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ক্রিকেট ম্যাচ সংক্রান্ত তথ্য উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যানের জীবনালেখ্য নিয়ে লেখা 'ক্রিকেটের রাজাধিরাজ'; ডন ব্র্যাডম্যান, রণজিৎ সিং, লেন হাটন প্রমুখ ক্রিকেটারদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে লেখা 'একদা ক্রিকেট'; বিশ্ব ক্রিকেটের নানা বর্ণময় ঘটনা নিয়ে লেখা 'ব্যাটের রাজা বলের উজীর' এবং ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে লেখা 'খেলার যুদ্ধ' প্রবন্ধগ্রন্থগুলির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ক্রিকেটের নিয়ম কানুন নিয়ে মতি নন্দী লিখেছেন 'ক্রিকেটের আইন কানুন' প্রবন্ধগ্রন্থ। আবার সত্তরের দশকে সীমিত ওভারের ক্রিকেট ম্যাচের সূচনা হয়, যা একদিবসীয়বা ওয়ান ডে ম্যাচ নামে পরিচিত। ক্রিকেটের এই সংস্করণ মতি নন্দীমেনে নিতে পারেননি। সেই ক্ষোভ থেকেই তিনি লিখেছিলেন 'চরম ও পরম টেস্ট ক্রিকেটেই', 'তবুও একদিনের ক্রিকেট দেখে থাকি'র মতো প্রবন্ধগুলি।

ক্রিকেটের ন্যায় ফুটবলেরও নানান কালজয়ী ঘটনাকে মতি নন্দী তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। মোহনবাগান ক্লাবের সাফল্য ও ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ের প্রসঙ্গ তাঁর 'কানাইলালের রেহাই' উপন্যাসে উল্লেখিত। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত টানা তিনবার মোহনবাগান ট্রেডস কাপ বিজয়ী হয়। এই উপলক্ষে কানাইলালের পিতা কৃষ্ণকিশোর সিং ক্লাবের ১১ জন ফুটবলারকে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজ করিয়েছিলেন।[৫] আবার ১৯১১ সালের আই.এফ.এ শিল্ড লিগে মোহনবাগান টানা ৫টি শক্তিশালী গোরা দলকে পরাজিত করে শিল্ডের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে শিল্ড বিজয়ের খ্যাতি অর্জন করে। এই ঐতিহাসিক জয়ে বাঙালিরা আত্মহারা হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে দেখা যায় নানা উন্মাদনা – কেউ নিজের জামা ছিঁড়ে, কেউ গড়াগড়ি দেয়, কেউ

নাচানাচি করে, ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যাদীপ, অপেক্ষারত মা বোনেরা শঙ্খ বাজান, উলু ধ্বনি দিতে থাকেন।[৬] বাঙালির এই অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বাস 'কানাইলালের রেহাই' উপন্যাসের কানাইলালের পিতার মধ্যেও দেখা যায়। তাই এই জয় উপলক্ষে তিনি "শান্তিপুর থেকে কীর্তন কুলনিধি শ্যামাপদ আচার্যকে আনিয়ে বাড়ির উঠোনে কীর্তন গাওয়ান, বাড়ির সামনে রাস্তায় মেরাপ বেঁধে যাত্রাপালা আর তরজা গানের আসর বসান, প্রায় দুশো কাঙালিকে এক আনা দক্ষিণাসহ খিচুড়ি খাওয়ান।"[৭] মোহনবাগানের সাফল্য ও ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ে বাঙালির উচ্ছ্বাসের চিত্র পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যেই মতি নন্দীউপন্যাসটিতে এই প্রসঙ্গগুলির উত্থাপন করেছেন।

মোহনবাগান, মহামেডান, ইস্টবেঙ্গল-এর মতোদেশীয় ক্লাবের উত্থানেগোরা ক্লাবগুলির আধিপত্য খর্ব হওয়ার পাশাপাশি এই ক্লাবগুলির মধ্যে এক প্রকার রেষারেষিও সৃষ্টি হয়েছিল।খেলার মাঠেতিন প্রধানের এই সংঘাতদলের সমর্থকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে প্রায়শই দেখা যেত দর্শক হাঙ্গামা, যার চরম পরিণতি১৯৮০ সালের ১৬ আগস্টের ঘটনা। ঐ দিন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের এক আপাতত গুরুত্বহীন লিগ ম্যাচ আয়োজিত হয়েছিল কলকাতার ইডেন গার্ডেনে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা যায় এবং ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে। ফলস্বরূপ পদপৃষ্ঠ হয়ে ১৬ জন ফুটবলপ্রেমীর মৃত্যু ঘটে। ভারতীয় তথা বাংলার ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত এই ঘটনাটির কথা সরাসরি না হলেও তার আভাস মতি নন্দীর 'ফেরারি', 'সারথির সারথি' উপন্যাসে এবং 'অন্ধকার থেকে অন্ধকার' ছোটগল্পে লক্ষ করা যায়। 'ফেরারি' উপন্যাসের নায়ক অনুপম ট্রাই ব্রেকারে গোল করতে ব্যর্থ হলে সারথির সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যা শেষ পর্যন্ত হাঙ্গামায় রূপান্তরিত হয়। এই হাঙ্গামার ফলে "টেন্টের সামনে লনে আটটা বডি এনে রেখেছিল। তা ছাড়া মরো মরো অবস্থায় কতজনকে যে হাসপাতালে নিয়ে গেছে ...।"[৮]অনুরূপ ভাবে দেখা যায় 'অন্ধকার থেকে অন্ধকার' ছোটগল্পেপ্রতুল ট্রাই বেকারের শেষ শটে গোল দিতে না পারায় গ্যালারিতে গণ্ডগোল বাঁধে যার ফলে ৬ জন দর্শক মাঠেই মারা যান। আবার 'সারথির সারথি' উপন্যাসের শেষে জ্যোতি নামক সারথি ক্লাবের এক ফুটবলারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া দর্শক হাঙ্গামার ফলে ১১ জনের মারা যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার ক্লাব ফুটবলে দর্শক বা ফুটবলারের হাতে রেফারি নিগ্রহের ঘটনা প্রায়ই দেখা যেত – ১৯৪৯ সালের ৭ জুলাই ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ানের খেলায় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের দ্বারা রেফারি সুশীল ঘোষ প্রহৃত হন। ১৯৫৬ সালের ২৮ জুন এই দুটি ক্লাবেরই আরেকটি খেলায় রেফারি বিজলী মুখার্জি আক্রান্ত হন। আবার ১৯৭৩ এর 14 আগস্ট ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচে মোহনবাগানের অধিনায়ক সুকল্যাণঘোষদস্তিদার ঘুসি মারেন রেফারি বিশ্বনাথ দত্তকে। বিশ্বনাথবাবু প্রায় অন্ধ হয়ে যান। রেফারি নিগ্রহের বাংলার ফুটবলের এই অন্ধকারময় দিকটি মতি নন্দী তাঁর 'দলবদলের আগে' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

বাংলা ফুটবলের পাশাপাশি মতি নন্দী ভারতীয় ফুটবল ও বিশ্ব ফুটবলেরও নানা ঘটনা তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। 'নারান' উপন্যাসে ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ভারতীয় ফুটবল দলের ১-১০ গোলে শোচনীয় হারের লজ্জার ইতিহাসের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। ১৯৬২ সালের জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতীয় ফুটবলারদের কথা রয়েছে'দলবদলের আগে' উপন্যাসে। 'ব্লেজার' গল্পে ১৯৮২-রদিল্লি এশিয়াডের টুকরো টুকরো চিত্রের কোলাজ আছে। বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে লেখা মতি নন্দীর প্রবন্ধগ্রন্থটির নাম 'বিশ্বকাপ ফুটবল : ষাট বছর', যেখানে রয়েছে ১৯৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের সূচনা থেকে ১৯৯০ বিশ্বকাপের তথ্যপূর্ণ ইতিহাস।

সাঁতারকে কেন্দ্র করে লেখা মতি নন্দীর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'কোনি'তে ক্লাব ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতার পাশাপাশি জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়ানশিপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রীড়াসাংবাদিক হওয়ার দরুন মতি নন্দীকে সাঁতারের এই প্রতিযোগিতাগুলির রিপোর্ট করতে হতো। এই রকমই একবার মাদ্রাজে জাতীয় সাঁতারের রিপোর্ট করতে গিয়ে মতি নন্দী বাংলার সাঁতারু ইলা পাল ও বুলা নাথকে কাছ থেকে দেখেছেন। অনেকের মতে উপন্যাসটির কেন্দ্রিয় চরিত্র কনকচাঁপা পাল ওরফে কোনি চরিত্রটি বাংলার এই সাঁতারুদের আদলেই রচিত। কারণ কোনির মতো তাঁরাও ছিলেন দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। এমনকি মতি নন্দী সম্পাদিত 'মাঠ ময়দান'-এ এঁদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল।[৯] তবে উপন্যাসে কোথাও এঁদের নাম সরাসরি পাওয়া যায়নি। অপরদিকে মতি নন্দীর ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট ক্রীড়াসাংবাদিক রূপক সাহার মতে মতি নন্দী 'কোনি' নামটি বিখ্যাত জার্মান সাঁতারু কর্নেলিয়া এনডারের ডাকনাম 'কোনি' থেকে গ্রহণ করেছেন।[১০] তবে এক্ষেত্রেও মতি নন্দী নিজে কোনোদিন কর্নেলিয়া এনডারের নাম নিয়ে আলোচনা করেননি। পরবর্তীতে মতি নন্দী জানান যে 'কোনি' উপন্যাসটি প্রবাদ প্রতিম অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু ডন ফ্রেজারের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত।[১১] ডন ফ্রেজার ১৯৫৬-র মেলবোর্ন অলিম্পিক, ১৯৬০-র রোম অলিম্পিক এবং ১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকে টানা তিনবার ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে স্বর্ণপদক পেয়ে

রেকর্ড গড়েছিলেন। এই তিনটি অলিম্পিকে তিনি ৪টি স্বর্ণপদক সহ মোট ৮টি পদক জিতেছিলেন। ১৯৫৬-র মেলবোর্ন অলিম্পিকে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে তিনি বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর সময় ছিল ১.০২ মিনিট। পরবর্তীতে ১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকেতিনি নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙে , ১০০ মিটার সাঁতারের জন্য সময় নেন ১ মিনিটেরও কম ৫৯.৫ সেকেন্ড। মতি নন্দীর 'কোনি' উপন্যাসে একাধিকবার ডন ফ্রেজারের নাম বিভিন্ন প্রসঙ্গের সঙ্গে তাঁর রেকর্ডের তথ্যটিও উঠে এসেছে। তাছাড়া ১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকে ৪টি স্বর্ণপদক জিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আমেরিকার সাঁতারু ডন শোলান্ডারের কথাও এই উপন্যাসে উত্থাপিত হয়েছে। আবার এই উপন্যাসে আরেক বিশ্বখ্যাত ক্রীড়াবিদের উল্লেখ রয়েছে, তিনি হলেনম্যারাথন দৌড়বিদ আবেবে বিকিলা।ইথিওপিয়ার মতো ছোট দেশ থেকে উঠে আসা এই ক্রীড়াবিদ ১৯৬০-র রোম অলিম্পিকে খালি পায়ে দৌড়ে ম্যারাথনে প্রথম স্থান হিসেবে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় এই প্রতিযোগিতায় তিনি বিশ্বরেকর্ডও গড়েছিলেন। পরবর্তী ১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকেও তিনি স্বর্ণপদক জিতেন এবং এক্ষেত্রেও তিনি বিশ্বরেকর্ড গড়েন। মূলত কোনির মতো গরিব পরিবার থেকে উঠে আসা সাঁতারুদের অনুপ্রাণিত করতেই মতি নন্দী এই বিশ্বখ্যাত ক্রীড়াবিদের প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপিত করেছেন।

আবার মতি নন্দীর সাহিত্যে পরিবেশিত হয়েছে বিশ্বখ্যাত ক্রীড়াবিদদের নানা জানা-অজানা কথা। এই রকমই বক্সিং নিয়ে লেখা তাঁর 'শিবা' উপন্যাসে বিখ্যাত বক্সার মহম্মদ আলির প্রসঙ্গলক্ষণীয়। উপন্যাসটিতে মহম্মদ আলি বিখ্যাত হওয়ার পূর্বে যখন ক্যাসিয়াস ক্লে ছিলেন তখনকার কথা উঠে এসেছে। আবার 'অপরাজিত আনন্দ' উপন্যাসে উল্লেখ রয়েছে রোমানিয়ার ডিস্কাস নিক্ষেপকারী লিয়া মানোলিউয়ের কথা। তিনি ১৯৫২-র হেলসিঙ্কি অলিম্পিক থেকেপ্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করলেও তাঁর কাঙ্খিত স্বর্ণপদকটি আসে ষোল বছর পর ১৯৬৮-র মেক্সিকো সিটি অলিম্পিকে যখন তাঁর বয়স ৩৭ বছর। এর মধ্যবর্তী ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪-এর প্রত্যেকটি অলিম্পিকেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। স্বর্ণপদক পাওয়ার আগে "ওকে ট্রেনিং ক্যাম্পে আসতেই বারণ করেছিলেন ওদের ফেডারেশন, বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য। বলেছিল, তোমার দ্বারা আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং মিছিমিছি কেন আর ট্রেনিংয়ে আসা। এর ন'মাস পরেই সে সোনা জেতে মেকসিকোয়।"[১২] লিয়া মানোলিউয়ের এই হার না মানার মনোভাব শিশু-কিশোর থেকে বয়স্ক যেন সবাইকেই উদ্বুদ্ধ করে। সেই প্রয়াসার্থেই মতি নন্দী মানোলিউয়ের ঘটনাটি এত নিখুঁত ভাবে 'অপরাজিত আনন্দ' উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন। এইভাবেই মতি নন্দী তাঁর সাহিত্যে দেশ-বিদেশের নানা খেলায় ঘটে যাওয়া নানা কালজয়ী ঘটনা ও তার কুশীলবদের সংগ্রামী জীবন কথা, বিশ্বখ্যাত বহু ক্রীড়াবিদদের জানা-অজানা কথাকে স্থান দিয়ে বাংলার কিশোর-মনকে ক্রীড়া ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করেছেন, তাদের খেলার যুদ্ধে তথা জীবন-যুদ্ধে হারা না মানার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি :

নন্দী, মতি, নক্ষত্রের রাত, দ্র. মতি নন্দী উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, সম্পা. নিতি নন্দী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০৭৩,পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০১৮, পৃ. ১০।

নন্দী, মতি,অ্যাই মোহিত, দ্র.মতি নন্দী, সম্পা. মানস চক্রবর্তী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ: ৩ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩২৪।

নন্দী, মতি, অপরাজিত আনন্দ, দ্র. মতি নন্দী কিশোর সাহিত্য সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. নিতি নন্দী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০০৬, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৪৮৩।

নন্দী, মতি, অস্থায়ী পলায়ন, দ্র. মতি নন্দী ছোটগল্প সমগ্র, সম্পা. মানস চক্রবর্তী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ১লা বৈশাখ ১৪২৬, পৃ. ১৭৯।

নন্দী, মতি, কানাইলালের রেহাই, দ্র. মতি নন্দী উপন্যাস সমগ্র ২য় খণ্ড,দীপ প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ :২০১৯, পৃ. ৩১৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়,কৌশিক,১৯১১ বাঙালির ঐতিহাসিক ফুটবল যুদ্ধ, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ :জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৩৪-৩৫।

নন্দী, মতি, কানাইলালের রেহাই, দ্র. মতি নন্দী উপন্যাস সমগ্র ২য় খণ্ড, দীপ প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৯, পৃ. ৩১৫।

নন্দী, মতি, ফেরারি, দ্র. মতি নন্দী কিশোর সাহিত্য সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. নিতি নন্দী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০০৬, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮, পৃ. ২০৩।

সাহা, রূপক, তারক চ্যাটার্জি লেনের সেই লোকটা, রোববার, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭০০০৭২, ২৪ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৯-২০।

ঐ।

রায়, পারমিতা, সোজা ব্যাটে মতি নন্দী, দ্র. মতি নন্দী, সম্পা. মানস চক্রবর্তী, দীপ প্রকাশন,কলকাতা – ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ : ৩ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৮১।

নন্দী, মতি, অপরাজিত আনন্দ, দ্র. মতি নন্দী কিশোর সাহিত্য সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. নিতি নন্দী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০০৬, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৫১০।

....

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ফেরিজীবীরা : ভাষা ও সংস্কৃতির নতুন দিক

ড. সাগর দেবনাথ
রাজ্য সহায়ক কলেজ শিক্ষক : বাংলা বিভাগ, রানাঘাট কলেজ

সারসংক্ষেপ :

রাস্তাঘাটে, হাট-বাজারে কিংবা ভিড় অথবা ফাঁকা ট্রেনে অজস্র কর্মমুখর কলরবে মিশে থাকা একেবারেই অন্যরকম একটা স্বরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমরা চলাফেরা করি। সেই একেবারে অন্যরকম স্বরটি হল, জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে জীবন থেকে উঠে আসা এক চলমান বাক্ -বিন্যাস— ফেরি বিজ্ঞাপন। তাদের জীবন-চর্যার চলমান রূপকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলে তাদের বাক্-শৈলী তথা জীবন-শৈলীর প্রতি উৎসুক না হয়ে পারা যায় না। এই ঔৎসুক্য থেকেই তাদের কথা বলা যেমন আমরা নিখুঁতভাবে শোনার চেষ্টা করেছি, তেমনি চেয়েছি তাদের হাঁটা-চলা খুঁটিয়ে লক্ষ করতে। এই চেষ্টা চালাতে চালাতেই আমরা দেখেছি তাদের রোজকার জীবন-সংগ্রাম। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে করতেই তারা অধিকাংশ জন বেছে নিয়েছে এই পেশা। জীবন-ধারণের তাড়না তাদের পথের মাঝখানে নিয়ে এসেছে। নিয়ে এসেছে রেলকামরার যাত্রী-ভিড়ের মাঝে। সেখানেই নিত্যদিন আবর্তিত হয়ে চলেছে তাদের নিজস্ব সেন্টিমেন্ট, নিজস্ব প্যাশন এবং সর্বোপরি নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ ও যাপন-যন্ত্রণা। আর 'সংসার চালানো'র আবশ্যিক এই কর্তব্য নির্বাহ হয়ে চলেছে তাদের একান্ত নিজস্ব ভাষিক চেহারায়। পেশাগত কারণে ফেরিবৃত্তিধারীদের যে নিজস্ব বুলি রয়েছে তার কথন-রূপটি দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীর সাধারণ চেহারা থেকে আলাদা।

ফেরি-চিত্র নানা রূপে নানা ভঙ্গিমায় প্রাচীন-মধ্য পর্ব পেরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-মানিক উজিয়ে একেবারে এই একুশ শতকের দুইয়ের দশকেও বাংলা সাহিত্যে অলংকৃত। বাঙালির অন্দরমহলেও একইভাবে ফেরি-সংলগ্ন যাপন-চর্যা আপন-স্রোতে বহমান। এই দীর্ঘ সময়-পর্বে যাপিত জীবন-বিভঙ্গে জড়িত ভাষাগত অনুষঙ্গ (মূলত তাদের ডাক বা হাঁক) সময়ের দাবি মেনেই বিবর্তিত হয়েছে এবং বহমান থেকেছে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বরাবরই এই বিবর্তমান অনুষঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রায়বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত একটি ইংরেজি প্রবন্ধে কলকাতার ফেরিওয়ালাদের সারা দিনের সময়-ক্রম মেনে বিচিত্র সব ফেরি-ডাক উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এর অনেকগুলিই বর্তমানে হারিয়ে গেছে। সে যাই হোক, স্থান ভেদে ডাকের মধ্যে যে একটা পার্থক্য গড়ে ওঠে সে-কথা শ্রী দত্ত নিজ-অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন। আর এই সূত্রেই আমরা বলতে পারি সময়ান্তরে বা কাল-ভেদে এই ডাক একদিন বদলাবে এবং বিলুপ্ত হবে। সেই সঙ্গে আবার নতুন ডাক যুক্তও হবে। বলাই বাহুল্য যে, সেটাই স্বাভাবিক এবং সেটা আমরা বাংলা সাহিত্যেও লক্ষ করেছি। উনিশ, বিশ ও একুশ শতকের লেখালিখিতে ফেরি-ডাক এই সংযোজন-বিয়োজন-রূপান্তরের মধ্য দিয়েই আমাদের সামনে হাজির হয়েছে।

সূচক শব্দ :
ফেরিওয়ালা, হকার, জ্ঞাপন-পদ্ধতি, ফেরি-বুলি, ফেরি-বিজ্ঞাপন, গত-বাঁধা কথন, বাগ্‌ধ্বনি, সম্ভাষণ-পদ, অতিরিক্ত বাক্, বাগাড়ম্বর, সুরবিন্যাস।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ 'হকার' [*hawker*] বলতে বুঝিয়েছেন—"যে পণ্য বহন করিয়া বিক্রয় করে; ফেরিওয়ালা"।[১] আর 'ফেরিওয়ালা'র অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি 'ফেরি'/'ফেরী' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে—"পণ্যবিক্রয়ার্থে

গ্রামে গ্রামে বা গলি গলি ফেরা বা বেড়ান; গ্রামে গ্রামে বা বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া পণ্য বিক্রয় (*hawking*)"।[২] এই সূত্রেই 'ফেরিওয়ালা'/'ফেরীওয়ালা'-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন খুব সহজে— "ফেরী করিয়া বেচার ব্যাপারী (*hawker*)"।[৩]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত ও সম্পাদিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এও 'হকার'-এর অর্থ হিসাবে 'ফেরিওয়ালা' প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর 'ফেরি' ও 'ফেরিওয়ালা' বলতে বোঝানো হয়েছে— "ফেরি, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বিক্রয় করা; ফেরিওয়ালা, যে ফেরি করিয়া বেড়ায়"।[৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই অভিধানে পালিভাষায় ফেরিওয়ালার কাজের নাম কী ছিল তাও জানানো হয়েছে। নামটি হল 'কচ্ছপুটবাণিজো'। এর অর্থ যে-বণিক পণ্যভাণ্ড বা পাত্র কাঁখে নিয়ে ফেরি করে। আর 'সংসদ বাংলা অভিধান'-এ 'হকার' সম্পর্কে লেখা হয়েছে— "ফেরিওয়ালা; যে হেঁকে হেঁকে পণ্য বিক্রি করে [ইং. hawker]"।[৫] অন্যদিকে 'চলন্তিকা'য় রাজশেখর বসুও 'হকার'-এর অর্থ করেছেন 'ফেরিওয়ালা'। আর 'ফেরিওয়ালা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'ফেরি' শব্দের অর্থ করেছেন— "রাস্তায় চলিয়া বা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বিক্রয়"।[৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুকুমার সেন অনুমান করেছেন 'ফির' ধাতুটি 'স্ফির'-এর রূপান্তরিত রূপ, যা বৈদিক শব্দ 'স্ফুর' ('আবর্তন করা')–এর সঙ্গে তুলনীয়। আর এই ধাতুটি 'চক্রাকারে আবর্তিত হওয়া' বা 'ঘুরে আসা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৭] আর 'ফির' থেকে উৎপন্ন হয়েছে 'ফেরি' বিশেষ্যটি। যদিও এটি ব্যবহৃত হয় 'পারাপার' অর্থে।[৮] এই সূত্রে আমাদের মনে হয় যে, এই বিশেষ্যটির সঙ্গে 'কর্' মৌলিক ধাতুটি যোগ ক'রে 'ফেরি কর্' যুক্ত ধাতু তৈরি হয়েছে এবং তা বিভক্তির সংযোগে 'ফেরি করা' (বিক্রি করা অর্থে) যুক্ত ক্রিয়ার রূপ গঠন করেছে। তবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ অভিধানকার 'হকার' শব্দটিকে 'ফেরিওয়ালা' অর্থে ব্যবহার করলেও সুকুমার সেন এর অর্থ করেছেন 'চিৎকার'। সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব'-এ উল্লিখিত 'অব হক্কার' এই 'হকার' বিশেষ্যের জন্মদাতা ব'লে তাঁর অভিমত।[৯] আবার নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত 'বিশ্বকোষ'-এ 'হকার' শব্দটির পরিচিতি একেবারে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। সেখানে "হকার (পুং) হ স্বরূপে কার। হ এই বর্ণ"[১০] বলা হয়েছে। তবে "হক্ক (পুং) হক্ ইত্যব্যক্তশব্দেন কায়তীতি, কৈ-ক। গজ-সমাহ্বান। হাতীর ডাক। (জটাধর); হক্কার (পুং) হক্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং। আহ্বান।"[১১], "হক্ক পুং [ধ্বন্যাত্মক ; 'হক্ক শব্দ বিশেষ (পৈ)] গজসমাহ্বান, হাতীকে ডাকার শব্দ।... ; হক্কার পুং [ধ্বন্যাত্মক] হক্-শব্দ ; আহ্বান"[১২] কিংবা "*hak*, ind. (onomat.) the sound ***hak.***— **kāra,** making the sound *hak*, calling, calling to, L. ; **Hakka,** m. calling to an elephant"[১৩]— এই প্রকার আভিধানিক নিদানগুলোর সঙ্গে সুকুমার বাবুর সংশ্লিষ্ট ভাবনার সংযোগ রয়েছে।

আহমদ শরীফ সম্পাদিত একটি অভিধানে 'হকার' শব্দের অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে 'সংবাদপত্র বিক্রেতা'কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— "১বি. ফেরিওয়ালা, ২বি. যারা প্রতিদিন ফেরী করে খবরের কাগজ ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে।"[১৪] আবার 'বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ'-এ 'হকার' বলতে কেবল বাড়ি বাড়ি ঘুরে পণ্য বিক্রয়কারীকে বোঝানো হয় নি। অন্যান্য জনবহুল স্থানে পণ্য বিক্রেতা ও বিভিন্ন শ্রেণির সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিকেও 'হকার' বা 'এক ধরনের ভাসমান বণিক' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এদের কর্ম-পদ্ধতিও উল্লেখিত হয়েছে, যার দ্বারা তাদের বৃত্তিগত পরিচিতি স্পষ্ট হয়েছে। 'হকার' (Hawkers) সম্পর্কে লেখা হয়েছে— "ফেরিওয়ালা, নগর ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদে ব্যবসায়ী। হকাররা বাড়ি বাড়ি ঘুরে অথবা অন্যান্য জনসমাগমে পণ্য ও সেবা ফেরি করে। এরা এক ধরনের ভাসমান বণিক এবং এটি দেশের একটি সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী পেশা।..."[১৫]

মূলত এই জ্ঞানকোষে কিছু 'ক্ষুদ্র পেশাজীবী'দের 'হকার' বলতে চাওয়া হয়েছে। এই 'ক্ষুদ্র পেশাজীবী'দের মধ্যে কারা পড়তে পারেন তা কয়েকটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পিঠা বিক্রেতা, ফল বিক্রেতা, নাপিত, হাতুড়ে ডাক্তার, বিভিন্ন ধরনের হাল্কা খাবার বিক্রেতা, সাইকেল ও রিকশা মেরামতকারী ব্যক্তি প্রমুখ শ্রেণীকে এই পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিতান্ত অল্প মূলধন নিয়ে এরা জীবিকায় নামে। এই জ্ঞানকোষে আবার তাদের মূলধনের আনুমানিক পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অনধিক এক হাজার টাকা। এদের মধ্যে অনেকেই কোনো একটি জায়গায় অস্থায়ী রূপে পণ্য বিক্রি করে অথবা পরিষেবা প্রদান করে।

আসলে 'রাস্তার ফেরিওয়ালা' আর 'ট্রেনের হকার' শেষ পর্যন্ত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তবে সাধারণ মানুষের ভাবনায় 'ফেরিওয়ালা' ও 'হকার' নিয়ে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য থেকেই যায়। রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালারা যে হেঁকে হেঁকে ফেরি করে এবং তাদের বিজ্ঞাপনী বক্তব্য প্রচার করে, তাতে সাধারণত ক্রেতারা তাদের নাগালের বাইরে থাকেন। আর সেই কারণে তাদেরকে ক্রেতার মর্জি ও সুবিধা-অসুবিধার

ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়। কেবল আগ্রহী ক্রেতারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে ফেরিওয়ালা তার কাঙ্ক্ষিত বক্তব্যখানির বিস্তার ঘটাতে পারে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরী যে, সাধারণত যেসব অঞ্চলে বাজার অথবা হাটের অভাব রয়েছে সেইসব অঞ্চলেই ফেরিওয়ালাদের আনাগোনা বেশি থাকে। কেননা হাট-বাজার সমৃদ্ধ অঞ্চলের বাসিন্দারা সাধারণত বাজারে গিয়েই কেনাকাটা করেন। তবে এইসব অঞ্চলেও গৃহবধূদের কাছে ফেরিওয়ালারা আদরণীয়। আর পল্লী-গ্রামে তারা বাড়ির ভেতরেও প্রবেশ করে এবং গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীকে তার বিক্রেয় পণ্য কেনার জন্য অনুরোধ বা আবদার করে।

এছাড়াও আরেকটি কথা বলার যে, এক্ষেত্রে ক্রেতারা অধিকাংশই গৃহকর্ত্রী কিংবা ঘরের মহিলা। এর নেপথ্য-কারণ অবশ্য রয়েছে। সাধারণত পুরুষরা জীবিকার প্রয়োজনে দিনের বেলাতে ঘরের বাইরেই কাটান এবং ফেরিওয়ালারা দিনের বেলাতেই ফেরি করে, রাতে খুব একটা করে না। সেই কারণে ফেরিওয়ালার কাছে মহিলারাই অন্যতম (একমাত্রও বলা যায়) ক্রেতা। (এক্ষেত্রে শহর হলে 'সেলস্‌ম্যান' সমগোত্রীয় ভূমিকা নেয়।) আর তার সংখ্যাটাও এক্ষেত্রে রেল-যাত্রীর তুলনায় একেবারেই অল্প।

অন্যদিকে ট্রেন-বাসের ভিড়ের মধ্যে একসঙ্গে অধিক সংখ্যক ক্রেতাকে দিনে ও রাতে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাওয়ার সুযোগকে আশ্রয় করল যারা, তারাই পরিচিত হল 'হকার' রূপে। এখন প্রশ্ন এই যে, কারা এই সুযোগকে আশ্রয় করল এবং কেন তারা শহর-গ্রামের অলি-গলি ছেড়ে পরিবহণ-কেন্দ্রিক এক নতুন দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিল? এর উত্তর রয়েছে দেশ-বিভাজনের পরবর্তী সংগ্রামী ইতিহাসের মধ্যে। মূলত, আমাদের দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পর অধুনা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে অসংখ্য শরণার্থীর ঢল নামে তাদের কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতাই ছিল এর বড় কারণ। তারা যেন একেকজন 'হাল ভাঙা নাবিক'। সম্পূর্ণ দিশাহীন।

এই সময় দু'মুঠো অন্নসংস্থানের জন্য যে যা কাজ খুঁজে পেল তাই গ্রহণ করল। কোনোরকম বাছবিচার করল না। ওপার বাংলায় হয়তো যিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এপার বাংলায় ভাগ্যের ফেরে তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন কারখানার মজুর কিংবা কুলি। আবার যিনি ছিলেন হয়তো সম্ভ্রান্ত কৃষক তিনি হলেন হালুইকর কিংবা সাফাইকর্মী। এমনই পেশাগত বিচ্যুতি ঘটলো ভারতে আগত উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর কোনো কোনো সদস্যের। অধিকাংশ শিক্ষিত যুবতী মেয়েরা এইসময়ই প্রথম ঘর থেকে বেরিয়ে এল রুজির টানে। তারা উদ্বাস্তু-শিবিরের আশপাশের এদেশীয় শহুরে সচ্ছল পরিবারে গৃহশিক্ষকতার কাজ নিল। আর অধিকাংশ যুবক প্রায় বিনা-পুঁজি কিংবা স্বল্প-পুঁজিতে নেমে পড়ল এই হকারি পেশাতে। অনেক ক্ষেত্রেই এরা ট্রেনে-ট্রামে-বাসে বিভিন্ন কম্পানির রকমারি পণ্য ক্যানভাসিং করার কাজে যুক্ত হল চুক্তির ভিত্তিতে। যেহেতু ভিড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরির কাজ সেহেতু বয়স্কদের তুলনায় যুবকদেরই এই কাজে বেশি যুক্ত হতে দেখা গেল। তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃষ্ণলালের মত বয়স্ক ক্যানভাসার একেবারে বিরলও নয়।

এরাও ফেরিওয়ালা। কিন্তু বাঙালির মানস-পটে ট্রেন-বাসের ভিড়ের মাঝে ফেরি করতে আসা স্বাধীনতা পরবর্তী কর্মহীন এই শরণার্থী ফেরিওয়ালারা পরিচিত হলেন 'হকার' রূপে। আর আমাদের ভাবনানুসারে এই দুই ফেরিওয়ালার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম ভেদরেখা রয়েছে যেগুলি সম্ভবত সাধারণ বাঙালির অবচেতনে গেঁথে গিয়েছে।

এই হকার বা ফেরিওয়ালারা পণ্য বিক্রির সময় ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত জ্ঞাপন-পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলো কিন্তু তাদের পেশাগত গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য-সূচক ব্যবহারিক পদ্ধতি (প্রকারান্তরে চিহ্ন স্বরূপও)। পরিচয়-জ্ঞাপক এই পদ্ধতিকে আমরা প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি।

হকার-ফেরিওয়ালার জ্ঞাপন-পদ্ধতি

⇩ বাগ্‌ধ্বনি নির্ভর | ⇩ সাধারণ আওয়াজ নির্ভর | ⇩ বাগ্‌ধ্বনি ও সাধারণ আওয়াজ নির্ভর

(ক) বাগ্‌ধ্বনি নির্ভর জ্ঞাপন-পদ্ধতি : ক্রেতাদের সঙ্গে কথোপকথন অথবা ক্রেতাদের উদ্দেশে বুলি নিক্ষেপণের মধ্য দিয়ে হকার-ফেরিওয়ালারা এই পর্যায়ের জ্ঞাপন-কার্য সমাধা করে। কণ্ঠের বিচিত্র প্রয়োগ এখানে মুখ্য ভূমিকা নেয়। অবশ্য এর পাশাপাশি অঙ্গভাষা, স্পর্শভাষা ও স্থিতিভাষারও একটি গুরুত্বপূর্ণ নেপথ্য-ভূমিকা থাকে। আর এক্ষেত্রে ভাষার বাচনিক, অবাচনিক ও অতিবাচনিক তিনটি রূপেই ক্রিয়াশীল থাকে। বলাই বাহুল্য আমাদের রাজ্যে এই মাধ্যম ব্যবহারকারী হকার-ফেরিওয়ালার সংখ্যাই বেশি। ট্রেনে-বাসে, হাটে-বাজারে কিংবা অলিতে-গলিতে এই পন্থা অবলম্বনকারী ফেরিওয়ালাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আমরা উল্লেখ করছি।

১. রেল-হকার : নানা প্রকার খাবার বিক্রেতা, কসমেটিক্স বিক্রেতা, নিত্য প্রয়োজনীয় গার্মেন্টস বিক্রেতা, সাংসারিক দ্রব্য বিক্রেতা, শিশু-মনোরঞ্জক খেলনা বিক্রেতা, ধর্মীয় সংস্কারমূলক দ্রব্য বিক্রেতা, রোগ নিরাময়-সঙ্কল্পক দ্রব্য বিক্রেতা, গৃহসজ্জামূলক দ্রব্য বিক্রেতা, শিক্ষা সম্পর্কিত দ্রব্য বিক্রেতা প্রমুখ। এছাড়া দক্ষতা বিক্রয় করতে আসা জুতো পালিশওয়ালা ও হাত-ঘড়ির রক্ষাকবচওয়ালা (রিস্টওয়াচ-প্রটেক্টর তৈরির কারিগর)-র কথাও আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। যদিও মোবাইলের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় হাত-ঘড়ির ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে। আর সেই কারণে রেল-কামরায় এদের উপস্থিতি এখন তেমন চোখে পড়ে না।

২. বাস-হকার : রেল-হকার ও এদের বিক্রেয় পণ্যের মধ্যে ফারাক নেই। তুল্য-মূল্য বিচারে এরা কেবল সংখ্যায় কম।

৩. হাট-বাজারের ফেরিওয়ালা : রেল বা বাসে ফেরি করা হকাররা যেসব পণ্য ফেরি করে, তার অধিকাংশই এরা ফেরি করে। এর সঙ্গে এরা আরও অনেক কিছুই ফেরি করে, যা ট্রেন-বাসের হকাররা করে না। আসলে চলন্ত ট্রেন-বাসের ভিড়ে এইসব দ্রব্য ফেরি করা কার্যত অসম্ভব বলেই তারা সেসব ফেরি থেকে বিরত থাকে। এইসব দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ফার্নিচার, শুকনো মাছ (শুঁটকি), ছাগল, গোরু, হাঁস, মুরগি ও মুরগির ছানা, হাঁস বা মুরগির ডিম, বিভিন্ন প্রকার চারা (কচি গাছ), মাছ, আইসক্রিম, বিচুলি (খড়), ঘুঁটে, শিমুল তুলো প্রভৃতি।

৪. অলিগলির ফেরিওয়ালা : হাটবাজারের ফেরিওয়ালার সঙ্গে এদের মূল প্রভেদ হল এরা শুধু পণ্য বিক্রয় করে না, ক্রয়ও করে। পাড়ায় পাড়ায় হাঁক দিয়ে কিংবা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কেউ কেউ যেমন উপরোক্ত পণ্য-সম্ভার বিক্রি করে, তেমন আবার এক শ্রেণির ফেরিওয়ালা পণ্য কেনে।

এই প্রকারের ফেরিওয়ালাদের কেউ কেউ নগদ পয়সায় দ্রব্য কেনে, কেউ কেউ আবার প্রাচীন যুগের ধারা এখনও বজায় রেখেছে— বিনিময় প্রথা। যেমন আইস্ক্রিম, দিলখুশ পাঁপড়, তিলেখাঁজা, মটকা বা শোনপাপড়ি প্রভৃতির বিনিময়ে অনেক ফেরিওয়ালারা ঘরের অব্যবহার্য সরঞ্জাম কেনে; অনেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সাংসারিক দ্রব্যের বিনিময়ে পুরানো পোশাক কেনে; অনেকে আবার নিত্যপ্রয়োজনীয় সাংসারিক দ্রব্যের বিনিময়ে ছেঁড়া চুল (কেবল ঝ'রে যাওয়া নারীর মাথার চুল) কেনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুপ্রিয় চৌধুরী তাঁর 'আরেকটা কলকাতা' গ্রন্থে 'কলকাতার বিচিত্র পেশা' নামক অংশে আরেকপ্রকার বিশেষ ফেরিওয়ালার সন্ধান দিয়েছেন, যারা চুক্তির ভিক্তিতে নানা স্থান থেকে নিয়মিত কিছু নির্দিষ্ট জিনিস কিনে নানা স্থানে নিয়মিত বিক্রি করে। এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ফেরির ধাঁচাতেই সম্পূর্ণ হয়। পার্থক্য কেবল, অন্যান্য ক্ষেত্রে ফেরিওয়ালার 'কাস্টোমার' যেমন অনিশ্চিত থাকে, এক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যাপার নেই, বরং রয়েছে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা। সুপ্রিয়বাবুর নিজস্ব পর্যবেক্ষণে এই বিষয়ক যে-চিত্রখানি ধরা পড়েছে তা উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

"...সেই কাকভোরে, সূর্যের আলো ঠিকঠাক ফোটার আগেই সাইকেলের পিছনে ড্রাম ঝুলিয়ে এরা (ভেড়ি অঞ্চলের মানুষ) বেরিয়ে পড়বে বাড়ি থেকে। চলে আসবে আমাদের এই শহরে। দোকান দোকান ঘুরে সংগ্রহ করবে মুরগির বর্জ্য।... গ্রামে অপেক্ষারত ক্রেতার দল, ভেড়ির মালিকের লোকজন।..."[১৬]

এছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এই শ্রেণিটির মধ্যে দক্ষতার বিনিময়ে উপার্জনকারী ফেরিওয়ালার সংখ্যা বেশি। এরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে নিজেদের দক্ষতা ফেরি করে রোজগার করে। ট্রেন-বাস বা হাট-বাজারে এদের উপস্থিতি কম। এর কারণটি একবারে দৈনন্দিন জীবন ও চাহিদার সঙ্গে সমানুপাতিক সম্পর্কের। সাংসারিক ও গৃহ-কর্মে অতি প্রয়োজনীয় যেসব কাজ খুঁটিনাটি সমস্যার কারণে বিঘ্নিত হতে থাকে, সেসব সমস্যা পূরণে এরাই একমাত্র উদ্ধারকর্তা। ট্রেনে-বাসে বা পথে-ঘাটে এই প্রকার তেমন কোনো সমস্যা না থাকার জন্য এই ফেরিওয়ালাদের চাহিদা সেখানে কম। ঠিক এই কারণেই শহর হোক, গ্রাম বা গঞ্জ— অলিতে গলিতে এদের বাহারি সুরে হাঁক দিয়ে ফেরা একটা পরিচিত চিত্র।

(খ) সাধারণ আওয়াজ নির্ভর জ্ঞাপন-পদ্ধতি : অনেক ফেরিওয়ালা কোনো বাগ্‌ধ্বনি ব্যবহার না করে কেবল নানারকম বস্তু ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের উপভোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কখনও ঘণ্টা বা ঘুঙুর বাজিয়ে, কখনও বেলুনে হাত ঘষে আওয়াজ তুলে ফেরিওয়ালারা নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়। আবার কখনও ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভে রেকর্ড করা বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হয়। এক্ষেত্রে তাদের কণ্ঠের ব্যবহার একেবারেই গৌণ। তবে রেল-হকারদের মধ্যে এই উপায় অবলম্বনে ফেরি করতে একটু কম দেখা যায়।

নীচে এই মাধ্যম ব্যবহারকারী কিছু ফেরিওয়ালার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

১. ঘণ্টা বাজিয়ে :

(অ) বড়ো ঘণ্টা ব্যবহারকারী (দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে; সেই দড়ি টেনে আওয়াজ তোলেন)— আইসক্রিম বিক্রেতা, কুলফিমালাই বিক্রেতা, আচার বিক্রেতা, ফুচকা বিক্রেতা প্রমুখের ক্যানভাসিং এই রীতি নির্ভর।

(আ) ছোটো ঘণ্টা ব্যবহারকারী (মুঠোয় রেখে হাত নাড়িয়ে বাজান)— ঝুড়িভাজা বিক্রেতা, বুড়ির সুতো বিক্রেতা, চিনির গাঁঠিয়া বিক্রেতা প্রমুখের এই পন্থা ব্যবহারে আগ্রহ দেখা যায়।

২. পাইপ-বেলুনে হাত ঘষে আওয়াজ তুলে : ছেঁড়া চুল কিনতে আসা ফেরিওয়ালার ক্যানভাসিং-এ কেবল এই রীতিটির ব্যবহার চোখে পড়ে।

৩. ঘুঙুর বাজিয়ে (হাত দিয়ে) : ঘটিগরম বিক্রেতাকে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

৪. মগে চামচ ঠুকে : অনেক ঝালমুড়ি বিক্রেতা ট্রেনে-বাসে মুড়ি-মসলা মাখানোর মগে চামচ ঠুকে ঠুকে বাহারি-আওয়াজ তোলে এবং সেই আওয়াজের মধ্য দিয়ে তার পণ্যটি বিজ্ঞাপিত করে। মুখে কিছু বলে না।

৫. রেকর্ড বাজিয়ে : অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সংশ্লিষ্ট ফেরিওয়ালা তার পণ্যের প্রচার-কাজটি করছে প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। আগে থেকে ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভে সংরক্ষণ করে রাখা পণ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন বিশেষ শব্দ-যন্ত্রের মাধ্যমে চালিয়ে মাইকে প্রচার করা হয়। এতে কণ্ঠের শ্রম যেমন লাঘব হয়, ঠিক তেমন বাচন-কৌশলে অপটু ফেরিওয়ালার ক্যানভাসিং-এর ঝক্কি পোয়াতে হয় না। সাধারণত এই পন্থা অবলম্বনে ফেরি করা ফেরিজীবীরা তিন-চাকার ভ্যান-রিক্সায় সমস্ত যন্ত্রপাতি ও পণ্য গুছিয়ে রাস্তা-অলি-গলি কিম্বা বাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। দিলখুশ, আইসক্রিম, আচার বিক্রেতাদের মধ্যে এই পন্থা ব্যবহারে বেশি আগ্রহ দেখা যায়।

এছাড়া অন্য একরকমের ফেরিওয়ালা আছে, যারা নির্বাক থাকার পাশাপাশি ভিন্ন উপায় অবলম্বনে ভিন্ন রকমের আওয়াজ সৃষ্টি থেকেও সম্পূর্ণ বিরত থাকে। অর্থাৎ পুরোপুরি নৈঃশব্দ্যে মোড়া তাদের কর্ম-যাত্রা। সাধারণত এরা 'সংগ্রাহক ফেরিওয়ালা' (আমাদের দেওয়া নাম) হয়ে থাকেন। এরা কিছু বিক্রিও করে না, কিছু কেনেও না। কেবল এটা-সেটা পথ-ঘাট, নালা-নর্দমা, গৃহস্থের বাড়ির আনাচ-কানাচ থেকে নানাপ্রকার বস্তু কুড়িয়ে বেড়ায় বা সংগ্রহ করে। তারপর সেগুলো তারা নির্দিষ্ট জায়গায় বিক্রি করে। প্লাস্টিক, পলিথিন, ছেঁড়া কাগজ, ভাঙাচোরা প্রভৃতি আবর্জনা ঘুরে ঘুরে তারা সংগ্রহ করে। মূলত তারা 'আবর্জনা সংগ্রাহক'। আর সেই কারণেই তারা পরিবেশ-বান্ধবও।

(গ) বাগ্‌ধ্বনি ও সাধারণ আওয়াজ নির্ভর জ্ঞাপন-পদ্ধতি : এই পর্যায়ের হকার-ফেরিওয়ালারা কেবল ক্রেতাদের সঙ্গে কথোপকথন অথবা ক্রেতাদের উদ্দেশে বুলি নিক্ষেপণেই সন্তুষ্ট হয় না। এর পাশাপাশি তারা ফেরির কাজে ব্যবহৃত নানা সামগ্রী একটার সঙ্গে আরেকটা ঠুকে নানারকম আওয়াজ তোলে। মূল লক্ষ্য ক্রেতাদের সামগ্রিক নজর তাদের নিজেদের দিকে টেনে আনা। যেমন অনেক ঝালমুড়িওয়ালাই 'মুড়ী ঝাল, ঝালমুড়ি-ই-ই' একদিকে যেমন বলছে, তেমনি আরেকদিকে বাঁ-হাতে রাখা স্টিল-মগে ডান হাতে চামচ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট লয়ে ঠুকছে। আবার দেখা যায় অনেক ঘটিগরমওয়ালা ঘুঙুর বাজাতে বাজাতে 'ঘোটীগ-অ-রোম' বলে পণ্য ফেরি করে চলেছে। এমন উদাহরণ বেশ কিছু দেওয়া সম্ভব। মূলত যাদের আমরা অবাগ্‌ধ্বনি নির্ভর পদ্ধতি ব্যবহারকারী বলে উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে অনেককেই আবার এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখি। কেননা যারা বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহার না করে অন্য উপায়ে শব্দ (phoneless sound) উৎপন্ন করে ক্রেতাদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাইছে, তারা ইচ্ছে করলেই বাক্-শূন্য ধ্বনিহীন আওয়াজের সঙ্গে বাক্য অথবা বাক্ জুড়ে নিতেই পারে। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হল, যারা কেবল বিভিন্ন বস্তু সহযোগে নানাপ্রকার আওয়াজ উৎপন্নের মধ্য দিয়েই তাদের জ্ঞাপন-কর্মটি সম্পূর্ণ করে তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত। আর যারা এর সঙ্গেই জ্ঞাপন-কাজে বাগ্‌যন্ত্র ব্যবহার করে সমান্তরালভাবে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ (single or cluster phone) যুক্ত করে তারা এই মিশ্র পর্যায়ের।

আর এর সঙ্গেই আমাদের নজরে আসে একটু অন্য প্রকারের ফেরি-চিত্র। পাড়াগাঁয়ে, দোকান কিংবা হাটে-বাজারে অথবা ট্রেনে-বাসে গান গেয়ে অনেকে মাধুকরী সংগ্রহ বা ভিক্ষে করে। এক্ষেত্রে তারা যে তাদের শিল্প-দক্ষতা বা অর্জিত বিদ্যাকেই ফেরি করে, তা তর্ক-সাপেক্ষ হলেও তারা আমাদের দৃষ্টিতে ফেরিওয়ালা। তবে এক্ষেত্রে উপভোক্তা 'ক্রেতা'র ভূমিকা ছেড়ে 'শ্রোতা' ও 'দাতা'র ভূমিকা পালন করে। এর পাশাপাশি গলায় 'সাউন্ড-সিস্টেম' ঝুলিয়ে ট্রাক ক্যাসেট বাজিয়ে অথবা একতারা-খমক-কর্তাল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অথবা খালি

গলায় সঙ্গীত পরিবেশনা এবং আবৃত্তি কিংবা গল্প (আখ্যান) পরিবেশনার মধ্য দিয়ে জীবন-ধারণের অর্বাচীন একটি ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে। বৃহত্তর দৃষ্টিতে বিচার করলে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিই ফেরিওয়ালা। সুধীর চক্রবর্তীর 'মহিলা কামরা বিলিতি আমড়া' শিরোনামের একটি নিবন্ধে ও শচীন দাশের 'কথাবেচা' নামক গল্পে এই আখ্যান-ফেরির কৃৎ-কলা ধরা রয়েছে।

অন্যদিকে গৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বৃত্তান্ত ফেরিওয়ালা' নামক গ্রন্থে দেহোপজীবিনীদের 'বিশেষ প্রজাতির ফেরিওয়ালা' বলতে চান। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ বক্তব্য আমাদের ভাবনাকে নতুন করে ভাবাতে বাধ্য করেছে। 'ছলাকলা পরিবেশনকারী', 'স্বমাংস-ফেরিওয়ালা' নাকি 'পরিষেবা-বিক্রেতা'— কোন্ গোত্রে তাদের রাখবে তথাকথিত ভদ্র সমাজ, সেই প্রশ্ন তিনি আমাদের কাছে রেখেছেন। সেই সঙ্গে তাদের কিছু ডাকও উল্লেখ করেছেন— 'যাবে?', 'কী গো, বসবে নাকি?' ইত্যাদি।

এই সূত্রেই আমাদের আরেক প্রকার ফেরিওয়ালার কথা মনে আসে, যারা বিভিন্ন স্থানে নানারকম খবরাখবর প্রচার করে বেড়ায়। যদিও একালে সেইসব খবর-প্রচারক ফেরিওয়ালাদের খুব একটা দেখা মেলে না। এরা কোনো ব্যবসায়ী বা সংস্থার উদ্যোগে উৎপাদিত বা আমদানিকৃত পণ্যের হরেক-কিসিমের খবর সাধারণের মধ্যে প্রচার করে থাকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে। অনেকসময় 'ক্যানভাসার' বলেও এদের আখ্যাত করা হয়। কিন্তু আমরা যাদের কথা বলছি, তাদের নিজস্ব পুঁজি না-থাকাটা প্রাথমিক শর্ত। অন্যের পুঁজির ভাগ বা ভাড়া নিয়ে কিংবা অংশীদারত্বের চুক্তিতেও এদের কাউকে ফেরি-ব্যবসায় যোগ দিতে দেখা যায় না। কেবল নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রচার-কার্যে অংশ নিয়ে হাটে-বাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ানই তাদের কাজ। 'সেলস্‌ম্যান' সম্ভবত এদেরই আধুনিক সংস্করণ।

আসলে যে-সময় যেসব অঞ্চলে খবরের কাগজ রেডিও টেলিভিশন ছিল না, সে-সময় সেসব অঞ্চলে ঢ্যাড়াওয়ালা (সংবাদ প্রচারক/খবর-ফেরিওয়ালা) খবরাখবর ফেরি করে বেড়াত। ঢেঁড়া পিটিয়ে খবর জানাত বলে ঢ্যাড়াওয়ালা। জনমানসে কোনও খবর জানানোর প্রয়োজন পড়লে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষ, কিংবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্যানভাসাররাও এই ঢ্যাড়াওয়ালাদের নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে প্রচারকার্যে নিয়োজিত করতেন। মানে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিকল্প পথ। তাদের প্রধান কাজ লোক জড়ো করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রচারকার্যে সাহায্য করা। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা কোনো লোকালয় বা জনবহুল এলাকা কিংবা হাট-বাজারে যেখানে জনসমাগম হয় সেখানে ঢেঁড়া পিটিয়ে, সঙ্গে কিছু আহ্বানসূচক অন্বয়-বাক্য জুড়ে প্রথমে লোক জড়ো করে কর্তৃপক্ষের বক্তব্যটিও পেশ করে দিত। আর তা নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহও ছিল প্রবল। ফলস্বরূপ সংশ্লিষ্ট খবর মুখে মুখে সকলের মধ্যে প্রচারিতও হয়ে যেত দ্রুত। সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়ের স্মৃতিকথায় এদের হদিশ মেলে। লেখক জানাচ্ছেন—

"...পূর্ব বাংলা তো বারো মাসে বাইশ পার্বণের দেশ। কিংবা খুব জরুরি কোনও খবর থাকলে লোকে কাগা-বগা দুই যমজ ভাইকে সেখানে ঢেঁড়া দিতে পাঠায়। সেই সময় আমাদের ওই অঞ্চলে খবরের কাগজ নেই, টেলিভিশন নেই, মানুষ বিজ্ঞাপন দিয়ে কী করে লোককে জানাবে? তাই ঢেঁড়ার ব্যবস্থা।..."[১৭]

ফেরি-বিজ্ঞাপন নির্মাণ

এই ফেরিজীবীদের বিজ্ঞাপনী বুলিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের ব্যবহৃত বুলিগুলিকে মোটা দাগে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। সেইটি রেখাচিত্রে আমরা প্রকাশ করছি—

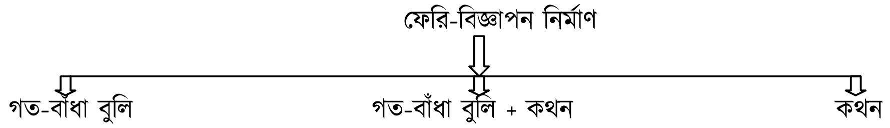

গত-বাঁধা বুলি : বিক্রেয় পণ্যের বিজ্ঞাপন রচনায় অধিকাংশ ফেরিজীবীই একই বুলির পুনরাবৃত্তি ঘটায় প্রতিদিন, প্রতি ট্রেনে, প্রতি কম্পার্টমেন্টে। একই তানে, একই ঝোঁকে, একই ধ্বনিতে দিনের পর দিন চলতে থাকে এই পৌনঃপুনিকতা। বুলি আওড়ানোর এই নিদর্শন বাস-ট্রামের কন্ডাক্টরদের মধ্যেও দেখা যায়। এই ধরনের বুলির আয়তন তিন প্রকার— অতিসংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও প্রলম্বিত। অতিসংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত বুলি নিতান্তই তথ্যমূলক। আর প্রলম্বিত বুলি মূলত আখ্যানধর্মী ও বিবরণবাহী।

অতিসংক্ষিপ্ত বুলির ক্ষেত্রে সাধারণত পণ্যের নামটুকুই কেবল প্রকাশ পায়। যেমন- '**বাদাম-বাদাম**', '**ঝালমুড়ি-ঝালমুড়ি**' ইত্যাদি। বড়ো জোর তার আগে-পরে যুক্ত হয় সম্ভাষণ ও ক্রিয়াপদ।

যেমন— পণ্য-নামের আগে ও পরে পদ-সংযোগ

সম্ভাষণ-পদ	পণ্য-নাম	ক্রিয়াপদ
এই যে দাদা	**বাদাম**	পাবেন
বড়দা	**বাদাম**	আছে
এই যে	**বাদাম**	বলবেন

(এখানে 'বলবেন' ক্রিয়াপদটি নেবেন/পাবেন/আছে অর্থে ব্যবহৃত)

পণ্য-নামের আগে পদ-সংযোগ

সম্ভাষণ-পদ	পণ্য-নাম
এই	**বাদাম**
এই যে	**বাদাম**
এই যে দাদা	**বাদাম**

পণ্য-নামের পরে পদ-সংযোগ

পণ্য-নাম	ক্রিয়াপদ
বাদাম	হবে
বাদাম	পাবেন
বাদাম	বলবেন

আর সংক্ষিপ্ত বুলির ক্ষেত্রে উপরোক্ত তিন প্রকার অতিসংক্ষিপ্ত বুলির সঙ্গে যুক্ত হয় অল্পকিছু বাক্। অতিরিক্ত এই বাক্ মূলত পণ্যের পরিচিতি প্রকাশক বিশেষণ বা বিশেষণ গুচ্ছ। তবে কখনও প্রশ্ন, কখনও আহ্বান, কখনও অনুজ্ঞা ভাবও দেখা যায়।

যেমন—

সম্ভাষণ-পদ	পণ্য-নাম	ক্রিয়াপদ	+	অতিরিক্ত বাক্
এই যে দাদা	**বাদাম**	পাবেন	।	খাস্তা, গোটা-গোটা, টাটকা।
দাদা, এই যে	**বাদাম**	—	।	বালিতে ভাজা।
—	**বাদাম**	খাবেন	।	টাটকা আর খাস্তা।
—	**বাদাম**	—	।	আর কাকে দেবো?
এই যে দাদা	**বাদাম**	—	।	খান আর নিয়ে যান।

অনেক সময় এই প্রকার বিজ্ঞপ্তি উপস্থাপনা রেল-যাত্রীদের কাছে একঘেয়েমিতার কারণে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। এগুলি যান্ত্রিকও বটে। তবে যারা সংক্ষিপ্ত ও প্রলম্বিত বিজ্ঞাপন পরিবেশনায় অভ্যস্ত তারা এই গত-বাঁধা বুলিতেও রং ধরাতে পারে। অশোকনগরের বর্ষীয়ান রেল-হকারের কথানুযায়ী 'কালারফুল' করে তুলতে পারে। সেখানে একঘেয়েমিতা থাকলেও বিরক্তির উদ্রেক করে না। ফেরি-ডাকের ইতিহাসে এগুলিকেই আমরা ধ্রুপদী ডাক হিসাবে চিহ্নিত করব। এই প্রকার ডাক সাধারণত সংক্ষিপ্ত বা অতি সংক্ষিপ্তই হয়ে থাকে। সকল প্রকার ফেরিওয়ালাদের মধ্যেই এর চল যেমন আছে, তেমন এই ধরনের বুলি ব্যবহারে সকলেই স্বচ্ছন্দ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা সংরূপে বিচিত্র ফেরিজীবী ও তাদের ভাষা-সংস্কৃতির স্বরূপ :

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা— বাংলা সাহিত্যের সব সংরূপেই ফেরিবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা চরিত্রের উপস্থিতি সম্ভ্রমপূর্ণ। তবে কথা সাহিত্যে তাদের উপস্থিতি সর্বাধিক। কখনও প্রধান চরিত্র রূপে, কখনও পার্শ্ব রূপে তারা অবতীর্ণ। রচয়িতার

মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিতে যেমন তারা লালিত, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে খানিকটা অবহেলারও শিকার। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই স্বমহিমায় বিরাজমান এবং অবশ্যই তা বিচিত্র পরিসরে ও পটভূমিতে। আসলে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাদের বিচরণ সবসময়ই বৈচিত্র্যে পূর্ণ।

কথা-সাহিত্য :

বাংলা গল্প-উপন্যাসে ফেরি-বৃত্তির সংগে যুক্ত চরিত্রাদির রূপাঙ্কন বর্ণময় ও বিস্তৃত। অপ্রধান কিংবা পার্শ্ব চরিত্র তো বটেই, কেন্দ্রীয় বা মুখ্য চরিত্র রূপে আবির্ভাব অনেক আখ্যানেই আমরা লক্ষ করেছি। কেবল তাই নয়, কিছু ক্ষেত্রে কাহিনীর আবহ নির্মাণে তারা সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। কখনও রেলের চলমান বা স্থবির হকার, কখনও অলি-গলির ফেরিওয়ালা, কখনও হাটে-বাজারের অস্থায়ী ব্যাপারী, আবার কখনও ক্রেতা কিংবা পরিষেবা প্রদানকারী ফেরি-কারবারী রূপে তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ বাংলা কথাসাহিত্যের বিচিত্রতা ও গরিমা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত :

উপন্যাস : 'পণ্ডিতমশাই'— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **সূর্য-দীঘল বাড়ী'**— আবু ইসহাক, **'বেঁচে থাকা'**— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, **'যে আছে অপেক্ষা করে'**— নলিনী বেরা, **'লেডিস কম্পার্টমেন্ট'**— অহনা বিশ্বাস, **'দলছুট'**— মন্দাক্রান্তা সেন প্রভৃতি।

ছোটোগল্প : 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল'— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, **'ফিরিওয়ালা'**— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, **'কাঠ-বিক্রি বুড়ো'**— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, **'ক্যানভাসার'**— বনফুল, **'জৈবিক নিয়ম'**— বনফুল, **'নিবারণের মৃত্যু'**— সরোজকুমার রায়চৌধুরী, **'ফেরিওলা'**— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, **'ফেরিওলা'**— বুদ্ধদেব বসু, **'ফেরিওয়ালা'-১**— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, **'ফেরিওয়ালা'-২**— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, **'রস'**— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, **'কুলপী বরফ'**— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, **'সুহাসিনী তরল আলতা'**— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, **'কোনও কুলবধূর কথা'**— সন্তোষকুমার ঘোষ, **'আপ ট্রেন'**— রমাপদ চৌধুরী, **'পশারিণী'**— সমরেশ বসু, ' **'ফেরিওয়ালা'**— প্রফুল্ল রায়, **'ফেরিওয়ালা'**— তারাপদ রায়, **'সোনা কুঠুরি'**— ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, **'হীরের কুচি'**— ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, **'ভাবুকচরণ'**— অমর মিত্র, **'লেডিজ কম্পার্টমেন্ট'**— যশোধরা রায়চৌধুরী, **'সুপুরিওয়ালা'**— তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়, **'শিশি-বোতল'**— তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

স্মৃতিকথা :

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিকথাতেও ফেরি-বুলি বর্ণময় হয়ে ধরা দিয়েছে। নানা উপমা, নানা বিশেষণ, নানা ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্য দিয়ে তাদের ডাক হয়ে উঠেছে জীবন্ত। লেখকদের অনেকেই তাঁদের শৈশবে দেখা ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র কর্ম-ক্রিয়ার পরিচয় তুলে ধরেছেন। আর অনেকক্ষেত্রেই সেগুলো চিত্রায়িত হয়েছে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

'জীবনস্মৃতি'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা'**— মহেন্দ্রনাথ দত্ত, **'নীরবিন্দু'**— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, **'ইছামতীর মশা'**— শঙ্খ ঘোষ, **'যখন যা মনে পড়ে'**— প্রফুল্ল রায়, **'সদর-মফস্বল'**— সুধীর চক্রবর্তী, **'আখ্যানের খোঁজে'**— সুধীর চক্রবর্তী, **'হ্যারিসন রোড'**— একরাম আলি, **'ভালো মানুষ মন্দ মানুষ'**— অমর মিত্র, **'লুপ্তকথা'**— কিন্নর রায়, **'আমার সময় : আমার সাংবাদিকতা'**— পার্থ চট্টোপাধ্যায়, **'বাঙাল জীবনের চালচিত্র'**— রঞ্জন রায়, **'ঘটিকাহিনি'**— পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আখ্যানধর্মী রচনা :

কৌতুক নক্শা, রম্যরচনা, কিস্সাধর্মী আখ্যানমূলক রচনাতেও ফেরিজীবীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। শৈল্পিক ভাবনার স্পর্শে লালিত করে যে-পেশাগত লড়াইটি জীবনের সঙ্গে নিরন্তর ফেরিওয়ালাদের চালিয়ে যেতে হয়, তা সরল স্বাদু অথচ ঋজু ভঙ্গিতে এইসব রচনায় উঠে এসেছে। তাদের ফেরি-পদ্ধতিতে যে মনস্তত্ত্বেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেই দিকটিতেও রয়েছে রচনাকারদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (কৌতুক নকশা)— কালীপ্রসন্ন সিংহ, **'কলকাতার ফিরিওয়ালা'**— বিনয় ঘোষ, **'দাঁতের মর্যাদা'**— বিনয় ঘোষ, **'রেটটা একটু কমান'**— তারাপদ রায়, **'লোকাল ডায়েরী'**— সব্যসাচী সরকার, **'পথঘাটের কিস্সা'**— অঞ্জনা দত্ত ও বরুণ ঘোষ প্রভৃতি।

কবিতা :

বাংলা কবিতার সংসারেও ফেরিজীবীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থিতি। দার্শনিক বার্তা প্রদান, কিংবা ব্যঞ্জনাময় কাব্যিক আবহ নির্মাণ অথবা সরাসরি কেন্দ্রিয় বিষয় হিসাবে উপস্থাপন— সবেতেই এই বৃত্তির মানুষ ও তাদের ব্যবহৃত বুলি কবিদের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলিতে কী সূত্রে এই পেশার মানুষগুলো ও তাঁদের বাক্-ক্রিয়ার সংযুক্তি ঘটলো তা আমরা নীচে উল্লেখ করছি।

'কাগজ বিক্রি'— প্রেমেন্দ্র মিত্র, **'বধূ'**— সুভাষ মুখোপাধ্যায়, **'কলকাতার যীশু'**— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, **'শিল কোটা'**— জয় গোস্বামী, **'আইসক্রিম গাড়ি'**— জয় গোস্বামী, **'ফটাস জল'**— সুবোধ সরকার প্রভৃতি।

নাটক :

সংখ্যায় অল্প হলেও বাংলা নাটকে পার্শ্ব ও মুখ্য চরিত্র রূপে ফেরিওয়ালারা এসেছেন। সেখানে ভ্রাম্যমান পথ-ফেরিওয়ালারা যেমন আছেন, তেমনই আছেন রেল-হকাররা। তাদের হাঁক-ডাক, চিৎকৃত বুলি, কলা-কৌশল সবকিছুই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংগে জড়িয়ে বর্ণিত হয়েছে নাটকগুলিতে।

'অলীকবাবু'— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, **'অপচয়'**— দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, **'নীলকণ্ঠ'**— উৎপল দত্ত, **'নতুন জামা'**— সুব্রত মুখোপাধ্যায় (শ্রুতিনাটক) প্রভৃতি।

প্রবন্ধ :

বাংলা ভাষায় ফেরিওয়ালা ও তাদের ব্যবহৃত বুলি নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু গবেষণাধর্মী, কিছু রস-সৃজনমূলক। আবার কিছু বস্তুগত, কিছু আত্মগত। এগুলো নানা প্রবন্ধ-গ্রন্থ, সাময়িক পত্রের পাতায় সংকলিত। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণি অনুযায়ী আমরা তালিকাবদ্ধ করছি।

গবেষণাধর্মী বস্তুগত প্রবন্ধ

'কলকাতার ফেরিওয়ালা'— অতুল সুর, **'সেকালের কলকাতার ফিরিওয়ালা'**— জলধর মল্লিক, **'হকার ও ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'**— চির দত্ত, **'পুরোনো কলকাতায় ফিরিওয়ালার ডাক'**— পবিত্র সরকার, **'শিয়ালদহ মেনলাইনে ট্রেনহকারদের ভাষা'**— দীপেশ প্রামাণিক, **'লোকালের ভাষা, ভাষার রেলগাড়ি'**— রাহুল পণ্ডা, **'ট্রেনের কামরা থেকে কামরায়, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণা'**— কিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়, **'ফেরির ভাষা'**— মহ: মেহেবুব হোসেন প্রভৃতি।

গবেষণাধর্মী আত্মগত প্রবন্ধ

'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ'— রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, **'কমলালয়া কলকাতা'**— মীজানুর রহমান, **'বৃত্তান্ত ফেরিওয়ালা'**— গৌতম চট্টোপাধ্যায়, **'ডাকগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, দরজাতে এসে দাঁড়ায় না কেউ'**— বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি।

রস-সৃজনমূলক প্রবন্ধ

'বড় বাজার'— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **'ফেরিওলার ডাক'**— সুধীরা গুপ্তা, **'লজেন্স হজমি শরীর রবীন্দ্র টুনির মা'**— সুধীর চক্রবর্তী, **'মহিলা কামরা বিলিতি আমড়া'**— সুধীর চক্রবর্তী, **'ফিরিওয়ালা'**— নবনীতা দেবসেন, **'পুরুষ প্রবেশ নিষেধ'**— জয়া মিত্র, **'ফিরে এল ফেরিওয়ালা'**— স্বপ্নময় চক্রবর্তী, **'ফুটে আছে যূথী জাতি জাঙ্গু'**— মন্দার মুখোপাধ্যায়, **'হক কথা'**— শিলাজিৎ, **'কেয়ার অফ ফুটপাত'**— ভাস্কর লেট প্রভৃতি।

সাহিত্যলব্ধ উল্লিখিত ফেরি-ব্যাপারীদের কর্মস্থল ও পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করে আমরা তাদেরকে সুস্পষ্ট পাঁচটি শ্রেণিতে বিভাজন করতে পারি। আমাদের ভাবনা-প্রসূত বিভাজনটি এইরকম—

রেল-হকার,

চলমান পথ-ফেরিওয়ালা,

স্থবির পথ-ফেরিওয়ালা,

ক্রেতা-ফেরিওয়ালা,

দক্ষতা বিক্রয়কারী/পরিষেবা প্রদানকারী ফেরিওয়ালা

এই সকল প্রকার ফেরিজীবীদের ভাষিক আচরণের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এর ফলেই ফেরি-বুলি হয়ে উঠেছে বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের নেপথ্যে যেসব ভাষাগত কারণ ক্রিয়াশীল সে-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়াটা জরুরী। এই কারণে আমরা সাহিত্য-লব্ধ উপাদানের ভিত্তিতে উল্লিখিত পাঁচ প্রকার ফেরিওয়ালার বাক্-ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করছি।

১. রেল-হকারদের ভাষিক আচরণ :

রেলের চলমান হকারের বিজ্ঞাপিত বুলিতে স্থবির পথ-ফেরিওয়ালাদের মত লব্জ ও বাক্-মালা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিশেষভাবে বলার কথা এই যে, চলমান ফুট-হকারদের মধ্যে বক্তৃতাধর্মী বিজ্ঞাপন পরিবেশনের প্রবণতা যেখানে নেই বললেই চলে সেখানে চলমান রেল-হকারদের মধ্যে এই ধরনের বুলি ব্যবহারের প্রবণতা অনেক বেশি। স্থবির রেল-হকাররা সাধারণত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিজ্ঞাপনী বক্তব্যকে

সীমায়িত করেন। বাংলা সাহিত্যের অন্দরমহলেও এর আঙিনাটি সুবিস্তৃত— কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষভাবে এসেছে চলমান ও স্থবির রেল-হকারদের প্রসঙ্গ ও তাদের চিৎকৃত ডাক। তারা চরিত্র হিসেবে কখনও মুখ্য, কখনও পার্শ্বিক বা সহকারী ভূমিকায় লগ্ন হয়েছে সাহিত্য-আখ্যানে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহৃত বুলিকে ভাষাগত পরিসরে বাঁধার চেষ্টা হয়নি, তবুও সেই বুলিগুলোকে এমনভাবে স্কেচ আর ডিটেলিং-এর কোলাজে লিপিমালায় বন্দি করা হয়েছে যে, সেগুলোকে সহজেই ভাষাতাত্ত্বিক ভাবনার পরিমণ্ডলে তুলে আনা সম্ভব। যেসব রচনায় এই প্রকার ফেরিওয়ালা ও তাদের বুলির সংগে আমাদের পরিচয় হয়েছে সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হলো।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'— কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল'— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জৈবিক নিয়ম'— বনফুল, 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ'— রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, 'আপ ট্রেন'— রমাপদ চৌধুরী, 'নিবারণের মৃত্যু'— সরোজকুমার রায়চৌধুরি, 'দাঁতের মর্যাদা'— বিনয় ঘোষ (কালপেঁচা), 'ডেলি প্যাসেঞ্জার ও ক্যানভাসার'— বিনয় ঘোষ (কালপেঁচা), 'পশারিণী'— সমরেশ বসু, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'— আবু ইসহাক, 'সদর-মফস্বল'— সুধীর চক্রবর্তী, 'হ্যারিসন রোড'— একরাম আলি, 'যে আছে অপেক্ষা করে'— নলিনী বেরা, 'ফটাস জল'— সুবোধ সরকার, 'লেডিজ কম্পার্টমেন্ট'— যশোধরা রায়চৌধুরী, 'লেডিস কম্পার্টমেন্ট'— অহনা বিশ্বাস, 'দলছুট'— মন্দাক্রান্তা সেন, 'পথঘাটের কিস্‌সা'— অঞ্জনা দত্ত ও বরুণ ঘোষ, 'লোকাল ডায়েরী'— সব্যসাচী সরকার

২. চলমান পথ-ফেরিওয়ালাদের ভাষিক আচরণ :

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ চলমান পথ-ফেরিওয়ালার ডাককে লিপিবদ্ধ করেছেন—

"মাথার উপরে আকাশবাণী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকিয়া যাইত— তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।"[১৮]

এই 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকে যে সুরের ধরনটি বহমান তা চলমান পথ-ফেরিওয়ালাদের একেবারে নিজস্ব ঘরানা। অধিধ্বনির নিরিখে সুরাঘাত ও সুরতরঙ্গ লগ্ন হয়ে রয়েছে এই ভাষিক-ছাঁচটিতে। 'ডাকঘর' নাটকেও ধরা আছে ফেরিওয়ালার ডাকের এই প্রতিমানটি— "দই—দই—ভালো দই!"[১৯] রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর 'পুরাতন পঞ্জিকা'তে এর সুরবিন্যাসের ছাঁচ (pitch pattern)-টি আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। দক্ষতা বিক্রয়কারী চলমান ফেরিওয়ালার একটি ডাককে চমৎকার কৌশলে তিনি বাণীরূপ দিয়েছেন— "কু—উ—উ—উ—ও ও ওর—ঘ—টি—তো—ও—ও—লা—আ—আ—আ—আ"।[২০] এই সুরেলা হাঁক ভ্রাম্যমান পসারীর সংগে ঠিক কীভাবে লগ্ন হয়ে রয়েছে তা পবিত্র বাবু ফেরি-ডাকের ভাষা সংক্রান্ত বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছেন—

"...কোনো কোনো প্রশ্নে অন্তর্লীন অনুরোধটিও ফুটে ওঠে— যেমন 'মাটি লেবে গো'— এই ডাকে। এতে 'গো' এই সম্বোধন-শব্দে অনুরোধটি স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত।

ঘোষণাও থাকে অনেক ডাকে, যদিও প্রশ্নের তুলনায় ও ডাকগুলির সংখ্যা কম। সেই বিখ্যাত 'কুয়োর ঘটি তোলা' এমনই একটি ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি। 'বাত ভালো করি', 'দাঁতের পকা বার করি' ইত্যাদি তো প্রায় পুরো বাক্যই। কিন্তু 'রিপুকর্ম', 'বেলফুল', 'ভয়সা দই', 'পানিফল', 'কাগজ বদল', 'আলু পটোল' ইত্যাদি প্রায় টেলিগ্রামের ভাষায় কেবল পসরাটির নাম ঘোষণা করা, তার বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ 'এই পসরা নিয়ে আমি হাজির, যার দরকার সে এসে কেনো।' কাজেই ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তিও গঠনের দিক থেকে দুরকমের, নামমাত্রিক ও ক্রিয়াযুক্ত। ক্রিয়াযুক্ত ডাকে পরোক্ষ অনুরোধ 'চাই' ক্রিয়াপদটি থাকে, আবার প্রায়ই প্রত্যক্ষ অনুরোধের 'নেবে' / 'লেবে'-ও থাকে।..."[২১]

'পুরাতন পঞ্জিকা'তে এই প্রকার ডাকগুলির সবিস্তার উল্লেখ রয়েছে এবং তাতে ভাষা-ছাঁদটি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। কিছুটা অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে—

"...বেলা ৩টায় বেরুল মুসলমান ফিরিওয়ালা, 'বিলিতি চুড়ি চাই, কাচের খেলনা চাই, সাবান চাই' বলে; জয়ের পুতুল বেণে পুতুল বিক্রয়কারিণীরা বাড়ীর ভিতর ঢুকে-ই দেশী মাটীর পুতুল গছিয়ে যেত, চাচারা বেচত বিলিতী চীনে মাটীর পুতুল, আর সাবান তখন সচরাচর গৃহস্থলোক বাড়ীতে কারুর পাচঁড়া হ'লেই কিনত।... পুরুষমানুষের, বিশেষ ছেলেদের পুজোর সময় নূতন জুতো কিনে পায়ে দিতে-ই হবে, পঞ্চমী ষষ্ঠীর দিন তেমনই মেয়েদের বেলোয়ারী চুড়ী চাই-ই চাই..."[২২]

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রশ্নপদহীন হ্যাঁ-না জিজ্ঞাসাবোধক বাক্যের ব্যবহারই অধিক। 'জীবনস্মৃতি' ও 'পুরাতন পঞ্জিকা' উভয় গ্রন্থে ফেরি-ডাকের অভিন্ন বাক্-বিন্যাসই আমরা লক্ষ করছি। 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' এবং 'বিলিতি চুড়ি চাই, কাচের খেলনা চাই, সাবান চাই'

বাক্-শৈলীতে কোনো প্রভেদ নেই। মূলত উনিশ ও বিশ শতকের ভ্রাম্যমান পথ-ফেরিওয়ালার হাঁকের এইটিই সাধারণ বাক্-রীতি। তবে এরমধ্যে কিছু ডাক হারিয়ে যাচ্ছে, আবার নতুন কিছু ডাকের উদ্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন সংরূপে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পুরনো ও নতুন ডাকগুলোকে সযত্নে স্থান দিয়েছে। অনেক সাহিত্যকারই আখ্যানের সংগে সংযোগ রক্ষা ক'রে ভাষাগত বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় এই ডাকগুলোকে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। আবার অনেকে সাধারণী ঢঙে ফেরি-বুলিগুলোকে আখ্যানের সংগে সংযুক্ত করেছেন।
নিম্নলিখিত রচনায় এই শ্রেণির ফেরিওয়ালাদের বুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'— কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'অলীকবাবু'— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পুরাতন পঞ্জিকা'— অমৃতলাল বসু, 'জীবনস্মৃতি'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পণ্ডিতমশাই'— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কচি ডাব'— যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'জৈবিক নিয়ম'— বনফুল, 'ফেরিওলার ডাক'— সুধীরা গুপ্তা, 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ'— রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, 'সে আর এক কলকাতা'— ড. অতুল সুর, 'ফেরিওলা'— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ফেরিওলা'— বুদ্ধদেব বসু, 'ফেরিওয়ালা'— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'সুহাসিনী তরল আলতা'— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'কলকাতার ফিরিওয়ালা'— বিনয় ঘোষ (কালপেঁচা), 'কোনও কুলবধূর কথা'— সন্তোষকুমার ঘোষ, 'নীরবিন্দু'— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'ইছামতীর মশা'— শঙ্খ ঘোষ, 'সেকালের কলকাতার ফিরিওয়ালা'— জলধর মল্লিক, 'ফেরিওয়ালা'— প্রফুল্ল রায়, 'নীলকণ্ঠ'— উৎপল দত্ত, 'রেটটা একটু কমান'— তারাপদ রায়, 'বেঁচে থাকা'— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'আখ্যানের খোঁজে'— সুধীর চক্রবর্তী, 'সোনা কুঠুরি'— ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'হীরের কুচি'— ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'লুপ্তকথা'— কিন্নর রায়, 'আইসক্রিম গাড়ি'— জয় গোস্বামী, 'কমলালয়া কলকাতা'— মীজানুর রহমান, 'ঘটিকাহিনি'— পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

৩. স্থবির পথ-ফেরিওয়ালাদের ভাষিক আচরণ :

স্থবির ফেরিওয়ালার বর্ণনাবহুল ভাষণধর্মী বাক্‌মালা বা বাগাড়ম্বর ব্যবহারের দৃষ্টান্তের পাশাপাশি টুকরো টুকরো লব্জ বেশ কিছু গ্রন্থ ও রচনায় পেয়েছি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, এই ধরনের বাক্‌মালা মূলত 'গ্রাহক টানার বুলি'। এর ব্যবহারে বক্তার ভূমিকায় থাকা বিক্রেতাই আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রেতার মনের রাশকে নিজের অধিকারে আনতে বক্তা এখানে সুচারু রূপে কৌশলী হয়ে ওঠেন। তাই দেখা যায় তাদের ব্যবহৃত বুলি কিংবা অন্বয় 'প্রকাশন' (expression) ও 'প্ররোচন' (hortation)— ভাষার দু'টি কাজকে ব্যবহার ক'রে 'জ্ঞাপন' (communication) থেকে 'বিজ্ঞাপন' (advertisement) হয়ে ওঠে। ফল স্বরূপ গ্রাহক বা উপভোক্তাকে কেবল শ্রোতার ভূমিকাতে থাকতে হয়। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারের এই ক্ষেত্রটিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল বিক্রেতার পণ্য সম্পর্কিত প্রশংসাসূচক সুবচনই থাকে। নিম্নলিখিত রচনায় এই ধরনের ফেরিওয়ালার কর্মপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।
'যখন যা মনে পড়ে'— প্রফুল্ল রায়, 'ভাবুকচরণ'— অমর মিত্র, 'ভালো মানুষ মন্দ মানুষ'— অমর মিত্র, 'বৃত্তান্ত ফেরিওয়ালা'— গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'হক কথা'— শিলাজিৎ, 'ফুটে আছে যূথী জাতি জাঙ্গু'— মন্দার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

৪. ক্রেতা-ফেরিওয়ালা ও তাঁদের ভাষিক আচরণ :

ক্রেতা-ফেরিওয়ালারা ঘুরে ঘুরে কিছু (দ্রব্য/পণ্য) বিক্রি করে না। তারা কেনে। এই ধরনের ফেরিওয়ালারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরাদরি করে। আর সেই সূত্রে কিছু বাঁধা-বুলি থাকলেও মূলত তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী বাক্ ব্যবহার করে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই প্রকার ফেরিওয়ালার উপস্থিতি অল্প হলেও উপভোগ্য ও চিন্তন-যোগ্য। যেসব রচনায় এই প্রকার ফেরিওয়ালার ডাক লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলো হল—'হুতোম প্যাঁচার নকশা'— কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'কাঠ-বিক্রি বুড়ো'— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কাগজ বিক্রি')— প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'ফেরিওলার ডাক'— সুধীরা গুপ্তা, 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ'— রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, 'নীলকণ্ঠ'— উৎপল দত্ত, 'বেঁচে থাকা'— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'সে আর এক কলকাতা'— অতুল সুর, 'সেকালের কলকাতার ফিরিওয়ালা'— জলধর মল্লিক, 'বৃত্তান্ত ফেরিওয়ালা'— গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'সুপুরিওয়ালা'— তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শিশি-বোতল'— তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

৫. দক্ষতা অথবা পরিষেবা বিক্রয়কারী ফেরিওয়ালাদের ভাষিক আচরণ :

দক্ষতা কিংবা পরিষেবা ফেরিও যে ফেরিবৃত্তির একটি বিচিত্র রূপ। পরিষেবা প্রদান বা দক্ষতার বিনিময়ে উপার্জনকারী ফেরিওয়ালারা গৃহস্থের ঘরে ঘরে নিজেদের দক্ষতা ফেরি করে রোজগার করে। দু'-একটি ক্ষেত্র ছাড়া ট্রেন-বাস বা হাট-বাজারে এদের উপস্থিতি তেমন একটা চোখে পড়ে না। এরা সাধারণত রাস্তা থেকে হাঁক দিয়ে নিজেদের বৃত্তি-পরিচায়ক তথ্য গৃহস্থদের অন্দরে তথা কর্ণ-কুহরে পৌঁছে দেয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা সংরূপে এই প্রকার ডাকেরও অল্পবিস্তর উল্লেখ আছে। কিছু কিছু রচনায় তাদের বিচিত্র পেশাগত

ভূমিকা ও কর্ম-পদ্ধতি বর্ণিত হলেও সরাসরি তাদের ডাক বা বুলির কোনোরকম উল্লেখ করা হয় নি, পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কৃৎ-কর্মের সূত্রে বিশেষ বুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব বুলির কিছু বিজ্ঞপ্তি-ধর্মী। যেমন- 'কুয়োর ঘটি তোলা'। কিছু আবার পূর্ণ বাক্য। যেমন- 'বাত ভালো করি', 'দাঁতের পোকা বার করি', 'সোনা চাঁদির গয়না ঝাল করাবেন পালিশ করাবেন' ইত্যাদি। আর কিছু কেবলই অন্বয়, প্রয়োজনীয় তথ্যের সবটা না ব'লে কেবল মূলটি উল্লেখ করা হয়। যেমন- 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে শুধুমাত্র 'মালিশ, তেল মালি—শ'-এর উল্লেখ পাই। 'করা হয়' যুক্ত ক্রিয়া বা 'করি' মৌলিক ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। উপভোক্তার কাছে ফেরিওয়ালার কর্ম-প্রকরণের বার্তাটি স্পষ্ট-রূপে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য পূরণে এই প্রকার অন্বয়-প্রয়োগ বা এইরকম উপস্থাপনা একেবারে অব্যর্থ। এই সকল ফেরিওয়ালাদের প্রসঙ্গ যেসব গ্রন্থ বা রচনায় গুরুত্ব সহকারে লেখা হয়েছে সেগুলি আমরা নীচে তালিকাবদ্ধ করছি।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'— কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'পুরাতন পঞ্জিকা'— অমৃতলাল বসু, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা'— মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ফিরিওয়ালা'— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রস'— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'কুলপী বরফ'— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'ফেরিওলার ডাক'— সুধীরা গুপ্তা, 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ'— রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, 'নীরবিন্দু'— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'— আবু ইসহাক, 'ফেরিওয়ালা'— তারাপদ রায়, 'একটি অজ্ঞাত অথচ'— সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'সে আর এক কলকাতা'— অতুল সুর, 'সেকালের কলকাতার ফিরিওয়ালা'— জলধর মল্লিক, 'খবর কাগজ খবরদার'— দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল, 'শিল কোটা'— জয় গোস্বামী, 'কমলালয়া কলকাতা'— মীজানুর রহমান, 'বেঁচে থাকা'— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'বৃত্তান্ত ফেরিওয়ালা'— গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'লেডিস কম্পার্টমেন্ট'— অহনা বিশ্বাস প্রভৃতি।

এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক মানদণ্ড আমাদের আলোচনার এক একটি বিশ্লেষণী বর্গ হয়ে উঠেছে। তাতে কখনও ধ্বনিতাত্ত্বিক, কখনও শব্দার্থগত, কখনও গঠনগত, আবার কখনও রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কখনও আবার সমাজ-ভাষার অনুষঙ্গে রচনাকার তাদের ফেরি-বুলিকে সংশ্লিষ্ট রচনায় যুক্ত করেছেন। এই সব কিছুর সহযোগেই বাংলা সাহিত্যের লেখকরা তাঁদের সৃজনী-স্পর্শে ফেরি-ভাষাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

উল্লিখিত রচনা ব্যতীতও বাংলা সাহিত্য-ভান্ডারে এমন অনেক সৃষ্টি রয়েছে, যেখানে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সূত্রে হকার বা ফেরিওয়ালার প্রসঙ্গ কিছুটা হলেও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, অথচ কোনো প্রকার বুলি উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু দেখা যাবে হকারের যাপিত জীবনকে কেন্দ্রে রেখেই সংশ্লিষ্ট সাহিত্য-কর্মটির বক্তব্য কিংবা প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি একাঙ্কিকা 'অপচয়'-এর কথা আমরা বলতে পারি। এখানে বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালি-জীবনের একটি চিত্রপট অংকিত হয়েছে। আর তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক বিপন্ন-অসহায় রেল-হকার। নাম তার মিলন। ট্রেনে ট্রেনে লজেন্স ফেরি করে। আর চার-পাঁচটা পেশাদার হকারের মত কথার ফানুস ফুলিয়ে ক্যানভাসিং করা তার পেশার একটি অত্যাবশকীয় মূলধন। কিন্তু তার ফুসফুসে ক্ষয়রোগ বাসা বেঁধেছে। আর সেই কারণে কথা বলতে গেলেই কাশি ওঠে। এই ঘটনাটিই মূল আখ্যানে নিয়ে এসেছে ট্রাজিক পরিণতি। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সন্ধ্যা স্বামী রূপে মিলনকে বরণ করে নিতে চাইলে মিলন বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। আসলে সে চায় না তার ক্ষয়রোগগ্রস্ত অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে এক সতেজ জীবনের অপচয় ঘটাতে। এই মারণরোগ একদিকে যেমন দারিদ্র্যের সূচক, অন্যদিকে তেমনি পেশাগত বিপত্তির অনাহূত ফলাফল। এই একাঙ্কিকায় হকারি বুলি না থাকলেও রেলকে আশ্রয় ক'রে হকারি পেশায় যে শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছিল তার কথা এর আখ্যানভাগে বলা হয়েছে। পাশাপাশি একজন হকারের স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভঙ্গ কীভাবে রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার সঙ্গে জড়িয়ে যায় এবং রাজনৈতিক বিপর্যয় মানুষের পেশায় বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি তার ভাষাগত সংরূপকেও কীভাবে স্পর্শ ও প্রভাবিত করে সেই ভাবনাটিও উঠে এসেছে। ঠিক এইরকম আরও কিছু সৃজন-কর্মের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। সেগুলির সংরূপগত পরিচিতি আমরা নীচে তুলে ধরছি।

ফিরিওয়ালা (ছোটগল্প)— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রস (ছোটগল্প)— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কুলপী বরফ (ছোটগল্প)— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ফেরিওয়ালা (গল্প)— তারাপদ রায়, ঝালমুড়ি (ছোটগল্প)— দিব্যেন্দু পালিত, খবর কাগজ খবরদার (রম্যরচনা)— দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল প্রভৃতি।

আর কিছু সৃজন-কর্মে আমরা দেখেছি যে, হকার কিংবা ফেরিওয়ালা কোনোভাবেই আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি, শুধু আখ্যানের আবহ নির্মাণে একটি সহযোগী উপাদান হিসাবে সৃজন-কর্তার অনুগ্রহ পেয়েছে। যেমন- ঈশ্বর গুপ্তের 'পৌষড়ার গীত' (ছড়া), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

‘গোরা’ (উপন্যাস), সুকুমার রায়ের ‘বুড়ীর বাড়ী’ (ছড়া), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘কলকাতার যীশু’ (কবিতা), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘বধূ’ (কবিতা), রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের ‘উদাসীর মাঠ’ (গল্প), সুনন্দা সিকদারের ‘দয়াময়ীর কথা’ (স্মৃতিকথা) প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রকার সৃজন-কর্মে ফেরি-বুলি নেই ঠিকই, কিন্তু ফেরি ব্যাপারীদের ক্রিয়াকলাপ উল্লেখে রচনাগুলি একটা নান্দনিক আবহের অংশ হয়ে উঠেছে। আর তাতে সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৭, পৃ ২৩১৯

২. তদেব পৃ ১৪৩৪

৩. তদেব

৪. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সম্পা.), দ্র. ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’ (২য় ভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৬, পৃ ১৪৬৩

৫. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (প্র. সম্পা.), দ্র. ‘সংসদ বাংলা অভিধান’, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, নভেম্বর ২০০০, পৃ ৫৬৯, ৮৫৮

৬. বসু, রাজশেখর, ‘চলন্তিকা’, নতুন সংস্করণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪১৮, পৃ ৪৭১, ৭১৭

৭. সেন, সুকুমার, ‘ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০ মে ২০০৩, পৃ ২৯১

৮. তদেব পৃ ২৯৩

৯. তদেব পৃ ৪৩৬

১০. বসু, নগেন্দ্রনাথ, দ্র. ‘বিশ্বকোষ’ (দ্বাবিংশ খণ্ড), প্রথম প্রকাশন, দিল্লী ১১০০০৭, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৮৮৬-১৯১১, পৃ ৪৫৪

১১. তদেব

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৭, পৃ ২৩২০

১৩. Williams, Sir Monier Monier, ‘A Sanskrit-English Dictionary’, Corrected Edition 2002, Motilal Banarsidass Publishers Priveted Limited, Delhi, p. 458

১৪. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), দ্র. ‘বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান’, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ ৬৫৭

১৫. আফরোজ হক, নাজনীন, দ্র. ‘বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ’ (খণ্ড ১০), প্রথম প্রকাশ, নিমতলী ঢাকা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, পৃ ৩৯৩

১৬. চৌধুরী, সুপ্রিয়, ‘আরেকটি কলকাতা’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ ১৬৩

১৭. রায়, প্রফুল্ল, ‘যখন যা মনে পড়ে’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ১৩৮

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘জীবনস্মৃতি’, (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৯), ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ ৪১৬

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘ডাকঘর’, (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬), ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ ৩৫৮

২০. বসু, অমৃতলাল, ‘অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি’ (সম্পা. ড. অরুণকুমার মিত্র), প্রথম মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্যলোক, জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ ৯৫

২১. সরকার, পবিত্র, ‘লোক ভাষা সংস্কৃতি নন্দনতত্ত্ব’, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৪, পৃ ১৪১

২২. বসু, অমৃতলাল, ‘অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি’ (সম্পা. ড. অরুণকুমার মিত্র), প্রথম মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্যলোক, জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ ১০৩

সহায়ক গ্রন্থ

মজুমদার, অভিজিৎ, ‘ভাষাপ্রসঙ্গ ও ধ্বনিবিজ্ঞান’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৪

চট্টোপাধ্যায়, আবীর, ‘জ্ঞাপনতত্ত্ব ও সংস্কৃতি’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, মার্চ ২০০৭

সিংহ, উদয়নারায়ণ, ‘ভাষা সমাজ সংস্কৃতি’, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২

জীনাত ইমতিয়াজ আলী, ‘ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা’, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বাংলাদেশ : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১

ঘোষ, দেবব্রত, ‘সাহিত্য, ইতিহাস ও জনজীবনে রেল’, প্রথম সংস্করণ, মেমারী বর্ধমান : এভেনেল প্রেস, কলকাতা বইমেলা ২০২০

সরকার, পবিত্র, ‘লোক ভাষা সংস্কৃতি নন্দনতত্ত্ব’, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৪

চৌধুরী, প্রদোষ, ‘সমাজচিত্রে ভারতীয় রেল’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা : গাঙচিল, সেপ্টেম্বর ২০১৬

দাশ, ভবেশ (সম্পা), ‘সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : গাঙচিল, কলকাতা বইমেলা ২০০৭

মুসা, মনসুর, ‘প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা’, পরিমার্জিত নবযুগ সংস্করণ, বাংলাবাজার ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৬

রহমান, মীজানুর, ‘কমলালয়া কলকাতা’, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা : বিশ্বকোষ পরিষদ, বইমেলা ২০০৯

হাই, মুহম্মদ আবদুল, ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’, সপ্তদশ মুদ্রণ, ঢাকা বাংলাদেশ : মল্লিক ব্রাদার্স, অক্টোবর ২০১৪

সর, রমেনকুমার, ‘রেল : উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সাহিত্যে’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : কমলিনী প্রকাশন, জুলাই ২০১২

গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ, ‘কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

হুমায়ুন, রাজীব, ‘সমাজভাষাবিজ্ঞান’, প্রথম প্রকাশ, বাংলাবাজার ঢাকা বাংলাদেশ : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০১

বসু, সুদীপ্ত, ‘শরীরের ভাষা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : দে পাবলিকেশনস্, জানুয়ারি ২০১২

চৌধুরী, সুপ্রিয়, ‘আরেকটি কলকাতা’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৮

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

চট্টোপাধ্যায়, কিঙ্কি, “ট্রেনের কামরা থেকে কামরায়, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণা”, ‘এই সময়’ সংবাদপত্র, ৮ মার্চ ২০১৭ : ৮

দত্ত, চির, “হকার ও ফ্রাঙ্কেনস্টাইন”, ‘দেশ’ ৬৪ বর্ষ ২১ সংখ্যা : ২৩ আগস্ট ১৯৯৭ : ৬৯-৭৬

মিত্র, জয়া, “পুরুষ প্রবেশ নিষেধ”, ‘রোববার’ (‘সংবাদ প্রতিদিন’ সংবাদপত্র) ৩০ আগস্ট ২০০৯ : ১২-১৩

দেবসেন, নবনীতা, “ফিরিওয়ালা”, ‘রোববার’ (‘সংবাদ প্রতিদিন’ সংবাদপত্র) ৫ ডিসেম্বর ২০১০ : ১০-১৩

রায়, বিধানচন্দ্র, “ডাকগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, দরজাতে এসে দাঁড়ায় না কেউ”, ‘রবিবারোয়ারি’ (‘এই সময়’ সংবাদপত্র) ১৭ নভেম্বর ২০১৯ :

লেট, ভাস্কর, “কেয়ার অফ ফুটপাত”, ‘রোববার’ (‘সংবাদ প্রতিদিন’ সংবাদপত্র) ৫ ডিসেম্বর ২০১০ : ২৮-৩০

মুখোপাধ্যায়, মন্দার, “ফুটে আছে যূথী জাতি জাঙ্গু”, ‘রোববার’ (‘সংবাদ প্রতিদিন’ সংবাদপত্র) ২৯ নভেম্বর ২০০৯ : ২০-২৫

সেনগুপ্ত, মুগ্ধ, “অঙ্গভাষা : জ্ঞাপনের স্তর বিন্যাসে”, ‘লোকসংস্কৃতি গবেষণা’ ১৭ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১১ (অঙ্গভাষা বিশেষ সংখ্যা) : ২১৯-২২৪

পণ্ডা, রাহুল, “লোকালের ভাষা, ভাষার রেলগাড়ি”, ‘উজাগর’ ষোড়শ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪২৬ : ২৮১-৯৭

শিলাজিৎ, “হক কথা”, ‘রোববার’ (‘সংবাদ প্রতিদিন’ সংবাদপত্র) ৫ ডিসেম্বর ২০১০ : ২০-২২

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, “ফিরে এল ফেরিওয়ালা”, ‘ছুটি’ (‘সংবাদ প্রতিদিন’ সংবাদপত্র) ২৪ জানুয়ারি ২০২১ : ৮

চক্রবর্তী, সুধীর, “লজেন্স হজমি শরীর রবীন্দ্র টুনির মা”, ‘রোববার’ (‘সংবাদ প্রতিদিন’ সংবাদপত্র) ৫ ডিসেম্বর ২০১০ : ১৪-১৯

“মহিলা কামরা বিলিতি আমড়া”, ‘রোববার’ (‘সংবাদ প্রতিদিন’ সংবাদপত্র) ৩০ আগস্ট ২০০৯ : ১৪-১৮

গুপ্তা, সুধীরা, “ফেরিওলার ডাক”, ‘এক্ষণ’ সপ্তদশ বর্ষ ১-২ সংখ্যা : শীত-বসন্ত ১৩৯১ : ১১৫-২৪

সহায়ক অভিধান

শরীফ, আহমদ (সম্পা), ‘বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান’, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বাংলাদেশ : বাংলা একাডেমী, সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সম্পা), 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৬, ২ খণ্ড
বসু, নগেন্দ্রনাথ, 'বিশ্বকোষ', প্রথম প্রকাশন, দিল্লী : বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৮৮৬-১৯১১, দ্বাবিংশ খণ্ড
হক, নাজনীন আফরোজ, 'হকার', দ্র. 'বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ', প্রথম প্রকাশ, নিমতলী ঢাকা বাংলাদেশ : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ১০ খণ্ড : ৩৯৩-৯৪
বসু, রাজশেখর, 'চলন্তিকা', নতুন সংস্করণ, কলিকাতা : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪১৮ বঃ
বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (প্র. সম্পা), 'সংসদ বাংলা অভিধান', পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, নভেম্বর ২০০০
সেন, সুকুমার, 'ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০ মে ২০০৩
বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', প্রথম সংস্করণ, নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৭, ২ খণ্ড
Williams, Sir Monier Monier, 'A Sanskrit-English Dictionary'. Motilal Banarsidass Publishers Priveted Limited : Delhi, Corrected Edition 2002 .

....

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পাতঞ্জলযোগ ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে রাজযোগ

সায়ন ভট্টাচার্য্য
গবেষক , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার (SACT) , গলসী মহাবিদ্যালয়

সারাংশঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে – "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষদসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে..." এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার লক্ষ্য হল ব্রহ্মবিদ্যা এবং উপায় হল যোগ। তবে গীতায় যোগ কথাটি শুধু উপায় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, লক্ষ্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে "সমত্বং যোগ উচ্যতে"। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। শ্রীকৃষ্ণ আবার যোগ বলতে বুঝিয়েছেন "তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ সংজ্ঞিতম্"। গীতায় যোগের যে তিনটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে এগুলির প্রথম ও তৃতীয়টি দ্বারা যোগ বলতে সাধ্যকে বা লক্ষ্যকে বোঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় যোগ শব্দটির দ্বারা সাধন বা উপায়কে বোঝানো হয়েছে। মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলেছেন। স্বামীজীর মতে যোগ হল জুড়ে দেওয়া অর্থাৎ জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন করে দেওয়া। পাতঞ্জলযোগদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উভয় শাস্ত্রে 'যোগ' শব্দটি আত্মোপলব্ধির পথ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনের নিগ্রহের উপায় প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে যে যোগ তাকে রাজযোগ বলা যেতে পারে।

বীজশব্দঃ

যোগ, রাজযোগ, ব্রহ্মবিদ্যা, দুঃখ, চিত্তবৃত্তি, নিরোধ, অভ্যাস, বৈরাগ্য,

স্বামী বিবেকানন্দ সাধনার চারটি স্তম্ভের কথা বলেছেন। সেগুলি হল জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ ও রাজযোগ। স্বামী বিবেকানন্দের মতে এগুলি এক একটি বা চারটি মিলিতভাবে আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আমরা তিনপ্রকার যোগের উল্লেখ পাই, কিন্তু রাজযোগের উল্লেখ আলাদা করে পাই না। অর্থাৎ এখানে এমন কোন অধ্যায় নেই যার নাম রাজযোগ। তাহলে রাজযোগের কথা কী গীতায় বলা হয় নি ? এই জিজ্ঞাসাই আমাকে বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাতে চাই গীতার কোন্ অধ্যায়ে, বিশেষকরে কোন্ কোন্ শ্লোকে রাজযোগের কথা বলা হয়েছে, রাজযোগ বলতে বস্তুত কি বোঝায় এবং পাতঞ্জল যোগের সঙ্গে রাজযোগ তথা স্বামীজীর রাজযোগের কীরূপ সম্পর্ক।

রাজযোগ আলোচনার পূর্বে আমাদের জানতে হবে 'যোগ' শব্দের অর্থ কী? পাতঞ্জলযোগ দর্শন ও যোগভাষ্যে আমরা যোগের কথা পাই। আবার শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের নামের শেষে যোগ শব্দটি যুক্ত। প্রথমে দেখব যোগসূত্রে 'যোগ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে। মহর্ষি পতঞ্জলি দ্বিতীয় যোগসূত্রে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলেছেন।[১] অর্থাৎ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই ছয়প্রকার হল চিত্তবৃত্তি এবং এ-সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলে।[২] চিত্ত বলতে বোঝায় মনকে। চিত্তের আবার পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা আছে। সেই অবস্থাগুলি হল ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।[৩] এর মধ্যে ক্ষিপ্ত থেকে বিক্ষিপ্ত পর্যন্ত চিত্তের ভূমিতে কোন প্রকার যোগ হয় না। অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিগুলির কোন প্রকার নিরোধ সম্ভব হয় না। যে সমাধি একাগ্র চিত্তে উৎপন্ন হয়ে যথার্থ বিষয়কে প্রকাশ করার পর ক্লেশ প্রভৃতিকে ক্ষীণ করে এবং কর্মের বন্ধনকে ছিন্ন করে চিত্তকে তার বৃত্তি নিরোধ ভূমির অভিমুখে নিয়ে যায় সেই অবস্থাকেই যথার্থ যোগ বলা হয়। এ সমাধির নাম হল সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।[৪] প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে যোগদর্শনে দুপ্রকার সমাধি স্বীকার করা হয়েছে। যথা- সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত।

যোগসূত্রে বলা হয়েছে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই ছয়টি হল চিত্তের বৃত্তি। যোগদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে।[৫] প্রমাণের দ্বারা পুরুষের প্রমা উৎপন্ন হয়। পাতঞ্জল দর্শনে প্রমা অনুব্যবসায়জ্ঞানস্থানীয় এবং

প্রমাণ ব্যবসায়জ্ঞানস্থানীয় চিত্তবৃত্তি। পরবর্তী চিত্তবৃত্তি হল বিপর্যয়। বিপর্যয় হল মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান। এক বস্তুকে অন্যবস্তু রূপে জানাকে বলা হয় বিপর্যয় বা ভ্রম জ্ঞান। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান।[৬] অবস্তুভূতবিষয়কজ্ঞানকে বিকল্পচিত্তবৃত্তি বলে। যেমন খরগোশের শিং।[৭] চিত্তের যে অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়জন্য জাগতিক বৃত্তি এবং কেবল মনোজন্য স্বপ্নবৃত্তি কিছুই থাকে না তাকে নিদ্রা বলা হয়। এই অবস্থায় তমঃগুণই চিত্তের বিষয় হয়ে থাকে।[৮] পরবর্তী চিত্তবৃত্তি হল স্মৃতি। সংস্কারকে সহকারীকারণ করে অনুভবকে জনক করে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। স্মৃতির বিষয় হল প্রমাণ, বিপর্যয় দ্বারা অধিগত পদার্থ।[৯] এই ছয় প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই পাতঞ্জল শাস্ত্রে যোগ বলা হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের দ্বারা গঠিত হয় চিত্ত। তাই চিত্ত হল ত্রিগুণাত্মক। যোগের অর্থ এই চিত্তের সকল প্রকার যে বৃত্তি তার নিরোধ ঘটানো। এই বৃত্তিগুলির নিরোধ ঘটবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা। যোগসূত্রে বলা হয়েছে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"।[১০] এই সূত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে উভয় দিকে প্রবাহমান একটি নদী আছে যার নাম চিত্ত। এই নদীর দুটি প্রবাহ হল একটি মঙ্গলের নিমিত্ত অপরটি পাপের নিমিত্ত। যে প্রবাহ কৈবল্যের অভিমুখে ধাবিত হয় তা হল কল্যানবহ। আর যে প্রবাহ সংসারের অভিমুখে ধাবিত হয় অর্থাৎ যার বিষয় হয় অবিবেকী তা হল পাপবহ। বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়দিগের প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয় এবং বিবেকদর্শনের অভ্যাসের দ্বারা বিবেক পথের স্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়। যে উপায় অবলম্বন করলে চিত্তের রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি দূর হয় এবং কেবল সাত্ত্বিক বৃত্তির প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় অভ্যাস[১১] এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার সুখ উপস্থিত হলেও তাতে সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত থাকাই হল বৈরাগ্য।[১২] এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করলেই চিত্ত বা মন সমাধিতে উত্তীর্ণ হবে। অবশ্য শুধু অভ্যাস ও বৈরাগ্য এলেই হবে না, এর সাথে অষ্টাঙ্গযোগের অনুশীলনও প্রয়োজন। চিত্তের পাঁচপ্রকার ক্লেশ আছে। যম, নিয়ম প্রভৃতি আটপ্রকার যোগের অনুষ্ঠান করলে অবিদ্যাদি ক্লেশের তিরোধান হয় এবং তখন আত্মজ্ঞান হয়। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে আটটি যোগের কথা বলা হয়েছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি - এই আটটি হল যোগের আটটি অঙ্গ।[১৩] এই আটপ্রকার যোগাঙ্গ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ। একেই যোগদর্শনে মুক্তি বলা হয়।

ভারতীয় শাস্ত্র ও দর্শন উভয়েই জীবের আধ্যাত্মিককল্যাণ তথা মুক্তির কথা বলেছেন। উপরি-উক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে যোগকে কৈবল্যলাভের তথা মুক্তির উপায় বলা হয়েছে। পাতঞ্জলযোগ শাস্ত্র ছাড়া আমরা আরও বিভিন্ন স্থানে 'যোগ' শব্দটির উল্লেখ পাই। বহুলপ্রচলিত এবং হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 'যোগ' শব্দের উল্লেখ পেয়েছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮টি অধ্যায়ের প্রত্যেকটির নামের সাথে 'যোগ' শব্দটি যুক্ত। যেমন অর্জুনবিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ প্রভৃতি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে – "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষদসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে..." এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার লক্ষ্য হল ব্রহ্মবিদ্যা এবং উপায় হল যোগ। তবে গীতায় যোগ কথাটি শুধু উপায় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, লক্ষ্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৮নং শ্লোকে বলা হয়েছে "সমত্বং যোগ উচ্যতে"।[১৪] অর্থাৎ ফলাফলে চিত্তের সমত্ব বা নির্বিকার ভাবই হল যোগ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দেওয়ার পর যোগস্থ হয়ে কর্ম করার কথা বলেছেন। গীতাকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭নং শ্লোকে বলেছেন কর্মত্যাগে যেন আসক্তি না আসে, কর্মফলে আমাদের অধিকার নেই, কর্মেই অধিকার এবং আমরা যেন কর্মফলের হেতু না হয়ে কর্ম করি।[১৫] একথার তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হয়ে কর্ম করার কথা বলেছেন। সিদ্ধি-অসিদ্ধি উভয় অবস্থাতেই সমভাবাপন্ন হয়ে ঈশ্বরোপাসনাজ্ঞানে কর্ম সকলের অনুষ্ঠান করার কথা বলা হয়েছে। 'সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা' বলতে জয়-পরাজয়কে সমানজ্ঞান করে অর্জুনকে যুদ্ধ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বোঝাতে চেয়েছেন কর্তব্যবোধে আমরা যদি কর্ম করি তবেই আমরা নিস্কাম কর্ম করতে পারব। এরপর বলেছেন "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"।[১৬] 'কৌশলম' বলতে কুশলতা বা কুশলভাবকে বোঝানো হয়েছে। মধুসুদন সরস্বতী গূঢ়ার্থদীপিকায় বলেছেন যে সমতাবুদ্ধিবিশিষ্ট যে কর্মযোগ তা কর্ম স্বরূপ হলেও তা দুষ্কর্মের ক্ষয় করে থাকে, একারণে সেই কর্মযোগ মহাকুশল।[১৭] এখানে আরও বলা হয়েছে এই সমত্ববুদ্ধিবিশিষ্টকর্ম অনুষ্ঠিত হলে মানুষ সত্ত্বশুদ্ধি দ্বার সহকারে পরমাত্মা সাক্ষাৎকার লাভ করে সুকৃত এবং দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়।[১৮] যোগীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যোগ বলতে বুঝিয়েছেন "তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ সংজ্ঞিতম্" অর্থাৎ যোগ বলতে এমন অবস্থাবিশেষকে বোঝানো হয়েছে যা হল সুখদুঃখসংস্পর্শশূন্য। গীতায় যোগের যে তিনটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে এগুলির প্রথম ও তৃতীয়টি দ্বারা যোগ বলতে সাধ্যকে বা লক্ষ্যকে বঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় যোগ শব্দটির দ্বারা সাধন বা উপায়কে বোঝানো হয়েছে।

রাজযোগ বলতে কী বোঝায়? রাজযোগ শব্দটি তন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে-এরূপ অভিমত কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। এদের মতে মহর্ষি পতঞ্জলি স্বীকৃত যোগ থেকে রাজযোগের পার্থক্য আছে। আধিবিদ্যক পরিকাঠামো অনুযায়ী যোগ শব্দের অর্থ সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন হলেও পাতঞ্জলযোগদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উভয় শাস্ত্রে 'যোগ' শব্দটি আত্মোপলব্ধির পথ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এর সাথে রাজযোগকে আত্মোপলব্ধির অন্যতম পথ বলে স্বীকার করেছেনে এবং রাজযোগের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ রাজযোগ হল সকল যোগের রাজা। স্বামীজীর মতে যোগ হল জুড়ে দেওয়া অর্থাৎ জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন করে দেওয়া। এই যোগে কোন প্রকার পূর্বস্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। এটি হল একপ্রকার বৈজ্ঞানিক পথ। এটি হল মনোস্তাত্বিক বিজ্ঞান। যে-কেউ এই উপায় অবলম্বন করতে পারে এবং এর দ্বারা অধ্যাত্ম ফল লাভ নিশ্চিত হবে এ বিষয়ে কোন সন্ধেহ নেই। তবে যিনি এই পথ অবলম্বন করবেন তাকে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে বলিষ্ঠ ও সংযমী হতে হবে। সত্ত্ব গুণ প্রধান মনের অধিকারী হয়ে এই পথ অবলম্বন করতে হবে। লক্ষ্য এক হতে হবে। লক্ষ্য হবে আত্মোপ্লব্ধি বা ঈশ্বরলাভ। এ সাধনা মাঝপথে ছাড়া যাবে না এবং অনাচাড় করলে পাগল হয়ে যাবে। এ ভাবে রাজযোগ সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পাতঞ্জলযোগসূত্রের উল্লেখ করেছেন এবং যোগদর্শনসম্মত যোগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। স্বামীজী বলেছেন পাতঞ্জলসূত্র হল রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্বোচ্চ প্রামাণিকগ্রন্থ। প্রসঙ্গগত একথাও বলা যায় যে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয়সূত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মধুসূদন সরস্বতী তাঁর গূঢ়ার্থদীপিকায় "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ", "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ"এই যোগসূত্রদুটি উল্লেখপূর্বক আলোচনা করেছেন। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে পাতঞ্জলযোগের সাথে রাজযোগের কোনো পার্থক্য নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় 'রাজযোগ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'অন্তঃপ্রকৃতির জয়'।[১৯] তাঁর মতে প্রতিটি মানুষেরই অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি এই দু প্রকার প্রকৃতি আছে এবং অন্তঃপ্রকৃতি, বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর। বহিঃপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হল বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি। আর অন্তঃপ্রকৃতি হল মন, মানসিকবৃত্তি প্রভৃতি। আমরা বাহ্যেন্দ্রিয় যেমন চোখ দিয়ে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করি, কিন্তু চোখ দিয়ে চোখকে দেখতে পারি না। তবে মন দিয়ে আন্তরপকৃতির সবকিছুকে যেমন প্রত্যক্ষ করি তেমনি মন নিজেকে নিজে প্রত্যক্ষ করতে পারে। স্বামীজী বলেছেন, "আমরা জানি মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা নিজের ভেতরটা দেখতে পারে—একে অন্তঃপর্যবেক্ষণ শক্তি বলা হয় ...... একই সময়ে তুমি কাজ করছ এবং চিন্তা করছ, আবার তোমার মনের আর এক অংশ যেন পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে--- তুমি কী চিন্তা করছ। মনের একাগ্রশক্তি একত্র করে মনের ওপরেই প্রয়োগ করতে হবে। সূর্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির কাছে অতি অন্ধকার কোণগুলি যেমন তাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করে দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন নিজের অতি অন্তরতম রহস্যগুলি প্রকাশ করে দেবে"।[২০] স্বামীজী আরও বলেছেন যে "রাজযোগের সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য—কীভাবে মনকে একাগ্র করা যায়, তারপর কীভাবে মনের গভীরতম প্রদেশগুলি আবিষ্কার করা যায়, শেষে মনের ভেতরের ভাবগুলি থেকে কীভাবে একটা সাধারণ প্রক্রিয়া খুঁজে বের করে তা থেকে নিজেদের একটা সিদ্ধান্ত করা যায়।"[২১] রাজযোগ অবলম্বন করে যে আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরলাভ করা যায় এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ , যোগদর্শন ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার সাথে একমত।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন একজন যোগী তাকেই বলা যায় যিনি তাঁর দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে কোন নির্জন জায়গায় বসে মনকে সর্বদা একাগ্র করেন।[২২] ধ্যানাভ্যাসের সময় সমস্তরকম চিন্তারাশি সংযত হতে হবে, কাম্যবস্তুর প্রতি কোনরকম কামনা থাকবে না। শ্রীকৃষ্ণ, এ প্রসঙ্গে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের সঙ্গে মনের একাগ্র অবস্থাকে তুলনা করেছেন।[২৩](৬/১৯) ধ্যানযোগের অভ্যাসের ফলে সেই ব্যক্তি সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবেন।[২৪](৬/২২) যোগীকে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে সর্তক করেছেন যে যোগী সর্বদা অধ্যবসায়ের সঙ্গে এবং হতাশাশূণ্য হয়ে যোগাভ্যাস করবেন।[২৫](৬/২৩) শ্রীকৃষ্ণের এরূপ কথা থেকে অর্জুন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে বলেন চঞ্চল মনের দ্বারা যোগাভ্যাস অসম্ভব । তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেন মনের নিগ্রহ দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সেই মনকে নিগৃহীত করা যায়।[২৬](৬/৩৫খ)

যোগ বলতে এককথায় বোঝায় মনকে নিগৃহীত করা। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনের নিগ্রহের উপায় প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে যে যোগ তাকে রাজযোগ বলা যেতে পারে। মন নিগৃহীত হলে আত্মোপলব্ধির পথ সুগম হয়। তাই রাজযোগ আত্মোপলব্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

তথ্যসূত্র

[১] যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।। যোগসূত্র ১।২
[২] প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ।। ১।৬, তদেব
[৩] ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। যোগভাষ্য, ১।১
[৪] যস্তেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। যোগভাষ্য ১।১
[৫] প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।। যোগসূত্র ১।৭
[৬] বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠাম্।। তদেব ১।৮
[৭] শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।। তদেব ১।৯
[৮] অভাবপ্রত্যালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।। তদেব ১।১০
[৯] অনুভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।। তদেব ১।১১
[১০] যোগসূত্র, ১।১২
[১১] তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।।তদেব ১।১৩।
[১২] দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।। তদেব ১।১৫।
[১৩] যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।। তদেব ২।২৯।
[১৪] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৪৮
[১৫] কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফকেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।। তদেব ২।৪৭।
[১৬] তদেব, ২।৫০(খ)
[১৭] সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ কর্ম্মযোগঃ কর্ম্মাত্মাপি সন্ দুষ্টকর্ম্মক্ষয়ং করোতীতি মহাকুশলঃ
[১৮] ইহ সমত্ববুদ্ধিযুক্তে কর্ম্মণি কৃতে সতি সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ বুদ্ধিযুক্তঃ পরমাত্মাসাক্ষাত্কারবান্ সন্ জহাত্যুভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
[১৯] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।২৩
[২০] স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭০
[২১] তদেব।
[২২] যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬।১০।।
[২৩] যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬।১৯
[২৪] যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।। তদেব, ৬।২২
[২৫] তং বিদ্যাদ্দুঃখদংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা।। তদেব, ৬।২৩
[২৬] অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।। তদেব, ৬।৩৫

গ্রন্থপঞ্জী

১। মহর্ষি পতঞ্জলি, যোগসূত্র, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু দ্বারা সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা, ২০০৫

২। মহর্ষি বেদব্যাস যোগভাষ্য, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু দ্বারা সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা, ২০০৫
৩। মহর্ষি বেদব্যাস, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৯১
৪। সরস্বতী মধুসূদন, গূঢ়ার্থদীপিকা, পণ্ডিত শ্রীযুক্তভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কর্তৃক সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৬
৫। স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৬৪

....

একই রক্ত বুকের তলে : 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস

ড. শর্মিষ্ঠা সেন
সহযোগী অধ্যাপক
জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ , দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ-

দেশপ্রীতির জোয়ারে যখন দেশ ভাসে, তখন আমরা বাঙালিরা অন্তরে ক্ষোভ অনুভব করি। পাঞ্জাবের মতোই ভারতের পূর্বপ্রান্ত দেশের স্বাধীনতার দিনে আনন্দোৎসব করতে পারে নি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে' -উপন্যাসটিতে হিন্দু-মুসলমানে মিলিত এক বাঙলাভূমির ছবি এঁকেছেন, যেখানে পরমাত্মীয়তায় বাঁধা থাকে অধিবাসীরা। কিন্তু খুব ধীরে-ধীরে বিভেদের কীট প্রকাশ করে সে-আত্মীয়তায়।এক প্রজন্মের কাছে যে-সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসার,পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা-ই গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। ধর্মীয় স্বার্থ কায়েম করার লক্ষ্যে মানুষে-মানুষে আত্মীয়তা ক্রমশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।উপন্যাসটিতে এবং পরবর্তী খণ্ডেও আমাদের ধ্বংসের দায়ভাগ কার—এ প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্রশব্দ :
স্বাধীনতা-'অমৃত মহোৎসব'-দেশভাগ-হিন্দ-মুসলমান-স্বপ্ন-বাঙলা-শোষণ]

মূল প্রবন্ধ-

স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তির ভেরী বাজছিল চারিদিকে। স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসবে' মেতে উঠেছে দেশ। আমরা বাঙালিরাও পিছিয়ে নেই, আমরাও করে চলেছি—যে যা পারি। অন্তত, খুশি হতে তো বাধা নেই! মন-কেমন-করা দেশপ্রীতির গানে সুর মেলাচ্ছি অন্তত—'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'! কিন্তু বর্ষপূর্তি কি একটা সংখ্যা মাত্র? না, আর এক বার মিলিয়ে নেওয়া এই কটা বছরে আমরা কী-কী পারিনি! কী-ই বা করে উঠেছি আমরা? নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক অখণ্ড দেশের স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ১৯৪১-এর আগস্ট মাসে চলে গেছেন কবিগুরু। দেশ স্বাধীন হয়েছে তার ঠিক ছয় বছর পর। 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'-- এই রক্তগরম করা ডাক দিয়েছিলেন যে সুভাষ, তিনিও তাঁর স্বপ্ন নিয়ে তখন হারিয়ে গেছেন। ১৯০৫-এ রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধন উৎসব কেবল সম্মিলিত স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে। ১৯৪৭-এর ১৪-১৫ই আগস্ট দ্বি-জাতিত্বের ভিত্তিতে ভাঙা হিন্দু আর মুসলমানের স্বার্থসঙ্কট তিন খণ্ড করেছে ভারতবর্ষকে—পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান এবং ভারত। আরো কিছু পরে—তিনটি দেশ,পাকিস্তান, ভারতবর্ষ আর পদ্মাপারের বাঙালির বাংলাদেশ! 'অমৃত মহোৎসবে' ঢাকঢোল পিটিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে--ভাঙা বাংলার হাহাকার; এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান! ভারতবর্ষ শুনতে না-পেলেও অমৃত-মহোৎসবের ভেরির আড়ালে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া বাঙালি মনে-মনে আউড়েছে—

> 'তোমরা যে সব বুড়ো খোকা বাঙলা ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা?'

এ-কালের তসলিমা নাসরিনের কবিতা—

> আমি সাতচল্লিশ শব্দটি মুছে ফেলতে চাই
> আমি সাতচল্লিশের এর দাগ ধুয়ে ফেলতে চাই
> পানি ও সাবান দিয়ে। [১]

কিন্তু বাস্তবকে মেনে না নিয়ে আমাদের উপায় নেই। ধর্মের ভিত্তিতে রাডক্লিফের লাইন ধরে প্রথমে ১৯৪৭-এ ভারত ও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভাগ হলাম। এ-পারে ও-পারে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন বহু বহু মানুষ। বহু মানুষ ভিটে-মাটি ছাড়তে বাধ্য হলেন। ধর্মের কারণে ভাগ

হয়ে গেলেন বাঙালি। বিভাজিত দেশ স্বাধীনতার আনন্দ দিতে পারে নি সেদিন এ-পারের বাঙালিকে। অথচ কিছুদিনের মধ্যেই ভুল বুঝলেন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা; ধর্ম যেমন একটা পরিচিতি, ভাষা আরো বড় পরিচিতি! ১৯৫২ থেকে মাতৃভাষার জন্য লড়াই শুরু করে আবার আর একবার দাবি তুলে পাকিস্তান থেকে নতুন বাংলাদেশ হল। ১৯৭১ সাল। বাংলা ভাষার জয়গানে মুখরিত, রক্তের বিনিময়ে গড়ে তোলা নবতম দেশটির পুনর্মিলন উৎসবে সেদিন সামিল হয়েছিলেন এ-পারের বাঙালিও। ১৯৭১ সালে দিল্লির দুর্গা পূজার প্যাণ্ডেলে মাইকে বাজছে—'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি—বাংলাদেশ! আমার বাংলাদেশ!'[২]

দেশভাগের আগে (১৯৪৬)শুরু করে এই ঘটনাধারাকে সম্পূর্ণ ধরে রেখেছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সিরিজের চারটি বিশালকায় বই। প্রথম খণ্ড 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' দেশভাগের আগের পূর্ববাংলার গ্রামজীবনের ছবি। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বইটির ১৯৭১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ১৩টি সংস্করণ প্রকাশিত। ১৯৭১-এ প্রকাশের পরই এ-বইটি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের দ্বার বারোটি ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯৯১ থেকে এখন বইটির অখণ্ড ই-সংস্করণও মেলে। ২০০৮ সালে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'বইটি সুরমা চৌধুরী আন্তর্জাতিক স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়।

বাংলার বুকে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নিয়েই হিন্দু মুসলমানের শান্তিময় সহাবস্থান। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' গ্রন্থের আরম্ভে পরস্পরের ধর্ম এবং আচার সম্বন্ধে কোনো নালিশ নেই, বরং আছে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, আছে পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভরতা ও শ্রদ্ধা-বাৎসল্যের সম্পর্ক। তিন প্রজন্ম শান্তির আশ্রয়ে বাস করে এসেছে। হিন্দু-মুসলমানের আচার-বিভেদ ছিল। অশিক্ষিত মুসলমান হিন্দুর আশ্রয়ে থেকে কাজ করত,তাদের অভাব-অনটনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা লাভ করত শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন হিন্দুরা। কিন্তু একদা শান্ত, আপাত-নিস্তরঙ্গ 'মেনে চলা' আর 'মানিয়ে চলা'র জীবনের মধ্য থেকে ধর্মের অজুহাতে ভাগ হয়ে মানুষ ক্রমশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে দুটি দেশে—হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান! মুসলমানপ্রধান গ্রামে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে হিন্দু পরিবারগুলি। এই ছবি দেখতে-দেখতে ছোট্ট সোনা—ঈশমদাদা এবং এক-গাঁ হিন্দু-মুসলমানের আদরের 'সোনাবাবু' তার শৈশব ও বালক বয়স কাটিয়ে এক সময়ে তার একান্ত-পরিচিত, নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গোপাট, সোনালী বালির নদী, বালির চর, হাসান পীরের দরগা, হাজি সাহেবের আতাবেড়া, আন্নু বেগম, মালতীর দুর্ভাগ্য, সামসুদ্দীনের দেওয়া ধানের ছড়া, বাস্তুপূজার নিশান, শীতলক্ষ্যার জল, ভুঁইঞা বাড়ির মেয়ে অমলা-কমলা, ফতিমা, 'নিরুদ্দিষ্ট' পাগল জ্যাঠামশায়, মুসলমানপাড়া, বিশ্বাসপাড়া, মা-জ্যেঠিমা-ঠাকুমার বাৎসল্যের জগত—বিশেষ তার 'ঈশমদাদা'কে ছেড়ে চলে যাচ্ছে হিন্দুস্থানে। এক অবিভক্ত পরাধীন বাংলায় 'হেমন্তের বিকেলে' 'মাঠময় সোনালি ধানের গন্ধে আতুর যে ঈশম শেখ দূরের তরমুজ ক্ষেতে তরমুজের আকাশমুখো লতা দেখতে-দেখতে আবিল হয়ে উঠেছিল, হিন্দু মনিব ধনকর্তার পোলা হয়েছে জেনে আনন্দে নেচে উঠেছিল, গ্রন্থের শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে 'অন্নহীন.ভূমিহীন' সেই ঈশম তরমুজ ক্ষেতে মরে পড়ে থাকল--- একটা জন্ম-উৎসবে যে উপন্যাসের আরম্ভ, একটা মানুষের মৃত্যুতে সে (নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে)উপন্যাসের অবসান। মুসলমানের নিজের দেশে এক দরিদ্র মুসলমান রিক্ত অবস্থায় তরমুজ ক্ষেতে মরে পড়ে আছে। আর মুসলমানের স্বার্থ—ধর্মের ধ্বজা ধরে যারা পূর্বপাকিস্তানে থিতু হয়েছিল, তারা ক্ষুব্ধচিত্তে দেখছে তাদের ভাষা—বাঙালির প্রাণের ভাষা ব্রাত্য হয়ে পড়েছে নতুন দেশে। একই সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা আর এক বাংলাদেশের স্বপ্ন তখন বোনা হয়ে চলেছে-- কাঁটাতার-বিচ্ছিন্ন পদ্মাপারের সেই দেশে-- 'পূর্বপাকিস্তান' যার নাম। এই সর্বজ্ঞাত তথ্যটি পরিবেশন করে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বইটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে দুইটি খণ্ডে। গ্রন্থটি নিবেদিত হয়েছে বাংলাদেশের কাণ্ডারী শেখ মুজিবুর রহমান এবং লেখকের মা-কে।

'মানুষের ঘরবাড়ি' এই সিরিজের দ্বিতীয় বই। 'আমাদের দ্যাশ—পুকুর—নদীর ঘাট—নাও--ক্ষ্যাত' নিয়ে যে 'কল্পকাহিনী' এ-পার বাংলায় জন্মে অবধি আমরা আবাল্য শুনে এসেছি, একদা-ভূমিহীন, আর্থিক কষ্টে থাকা আমাদের উপরের প্রজন্মের কাছে, আর আড়ালে হেসেছি তাদের অবাস্তবতা কল্পনা করে, 'মানুষের ঘরবাড়ি' পর্বে আমরা সেই আদতে কষ্টে থাকা ছিন্নমূল মানুষগুলোকে দেখতে পেলাম। এপার বাঙলায় এসে শিকড়হারা মানুষগুলোর লড়াই ও তাদের কষ্টে গড়ে তোলা ঘরবসত এ-খণ্ডের মূল আখ্যান। সেই জবরদখল প্রায়-বন্ধ্যা মাটিতে কঠোর শ্রম দিয়ে তাতে ফসল ফলানো-- ক্রমে মানুষের মতো বাঁচতে শেখা। অসীম মমতায় আত্মীয়-বান্ধবকে নিয়ে একটি সরল ধর্মভীরু মানুষের(সোনার বাবা) ধীরে-ধীরে আবার স্বপ্ন গড়ে তোলা। মানুষকে মায়ায় বাঁধে নিজ হাতে গড়ে তোলা মানুষের ঘরবাড়ি। এই পর্বে সে-কথা।

'অলৌকিক জলযান' তৃতীয় পর্ব। কৈশোর পেরোনো সোনা 'ছোটবাবু' অর্থাৎ ফিফথ অফিসার হয়ে এস. এস. সিউল ব্যাঙ্ক নামক জরাজীর্ণ জাহাজে নাবিক হয়ে ভেসে পড়ে। এক অলৌকিক জলযান এবং সেখানে ক্যাপ্টেন হিগিনসের মেয়ে বনির সান্নিধ্য ও অপার্থিব ভালোবাসার অভিজ্ঞতা সোনার ছোটবাবু-পর্বের কথকতা যা পরবর্তী গ্রন্থে অতীশকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে আজীবন।

'ঈশ্বরের বাগান' এই সিরিজের সর্বশেষ গ্রন্থ। বনিকে শেষাবধি বিসর্জন দিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় সোনার ঘরবাড়িতে ফিরে আসার গল্প আছে এখানে। 'ঈশ্বরের বাগান'-এর কাহিনি মূলত অতীশ বা সোনার কলকাতা বাসের কাহিনি। অতীশের সংসারযাত্রা নির্বাহের কাহিনি। বাৎসল্যময় পিতা অতীশের কর্মস্থলের নানা জটিলতা, সততা আর অসাধুতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অতীতের 'ঘোর' তাড়িত এক অসহায় স্বামীর টানাপোড়েন। এই পর্বে অতীশ সাক্ষাৎ পেয়েছে তার গ্রামজীবনের শৈশবে ফেলে আসা কিছু মানুষের। তিনটি নারীর। তার ফেলে আসা দেশ-গাঁ-এ অতিথি হয়ে ফিরে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে আত্মানুসন্ধানের এক নতুন পর্যায়ে কাহিনিটি সমাপ্ত হয়েছে।

'ঈশ্বরের বাগান' পর্বে স্বল্প-পরিসরে হলেও শৈশব-বাল্যের স্মৃতিমেদুরতা ছাপিয়ে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরকে দোষারোপের এক নতুন আখ্যান। হিন্দু অতীশ মুসলমান ফতিমাকে বলে, মুসলমানরাই ঘরছাড়া করেছে হিন্দুদের। এই প্রথম ফতিমার মুখে অতীশ শুনেছে দেশভাগের অন্য বয়ান। হিন্দুর উচ্চমন্য স্বভাব আর মুসলমানকে বঞ্চিত রাখার দায় হিন্দুর। তাই বঞ্চিত মানুষ ক্ষেপে উঠেছিল। দেশভাগ তাদেরই কারণে।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' গ্রন্থের প্রসঙ্গে আসা যাক। ধনকর্তা ও ধনবৌএর ছেলে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক ওরফে সোনার জন্ম হয় পূর্ববাংলার একটি অভিজাত গোঁড়া-হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারে। শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী কোনো অঞ্চল সেটা। তখন স্বদেশীর যুগ। সংস্কৃতজ্ঞ, নৈতিক মূল্যবোধে দৃঢ়, পরদরদী, দানশীল এই হিন্দু পরিবার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় গ্রামের পাঁচজনের কাছে বিশেষ সম্মানিত 'ঠাকুর পরিবার'। বিপদে-আপদে এঁরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রামের নিম্ন-মধ্যবিত্ত আর গরীব মানুষের পাশে দাঁড়ান। তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় এঁরা মিলেমিশে একাকার হয়ে আছেন। সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-উৎসব-পার্বণ—সবেতেই গ্রামের হিন্দু-মুসলমান এঁদের আত্মীয়বন্ধু। ভরসার জায়গা।অবস্থাপন্ন 'বুড়া কর্তার'(ধনকর্তার বাবা) ছেলেদের মধ্যে যেমন মিলমিশ, বড়বৌ, ছোটবৌ, ধনবৌদের মধ্যেও সেই রকম। ছোটরা সবসময় সুরক্ষিত বোধ করে এই পরিবারে। প্রাচীন আদর্শবোধ পরিবারকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে।

এ-হেন পরিবারে 'আঘুনের শেষ ফজরে ধনকর্তার পোলা হইছে।'[৩]—এই খবরটি নিয়ে মাইলের পর মাইল ছুটে চলেছে ঈশম শেখ। ঠাকুরবাড়িতে জন খাটে সে। তার নিজের কথায়,--'ঠাকুর বাড়ির বান্দা আমি।' রাস্তায়, মাঠে যাকে পায় সে ডেকে ডেকে ঈশম এই খবরটি দেয়—যেন আজকের পৃথিবীতে এই খবরই একমাত্র খবর—ধনকর্তার পোলা হইছে। ঈশম নামের এই মানুষটি ধনকর্তার ছেলে হওয়ার খবরে খুশিতে হৈ-হৈ করে। অন্ধকার রাতের বেলায় কাদাজল ভেঙে ধনকর্তাকে খবর দিতে যায়। সে-বাড়ির পাগল বড়ঠাকুরকে একান্ত আত্মীয়ের মতো সে 'বড়মামা' বলে। বড়বৌএর পরম ভরসা সে। রাত-বিরেতে পাগল মণীন্দ্রনাথ(ঈশমের 'বড়মামা') বাড়ি না ফিরলে বড়বৌকে নিশ্চিন্ত করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ঈশম নিজে খুঁজতে বেরোয় তাঁকে। কারণ এই পরিবারের একান্ত আপনজন সে। দূর পথ পাড়ি দেওয়ার আগে ঠাকুরবাড়িতে নিঃসঙ্কোচে পাতা পেড়ে ভাত খেতে বসে ঈশম। বড়বৌ ঈশমকে খেতে দিয়ে পরমাত্মীয়ের মতোই তার যত্ন করে। বড় দূরে যাবে ঈশম। ঘরে তার পঙ্গু বৌ। বড়বৌএর কেমন মায়া হয় ঈশমের জন্য। আর ঈশমের মায়া হয় বড়বৌএর ছলোছলো বড়-বড় চোখ দুটির দিকে চেয়ে। তার পাগল স্বামীর কথা ঈশমের মতো আর কে জানতে চায় বড়বৌএর কাছে! তাই ঈশম তার পরম ভরসা—গোটা ঠাকুরবাড়ির ই পরম বিশ্বাস ও ভরসার মানুষ। তেমনি ঠাকুরবাড়ির মানুষের বড় আদরের জনও সে। সোনা এবং ঈশমের অসমবয়সী ভালোবাসা প্রথম-বইটিতে এক উল্লেখযোগ্য বুনন। ঈশমদাদার কাঁধে চড়া সোনার ছবিটির অভাববোধ আমাদের প্রথম বইটি পার হয়ে গিয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বই তিনটিতে বড়ই আঘাত করে। ঈশম যেন সোনাবাবুর শৈশব-বাল্যের নিশ্চিন্দিপুর—বড় হয়ে গেলে যাকে আর পাওয়া যায় না! নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে ঘিরে রাখে ঈশম সোনার শৈশব-বাল্যকে।

শুধু কি ঈশম? ঠাকুরবাড়ির পাগলঠাকুরকে রাত-বিরেতে মাঠ থেকে ধরে এনে বাড়ি পৌঁছে দিতে চায় আবেদালিও। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র পরিবারের মধ্যে নিবিড় এই আত্মীয়তা। উচ্চবর্ণের হিন্দু অস্পৃশ্যতায় দীক্ষিত। দরিদ্র মুসলমানও তা বরাবর মেনে চলেছে। মুসলমানের ছোঁয়া লাগলে হিন্দু কর্তাকে রাতবিরেতে তাঁর মাতা শশীবালা 'সান' করিয়ে দেবেন—এই ভয়ে আবেদালি তাঁর গায়ে হাত দেয় না। এ এক আশ্চর্য সম্পর্ক! আবেদালি কিন্তু এতে বিরক্ত নয়, বরং বড়কর্তার হয়রানি হবে বুঝে না-ছুঁয়ে কেবল তাঁকে বাড়ি চলে যেতে বলে।-'ঝড়-জল আসমান ফেটে নামলে মানুষটা ভিজে ভিজে মরে যাবে'! সে জন্য চিন্তায় তার মন পোড়ে। এই সম্পর্ক

ধনকর্তার 'পোলা' সোনাবাবুর জন্মের বহু আগে থেকেই চলে এসেছে। সমাজের কোনো ঘরে একেকটা ঘটনা ঘটে গেলে তার দোলা লাগে উঁচু-নীচু সকল মানুষকেই।

কাহিনির গতির সঙ্গে এ-গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একান্ত নির্ভরতার বহু চিত্র জড়িয়ে থাকে। ধনকর্তা, বড়বৌ, ঈশমদাদা, মালতী, জালালি, জোটন, ফেলু, আন্নু, নরেন দাস, হাতির মাহুত জসীম, আবদুল, আবেদালি, ঈশমের নাতনি ফতিমা, সামসুদ্দিন, মনজুর, আকালু সকলে মিলে গোটা গ্রামটাই যেন একটি বড় পরিবার! শুধু কি তাই? হাসান পীরের দরগা, বড় তেঁতুল গাছটা, মালতীর হাঁসগুলো, গোপাট, তরমুজের ক্ষেত---সবকিছুই যেন এই বিরাট পরিবারের সদস্য! এ-হেন পরিবারে অভিজাত হিন্দু 'ধনকর্তার পোলা' হলে মুসলমান প্রজা ঈশম এবড়োখেবড়া জমি আর তরমুজের ক্ষেত পেরিয়ে ছোটে ঠাকুর পরিবারের বড় ছেলে একদা-প্রতিভাবান, পলিন-বিরহী, অস্থিরমস্তিষ্ক-মনীন্দ্রনাথ আর দূরবর্তী অন্য গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে কর্মরত 'ধনকর্তা'কে খবর দেওয়ার জন্য। আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট ভিন্নতা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানেরএই আত্মীয়তার জোরেই, যে কোনো সময়ে ঈশম বা জোটন যে-কেউ কলা পাতা পেড়ে ভাত খেয়ে যেতে পারে ঠাকুরবাড়িতে। ঈশমকে পাত-পেড়ে খেতে দেখে নিঃসন্তান বড়বৌ-র দুই চোখে মমতা ছলছল করে! মুসলমান সামুর প্রাণ কেঁদে ওঠে একত্রে বেড়ে ওঠা হিন্দু বিধবা মালতীর দুঃখে। বালক বয়সের খুনসুটি আর খেলার সাথীটিকে বৈধব্যে জর্জরিত হতে দেখে মনের মধ্যে এক অসহায় ব্যাকুলতা অনুভব করে সে। মুসমান ছেলে ফেলু পড়াশুনায় ভাল ফল করতে না-পারলেও তার খেলা জিতে আসার আনন্দ সকল গ্রামের হিন্দু-মুসলমানকে উৎসবমুখর করে তোলে। পাগল বড় ঠাকুরকে না পেয়ে ঠাকুরবাড়ির লোকেরা নিশ্চয় উদ্বিগ্ন আছেন— অনুভব করে পরমাত্মীয়ের মতো বড়-নৌকোর মাঝি আবেদালি বড় ঠাকুরের নিরাপদ থাকার খবর ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে শীত, গ্রীষ্ম আর বসন্তে হিন্দুপাড়ায় কামলা খাটে। এই খাটার মধ্যে কোনো দীনতা নেই। ঠাকুরবাড়ির ছেলে আর বৌরাও কারণে-অকারণে, শোকে-উৎসবে এই দরিদ্র, মুসলমান গ্রামবাসীদের কাছে ডেকে নেয়। তাদের শুভাশুভ চিন্তায় খুশি আর উদ্বেগ প্রকাশ করে। দুঃখ পায়। মমতা বোধ করে।

তবু এই বৃহৎ গ্রাম-পরিবারেও ফাটল ধরে খুব মন্থর গতিতে। আর্থিক স্বচ্ছলতার উপরিভাগে থাকেন যাঁরা, স্বভাবতই তাঁরা শিক্ষিত, হিন্দু। কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাঁদের পদপ্রান্তে জীবন-অতিবাহিত করা-- আর্থিক ক্ষমতার নীচের দিকে থাকা মুসলমান প্রজাদের এক সময় তা নামঞ্জুর হয়। প্রথম প্রজন্মের কাছে যা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, অহেতুক ভালোবাসা বা সহানুভূতির বিষয়,—পরবর্তী প্রজন্মের চোখে তা-ই অস্বাভাবিক ঠেকে—মনে হয় 'দয়ার দান'! বড়কর্তা গোরস্থানের বটগাছের নীচে বসে আছেন—এই খবরটুকু আবেদালি ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছে দিতে বললে আবেদালির ছেলে জব্বর অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বলে, "আমি পারমু না বা'জান। আমারে অন্য কামের কথা ক'ন।" কাহিনির মধ্যে লেখক বুনে দেন পারস্পরিক আত্মীয়তার অচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে ক্রমশ বঞ্চনা এবং ক্ষোভের বিবর্তন কথা। জব্বর বাবাকে জানায় সে 'লীগে' নাম লিখিয়েছে কারণ-- 'হিন্দুরা আমাগ দ্যাখলে ছ্যাপ ফ্যালায়,আমরা-ও ছ্যাপ ফ্যালামু।'[৪]

উর্দ্ধতন পুরুষ অনুভব না করলেও, মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্ম জানে, এই পারস্পরিক মমতা ও নির্ভরতার মালিন্যহীন অনুভবের তলে যে আখ্যন নির্মিত হয়ে চলেছিল—তার নাম শোষণ। হিন্দু-প্রভুদের কাছে এই শোষণ-বঞ্চনার স্বরূপ স্পষ্ট ছিল না প্রথমাবধি। তাই জাতিভেদের বহুকাল যাবৎ-অভ্যাসে তাঁরাও মুসলমানের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তাঁদের আশ্রিত জনকে নির্দ্বিধায় 'দয়া' করে গেছেন, সরল মানুষ বশংবদ থেকেছে।

কেমন ছিল মুসলিম লীগের প্রতি হিন্দু-মুসলমানের প্রাথমিক সাড়া? উপন্যাসে তা-ও আছে। ঠাকুরদের পূজা-পার্বণের কাজকর্মে জড়িয়ে থাকা, আবেদালি ছেলে জব্বরের 'মুসলিম লীগে' যোগ দেওয়ার খবরে খুশি হতে পারেনি—বলেছে, --"তুমি আমার ভাত পাইবা না। কাইল থাইকা তোমার ভাত বন্ধ।" তারপর প্রতিকারহীন বিষাদ অনুভব করে,"আল্লা, দ্যাশে এটা কী শুরু হইল!"[৫] এই গ্রহণ-অগ্রহণ, দয়া-প্রতিবাদের মধ্যেই গাছে-গাছে মুসলিম লীগের ফেস্টুন টাঙায় সামু। দিন বদলে যায়। সামুর আশৈশব-সঙ্গী হিন্দু ঘরের বিধবা-মালতী আপন অধিকার বলে সামুর টাঙানো সব ফেস্টুন টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সামু কেবল কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে।

এই ভাবে ঘৃণা ও ভালোবাসার এক জটিল মানস সম্পর্কে আবর্তিত হতে শুরু করে হিন্দু-মুসলমানের গ্রাম। হিন্দুদের দয়া-দাক্ষিণ্য অসহ্য হয় যুবকদের। রাজনৈতিক চাপান-উতোর ক্রমশ বে-আব্রু হয়ে দেখা দেয়--

...সব জমি কার?

হিন্দুর।

ভূমিহীন কারা?
আমরা
উকিল বলুন, ডাক্তার বলুন, কারা?
হিন্দুরা।
শিক্ষা-দীক্ষা কাদের জন্য?
হিন্দুর জন্য।
ওদের জমিতে খাটলে আপনি খান, আপনার নাম মুসলমান।[৬]

এই যুক্তির একদিকে যখন বিদ্বেষ, অন্যদিকে মন-কেমন! সামু হিন্দু প্রতিবেশিদের প্রতি তার আবাল্য-অর্জিত দরদকে ঠেলে দিয়ে জোর করে ভাবতে চায়—'এসব সাময়িক দুর্বলতা'। আবার আকালু স্বদেশী করা ছোটকর্তাকে ধরিয়ে দিয়ে বাহবা নিতে এলে বেদনায় সামুর হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে।[৭]

অন্যদিকে আকালুর মতো মানুষ একেবারেই দ্বিধাগ্রস্ত নয়। লীগের নেতৃবৃন্দ তখন আকালুর মতো আরো অনেক মুসলিম নওজোয়ানকে সমস্ত বঞ্চনার শেষে সব-পেয়েছির দেশে টান দিচ্ছেন। মুসলমানের বঞ্চনার বোধ তীব্র অপমানে পর্যবসিত হলে দূরের গ্রামে রাত্রে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। যে মানুষগুলোর পরস্পরকে ছাড়া এক মুহূর্ত চলত না, কেন এক বিভাজনরেখা তাদের এই রকম বিচ্ছিন্ন করে দিল? সোনারা দেশ-গাঁ ছেড়ে হারা উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।এই চারটি গ্রন্থের সর্বশেষ পর্বে, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের টানাপোড়েন বুনতে-বুনতে লেখক যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন বারবার, কোথায় ভুল ছিল আমাদের? উপন্যাসের শেষদিকে ঈশমের অসহায় মৃত্যু একটা নির্ভরতার মৃত্যু। হিন্দু-মুসলমান যুগ্ম-শক্তির মৃত্যু।

'ঈশ্বরের বাগান'(অখণ্ড,করুণা প্রকাশনী,অষ্টম সং, ২০১৯) নামক শেষ খণ্ডে ফতিমা আর সোনার পরিণত-বয়স্ক স্মৃতিচারণ। ফতিমার প্রতি সমস্ত আবেগ সত্ত্বেও অতীশকে সহজ হতে দেয় না দেশ হারানোর ক্ষোভ এবং বেদনা। তার বাল্যস্মৃতি নেই, বলে সোনা। আসলে স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার দেশ হারানার যন্ত্রণা। ফতিমা সোনাকে মনে করিয়ে দিতে চাইলে চর্চিত হয় যন্ত্রণার কারণগুলো।

'তোরা আলাদা দেশ দাবি করলি! আমাদের মানুষ মনে করলি না। আমরা কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে উঠব ভাবলি না। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। বাংলাদেশ, এমন সোনার বাংলা, তাকে পূর্ব-পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়লি।'[৮] বালককালের সঙ্গিনী ফতিমা সমাপ্তি-খণ্ডে তার বন্ধু-পরিচয় ছাড়িয়ে সোনার কাছে 'তোরা'(মুসলমান প্রতিপক্ষ)।

দেশ-গাঁ ছেড়ে বিবাহসূত্রে কলকাতার উচ্চপদস্থ আমলার যুক্তিবাদী স্ত্রী ফতিমা। সোনাবাবুকে সে জীবনভর খুঁজে বেরিয়েছে কারণ তার নীলকণ্ঠ পাখিটি গচ্ছিত আছে সোনাবাবুর কাছে। তবু বহু বছর পেরিয়ে সোনার সঙ্গে দেখা হলে সে-ও বলতে ছাড়ে না—

'হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবার চেষ্টায় দেশটার ভাগ।' আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ফতিমা স্পষ্ট করে বোঝে আর্থিক, সামাজিক এবং শোষণের কথা—বৈষম্যের আসল কারণগুলো। তার বলতে ইচ্ছা হয়, "আপনারাও কম হুজুকে মাতলেন না। এ-পারে আপনাদের স্বর্গবাস।নরকে কে থাকে!...আপনারা চলে না এলে দেশটার কত জোর থাকত বলুন তো!"[৯]

ফতিমা বোঝে,হিন্দুরা চলে এলে বাংলাদেশ তার জোর হারিয়েছে। শেষ আখ্যান পর্যন্ত লেখক টেনে এনেছেন হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ ও ভালোবাসার কাহিনি! পাকিস্তান ভেঙে নতুন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার আখ্যানেও তা বিলীন হয় নি। মমতা থাকলেও 'ফতিমাদের' প্রতি সোনার মনোভাব এখনও মাঝেমাধ্যেই রুষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু ফতিমা বা পরবর্তীতে মীনু, মঞ্জুরা বুঝল, ধর্ম ধুয়ে জল(পানি) খেতে নেই![১০] লেখক কি বলতে চান নারীর কাছেই আছে কোনো উত্তর,সমাধান? শিক্ষা মুসলিম দুই নারীকে মুক্ত চিন্তা করতে শিখিয়েছে? অনেক সময় আখ্যানের সুতো ছিঁড়ে গেলেও দেশ-কালকে লুপ্ত করে শেষাবধি এই চারটি খণ্ডে বহতা নদীর মতো এক দীর্ঘ আখ্যান।

তথ্যসূত্র-

১) নাসরিন, তসলিমা, অস্বীকার, আয় কষ্ট ঝেঁপে, জীবন দেব মেপে,১৯৯৪
২) মজুমদার গৌরীপ্রসন্ন, শোনো একটি মুজিবরের থেকে, এই গানটি ১৩-১৫ই এপ্রিল ১৯৭১ সাল আকাশবাণী কলকাতার কেন্দ্রে প্রথম বাজানো হয়েছিল। শিল্পীঃ অংশুমান রায়
৩) বন্দ্যোপাধ্যায় , অতীন, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, একাদশ অখণ্ড সংস্করণ,২০১১, করুণা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৯

৪) ঐ, পৃষ্ঠা-১৯

৫)ঐ

৬)ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬

৭)ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৭, সমাজের একই সাক্ষ্য দেবে মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ'(সুবর্ণরেখা, ২০০৫) নামের স্মৃতিকথা। তিনিও লক্ষ্য করেছেন, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিচারে দীর্ঘকাল উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, ডাক্তার সবই হিন্দু ছিলেন, ছিলেন, মুসলমানের শোষক।

৮) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরের বাগান(অখণ্ড সংস্করণ), একান্ন, করুণা প্রকাশনী, অষ্টম সংস্করণ-২০১৯,পৃষ্ঠা-৪৭৯

৯) ঐ-৪৮৫

১০) ঐ, উনপঞ্চাশ, পৃ ৫০৪ এবং 'সাতষট্টি', পৃ৬৩০ থেকে' চুরাশি', পৃ-৭২৪

..

'অদ্ভুতুড়ে' চরিত্রের ঘনঘটায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শিশু-কিশোর সাহিত্য : চরিত্র চিত্রণের এক নতুন আঙ্গিক

সৌরভ চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শিশু-কিশোর উপন্যাসগুলি নিজস্ব বিষয় বৈচিত্র্যে যেমন অন্যান্য শিশু-কিশোর সাহিত্য থেকে অনেকটাই ভিন্ন স্বাদের পরিচয় বহন করে, ঠিক তেমনই শীর্ষেন্দু তাঁর পাঠককুলকে আকর্ষিত করেন এই ধারার সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির এক বিশেষ অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে। তাঁর অদ্ভুতুড়ে কাহিনি কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে সেখানে দেখতে পাই নিধিরামের মতো ভীতু ভূত, করালীর মতো ভুতে ভয় পাওয়া তান্ত্রিক, বগলাচরণের মতো অসফল গোয়েন্দা আবার ঠিক তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে মনোজের মতো অসীম সাহসি কিশোরদের মতো চরিত্রদের; যা আমাদের তথাকথিত শিশু-কিশোর সাহিত্য পাঠের দৃষ্টিভঙ্গিকে একটা ভিন্ন মাত্রা দেয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে কাহিনি সৃষ্টিতে চরিত্র চিত্রণের এই অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ ধারার সূচনা করে, যে ধারা অন্যান্য শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের থেকে তাঁকে খানিকটা স্বতন্ত্র্য আসনে বসিয়ে দেয়।

Keyword

শীর্ষেন্দু, অদ্ভুতুড়ে, শিশু, কিশোর, চরিত্র, ভূত, শিশু সাহিত্য, ডাকাত।

Discussion

শীর্ষেন্দুর 'অদ্ভুতুড়ে' কাহিনিগুলি অদ্ভুতুড়ে হয়ে ওঠার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান যদি কারও থাকে, তারা হল কাহিনির চরিত্ররা। এই ধারার কাহিনিগুলির সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী, সেগুলি সবই কিশোর চরিত্রদের চোখ দিয়ে দেখা। যে কিশোর চরিত্র অনেকটা লীলা মজুমদারের 'পদিপিসির বর্মীবাক্সের' কেন্দ্রীয় চরিত্রের মতো। যে কিশোর তুলনামূলকভাবে চৌকস, বুদ্ধিমান এবং হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন। কিন্তু তার আশেপাশের চরিত্ররা বয়সে প্রবীণ হলেও কার্যকলাপে, সংলাপে এবং অঘটন ঘটনে হাসির উদ্রেক করে চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন অসঙ্গতি থেকেই হাস্যরসের উদ্রেক ঘটে। শীর্ষেন্দু এই অসঙ্গতি সৃষ্টিতে কাহিনির থেকেও বেশি ভরসা রেখেছেন চরিত্রদের উপরেই। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা অতি সাধারণ কিন্তু অসাধারনত্ব তার প্রকাশে। শীর্ষেন্দুর গল্পে ছানি পরা চোখে চোর সিধু ঠিকঠাক দেখতে পায়না। আর হালিমের ডাকাতের দল ভয়ের উদ্রেক করে না বরং তাদের কাশির দমক পাঠক মনে হাসির দমক সৃষ্টি করে। তাঁর উপন্যাসের গোয়েন্দা চরিত্রকে কেউ মান্যতাও দেয়না, কিন্তু সে নিজেকে ব্যোমকেশ, ফেলুদার সমকক্ষ মনে করে। তাঁর কাহিনির পুলিশ চোরকে ভয় পায়, ভূত মানুষকে ভয় পায়, ডাকাত গৃহস্থকে ভয় পায়, সবজিওয়ালা ক্রেতাকে ভয় পায় – কিন্তু পাঠক কাওকে ভয় পায়না, বরং এই আচরণে তাদের হাসি পায়। এই কাহিনিগুলির উল্লেখ একটি নিছক উদাহরণ মাত্র। দীর্ঘ অদ্ভুতুড়ে সিরিজ এর প্রতিটি গল্প উপন্যাসেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই অদ্ভুত চরিত্রদের নির্মান করে চলেছেন। যা এক কথায় অভিনব, অনন্য এবং অননুকরণীয়।

ভূত নয়, অদ্ভুত। এ কথাটা বুঝলেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভূতের গল্প-কাহিনি-উপন্যাসের অর্ধেক ফর্মুলা বোঝা হয়ে যায়। তাঁর অদ্ভুতুড়ে সিরিজের সমস্ত বই তো গত প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে বেজায় জনপ্রিয়, সিনেমার পর্দাতেও জায়গা করে নিয়েছে কিছু, কিন্তু তার বাইরেও, ছোটো ছোটো, একক ও স্বাধীন যেসব ভূতের গল্প লিখেছেন বাঙালির এই প্রিয় লেখক, সেখানেও এ কথাটা সত্যি ভূত নয়, অদ্ভুত। পাবলো পিকাসোর নামে আরোপিত একটা বিখ্যাত কথা আছে, 'দি ওয়ার্ল্ড ডাজ নট মেক সেন্স, সো হোয়াই শুড আই পেইন্ট পিকচার্স দ্যাট ডু?' আন্দাজ করে নেওয়া যায়, ছবির আপাত-দুর্বোধ্যতার প্রশ্নে শিল্পীর এই উত্তর। শীর্ষেন্দুবাবু কখনও কোনো সাক্ষাৎকারে তাঁর লেখা ভূত ও ভূতের গল্প সম্পর্কে ঠিক এ কথাই বলেছেন কি না জানা নেই, তবে বলতেই পারতেন। চারপাশের যে জগৎটা আমাদের, সেটারই যখন কোনো মানে নেই, তখন তাঁর ভূত-চরিত্র আর তাদের কাণ্ডকারখানার মানে থাকতে যাবে কোন দুঃখে?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নিজের লেখনীর জোরে কথাসাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবাধ বিচরণ করে চলেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু সমসময়ের অন্যান্য সাহিত্যিকের তুলনায় শীর্ষেন্দুর স্বকীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। শিশু-কিশোরদের জন্য সৃষ্ট সাহিত্যে তিনি এমন এক অভিনব কল্পলোকের সূচনা করলেন, যা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় লক্ষ্যই করা যায়নি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু'অ্যাডভেঞ্চার ধারার রচনা, হেমন্দ্র কুমার রায়ের রচনাও তাইই, আবার সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'মিতিন মাসি' বা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল 'গোয়েন্দা'ধারার রচনা। 'ঘনাদা'বা 'টেনিদা'র মতো পূর্বসূরিরাও প্রধানত নির্মল হাস্যরসের যোগানদার। কিন্তু এমন ছোট্ট ছাতার তলায় আটকা পড়তে রাজি নয় শীর্ষেন্দুর সৃষ্টিরা। তাঁর সাহিত্যে ভূত, গোয়েন্দা, চোর, পুলিশ, বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান, বাস্তব, কল্পনা, হাসি, অ্যাডভেঞ্চার, স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক – সবকিছুর এমন নিবিড় সহাবস্থান, যে তাদের একে অপরের থেকে পৃথক করা একপ্রকার অসম্ভব। আর এদের ছাড়া শীর্ষেন্দুর কিশোর সাহিত্যের কথা কল্পনা করাও ঠিক ততটাই অসম্ভব। নিজের লেখনী দিয়ে তিনি এমন এক অদ্ভুতুড়ে কল্পলোকের সৃষ্টি করেন, যেখানে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যেতে হয় আট থেকে আশি সকলকেই। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ধারায় এই অদ্ভুতুড়ে সৃষ্টি তাই নিঃসন্দেহে এক নতুন ঘরানার জন্ম দিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, শীর্ষেন্দুর রচনার এই বিশেষত্ব তাঁর রচনা শৈলীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নাকি বুঝেশুনেই সৃষ্টি করা? এর উত্তর স্বয়ং শ্রষ্টাই দিয়েছেন। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র'-এর প্রথম খন্ডের ভূমিকা অংশে 'কিছু কথা'শীর্ষক অংশে তিনি লিখছেন, "মজা হল, আমি কাউকে ডেকে এনে খাতির করে বসাই না, তারা সব গন্ধে গন্ধে আপনি আসে। এই ভূতপ্রেত, বিটকেল আর খিটকেলে লোক, উজবুক আর ভবঘুরে, বোকা আর চালাক, নানা সাইজের দারোগাবাবু, এমনকী রাজাগজা অবধি এসে আমার লেখার পাতায় গ্যাঁট হয়ে বসে যায়। আর নিশুত রাতে তাদের সঙ্গেই আমার তুমুল আড্ডা জমে ওঠে। আমার যে বুড়ো মাষ্টারমশাই উবু হয়ে বসে ছেলেবেলায় আঁক কষাতেন তিনিও দেখছি হাজির হয়ে গেছেন। আর আকাশের অনেক তফাতে গ্রহান্তরের মানুষজনও সাঁ সাঁ করে নেমে পড়েন। আসেন কাপালিক, মাথা পাগলা লোক, পেটুক, হাড়কৃপণ, আনমনা ভুলো মনের মানুষ। চোর-ডাকাতের কথা তো বলাই হয়নি, আর চোরও কি একরকম? হরেক চোর, হরেক ঘটনা, ডাকাতদের সঙ্গেও আমার ভারী খাতির। খারাপ লোকেদেরও তো ফেলতে পারি না। তা তারাও কাঁচুমাচু মুখে এসে জুটে যায়। খেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধা, সাঁতারু, ক্রিকেট বা ফুটবলের মাঠ কাকে বা কোনটাকে বাদ দেওয়া যায় তাই তো ভেবে উঠতে পারলাম না আজও।"[১] এই অকপট স্বীকারোক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় শীর্ষেন্দুর মানসিকতা। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুরোধেই শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনায় হাতেখড়ি হয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। কিন্তু শুধুই পত্রিকার প্রয়োজনে বা নিছক অনুরোধ রক্ষার্থে যে তিনি বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য রচনা অগ্রসর হননি, তাও স্পষ্ট করেছেন লেখক। তিনি লিখছেন, "আগে আমি শুধু বড়দের জন্যই লিখতাম। গেরামভারী সব লেখা। তারপর তখনকার আনন্দমেলার সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এসে আমাকে ধরলেন ছোটদের জন্য একটা গল্প লিখে দে তো। শুনে ঘাবড়ে গেলাম। ছোটদের জন্য লেখা! পারব কি? তার কিছুদিন আগে আনন্দবাজারের পাতায় যে একপাতার আনন্দমেলা বেরোয় তার তখনকার সম্পাদক, আমার বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমাকে দিয়ে একটা একরত্তি গল্প লিখিয়ে নিয়েছিল, সেটা এক চোরের গল্প, নীরেনদার ফরমাশে এবার যে গল্পটা লিখে ফেললাম সেটার নাম "বিধু দারোগা", আর তার কিছুদিন পরেই ধারাবাহিকভাবে "মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি" উপন্যাস, তারপর পুজো সংখ্যায় "গোঁসাইবাগানের ভূত"। ওই সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে, প্রথমে একটু অনিয়মিত এবং পরে নিয়মিতভাবে প্রতি পুজো সংখ্যাতেই একটি করে উপন্যাস লিখে আসতে হয়েছে।"[২]

রচনার উদ্দেশ্য এবং আগ্রহের দিকটি না হয় প্রকাশিত হল, কিন্তু এর গোত্র নির্ণয়ের মুখে এসে সমস্যায় পড়তেই হবে। পূর্বেও একথা আলোচনা করা হয়েছে যে, সমকালীন শিশু-কিশোর সাহিত্যের চলতি কোনো নির্দিষ্ট ধারায় শীর্ষেন্দুর রচনা খাপ খায় না। ভূতের গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, হাসির গল্প, গোয়েন্দা গল্প, অ্যাডভেঞ্চার গল্প, রূপকথার গল্পের নির্দিষ্ট নকশায় শীর্ষেন্দুর এই সৃষ্টিদের আটকে রাখা অসম্ভব। এমনকি বিশ্ব সাহিত্যের নব নব ধারা যেমন, ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতা, অ্যাবসার্ড সাহিত্য ইত্যাদির ধারণাতেও শীর্ষেন্দু রচনারা কোনোভাবেই খাপ খায় না। তাহলে ঠিক কোন গোত্রে ফেলা যাবে শীর্ষেন্দুর এই অভিনব সৃষ্টিগুলিকে? এই ভাবনা থেকেই জন্ম নিল এক নতুন ধারা। যদিও জন্ম নিল বললে ভুল হবে বরং সৃষ্টি করা হলো এক নতুন ধারার, যার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যাবে শীর্ষেন্দুর শিশু কিশোর সাহিত্যের ঘরানাকে। আর সেই নামটিও নেওয়া হল তাঁর এমনই এক রচনা থেকেই। 'অদ্ভুতুড়ে'সিরিজ নামে চিহ্নিত করা হল এই গোত্রের রচনাগুলিকে। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র'-এর চতুর্থ খন্ডে 'অদ্ভুতুড়ে'নামেই

একটি রচনা রয়েছে শীর্ষেন্দুর, আবার তাঁর একেবারে প্রথম বড় কাহিনিটির নামই হল 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি' –এই দুই নামের যেকোনো একটি থেকেই এই নামের উৎপত্তি বলে ধারণা করা যেতে পারে। তবে এই নামকরণ যতখানি লেখকের তার থেকেও বেশি করে পাঠকের ও প্রকাশকের। যদিও এই নামকরনের পিছনে যে লেখকের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কারণ, ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে কাহিনিগুলির সংকলনের স্বার্থে যে 'কিছু কথা'অংশটি তিনি রচনা করছেন সেখানে নিজের কাহিনি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি নিজেই লিখছেন, "সব মিলিয়ে মিশিয়ে নানা অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার স্যাপার"[৩]। আবার এই সংকলন প্রকাশের আগেও আনন্দ পাবলিশার্স থেকেই পৃথক পৃথক ভাবে কাহিনিগুলি প্রকাশের সময়ও প্রকাশকের তরফে এই 'অদ্ভুতুড়ে'শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড', 'ভূতুড়ে ঘড়ি', 'পটাশগড়ের জঙ্গলে'র মতো বই গুলির ক্ষেত্রে প্রচ্ছদেই লেখা রয়েছে 'অদ্ভুতুড়ে সিরিজ'। তবে একেবারে শুরুর দিকের গ্রন্থের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন, 'বক্সার রতন'গ্রন্থটি যখন একক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়, সেখানে প্রচ্ছদে লেখা 'কিশোর কাহিনী সিরিজ'। ফলে মনে করা যেতেই পারে 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'কাহিনির নাম থেকে নয় বরং 'অদ্ভুতুড়ে'রচনাটির নাম থেকেই সিরিজটির এমন নামকরণের সম্ভাবনা বেশি। 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা'পত্রিকায় এই ঘরানার কাহিনির বিজ্ঞাপনে বা সারসংক্ষেপের ক্ষেত্রেও একাধিকবার 'অদ্ভুতুড়ে'নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সর্বত্রই এই নামটি ব্যবহৃত হয়নি। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত সংকলনের ক্ষেত্রেই 'অদ্ভুতুড়ে'নামের কোনও ব্যবহার নেই, বরং এই ৪টি খন্ডের সংকলন গ্রন্থটি 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র'নামেই পরিচিত। তাই মনে করা যেতেই পারে প্রকাশক এবং পাঠকের বদান্যতাতেই এই নামের এত বিপুল জনপ্রিয়তা।

এখন প্রশ্ন হল, এই সৃষ্টিরা অদ্ভুতুড়ে কেন? কোন চরিত্র বৈশিষ্ট্যে এরা অপরাপর শিশু-কিশোর সাহিত্যের থেকে আলাদা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা শীর্ষেন্দুর এই ধারার প্রথম বড় কাহিনি 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'র উপরেই নির্ভর করব। কারণ এই রচনা থেকেই যে তাঁর অভিনবত্বের সূত্রপাত, তা বলা যেতেই পারে। 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'প্রথমে 'আনন্দমেলা'পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এরপর ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কাহিনিটি শুরুই হচ্ছে সাসপেন্সের গন্ধ দিয়ে। লেখক লিখছেন – "ফোটোটা কী করে যে মনোজদের বাসায় এল, তা কেউ জানে না। ফোটোটা কার, তাও কেউ বলতে পারে না। মনোজদের বাড়িতে অনেকের ফোটোর মধ্যে এই ফোটোটাও বরাবর আছে। অথচ কেউ ঠিক করে বলতে পারে না যে, এটা কোত্থেকে কবে এসেছিল, ফোটোটার ছেলেটাই বা কে!"[৪] কিন্তু গল্পের শুরুর এই সাসপেন্স গোটা কাহিনিজুড়েই অন্তঃসলিলার মতো বয়ে গেলেও বহিরঙ্গে নানা রূপের চমক তৈরি হয়েছে বাকি কাহিনি জুড়ে। অদ্ভুত রকমসকমের শুরু ছবির বর্ণনার পর থেকেই। মাষ্টারমশাই দুঃখহরণবাবুর কথাই ধরা যাক – "উবু হয়ে না-বসলে দুঃখহরণবাবু পড়াতে পারেন না। যদি কেউ তাঁকে আসন-পিঁড়ি করে বসিয়ে দেয়, বা চেয়ারে ঝুলিয়ে বসতে বলে, তা হলেই দুঃখহরণবাবুর বড় বিপদ। তখন তিনি অঙ্ক ভুল করেন, ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোল গুলিয়ে ফেলেন, ইংরেজি ট্রানস্লেশন করতে হিমশিম খান। যেই উবু হয়ে বসলেন, অমনি তাঁর আঙুল দিয়ে পেনসিল বেয়ে হড়হড় করে অঙ্ক, ট্রানস্লেশন, জ্যামিতি সব নেমে আসতে থাকে, মুখে খই ফোটে ইতিহাস আর ভূগোলের।"[৫] নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিতে এই অদ্ভুত চরিত্রদেরই গুরুত্ব দেন শীর্ষেন্দু। তাদের অদ্ভুত কর্মকাণ্ড শীর্ষেন্দুর লেখনীর গুনে ছবির মতো ধরা দেয় পাঠকের হৃদয়ে। শুধু দুঃখহরণবাবুই নন, এরপরেও একের পর অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে চলে গানের মাষ্টার গনেশবাবু, বিধবা পিসি, চাকর রামখিলাওন, ঠাকুমা বামাসুন্দরী সহ অন্যান্যরা। তাহলে কি 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'সাসপেন্সের গল্প নয় বরং নির্মল হাস্যরসের কাহিনি? কিন্তু সেটাই বা বলা যায় কী করে। কারণ এর পরেই কাহিনিতে অনুপ্রবেশ ঘটে পুরুত মশাই সতীশ ভরদ্বাজের, যিনি কিনা আবার ভূত পোষেন। লেখকের ভাষায় – "সতীশ ভরদ্বাজ বড় খাইয়ে মানুষ।...এ বয়সেও জোয়ানমদ্দরা মাছ বা রসগোল্লার কম্পিটিশনে তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। পাতে পড়তে-না-পড়তে তুলে ফেলেন। লোকে বলে তাঁর নাকি দুটো পোষা ভূত আছে, খাওয়ার সময় আবডাল থেকে তারাই সব তুলে খেয়ে ফেলে।... সতীশ ভরদ্বাজ যে ভূত পোষেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রায় সময়েই দেখা যায়, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ তিনি 'উঁ'বলে যেন কার নিঃশব্দ ডাকে সাড়া দেন, ঘাড় ঘুরিয়ে হঠাৎ যেন কার সঙ্গে ফিসফিস করে খানিক কথা বলে নেন, আবার কখনও হঠাৎ রাস্তাঘাটে চেঁচিয়ে 'হাঁদু', 'ভুঁদু'বলে কাদের ডাকাডাকি করেন। এইসব কারণে সবাই তাঁকে খানিকটা ভয় পায়।"[৬] এখনও কাহিনিতে গোয়েন্দা আর ডাকাতের প্রবেশ বাকি আছে। এই গোয়েন্দাও আবার বাংলা সাহিত্যের পরিচিত গোয়েন্দাদের গোত্রভুক্ত নন। গোটা কাহিনিজুড়ে বিভিন্ন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা করে চলে গোয়েন্দা বরদাচরণ। শুধু 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'তেই নয়, এই ধারার পরবর্তী একাধিক রচনাতেও ফিরে ফিরে এসেছে গোয়েন্দা বরদাচরণ চরিত্রটি। পাঠকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়েই বরদাচরণের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক –

"সাধারণত গোয়েন্দা বরদাচরণ কখনও সদরদরজা দিয়ে ঢোকেন না। তাতে নাকি গোয়েন্দার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়, লোকে গোয়েন্দা বলে খাতির করে না। গোয়েন্দাদের আচার-আচরণে একটা রহস্যময়তা না থাকলে লোকে সেই গোয়েন্দাকে মানবেই বা কেন? গোয়েন্দারা কখনও সহজ পথে চলবেন না, সহজ পথে ভাববেন না, সহজ চোখে চাইবেন না। সব সময়ে এমন আচরণ করবেন যাতে লোকে চমকে, আঁতকে, ভয় খেয়ে বা ভিরমি খেয়ে যায়। তাই গোয়েন্দা বরদাচরণ বেশির ভাগ বাড়িতেই দেয়াল টপকে, জানালার শিক বেঁকিয়ে ঢোকেন। শোনা যায়, এক বাড়িতে নাকি সিঁধ কেটেও ঢুকেছিলেন।"[৭] আলোচনা আর দীর্ঘ না করেও বলতেই হয় যে, গোয়েন্দা বরদাচরণের সহকারী তথা ভাগ্নে চাক্কু, ডকাতের দল, মনোজের মেজ কাকা ভজহরিবাবু এবং হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দনারায়ণ পর্যন্ত কাহিনিজুড়ে এমন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে যেতেই থাকেন।

উদাহরণ তো অনেক দেওয়া গেল, কিন্তু একটা প্রশ্ন এখনও থেকেই যায়, তা হল আমাদের পরিচিত চরিত্রদের এমন অদ্ভুতভাবে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাটা কী ছিল? এই ধরণের সৃষ্টি কি শুধুই অসঙ্গতি জনিত হাস্যরস সৃষ্টির তাগিদে? নাকি পৃথক একটি ধারা সৃষ্টির ভাবনা থেকেই এই পরিকল্পনা? নাকি সুপরিকল্পিতভাবে এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে কোনও বার্তা দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে লেখকের? লেখক নিজে কোথাও স্পষ্ট করে এর উত্তর না দিলেও পাঠক হিসাবে এর কিছু উত্তর কল্পনা করা যেতেই পারে। সাধারণ পাঠকের পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেওয়ার একটা অভিপ্রায় হয়তো এই রচনাগুলির মধ্যে সুপ্ত আছে। চোর, পুলিশ, ডাকাত, রাজা, ভূত এই শব্দগুলির সঙ্গে যে চিত্রকল্পগুলি আমাদের মনে আগে থেকেই বাসা বেঁধে আছে, সেই গতানুগতিকতায় ভেসে না গিয়ে একটি পৃথক চিত্রকল্পের সার্থক নির্মাণের মধ্যে যে ভিন্নতর অভিঘাত রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। ভূত যখন রাম নাম শুনে পালায় না, বরং তারই নাম হয় নিধিরাম (গোঁসাইবাগানের ভূত) কিংবা দুঁদে দারোগা যখন সামনে পিস্তল দেখলে ভয় পেয়ে যায় (মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি) কিংবা পরিচিত গোয়েন্দাকে যখন মাচার লাউ, গাছের নারকেল বা ঘরের পোষা গরু হারিয়ে যাওয়ার তদন্তের বরাত দেওয়া হয় (মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি) তখন পূর্বাপর সাহিত্যের ভূত, পুলিশ বা গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে তাদের মেলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর এই অসম্ভব সৃষ্টিই শীর্ষেন্দুকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে। শীর্ষেন্দুর সৃষ্টিরা হয়তো স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু তার মধ্যে এই পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের এই চেষ্টা পরিকল্পিত বলেই বোধ হয়। লেখক নিজেই 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র'প্রথম খণ্ডের 'কিছু কথা'অংশে বলেছেন – "দুনিয়ার সব মানুষকে বন্ধু করে নেওয়া একটু শক্ত বটে, কিন্তু বইয়ের ভিতরকার মানুষগুলোর সঙ্গে ভাব হতে দেরি হয় না, যদি তাদের পছন্দ হয়। এমনকী ভূতেদেরও। এর অনেকগুলো উপন্যাসেই কয়েকজন ভূত আছে। তাদের ভয় পাওয়াটাই শক্ত, কিন্তু আমি নিজে যেসব ভূতের পাল্লায় পড়েছি তারা তত সুবিধের ভূত নয়, বন্ধু তো নয়ই।"[৮] বোঝা যায়, নিজের পরিপার্শ্ব সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার উপর তো তিনি জোর দিয়েইছেন, কিন্তু একইসঙ্গে বিশ্বাস রেখেছেন নিজের কল্পনার প্রতি। সেই বিশ্বাসই জন্ম দিয়েছে এই চরিত্রদের, যারা সবার থেকে আলাদা, যাদের অবস্থান আমাদের ভাবনা বৃত্তের বাইরে। সেই বিশ্বাসই জন্ম দিয়েছে এই সৃষ্টিগুলির, যারা কখনও মজার, কখনও ভৌতিক, কখনও কল্পবিজ্ঞানাশ্রয়ী, কখনও গোয়েন্দাধর্মী আর সার্বিকভাবে এই সবকিছুর মিশেল। এই সৃষ্টি বাংলা সাহিত্য আগে দেখেনি, এই রচনা বাঙালি পাঠক আগে পড়েনি, তাই তো সব পরিচিত ধারার বাইরে বেড়িয়ে শীর্ষেন্দুর রচনাকে বুঝতে তৈরি করতে হল এক নতুন ধারা, যাকে লেখকও চিহ্নিত করেছেন 'অদ্ভুতুড়ে' নামেই। এক নতুন রূপে শীর্ষেন্দুকে খুঁজে পেল বাঙালি পাঠক আর বাংলা সাহিত্য খুঁজে পেল শিশু-কিশোর সাহিত্যের এক নতুন আঙ্গিক।

উল্লেখপঞ্জি :

কিশোর উপন্যাস সমগ্র ১, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, কিছু কথা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৩।

তদেব।

তদেব।

মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কিশোর উপন্যাস সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩।

তদেব, পৃষ্ঠা- ৪-৫।

তদেব, পৃষ্ঠা- ৮।
তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫।
কিশোর উপন্যাস সমগ্র ১, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, কিছু কথা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। কলকাতা: ডি.এম. লাইব্রেরী। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
ঘো, অজিতকুমার। বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৯।
চক্রবর্তী, পুণ্যলতা। ছেলেবেলার দিনগুলি। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭।
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। লোকসাহিত্য। রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রবন্ধ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯০৭।
দেব, চিত্রা। বাংলা শিশুসাহিত্য। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৯৮১।
রায়, হীরেন্দ্রনাথ। শিশুতীর্ণ। প্রবন্ধ সংকলন। কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং। আগস্ট ১৯৮৮।

....

শ্যামল সিংহের কাব্যগ্রন্থ ‘চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা’ : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. সুবীর বসাক
সহকারী অধ্যাপক
অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
অমরপুর, গোমতী, ত্রিপুরা।

সারসংক্ষেপ :

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে শ্যামল সিংহ একটি উজ্জ্বল কবিপ্রতিভা। ‘চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা’, ‘সূর্যাস্ত আঁকা নিষেধ’ এবং ‘জেগে উঠেছেন বাঘাযতীন’ – মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা তিনি। সংহত কবিতাচর্চার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা কবিতায় একটি নতুন পথের সম্ভাবনা খুলে দিয়েছেন। তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত কবিতাগুলি আসলে একেকটি কোড। কবিতায় ব্যবহৃত ভাষা-চিহ্নগুলির পারস্পারিক বিন্যাস ও বৈপরীত্যে একেকটি কবিতা একেকভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। দ্যোতিতের মনন, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে তার ভিন্নভিন্ন প্রতিক্রিয়া। কাব্যগ্রন্থটির কিছু কবিতায় ধরা আছে ভোগবাদে নিমজ্জিত মানবসভ্যতার ভয়াবহ পরিণতির কথা। সামাজিক অভিঘাত, যেমন- দেশভাগ, নকশাল আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক জাগরণ, উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন কয়েকটি কবিতার মূল বিষয়। পণ্যসর্বস্ব দুনিয়ায় প্রেমের স্বরূপটিকেও তুলে ধরেছেন বেশ কিছু কবিতায়। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে ‘চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা’ কাব্যের কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাব্যটির অন্তর্নিহিত সুরটিকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বীজ শব্দ :

সংহত কবিতা, কবিতা ও কোড, ভাষা-চিহ্নের বিন্যাস, পুঁজিবাদী বিশ্ব, ভোগবাদ ও মানব সভ্যতা, সামাজিক অভিঘাত, পণ্যসভ্যতা ও প্রেম

মূল নিবন্ধ :

বাংলা কবিতার ইতিহাসে শ্যামল সিংহ (১৯৪৯-২০০৩) এক অবিস্মরণীয় কবি প্রতিভার নাম। সাহিত্যের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন কিছু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছে বহুদূর আলোকবর্ষ থেকেও যাঁদের উজ্জ্বলতা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করা যায়। শ্যামল সিংহ তেমনই একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত ‘পাগলাঘোড়া’ (সম্পা. বিজয় দে) ও ‘ক্রুসেডে’র (সম্পা. সমর রায়চৌধুরী) হাত ধরে বাংলা কবিতার জগতে তাঁর পদার্পণ। আটের দশকের এই কবির জন্ম জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়িতে। ফণীন্দ্রদেব ও দেশবন্ধু নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল শিক্ষা এবং আনন্দচন্দ্র কলেজ অব কমার্স থেকে স্নাতক। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো— ‘চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা’ (১৯৯১), ‘সূর্যাস্ত আঁকা নিষেধ’ (২০০১), ‘জেগে উঠছেন বাঘাযতীন’ (২০০৩)। ২০১৪-তে ‘এখন বাংলা কবিতা’র পক্ষ থেকে প্রবীর রায় ও অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শ্যামল সিংহের গ্রন্থবদ্ধ ও অগ্রন্থিত কবিতাগুলি ‘নির্বাচিত শ্যামল সিংহ’ নামে প্রকাশিত হয়। শ্যামল সিংহের কবিতা সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে প্রকাশক লিখেছেন— “তিনি ছিলেন সেই বিরলতম কবিদের একজন যারা কবিতার ধারা বদল করেন একক প্রয়াসে। ...কবিতার মধ্যে অনন্য রূপকল্প, চিত্রকল্প ব্যবহারে তাঁর মুন্সীয়ানা কিংবা সুররিয়ালিজমের সার্থক প্রয়োগ এরকম কোনও গতানুগতিক আলোচনায় শ্যামলের কবিতাকে আটকে রাখা যাবে না। কেননা তিনি লিখেছেন আগামী প্রজন্মের জন্য।”[১]

বিগত শতাব্দীর সাতের দশক ছিল নানা অর্থেই ঝোড়ো দশক। স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফিতি, খাদ্যহীনতা, বেকারত্ব, বামপন্থী দলগুলি পরিচালিত বিভিন্ন গণ-আন্দোলন, বারেবারে প্রসাশনিক ক্ষমতার হস্তান্তর, জরুরী অবস্থা, কৃষক-শ্রমিক জাগরণ, বামফ্রন্ট সরকার গঠন দ্রুত ঘটে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনার অভিঘাত রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সঞ্চার করেছিল। এমতাবস্থায় সাতের দশকের কবিরা কবিতায় শিল্পকুশলতার পরিবর্তে স্মার্ট সাংবাদিকতাকেই আধেয় করলেন। সর্বোপরি কবিতাকে নিপীড়িত জনগণের আয়ুধ হিসাবে ব্যবহার করলেন সাতের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করবার অভীপ্সায়। উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে সমীর চক্রবর্তী, বিমল ভট্টাচার্য, তুহিন দাস, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, নীরদ রায় প্রমুখদের কথা এপ্রসঙ্গে মনে পরে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার দোহাই দিয়ে হাংরি সাহিত্য, নিম সাহিত্য, কংক্রিট সাহিত্য, না-সাহিত্য, বিরক্তিকর সাহিত্যে তখন ভরে

উঠেছিল বাংলা কবিতার ভুবন। এরই মাঝে আবেগতরল, বিবৃতিধর্মী, কিছু তাত্ত্বিক মালমশলা এবং সমসাময়িক জ্বলন্ত সামাজিক উপকরণগুলিকে ব্যবহার করে কেউ কেউ যখন প্রায় অমৃত কলসের ঢাকনা খুলে ফেলছিলেন তখনই নিঃশব্দে রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ শ্যামল সিংহের। কোনরকম প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সোচ্চার চিৎকার নয়, কবিতা আন্দোলনের দলগত ইশতেহার নয়, তিনি চেয়েছেন একক নিভৃত সাধনা—

"কবিতাগুচ্ছের কুয়াশা থেকে বরাবর আমি দূরে আছি
আমি বুঝি, একক কবিতার পায়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত"[২]

শ্যামল সিংহের কবিতার আলোচনায় প্রবেশের আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যে শ্যামল সিংহ প্রথাগত ফর্মের কবিতা লেখেননি। অনেকটা জাপানী হাইকু কবিতার মতো তাঁর কবিতার আয়তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চার থেকে দশ চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে যে উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি প্রত্যেকটিই একেকটি সম্পূর্ণ কবিতা। আমাদের প্রথাগত কাব্য পাঠের ধারণায় তাঁর কবিতার মর্মার্থ অনুধাবন কষ্টকর হয়। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর কবিতায় চমক-গমক-মীড় কিছুই চোখে পরে না। মনে হয় যেন কোনো তৃতীয় শ্রেণির কবিতা। কিন্তু একবার এর বহিরাভরণকে উন্মুক্ত করতে পারলে মেলে পরিপূর্ণতার স্বাদ। দিনানুদিনের ভাষা এবং উপকরণের মধ্যে যে কত সংকেত এবং চেতনার গূঢ় রহস্যময়তা লুকিয়ে রয়েছে— তাকেই তুলে ধরেন কবিতায়। কবিতার জন্য দারুচিনি দ্বীপের নির্জন বনানী বা লীলা কমলের মনোজাগতিক সৌন্দর্যের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু চেতনার বিস্ফোরাত্মক সংকেত— শ্যামল সিংহ তা বুঝিয়ে দিলেন। আমরা তাঁর 'চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা' কাব্যগ্রন্থটির আলোচনায় সেকথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবো।

শ্যামল সিংহের 'চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে। এর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৮২-১৯৯০। কাব্যটির একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ভোগবাদে নিমজ্জিত মানব সভ্যতার বিবমিষা প্রান্তরের ছবি। জন্মের পর থেকেই একজন মানবশিশু কীভাবে ধীরে ধীরে ভোগবাদের দুনিয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পরে এবং ফলস্বরূপ কীভাবে প্রকৃতির হন্তারক হয়ে ওঠে 'চড়ইভাতি' কবিতায় সেই চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

"ঘোড়ার পিঠে দুলছে সবুজ বন
আকাশের তারা টিপে টিপে কে নেমে আসছে
হাঁস বলছে শুধু গল্পের কথা
মুরগী বলছে যুদ্ধের কথা
চাঁদ ফাক করে আমরা দেখছি
চড়ইভাতি আর কত দূর।"[৩]

'ঘোড়ার পিঠে দুলছে সবুজ বন' অর্থাৎ যৌবনের উদ্দামতায় দেখা জীবনের স্থিতিহীন স্বপ্নগুলির কথা বলা হয়েছে। আকাশের তারাদের যদি লক্ষ্যবস্তু মনে করা হয়, তবে ধীরে ধীরে যৌবনের স্বপ্নগুলিও কমবেশি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচলিত সাম্য ও পুঁজিবাদী বিশ্বের ধারণা 'হাঁস' ও 'মুরগী'র রূপকে প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে সাম্যবাদী বিশ্বের ধারণা নিছক আখ্যানকথায় পর্যবসিত হয়েছে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বের রাজছত্র উত্থিত হয়েছে যুদ্ধের লেলিহানতার মধ্য দিয়েই। এমতাবস্থায় মানুষের প্রকৃতিপ্রেম, তার সৌন্দর্যচিন্তা সবকিছু আসলে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ভোগের দিকেই যাত্রা।

আটের দশকের দিনগুলিতে দাঁড়িয়ে শ্যামল সিংহ দেখেছেন বিশ্বব্যাপী পুঁজি শক্তির দাপট। পণ্যসর্বস্ব বাজারী আধুনিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, প্রচারসর্বস্ব মানসিকতা ও ভোগবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সমাজের ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে উঠেছে পরবর্তী কবিতা 'তুরপুন'-এ। কবি লিখেছেন—

"মুখোশ ছুঁয়ে সূর্য ওঠে
মুখোশ ছুঁয়ে অস্ত যায়
সুতো ছিঁড়ে আমি ময়ূর হত্যা করেছি
পুতুল খেলছে, খেলছে বুদ্‌বুদ্
ফ্যান টপকে ফ্যান

ফ্যান টপকে ফ্যান

মোরগের ঝুঁটি ভেদ করে তুরপুন ঘুরছে”[৪]

বর্তমান সমাজের প্রকৃত রূপটিকে তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা মুখোশ নামক একটি অদৃশ্য পোশাক পরিধান করছি। কিন্তু এরপর কবি যখন বলেন, ‘সুতো ছিঁড়ে আমি ময়ূর হত্য করেছি’ তখন আমাদের উপলব্ধির ক্ষেত্র একটু পেছন ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরায় আজকের এই অবক্ষয়িত দিনের জন্ম হয়নি। আমাদের সংস্কৃতিতে বারে বারে অধঃপতন এসেছে কিন্তু সে অধঃপতন কখনোই মানুষে মানুষে সর্বাত্মক বিচ্ছেদ তৈরি করেনি। যখন থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি তার স্বীয় ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গলাধঃকরণ করতে চেয়েছে তখন থেকেই মানুষে মানুষে বিচ্ছেদের ব্যবধান তীব্রতর হয়েছে। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই মুখ ও মুখোশের বিরামহীন ভণ্ডামি। ক্ষণস্থায়ী জীবনে এই ভণ্ডামির খেলা যেন পুতুল খেলার সামিল। যেখানে একই ম্যাচ পুনঃপুন সংঘটিত হয়ে চলেছে— শুধু ভাতের জন্য দৌড়, শুধু দিন যাপনের গ্লানি। ফলে উদারতা, মহত্ব ও সৃজনশীলতার যে রাজতিলক ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে বহন করেছে তাতে ছেদ দেখা দিয়েছে।

সর্বব্যাপী ভোগবাদের হুল্লোড় কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। রাষ্ট্রশক্তিই তার জয়যাত্রাকে সুনিশ্চিত করেছে। রাষ্ট্র কীভাবে সমাজ পরিকাঠামোয় তাকে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত করছে তার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে ‘কুয়াশা’ কবিতাটিতে—

“কুয়াশার আগে নদীর জলে পা দিয়ে
মিলিটারি আঁকছে যুদ্ধ জাহাজ; অস্ত্রশস্ত্র
পাতায় পাতায় কাঁপছে মাঝির ছায়া
নদীতে নৌকা ডুবে গেছে
কুয়াশার পরে হাসের বিয়ে মুরগির বিয়ে
তারপর ডিম ফেটে জ্যোৎস্না
তারপর ডিম ফেটে জ্যোৎস্না
তারপর জ্যোৎস্নায় উড়ছে পতাকা”[৫]

এখানে কবি যা বলতে চেয়েছেন তার অর্থ হলো— দেশব্যাপী যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই দেশকে সাজানো হচ্ছে যুদ্ধের উপকরণে। অর্থাৎ একধরণের ছায়াযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অথচ দেশের অগ্রগতি ক্রমাগত নিম্নমুখী। মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার মতো মৌলিক সমস্যাগুলির কোনো নিশ্চিতকরণ নেই। অন্যদিকে কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলা ছায়াযুদ্ধের পরিবেশ কেটে গেলে দেখা যায় ভোগবাদের হুল্লোড়— ‘হাঁসের বিয়ে’, ‘মুরগির বিয়ে’ এবং সেইসাথে রাষ্ট্রশক্তির জয়জয়কার। দেশপ্রেমের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে শাসকের পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা আজ বিশ্ব রাজনীতির এক বহুচর্চিত কৌশল। রাজনৈতিক কূটাভাসের এই অধঃপতনকেই নির্দেশ করেছেন শ্যামল সিংহ।

শ্যামল সিংহের ‘চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা’ কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় ভোগবাদে নিমজ্জিত মানবের অসহায়তা ও আর্তনাদের পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক অভিঘাতের কথাও ধরা পড়েছে। এবারে সমাজ সমস্যামূলক কয়েকটি কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। গণপ্রজাতান্ত্রিক ভারতের রাষ্ট্র কাঠামোটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সংসদীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সেই সংসদীয় ব্যবস্থার ভেতরেও যে কত কূটাভাস রয়ে গেছে তা নজর এড়িয়ে যায়নি কবির। ভোটসর্বস্ব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি বিদ্রুপ করে তিনি লিখেছিলেন ‘আলোচনা’ কবিতাটি। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

“সেতুর কাছে আমি রেখেছি পাটিগণিতের প্রস্তাব
পলাশের জটিলতায় খাচ্ছি রাস্তার ভুলভাল
দুধের কাছ থেকে মাইল মাইল দূরে আছি
পেরেক নিয়ে তো তেমন আলোচনা হলো না কোনদিন”[৬]

‘সেতু’ এই কবিতায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তিনি রাষ্ট্র ও ভোটারের সংযোগের চিহ্ন স্বরূপ। ‘পলাশের জটিলতা’ অর্থাৎ রঙবেরংয়ের বহুদলীয় ব্যবস্থাকে বোঝাচ্ছে। বহুদলীয় ভোটসর্বস্ব গণতান্ত্রিক জটিলতায় প্রকৃত উন্নয়ন মাঠেই মারা পড়ছে। ‘পেরেক’ এখানে সেই

লৌহখণ্ড যা রাষ্ট্র এবং জনগণের সম্পর্ককে দৃঢ়তায় আবদ্ধ করে— সেই সম্পর্ক নিয়ে আমাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনদিন আলোচনাই হয়নি।

'আত্মকথা' কবিতাটিতে দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু ও ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাসের দিকে আমরা ফিরে তাকাই আর না তাকাই ইতিহাস আমাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে রয়েছে। কোনো সময়েরই মননশীল কবিসত্ত্বা তাকে অস্বীকার করতে পারে না। আটের দশকের কবি শ্যামল সিংহ যদিও সেই অবস্থান থেকে বেশ কিছুটা দূরে তথাপি সেই দহনকালীন দিনগুলিকে তিনি ভুলতে পারেননি। তাই লিখেছেন—

"কোথাও গোপনে বরফ পড়ছে
শাড়িতে নাচছে হাড়
হাহাকারে ভেঙে যাচ্ছে সব ফিডিং-বোতল
যারা ছিল তারা চলে গেছে রান্না ঘরে
লণ্ঠনের উপুর-করা আলোয় বসে
আমরা শুনছি ঘাসের জন্ম ও মৃত্যুর কথা"[৭]

কবি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই বলেছেন কোথাও গোপনে শলা-পরামর্শ সাধিত হচ্ছে। অথচ দেশ জুড়ে নিরন্ন মানুষের হাহাকার। দেশ ও রাজ্যের সর্বত্রই কঙ্কালসার নরনারীর চিত্র। শিশুরাও অভুক্ত। যাদের যৎসামান্য কিছু রয়েছে তারা খেয়েপরে বেঁচে থাকছেন। কবি সেই দহনকালীন সময়ের থেকে কিছুটা দূরে থাকায় সেদিনের মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর আখ্যান নানাভাবে শুনে এসেছেন।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিদ্রুপ করে শ্যামল সিংহ লিখেছেন 'রক্ত' কবিতাটি—

"ব্ল্যাকবোর্ড থেকে উড়ে গেছে পাখি
আমরা জুতো ছুঁড়ছি স্বর্গের দিকে
শূয়োরের সমীকরণে না গিয়ে
আমরা অনুবাদ করছি দেবতা
ডিমের ভেতর ঘুমিয়ে আছেন সন্ন্যাসী
মাফলার খুললেই ব্লটিং পেপার
ব্লটিং পেপারে বাসি রক্ত"[৮]

'ব্ল্যাকবোর্ড' আমাদের বর্তমান শিক্ষাগৃহগুলোকে বোঝাচ্ছে। আমাদের শিক্ষাগৃহ কখনোই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা দেয়নি। আমাদের শিক্ষায় পাখিও নেই, মুক্তিও নেই। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে জুতো ছোঁড়ার মতন আমরা নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। সমকালীন সমাজের এই অবস্থাকে কবি জীবনানন্দ দাশের মতন সহজ সমীকরণে মেনে নিতে রাজি নন। মনে রাখতে হবে যে, জীবনানন্দ দাশ 'অন্ধকার' কবিতায় বিশ্বব্যাপী মানব সভ্যতার নৈতিক অধঃপতনকে শুয়োরের চিত্রকল্পে ধরেছিলেন। কিন্তু শ্যামল সিংহ মানুষের ভণ্ডামিগুলিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চান। তিনি দেখিয়েছেন আমরা সত্য নয়, সত্যের অনুবাদ করছি মাত্র। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই লুকিয়ে রয়েছে মুখোশধারী একেকটি সন্ন্যাসীর রূপ। কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত মুখের আভরণ খুলে ফেললেই রেরিয়ে আসছে প্রকৃত শোষকের চেহারা— 'ব্লটিং পেপার'।

উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়নের পশ্চাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটিতে। কবিতাটির পরিসর উত্তরবঙ্গের বন-পাহাড়কে ধরলে এর একটি সুন্দর ভাষ্য তৈরি সম্ভব। কবি লিখেছেন—

"গায়ে গায়ে শীত নিয়ে রেখে এসেছি পাহাড়ে
কথার ভিতর উঁকি দিচ্ছে বন
ঘোড়ার তলায় ঘুমিয়ে পড়ছে রাত
সূর্যের সাথে উঠে আসছে সেলুন
শিশুটি ওড়াচ্ছে বেলুন"[৯]

উত্তরবঙ্গের বন-পাহাড়ের অনুন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ব্যবস্থাকেই দায়ি করেছেন। ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাহারি ভাষণের পশ্চাতে লুকিয়ে রয়েছে অরণ্যের জটিলতা। ফলস্বরূপ তাদের যাবতীয় উদ্যোম কখনোই সফলতায় পর্যবসিত হয়নি। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের অবস্থা রয়ে গেছে সেই তিমিরেই। দিনের আলোয় দৃষ্টি গোচর হওয়া 'সেলুন'— সেই দরিদ্রতাকেই মনে করাচ্ছে। দীর্ঘকালব্যাপী অনুন্নয়ন ও বঞ্চনার ফলে উত্তরবঙ্গে যে স্তব্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কবি তাকে 'বেলুন'-এর চিত্রকল্পে নির্মাণ করেছেন। 'বেলুন' আপাত শান্ত এবং মনোহারী কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে ফেটে গিয়ে নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিতে পারে।

শ্যামল সিংহের 'চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা' কাব্যের যে কয়েকটি কবিতায় সমাজ-রাজনীতির অভিঘাত ধরা আছে 'পতাকা' তার মধ্যে অন্যতম। কবিতাটিকে নকশাল আন্দোলনের কবিতা বলেও ধরা যায়। কবিতাটি উদ্ধৃত করা হলো—

"ফুল ছিঁড়ে আমি রক্ত পান করছি
লাল মোজার ভেতরে কাঁপছে আততায়ী
করোটি ঘেঁটে ঘেঁটে চিনেছি
ধারাপাতে নিহত জ্যোৎস্না
দৃষ্টিপাতে আমি রেখেছি ডাকটিকিট
পা থেকে সোজা উঠে গেছে পতাকা"[১০]

কবিতায় ব্যবহৃত সংকেতগুলি পাঠক চেতনাকে নকশাল আন্দোলনের কথা মনে করায়। কীভাবে সরকার কর্তৃক নকশাল আন্দোলন দমন করা হয়েছিল, কীভাবে অসংখ্য নকশাল আন্দোলনকারীকে হত্যা করা হয়েছিল— এই কবিতার সেরকম একটি ভাষ্য তৈরি করা যায়। কবিতাটির প্রথম চরণে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় চরণে বোঝানো হয়েছে কমিউনিস্ট ভাবধারার মধ্যেই তাদের লুকিয়ে থাকার কথা। তৃতীয় চরণটি ব্যাঙ্গার্থে, যেন জন্মপঞ্জী ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজে বের করা হয়েছে তাদের। চতুর্থ চরণে গুণিতকহারে তাদের হত্যালীলার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম চরণের অর্থ, শাসকের চোখেই তাদের ঠিকানা লেখা ছিল অর্থাৎ আগে থেকেই চিহ্নিত করা। এইভাবে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে একেবারে শেষ চরণটিতে।

'কম্পাসের ছায়া' কবিতাটিতে বামপন্থী দলগুলি কর্তৃক সংগঠিত গণ-আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গে বারেবারে খাদ্য সংকট ঘণীভূত হয়েছিল। বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের আগমণে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কালোবাজারী, সরকারী নিয়ন্ত্রণহীনতা, মুদ্রাস্ফিতি ইত্যাদি কারণে পশ্চিমবঙ্গে বারে বারে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এর বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলি গণ-আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। সেই গণ-আন্দোলনেরই একটি চিত্র এই কবিতাটি। কবিতাটি উদ্ধৃত করা হলো—

"জবার আমূল লাথিতে
ছিট্‌কে গেছে ধানের গোলা
ভেসে যাচ্ছে শাড়ি
ভেসে যাচ্ছে রেলগাড়ি
আমার হাতে ও পায়ে ছম্‌ছমে পুকুর
নাভিতে কম্পাসের ছায়া
ছোট ছোট ভুল, ছোট ছোট সাপ
পৃথিবীর সব নার্স ছুটিতে গেছে
তুলোও আজ ধর্মান্তরিত"[১১]

আন্দোলনকারীদের দ্বারা লুট হয়েছে জমিদারের ধানের গোলা। নারী-পুরুষ তথা শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত প্রতিরোধ। সমাজের চারপাশে তখন গা-ছম্‌ছমে ভাব। 'নাভিতে কম্পাসের ছায়া' অর্থাৎ ক্ষুধাই দিক নির্ণয় করে দিচ্ছে এইসব আন্দোলনের। আন্দোলনের বিশাল ঢেউ-এ ছোটছোট ভুল-ভ্রান্তিও ঘটছে। এমতাবস্থায় সমাজে কোথাও শান্তি বা শুশ্রূষা নেই, নেই তুলার কোমল পেলবতাও।

সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছে 'মুখোশ' কবিতাটি। কবি লিখেছেন—

"মুখোশ পরে নখের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে শয়তান
টুপটুপ করে রক্ত পড়ছে
খোঁড়া বেলুন-অলা বাঁশি বাজাতে বাজাতে
শিশুর বেলুনের ভেতরে ঢুকে পড়ছে
শিশু হাসছে
চাঁদ উঠছে"[১২]

'নখ' বললেই হিংস্রতার কথা মনে পড়ে যায়। সেই হিংস্রতাকে আড়াল করে মুখোশ পরে তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শয়তান। ফলস্বরূপ সমাজের রক্তক্ষরণ অব্যাহত। 'শয়তান' এখানে খোঁড়া বেলুন-অলা। তিনি আদতে রাষ্ট্রনেতা। যিনি স্বপ্নের কারিগর। রাষ্ট্র নির্মাণের ভার যার হাতে অর্পিত। কিন্তু সেই স্বপ্নের কারিগর হলেন খোঁড়া। অর্থাৎ তিনি কাজ না করে শুধুই স্বপ্ন বিলি করছেন। শিশুসুলভ জনগণও সেই স্বপ্নের ঘোরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। এইভাবে রাষ্ট্রনেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ধরা পড়েছে কবিতাটিতে। এই কবিতাটির প্রাসঙ্গিকতাতেই কাব্যগ্রন্থের শিরোনামটিও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এসবের পাশাপাশি কয়েকটি কবিতার প্রেমের কথাও ফুটে উঠেছে। তবে শ্যামল সিংহের কবিতার প্রেমে মিলন অপেক্ষা বিরহই প্রাধান্য পেয়েছে। আসলে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কবি দেখেছেন ভোগবাদে নিমজ্জিত আত্মকেন্দ্রিক মানুষের চরম রূপ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কেবল আত্মকেন্দ্রিকতার চিহ্নই বহন করে চলেছে, তার হৃদয়ের সুকোমল অনুভূতিগুলির নিঃস্বার্থ বিকাশ সম্ভব নয়। তাই তাঁর কবিতায় প্রেমের চাইতে বিরহেরই প্রাধান্য। এই কাব্যের 'ভাঙা' কবিতাটি একটি দাম্পত্য প্রেম বিষয়ক। কবি বলেছেন—

"যে কোনো কথাবার্তায় চলে আসে থম্‌থমে কুয়ো
উল্টো করে জামা পরার মতো সবকিছু মনে হয়
মন খারাপ হলে লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে
ফিরে আসে ফাঁকা মাঠ
ঘরের মধ্যে ধু-ধু রেলস্টেশন
চিরুনির শেষে ভেঙে যাচ্ছে গ্রাম"[১৩]

কবি তার প্রেয়সীকে কোনো কিছু বলতে ভয় পান। কেননা তাতে উল্টো কোনো মানে হয়ে যেতে পারে। দাম্পত্যের এই অনুরাগহীন শীতল সম্পর্কে কবিমন ক্রমশ উদাস হয়ে পড়ে। সেই যন্ত্রণাকাতর একাকিত্ব 'ফাঁকা মাঠে'র চিত্রকল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। ক্রমশ দাম্পত্যের প্রেমহীনতা আরো বিস্তৃততর হয়েছে। গৃহাভ্যান্তরে ধু-ধু রেলস্টেশনের চিত্রকল্প সেই প্রেমহীনতারই ইঙ্গিতবহ। এইভাবে একসময় দাম্পত্যজীবন ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। 'চিরুনি' দাম্পত্য এবং 'গ্রাম' সংসারের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

আধুনিক পণ্যসর্বস্ব বাজার অর্থনীতিতে প্রকৃত প্রেমের কোনো স্বীকৃতি নেই। পণ্য সর্বস্ব দুনিয়ায় প্রত্যেকটি মানুষই আজ খদ্দেরে রূপান্তরিত হয়েছে। কবির অন্দরমহলও যার ব্যতিক্রম নয়। সেই বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা শোনান 'হত্যা' নামক কবিতাটিতে। কবি লিখেছেন—

"কুড়ালের মতো একা, উলঙ্গ দোলনায় আমি দুলছি
ছুটে যাচ্ছে রঙবেরঙের স্যুটকেস
আমার খাটে ছড়িয়ে পড়ছে স্যুটকেসের অসুখ
আমি কিভাবে বাজাবো তোমার চোখের জল
প্রদীপের কূটচালে নিহত খড়মের শ্লোক"[১৪]

বর্তমান পণ্যসর্বস্ব বাজারে কবি একা হয়ে পড়েছেন। মানুষের প্রেম-ভালোবাসা-আবেগ সবকিছুই আজ বাজারজাত হয়ে পরেছে। তাই প্রেমের যাবতীয় আভরণ উলঙ্গ হয়ে পরেছে। চারপাশে ছুটে চলেছে নানান রঙের মনোহারী ভোগলিপ্সা। কবির অন্দরমহলও তার থেকে

ব্যতিক্রম নয়। এরকম সময়ে দাঁড়িয়ে কবি কীভাবে তার প্রিয়তমাকে বোঝাবেন প্রেমের ভাষা। যেখানে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চুপিসারে ঢুকে গেছে ভোগবাদের হুল্লোড়। আর এভাবেই আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি তথা মূল্যবোধগুলি নিহত হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে শ্যামল সিংহের 'চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা' কাব্যের কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতাগুলির বিশ্লেষণ সব পাঠকের কাছে একইরকম হবে এরকমটা মনে করি না। আধুনিক কবিতার বহুমাত্রিক প্রবণতায় পাঠকভেদে তার আলাদা আলাদা ভাষ্য গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু একথা ঠিক যে, প্রথাগত কাব্যপাঠের ধারণায় তাঁর কবিতা অনুধাবন সম্ভব নয়। আমরা জেনেছি, প্রকরণবাদী সাহিত্য সমালোচকেরা বলতেন সাহিত্য আসলে একটি 'কোড' অতএব তাকে ডি-কোড করাটাই সাহিত্য সমালোচনার লক্ষ। অন্যদিকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী সস্যুরও বলেছেন রচনা আদতে এক চিহ্ন ব্যবস্থা। চিহ্নগুলির পারস্পারিক বিন্যাস এবং তাদের মধ্যেকার বৈপরীত্য নির্মাণ করে রচনার সংগঠন। চিহ্ন বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি দুটি সূত্র উত্থাপন করেছেন। প্রথমটি 'লাঁগ' এবং 'পারোল' তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়টি 'দ্যোতক' (Signifier) ও 'দ্যোতিত' (Signified) তত্ত্ব। তাঁর মতে ভাষা হলো চিহ্নের (Sign) সংস্থান। ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ হলো এই চিহ্নসমূহের বিন্যাস বিশ্লেষণ করা। তিনি আরো বলেন যে অর্থ আসলে আরোপিত কোনো মূল্যমান নয়, চিহ্নের বিন্যাস এবং বৈপরীত্যই এর অর্থ গড়ে তোলে। অবয়ববাদী সাহিত্য তাত্ত্বিকেরা সস্যুরের এই ভাবনার প্রয়োগ ঘটান সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। ফলে সাহিত্যের বয়ান ও লেখক নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র সংস্থান হয়ে ওঠে।[১৫] অবয়ববাদী সাহিত্য তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণ মাথায় রাখলে শ্যামল সিংহের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী কীভাবে চিহ্নায়ক মূল্যমান নির্ধারণ করছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার উৎকর্ষতা নিরুপণ করা যায়। ভাষাচিহ্নগুলির পারস্পারিক বিন্যাস ও বৈপরীত্যের মাধ্যমে তাঁর একেকটি কবিতা একেকভাবে অর্থবহ হয়ে উঠছে। দ্যোতিতের মনন, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠছে ভিন্নভিন্ন প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ রচনার বয়ান (Text) বা লেখক কেউই সাহিত্যকৃতির অর্থ নির্ধারিত করছে না এর অর্থ নির্ধারিত হচ্ছে দ্যোতিতের (পাঠকের) মননবিশ্বে। এইভাবে শ্যামল সিংহের কবিতা বস্তুজগতের উপাদান সমূহের মধ্যেকার ভাষা ও চিহ্নের আন্তঃসম্পর্ক এবং তাদের পারস্পারিক বিন্যাস ও শব্দের নিহিতার্থ আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলা কবিতায় নতুন ধারার সূচনা করলো।

তথ্যসূত্র:-

১. রায় প্রবীর ও বন্দ্যোপাধ্যায় অতনু, নির্বাচিত শ্যামল সিংহ, এখন বাংলা কবিতার কাগজ, জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ১৪

২. তদেব, পৃ. ৩২

৩. তদেব, পৃ. ১৭

৪. তদেব, পৃ. ১৮

৫. তদেব, পৃ. ২৬

৬. তদেব, পৃ. ২০

৭. তদেব, পৃ. ২৪

৮. তদেব, পৃ. ২৭

৯. তদেব, পৃ. ২৯

১০. তদেব, পৃ. ৩৩

১১. তদেব, পৃ. ৩৪

১২. তদেব, পৃ. ৩৬

১৩. তদেব, পৃ. ১৮

১৪. তদেব, পৃ. ২৫

১৫. মজুমদার অভিজিৎ, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৭, পৃ. ১৬২-১৬৫

....

মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প

ড. সুব্রত পাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ , মুন্সীপ্রেমচাঁদমহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

সারসংক্ষেপ:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা সৃষ্ট সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে মন্বন্তর সম্পর্কিত নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছেন। তবে ছোটোগল্পের সীমিত পরিসরে বাহুল্যবর্জিতভাবে মন্বন্তর পীড়িত ব্যক্তিবর্গের খণ্ডজীবনের ছবি ও মর্মকথা যাঁর লেখনীতে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তিনি হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'নক্র-চরিত', 'দুঃশাসন', 'কালো জল', 'কবর', 'পুষ্করা', 'ভাঙা চশমা', 'হাড়' প্রভৃতি গল্প মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত 'নক্র-চরিত' গল্পটিতে কালোবাজারি ও চরম হৃদয়হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মন্বন্তরের ফলে অভাবে-অনাহারে একদিকে যেমন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি পেটের জ্বালায় মানুষ গলায় দড়ি দিতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে। গল্পটিতে লেখক একদিকে যেমন মন্বন্তরের কারণ অন্যদিকে তেমনি করুণ বীভৎস রূপটিকেও তুলে ধরেছেন। 'দুঃশাসন' গল্পটিতে বাংলার বুকে ঘটে যাওয়া মন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকটের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে বস্ত্রের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অধিক দামে কালোবাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনে সক্ষম দেবীদাসের মত অর্থলোভী পিশাচরা। ফলে সাধারণ মানুষ বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে, দিনের আলোয় মানুষ গৃহবন্দি হতে বাধ্য হয়। 'কালো জল' গল্পটিতে একদিকে যেমন মন্বন্তরের পূর্বের চমৎকার দিনগুলির কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মন্বন্তরের ফলে ঘটে যাওয়া গ্রামের সাধারণ মানুষের করুণ বীভৎসতার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কবর' গল্পে শা-নওয়াজ চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন পরিবেশ-পরিস্থিতি কীভাবে মানুষকে হৃদয়হীন করে তোলে। 'পুষ্করা' গল্পে লেখক মন্বন্তরের পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে যে মহামারী দেখা দেয় তার বীভৎসতা ও তার থেকে পরিত্রাণের জন্য গ্রামবাসীর অন্ধ দেবভক্তি ও পুরোহিততন্ত্রের কপটতার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। 'ভাঙা চশমা' গল্পে লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একদিকে যেমন মন্বন্তরের নারকীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ত্রাণ ব্যবস্থাকে প্রহসন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অন্যদিকে তেমনি মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'হাড়' গল্পটিতে মন্বন্তরকালীন পটভূমিতে একদিকে উচ্চবিত্তের বিলাসিতা অন্যদিকে সর্বহারা শ্রেণির দানবীয় আর্তনাদের বাস্তব চিত্র বর্ণনা করেছেন।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর ও মন্বন্তরজনিত মহামারী বাঙালি জীবনে যে চূড়ান্ত অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল তারই প্রভাব পড়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে।

মূল শব্দ:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসংকট, কালোবাজারি, ক্ষুধার্ত, মহামারী।

মূল প্রবন্ধ :-

১৯৪৩ সালে বাংলায় সংঘটিত মন্বন্তরের মূল কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিশাপ সমগ্র দেশে অনুভূত হলেও সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলাদেশের জনজীবন। ড. রামেশ্বর শ' তাঁর 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন— "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা আসে তারই শোচনীয় পরিণাম বাংলার কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩)। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মন্বন্তরকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ ফল (direct result) বলে অভিহিত করেছেন।"[১] এই মন্বন্তর ততটা না প্রকৃতিসৃষ্ট যতটা মনুষ্যসৃষ্ট। ১৯৪২-৪৩ সালে অনাবৃষ্টি ও মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণা জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ মুনাফা অর্জনের জন্য খাদ্যশস্য নিয়ে কালোবাজারিতে ব্যস্ত ছিল। আর এই কালোবাজারি দমনে সরকার ছিল ব্যর্থ, সরকারের খাদ্য সংগ্রহ অভিযানও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। আবার জাপানী আক্রমণের কারণে বর্মা থেকে প্রচুর উদ্বাস্তু বাংলায় চলে আসে। ফলে খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি চরম আকার ধারণ করে।

খাদ্যদ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে চাপ আসে গ্রামের ভূমিহীন মজুরদের উপর এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে সমাজের অন্যান্য স্তরেও। লক্ষণীয় বিষয় ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কর্মরত দেশীয় ব্যক্তিবর্গের আয় অনেকটা বৃদ্ধি পাবার ফলে দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর-মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও তাদের খুব একটা সমস্যা হয়নি, কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল তাদেরই। যার ফল স্বরূপ দেখা দেয় অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকার সমস্যা, যা মানুষের মূল্যবোধকে গ্রাস করেছিল। এছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের শোষণ-পীড়ন ও সামরিক বাহিনীর জন্য সামান্য মূল্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যবস্তু মজুত রাখার প্রয়াস সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে গ্রামছাড়া করতে বাধ্য করেছিল। শহরের রাস্তায়, ফুটপাথে নিরন্ন মানুষের মিছিল, ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খাদ্যের অধিকার নিয়ে মানুষে-কুকুরে লড়াই ছিল নিত্যদিনের ছবি। এই মন্বন্তর ধীরে ধীরে আবার মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। খাদ্যের অভাবে নিরন্ন মানুষের দল অখাদ্য-কুখাদ্যের প্রভাবে নানা রোগের শিকার হয়েছিল স্বাভাবিক নিয়মেই। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি অসুখ মহামারীর মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। আসরফী খাতুন তাঁর ‘বাংলা কথাসাহিত্য : চল্লিশের সময় ও সমাজ’ গ্রন্থে বলেছেন—“মন্বন্তর বাংলাকে বীভৎস, ভয়ানক করে তুলল। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে পথে ঘাটে। যেখানে সেখানে মৃত্যুদৃশ্য, ছড়ানো ছিটানো মৃতদেহ, শকুন, কুকুর ও শিয়ালের অবাধ রঙ্গমঞ্চ ছাড়াও নানারকম করুণ ছবি মানুষের মনে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জ্যান্ত শিশুর দেহ, অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে শিয়ালে-কুকুরে ছিঁড়ে খেতে লাগল। সৎকারের অভাবে মৃতদেহের পাহাড় জমে উঠতে লাগল গ্রামে-গঞ্জে। কোনো কোনো স্থানে সৎকারের অভাবে মৃতদেহগুলি নদীতে ও বিলে ফেলে দেওয়া হয়।”[২]

মানবজীবনের এই সমস্ত বিভীষিকাময় দুঃখজনক ঘটনাসমূহ লেখকদের বিচলিত করে তুলেছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা-মৃত্যু বাধ্য করেছিল লেখকদেরকে কলম ধরতে। বিভিন্ন লেখক একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে মন্বন্তরের এই ভয়াবহতাকে বাস্তব রূপে চিত্রিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’কে অধিকতর উৎকর্ষ দান করতে সক্ষম হয়েছেন ছোটোগল্পকারেরা। মন্বন্তরের দুর্যোগময় চিত্র যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গল্পকারেরা নিজেদের গল্পে তুলে ধরেছেন তাঁরা হলেন— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ। তবে ছোটোগল্পের সীমিত পরিসরে বাহুল্যবর্জিতভাবে মন্বন্তর পীড়িত ব্যক্তিবর্গের খণ্ডজীবনের ছবি ও মর্মকথা যাঁর লেখনীতে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তিনি হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮- ১৯৭০)। তাঁর ‘নক্র-চরিত’, ‘দুঃশাসন’, ‘কালো জল’, ‘কবর’, ‘পুষ্করা’, ‘ভাঙা চশমা’, ‘হাড়’ প্রভৃতি গল্প মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত।

‘নক্র-চরিত’ গল্পের নায়ক নিশিকান্ত কর্মকার একজন শঠ ও কুটিল চরিত্র, চোরের উপর বাটপাড়ি করে সোনা-গহনা ও অর্থের ভারে যার বিলিতি লোহার সিন্দুক ভরে ওঠে। গল্পটিতে কালোবাজারি ও চরম হৃদয়হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিশিকান্ত কর্মকার গোলাপাড়া হাটের জাঁদরেল মহাজন তথা ধানচালের আড়তদার, কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ী ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। হাবিবগঞ্জ থানার দারোগা ইব্রাহিম মিঞাও ছিল অর্থের লোভে ও সেবাদাসী বিশাখার প্রতি বিশ্বগ্রাসী লালসায় নিশিকান্তের মন্ত্রমুগ্ধ। বৈষ্ণব উপাসক নিশিকান্ত মুখে ধর্মের জয়গান করলেও অধর্মেই তার প্রকৃত পরিচয়। মন্বন্তরের ফলে অভাবে-অনাহারে একদিকে যেমন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি পেটের জ্বালায় মানুষ গলায় দড়ি দিতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে, এরকমই করুণ চিত্রকে গল্পকার তুলে ধরেছেন মতি পাল ও তার বৌ-এর চরিত্রের মধ্য দিয়ে—“মতি পাল বারান্দায়ই পড়ে আছে। পেটের জ্বালায় দাওয়া থেকে বুঝি খানিকটা মাটি কামড়ে খেয়েছিল, একরাশ কর্দমাক্ত বমি গালের দু’পাশে জমে রয়েছে। পুরো বত্রিশটা দাঁতই তার বেরিয়ে আছে, মরবার আগে কী একটা অসীম কৌতুকে খানিকটা পৈশাচিক হাসি হেসেছিল বলে মনে হতে পারে।... মতি পালের বৌ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। শেষ সম্বল ছিন্ন লজ্জাবাস দিয়েই গলায় ফাঁস পরিয়েছে— লণ্ঠনের আলোয় সেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অস্বাভাবিক নারীদেহটা একটা দানবীয় বিভীষিকা যেন।”[৩] এই সব মৃত্যু দৃশ্য সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি নিশিকান্তের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না, তার কাছে স্বার্থের বাইরে কিছু নেই। তার মতো চরিত্রের পক্ষেই তাই বলা সম্ভব— “কাল পূর্ণ হলে মানুষকে মরতেই হবে, কেউ তো আর লোহা দিয়ে মাথা বাঁধিয়ে আসে না। না খেয়ে মরেছে সে তো কৃতকর্মের ফল। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির দেনা এ জন্মে শোধ করতেই হবে—হুঁ হুঁ বিধাতার রাজ্যে অবিচার হওয়ার জো নেই।”[৪]

গল্পে দেখা যায়, বারো টাকা দরে কেনা অটশো মণ চাল নিশিকান্তের গোলাঘরে মজুত আছে অথচ তারই গ্রামে মানুষ অনাহারে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে—“আটশো মণ সে চাল মজুত করে রেখেছে। বর্ষার বাজারে চল্লিশ টাকা দরে এই চালটা ছেড়ে দিলে সে শুধু লাল নয়— রক্তের মতো টকটকে লাল হয়ে যাবে। যুদ্ধের দিনকাল— মন্বন্তর যাকে বলে। কিছু যদি করে নিতে হয় তো এই-ই সুযোগ।”[৫]

এইরকমই নিষ্ঠুর, নির্মম ও হৃদয়হীন চরিত্র নিশিকান্তের, লোভ-লালসা যার মজ্জাগত। তবে এই নিশিকান্ত কর্মকার নিজের অপরাধবোধ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল বলেই অন্ধকার রাতে পথ চলতে গিয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। তার মনে হয়েছে, বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে অসংখ্য মাংসচর্মহীন অস্থিময় প্রেতাত্মারা বেড়িয়ে এসে তাদের মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ী করবে— "সেই মূর্তিগুলো আর্তনাদ করে উঠবে— আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভাণ্ডারে জমা করেছ তুমি। তোমার ক্ষমতা, তোমার খত, তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে। কিন্তু— এখন?এখন? এখন?"[৬]

গল্পটিতে লেখক একদিকে যেমন মন্বন্তরের কারণ অন্যদিকে তেমনি করুণ বীভৎস রূপটিকেও তুলে ধরেছেন। গল্পের শেষে লেখক চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে নিশিকান্তের মত চরিত্রদের তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। গোলাঘরে মজুত রাখা চালের পচা অংশকে 'গলিত গোরুর দেহে'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং ক্ষুধার্ত সাধারণ মানুষকে 'শকুন' ও নিশিকান্তকে 'ঘেয়ো কুকুর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক বলেছেন—"মাঠের মাঝখানে একটা গলিত গোরুর দেহ আগলে বসে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর; চারিদিক থেকে শকুনেরা উড়ে উড়ে সেই মড়াটাকে ঠোকর মারবার চেষ্টা করছে, আর কুকুরটা অস্বাভাবিক প্রচণ্ড চিৎকার করে ক্ষুধার্ত শকুনগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।"[৭]

'দুঃশাসন' গল্পটিতে বাংলার বুকে ঘটে যাওয়া মন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকটের বাস্তবচিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। ছোট গ্রামের ছোট বন্দরে বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস, কাপড়ের আড়তদার— বস্ত্রসংকটের নায়ক। দারোগা শচীকান্তের সঙ্গে দেবীদাসের দুষ্ট-মিষ্ট সম্পর্কই কালোবাজারির প্রধান সহায়ক। যুদ্ধের বাজারে বস্ত্রের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অধিক দামে কালোবাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনে সক্ষম দেবীদাসের মত অর্থলোভী পিশাচরা। ফলে সাধারণ মানুষ বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে, দিনের আলোয় মানুষ গৃহবন্দি হতে বাধ্য হয়— "কোনোখানে একটি মানুষ নেই— যেন শ্মশান—"[৮]

বস্ত্র সমস্যার পাশাপাশি গল্পে রয়েছে কেরোসিনের সমস্যাও। কেরোসিনের অভাবে সমস্ত গ্রাম প্রায় অন্ধকারেই নিমজ্জিত। অন্ধকার পথে চলতে গিয়ে রোজ দু'তিন জন মানুষ সাপের কামড়ে মারা যায়। এছাড়াও অন্ধকারেই শেয়াল কর্তৃক চুরি হয় ছোট শিশু সন্তান—"মুচিপাড়ায় একটি মেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে, পরশু দিন নিশুতি রাতে ওর ঘরের বেড়া ভেঙে শেয়ালে ছেলে চুরি করে নিয়েছে। পরদিন সকালে বাড়ি থেকে তিরিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা খুঁজে পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না।"[৯] একদিকে কেরোসিনের অভাবে সাধারণ মানুষের ঘরে আলো জ্বলে না অন্যদিকে শচীকান্ত-দেবীদাসের আনন্দোৎসবের যাত্রাপালায় পাঁচ-পাঁচটা জোড়ালো ডে-লাইটের আলো গ্রামের মানুষের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

গল্পে যাত্রাপালার নাম 'দুঃশাসনের রক্তপান'। এই যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে লেখক বাস্তবের দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণকারী দুঃশাসনরূপী দেবীদাসকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। যাত্রাপালা উপভোগ করে দেবীদাস ও গৌরদাস মুচিপাড়ার মধ্য দিয়ে যাবার পথে দৃষ্ট ষোড়শী কন্যার চিত্র সমাজের নির্মম বাস্তবতাকেই নির্দেশ করে—"ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর একসঙ্গেই চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি— ছলছল করে উঠল রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে এক ফালি কাপড় নেই— কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[১০]

যাত্রাপালায় যেমন দেখা যায় দুঃশাসনের বুকে বিঁধেছে ভীমের খর-নখর তেমনটা কিন্তু বাস্তবের দুঃশাসনের সঙ্গে ঘটেনি। তবে গল্পের শেষে গৌরদাসের মনে ভীতি সঞ্চারের মধ্য দিয়ে গল্পকারের ব্যঞ্জনাময় উক্তি স্মরণযোগ্য— "যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?"[১১]

'কালো জল' গল্পে লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন কীভাবে মন্বন্তরের সুযোগে মথুরা দাসের মতো স্বার্থলোলুপ মহাজনেরা রাজা বাদশা হয়ে গিয়েছে। গল্পটি শীতল মাঝির দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। গল্পটিতে একদিকে যেমন মন্বন্তরের পূর্বের চমৎকার দিনগুলির কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মন্বন্তরের ফলে ঘটে যাওয়া গ্রামের সাধারণ মানুষের করুণ বীভৎসতার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। মন্বন্তরের পূর্বে গ্রামের চমৎকার দিনগুলি গল্পকারের বর্ণনায় ভাষা পেয়েছে— "পুজোর সময় পরদেশীরা ঘরে ফিরেছে, হাসি আর গানে মুখর হয়ে উঠেছে নদীর জল, বাঁশীতে ভাটিয়ালী সুর মনকে ব্যাকুল করে দিয়েছে। বাইচের নৌকায় ঝমঝম করে করতাল বেজেছে— উঠেছে উদ্দাম চিৎকার। গ্রামের হরিসভা থেকে কীর্তনের সুর এসেছে, গাঁটছড়া বাঁধা বরকনে নিয়ে আনন্দিত মুখে গাঁয়ের

মেয়েরা 'জলসই' করতে এসেছে গাঙের ঘাটে।"[১২] কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই দেখা দিয়েছে আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন, যা লেখক শীতল মাঝির দ্বারা ব্যক্ত করেছেন— "তিন বছরে কী আশ্চর্য পরিবর্তন। শীতলের চোখের সামনে দিয়েই তো দুর্ভিক্ষের এত বড় একটা ঝাপটা বয়ে গেল। এই নদী দিয়ে সে কত মরা মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে, দেখেছে উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পর গ্রাম। আড়িয়াল খাঁর অনিবার্য ভাঙনের মতো মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত নির্মমভাবে চূর্ণবিচূর্ণকরে দিয়ে গেছে সমস্ত। শ্রীহীন শূন্যপ্রায় গ্রামগুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে।"[১৩] দীর্ঘ পাঁচ বছর পর অধীর আগ্রহ নিয়ে তারাপদ গ্রামে ফিরে এসেছে স্ত্রী, কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত পরিবারটির যে চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা ভয়াবহ— "পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সব শুনে গেল তারাপদ। কলেরায় মারা গেছেন জানকী চক্রবর্তী। ভুনি একদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, শোনা যায় কারা নাকি তাকে গিয়ে কলকাতায় বিক্রি করে দিয়েছে। আর অরুণা ! পেটের ভাত আর পরনের কাপড় যার জোটে না, যার স্বামী থেকেও নেই, তার শেষ পথই খুঁজে নিয়েছে সে। ঘরে মাটির কলসী ছিল এবং খালে জলের অভাব ছিল না।"[১৪]

গল্পটিতে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী বল্লভপুরের মথুরা দাসের মত ধনী মহাজনদের কুকর্মকে বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের বাজারে মথুরা দাস রাতের অন্ধকারে দশ বস্তা চাল চুরি করে নিয়ে চলেছে নিজের গোলায় মজুত করার উদ্দেশ্যে, কেড়ে নিয়ে চলেছে মানুষের মুখের গ্রাস। এইসব মহাজনেরা শুধু একটা মানুষকে নয়, একটা গ্রামকে, একটা দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাইতো লেখক বলেছেন—"শ্মশানের ওপর হাড়ের স্তূপ যত আকাশ-ছোঁয়া হতে থাকবে, তত উঁচু হয়ে মাথা তুলবে মথুরা দাসের কড়ির পাহাড়।"[১৫] শীতল মাঝি নৌকার যাত্রী কালোবাজারি মথুরা দাসকে পাহাড়াদারদের হাত থেকে রক্ষা করেছে ঠিকই কিন্তু প্রবল বিবেকদংশনে বিদ্ধ হয়েছে। লেখক শীতল চরিত্রের বিবেকযন্ত্রণাকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন, তাকে প্রতিবাদী করে তুলতে পারেননি। তবে গল্পের শেষে লেখকের তীব্র ব্যঙ্গাত্মক উক্তি স্মরণযোগ্য—"রাত্রির অন্ধকারে খালের সংকীর্ণ প্রচ্ছন্ন পথে কালো জল কলকল করে বয়ে চলেছে, যেন একটা সাপ নিঃশব্দে দংশন করে ক্ষিপ্রগতিতে লুকোতে চলেছে নিজের বিষাক্ত বিবরে।"[১৬]

এখানে লেখক মথুরা দাসের মত চোরাকারবারিদের বিষাক্ত সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চোরাকারবারিরা গোপনে সমস্ত বঙ্গদেশকে শোষণ-পীড়ন করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কবর' গল্পে শা-নওয়াজ চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন পরিবেশ-পরিস্থিতি কীভাবে মানুষকে হৃদয়হীন করে তোলে। দরিদ্র ঘরের সন্তান শা-নওয়াজ লেখাপড়ায় ভালো হওয়া সত্ত্বেও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারেনি। প্রভাবশালী মোড়লের (ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট) ছেলের কাছে চুরির মিথ্যা অপবাদে তার মা অপমানিত ও অত্যাচারিত হয়। প্রতিবাদে শা-নওয়াজের তিন মাস জেল হয়। জেলখানা প্রসঙ্গে তার উক্তি স্মরণযোগ্য—"জেলখানা না দেখলে মানুষ গড়বার এমন সার্থক যন্ত্রটির পরিচয় অজানাই থেকে যেত। পাথর ভাঙলাম, বুটের লাথি খেলাম, সরকারকে সেলাম দিয়ে রাজভক্তি শিখলাম। তিন মাস ধরে সরকারের সযত্ন পরিচর্যায় একেবারে বিশুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এলাম আগুনে-পোড়া খাঁটি সোনা যাকে বলে। তখন আমার চরিত্রের উৎকর্ষ দেখলে দেবতাদেরও হিংসে হতো। ম্যাট্রিক তো ওই পর্যন্তই, বেরিয়ে দেখি মা-ও মরে বেঁচেছে।"[১৭]

এখানেই শেষ নয়, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাকে বাঁধা পেতে হয়েছে। চটকলে কাজ নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মালিকের বিষনজরে পড়লে পালিয়ে বাঁচতে হয় তাকে। চিৎপুরের হোটেল, কানিং স্ট্রীটে মনোহারীর দোকান কোনোটাই করতে পারেনি। অবশেষে যুদ্ধ শুরু হলে ধানচালের কন্ট্রাক্ট তার জীবন বদলে দেয়, সে হয়ে ওঠে নির্দয় ও স্বার্থপর। পঞ্চাশ লাখ মানুষের মৃত্যুও তার হৃদয়ে দাগ কাটতে পরে না। তাইতো দেশের মানুষের সঙ্গে কালোবাজারি করে মন্বন্তরের বাজারেও পাঁচ গুণ দাম দিয়ে নাইন্টিন ফরটিফোর মডেল টিপটপ আমেরিকান গাড়ি কিনতে পেরেছে শা-নওয়াজ—"পঞ্চাশ লাখ মরা মানুষের রক্তমাখা টাকায় বাড়ি কিনেছি গাড়ি কিনেছি। কলকাতার রাস্তায় পায়ের নীচে মাড়িয়ে গেছি মড়া। ভাতের ফ্যানের জন্যে যখন জীবনের অপমান তার কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে দুয়োরে দুয়োরে কেঁদে বেড়িয়েছে, তখন দামী দামী খাবার কিনে কুকুরকেই খেতে দিয়েছি, মানুষকে নয়। মানুষ হাত পাতলে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।"[১৮]

যে গ্রামে একদিন তাকে, তার মাকে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল, মন্বন্তরের সময় সেই গ্রামের উপর কতটা প্রতিশোধ নিতে পেরেছে, তা দেখার জন্য গেলে শা-নওয়াজের দামি গাড়ির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় অসংখ্য কবর—"কবর— রাস্তাঘাট সব জুড়ে কবর দিয়েছে, আল্লাতলী— অর্থাৎ আল্লার দরবারে এত লোকের ঠাঁই হয়নি একসঙ্গে। তাই বাংলাদেশের মানুষ বাংলার পথে-ঘাটে সব

জায়গাতেই ছড়িয়েছে মৃত্যুশয্যা। আমার ধানচালের কন্ট্রাক্ট সার্থক হয়েছে।”[১৯] শেষ পর্যন্ত কিন্তু শা-নওয়াজ ভীত হয়ে পড়েছে, তার হৃদয়েও দেখা দেয় অপরাধবোধ, তাই সে রঞ্জনকে বলেছে—“মরা-মানুষ আবার কি বেঁচে ওঠে কোনোদিন? কবর ফুঁড়ে তারা কি উঠে আসে কখনো?”[২০]

‘পুষ্করা’ গল্পে লেখক মন্বন্তরের পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে যে মহামারী দেখা দেয় তার বীভৎসতা ও তার থেকে পরিত্রাণের জন্য গ্রামবাসীর অন্ধদেব ভক্তি ও পুরোহিততন্ত্রের কপটতার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। গল্পে মড়কের বর্ণনায় বলা হয়েছে—“আশেপাশে দশখানা গ্রাম জুড়ে মড়ক দেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক। আর সে কি মৃত্যু ! ছ মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো— দিব্যি আছে, কোন রোগব্যাধির বালাই নেই, হঠাৎ কাটা কই মাছের মতো ধড়ফড় করে মরে যাচ্ছে।”[২১] আর এই ভয়াবহ মড়কের হাত থেকে রক্ষার জন্য ঘোষপাড়া গ্রামের সমৃদ্ধ মহাজন আর তালুকদার বলাই ঘোষ ভিন্ন গ্রাম থেকে তিনশো টাকা দক্ষিণার লোভ দেখিয়ে তর্করত্নের মতো সিদ্ধপুরুষ পুরোহিতকে নিয়ে এসেছেন কুপিতাদেবী শ্মশানকালীকে শিবাভোগে তুষ্ট করার জন্য। কারণ, গ্রামের মানুষের ধারণা দেবী তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন, যার ফল স্বরূপ দেখা দিয়েছে মহামারী। তাই শুক্লা চতুর্দশীর রাতে তর্করত্ন কালীপুজোর আয়োজন করেছিল এবং সে তার সাধনায় সফল হয়েছিল, কারণ পুজো শেষে দেখা যায় দেবী নিজের মূর্তি ধরেই দু'হাতে গোগ্রাসে শিবাভোগ খেয়েছেন—“স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড় মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।”[২২]

কিন্তু তর্করত্ন বুঝতেই পারেনি শ্মশানকালী এসেছিল ডোমপাড়ার পাগলিনী বধূর রূপে, যিনি তিনপুত্র ও স্বামীকে হারিয়েছেন দুর্ভিক্ষে— “তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই— আর এখনো পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে— কালীর মতো জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে একফোঁটা জলের জন্যে। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারেনি।”[২৩] লেখক এখানে এই পাগলিনী ডোমবধূ চরিত্রের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মহামারী ও মড়কের ভয়াবহতাকে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তেমনি গ্রামবাসীর অন্ধ দেবভক্তি ও ভ্রান্ত বিশ্বাসকেও ব্যঙ্গ করেছেন। তাইতো গল্পের শেষে লেখকের ইঙ্গিতবাহী উক্তি—“কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে। মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।”[২৪]

'ভাঙা চশমা' গল্পে লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একদিকে যেমন মন্বন্তরের নারকীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ত্রাণ ব্যবস্থাকে প্রহসন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অন্যদিকে তেমনি মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। কথক প্রথমে শিক্ষকের চাকরি করলেও পরে তা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে রিলিফ ওয়ার্ক করার জন্য সাব-ডেপুটি গ্রেডের হাকিমের চাকরিতে যোগ দেন। দুর্ভিক্ষ আর ম্যালেরিয়াজীর্ণ গ্রামে ওষুধ-কম্বল-রেশনের ব্যবস্থা করলেও কথকের মন ক্লান্ত আর সংশয়গ্রস্ত হয়ে ওঠে—“শ্মশানের ওপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করে কী লাভ। শ্মশান। তা বই আর কী। মন্বন্তর নির্বিবাদে বয়ে গেছে— এসেছে ম্যালেরিয়া।...দূরে দূরে শেয়ালের ডাক শুনি— শকুনের আর্তনাদ অবরুদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু মানুষের গলা শুনতে পাই না— শিশুর কান্না ভেসে আসে না। ম্যালেরিয়া আর দুর্ভিক্ষে হতশেষ মানুষ ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ করে। আর না খেয়ে মায়ের বুকে ছটফট করে শুকিয়ে মরে গেছে শিশুরা— ভাবী স্বাধীন ভারতের মানবকের দল।”[২৫]

সরকারের চূড়ান্ত অবহেলায় ও কালোবাজারিদের অত্যাচারে দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আর এমত অবস্থায় সরকারি ত্রাণের ব্যবস্থাকে লেখকের প্রহসন বলেই মনে হয়েছে—“যেন একটা বিরাট প্রহসনের বিদূষক বলে মনে হয় নিজেকে। যাদের মৃত্যুর জন্যে শেষে কৈফিয়ৎ দিয়েই আমরা পাপক্ষালন করতে পারব না, তাদের কবরের ওপর রিলিফের সান্ত্বনা ছড়ানো যেন তাদের অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়।”[২৬]

কথক ষাট টাকা বেতনের শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে হাকিমের চাকরিতে যোগ দিয়ে নিজেকে জয়ী বলে মনে করেছেন। এখানে কথকের হৃদয়ের লোভ ও স্বার্থপরতাই বড় হয়ে উঠেছে—“জিতেছি নিশ্চয়ই— জীবনের চক্রনেমি উল্টো গতিতে ঘুরতে শুরু করেছে। ভালো করে ‘কোরাস্’ গাইতে পারলে পাকাপাকি হয়তো হয়েও যেতে পারি, এমনি একটা আশা উপরিওয়া সেদিন দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের জয় হোক্— রিলিফের জন্যেই তো এমন চাকরিটা আমি পেয়ে গেলাম। মড়ক বিশেষ না হলে জীববিশেষের পার্বন হয় না, আমাদের দিকটাও তো দেখতে হবে।”[২৭]

গল্পে দেখা যায় মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সারাজীবন ধরে কষ্ট করে এমনকি শেষ সম্বলটুকু (বৌয়ের হার) পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়ে একটি স্কুল তৈরি করেছিলেন, কিন্তু ভয়ানক দুর্ভিক্ষ তার সারাজীবনের স্বপ্ন নষ্ট করে দিয়েছে। তবুও তিনি হার মানেননি, উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায়ও কাল্পনিক ছাত্রদের প্রিপোজিশন পড়াতে ব্যস্ত ছিলেন। উন্মাদগ্রস্ত এই আদর্শ শিক্ষকের আচরণের মধ্য দিয়ে লেখক কথকের অপরাধবোধকেই জাগ্রত করেছেন— "যেন চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছি আমি। মনে হল, বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই— আমার ছোঁয়াতেই এখানকার সব কিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রত্যচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।"[২৮]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'হাড়' গল্পটিতে মন্বন্তরকালীন পটভূমিতে একদিকে উচ্চবিত্তের বিলাসিতা অন্যদিকে সর্বহারা শ্রেণির দানবীয় আর্তনাদের বাস্তব চিত্র বর্ণনা করেছেন। রায়বাহাদুর এইচ.এল. চ্যাটার্জি উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। দুর্ভিক্ষের বাজারে রায়বাহাদুরের প্রকাণ্ড প্রাসাদ, বাড়ির দারোয়ান, ফুলের বাগান, মালি, অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা, কালো মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি, রঙিন কাচ দেওয়া জানালায় সিল্কের পর্দা, চীনেমাটির টবে কম্পমান অর্কিড, বহুমূল্য হাড় সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিচিত্র শখ উচ্চবিত্তের চূড়ান্ত বিলাসিতাকেই নির্দেশ করে। অপরদিকে রায়বাহাদুরের প্রাসাদের একটু দূরেই মনোহরপুকুর পার্কে বুভুক্ষুর কলোনি বসেছে। ক্ষুধার্ত জনতার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে— চিৎকার করছে, কলহ করছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেনের ময়লা জল। তাদের একান্ত প্রার্থনা—"—চট্টি ভাত দাও মা— একটুখানি ফ্যান—"[২৯] কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে ট্রাম চলছে, মোটর চলছে অনবরত কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে বুভুক্ষুদের আর্তনাদই বড় হয়ে উঠেছে—"কী অস্বাভাবিক গলার জোর, কী দানবীয় আর্তনাদ! মরবার আগে মানুষের গলার স্বর কি ওই রকম গগনভেদী হয়ে ওঠে।"[৩০]

রায়বাহাদুর ম্যানিলা, তাহিতি, মিণ্ডানাও, হাওয়াই প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে বহুমূল্য ও বহুগুণান্বিত হাড়গুলি জোগাড় করেছেন কিন্তু মন্ত্রগুলি পাননি। লেখক বলেছেন, হাড় যে শুধু রায়বাহাদুরই পেয়েছেন তা নয়, দুর্ভিক্ষপীড়িত সর্বহারা বুভুক্ষুর দলও পেয়েছে। তবে রায়বাহাদুর সেগুলি সাজিয়ে রেখেছেন আর বুভুক্ষুর দল সেগুলি চুষে চুষে খাদ্যের অন্বেষণ করছে। গল্পের শেষে লেখক যে বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ— "কলকাতার আকাশেও কি মেঘ করেছে, ভালো করে তারাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না? ওই কালো আকাশের রঙ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠবে কবে, এই ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধজড়িত মিঠে হাওয়ায় ঝড়ো আগুনের ঝলক লকলক্ করে বয়ে যাবে কবে?

হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকি।"[৩১]

এছাড়াও আরো যে কয়েকটি গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষকালীন বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করেছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'একটি শত্রুর কাহিনি', 'খড়্গ', 'ডিম', 'নিশাচর', 'ডিনার' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর ও মন্বন্তরজনিত মহামারী বাঙালি জীবনে যে চূড়ান্ত অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল তারই প্রভাব পড়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে। তাঁর ছোটোগল্পে একদিকে যেমন বিপর্যস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে অন্যদিকে তেমনি প্রশাসনিক ত্রুটি, কালোবাজারির দল ও লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর গল্পে ব্যবহৃত তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং শাণিত বিদ্রুপ পাঠকের হৃদয়কে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। মন্বন্তরকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের গুরুত্ব সূচিত হয়েছে আর এক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরছোটগল্প বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সমকালীন ঘটনাবলিকে ভিত্তি করে রচিত হলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পগুলি যুগোত্তীর্ণ মহিমা অর্জন করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. শ', ড. রামেশ্বর, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি,কলকাতা-০৯, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৪শে নভেম্বর, ২০০৮, পৃ. ৬২

২. খাতুন, আসরফী, বাংলা কথাসাহিত্য : চল্লিশের সময় ও সমাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা, ২০১৪, পৃ.১২৯

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃ. ৪২২-৪২৩

৪. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪২২ , ৫. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪২৪ , ৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪২২ , ৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪২৪

৮. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৩৮
৯. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪১
১০. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪৪-৪৪৫
১১. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪৫
১২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪৬
১৩. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪৮
১৪. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৫১
১৫. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৫৪
১৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৫৬
১৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৭০
১৮. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৭১-৩৭২
১৯. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৭৪
২০. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৭৪
২১. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৫৭
২২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৬১
২৩. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৬৪
২৪. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৬৫
২৫. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৬৭ , ২৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৬৭
২৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৬৮ , ২৮. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৭৩
২৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: রথযাত্রা ১৩৮৬, পৃ. ৫৭১
৩০. প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৭১ , ৩১. প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৭৩

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:,কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: রথযাত্রা ১৩৮৬
২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৩৮৬

সহায়কগ্রন্থ:

১. শ',ড. রামেশ্বর, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি,কলকাতা-০৯, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৪শে নভেম্বর, ২০০৮
২. খাতুন, আসরফী, বাংলা কথাসাহিত্য : চল্লিশের সময় ও সমাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা, ২০১৪
৩. মুখোপাধ্যায়, ড. তরুণ(সম্পাদনা), বাংলা ছোটগল্প : পর্ব-পর্বান্তর, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স,কলকাতা-৭৩,প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৫
৪. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯,পঞ্চম সংস্করণ: জুলাই ২০০৪
৫.উজাগর–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪২১

....

অণুগল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী :- একটি পর্যালোচনা

সুমন সরকার
গবেষক , রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ-

বাংলা অণুগল্পের জগতে স্বপ্নময় চক্রবর্তী একটি মাইলফলক। তিনি যেসব অণুগল্পগুলি লিখেছেন সেখানে মধ্যবিত্ত মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তার লেখায় নারীদের কঠিন সংগ্রামেরছবিদেখাযায়। অনেক সময় পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে নারীরা ভোগ্য পণ্যে পরিণত হচ্ছে সেই ছবিও দেখাতে ভুল করেনি লেখক। তবে তার অণুগল্পে বার্ধক্য প্রেম আলাদা মাত্রা পেয়েছে। ইতিহাস সচেতন লেখকের কলমে নানা সময় ইতিহাসের অনালোচিত দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে। আবার রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথাকে নিজস্ব মুন্সিয়ানায় তুলে ধরেছেন অভ্রান্ত ভাবে। সঠিক ও পক্ষপাতহীন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় তার অণুগল্পগুলি কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মৃত্যুচেতনা, কালোবাজারি, দেশভাগের যন্ত্রণা তার লেখা অণুগল্পে নানাভাবে উঠে এসেছে।

মূলশব্দ-

অণুগল্পে মধ্যবিত্ত চেতনা, বয়স্ক প্রেম, রাজনীতি ও ইতিহাস চেতনা।

মূলপ্রবন্ধ-

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে স্বপ্নময় চক্রবর্তী একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর জন্ম ১৯৫১ সালের ২ জানুয়ারি উত্তর কলকাতায়। তাঁর পিতামহ কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী পূর্ব পাকিস্থানের গুরু ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের আগেই অবসর নিয়েছিলেন। পিতা হীরালাল চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৪৮ সালে দেশ ভাগের সময় তাদের পুরো পরিবার নিয়ে নোয়াখালি থেকে কলকাতার বাগবাজারে চলে আসেন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে লেখক বড় সন্তান। তিনি বাগ বাজারের মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্কুলে পড়তেন। এরপর তিনি ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। এখানে বাংলার শিক্ষক অসীম বাবুর নজরে আসলেন নিজের লেখনীর গুণে। এরপর দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে রসায়নে সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কর্মজীবনের প্রথমে একটি দেশলাই কম্পানিতে কাজ করতেন। এই সময়ের কিছুটা পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭২ সাল নাগাদ পাকাপাকি ভাবে কর্ম জগতে প্রবেশ করেন। কর্মসূত্রে তিনি বিহারে প্রবাসী জীবন কাটান। সেখানে কিছুকাল চাকরি করে ফিরে আসেন বাড়িতে। পরে ডাব্লু. বিসি.এস পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ভূমি সংস্কার বিভাগে চাকরি পান। এই সূত্রে তাকে গ্রামে-গঞ্জে অনেক ঘুরতে হয়েছে যার প্রতিচ্ছবি সাহিত্যের পাতায় দেখা যায়। এই চাকরির স্থায়িত্বকালও বেশি দিন ছিল না। এরপর তিনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টিভ, হাওয়া দপ্তরে র‍্যাডার চালানো এবং সবশেষে আকাশবাণীর ম্যানেজার হিসাবে বাকি জীবনটা কাটান। এই খানেই তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে গভীর ভাবে হাতে খড়ি হয়।

তিনি একাধারে গল্পকার, অণুগল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর লেখা 'অণুগল্প সংগ্রহ' বইটিতে ১০৮ টি অণুগল্পের সংগ্রহ আছে। সেই লেখাগুলিতে উঠে এসেছে সমাজের নানান ছবি।

মধ্যবিত্ত মানুষের কথা নানা ভাবে তাঁর লেখা অণুগল্পে উঠে এসেছে। 'হরিণ! হরিণ!' অণুগল্পে দেখা যায় এক ছাদের তলায় থাকে অথচ কেও কাওকে চেনেনা। গল্পে দেখা যায়- 'একটা ঘরে দুজন থাকি। আমরা দুজন রাগ করে দরজা দেরাজ জানলা কপাট সমান নিলাম ভাগ করে কোনো একজন বাইরে গেলে লাগাই তালা ঠিক করে একটা কপাট বন্ধ থাকে অন্য কপাট ফাঁক করে এই আমাদের সম্পর্ক।'[১] মধ্যবিত্ত মানুষের আত্মসংকোচ ভাব তাকে জগতের থেকে আলাদা করে রাখে। 'ভিড়ের ভিতরে মানুষ' গল্পে দেখা যায় নিজেদের বাড়ির কাজের লোকের নাতি সংকটজনক অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেও এড়িয়ে যায়। নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য মধ্যবিত্ত মানুষ সবরকম ভাবে আপোষ করে নিতে পারে। গল্পে দেখা যায়-' অফিসে যাবার সময় বড্ড তাড়াহুড়ো হয়। ছোটাছুটি করে ট্রেন ধরি। ট্রেনে

শিয়ালদা, তারপর বাস ন'টা-বারোর ট্রেনটা আগের স্টেশনটা থেকে আসে বলে একটু ফাঁকা থাকে। পরের ট্রেনে ভীষণ ভিড়।'[২] এই ভাবে মধ্যবিত্ত মানুষ নিজের সুবিধাটা আগে বুঝে নিয়ে জগৎ বিমুখ হয়ে যায়।

লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখায় ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ইতিহাস তাঁর লেখা গল্পে পাওয়া যায়। 'ইতিহাস' অণুগল্পে আছে- 'কাঠের কলে অনেক কাঠ। ঝাড়খন্ড-আন্দামানের কাঠও আছে, মালয়েশিয়া-ভিয়েতনামের কাঠও আছে। কাঠকলের মালিক একদা বাম রাজনীতি করতেন, শাসক দলের অনেক নেতার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। অফিস ঘরে লেনিনের ছবি। মেয়ের বিয়ের ফার্নিচার বানাবেন। ভিয়েতনামের সেগুন খুব ভালো। কাঠ চেরাই হচ্ছে। হঠাৎ তীব্র শব্দ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বিদ্যুৎ চালিত করাত বেঁকে গেল। আসলে কাঠের গভীরে ছিল কয়েকটা বুলেট। গোপনে। যুদ্ধের।'[৩] এই বুলেটে যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। তারই লেখা 'উন্নয়ন' অণুগল্পে কলনি জীবনের কথা আছে। উদবাস্তু সমস্যার প্রসঙ্গও এসেছে তাঁর গল্পে। বস্তিজীবনের নানা কথা তাঁর লেখা অণুগল্পে এসেছে। অণুগল্পটিতে বস্তিজীবনের স্বরূপের ছবি- 'প্রফুল্লনগর উদ্‌বাস্তু কলোনীতে আমাদের প্লট নম্বর ৩৭২। দু-বছর হল আমরা দলিল পেয়ে গেছি। এখন ওই জবর দখলি প্লটটার মালিক আমরাই। ঠাকুরদাদা, বাবা, সবাই মারা গেছেন। আমরা তিন ভাই ঠিক করেছি জমিটা প্রোমোটারকে দেব। আমাদের প্লটে রাস্তার ধার ঘেঁসে একটা শহিদ-বেদি আছে। ১৯৫২ সালে জমির মালিকরা গুন্ডা পাঠিয়েছিল। আমার কাকার মাথায় লাঠি পড়েছিল। শহিদ-বেদিতে লেখা আছে উদবাস্তু আন্দোলনের কিশোর শহিদ...। পাথরের লেখা এখন ঝাপসা। প্রোমোটার হারান জ্যাঠার ছোটছেলে। বাঁ হাতে চন্ডীর সুতো। ডান হাতে সিগারেট। আজ থেকেই কাজ শুরু। ও কাকার শহিদ বেদিটার দিকে সিগারেট ধরা হাত উঁচিয়ে বলে- তা হলে ওটা ভেঙে ফেলি। উন্নয়নের স্বার্থে আমি বলি হ্যাঁ...।'[৪] লেখকের লেখায় স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথাও উঠে এসেছে। ইংরেজ সৈন্যের হাতে বুলেট খেয়েও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ধরা পরার ভয়ে কষ্ট সহ্য করে নিত। এই নিদারুণ বেদনা ও আত্মবলিদানের কথা 'বুলেট' অণুগল্পে ফুটে উঠেছে। অণুগল্পে- 'জ্যাঠামশাই স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। দুবার জেল খেটেছেন। শুনেছিলাম ওর শরীরের ভিতরে ব্রিটিশের গুলি ঢুকেছিল। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে হাসপাতালে ভরতি হননি।'[৫]

তাঁর অণুগল্পে দেব-দেবতা প্রসঙ্গ এসেছে নানা সময়। দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস তাঁর গল্পের অন্যতম দিক। 'মা মনসা' অণুগল্পে গুপীর কাছে সকলে আসে মানত করে কারণ সে মনসা পালা করে। গল্পে দেখা যায়- 'গুপির কাছে কিছু গরিব-গুর্বো ওদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আসত। একটু মাথায় হাত বুল্যে দাও। মা, যেন ভাল থাকে, যেন সাপে না কাটে।'[৬] তাঁর 'রামকৃষ্ণ' অণুগল্পটিতে প্রচুর মনীষীর ছবি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থ ছুঁতে পারতেন না, সেটা দেখানোর জন্য ঠাকুর সেজে দেখানো হয়েছে- 'পরানের ঠাকুমা জহর কোটের পকেটটা দেখে নেয়। পকেটে পয়সা কড়ি নেই তো? রামকৃষ্ণের তোশকের তলায় টাকা ছিল বলে ওঁর গায়ে জ্বালাপোড়া হচ্ছিল। জহর কোটের পকেটে কোনো টাকা পয়সা নেই তো?'[৭] আবার ধর্ম নিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত অণুগল্পের নমুনা 'ডায়মন্ড কালী'। সেখানে দেখা যায়- 'আমরা ঠাকুর সর্বানন্দের বংশধর। বিরাটিতে আমাদের দেড়বিঘা জমির উপর বাড়ি। পুকুর আছে, বাগান আছে। বাড়িতে মন্দির আছে, মন্দিরে মা কালী আছেন। পূজারি আছেন, মাসে মাসে মাইনে দিচ্ছি। আমাদের কাঈর নাম বিরিঞ্চি কালী। আমি দিল্লিতে স্টেল্‌ড। ছেলে বিদেশে, মেয়ে পুণে। বিরাটির প্রপার্টি বিক্রি করে দেব, ডায়মন্ড শেল্টার্স-এর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ওরা রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স করবে, কমার্সিয়াল মল করবে। ওদের অফিসার বললেন- মন্দিরটা থাকাতে ভালোই হল। ফ্ল্যাটে ওনাররা একটা মন্দিরও পেয়ে গেল। আপনাদের কালী মায়ের অসম্মান করব না। এখন যে পুজো করছে, সেই করবে। গরদের ইউনিফর্ম করে দেব। নামাবলিতে কোম্পানির লোগো থাকবে। আমি জানি, শপিং মলে তারপর প্যাকেটে বন্দি প্যাঁড়া বিক্রি হবে। জবা ফুলও পাওয়া যাবে। পলিথিনে। পুজো দেবার টিকিট বেরুবে। বারকোড লাগানো। আর আমাদের কালীর নাম হয়ে যাবে ডায়মন্ড কালী।'[৮]

তাঁর লেখায় অনেক সময় বয়স্ক প্রেমের ছবি দেখা গেছে। তাঁর 'সম্পর্কের এমব্রোডায়ারি' গ্রন্থের 'প্রথম অক্ষর' অণুগল্পে পরকীয়া প্রেম দেখা গেছে। একদা প্রেমিক-প্রেমিকা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে এসে আবার প্রেমসত্বা জেগে উঠে পরিমল তালুকদার ও শিউলি হালদারেরে মধ্যে। অণুগল্পে দেখা যায়- 'পরিমল শিউলির পাশে বসে আছে। দেখল শিউলির হাতের স্ফীত নীল শিরা। যেন কোনো গ্রাম্য পথ।... শিউলির চোখের ভাষা পড়তে পারল পরিমল।...আপনার কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে। ... কী জানতে ইচ্ছে করে পরিমল গুছিয়ে বলতে পারেনা। শিউলি ওর ব্যাগের ভিতর থেকে একটা কলম বের করেন। আর একটা ছোট্ট লেখার প্যাড। শিউলির হাত কাঁপে। কাগজের উপর কোনো রকমে লেখেন একটি অক্ষর। আদি অক্ষর 'অ', তারপর কলমটা থেমে যায়।...'[৯] তাঁর 'সবুজ সোয়েটার' অণুগল্পেও বৃদ্ধ বয়সের প্রেম দেখা যায়। ডাক্তারখানায় চলতে থাকে প্রেমালাপ। এমনকি দুজনের একই তারিখ না পড়লেও প্রেমের টানে এসে উপস্থিত হয়। নিজেদের

দেওয়া পোশাক পর্যন্ত পরিধান করে আসে। গল্পে দেখা যায়- 'সকালে ভাল করে দাড়ি কামালাম। মুখে নাতির আফটার সেভটা চুরি করে লাগালাম। পাজামার উপর সেই পাঞ্জাবিটা পরলাম। সেই পাঞ্জাবি। মাফলার। দশটার আগেই আমি হাজির। তখনো ভিড় হয়না রুগিদের।'[১০]

তাঁর লেখায় পরকীয়া প্রেম, যৌনতা ফুটে উঠেছে । তাঁর 'হলুদ শাড়ি', 'মা ও মেয়ে', 'মা', 'জাগরণে যায়', 'গদ্যপদ্য প্রবন্ধ', 'মা-মেয়ের সুখের সংসার', 'অনুপ্রবেশ', 'কথা' অণুগল্প উল্লেখ যোগ্য। 'হলুদ শাড়ি' অণুগল্পে অরুণার স্বামী বিয়োগের পর অফিসের সহকর্মী তাঁর প্রতি প্রেম নিবেদন করে। তাঁর পরিধান করা হলুদ শাড়িটি প্রেমিকের ভাল লাগে। দেখা যায়-'অরুণা একটা ফোন পেল। ফোনের ওপার থেকে একটা অচেনা পুরুষ কণ্ঠ। গত সোমবার একটা হলুদ রঙের শাড়ি পরে আসেন। এত অযত্নে রাখেন কেন নিজেকে? যা হবার তো হয়েই গেছে। জীবন তো একটাই। নিজেকে আনন্দে রাখুন। ... অরুণার কি হলুদ শাড়ি পরে আসাটা উচিৎ হবে? যে ফোন করেছিল সে আশকারা পেয়ে যাবে না?...'[১১] 'মা' গল্পে দেখা যায় যূথিকা নামের একটা মেয়ে গর্ভ ভাড়ার ব্যবসা করে। আধুনিক সারোগেট মাদার ভাবনা তাঁর লেখায় দেখা গেছে। অণুগল্পে দেখা যায়- 'যূথিকা পেট ভাড়া দিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরল- নৈহাটি। এতদিন কলকাতার বালিগঞ্জে ছিল। আসলে ও ছিল সারোগেট মাদার।... ভদ্রলোকের বীজ, ওর বৌয়ের ডিম্বাণু মিশিয়ে, কীসব করে যূথিকার পেটে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। ... যূথিকাকে অনেক টাকা দিয়েছে। শাড়িও।'[১২] তাঁর লেখা 'গদ্যপদ্য প্রবন্ধ' অণুগল্পে পরকীয়া ফুটে উঠেছে। গল্পের নায়কের স্ত্রী মিমির সামনে সুদেষ্ণাকে নিয়ে ধরা পড়ে যায় বাড়িতে। অণুগল্পে দেখা যায়- 'গতকালই কেসটা হয়েছে। আমি ধরা পড়ে গিয়েছিলাম মিমির কাছে। মিমি বাপের বাড়ি গিয়েছিল। আমি সুদেষ্ণাকে আসতে বলেছিলাম। মিমির আসার কথা ছিল রাত্রে। কিন্তু বিকেলেই চলে আসে। ঘরে তখন সুদেষ্ণা।'[১৩] 'মা ও মেয়ে' অণুগল্পে দেখা যায় প্রথম বয়সে বৈধব্য ঘটেছে। তারপর মেয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা শুরু করে। অণুগল্পে-'মা বলল- ওসব থাক। শত হলেও তোর জোয়ান বয়েস। মা হয়েই বলছি, একজন পুরুষ মানুষ... মেয়ে বলল- অভাব নেই মা...। মা কথা থামালেন। মেয়েকে বাঁকা চোখে দেখতে থাকলেন। আগেকার দিনের সিনেমার ছায়াদেবীর মতও।'[১৪] তাঁর লেখাতে সমাজে নিম্নবিত্তের পরিবারে মেয়েদের সুরক্ষা থাকেনা একেবারে বেয়াব্রু হয়ে যায়। সেই ছবিও তিনি তাঁর 'মা-মেয়ে সুখের সংসার' লেখায় দেখিয়েছেন-'মা আর মেয়ে থাকে দেশে, ছেলে থাকে ভিন দেশে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু জামাই ফেলে রেখে গেছে। জামাই নেয় না। সম্পর্ক রাখে না। মেয়ে বলেছে তাতে কী মা, তোমার কাছেই থাকব। তোমার মাথার উকুন বেছে দেব, চুল বেঁধে দেব, গা মুছিয়ে দেব, তোমার আমার ভাত ফুটিয়ে নেব। মা-মেয়ের সংসার...। সেই থেকে মেয়ে মায়ের কাছেই থাকে। ভিন দেশ থেকে মাঝে মাঝে ছেলে হুন্ডিতের টাকা পাঠায় অন্য একজনের কাছে। সে টাকা নিয়ে এবাড়িতে দিতে এলে মেয়ের কাপড় খুলতে হয়। কিছুদিন পর একজন এসে বলে ও বুড়িমা, সরকার এখন বুড়োভাতা দিচ্ছে। নেবে? বুড়ি বলে পেলে কেন নেব না। বুড়ি বার্ধক্যভাতা পায়। তাঁর আগে মেয়ের কাপড় খুলতে হয়।... এই টাকার জন্য কাগজে সই করাতে আসে কেউ। মেয়ের তখন কাপড় খুলতে হয়। এরকম বারবার কাপড় খুলতে ভালো লাগে না মেয়ের। মনে হচ্ছিল কাপড়টাই যত বিপত্তি। তাই, কাপড় খুলেই রাখত মেয়ে। ...বাড়িতে মাংস ভরা ন্যাংটো মেয়ে। ...মেয়ে এবার গায়ের চামড়াটাও খুলে ফেলল। ক্রমশ কঙ্কাল হয়ে গেল। এখন বুড়ি মা আর কংকাল মেয়ের সুখের সংসার। এখন বাড়িতে লোকজন আসে। কোনো অসুবিধা নেই। ... সোমত্ত মেয়ের এখন আর কোনো ভয় নেই। আর ভয়ে ভয়ে না থাকাটাকেই তো সুখ বলে। আর মেয়ে সুখে থাকলেই তো মায়ের সুখ। মা-মেয়ে সুখেই আছে।'[১৫]

তাঁর লেখায় রাজনীতি এসেছে। বিশেষ করে তাঁর লেখা, 'ইউনিয়ন রুম', 'বোমা', 'কুড়ুনি', 'ও', 'হাওয়া', 'শকুন' ও 'চলোপাল্টাই', 'জঙ্গলমহলের বাপগুলান', 'ভূত', 'শান্তি প্রক্রিয়া', 'উল্কি', 'লক্ষ্মী, 'ঘর' ইত্যাদি অণুগল্পে। মূলত বামরাজনীতি সেই সঙ্গে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ও জঙ্গল মহলের কথা লেখা আছে তাঁর অণুগল্পগুলিতে। 'ইউনিয়ন রুম' অণুগল্পে লালঝান্ডা আর লেনিন দেখে বুলডোজার থেমে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাতে নতুন আবাসন হবে কিন্তু বামফ্রন্টের দাপট থাকায় পুরনো ইউনিয়ন রুম ভাঙতে ভয় পায় বুলডোজারও। বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা জ্যোতিবসুর সাধারণ জীবন যাপনের ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখা 'ঘর' অণুগল্পে। অণুগল্পে –'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্যার দারুণ লোক। খুব ভাল লোক। প্রথম যেদিন সি এম ডিউটি পড়ল, অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস হয় না। এটা সিএম স্যারের বাড়ি? আমি রাজভবন দেখেছি, জ্যোতিবাবু স্যারের বাড়িও দেখেছি, আমাদের গাঁইয়ের হরেন দলপতির বাড়িও দেখেছি। হরেনবাবু কী বা এমন নেতা, তবু ওর কত বড়ো বাড়ি, আর মাদের মুখ্যমন্ত্রী কী অর্ডিনারি থাকেন। ওদের পুরো ফ্যামিলি অর্ডিনারি। জানালায় দুটো কাক আসে, ওঁর মেয়ে কাককে মুড়ি দেয়। সি এম মাঝে মাঝে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গাছ দেখেন। ওনার মোটে অহংকার নেই।'[১৬] সিঙ্গুরের চাষযোগ্য

জমিতে আর চাষবাস হবেনা সেই প্রেক্ষাপটে লেখা 'লক্ষ্মী' অণুগল্পটি। অণুগল্পে দেখা যায়-'নন্দী বাড়িতে পৌষলক্ষ্মীর পুজো হয় পৌষ পূর্ণিমায়। বহুদিন ধরেই এটা হয়ে আসছে। বাড়ির সবাই আসে সিঙ্গুরের সেই সানাপাড়া গাঁয়ে। বড়োকর্তা এখানেই থাকে। কেউ কলকাতায় চাকরি করে, কলকাতায় বাড়িও আছে, কেউ থাকে চুঁচুড়ো, কেউ বা বর্ধমান, কিন্তু পৌষলক্ষ্মী পুজোয় সবাই আসে। বহুদিনের নিয়ম। খেতের ধানের নতুন চালের খিচুরি। ভাজাভুজি আর নলেন গুড়ের পায়েস।... সবাই লাইন দিয়ে খেতে বসে। খাওয়ার আগে বলে 'মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী, আদেশ কর নোয়া খাব।' এরকম তিনবার বলে নিতে হয়। আর খাওয়া শেষে বলতে হয়-'বেশ খেলাম মা লক্ষ্মী, তোমার কৃপায় যেন সামনের বছর আবার খাই।' এ-বছর পৌষলক্ষ্মীর পুজোয় লক্ষ্মীমায়ের আদেশ নিয়ে খাওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু খাওয়া শেষ করে কিছুই বলা হল আর। বড়ো কর্তা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। এ জমিতে সামনের বছর চাষ হবে না। কারখানা হবে।'[১৭] 'চাষি' অণুগল্পেও কেদার বাড়ুজ্যে কারখানার জন্য জমি দেবে সেই প্রসঙ্গ আছে। 'উল্কি' অণুগল্পে রাজনীতি করতে গিয়ে কাঁধে গুলি খেতে হয়। কারখানা হবার জন্য জমিরাজনীতি দেখা যায় 'কুড়ুনি' অণুগল্পে। কারখানা তৈরি হলে ভবিষ্যতের ছবি বদলে যাবে সেই ছবি উঠে এসেছে। 'বেড়াবেড়ি গাঁইয়ের পুবপাড়ায় অনিল ঘোড়াই-এর চায়ের দোকানে কমরেড জগন্নাথ নন্দী বললেন, কারখানাটা হয়ে যাক, এই দোকানের ভোল পালটে যাবে। কলকাতার কারিগর এনে চভপ-কাটলেট বেচতে হবে। আর ওই পঞ্চু প্রামাণিককে ঘর-ঘর গিয়ে কামাতে হবে না। সেলুন করে বসে যাবে, লোকে এসে চুল কেটে যাবে।'[১৮]

তথ্যসূত্রঃ

১. চক্রবর্তী,স্বপ্নময়, অণুগল্প সংগ্রহ, অভিযান পাবলিশার্স,১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯,চতুর্থ মুদ্রণঃ জুন ২০১৯,পৃ-১১
২. তদেব, পৃ-৪১
৩. তদেব, পৃ-৩৭
৪. তদেব, পৃ-৩৮
৫. তদেব, পৃ-৫১
৬. তদেব, পৃ-৬৪
৭. তদেব, পৃ-৬৭
৮. তদেব, পৃ-৬৮
৯. তদেব, পৃ-১০২
১০. তদেব, পৃ-১০৪
১১. তদেব, পৃ-১১৯
১২. তদেব, পৃ-১০৯
১৩. তদেব, পৃ-১২১
১৪. তদেব, পৃ-১২৩
১৫. তদেব, পৃ- ১৩
১৬. তদেব, পৃ-১৪২
১৭. তদেব, পৃ-১৪৪ , ১৮. তদেব, পৃ-১৫১

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

১. চক্রবর্তী,স্বপ্নময়, অণুগল্প সংগ্রহ,অভিযান পাবলিশার্স,১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, চতুর্থ মুদ্রণঃ জুন ২০১৯
২.ঘোষ, চন্দন,অণু-সন্ধান অণুগল্প ও অণুগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ,অভিযান পাবলিশার্স,১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯,প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৯

....

যুগ সন্ধিক্ষণের নির্মাণ ও বিনির্মাণে কবি তরুণ সান্যাল

তমাল মুখোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

সারসংক্ষেপ :

পঞ্চাশের দশকে যৌবনের মানসিক যন্ত্রণাবোধের জীবন প্রস্থান নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কবি তরুণ সান্যাল। স্বাধীনতা উত্তর প্রাগৈতিহাসিক অস্থিরতা তুল্য চেতনার বহ্ন্যুৎসবের মাঝে কবির পরিচিত ঝড়ঝাপটা যুগের কবি হিসেবে। আদ্যন্ত বামপন্থী হয়েও দলীয় বাধ্য বাধকতায় হিরণ্ময় নিস্তব্ধতা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। পঞ্চাশ ও উত্তর পঞ্চাশ এর কবিদের দায় ও দায়িত্ব উচ্চারণের পাশাপাশি কবির হৃদয়ে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী মানস চেতনার সংঘর্ষে মাটির পৃথিবীর শরীরিণীর সাথে স্বপ্নচারিণী মিল খুঁজতে গিয়ে অমিল উপলব্ধির তীব্র বেদনাবোধ তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। তবুও কবির সমস্ত সত্তা জুড়ে বিরাজ করে হৃদয়ের চূড়ান্ত নির্বাণের সৌভাগ্য পিয়াসী সেই প্রেমের অভিলাষ। কবি দেশ, সমাজ ও রাজনীতি, ধর্মতন্ত্রের মধ্যকার শোষণ, নগ্নবৈষম্য, ধর্ষকাম মনোবৃত্তি নিয়েও মুখর। সমসাময়িক বিষয়কে কবিতার অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ তাঁর কাব্য ব্যক্তিত্বের অন্যতম আগ্রহের বিন্দু। তাঁর সৃষ্টির পথে একটা বড় অংশ জুড়ে অবস্থান করে জন্মের পবিত্র সূত্র ও সূত্রধাররূপী নভোচারী ভ্রষ্টনীড় বাংলাদেশ। বনের গহীনের অনুচ্চারিত ভাবনা রূপায়ণে তিনি রোম্যান্টিক রাজনীতি-সমাজনীতিতে সক্রিয় ও পরিশেষে মানবতাকে শিরোধার্য করে। জীবন পথে স্রষ্টা রূপে পাড়ি দেওয়া সেই চির শিশু যিনি শেষ সচেতন মুহূর্ত পর্যন্ত পৃথিবী ও শৈশবের জন্য প্রতীক্ষারত স্বপ্নসন্ধানী চিরপথিক।

Key Words

যুগ সন্ধিক্ষণ, বামপন্থী কবি, দ্বিধান্বিত প্রেম ভাবনা, নারীর স্তুতিতে অস্বস্তি, ক্ষমতার ধর্ষকাম মনোবৃত্তি, শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত বাংলাদেশ

"সেই সবুজ পাখি, নীল ডানা আর স্মৃতি
আমি তখন মুঠো মুঠো মাটি ছুঁড়ে শিশু
তোমার ঘন বন্য আদিমতায় মুখ লুকিয়ে কাঁদবো।"[১]

বিংশ শতকের মধ্যভাগ যেমন দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু তেমনি পরের দশকগুলির জন্য বয়ে আনা এক অস্থিরতর বোধের ভাঙা গড়া সম্পৃক্ত, সংক্ষুব্ধ মানসচেতনার প্রারম্ভিক সূচক-ও। পরিবর্তমান কাল প্রবাহের বিংশ শতক; ইতিহাসের মহান আনন্দময় ট্র্যাজিক বিষণ্ণ ও দুঃখী মুহূর্তের সাক্ষী। এই শতক দেখেছে মানুষের উদ্ভিদ তুল্য প্রাণশক্তি, লেলিহান, উষর, দাবদাহ, নিড়ানি, বুলডোজারও মুছে দিতে পারে না মানুষের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী অস্তিত্বকে। সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি-অর্থনীতি, পরিবার সমস্ত ক্ষেত্রেই বিপর্যয় ও পুনর্নির্মাণের স্বপ্ন দেখে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা পাশাপাশি বাংলা কাব্যজগতেও বিশেষ বিদ্রোহমুখীতা, আধুনিকতা বা প্রাগ্রসরতার বেনো জল নেমে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সেই পঞ্চাশের দশকেই যৌবনের মানসিক যন্ত্রণাবোধের জীবন প্রস্থান নিয়ে হাজির হলেন নতুন এক কবি— তরুণ সান্যাল। যে সময় শুরু করলেন, তার পরের সময়কাল, প্রাগৈতিহাসিক অস্থিরতা তুল্য ভাঙন-নির্মাণ-সংবেদনা-রক্তচক্ষু-আস্ফালন-অবক্ষয় ও চেতনার বুহ্ন্যুৎসবের মাঝে আশার উৎসার এর কাল। তাঁর ভাবজগত যতবার আলোড়িত হয়েছে, ততবার তিনি কখনও এগিয়েছেন কখনও বদলেছেন, কখনও ফিরতে চেয়েছেন অতীতে। কবি তরুণ সান্যালকে ঝড়ঝাপটার যুগের কবি বলে চিহ্নিত করতে পারি। হিরণ্ময় নিস্তব্ধতা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ, সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি।

কোনো বিশেষ পরিচয়ে তাঁকে বেঁধে রাখা মুশকিল। আদ্যন্ত বামপন্থী ঘরানার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলীয় রাজনৈতিক পরিসরের ঊর্ধ্বে উঠে প্রত্যাখ্যানের সাহসও দেখিয়েছেন বামদলগুলিকে। প্রেম, বিপ্লব, নৈরাজ্য, কল্পনা, প্রেষণা, রাজনীতি, দেশ, আশাবাদ, ঈশ্বর, অনিশ্চয়তা, হতাশার আয়ুধে সমুদ্রমন্থন করেছেন নিজের অন্তরতর 'আমি'-র। মন্থনজাত অমৃত গরল দুইই পান করতে হয়েছে। আত্মশুদ্ধির তপশ্চর্যায় সফল হয়েছিলেন। উত্তম পুরুষের বয়ানে সেই পথচলার আনন্দ-বিস্ময়-বিমূঢ়তা, ক্লেদ, হতাশা, উল্লাস, তৃপ্তি,

সংবেদনা জমা হয়েছে শব্দের খোলসে, কবিতার অবয়বে। কবির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার পোরজনা গ্রামে ২৯ অক্টোবর ১৯৩২। পিতা অশ্বিনীকুমার সান্যাল, মা হিরণ্ময়ী দেবী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর। ১৯৪৮ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যাপনা কার্যের সাথে যুক্ত। শৈশব ও প্রারম্ভিক কৈশোরের পাবনা-রাজশাহীর জীবন যখন কেড়ে নিল দেশভাগ। তখন ছিন্নমূল হবার যন্ত্রণা বয়ে এপারে আসা। তারপর আমৃত্যু (২৮ আগস্ট ২০১৭) সে জীবন ফিরে পাবার স্বপ্ন দু-চোখে নিয়ে ফিরেছেন এক পথ থেকে অন্য পথে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নাৎসি আগ্রাসন, ফ্যাসিস্ট শক্তির উল্লাস, পঞ্চাশের মন্বন্তর, বাংলার বৌদ্ধিক মহলে কমিউনিস্ট ভাবধারার বিস্তার, প্রভৃতি ঘটনাক্রম তাঁকেও কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে আকর্ষিত করছিল। ১৯৪৯-এ পার্টির সদস্য হলেন। বর্ধমান রাজ কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি, কারাবাস, অনশন প্রভৃতি ঘটনা তাঁর তারুণ্যকে অর্থ দিচ্ছিল। কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন ১৯৫৬ তে প্রকাশিত 'মাটির বেহালা'-তে। ঘোষণা করলেন—

"বিশেষত, যখন প্রচলিত 'আধুনিকতা'-র কাব্যপ্রস্থান এবং প্রাগ্রসরতার নামে ফলিত দৈনন্দিনের সূত্রসংস্থান অতি ব্যবহারে নিষ্প্রভদ্যুতি তখন বিংশ শতকের পঞ্চাশোত্তর দশকে অন্য কাব্য বক্তব্যের কথা কবিতা পাঠকদের চিন্তিত করে তুলেছে। এবং এই চিন্তার মানসকর্মের যে শিল্পরূপ কাব্যে প্রকাশিত হবে—সেটাই হবে যথার্থ আধুনিকতা।"[২]

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রারম্ভিক বিশেষ লক্ষণগুলি। পঞ্চাশ ও উত্তর পঞ্চাশ-এর কবিদের দায় ও দায়িত্ব উচ্চারণের পাশাপাশি কবির হৃদয়ে, অন্তর্মুখ ও বহির্মুখী মানসচেতনা সংঘর্ষে, মাটির পৃথিবীর শরীরিণীর সাথে স্বপ্নচারিণীর মিল খুঁজতে গিয়ে অমিল উপলব্ধির তীব্র বেদনাবোধ যে এই কাব্যের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি—সেই সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত, প্রেম ও নারী বিষয়ে পথ চলার দিন থেকেই এই যে দ্বিধা, সংশয়, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মাঝে শূন্যতার দোলা, তা তাঁর সমগ্র কাব্যজগৎ জুড়েই ছড়িয়ে আছে।

'মাটির বেহালা' কাব্যের 'সংলাপ', 'পেছনের মানুষ', 'দিনান্তের সান্ত্বনার উৎসর্গ', 'অভিজ্ঞান', 'তুমি সেই তুমি'—প্রভৃতি কবিতা থেকে ঐ বিশিষ্ট অনুভূতির উৎসারটি সমগ্র জীবনজোড়া সৃজন জগতে, অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ অনুরণনে ছড়িয়ে আছে। প্রেমে মিলবে সান্ত্বনা, তা নিয়েই হয় সূর্যোদয়, দীন দীর্ণ জীবনের বিরাজ করে নক্ষত্র বিলাস, তমিস্রাঘন অন্ধকার জীবনে পথ চলা তার-ই প্রত্যাশায়; যৌবনের ব্যাকুল হৃদয়, পাখির গানে যে বিস্ময় তারও প্রণোদক ঐ প্রেম। ফুল, সূর্যাস্ত, মেঘ, নীল, স্রোত, ঝরনার শব্দ, ক্রুদ্ধ ঝড় সমস্তই তার আকাশ। ক্লান্তি হরণ সেই প্রেম কেবল ঝরা ফুল, হতশ্বাস, কথার দোলা-খেয়াল খোলার বিপর্যয় নয়। কবির সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে বিরাজ করে হৃদয়ের চূড়ান্ত নির্বাণের সৌভাগ্য পিয়াসী সেই প্রেমের অভিলাষ—

"তোমাকেই দীর্ণ দীণ জীবনের নক্ষত্র বিলাসে
বার বার উন্মোচন করি, তোমাকেই
দিনান্তের রক্তাভায় আসমুদ্র তরঙ্গ তুফানে
সূর্যাস্তের লক্ষ হাতে বুকে টেনে রাখি
অধিকারে।"[৩]

বৃত্তাকার জীবনের ক্লান্তি, ব্যর্থতা, ক্ষোভ যখন প্রশান্তি খোঁজে ম্লান ঠোঁটে ভোরের আলোতে; উঞ্ছজীবী নবান্নের ব্রতে ভিক্ষা ভোজী প্রাণের প্রাপ্তির ঘর শূন্য, তখনও কবি নক্ষত্রের দীপালোকে ঝিরি ঝিরি অন্ধকার দেহের কীর্তনে সেই পলাশ প্রেমের প্রতীক্ষা করেন। প্রাণের যত মূল্য ছিল তিনি তাকেই অর্পণ করেছেন। দুর্বিষহ দৈনিকের প্রত্যাশার বিপরীতে প্রশান্তি স্বরূপা, সর্বরিক্ত ভবঘুরের বিশাল রিক্ত অনুবর্তায় বারী সিঞ্চন, অবিরাম ভাঙন, আর কীর্তিনাশার বিপরীতে সেই প্রেম; বিশ্বজয়ী। এই প্রেম যা মুছে দেয় সব ধূলি ধূসর। প্রেমের জগতকে কবি অঙ্কন করেছেন, হৃদয়ের অপার মাধুরী, স্নেহ, করুণা, বিস্ময়, নিবিড়তা দিয়ে। অমরাবতীর সেই শাশ্বতী, চিরকালের অপ্রাপনীয় হয়েই থেকে গেছে কবির কাছে। 'ঊন পঞ্চাশী বজ্রে'র কৈশোর শেষে প্রাক্-যৌবনে যখন উপস্থিত হলেন তখন নিজেকে আবিষ্কার করলেন, মিছিলের জনারণ্যে। ছায়াঘন অবগুণ্ঠন মোচিত হল না। যে যৌবন এল 'তীক্ষ্ণ দাহের খড়্গে" সেই যৌবন-ই শেষে পথে নিয়ে এল শান্তি। সেতুবন্ধ ভেঙে গেছে, সেই প্রেম অলকানন্দাতেই থেমে গেল। প্রশ্ন ওঠে, স্বপ্নের ঝুলন পূর্ণিমার আলো থেকে কবি বঞ্চিত হলেন কেন? প্রথমেই বলা হয়েছে তিনি ঝড়ঝাপটা যুগের কবি। প্রাণের সমস্ত প্রার্থনা দিয়ে তাঁকে চেয়েছিলেন, যুগের ছন্দগতি তাঁকে ততই তার থেকে দূরে ঠেলেছে। প্রথমে আলোচ্য নারী।

সৃষ্টির দিনগুলি জুড়ে কবির কাছে নারী বা প্রেমের আধার রূপী নারী; খুব একটা প্রশংসাসূচক স্তুতির পাত্রী হননি। ১৯৯১, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর একমেরু বিশ্ব, বিশ্বায়ন, বিজ্ঞাপন, বিপণন, ভোগবাদী বিনোদনী দুনিয়ার আগ্রাসী বিস্তার, পুরুষের মত নারী মূর্তিকেও ক্লেদাক্ত করার উপাদান নিয়ে হাজির হয়েছে। ফলে অলকাপুরীর সেই অপার্থিব প্রেমের মূল্যে অশরীরী বিকৃতি, কামনার চড়াগন্ধ। সেই প্রেত ভক্ষ্য প্রেমে—

“রক্ত মাংস মুড়ে প্রেমিক প্রেমিকা এক জোড়া
রতিরঙ্গে হামা দেয় আদিম রক্তির তাপে মেতে।”[৪]

ভালোবাসা শব্দটি এখানে অসহ্য, বাচাল, কথার গুমোট ও জৈব সংখ্যায়ন। উরু, গুরু বক্ষ, আর জৈব তপ্ত নিঃশ্বাসের কাদায় যেখানে বোধ আছাড় খায়। তেলহীন প্রদীপের বুকের ফিতেকে উসকে দেওয়াটাই যেন আধুনিক প্রেমের স্বরূপা। যেন প্রেমের হাতে তুলে দেওয়া তনুমন—

“এ পথে আর ওপথে—দেহমনের গোঁজামিলে
বিরোধী দুই চাওয়ায়, তুই কী দিবি তবু নারী।”[৫]

যখন দুচোখে আরণ্যক অন্ধকার, দুপায়ে ব্যর্থ যৌবনের শিকল ঝঝনা, দিগন্ত ব্যাপী মারীর জান্তব পদচারণা, কবি আশ্রয়ের খোঁজে যে নারীর প্রত্যাশায় দুহাত বাড়ান সে পথ হারিয়েছে। সেই নারী কেবল কামনার রঙিন উৎসার, সেই নারীর প্রতীক্ষায় আত্মরতির রাতের কষাটে কুয়াশা—

“রে আপাপ বিদ্ধা নারী, স্খলিত আঁচল ছত্রাকার
ছড়িয়ে যদিও তবু দশমাস দশদিন চলে যায়।”[৬]

স্বর্গীয় দেবত্বের যে ছিল অধিষ্ঠাত্রী তার চোখে শুধুই মৈথুনের বর্ষা। নারীর অঙ্গ আঁধারে ডুব দিয়েও দেখেছেন, সেখানে নিত্যতার চাবি নেই। সতীত্ব; নেই প্রেমে, নেই দেহে। পার্কে হাঁটা রক্তমাংসের প্রতিমাগুলো, ভিয়ানে গেঁজিয়ে ওঠা রস। ভগ্ন ও চড়া গন্ধময় মেদগন্ধী সেই নারী তাঁর প্রিয়া, বধূ, সখি, অন্তর্যামী, বিচিত্র রূপিণী, মানস সুন্দরী কেউ নন। তিনি তো চেয়েছিলেন—

“তোমাকে দিলেম এই অনিদ্রার রক্তিম চোখের
পলাশ প্রেমের বহ্নি, তোমাকেই দিই।”[৭]

সত্ত্বর বিজয়িনী সেই নারীর আভাস তিনি পেয়েছিলেন মিছিলে, তাঁর তনুর ছন্দে উদ্বেল সূর্যোদয় সূর্যাস্ত। স্তব্ধ রাত্রে যার স্পর্শ সুদূর নক্ষত্রালোক বয়ে আনে, সেই নারী আজ পণ্যে পরিণত। চারিদিকে কেবল কুসুমেরা ছড়িয়ে পড়েছে, যাদের কেবল ‘শরীর আর শরীর’ তাদের ‘মন’ নেই।

প্রেম ও নারী সম্পর্কে এই হতাশা, ক্লান্তি, সংশয়, বিষণ্ণতা তাঁর জীবন অন্বেষা, অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনেরই ফলশ্রুতি। তরুণ সান্যাল রাজনীতি ও সমাজ সচেতন কবি। দেশ, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মতন্ত্রের মধ্যকার শোষণ, নগ্ন বৈষম্য, ধর্ষকাম প্রবৃত্তি, অপাংক্তেয় করার প্রবণতা, অসামান্য কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতির প্রতি তাঁকে আজীবন প্রতিবাদে মুখরিত হতে দেখা গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে নবরূপী ঘাতকরা যে আসলেই ফ্যাসিস্ট, হিরোসিমা ক্যালিপসো আর নাপাম তরলে বোবা হওয়া অরণ্য যে এক, তা তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না। তাই যখন নরঘাতকের ডঙ্কা বাজছে, শতকের জতুগৃহে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য মাঠে নেমে পড়েছে ধনতান্ত্রিক বেনিয়া প্রভু, এককালে যারা ছিল জাতির (ইহুদির) শত্রু, আজ তারা মতবাদের বিরুদ্ধে নেমেছে। কবির বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে আসলে তারা মানবতার শত্রু—

“অন্য পিঠে যেই
লাল ঘুড়ি মাটি খমচে নামে
তখনি মুঠোর মধ্যে ছটফট ফড়িং হয়ে জনপদ গ্রাম
তখন নাপাম গ্যাস রকেট বুলেটে ভিয়েতনাম
তখনি দুর্গন্ধে মর্গে সুহার্তোর দাঁতের নখে শহিদের চর্বি ও শোণিত।”[৮]

দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের অধিকারের কথা বলার জন্য বিশ্বের সর্বত্র সমাজতন্ত্রী মনোভাবাপন্নদের বিরুদ্ধে সব শতাব্দীর হিংসা মাখা বাঁকা ছুরি নিয়ে নেমে পড়েছে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন অস্থির। বাংলা দেখেছে উদ্বাস্তু, দেশভাগ, খাদ্য আন্দোলন, নিষিদ্ধ মার্কবাস, নকশাল আন্দোলন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন, পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রীয় মদতে অত্যাচার, পীড়ন, গণহত্যা, ধর্মান্ধ উন্মাদদের তাণ্ডব। একটা সভ্যতা ক্রমশ আরণ্যক রাজ্যে পর্যবসিত হয়েছে তরুণ কবি নীরব নাকের কীভাবে!

"কে আমার ভারতবর্ষ, কী তোমার বাংলাদেশ, কারা
তোমার আত্মার ক্ষতে আঙুল ডুবিয়ে রক্ত তোলে।"[৯]

পৃথিবীর চারিদিকে রাজাদের ঢক্কানিনাদ, জিন্দাবাদ, দেশে দেশে রঞ্জনরা নিহত যৌবন ওয়েভারা-তে পর্যবসিত। বাংলার নানা প্রান্তে কোটি কোটি হাত উঠেছিল 'অন্ন চাই' 'অনুচাই' বলে, একদল শিক্ষিত তরুণ তার জবাব খুঁজতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হয়ে যখন বেওয়ারিশ লাশ হয়, কবি কণ্ঠে তখন বর্ষিত হয় একরাশ ঘৃণা –

"মৃত্যু-মৃত্যু উৎসবে বিপ্লব
মায়ের কোলের কাছে মরা ছেলে
ফুটপাতে রক্তের ছোপ অস্ত্রে শস্ত্রে কানামাছি
এরই নাম বলিদান, এরই নাম শস্ত্রে অভ্যুত্থান
মাথা নিচু করে ফিরে আসি, হাতের ও পিঠে রক্ত কার
সে আমার।"[১০]

বয়সগুলো বৃথা ঝরে গেল, রুজির আঙুলে তখনও ছুটি। গণতন্ত্রের নামে সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডকে ধিক্কার জানানোর কোনো ভাষাই কবির কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়নি। নির্মম গণহত্যা, শোষণ, বঞ্চনা, বিপর্যস্ত মনুষ্যত্ব দেখে কবি ব্যাকুল কণ্ঠে তাই খুঁজে চলেন—

"মানুষ হে কোথায় রয়েছ
মানুষ মানুষ।"[১১]

দরিদ্র অসহায় কণ্ঠকে দমিত করে, প্রশ্ন করে ওঠা হাতগুলোকে খুন করে সেই রক্তে মেখে ভারত যখন উন্নয়নের আলোয় সাজছে, প্রজাতন্ত্রের নামে সেই কদর্যতার ঘৃণাভারে প্রত্যাখ্যান জোটে কবির কণ্ঠে—

"বিধানসভা থেকে কে মুখ ফিরিয়ে ও
আঠারো বছরের তরুণ ক্ষুদিরাম।"[১২]

স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত সমস্ত আত্মবলিদানের হয়ে তিনি এই ভারতকে অভিশাপ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

তাঁর চোখের সামনে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে সাবালক হবার পথে পা ফেলেছে। অথচ যত এগিয়েছে ততই ভারত হয়ে উঠেছে এক ভয়ঙ্কর বিরোধাভাসের ভূখণ্ড। একদিকে বিপুল সম্পদ, অন্যদিকে কর্কশ গলায় খাদ্য চাই, কাজ চাই। বিশ শতকীয় ভারত যেন ঝুট ও লুঠ-

"তাক ডুমা ডুম্ হাঁড়ি পাড়ি যা হোক ফাটাক রঙের পাঁজর
শিল্প শিল্প হাঁকুক ফন্দী, আমরা বান্দা তেমনি নাছোড়।"[১৩]

কেবল শিল্পায়নের নামেই ভাঁওতাবাজি নয়, একই বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরেও দুটো ভারত তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যাধিগ্রস্ত, রক্তহীন, ভিক্ষাজীবী ভারতের কল্পনা করেনি কেউ। এক বৃহৎ অংশের আগামীকে বাইরে, তালিমারা-সস্তা, ক্ষুধা, বস্তিতে আটকে রেখে ভবিষ্যতের প্রভুদের দূর থেকে দেখা ও চেনার ব্যবস্থাকে বিকল করার জন্য কবি আহ্বান জানান সেই সাধারণ উত্তরপুরুষদের, যারা জরদগব কেরানী বা নতুন প্রভুর জোব্বা পরা কেউ হবে না—

"তোকে নিতে হবে এই সসাগরা ধরিত্রীর
কঠিন দায়িত্ব শান্তি সমৃদ্ধির দায়।"[১৪]

কবি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তিনকালেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের পূজারী ও তাতেই আস্থাবান। মানুষের স্বভাব বিজ্ঞতায় তাঁর আস্থা। তিনি আশাবাদীও। এ যুদ্ধ একদিন শেষ হবে।-

"আমরা যারা চেতনায় অথবা বাহুর
শাবলে বেঁধেছি বাঁধ, রক্তের উৎসবে সব স্মারক মুছেছি
তাও সাঙ্গ হয়ে যাবে।"[১৫]

আর সেই রক্তে লেখা থাকবে জলদর্চি মুক্তি। এই দিন বদলের স্বপ্নে; পালাবদলের কর্তব্য পথে কবিদেরও এগিয়ে আসতে হবে। কবিরা সমাজ নিরপেক্ষ কেউ নন, জাগতিক মঙ্গল-অমঙ্গল, সত্য-অসত্য, সুন্দর ও অসুন্দর সমস্ততেই তাঁরা আছেন। কবিদেরও দায়িত্ব আছে—

"সর্বনিম্ন মজুরির তর্কে, এসো
পঞ্চবার্ষিকীর নামে স্বরের পঞ্চমে, এসো
মফঃস্বলে বামে ঢলে রাজলক্ষ্মী উপনির্বাচনে, এসো
পা বাড়াই বাইরে এসো, এসো।"[১৬]

সমসাময়িক বিষয়কে কবিতায় অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ তাঁর কাব্য ব্যক্তিত্বের অন্যতম একটি আলোচ্য প্রসঙ্গ। একাধিক কবিতায় এসেছে যে গুয়েভাবার কথা। 'সবরমতী' কবিতায় সনাতন ভারতের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তানটির জন্মভূমি আমেদাবাদ কীভাবে বিকৃত নগ্ন, কলুষিত, ধর্মান্ধতার পীঠস্থান হয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। অতীতের তরুদত্ত উঠে আসেন 'তরুণী' ও 'তরুদত্ত' কবিতায়, অনেকটা অগ্রজদের প্রতি অভিমান বশত। ভাষার জন্য 'ভোরের পাখি' হওয়া হল না তাঁর সেজন্য পূর্বসূরীদের প্রতি কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা যেন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। প্রসঙ্গে আসেন লেলিনও, কারণ মিটিং মিছিল বন্ধ ঘেরাও, রিক্ত চাষীর ঘাম, খাদ, চা-বাগান, ভেড়ি, ধাওড়া, কারখানার আঁধার যত দুঃখ বুনবে নক্সি কাঁথায়, পাঞ্জা লড়তে, স্বপ্ন গড়তে লেলিন থাকবেন। 'চুনী কোটালের ঘাতক' কবিতা দেখিয়েছে ভারতীয় রামরাজ্যে গুহক- রা বিস্মৃত, শম্বুক-পরিণতিই সত্য। এক দলিত আদিবাসী লোধা শবর মহিলা, স্বজাতিতে প্রথম স্নাতক হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগদানের পর উচ্চবর্ণের হাতে দিনের পর দিন লাঞ্ছিত অপমানিত হতে হতে আত্মহত্যাকেই মর্যাদা রক্ষার শেষ ব্যারিকেড করে তোলেন। বিংশ শতাব্দীতে তথাকথিত সুসভ্য সমাজের বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে কবি স্তব্ধ থাকেননি—

"বিদ্যাসাগর দেশে লোধা শবরীর বেশে
শম্বুকের কন্যা হৈল গুণী
চুনি খুনি কারে নিন্দ দর্পণে পাঠকবৃন্দ
যাবে হের সে মুখ আপনি।"[১৭]

এ যেন মধ্যযুগীয় ত্রিপদী ছন্দেই মধ্যযুগীয় অমানবিক অসভ্যতার প্রতিবাদ করে, সমাজের গলিত পচিত রূপকে তুলে ধরা। 'দিল্লীতে নিহত হরিজন কিশোরীর জন্য' হোক বা সাম্প্রতিক বামপন্থীদের অধোগতি দেখে 'তাপসী মালিকের জন্য ব্যালাড' বা নন্দীগ্রাম গণহত্যের প্রতিবাদে 'পাপকথন' সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি সমান মুখর। হাংরি আন্দোলনের সময়, মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-কবিতাকে অশ্লীলতার কারবারি ভাবা খাপ পঞ্চায়েতি মানসিকতার বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়িয়েছেন। আবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁকে দেখা যায় জনমত সংগ্রহে, শরণার্থী ক্যাম্পে, লেখনী ধারণে একাগ্র। ১৯৯২ তে যখন বাবরি ধ্বংস হল;- ধর্মান্ধতার এই জান্তব উৎসবের বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধরেছেন—"বাবরে অবর সবর ফ্যামিস্ত খড়্গা।" বারবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—হিরোশিমা থেকে আউশ ভিট্‌স্ক, আফ্রিকা- এশিয়া-চিন-বাংলা-বাবরির দায় প্রাকৃতিক নয়, এতগুলো দশক পার হবার পরেও আত্মা পচে যাবার ফল। তবে একটা লক্ষণীয় যে তাৎক্ষণিক বিষয় হলেও কবিতার আবেদন তাৎক্ষণিক উত্তেজনাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। হরিপদ, ইসমাইল, মংলু হেমব্রম, ইমানুরেল, বোধিদ্রুপ, হেরাশৈল, জডন, গুহক, শ্যাম, তিতুমীর, বিরসা, সিধু, দিব্যক, মঙ্গল পাঁড়ে, লেলিন, গুয়েভারা, জটায়ু সম্পাতিরা মিশে গিয়ে এক অখণ্ড মানব স্রোতের অংশ হিসেবে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়। অখণ্ড মানবভাগ্য ধর্ম-বর্ণ-জাতির গণ্ডীতে যেমন বিচ্ছিন্ন নয় তেমনি নয় দেশ বা কবির সীমানা। কবি চিত্তকে সীমানাতে ধরে রাখাতে প্রবল আপত্তি তাঁর।

কবির জীবনের একটা বড় অংশে অবস্থান করে তাঁর জন্মের প্রথম পবিত্র সূত্র ও সূত্রধার, নভোচারী ভ্রষ্টনীড় বাংলাদেশ। যার সূত্রে তাঁর শৈশব, তাঁর সমগ্র জীবন স্মৃতিতে বিস্তীর্ণ ছায়া পথের মত ছাড়িয়ে আছে। অশ্রু বিষাদ-শ্যামলিমা, বিধ্বস্ত প্রতিমা বাংলাদেশ, অতীত ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলা সেই বাংলাদেশ পূর্ব-পশ্চিম মিলিত এক বিমূর্ত ভাবনা। যখন মাতৃভূমি বিপর্যস্ত, দেশে শস্ত্রের অশ্লীল উল্লাস, খুন, মন দুমড়ে চলে যাওয়া ট্যাঙ্কের চাকা, বোমারুর বীভৎস পাখার তলে শিউরে উঠছে বাংলা ঘর, তলতা বাঁশঝাড়, ঘাতক

কষাটে দিন;—তখন বাধ্য হয়ে কবির কলকাতায় আসা। কলকাতার জীবন তাঁর ভালো লাগেনি। নাগরিক উত্তেজনার আঁচ, ছুটি, বিস্ফোরণ, গুলি, জিন্দাবাদ, দেওয়ালে পোস্টার, মানিকতলা স্ট্রীটের গীর্জাঘেঁষা গাছে কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ফাগুন আসা সত্ত্বেও কলকাতার জীবন তাঁর কাছে নির্বাসনের নামান্তর।

"আভূমি প্রণাম যাই
ফের দেখা হবে প্রেম, ফের দেখা
হবে বাংলাদেশ।"[১৮]

তাঁর মা ঐ বিস্তৃত বাংলাদেশ, স্বপ্নমায়াবী শৈশবে যাঁর আঁচলের স্নিগ্ধ স্পর্শ, সারা জীবন তাঁকে ফিরে পেতে চেয়েছেন। কলকাতায় যখন বৃষ্টি নামে, হর্কাস কর্ণারে চালা ছুঁয়ে খোলা নর্দমা ও নালা হয়ে বেলেঘাটা নারকেল ভাঙায় বয়ে যাওয়ার ছবি দেখে তিক্ত কবির স্মরণে আসে পূর্বপুরুষের স্বপ্নধূলা জমা মাটি, সেই স্বর্গাদপির। শব্দ দিয়ে সীমানা ভাঙলেও দেশকে ফিরে পাননি। এই দেশও তাঁর কাছে স্বর্গাদপি কিন্তু বিমাতার কোল।—

"সে স্বদেশ অন্বেষণ ফুরালো না ফুরায় না
মা আমার ছাই কাঠকয়লা হয়ে পঞ্চভূতে হারিয়ে গেছেন।"[১৯]

বোধ উন্মেষের পর থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত তাঁর ভাবজগতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য মুগ্ধতা বেশ চোখে পড়ে। শৈশবে, প্রথম কৈশোর-এ দেখা গ্রাম বাংলার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ তাঁর হৃদয়ে এক বিশিষ্ট অনুভূতি রূপে বিরাজ করেছে। বাংলার নদী, গাছ, পাখি, ফুল, ফল শর কাশে দীর্ঘ ভেজা ছায়া, দূর্বাঘাস, উঠানের গাছের পাতা হয়ে কারোগেট টিন দিয়ে নেমে আসা চাঁদের আলো, নদীর বাঁক, সন্ধ্যার বাঁকা চাঁদ, বাঁশের সাঁকোয় মজা নদী, জ্যোৎস্না চষা ক্ষেত, বাংলার আকাশ, কুয়াশা, ধোঁয়ায় মোড়া মোড়, আঁচল নামানো গ্রাম, ধানসেদ্ধর গন্ধ, তুলসি তলার পিদিম, বাংলার সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা তাঁর সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি। আধুনিকতার চাবুকে আহত বাংলার ভ্রষ্ট সৌন্দর্য দেখে মনবিকল হয় তাঁরও—

"কে এখানে এসেছিল বনভোজনের জন্য লবটুলিয়ায়
কে এখানে পরীদের নৃত্যের আসরে
ছুঁড়ে গেছে ভাঙা ক্যান, লিপটনের রাংতা
ভাঙা হেজের বোতল।"[২০]

তবু এরই মাঝে প্রশান্তি খুঁজে পান। অতীত স্মৃতি রোমন্থন ভবিষ্যতের পাথেয় এনে দেয় তাঁকে।

প্রকৃতির অনুষঙ্গে আসে সমুদ্র, বর্ষা, গ্রীষ্মের কথাও। সত্যকার চিরন্তনী সমুদ্র দেখার সাধ তার মনে। যার কল্লোলে মুক্তির স্বাদ আছে। রক্তে সেই গাঢ় বন্যার উত্তাপকে অনুভব করদে চান। বর্ষা ঋতু তাঁর কবিতায় আসে ক্ষুব্ধ হয়ে ত্রাসের সঞ্চার করতে। সমস্ত ব্যাধি, নষ্ট শব, বিধ্বস্ত হয়ে প্লাবনের অতলে ডুবে ধুয়ে যায় চোখের বহুদূরে। বৈশাখ মাসের হাওয়ায় ফেরে মরা কান্না, তাতে ফাল্গুনের মোহ-র একটুকুও অবশিষ্ট নেই। প্রথম যৌবনে তৃতীয়ার চাঁদ কবিকে মুগ্ধ করেছিল। নীলে নীল মাঠ, চাঁদের ঢেওয়ের জলসত্র-কে কবি চুরি করেছিলে । সমুদ্র হয়ে সোনার তরণীর নাবিক তরুণীর সাথে, গিয়েছিলেন ইন্দ্রলোক, ধ্বলগিরি, সমুদ্র, চাঁদ, নারীতে জীবন উথাল পাথাল হল, তবুও তাঁর চেতনায় জেগে থাকল ক্ষুধিত শিশুর মুখ। ফলে প্রকৃতি তাঁর বিদ্রোহী সত্তার অনুষঙ্গে এলো, এল প্রতিবাদে, এল মুখরতায়। এল ধ্বংসে, কাঙ্ক্ষিত নির্মাণের সমর্থনে।

কবি পরিবর্তমান জীবনের সাক্ষী, চোখের সামনে মানুষের জীবন, ভাবনা, চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদাও তীব্র-তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক মেধাকেও বিশ্বায়নের খোলা বাজারের দাপটে ঘুলিয়ে যেতে দেখেছেন। দেখেছেন যন্ত্র সভ্যতার হাইটেনশন তারে সনাতন শিবের প্রত্নপুরাতন লাঙ্গলকে হারিয়ে যেতে—

"রেডিও মাইক টিভি ফ্লাস লাইট ঘুরন্ত ক্যামেরা
অসহ্য ক্লিকের নখে আকাশ মাটির আলোক মৈথুন খুন করে।"[২১]

মন্বন্তর, মারী, অধীনতা, মধ্যযুগীয় ঘনতমসা যে জীবনের গতিপথ বদলে দেয়নি সেই জীবন এখন ভিন্টেজগাড়ির হল্লায় রঙ্গিলা জীবন। আবার তারই মাঝে সমুদ্র বিষবাষ্প হয়ে জমে ওঠা মৃত্যু, গেরিলা, ইশতেহার, হাড় মাংস কুরে খাওয়া ক্ষুধা মহাজন, ফিউডাল প্রণয় লক্ষ্যে কবিতা লেখা কবির আসর। এই বিকৃত বিবর্তনে ক্ষুব্ধ কবি। স্বাভাবিক ভাবেই কবির মনে হয়েছে—

“কলকাতা কলকাতা তোকে ঘৃণা করি ঘৃণা করি আমি
ঘুমের অর্ধেক রাতে মনে হয় তোর কালো হাত আমারি গলায়
সারা শহর শহরতলী কালো কঠিন ধোঁয়াতে চেতনা মুখ থুবড়ে পড়ে।”[২২]

বস্তুত এই কলকাতা, নাগরিক বিকৃতির সর্বোচ্চ রূপকায়িত প্রতীক। আধুনিক সভ্যতার নামে নাগরিকতা, নাগরিক চাতুরালির মেদে স্ফীত এই শহর বিকৃত পচাগলা জীবন বয়ে নিয়ে চলেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্ষিপ্ত সময়ের আঘাতে বিষণ্ন গ্রাম, অন্যদিকে আধুনিকতার প্রাণান্তিক ঘুমে আচ্ছন্ন শহর—এটাই যেন মানুষের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি অথচ মানুষ ভাবছে গতি সামনের দিকে—

“মাঝরাতে জেগে উঠে, রেলিঙে দেখেছি নষ্ট চাঁদ
কালো বেড়ালের পিঠে চেপে আসে মির্জাপুর স্ট্রীটে
দু একটা নীলাভ গ্যাসবাতি হয় নিরীহ স্বান্তনা
দেখ, মজা পচা রসে তলানির প্রচুর সংবাদ।”[২৩]

অদম্য জীবনাকাঙ্ক্ষার বিপ্রতীপে মৃত্যু চেতনা সম্পর্কে বিশিষ্ট উপলব্ধিগুলি তরুণ সান্যালের কবিতায় স্বল্প কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। তরুণ বয়স ছিল মৃত্যু নিয়ে আত্মমগ্নতার সময়, তাই—

“রোদ বেড়ে ওঠার সঙ্গে পায়ে পায়ে আহ্লাদী বেড়াল হয়ে
ছায়া ছায়া মৃত্যু ঘুর ছিল।”[২৪]

আবার প্রৌঢ়ত্ব মৃত্যুকে দেখেছে, উদাস ঠাণ্ডা স্নায়ু দিয়ে নির্জন বিষাদ উদাস প্রতীক্ষায়। একাকী জীবন জীবনায়নেই গৌণ হলে মৃত্যু ও মুক্তি পাশাপাশি বসে। কখনও মৃত্যুকে নিয়ে প্রশ্ন জাগে, সে কি কেবল অমোঘ পায়ে স্মৃতির হয়ে অন্য স্মৃতি পার হওয়া? সে কি কেবল যাওয়া? অনর্থক মৃত্যু দেখে মৃত্যুর তাৎপর্যের বোধটুকু মরে যেতে দেখেছেন—“একা জীবন চলেছে কবর শ্মশান নিয়ে টেলিপ্রিন্টারের দাঁতে সংবাদে মৃত্যুকে লোফালুফি করে।” বিশ্বায়ন উত্তর জীবনের সংজ্ঞা বদলে গেছে, জীবন হয়ে উঠেছে অর্থহীন—

“জলের কুঁজো, সুটকেশ সাবান, টুথব্রাশ
এবং আক প্যাক সিগারেট
আর কী চাই চিত্রগুপ্ত পৃথিবীতে জন্ম নিতে
আর কী কী সঙ্গে নিতে হয়।”[২৫]

এই জীবন বাঁচা আর বাচাঁর মধ্যেই রয়ে যাওয়া এক কিম্ভূত কিমাকার। জীবন ও মৃত্যুকে সহজ ভাবে ভাবা যায় না। তিনিও পারেননি। সহজ ভাবে সহজ কথা কে বলতে পেরেছে? মানুষ বড় দীর্ঘদিন বাঁচে! তিনিও বাঁচতে চান। মৃত্যুর দরজা স্পর্শ করেও জীবনের পায়ের কাছে বসেন, তবে সে বাঁচা হোক তাৎপর্যের সাথে সমন্বিতা। শ্যাম রুক্ষ রণক্ষেত্র পৃথিবী, লক্ষ বছরের মৃত করোটির অক্ষিপটাহীন কালো অন্ধ চোখে যখন চেয়ে থাকে তখন—

“ভেঙে ভেঙে সকলের মত হতে গিয়ে যেন
সকলের মত মুখ ফেরাবার ব্যবসায়ী হব।”[২৬]

হতে চাননি। একই কারণে ঈশ্বরের প্রতিও গভীর সংশয় তাঁর। স্বয়ম্ভু দেবতা নিদ্রা গেছেন অনন্ত শয্যায়, বার বার প্রভুকে চেনার চেষ্টা করেন, জানা হয় না—

“যদি ঐ কালোয় ঝাঁপ দিই
অন্য পারে আছো তুমি সনাতন?”[২৭]

তিনি চেয়েছেন, ভাঙার ঈশ্বর চিরকাল সাধারণের কান্নার গলা টিপে ধরে। ক্রুশকাঠে মুক্তির কাঁটা মাথায় নিয়ে হেঁটে যাওয়া ঈশ্বরপুত্র সাধারণের মুক্তির জন্য রেখে গেছেন শোষকের দাঁত। ঘাতকের খড়্গ আজ তাই ঈশ্বরের নির্দেশে ওঠে। ধর্ম, ঈশ্বর, সত্য, মঙ্গল, শিব, করুণা সমস্ত শব্দ ধারণাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে।

তরুণ সান্যালের কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের যুগ, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ অনুগামী সাহিত্যিকদের বিচরণের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত। তবে কেবল সেই সব সাহিত্যিকদেরই অনুরাগী পাঠক ছিলেন না কবি। অগ্রজদের ভাবনা জগতের নানা মণিমুক্তা তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে। জীবনানন্দের নিশ্চেতন দুর্বোধ্য অন্তর্জগতের অনুভূতি যেমন এসেছে—

"অবশেষে রাত্রি নামে শিশিরের শব্দ শুনি কানে
দিনের আলোর পাখি অবশেষে নীড়ে ফিরে যায়।"[২৭]
(তুলনীয় 'বনলতা সেন' কবিতা)

তেমনই শাসকদের মধ্যযুগীয় বর্বরতার তুলনায় আসে মনসামঙ্গলের প্রসঙ্গে। শরীরী কামনায় বিদ্ধ নারী তুলনা কেবল বোধ হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুসুম। বিপন্ন সভ্যতা পৃথিবীতে দেখেন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-র রঞ্জনদের প্রত্যাশা। আবার মানুষের অপার সম্ভাবনার অদম্য প্রাণশক্তির, আমিত্বের বিচিত্র লীলার সুর রবীন্দ্রনাথের 'আমি' কবিতার মতই।—

"আমি প্রেমে পড়বো বলে কালো মেঘে
বিদ্যুৎ চমকাবে
আমি খেলা ভাঙবো বলে দিগন্তের ঘোমটা খসে যাবে।"[২৮]

এই প্রসঙ্গে কবির বিশিষ্ট পুরাণ চেতনাও স্মরণ করা যেতে পারে। পৌরাণিক কৃষ্ণ, শিব, অর্জুন, রাধা, পুরোচন, অভিমন্যু, কর্ণ, কুন্তী, বাল্মীকিরা ফিরে ফিরে আসে কবিতায়। জীবনের ট্র্যাজেডির তুলনায় আসে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা-রা। অন্ধকারে স্বপ্নের সঙ্গিনীতে দ্রৌপদী বা ভানুমতী। রমণীর কামনা বাসনায় জতুগৃহ বারনাবত, পুরোচন। মহাভারতের এত মৃত্যু কেবল অপচয় ও বিনষ্টি কারণ মহাভারত শেষে নিহত হয় 'ব্রজের রাখাল'। কত বিপ্লব এভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কুরুক্ষেত্রের আঠারো দিনের আঠারো অক্ষৌহিণী বাহিনীর শবদেহের মাঝে একা অভিমন্যুর মত পড়ে থাকতে দেখেন নকশাল আন্দোলনের শহীদদের। কাশীপুর, বরানগর, কোন্নগর, বহরমপুরে কত তরুণ; সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বৃথা ঝরে গেল। তারা অভিমন্যুর মতই বিষণ্ন শহীদ। আবার অভিমন্যু কখনও আসে কবির শৈশব স্মৃতির বেদনা বেয়ে। কুরুক্ষেত্র নয়, অর্জুন-গাণ্ডীব-কৃষ্ণ নয়, বাবা-মার বিচ্ছেদে, একা ও প্রবাসী শৈশবের দুঃখী তূণীরের ঝিকির মিকির নিয়ে অভিমন্যু আসে।

কবির লেখা কিছু গল্পাভাস যুক্ত কবিতা আছে। নিটোল ছোটগল্পের আবেদন বিশিষ্ট সেই কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য 'বাঁশী ও সুদর্শন'। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী জন্মাষ্টমী সভায় ভক্ত মণ্ডলীর সম্মুখে জীবন্ত করে তুলেছেন চক্রধারী, দুষ্টের দমনকর্তা, মধুকৈটভ অরি, পরম করুণাময় ত্রাতা জগৎ পালনকর্তা কৃষ্ণকে। ফেরার পরে তাঁর মনে আর সেই কৃষ্ণ নেই, মনে পড়ছে শ্রীরাধার কথা। তখন মানুষ সুখেষু বিগতস্পৃহ দুখেষু অনুদ্বিগ্নমনা থাকে কী ভাবে? মনে পড়ছে ছেলেবেলায় ভোরবেলা শেফালি কুড়ানো বালিকার কাঁটা বেঁধা পায়ের ক্ষত নিয়ে করুণ মুখখানি। 'স্বদেশে বিদেশী' কবিতায় প্রবাসীজন দেশে ফিরে দেশের মাটিতে শেষ শয্যা পাতার সৌভাগ্য লাভ করেছে। দেশের মাটির প্রতিটি অনুভব যেন কবির রোমকূপেও শিহরণ জাগিয়ে যাচ্ছে। 'কবি' কবিতায় কবির ভাই দুনিয়া পালটানোর মত সর্বনাশা স্বপ্ন দেখেছিল। তার মাশুল তাকে নিজের জীবন দিয়ে চোকাতে হয়। গণশত্রুদের চিহ্নিত করার পরেও এটি একটি সার্থক গল্প কবিতা।

পাঠক বা কবিতা বোদ্ধা হিসেবে কবিকে শুধুমাত্র মার্কসবাদী রাজনীতি সচেতন কবি হিসেবে সীমায়িত করাটা ধৃষ্টতার নামান্তর। তাঁর বোধিচিত্তের ব্যাপকতা স্পর্শ করার ব্যর্থতা এমন ভ্রান্তি আনতে পারে। মনের গহীনের অনুচ্চারিত ভাবনা রূপায়ণে তিনি রোম্যান্টিক, রাজনীতি-সমাজনীতিতে সক্রিয় ও পরিশেষে মানবতাকে শিরোধার্য করে, জীবনপথে, স্রষ্টা রূপে পাড়ি দেওয়া সেই চিরশিশু যিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত শুভবুদ্ধির পৃথিবী আর শৈশবের দিনগুলোর প্রতীক্ষারত স্বপ্ন সন্ধানী চিরপথিক।

তথ্যসূত্র:

১। সান্যাল তরুণ, তরুণ সান্যালের কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ১০১।

২। তদেব, পৃ. ১৯।
৩। তদেব, পৃ. ২৫।
৪। তদেব, পৃ. ১১১।
৫। তদেব, পৃ. ৪২।
৬। তদেব, পৃ. ৫৮।
৭। তদেব, পৃ. ২৫।
৮। তদেব, পৃ. ২১৬।
৯। তদেব, পৃ. ৯৭।
১০। তদেব, পৃ. ২২৩।
১১। তদেব, পৃ. ২১৭।
১২। সান্যাল তরুণ, তরুণ সান্যালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১৩৯।
১৩। সান্যাল তরুণ, তরুণ সান্যালের কবিতা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
১৪। তদেব, পৃ. ৩২৬।
১৫। তদেব, পৃ. ৫৩ ।
১৬। তদেব, পৃ. ৫৯ ।
১৭। সান্যাল তরুণ, তরুণ সান্যালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
১৮। সান্যাল তরুণ, তরুণ সান্যালের কবিতা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।
১৯। তদেব, পৃ. ২৩৩।
২০। তদেব, পৃ. ৭৬।
২১। তদেব, পৃ. ১৫০।
২২। তদেব, পৃ. ৬৩ ।
২৩। তদেব, পৃ. ১১১।
২৪। সান্যাল তরুণ, তরুণ সান্যালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
২৫। সান্যাল তরুণ, তরুণ সান্যালের কবিতা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬ ।
২৬। তদেব, পৃ. ২০২।
২৭। তদেব, পৃ. ৪২।
২৮। তদেব, পৃ. ৮৪।

....

মায়ের প্রেমিক : এক নারীর জীবন সংগ্রাম ও প্রেমাস্পর্শে উত্তরণের আখ্যান

তনয়া দাস
প্রাক্তনী, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ (Abstract)

জয় গোস্বামীর 'মায়ের প্রেমিক' উপন্যাসে নারীর জীবন সংগ্রাম তথা প্রেমের স্পর্শে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে উত্তরণকে বিশেষ রূপে দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসের মূল নারী চরিত্র মঞ্জরী। সে মা-বাবা-স্বামী সকলের কাছে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হতে নিজের শিক্ষা ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের জোরে জীবনে এগিয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি যত খারাপ হয়েছে সেও নিজেকে তত শক্ত করে গড়ে তুলেছে। অনুভূতিহীন সম্মানহীন সম্পর্ক দেখতে দেখতে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে মঞ্জরী ও শিবনাথ একে অপরের ভালোবাসাতে জীবনে সুখ-শান্তি ফিরে পেয়েছে। মঞ্জরীকে কেন্দ্র করে শিবনাথ, শেখর, তনুশ্রী, অনিমেষ ইত্যাদি চরিত্রের জীবনেও ভালোবাসার স্পর্শে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। একইসঙ্গে এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক চাপে কীভাবে মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। মা-বাবার ভুলের পরিণতি, শিক্ষার সারশূন্যতা, আভিজাত্যের অহংকার, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব, বৈবাহিক ধর্ষণ এবং বিশেষরূপে সম্পর্কের বহুমুখী দৃষ্টিকোণ এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। তবে ভালোবাসার হাত ধরে নারীর জীবন সংগ্রামের পরিপূর্ণতা তথা অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ এই উপন্যাসে বড় হয়ে উঠেছে।

মূল শব্দ (keyword)

সম্পর্ক, বৈবাহিক ধর্ষণ, আভিজাত্য ও পদের অহংকার, প্রেম, একাকিত্ব, পারিবারিক চাপ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি।

মূল প্রবন্ধ

'ওরা কে? ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের নিয়ে ভাববেন না।'[১]

—একটি মানুষের দৃঢ়তাই পারে তাকে প্রতিকূল অবস্থা থেকে বের করে আনতে। এই দৃঢ়তার সঙ্গে যখন মিশে যায় ভালোবাসা-ভরসা-শান্তির সুর তখন জয় গোস্বামীর 'মায়ের প্রেমিক' উপন্যাসের মঞ্জরীর মতো মানুষ পারে মানসিক সংযোগহীন মানুষদের অগ্রাহ্য করতে এবং ভালোবাসাকে জীবনে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা দিতে। ১৪২৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'মায়ের প্রেমিক' উপন্যাসে লেখক দেখালেন হার যে মানে, না তাকে কোনো পরিস্থিতি হারাতে পারে না। একইসঙ্গে লেখক দেখালেন ভালোবাসার আশ্রয়ে কীভাবে মানুষের জীবন পরিবর্তিত হতে পারে। মঞ্জরীকে কেন্দ্র করে একাধিক চরিত্র এই উপন্যাসে এসেছে এবং লেখক দেখিয়েছেন ব্যক্তিত্বের জোরে ও বিভিন্ন বয়সে আগত প্রেমের স্পর্শে মানুষ কীভাবে অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পেয়েছে। 'মায়ের প্রেমিক : এক নারীর জীবন সংগ্রাম ও প্রেমাস্পর্শে উত্তরণের আখ্যান' বিষয়টি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও বেশিরভাগ নারী নিজের নামে নিজের পরিচয়ে পরিচিত হয় না। তারা কারো মেয়ে, কারো স্ত্রী, কারো মা। তাদের যে মানুষ হিসেবে নিজস্ব সত্তার দাবি থাকতে পারে সমাজ তা মনে করে না। এই মনোভাব থেকে দেখা যায়, এই উপন্যাসে মঞ্জরীকে তার মা-বাবা কখনো তার ইচ্ছের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। সবসময় তার উপর নিজেদের ইচ্ছে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এমনকি বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে কোনো মানসিক সম্পর্ক তৈরি না হওয়া সত্ত্বেও স্বামী চেয়েছে মঞ্জরী তার অনুমতি নিয়ে চলুক। এমনকি ছেলে শেখর চেয়েছে মা নিজের ভালোলাগাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তার ইচ্ছে অনুযায়ী চলুক। মঞ্জরীর নিজের জীবনে তার ইচ্ছের মূল্য যখন কেউ দেয়নি , তখন সে নিজেই নিজেকে প্রাধান্য দিয়েছে। সে নিজের জীবনকে নিজের ইচ্ছে মতো চালনা করেছে। যে অনুপ্রেরণা সে নিজেকে দিয়েছে সেই অনুপ্রেরণাতে অনুপ্রাণিত হয়ে যেকোনো মানুষ নিজেকে যেকোনো পরিস্থিতি থেকে বের করে আনতে পারে।

বর্তমান সময়ে দেখা যায় শিক্ষিত বলতে কেবলমাত্র বেশি বেশি ডিগ্রি অর্জনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু জীবনের শিক্ষায় তারা শিক্ষিত নয়। তাদের শিক্ষা আসলে চরিত্র গঠন করে না। তা সারশূন্য। ডিগ্রি অর্জন করে বড়ো চাকরি করলে যে বড়ো মানুষ হয় না তার প্রমাণ মঞ্জরীর বাবা-মা-স্বামীর মতো মানুষেরা। জীবনে সম্পর্কের গুরুত্ব মঞ্জরীর মা-বাবা-স্বামী কোনোদিন উপলব্ধি করেনি। মা-বাবা-স্বামীর সঙ্গে কোনোরকম মানসিক সম্পর্ক তার ছিল না। মঞ্জরীর কোনো ছেলে বন্ধু বা বান্ধবী ছিল না। বাড়িতে কোনো বান্ধবীও আসবে না কারণ বাবার মতে, **‘বাইরের সম্পর্ক বাইরেই রেখে আসতে হয়।’**[২] আর মায়ের মতে, **‘এখনকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটা ফারাক আছে তোমার, তোমার বাবা বড় অফিসার।’**[৩] অর্থাৎ এই তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা দেখাতে গিয়ে এইরকম মা-বাবারা কোনোদিন সন্তানকে বোঝে না। তারা নিজেরাও সন্তানের বন্ধু হয় না এবং অন্য কারো সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক তৈরিও হতে দেয় না। তাকে একাকিত্বের মধ্যে ঠেলে দেয়। বর্তমান সমাজে অনেক মা-বাবা টাকা দিয়ে সন্তানের সব চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে। কিন্তু মা-বাবার কাছে যথেষ্ট সময় না পেয়ে সন্তান যখন দূরে চলে যেতে থাকে , তখন মা-বাবা তা বোঝে না। আর একটা সময় ছেলেমেয়ে তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে কালের নিয়মে দুর্ভেদ্য দেওয়াল তৈরি হয়। উপন্যাসে মঞ্জরীর মা এই দুর্ভেদ্য দেওয়াল দেখেছিল। যখন বিষাক্ত দাম্পত্য জীবনের কষ্ট, মা-বাবার প্রতি অভিযোগ, মঞ্জরীর কষ্ট মঞ্জরীর মা শুনতে চায়ত তখন –

‘বুঝেছেন মঞ্জরীর মা যে, তাঁর মেয়ে নিজের চার দিকে একটা পাঁচিল তুলে দিয়েছে। মঞ্জরীর মায়ের সব প্রশ্ন, সব কৌতূহল, সব ঔৎসুক্য ওই পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে। ...অসম্ভব দুর্ভেদ্য এখন মঞ্জরী।’[৪]

–এমনকি বাবা কেমন আছে সেই প্রশ্ন পর্যন্ত মঞ্জরী করত না। অর্থাৎ সম্পর্ক সারশূন্য হয়ে গেলে তার শুধু কাঠামোটা পড়ে থাকে। সেখানে অনুভূতি বলে আর কিছু থাকে না।

অতিরিক্ত শাসন মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। সমাজে মঞ্জরীর মা-বাবার মতো মানুষেরা আসলে মানবিক গুণসম্পন্ন হয় না। এই কারণে মঞ্জরী যখন সাত বছরের বাচ্চা তখন হাত ফসকে কাঁচের গ্লাস মাটিতে পড়ে গেলে মঞ্জরীর বাবা মেয়েকে বলে, **‘যে-দুধ তুমি নষ্ট করলে, সেই দুধের কত দাম জানো? আর কাচের গ্লাসটার কত দাম?’**[৫] এর শাস্তিস্বরূপ এক ঘন্টা মঞ্জরীকে বাথরুমে বন্ধ করে রাখা হয়। আর মা বলে **‘শাসন চাই। শাসনটাই আসল কথা। উপযুক্ত শাসনে থাকলে ছেলেমেয়ে ভালো হয়, শিক্ষিত হয়।’**[৬] অথচ শিক্ষা যে মানুষের চরিত্র গঠন করে মানুষকে ভালো মানুষ তৈরি করে তোলে, এই বোধই এইসব মানুষদের থাকে না। ছোটো মেয়ের ভুলকে মা-বাবা ক্ষমা করতে পারে না। তারাই আবার আশা করে যে, তাদের যে ভুলে মঞ্জরীর জীবন নরক হয়ে গিয়েছে তা মঞ্জরী ক্ষমা করে দেবে।

বর্তমানে মানুষ টাকা, স্ট্যাটাসকে এত বেশি গুরুত্ব দেয় যে মানুষ মানসিক সম্পর্ক, প্রেম, ভালোবাসা, অনুভূতি এই বিষয়গুলির গুরুত্ব বোঝে না। বাবা-মায়ের কড়া শাসনে মঞ্জরীর জীবন কেটেছে প্রেমহীন অবস্থায়। তার অনুভূতি কোনোদিন প্রকাশ পাওয়ার পথ খুঁজে পায়নি। বাবা-মা নিজেদের পছন্দের এক এসডিও সাহেবের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে। একবারও মঞ্জরীর মতামত জানতে চায়নি। যখন পাত্র জিজ্ঞাসা করেছে মঞ্জরী গান জানে কিনা তখন মঞ্জরীর বাবা সগর্বে বলেছে মেয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরে তারা বেশি জোর দিয়েছে। গান-টান শেখায়নি। অর্থাৎ মেয়েকে একমাত্র তারা পড়াশোনার যন্ত্র করে তুলেছে। কখনো মেয়ের পছন্দের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। কারণ উপন্যাসের পরবর্তী অংশ দেখা যায় শিবনাথের গান শুনতে মঞ্জরী খুব ভালোবাসে। অথচ তার এই ভালোলাগার কথা সে কোনোদিন নিজেই বুঝতে পারেনি। কারণ সেই সুযোগটাই সে পায়নি। বর্তমান সমাজেও দেখা যায় কীভাবে মা-বাবা বাচ্চাদের উপর পড়াশোনার চাপ বাড়াতে থাকে এবং তাদের আবেগহীন অনুভূতিহীন তৈরি করে। এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ‘জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেছেন–**‘ব্রহ্মচর্যাশ্রমী বালকের দেহ-মনকে নানাদিকে স্ফূর্তি দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ খেলা, অভিনয়, গান ও উপাসনা এগুলিকে বিদ্যাশিক্ষার মতোই প্রয়োজনীয় বলে গোড়া থেকেই জেনেছিলেন।’**[৭] –

অথচ এই গুরুত্ব আজও মানুষ বোঝে না। উপন্যাসের এই অংশে লেখক বাচ্চাদের জীবনের একটি নির্মম সত্যকে তুলে ধরেছেন। পারিবারিক চাপে তাদের ছেলেবেলা একইসঙ্গে যৌবন বয়স নষ্ট হয়ে যায়। শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করে তাদের পয়সা উপার্জনের যন্ত্র করে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়। কারণ বর্তমান সমাজে শুধুমাত্র টাকা-পয়সা থাকলে সমাজে তথাকথিত মান-সম্মান-মর্যাদা থাকে।

আবার উপন্যাসে দেখা যায়, যে পড়াশোনাকে এত গুরুত্ব দিয়েছে মঞ্জরীর বাবা, সেই বাবাই মেয়ের ডিগ্রি অর্জনে, স্কুলের চাকরিতে অমত প্রকাশ করেছে। কারণ সেটা কোনো বড়ো চাকরি নয়। সমাজে আজও মেয়েদের চাকরি করা বিলাসিতা মাত্র। সেইজন্য মঞ্জরীর মা-বাবা দু-জনেই বলতে পেরেছে চাকরি ছেড়ে স্বামীর কাছে গিয়ে থাকতে হবে। এখানে মঞ্জরী বিশেষ নারী হয়ে ওঠে। এতদিন ধরে যা কিছু সে সহ্য করেছে তার প্রতিবাদস্বরূপ সে বলেছে, এতদিন এত কষ্ট করে পড়াশোনা করেছে চাকরি ছেড়ে দিতে নয়। আর দৃঢ় গলায় বলেছে **'যদি চাকরি ছাড়তে হয় তা হলে বিয়ে করব না।'**[৮] এইভাবেই সে নিজের জন্য লড়াই করেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীকে শুধুমাত্র অর্থ দেয় না, দেয় নিজের জন্য নিজে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি। বিবেকানন্দ বলেছেন – **'We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet.'**[৯]– অর্থাৎ তিনি সেই শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন যার দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধির প্রসার ঘটে এবং যার দ্বারা নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। এই উপন্যাসে মঞ্জরী চরিত্র এই শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। শিক্ষার হাত ধরেই সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পেরেছিল। যদিও তার বাবা-স্বামী শিক্ষার নামে যা গ্রহণ করেছিল তা শুধু ডিগ্রি মাত্র।

মা-বাবা অনেক সময় জোর করে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে তাদের জীবন নষ্ট করে দেয়। যে কাজ মঞ্জরীর মা-বাবা এবং শিবনাথের মা করেছিল। মঞ্জরীর স্বামী শুধুমাত্র শরীরের চাহিদা পূরণ করার জন্য বিয়ে করেছিল।সে ছুটিতে বাড়ি এসে শুধু মদ খেত ও রাত্রে মঞ্জরীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে মিলিত হত। যাকে এক কথায় বৈবাহিক ধর্ষণ বলা যায়। কোনো মানসিক সম্পর্ক তাদের মধ্যে তৈরি হয়নি। মঞ্জরীর মা এইসব দেখে নিজেদের অপরাধী মনে করে। কিন্তু মঞ্জরী মায়ের কাছে কোনো অভিযোগ করেনি বলে এই অভিযোগের ভার ছিল বেশি। অন্যদিকে শিবনাথের মা যেহেতু সইকে কথা দিয়েছিল,তাই শুধুমাত্র কথা রাখার জন্য ছেলেকে বিয়ে করতে বাধ্য করে। ছেলের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেয়নি। অত্যন্ত মুখরা শিবনাথের স্ত্রীর সঙ্গে শিবনাথ কখনো সুখী হতে পারেনি। অর্থাৎ অনেক সময় মা-বাবা ভুলে যায় ছেলেমেয়েদের জীবনে তাদের নিজেদের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু মঞ্জরী ও শিবনাথ দু-জনেই ছেলেদের পছন্দ মতো বিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছে। কিন্তু শিবনাথের বৌমা মা-বাবার সম্মান বাঁচাতে বিয়ে করেছিল। তার কাছে অনিমেষ বা তাদের সম্পর্কের কোনো মূল্য ছিল না। তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সে সারাজীবন ভগবানের সেবা করে কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু সমাজে অবিবাহিত ও স্বামীপরিত্যক্তা মেয়েকে বোঝা হিসেবে দেখা হয় এবং মা-বাবাকে নানা লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। সেই কথা ভেবে সমাজের ভয়ে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়িতে থাকত। সেই বৌমার সঙ্গে একই বাড়িতে থেকে শিবনাথও শান্তি পায়নি। কিন্তু বৌমার বিরুদ্ধে সে কোনো অভিযোগে করেনি। কারণ তাহলে বৌমাকে সারাজীবন বাবার বাড়িতে বোঝা হয়ে থাকতে হবে। এইভাবে অনেক সময় সমাজের ভয়ে ও চাপে মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যায়।

এসডিওর ছেলের প্রতিও কোনো বিশেষ টান ছিল না। মঞ্জরীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শুধুমাত্র দেহের ভোগের জন্য সে বাড়ির আয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, দমদমের ফ্ল্যাটে রান্নার মেয়েকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে মারা গিয়েছে। এই অন্ধকার জগৎ থেকে মঞ্জরী নিজের চেষ্টায় নিজেকে টেনে বের করে এনেছে। যে মানুষটার কাছে তার কোনো গুরুত্ব নেই তাকেও গুরুত্ব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ সে করেনি। যখন স্তনের অপারেশন করতে হয়েছে তখন দৃঢ়ভাবে তার মাকে বলেছে কাউকে জানানোর দরকার নেই। এমনকি মঞ্জরী যখন চাকরি পরিবর্তন করে অন্য স্কুলে গিয়েছে তখনও এসডিওকে জানায়নি। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যারা নিজেদের রাজা মনে করে, যাদের হুকুম করা অভ্যাস তারা নারীর স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিতে পারে না। তাই এসডিওর রাগ হয়েছে মঞ্জরীর কাজ দেখে। কিন্তু মঞ্জরী এসডিওর রাগকে অগ্রাহ্য করেছে।সে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক দেখে নীরব প্রতিবাদে নিজের ঘর আলাদা করে নিয়েছে। নিজের দেহের অসুস্থতাকে এবং আত্মসম্মানকে গুরুত্ব দিয়ে আর কোনোদিন স্বামীকে মিলিত হতে দেয়নি। চাকরি পরিবর্তন সম্পর্কে মঞ্জরী বলেছে, **'আমার চাকরি। আমার সিদ্ধান্ত। জানানোর দরকার ছিল বলে মনে করিনি।'**[১০] অর্থাৎ নিজের চাকরি এবং সন্তানকে অবলম্বন করে মঞ্জরী একা লড়াই করেছে। এভাবে মঞ্জরী সমাজকে দেখিয়েছে মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া কতটা প্রয়োজন। একইসঙ্গে বোঝা যায় মেয়ে হয়ে স্ত্রী হয়ে যে প্রতিবাদ করার সাহস মঞ্জরী পায়নি মঞ্জরীর মাতৃসত্তা তাকে সেই সাহস দিয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের মৃণালের জবানিতে শোনা যায়, **'মা যে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব সংসারের।'**[১১] এই অনুভূতি মঞ্জরীরও হয়েছে। তাই সে মুখের উপর প্রতিবাদ করতে পেরেছে। মৃণালেরও জীবনে তার একমাত্র পরিচয় ছিল সে বাড়ির মেজবৌ।

সেও নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। মাতৃত্বের স্বাদ নারীকে জীবনে যা কিছু বড় যা কিছু সত্য সেই সমস্ত কিছু এনে দিতে পারে।

স্বামীর অন্যায়ে বাড়ির আয়া বা উদ্বাস্তু রমণী কাউকেই মঞ্জরী অপমান করেনি। বরং নারী হয়ে নারীকে সম্মান দিয়েছে। উদ্বাস্তু মেয়েটির বাচ্চা নষ্ট করার জন্য নিজের উপার্জিত টাকা দিয়েছে। কিন্তু নিজের জীবন থেকে তাদের মুছে দিয়েছে। একদিকে সে উদারতার পরিচয় দিয়েছে। অন্যদিকে তার চরিত্রের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। নিজে পাঁকে নেমে কাদা ঘাটেনি। এখানে মঞ্জরীর স্বামীর কোনো নাম নেই। তাকে বারবার কোনো একটি পদ হিসেবে ডাকা হয়েছে। সমাজে এসব মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের টাকার পরিমাণ বাড়ে কিন্তু নিম্নমানের মানসিকতা তৈরি হয়। অর্থাৎ সমাজে এসব মানুষদের নাম হয় না। তারা মুখোশের আড়ালে থাকা সেই খল চরিত্র যারা শুধু নারীর শরীর ভোগ করতে চায়। নারী মানে তাদের কাছে ভোগ্যবস্তু। জীবনে শিক্ষার আলো তাদের কাছে পৌঁছায় না। শিক্ষা তাদের টাকা উপার্জনের রাস্তা। আর সমাজের উঁচু তলাতে বসে তারা এইভাবেই অমানবিক কাজ করে যায়।

মঞ্জরী ও শিবনাথ কোনোদিনই জীবনে ভালোবাসা পায়নি। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তে তারা সহকর্মী থেকে বন্ধুত্বের হাত ধরে একটা সম্পর্কের মধ্যে এসেছে। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক ব্যতীত পবিত্র প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মনের এই সম্পর্ককে কোনো একটা পরিচয় দিয়ে তার সীমা নির্ধারণ করা যায় না। যে পবিত্র ভালবাসা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে বিপিন ও জমিদারের মেয়ের মধ্যেও দেখা যায়। যেখানে দু-জন দু-জনের জীবনে বাধা নয়, বরং সহায় হয়। শারীরিক সম্পর্ক ব্যতীত তারা একে অপরের কাছে শান্তির আশ্রয় খুঁজে পায়। দূর থেকে একে অপরের প্রতি যত্ন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সম্পর্ক মঞ্জরীর ছেলে শেখর প্রথমে মেনে নিতে পারত না। বাবার মতো কর্কশ ব্যবহার তার ব্যবহারে ফুটে উঠত। কিন্তু সেখানেও মঞ্জরী নিজেকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষমতা দেখাতে পেরেছিল। সে যেমন ছাত্রীর সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক মেনে নিয়েছিল তেমনি শেষ জীবনে নিজের ভালোবাসার আশ্রয় ছেলের অপছন্দের কথা ভেবে বা লোকলজ্জার ভয়ে ত্যাগ করেনি। বরং মঞ্জরী শিবনাথের দ্বিধাগ্রস্থতা দূর করে ভালবাসাকে গুরুত্ব দিয়েছে। এইভাবে তারা শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। অন্যদিকে শিবনাথ তাদের সম্পর্কের পবিত্রতাকে সম্মান দিয়েছে অন্যভাবে। মঞ্জরীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী নারীর শুভ্রতাতে যেন সমাজের কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করতে না পারে তাই শ্মশানের শেষ যাত্রাতেও তার কাছে যায়নি বা শোকসভাও দূর থেকে দেখে চলে গিয়েছে। তার ভালোবাসা দূর থেকেই মঞ্জরীর উপর অর্পিত হয়েছে। অর্থাৎ লেখক বোঝাতে চায়লেন যে, ভালোবাসাতে একে অপরের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। ভালবাসার শক্তিতে যেকোনো খারাপ পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসা যায়। সুন্দর মানসিক সম্পর্ক মানুষের জীবনে শান্তি দিতে পারে।

সমাজে শুধুমাত্র নারীর উপরেই সব কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না। অনেক সময় পুরুষও পরিবারের কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। যে প্রতিবাদ করবে না দুর্বল ভেবে সবলেরা তার ওপর নিজেদের মত চাপিয়ে দেয়। যেরকম অবস্থা শিবনাথের হয়েছিল। তার মা, স্ত্রী, বৌমা সবাই নিজেদের ইচ্ছে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সেই মানুষ মঞ্জরীর কাছে ভালোবাসার আশ্রয় পেয়ে তা হারাতে চায়নি। শেখরের খারাপ ব্যবহারে শিবনাথ ও মঞ্জরী দু-জনে কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে জীবনে একাকিত্ব থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছে। প্রকৃত ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে দু-টি মানুষ জীবনে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে–

'পুরো জীবন পার করে এসে, এই আটান্ন বছর বয়সে, শিবনাথবাবুর কাছে একটু শান্তি পেয়েছেন মঞ্জরী। ...অপেক্ষা করে থাকেন সন্ধেবেলার এই শান্ত সময়টুকুর জন্য।'[১২]–অর্থাৎ মানুষের জীবনে বেঁচে থাকতে হলে অর্থের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অর্থ উপার্জনই সব নয়। মানুষ দিনের শেষে শান্তির আশ্রয় পেতে চায়। শান্তির মধ্যে দিয়েই মানুষ আসলে ভালো থাকে। মঞ্জরী ও শিবনাথ দু-জনেই চাকরি করেছে। অথচ তাদের জীবনে শান্তি ছিল না।

লেখক যেমন মঞ্জরী ও এসডিও সাহেবের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে একদিকে দেখিয়েছেন মানসিক সম্পর্কহীন শুধুমাত্র দেহ ভোগের মধ্যে দিয়ে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না; তেমনি শিবনাথ ও তার স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে দেখিয়েছেন মানসিক সম্পর্ক তৈরি না হলে শারীরিক তৃপ্তি পাওয়ার ইচ্ছেও চলে যায়। আবার শিবনাথের ছেলে অনিমেষ ও তার ধর্মপ্রাণ স্ত্রী করবীর মধ্যে দেহের সম্পর্ক তৈরি না হওয়ায় মনের সম্প্রকও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সম্পর্কের একটি পর্যায়ে কামবাসনা সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সম্পর্ক সুস্থভাবে গড়ে ওঠার জন্য শারীরিক ও মানসিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। একদিকে দেখা যায় এসডিও

সাহেবের মধ্যে ভালোবাসার কোনো অনুভূতি ছিল না। নিজের ভোগ চরিতার্থ করতে না পেরে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে অনিমেষ স্ত্রীর সম্পূর্ণ ভালোবাসার না পেয়ে বাড়ি থেকে চলে যায়। সেই ভালোবাসার একটি অংশ শারীরিক সম্পর্ক। এরপরে অনিমেষ জীবনে সুখ, শারীরিক তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে অতসীর কাছে। অন্যদিকে মঞ্জরীর ছেলে শেখর প্রেমিকা তনুশ্রীকে ভালোবেসেছে। সেই ভালোবাসারও একটি অংশ শারীরিক সম্পর্ক। অর্থাৎ লেখক পাঠককে দেখালেন যে, বয়সের চাহিদা অনুযায়ী একটি সুস্থ সম্পর্কের একটি উপাদান শারীরিক সম্পর্ক। কিন্তু সেটাই সর্বস্ব নয়। আবার শেখর যখন তনুশ্রীর সামনে শিবনাথের সঙ্গে গল্প করার জন্য তার মাকে অপমান করেছে তখন তনুশ্রীর উক্তিতে পাঠক শুনতে পায় দৃঢ় স্বর–

'যদি তোমার স্বভাবের এই রুক্ষতা বদলাতে না-পারো, তা হলে আমাকে ভেবে দেখতে হবে তোমার সঙ্গে সারা জীবন আমি থাকতে পারব কি না। সম্ভবত পারব না।'[১৩]

–অর্থাৎ সম্পর্কের মধ্যে কখনো কখনো নিজস্বতাকে বাঁচানোর জন্য শক্ত হতে হয়। প্রতিবাদও করতে হয়। দৃঢ়ভাবে নিজের মত প্রতিস্থাপনও করতে হয়। কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে মনসিক সংযোগ থাকাও জরুরী। তনুশ্রীর ভালবাসার মধ্যে দিয়ে শেখর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে এবং তার জীবনে মানবিক গুণগুলি ভালোভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

তবে মঞ্জরীর লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয় যে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে মানুষ নিজের জন্য লড়াইটুকু করতে পারে। একইসঙ্গে বোঝা যায় ভালোবাসার মানুষ পাশে থাকলে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পেতে পারে। মঞ্জরী মা হয়েও ছেলের মতকে অগ্রাহ্য করতে পারে এবং গুরুত্ব দিতে পারে শিবনাথের আগমনকে। ভালবাসার শক্তি মানুষকে সেই শক্তি দেয়। ছেলেমেয়েরা অনেক সময় শুধু নিজেদের কথা ভাবে। যেমন শেখর ভেবেছে। কিন্তু ভাবে না মা-বাবা হলেও সেই মানুষগুলো স্বতন্ত্র মানুষ। তাদের জীবনে কিছু ভালোলাগা-মন্দলাগা, অনুভূতি আছে। ভালোবাসাহীন একাকিত্বের জীবনে যদি তারা পছন্দের মানুষের সঙ্গে শুধুমাত্র কিছুটা সময় কাটিয়ে শান্তি পায়; সে ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের উদার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যে উদারতার কথা তনুশ্রী বলেছে এবং নিজে সেই উদারতা দেখিয়েছে। তনুশ্রী শেখরকে বুঝিয়েছে, মঞ্জরী মারা যাওয়ার পরে কোন শূন্যতা সে শিবনাথের চোখে দেখেছে। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় শেখরের রাগ থাকে না। বরং সে শিবনাথের কষ্ট বুঝেছে। তার মায়ের সম্পর্ক তথা শিবনাথকে সম্মান দিয়ে তাদের বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়েছে। সে পুনরায় শিবনাথকে তার মায়ের জন্য গান করতে বলেছে। শিবনাথের গানে তার ভিতরের পাথর গলে গিয়েছে-

'শেখরের শরীর কাঁপছে কান্নার দমকে। শেখর বুঝতে পারছে, এই কান্না কেবল মায়ের শোকেই আসছে না। শিবনাথবাবুর একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কষ্টও তাকে তোলপাড় করছে।'[১৪]

– এইভাবে ভালোবাসা তাদের জীবনে দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছিল। একে অপরের প্রতি সহানুভূতি তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছিল।

'মায়ের প্রেমিক' উপন্যাসে এইভাবে মায়ের প্রেমিক অর্থাৎ শিবনাথের গানের মধ্যে দিয়ে একটি পবিত্র সম্পর্ক মর্যাদা পেল। লেখক দেখালেন কীভাবে ভালোবাসা মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে। ভালবাসার হাত ধরে মঞ্জরী, শিবনাথ তথা পার্শ্ববর্তী চরিত্র শেখর, তনুশ্রী, অনিমেষ জীবনের অন্ধকার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছে। একইসঙ্গে এটাও বুঝতে পারা যায় ভালোবাসাহীন জীবনে কীভাবে এসডিও সাহেব, শিবনাথের স্ত্রী, অনিমেষের স্ত্রীর জীবন অন্ধকারে ডুবে গেল। একজন নারী পরিস্থিতির সামনে হার না মেনে সে যে একাই জীবনে লড়াই করতে পারে এবং ভালোবাসার স্পর্শে যে মানুষ জীবনের অন্ধকার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পায়, এই বার্তা লেখক জয় গোস্বামী তাঁর 'মায়ের প্রেমিক' উপন্যাসে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১.গোস্বামী, জয়, "মায়ের প্রেমিক", 'দেশ', শারদীয় ১৪২৮, পৃ ১২৭

২.তদেব, পৃ ১০৫

৩.তদেব, পৃ ১০৫

৪.তদেব, পৃ ১০৯

৫.তদেব, পৃ ১০৫

৬.তদেব, পৃ ১০৫

৭.রায়, অন্নদাশঙ্কর, "জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ", 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ ১২

৮.গোস্বামী, জয়, "মায়ের প্রেমিক", প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬

৯.Swami Vivekananda, "Society and education", Dr. Kiran Walia(compiler), 'My idea of Education', Advaita Ashrama, Kolkata - 700014, 1st published 2008, p 54

১০.গোস্বামী, জয়, 'মায়ের প্রেমিক', প্রাগুক্ত, পৃ ১১২

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "স্ত্রীর পত্র", 'গল্পগুচ্ছ', মাইতি বুক হাউস, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ ৫৬৯

১২.গোস্বামী, জয়, "মায়ের প্রেমিক", প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩

১৩.তদেব পৃ ১২৩

১৪.তদেব পৃ ১২৯

গ্রন্থপঞ্জি

মূল গ্রন্থ

গোস্বামী, জয়, "মায়ের প্রেমিক", 'দেশ', শারদীয় ১৪২৮

সহায়ক গ্রন্থ

১.রায়, অন্নদাশঙ্কর, "জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ", 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

২. বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ' বিপিনের সংসার', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮

৩.ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "স্ত্রীর পত্র", 'গল্পগুচ্ছ', মাইতি বুক হাউস, কলকাতা - ৭০০০৭৩

৪.Swami Vivekananda, "Society and education", Dr. Kiran Walia(compiler), 'My idea of Education', Advaita Ashrama, Kolkata - 700014, 1st published 2008

....

দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান: বাংলা সাহিত্যের নিঃসঙ্গ জহুরির আশ্চর্য জীবন নির্মাণ

উজ্জ্বল গরাই
গবেষক , বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

দুর্গম অরণ্য পাহাড়, স্বর্ণগর্ভা নদী-খাল, বুনো হাতির উপদ্রব, আতঙ্ক এবং এই সব কিছুকে বুকের মধ্যে তীরের মতো নিয়ে সিংভূমের বভুক্ষু আদিবাসী জনজীবন—‘দৌড়বোগড়ার উপখ্যান’ উপন্যাসের এই মূল প্রতিপাদ্য। হীরালাল বুড়ো সেই দৌড়বোগাড়ার প্রবীণ পুরুষ। সারাদিন দৌড়বোগাড়ার বুকে মাথা গুঁজে সোনার টুকরো খুঁজে বেড়ায় সে। বুকের কাদামাটির নরমে সোনার দেহের স্পর্শ খুঁজে পায়। দৌড়বোগাড়া সেই অর্থে বুড়োকে কিছুই দেয়নি। হীরালাল সোনা খুঁজেছে মনের আনন্দে। সেই কাজে না গেলে তার ঘুম হয় না। তবে শুধু ছেলে নয়, বউ গুরুবারিও বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করে হীরালালকে। তার কথায়, দৌড়বোগাড়ায় যাওয়া ছাড়া বুড়ো সংসারের আর কোনও কাজে আসে না। হীরালালের বাৎসল্য প্রবল। সেই বাৎসল্য প্রাবল্যে ধনকুমারকে সে নিজের মতো করে গড়তে চায়। হীরালাল শেষ বয়সে এসে বুঝতে পারে, দৌড়বোগাড়া আগের থেকে যেন কৃপণ হয়ে উঠেছে। তার বুক থেকে ধীরে ধীরে ধুয়ে যাচ্ছে সোনার কুচিগুলো। যাকে আশ্রয় করে এত এত অভাবী মানুষের বেঁচে থাকা, তার এই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বুড়োর মনে অভিমান বাষ্পিত করে তোলে। খাদানের পর খাদান খুঁড়েও রাউতুরা মনের মতো সোনা পায় না। হীরালালের আশ্বাস তাদের মধ্যে সংশয় তৈরি করে। বুড়োর আগের সেই মাটি চেনার সম্মোহনী শক্তি আর নেই। যা দিয়ে সে মাটি চিনতে পারত, বুড়োর সেই নজর থেকে নিভে গিয়েছে অলৌকিক দ্যুতি। ইচ্ছা মৃত্যুর অলৌকিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও ভীষ্ম অপেক্ষা করেছিলেন যুদ্ধ থেমে যাওয়া অবধি। তার বিশাল জীবনের অতল অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রজন্মান্তরের বুকে। হীরালাল দৌড়বোগাড়ার একমাত্র জহুরি। মাটির অতলস্পর্শী যার দৃষ্টি। এই দেখার চোখ, মাটিকে পরখ করার এই গুণ সে-ও দিয়ে যেতে চায় দৌড়বোগাড়ার নতুন প্রজন্মের হাতে। বুড়ো হীরালাল ক্রমশ একা হতে হতে নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ আলোটুকু নিয়ে মুক্তির মধ্যে দিয়ে অনুভব করে তার চিরপ্রার্থিত ‘সোনা পাইয়ো যদি’-র ঠিকানা।

কী-ওয়ার্ড

দৌড়বোগাড়া, সোনা, জহুরি, মাটি, বাৎসল্য, নিঃসঙ্গতা, ভীষ্ম, চাঁদ

মূল প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’র প্রথম সংস্করণে বিশু আর নন্দিনীর সংলাপের মধ্যে পিতামহ ভীষ্মের প্রসঙ্গ এনেছিলেন। সেখানে জালের ভিতরে মকর রাজকে দেখে বিশুর মনে হয়েছিল যেন রামায়ণ-মহাভারতের কেউ। যুগ যুগান্তরের ভয়ানক একলা মানুষ ভীষ্ম পিতামহ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজার বিশালত্বকে ঢেকে দিয়েছে ‘ভয়ানক একলা’ শব্দটি। রাজার জীবনের রাজকীয় মুহূর্তের আড়ালে এক আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা।

কুরুক্ষেত্রের যুগান্তর ভূমি থেকে বহুদূরে দৌড়বোগাড়া। না, মহাভারতের কোনও যুদ্ধভূমি নয়। মহাভারতের কোনও প্রবীণ পুরুষ এখানে নেই। দুর্গম অরণ্য পাহাড়, স্বর্ণগর্ভা নদী-খাল, বুনো হাতির উপদ্রব, আতঙ্ক এবং এই সব কিছুকে বুকের মধ্যে তীরের মতো নিয়ে সিংভূমের বভুক্ষু আদিবাসী জনজীবন—‘দৌড়বোগড়ার উপখ্যান’ উপন্যাসের এই মূল প্রতিপাদ্য। হীরালাল বুড়ো সেই দৌড়বোগাড়ার প্রবীণ পুরুষ। সারাদিন দৌড়বোগাড়ার বুকে মাথা গুঁজে সোনার টুকরো খুঁজে বেড়ায় সে। বুকের কাদামাটির নরমে সোনার দেহের স্পর্শ খুঁজে পায়। মাটিতে হাত ছোঁয়ালেই সে টের পায় চেনা নারীর শরীরের স্পন্দন। এই মেয়ের দুই বুকের মাঝখানে লুকোনো আছে সোনার ঝর্ণা। জীবনভর যাকে খুঁজে যাবে হীরালাল। স্বপ্ন দেখে—একদিন এই দৌড়বোগাড়ার সোনা দিয়ে বউ গুরুবারির গা মুড়িয়ে দেবে সে। কেন না, মাটি ফাঁকি দেয় না। ফসল না হলেও সেই মাটি ,চিটে ধান তুলে দেয়। হীরালাল জানে, এই অচল বস্তিতে কোনও কাজ নেই।

জঙ্গল মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। সেখানে সরকারি বন-সিপাইদের তাড়না। কাঠ কাটাও বারণ। সুতরাং দৌড়বোগাড়ার খালে সোনা খুঁজতে না গেলে বাড়িতে খাবার জুটবে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় শশী এবং তার বাবার সম্পর্কের একটা দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছিলেন। সাংসারিক গোপাল চেয়েছিল ছেলে তার সংসারের হাল ধরুক। অর্থ ও ধন-সম্পদের কাছে পদানত থেকে বাকি জীবনটা সে নিশ্চিন্তে কাটাক। সেখানেই বাবা-ছেলের সম্পর্কের মূল সংকটটি তৈরি হয়। শশীর উদারতা, সমাজের প্রতি মঙ্গল কামনা বাবার থেকে একটা অলঙ্ঘ্য দূরত্ব তৈরি করে দেয়। হীরালাল তার তার বাৎসল্যের স্নেহ দিয়ে ছেলে ধনকুমারকেও দৌড়বোগাড়ার কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছে। চেয়েছে সোনা খোঁজার কাজ শিখিয়ে দিতে। কিন্তু ধনকুমারের কুঁড়েমি, উচ্ছৃঙ্খলতা, মাদকাসক্তি হীরালালকে এক মুহূর্তও সুখ দেয়নি। সোনা খুঁজতে যাওয়ার কাজে ধনকুমারের তীব্র অনীহা। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় বাবা ছেলের সম্পর্কের মলিনতা জটিলতা গোপালের কথায় ঝলকে উঠতে দেখি। গোপাল অনুভব করে—ছেলে বড় হলে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ছেলে বড় হলে বাবার কাঁধ হালকা হয় কিন্তু হীরালালের বেলায় উলটো। ক্ষেতিবাড়ির কাজ ছাড়া ধনকুমার অন্য কিছু করতে রাজি নয়। হীরালাল ছেলেকে বোঝায়—কাজের নেশায় যে পাগল হয় তার ভাত কাপড়ের কোনওদিন অভাব হয় না। কিন্তু তারই কথার প্রত্যুত্তরের তীর বেঁধে আসে বুকে। যৌবনটা তো দৌড়বোগাড়ার খালের পাড়ে পাড়ে ঘুরে কেটে গেছে, খালের ঘোলা জল, বালি মাটি আর এই সোনা ছেনে তোলা কাঠের পাটা জীবনে কী দিয়েছে হীরালালকে? আসলেই তো দৌড়বোগাড়া সেই অর্থে বুড়োকে কিছুই দেয়নি। হীরালাল সোনা খুঁজেছে মনের আনন্দে। সেই কাজে না গেলে তার ঘুম হয় না। তবে শুধু ছেলে নয়, বউ গুরুবারিও বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করে হীরালালকে। তার কথায়, দৌড়বোগাড়ায় যাওয়া ছাড়া বুড়ো সংসারের আর কোনও কাজে আসে না। হীরালালের বাৎসল্য প্রবল। সেই বাৎসল্য প্রাবল্যে ধনকুমারকে সে নিজের মতো করে গড়তে চায়। দয়ানন্দের ছেলে শিবার সঙ্গে মেলামেশাটা তাই ভালোভাবে নিতে পারে না। শিবার বাবার অর্‌থ-প্রতিপত্তি আছে। তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মাতাল হলে আখিরে ধনকুমারেরই সমূহ সর্বনাশ। কিন্তু ধনকুমার এই সোনা খোঁজার কাজে গিয়ে ফোকোটে বড়লোক হতে চায় না। সারাদিন বালি ছেনে কুজো হয়ে যায় শিরদাঁড়া। দিনশেষে এক চাল সোনাও মেলে না। তার চেয়ে পাহাড় ভাঙ্গা সোজা। তবু কোনও এক সম্মোহনী শক্তিতে দৌড়বোগাড়ার কালো মাটির কাছে মানুষগুলো সোনার হরিণ ধরব বলে ছুটে আসে। হাতি যেমন তাদের ফসল খায়, সুখ খায়—দৌড়বোগাড়ার নালার এই সম্মোহনী শক্তি শুষে নেয় হাড় হাভাতে নিরন্ন জীবন। ধনকুমার সেখানে কোনওদিনও যাবে না।

হীরালাল অনুভব করে—

"যতদিন শ্বাস ততদিন মাটির সুবাস। শ্বাস ফুরালে শরীরের জল শুকিয়ে ভেসে উঠবে পাথর চাটাং। হাড়-মাস-মজ্জা পচে-গলে সার হবে। যতদিন সার না হয় এ দেহ ততদিন খোঁজা। দুই নারী এক পুরুষ। নারী ধারণ করে সোনা। পুরুষ খোঁজে।"[1]

হীরালালের এই মাটি চেনা দেখে বিস্ময়ের শেষ থাকে না রাউতু-তমসয়দের। সে মাটি না চিনিয়ে দিলে সোনা পাওয়া যায় না। হীরালালের এই মাটি চেনার চোখ তৈরি করে দিয়েছিল তার বাবা। মাটির রঙ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের। মাটির ভিতরে এই মাটির রহস্য বুঝতে গিয়ে মাথায় ঝিম ধরে ভুন্ডে-রাউতু-তমসয়দের। হীরালাল তাদের বলে—মাটি আর মেয়ে মানুষ চেনা মুখের কথা নয়। এই চেনা যত ঘুরপথে, যত কঠিন, তার তত বেশি রস। এবং তত বেশি রহস্য। ঔপন্যাসিক লিখছেন—

"এত বড় দেশ দুনিয়ায় কোথায় সোনা লুকিয়ে তা হলফ করে বলা মুখের কথা নয়। যার এলেম আছে, মাটি চেনে সেই কেবল বলতে পারে এই রহস্যের ঠিকানা। এছাড়া মাটির স্বাদ, মাটির ভাষা বোঝার ক্ষমতা দরকার। এ ক্ষমতা যার আছে সে তো মানুষ নয় দেবতা।"[2]

রাউতুদের কাছে হীরালাল দেবতা। চোখে ছানি পড়লেও চোখ দুটো মাটির তল পর্যন্ত দেখতে পায়। হীরালালের চিমড়ানো শরীরটা দূর থেকে দেখে জনার্দনের মনে হয় 'আগুনে পুড়ে যাওয়া জীবন্ত কোনো গাছ'। বুড়াকে পোষ মানানো সহজ নয়। তার নিরেট পাথর-মন ভাঙতে পারে না জনার্দনের মতো বিত্তশালীরা। হীরালাল অর্থের কাছে কখনও নত করেনি নিজেকে। জনার্দনকে তাই স্বাভিমানী দেমাকে বলে ওঠে—চোখ উপড়ে নিলেও দৌড়বোগাড়ার শরীর ছুঁয়ে সে বলে দিতে পারবে কোথায় সে গয়না পরেছে। দয়ানন্দ কোড়াকে বাবুদের প্রসঙ্গে শুনিয়ে দেয়—বন ছিল, বন কেড়ে নিয়েছে। আইন দেখিয়ে নালাও কেড়ে নেবে। কিছুদিন পর হয়তো ঘরের বউ-মেয়েছেলেদেরও কেড়ে নেবে। তখন আর যাওয়ার কোথাও থাকবে না। তাই সময় থাকতেই শিরদাঁড়া শক্ত করার প্রয়োজন। রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন।

হীরালাল শেষ বয়সে এসে বুঝতে পারে, দৌড়বোগাড়া আগের থেকে যেন কৃপণ হয়ে উঠেছে। তার বুক থেকে ধীরে ধীরে ধুয়ে যাচ্ছে সোনার কুচিগুলো। যাকে আশ্রয় করে এত এত অভাবী মানুষের বেঁচে থাকা, তার এই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বুড়োর মনে অভিমান বাষ্পিত করে তোলে। খাদানের পর খাদান খুঁড়েও রাউতুরা মনের মতো সোনা পায় না। হীরালালের আশ্বাস তাদের মধ্যে সংশয় তৈরি করে। বুড়োর আগের সেই মাটি চেনার সম্মোহনী শক্তি আর নেই। যা দিয়ে সে মাটি চিনতে পারত, বুড়োর সেই নজর থেকে নিভে গিয়েছে অলৌকিক দ্যুতি। মণিহারা ফণীর মতো এখন দশা হয়েছে তার। রাউতু হতাশায় বলে ওঠে, ডাক্তারের কাছে চোখ দুটো দেখিয়ে আসার জন্য।

কাউকে সে দিব্যি দেয়নি এখানে থাকার জন্য। অন্যের কথায় বিরক্তি জেগে ওঠে হীরালালের মনে। ছেলে ধনকুমারের অবজ্ঞা তাকে হাজার বছর পিছিয়ে দিয়েছে। তাকে ঘিরে দৌড়বোগাড়ায় গড়ে উঠেছে একটা অসন্তোষের ঝড়। আশেপাশের হতাশাগ্রস্ত বিধ্বস্ত মানুষগুলোর ভাঙ্গা মন জোড়া করতে তবু চেষ্টার লাগাম টানেনি সে। কিন্তু ভুন্ডেরা আর দৌড়বোগাড়ায় আসতে চায় না। পচা জলে সারাদিনের সম্বল মাত্র এক চাল সোনা। তাতে সংসার চলে না। এসবে দুঃখ নেই হীরালালের। দুঃখ একটাই, ঘরওয়ালি অর্থাৎ তার বউ স্বামীর এই সোনার স্বপ্নকে মানতে চায় না। পথ আটকে বলে—সোনা খুঁজতে না গেলেও দিব্যি বেঁচে থাকবে সে। হীরালাল উত্তপ্ত কণ্ঠে গুরুবারিকে শুনিয়ে দেয়—'তোরা মরবি না, তোরা অমরির ঝাড়।' কথাটা শুনে ক্ষিপ্ত গুরুবারি সোনা চালার পাটাটা পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল উনুনের আগুনে। সকলে দৌড়বোগাড়ার শুকিয়ে আসা নালা, না হলে বুড়োর ছানিপড়া চোখের দিকে আঙুল তোলে। সকলের এই প্রত্যাখ্যান আত্মসম্মানে লাগে হীরালালের। সে জানে, দোষ আসলে প্রত্যেকের। কেন না, মাটিকে না ভালবাসলে মাটি তো মুখ ফিরিয়ে নেবেই। কষ্টে মিলে কেষ্ট—এই প্রবাদ বাক্যটিকে জীবনে সত্য বলে তারা মেনে নিতে চায় না। কর্মের জোরে নয়, তারা চায় দৌড়বোগাড়ার বুকে জুয়ার বাজি ধরতে। সোনা খুঁজতে যাওয়া—হীরালালের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মতো। নিক্তিতে তার ওজন মেলে না। পোড়া নিয়তির ক্ষত নিয়ে ভুল হয়ে যায় জীবনের হিসেব। গ্রামের গঞ্জনা বুকে হীরালাল সাধের দৌড়বোগাড়া ছেড়ে চলে গেলে ভুন্ডের মনে হয়—বেশিদিন মানুষটা বাঁচবে না। আত্মসম্মানে ঘা লাগলে অনেকে গোড়াকাটা গাছের মতো শুকিয়ে যায়। যে বুড়ো কয়েক বছর আগেও ছিল এই বস্তির নায়ক। যার অতলস্পর্শী চোখ মাটি চিনে বুক ঠুকে বলে দিতে পারত কোথায় সোনা আছে। রাউতুরা যাকে মাথায় করে রাখত। বস্তির মানুষের কাছে যে বুড়ো ছিল সিংবোঙার দেবতা। ভুন্ডে অবাক চোখে সেই হীরালালের চলে যাওয়া দেখে।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিনে শয্যাশায়ী হন ভীষ্ম। শরসজ্জায় কন্টকিত হওয়ার পরেও মৃত্যুর জন্য আরও অপেক্ষা করেছিলেন দীর্ঘদিন। শাস্ত্রজ্ঞ, বীর, রাজনৈতিক বিচক্ষণ, ষড়গুণে গুণান্বিত, বিপুল জীবনাভিজ্ঞ, আদিপুরুষ পিতামহ ভীষ্মের এই অপেক্ষা আসলে যোগ্য উত্তরাধিকার অনুসন্ধানের। তিনি তাঁর অসীম অভিজ্ঞতার বীজ পুঁতে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যোগ্য আগামীর হাতে। দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ন্যায় নীতি-রাজনীতি-কূটনীতি-অর্থনীতি-ধর্মনীতির সুবিশাল পাঠ—তার বিশাল জীবনভার। ইচ্ছামৃত্যুর অলৌকিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও ভীষ্ম অপেক্ষা করেছিলেন যুদ্ধ থেমে যাওয়া অবধি। তার বিশাল জীবনের অতল অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রজন্মান্তরের বুকে।

হীরালাল দৌড়বোগাড়ার একমাত্র জহুরি। মাটির অতলস্পর্শী যার দৃষ্টি। এই দেখার চোখ, মাটিকে পরখ করার এই গুণ সে-ও দিয়ে যেতে চায় দৌড়বোগাড়ার নতুন প্রজন্মের হাতে। এইজন্য এত অপমান, অপবাদ, গঞ্জনা, দোষারোপের তীর গায়ে নিয়ে হীরালাল অপেক্ষা করে ধনকুমার-ভুন্ডে-রাউতু-তমসয়দের কেউ এগিয়ে আসুক—যার হাতে দিয়ে যেতে পারবে, সোনা খোঁজার অঙ্কুশ। একসময় ভুন্ডেকে সেই সোনার মাটি চেনার চোখ দিয়ে যেতে চেয়েছিল। যা হীরালাল বুড়ো পারেনি, ভুন্ডে তা খুঁজে পেয়েছিল কুসমার শরীরে। মনের মাটি চুঁয়ে ভুন্ডে আবিষ্কার করে—এই শরীর হল নদী। সংসারে শরীরের ঢেউয়ে পিছল হয়ে ওঠে মনের মাটি। মন চুয়ানো জলে মিশে থাকে স্মৃতির স্বর্ণরেণু।

ঘরে বাইরে শান্তি নেই হীরালালের। শান্তি নেই সংসার জীবনে। বউ গুরুবারির কাছে বারবার তিরস্কার গঞ্জনা পেতে পেতে মুখ থুবড়ে পড়ে সে। যাকে সে জান দিয়ে ভালোবাসে তার এই প্রতিদান সে কীভাবে সহ্য করবে? বুড়োর মনে হয়, দৌড়বোগাড়াও বুঝি গুরুবারির মতো ছলচাতুরি জানে। দৌড়বোগাড়া তার কাছে প্রেমিকার মতো। নিজের জীবন দিয়ে তাকে সে ভালবেসেছে। তার মাটিতে এসে স্পর্শ পেয়েছে তার প্রার্থিত আনন্দের। আর তাই এই প্রত্যাখ্যান হীরালালকে জাগিয়ে তোলে নতুন করে—সোনারফাঁদ, সে বড়ো মায়াবী ফাঁদ!

গুরুবারি চিরকাল এই দৌড়বোগাড়াকে তার সতীন ভেবে এসেছে। তাই বুড়োর এই জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়ার দিনে, সারা জীবন কাদামাটি ছেনে আনা হাতের স্পর্শকে গুরুবারিও প্রত্যাখ্যান করে সেই রাঁড়ের কাছে অর্থাৎ দৌড়বোগাড়ার কাছে ফিরে যেতে বলে। হীরালালের গলা বুঝে আসে কান্নায়। জীবনের উপান্তে পৌঁছেও তার বুকে শুধুই শূন্যতা। নিঃসঙ্গতা। এখন শূন্য হাতে তাই এই শূন্যভূমি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়। মহাভারতের ভীষ্মের মতো 'ভয়ানক একলা' হয়ে এখন সময় যুদ্ধভূমি ত্যাগের। লেখকের ভাষায়—আলো মরে যাওয়া পৃথিবীতে হীরালাল এখন একা! তার অভিমানসিক্ত বুকের পাঁজরে জমা হয় যুবক বয়সের প্রেমাকুতি। জীবনের পথে চলতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াটাও তো জীবনেরই ধর্ম। তাই আর এই পোড়া মুখ নিয়ে বস্তিতে ফিরে আসতে চায় না সে। সংসারের যাবতীয় মায়া কাটিয়ে হীরালাল খুঁজে পায় ঠিকানার হদিস। চিরপ্রাপনীয় মুক্তি। আনন্দ। হীরালাল স্বর্ণরেণুর মধ্যে দিয়ে যেন জীবনের আদি মাধুর্যকে খুঁজতে চায়। ধরতে চায়। স্বর্ণ তৃষ্ণা তাঁর কাছে জীবন তৃষ্ণা। প্রেমের নিগূঢ় অন্বেষণ। সোনা তাই অধরা মাধুরী। হীরালালের বুকে যেন বেজে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গান—

"তোরা পাবার জিনিস হাতে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে—
যারে যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে।
আমার যা ছিল তা গেল ঘুচে যা নেই তার ঝোঁকে—
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস, বুঝি মরি তারি শোকে?
আমি আছি সুখে হাস্যমুখে, দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥"[৩]

দৌড়বোগাড়ার এই নিঃসঙ্গ জহুরি হীরালাল যেন অনন্ত সময়ের প্রতিনিধি। অনন্ত অপেক্ষার। উত্তরণের।

'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় গোপাল সেন দিদির অবৈধ সন্তানকে বুকে নিয়ে খুঁজে পেতে চেয়েছিল কাঙ্ক্ষিত বাৎসল্যের সৌন্দর্য-তৃপ্তি। আর বুড়ো হীরালাল ক্রমশ একা হতে হতে নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ আলোটুকু নিয়ে মুক্তির মধ্যে দিয়ে অনুভব করে তার চিরপ্রার্থিত 'সোনা পাইয়ো যদি'-র ঠিকানা। রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পের মাহাতো বুড়োর মতো শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে নয়, দৌড়বোগাড়ার বুড়ো হীরালালের বেঁচে থাকা আত্মসম্মানের শক্তিতে। মনে পড়বে, শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা নাটক'-এর কথা। চাঁদের মতো হীরালালও জানে, সমাজের মঙ্গলের পথে 'দুরস্তর বাধা'। সমাজ-সংসারের বুকে প্রাপ্য প্রতিদান শুধু অপবাদ, গঞ্জনা। সনকার কাছে ফিরে আসতে চেয়ে ব্যর্থ, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, পরাজিত চাঁদকে বলতে শুনি—

"পুরুষ কি তবে শুধু জয়ী হয়্যা তার নারীর নিকটে যাবে? আর, জীবনে পরাস্ত হয়্যা? আহত বিক্ষত এক মুমূর্ষু পশুর মতো যদি কোনো হতভাগা গুহার সন্ধানে আসে—যদি এতটুকু শান্তি চায়, সেবা চায়—জ্বলন্ত ক্ষতের পরে এতটুকু শুশ্রূষা কামনা করে—সেটা তার অপরাধ?"[৪]

চাঁদের এই কথাগুলোই যেন হীরালাল তার বউ গুরুবারির কাছে ব্যক্ত করতে চেয়েছে বারবার। চাঁদের কাছে পাড়ি দেওয়ার মূল লক্ষ্য সমাজের মঙ্গল। উত্তরণ। অন্ধকার থেকে আলোর পথ সন্ধান। হীরালালও দৌড়বোগাড়ার মাটির গভীর অন্ধকারে মঙ্গলের স্বর্ণপ্রদীপ প্রজ্বলিত করতে চেয়েছিল। ব্যাক্তিগত জয়ের মধ্যে দিয়ে দুজনেরই প্রার্থনা ছিল সমষ্টির জয়। সমষ্টির উন্নতি। আপাত বিচারে জীবনযুদ্ধে পরাজিত। কাঙ্ক্ষিত জয়লাভে ব্যর্থ। তবুও নিয়তির কাছে মাথা নত করে নয়, নিজেদের সত্য, মুক্তি এবং আনন্দের পথে, দুজনই যেন উত্তরণের স্বপ্নে পাড়ি দেওয়া অনন্ত অভিযাত্রী। চরৈবতি জীবনের আনন্দ-পথিক। জীবনের নিঃসঙ্গ জহুরি।

তথ্যসূত্র

১। ঘড়াই, অনিল, দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৯

২। তদেব, পৃষ্ঠা-৭২

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাজা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৩ কার্তিক, পৃষ্ঠা-৩৯

৪। মিত্র, শম্ভু, চাঁদ বণিকের পালা, কলকাতা, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮৪, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃষ্ঠা-৫০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ
১। ঘড়াই, অনিল, দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৭
সহায়ক গ্রন্থ
১। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, রচনাসমগ্র ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০
২। ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ(সম্পা.), নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৮, নবম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮
৩। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের ছয় প্রবীণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২
৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৮০

……………………………………………

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প উপন্যাসে বিহারের লোক জীবন

অতীশচন্দ্র ভল্লা
স্বাধীন গবেষক
বাংলা বিভাগ,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সার সংক্ষেপ :

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকরণগত অভিনবত্ব সম্প্রতিভ তীক্ষ্ণতায় আধুনিকতার স্বীকৃত বৈচিত্র্যময় প্রতিভা । ১২৯৮ সালে হিতবাদী হাত ধরে যে ছোটগল্প প্রথম প্রবেশ জীবনের শেষ অবধি তার কোন অন্যথা ঘটেনি [1]। ফলে বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের ভাষা চাতুর্য মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ চরিত্র নির্মাণের সঙ্গে কথা ও কাব্যের সুরভী নিয়ে বিশ শতকের গল্প সাহিত্যের সীমানায় পৌঁছে যায়।আর তিনি নিজে হয়ে যান হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক মানের গল্পকার [2]। বিশুদ্ধ বাস্তবতার রূপায়নী নয় বৃহত্তর মহত্ত্ব জীবনের অন্বেষণ হয়ে ওঠে উপন্যাস রচনা প্রেরণা, উপন্যাস রূপে তাই তিনি ক্রমশ হয়ে ওঠেন কালান্তরের প্রতীক, মহাজীবনের কথাকোবিদ ।

সূচক শব্দ :

বিহার, রবীন্দ্রনাথ, লোকজীবন, গল্পগুচ্ছ, ছোটনাগপুর, গিরিডি

মূল প্রবন্ধ :

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি নানা প্রকাশকের মাধ্যমে নানান আখ্যানপত্র নিয়ে একাধিক সময় প্রকাশিত হয়েছে।পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় যখন 'গল্পগুচ্ছ' নামে গল্পগুলোকে খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত করতে থাকে। তখন পূর্ববর্তী খন্ড ভিত্তিক গল্পগুলি বিন্যাস নতুনভাবে হতে থাকে। অববাহিত পরে সংস্করণে তথাপি দেখা যায় পরিবর্তন পরিমার্জন ও নতুন সংযোজন [3]। সম্প্রতি কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র রচনাবলী যে "জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ" প্রকাশিত হয় সেখানে কিন্তু কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই । এবং এতে সহায়তা করেছেন শ্রী প্রবোধ চন্দ্র সেন, শ্রী অমীয় কুমার সেন,শ্রী হরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, শ্রী প্রমথনাথ বিশ্বের মতো রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা এ যাবত কাল সমস্ত গবেষণা এবং বিচার- বিবেচনার সাহায্য অধিকতর সুসম্পূর্ণ এবং আধুনিকতম সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন । 'গল্পগুচ্ছ', 'লিপিকা', ' সে', ' তিন সঙ্গী' ও 'গল্পসল্পের 'গল্পগুলি এখানে পর্যায়ক্রমে সাজানো আছে পরিসংখ্যানে দিক থেকে গল্পগুচ্ছের ৯০ টি লিপিকার ৩৮ টি শেয়ার চতুর টি তিনসঙ্গে তিনটি গল্পসল্পের 16 টি মোট ১৬১ টি ।

'রবীন্দ্রনাথের গল্প 'বলতে পাঠক মনে যে আলোড়ন ও লেখক রূপেও রবীন্দ্রনাথের যেখানে গর্ব তা গল্পগুচ্ছের ৯০ টি এবং তিনসঙ্গে ৩ টি গল্পকে নিয়ে ধরা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বভাবেই বহু আলোচনা করেছেন।তিনি বলেছেন 'আমি যে ছোট ছোট গল্প গুলো লিখেছি,বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম তাকেই ধরা পড়েছে [4]। 'আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী পেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিল তখন আমার অন্তর আত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখ দুঃখের বিভাস আভাস অন্তকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লী চিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ করেনি। [5]

গল্পগুচ্ছে 90 টি গল্পের মধ্যে 'মুকুট', 'দালিয়া', ' রীতিমতো নাটক', ' জয় পরাজয়', ' ক্ষুধিত পাষান ', 'দুরাশা', গল্পগুলিকে ছেড়ে দিয়ে বাকি গুলির পরিবেশ- পারিপার্শ্বিকতা বলতে দেখা যায় কলকাতা, ২৪ পরগনা, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম,নদীয়া এবং বরেন্দ্রী কখনো বা গন্ডগ্রাম কখনো বা জেলা শহর। কুশিলবদের মধ্যে বিত্তবান আছে,মধ্যবিত্ত আছে,নিবৃত্ত আছে পেশায় যারা জজ, হাকিম,মহাজন ,দারোগা, পুলিশ,কনস্টেবল, পুরোহিত,শিক্ষক,অধ্যাপক,পত্রিকার সম্পাদক পোস্টমাস্টার। গল্পের শতবাহ মেলে আছে বিশিষ্ট এই ভূখণ্ডের দিন যাপনের মধ্যে যেখানে ম্যালেরিয়া আছে, মহামারি আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে,জমিদার আছে, পুলিশের পেয়াদা আছে।

তিনসঙ্গীর 'শেষ কথা 'গল্পটি এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলকে নিয়ে গল্পটির পটভূমি রচিত হয়েছে। নারী- পুরুষের জৈবিক আকর্ষণ- বিকর্ষণ ও প্রণয় নিয়ে গল্পটি কেন্দ্র রস।কুশীলব এখানে বাঙালি নিশ্চযই, কিন্তু তথাকথিত

বাঙালিয়ানা এখানে নে। পড়ন্ত বাঙালি আমাকে অল্প মধুর কটা কষলে সে আঘাত করা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের আরো কিছু গল্পে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে নিছক নাম লিখি বড় বেশি হলেও সেসব অঞ্চলের কথায় দুই একটা অনুচ্ছেদে ব্যবহার মাত্র দৃষ্টান্ত রূপে বলা যায়। 'রাজটিকা' গল্পে বক্সারের উল্লেখ আছে, 'মনিহার' গল্পে রাজ্যের উল্লেখ আছে মাল্যদান বেহারা অঞ্চলের উল্লেখ আছে। এছাড়া অনেকগুলো গল্পে পশ্চিমের কথা তো আছে, যেখানে চাকরির জন্য যাওয়া মানুষে ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোমান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। ভারতের মানচিত্র অনুযায়ী পশ্চিমের অর্থ নিশ্চয় বিহার নয়, কিন্তু চলতি 'পশ্চিম' বলতে বিহারকে বলা হত। সেদিক থেকে গল্পের 'পশ্চিমের' অর্থ যদি বিহার ধরে নেওয়া যায় তবে আরো কিছু গল্পের সংখ্যা বেড়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে জীবনে শিলাইদহ যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি প্রভাব বিস্তার করেছে কলকাতা এবং শান্তিনিকেতন। এই 'তিনজগৎ এর তারা তার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল[6] । তার সঙ্গে বিহারের ভূখন্ডে নিশ্চয় কোন তুলনা হয় না তারপরও বিহার অঞ্চলের রবীন্দ্রনাথের জীবন পর্বে সুখ দুঃখ আনন্দ আবেগ মনের মধ্যে একটা জায়গা জুড়ে নিয়েছিল। জীবনের শেষ থেকে শান্তিনিকেতন থেকে প্রায়শই তিনি চলে আসতে এখানে শালবনের ভিতর দিয়ে শিশির ভেজা ঘাসের পথে হাঁটতে হাঁটতে গুনগুন করে গান করতে করতে চিন্তা করে যেতেন বিরহ জটিল চিন্তা সব স্বদেশী বিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি । শাল মহুয়া ক্ষয়ের পলাশের এই গহন জঙ্গল সঠিক কঠিন শিলাময় পর্বতের বিস্তার তার কাছে নিয়ে আনত নিরুদ্দেশ প্রকাশনা স্বর্গীয় সান্তনা স্পর্শ। এই জন্যই স্ত্রী মৃণালিনী দেবী যখন মারা যান, মেজো মেয়ে রেনুকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন রবীন্দ্রনাথের অসুস্থ রুগ্ন মেয়ে এবং মেয়েরা পুরো অঞ্চলে হাজারীবাগে । পেয়ে যান কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িটি। কবিচিত্রকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে সেই পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা খুলে যায় কাব্যের নতুন কল্পলোক [7] শুরু করে দেন 'নৌকাডুবি'উপন্যাস রচনা ।

বছর না ঘুরতে ঘুরতে কবি আবার আসেন তবে এবার আর হাজারীবাগে নয়,- গিরিড়িতে। গিরিডিতে তখন থাকতেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, এন্ড একইজেশন ডেপুটি। প্রথম এসে ওঠেন তারই বারগন্ডার বাড়িতে তারপর সেই বাড়ির কাছাকাছি একটা ভাড়া বাড়ি উঠে যান এবার সঙ্গী মীরা, রবীন্দ্রনাথ, শমীন্দ্র।কিছুদের সস্ত্রীক মধ্যে জগদীশচন্দ্র আসেন,স্থির হয় বুদ্ধগয়া যাবেন । ১৯০৪ সালের এই ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ আরও একবার বুদ্ধগয়া আসেন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। কন্যা মীরা ও জামাতা নগেন্দ্র সহ থাকেন গয়ার মোহান্তের অতিথি হয়ে। বসবাসের দিনগুলো গানের গল্পে মজলিসে জমিয়ে রাখেন সাহিত্যিক মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। পরে মুজাফফরপুরে কবির একরকম স্থায়ী নিবাস হয়ে ওঠে । ১৩১৬ সালে সরস্বতী পূজার দিন থেকে ভাগলপুরের বঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনে যে তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন সে সম্মেলনের মধ্যমনি [8]। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাগলপুরে চলে এক অনাবিল উৎসব ধারা। যে উৎসবের ধারায় বাঙালি বিহারী ধনী জমিদার চাকুড়ে ছাত্র কোন ভেদাভে থাকে না।

বিহারের মুঙ্গের রবীন্দ্রনাথের জীবন এক নির্ধারণ ক্ষত সৃষ্টি হয়ে যায় কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্র সঙ্গে শ্রীচন্দ্র মজুমদার মজুমদারের পুত্রের শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল ছুটিতে মামার বাড়ি মঙ্গল গিয়েছিল। সেখানে সমুদ্রের কলেরা হয়ে মারা যায়। টেলিগ্রাম খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ মুঙ্গের যান [9]। বছর না ঘুরতে ঘুরতে আরো এক দুঃসংবাদ আসে বিহারে দুমকা থেকে মারা যান [10]। সন্ধ্যা সংগীতের যুগ থেকে শেষ চন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার চিঠিপত্রের শ্রীশচন্দ্র কবিকে সম্বোধন করতেন 'ভাই রবি' বলে।

ঘটনা ঘনঘটায় বিহার ভুখন রবীন্দ্রজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার সত্ত্বেও গল্প উপন্যাসের সৃষ্টিশীলতার মধ্যে তেমন কোন স্থান নিতে পারেন নি, গল্পের ক্ষেত্রে তবুও যত কিঞ্চিৎ কিছু স্থান উপন্যাস ও তাও পায়নি।সমগ্র উপন্যাস গুলির মধ্যে 'নৌকাডুবিতে' কিছুটা উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতা ও 'শেষের কবিতায়' কিছুটা শিলং পাহাড়ের নিঃসর্গের কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের উপর সবকিছুই বাগবাজার (করুণা) কলুটোলা (নৌকাডুবি ও শেষের কবিতা) পটলডাঙ্গা (চোখের বালি) আর তার থেকে বেশি কিছু হলে বারাসাত, দমদম, কাশিপুর গঙ্গার তিরুপতি হুগলি- ২৪ পরগনাকে পটভূমি করে,অথবা বিশ্ব পর্যটক রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস করে রচনা করেছেন বৃহত্তর ভারতের নানা প্রান্তে বসে জনজীবনের নানা সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে (নৌকাডুবি উপন্যাসের কথা আগে বলা হয়েছে)- ১৯২৭ এ শিলং পাহাড়ে থাকাকালীন 'যোগাযোগ' উপন্যাস রচনা সূত্রপাত করেন, ১৯২৮ এ দক্ষিণ ভারত সফরকালে লেখেন 'শেষের কবিতা'[11], ১৯৩৪শে শ্রীলংকা পরিভ্রমণ কালে লেখেন 'চার অধ্যায় '[12]

এ যুগের কারখানা ঘরে উপন্যাস তৈরি করতে গিয়ে ঘটনা পরম্পরায় বিবরণ দান নিতান্তই পরিত্যাজ্য বলে মনে করে রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন চরিত্রগত মৌল সমস্যায় ফলে তার উপন্যাসে চরিত্রের অনেক ভিড় থাকে জনজীবনে ছত্রছায়া থেকে সরতে সরে গিয়েছেন চরিত্রগত জটিলতা জটিল জিজ্ঞাসায়। যেখানে সংসার ও সমাজের ছবি অনুপমভাবে আঁকতে হয় না হালকা তুলির টান দিয়ে এপিগ্রামের তীক্ষ্নতা ও উজ্জ্বলতা কবিময় ভাষায় মন বিকলন করে 'মানব চরিত্রের কঠিন সংস্পর্শ' পাঠকে দিতে পারলেই হয়।দেশকালে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করা তার কাছে উপন্যাস রচনার অন্যতম শর্তাবলী কখনই মনে হয়নি তার তাই উপন্যাস পরিবেশগত চরিত্র অভিনবত্ব বৈচিত্র তেমন কোন গুরুত্ব পায়নি । ঠিক তেমনি ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে তার মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।রচনা করতে চেয়েছেন 'সংসারের কঠিন স্পর্শ' যেখানে সংসার ও সমাজের ছবি অনুপম ভাবে হাসতে হয় না হালকা তুলির কয়েকটা টান দিয়ে একটি গ্রামের তীক্ষ্নতা ও চললে কবি তোমায় ভাসায় মনবিকল ইতরতা এবং জঘন্যতাকে বাদ দিয়ে রাখতে চেয়েছেন- বাস্তবতা প্রকাশ ।এজন্য দেখা যায় 'গল্পগুচ্ছের লিমেরিক ধর্মিতার কথা শুনলি অভিমানকাতর হয়ে উঠতে রবীন্দ্রনাথ,- 'অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি,বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন কবি এ লেখেন নি- কিন্তু আমার অবাক লাগে যে তোমরা যখন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীত ধর্মী '[13]। 'আমি একটা কথা বুঝে উঠতে পারিনা,আমার গল্প আমার গল্পগুলিকে কেন ধর্মী বলা হয়। এগুলো নেহাত বাস্তব জিনিস। যা দেখছি, তাই বলেছি। ভেবে বা কল্পনা করে তা কিছু বলে যেতে কিন্তু তা তো কোন করিনি আমি'[14]।

রবীন্দ্রনাথ গল্পের জন্য চেয়েছেন জীবনের উষ্ণ সান্নিধ্য- যে জীবনকে চোখ মেলে দেখতে দেখতে 'বুকের মধ্যে মাথার মধ্যে একটা কষ্ট' ক্রমশ ছড়িয়ে যায় যে জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার কথা ভেবে জন্মান্তরের একই পরিবেশে একইভাবে ফিরে আসতে ইচ্ছা করে [15]। নদীয়া জেলার বিরাহিমপুর পরগনা, পাবনা জেলার শাহজাদপুর পরগনা, পার্শ্ববর্তী শহর তৈরি লোক জীবনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পেয়ে গিয়েছিলেন বাঞ্ছিত জীবনের সান্নিধ্য । অন্য কোন দিকে আর ফিরে তাকান নি। অনেক দুঃখ যন্ত্রণা আনন্দ সান্তনার দিক বলয় রচনা করেছিল যে বিহার ভূখণ্ড তাকেও সযত্নে পরিহার করে গেছেন। যে যোগাযোগ সংযোগ রক্ষিত হলেও নতুন পরিবেশ থেকে গল্প তৈরি করা যায়,কয়েকটি সাহিত্য সভা, সম্মেলনী,আনন্দ ভ্রমণ,অবসর বিনোদন তার পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল,বাতুলতা- দরকার সত্যিকারের কর্মযোগের গ্রন্থি বন্ধন সেদিন তাই কাশি এলাহাবাদ ভাগলপুর সেখানেই যেখানেই প্রবাসী বাঙ্গালীদের সম্মেলন হয়েছে সাহিত্য আলোচনার ও আসর বসেছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ এই একই কথা বলতে চেয়েছেন।

সর্বতোভাবে বাঙালি সাহিত্য সেবীদের নিরভিমানী হতে বলেছেন, বৃহত্তর মানব সংসদে জীবনে সংগ্রহ তুলে নেবার কথা বলেছেন সাহিত্য ভাষা সাহিত্য 'স্থানীয় ভাষাসাহিত্য, স্থানীয় অভিজ্ঞতা থেকে যা কিছু তথ্য ও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব [16]।সেই সমস্ত কিছু দিয়ে বাংলা সাহিত্যে পুষ্টি বিধানে সক্রিয় হতে বলেছেন স্বতন্ত্র প্রদেশ রুপে 'নতুনবিহার '-র জন্ম কে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের গতিতে অনিবার্য বাস্তব বলে মনে নেই মেনে নিয়েছিলেন [17] এবং প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিকদের মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রবাস জীবনকে সংকীর্ণ ভাবে না দেখে। স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে সৌহাদ্য স্থাপন করে , শরবতভাবে নতুন লুকু জীবনের সঙ্গে সংসদ রেখে সংযোগ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের যাতে ভৌগোলিক বিস্তার ঘটনা ঘটান সম্ভবপর হয় সংশ্লিষ্ট সকলকে তাই তাই হতে বলেছিলেন বিশেষভাবে সক্রিয় ।

তথ্যসূত্র :

১. সেন সুকুমার,বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা -৩০৪

২. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ,সাহিত্যের ছোট গল্প, পৃষ্ঠা- ২৯৪

৩.প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ় সংখ্যা

৪.রবীন্দ্র রচনাবলী,১৪ খন্ড পৃষ্ঠা -৫৩৮

৫. প্রমথনাথ বিশী,রবীন্দ্র সরণি পৃষ্ঠা-৪

৬. রবীন্দ্র জীবনী, দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা- ১০৩

৭. প্রমথনাথ বিশী,রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে, পুলিন বিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জি পৃষ্ঠা- ১১

৮. মিত্র খগেন্দ্রনাথ ভাগলপুর সাহিত্য সম্মেলন প্রবাসী ১৩১৬ চৈত্র সংখ্যা

৯.মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার রবীন্দ্র জীবনী দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা -১৭৮

১০. মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার রবীন্দ্র জীবনী দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা -১৯৯

১১. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার রবীন্দ্র জীবনী চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা -৮৩
১২. প্রবাসী আসার ১৩৪৮ বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ
১৩. মুখোপাধ্যায় প্রভাত রবীন্দ্র জীবনী বিশ্বাস সংখ্যা পৃষ্ঠা- ৪৯৮
১৪. রাণী চন্দ 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'
১৫. রবীন্দ্রনাথ: ছিন্নপত্রাবলী, ৯৮ নম্বর চিঠি
১৬.রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের পথে, সভাপতির বক্তব্য।
১৭. রবীন্দ্র রচনাবলী (১২ খন্ড) 'সদুপায়' পৃষ্ঠা- ৮২৭

....

মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোকনৃত্য: নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা

সাবিনা বিশ্বাস
প্রাক্তন ছাত্রী, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ-

লোকনৃত্য হল কোন জনগোষ্ঠীর জীবন ঘনিষ্ঠ নৃত্য। এই নৃত্য বিশেষ কোন জাতিগোষ্ঠী, অঞ্চল বা উপজাতীয় সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে বিকশিত। এর সাথে নরগোষ্ঠীর জীবিকা, সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, সংস্কার ও লোকাচার ও ধর্মীয় সংস্কারের সাথে গভীর যোগ থাকে। সভ্যতার আদিকাল থেকে নৌকা বওয়া, ফসল কাটা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে লোকনৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোকনৃত্যের কোন কোনাটি ভাবেও উপলক্ষ্যে ইসলামী প্রভাব পড়লেও নৃত্যের ভঙ্গিতে এদেশীয় প্রচলিত ধারার রীতি অব্যাহত থেকে গেছে। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বেশ কিছু লোকনৃত্য আজও বহু প্রচলিত। বিশেষত মহরমে জারি নৃত্য করে মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে বেশ কিছু অঞ্চলের সুন্নীরাও জারিগান ও নাচ করে, এটা এদের অনেকের জীবিকা নির্বাহ করে অর্থাৎ অনেকের পেশা হল জারি গান ও নাচ। মহরম উপলক্ষ্যে আবার লাঠি নাচের প্রচলন আছে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে। মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন পীর পীরানির জন্ম ও মৃত্যু দিবসে পালিত লোকগান ও লোকনৃত্য। এছাড়াও মানুষ রোগমুক্তি বিপদ আপদ দূর করার জন্য বাড়িতে পীরের গান ও নাচের আসরের আয়োজন করে। এখানে পুরুষেরা নারী বেশ ধারণ করে বিভিন্ন রূপকথার কাহিনির চরিত্রে অভিনয় করে। লোকনৃত্যের শুরুতে পীর ও রসুলের নামে গীত বন্দনা করে। এছাড়া বিয়ের গীত ও নাচ বহুকাল ধরে মুসলিম সমাজে প্রচলিত। বিয়ের আগের দিন অর্থাৎ লগনের দিন সধবা মহিলারা গান গায় ও নাচ করে। বাউল নাচের প্রচলন ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে।

সূচক শব্দ:

লাঠি, বাউল, জারি, ছোকরা, লগন, ফকির, পীর পীরানি, নাচ, গান।

ভূমিকা:

নৃত্য বা নাচ হল একটি দৈহিকগতি ভঙ্গিমা। তবে ব্যবহারিক জীবনে নৃত্যকার শুধুমাত্র গতি ভঙ্গিমা নয় এতে ছন্দ ও সংযম থাকে। ক্লাসিক নৃত্য অঙ্গভঙ্গির যে কৌশল তা সাধনার মধ্য দিয়ে আয়ত্ব করতে হয়। কৃত্রিম ভঙ্গিতা লোকনৃত্যে কম এজন্যই লোকনৃত্যে অঙ্গকৌশল খুব একটা দুঃসাধ্যব্রত নয়।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে পোশাক পরিচ্ছদ ভূষনাদি একটি অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশই সাধারণ ও সীমিত পোষাকে হয়। ক্লাসিক নৃত্যের তুলনায় লোকনৃত্যের তালযন্ত্রের ব্যবহার অল্প। লোকনৃত্যে দেশীয় ঢাক, ঢোল, কাঁশি এইসব সাধারণ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

লোকনৃত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কণ্ঠ সংগীতের ব্যবহার। অধিকাংশ গান নাচের সাথে পরিবেশিত হয়। বাউল, জারি, কীর্তন, গাজন প্রভৃতি লৌকিক অনুষ্ঠানে গান ও নাচ একসাথে পরিবেশিত হয়। এই সমস্ত লোকনৃত্য যন্ত্র সংগীতের অভাব থাকলে তাদূর হয়ে সমস্ত পরিবেশটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়ে উঠে। লোকনৃত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দলবদ্ধতা। দলবদ্ধভাবে প্রত্যেকে এই নৃত্য পরিবেশন করে।

অনেকের মনে সভ্যতার সূচনা লগ্নে নাচ ছিল কাজের সমতুল্য। অর্থাৎ নাচ ও কাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দলবদ্ধভাবে আদিম জাতিরা শিকার, যুদ্ধ ও শস্য প্রভৃতি নাচ করত তাদের মূল লক্ষ ছিল সফলতা। মানুষের দলবদ্ধ নাচ কাজ শুরুর পূর্বে তাদের প্রেরণা এটা মনে করত। শিকার ও যুদ্ধ নাচে অনুকরণ করে কামনা সফল করার চেষ্টা করে। ফসল নাচে উর্বরতা কামনা করা হয়।

বাংলার লোকনৃত্যের কোনটিতে আছে প্রাচীন সংস্কার, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মের প্রভাব ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

উদযাপন ও উদভাবনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে লোকনৃত্যগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হল-

লোকনৃত্য

ধর্মীয় লোকনৃত্য	**সামাজিক লোকনৃত্য**	**আনুষ্ঠানিক লোকনৃত্য**
১. জারি নাচ	১. ঢালি নাচ	১. খাটু নাচ
২. ফকির নাচ	২. লাঠি নাচ	২. ঘেমটা নৃত্য
৩. চেলা নাচ	৩. রায় বেঁশে নাচ	৩. সারি নাচ
৪. কীর্তন নাচ		৪. বলি নাচ
৫. গম্ভীরা নাচ		
৬. বাউল নাচ		

নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে সাধারণত দুই ধর্মের মানুষ বসবাস করে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়। সাধারণ মুসলিম ধর্মে নাচ ও গানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র আনন্দ বিনোদন নয়। ত্যাগ ও সংযমের মাধ্যমে আদর্শ জীবনযাপন করার কথা ইসলাম বলে। প্রতিবেশী হিন্দুদের সংস্কারে এরা বশীভূত। জারি, খাটু, বাউল, লাঠি, ঘেমটা প্রভৃতি নাচগুলি মুসলিম সমাজ দ্বারা লালিত। নিম্নে লোকনৃত্যের আলোচনা করা হল-

১. জারি নাচ:

নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে মুসলিম সমাজের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকনৃত্য হল জারিনাচ। এটা সাধারণত মহরম উপলক্ষ্যে পালিত হয়। ইসলামী শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে মহরমের সময় শোকপ্রকাশ, নামাজ, রোজা পালনের নির্দেশ আছে। মিছিল বের করা তাজিয়া তৈরী ও দরগাহ করা, মাতম করা প্রভৃতি লৌকিক আচার, তাজিয়া নির্মাণ করা ও দরগাহ তৈরী প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতি জাত।

জারি নাচে কিশোর কিশোরীসহ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষেরা অংশগ্রহণ করে। এদের পোশাকের কিছু বিশিষ্টতা আছে কিন্তু বাধ্য বাধকতা নেই। এদের পরনে থাকে লুঙ্গি, গায়ে থাকে জামা বা গেঞ্জী আর মাথায় বাঁধা থাকে লাল গামছার ফেটী। একনাচে একজন প্রধান ব্যক্তি থাকেন তিনি নাচেন না। 'মুর্শিদাবাদে সরু বাঁশের একপ্রান্ত খিল খিল করে চিরে একপ্রকার লৌকিক বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা হয় এর নাম ঝারনি'।[১] দুহাতের দুটি ঝারনি পরস্পর আঘাত করলে ঝনঝন সুর ধ্বনিত হয়। মুর্শিদাবাদে মহরমের নতুন চাঁদ দেখা মাত্রই জারি নাচ শুরু হয়। নদীয়া জেলার শান্তিপুর অঞ্চলে মহরম মাসের ১ তারিখ থেকে ৪১ দিন পর্যন্ত সন্ধ্যায় জারিগান ও নাচ করা হয়। মাগরিবের পর প্রত্যেক সন্ধ্যায় এই ৪১ দিন পর্যন্ত খিচুড়ি রান্না করে দরবারে উপস্থিতরত ব্যক্তিদের খেতে দেয়।

২. বাউল নাচ:

পল্লী বাংলার পথে ঘাটে বাউলগান দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাউল নাচে ও গানে শুধুমাত্র বাউলেরা অংশগ্রহণ করে। বাউল নাচ ও গানের মূল প্রেরণা হল ধর্মকে সাধনা করা অর্থাৎ ধর্মসাধনা। বাউল ফকিরেরা সাধারণ পোষাকেই গান ও নাচ করে। এদের গায়ে গেরুয়া রংয়ের লম্বা ঢিলা জামা বা আলাখাল্লা কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়ান, মাথায় পাগড়ি মুখ, গোঁফ-দাঁড়িতে ভরা থাকে।

সুরবাদ্য হিসাবে এরা একতারা ব্যবহার করে, আবার অনেক বাউল নুপুর পরে থাকে ডান হাতের একতারার সাথে সাথে পায়ের নুপুর ও বাজতে থাকে ফলে বাউলেরা গানের সুরে ও নাচের তালে মশগুল হয়ে থাকে। বাউল নাচ সাধারণত পুরুষকেন্দ্রিক। দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমান জেলা বাউলদের প্রধান কেন্দ্র। তবে দক্ষিণবঙ্গের নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাগুলোতেও এদের শিষ্যদের দেখা যায়। পল্লী বাংলার বাউলেরা গান গেয়ে ও নেচে তাদের জীবিকা অর্জন করে। তবে তার সংখ্যা খুবই কম। আখড়ায় বা মিলনোৎসবে বাউলেরা গান করে।

৩. ফকির নাচ:

সমাজে বসবাসকারী এক শ্রেণীর লোক আছে যা ঢিলেঢালা পোষাক পরে মাথায় বাবরি চুল রাখে, গলায় মোটা মালা পরে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে। এরা ফকির নামে পরিচিত। ফকিররা মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়ে থাকে। ফকিরের জিকির করা ছাড়া নাচ গানও করে থাকে। দক্ষিণবঙ্গের অনেক অঞ্চলে ফকির নাচের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা থাকে। প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ফকির নাচ হয়। এইদিন পীরের ভক্তরা এসে পীর ফকিরের কবরে ধূপ, মোমবাতি জ্বালায়। পীরের গুনকীর্তন করে পীরের মুরিদেরা ফকির নাচ করে। নদীয়া জেলার বেশকিছু অঞ্চলে প্রতিবছর বৈশাখ মাসে গাজীম পীরের মেলা বসে। এখানে পীরকেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার পালন করা হয়। পীরের নামে একটি বাঁশে লাল কাপড় জড়িয়ে ওই বাঁশের মাথায় চামর বুঝুলিয়ে দেয়।

পীর ফকির ভক্ত মানুষের কাছে এটা হল ওই পীরের প্রতীক। ওইদিন নারী পুরুষ নির্বিশেষে পীরের মাজারে মানত করে। পীরের শিষ্যরা ফকিরি নাচ নাচে।

৪. ছোকরা নাচ বা আলকাপ নাচ:

আলকাপ নাচটি মুর্শিদাবাদ জেলায় অধিক জনপ্রিয়তা। এই নাচে একাধিক অল্পবয়সী পুরুষ থাকে তবে কেউ কেউ নারী বেশধারী। এই নাচে গানের প্রাধান্যই বেশী। গানের বিষয়বস্তু সাধারণত প্রেম বিষয়ক। যিনি গান গায় তাকে 'গীদাল' বলে ও তার সহকারীকে ‘দোহার’ বলে। এই নাচে হারমোনিয়াম, বাঁশী, ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। এই নাচে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করে। আলকাপ নাচ গান প্রসঙ্গে ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “আলকাপ গানে একটি কিশোর কিংবা বালক মেয়ের মত সাজিয়া নৃত্য করে ও গান গাহিয়া থাকে।... দলের একজন পুরুষ কিশোরী বেশী বালকটির সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নানা লঘু হাস্য পরিহার ও কৌতুক করিয়া থাকে দলের মধ্যে এক দুইজন ব্যতীত অবশিষ্ট আর প্রায় সকলেই দোহার। পুরুষ ও নারী বেশী বালকটির দ্বৈত সঙ্গীত সংলাপের মধ্যে মধ্যে তাহারা ধুয়া ধরিয়া থাকে, কখনও কখনও ছড়া কাটে।”[২]

৫. লাঠিনাচ:

মহরম মাসে ১০ তারিখে এই লাঠি নাচটি মুসলিম সমাজে অনুষ্ঠিত হয়। এটা এক প্রকার যুদ্ধ নৃত্য। এখানে জারীয়ালদের মতো লাঠিয়াল দল তৈরী করে। এই নাচে দৈহিক বল ও কায়দা কানুনের প্রয়োজন হয় বলে বয়স্করা এই নাচে অংশগ্রহণ করে না। এই নাচে পোষাক পরিচ্ছন সাধারণ থাকে পরণে লুঙ্গি বা পায়জামা, গায়ে জামা ও মাথায় গামছা বাঁধা থাকে। লাঠি নাচে একমাত্র উপকরণ হল লাঠি এখানে কোন বাদ্যযন্ত্রের তেমন প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র ঢোলের প্রয়োজন ঢোলকের তালে তালে লাঠিয়ালরা নাচ করে। ‘লাঠি নাচে পুরুষের একক অথবা দ্বৈত নাচ। নাচের সাথে কোনরূপ গান হয় না। পায়ের গতিভঙ্গি ও হাতের ঘোর প্যাচ ছাড়া দেহের অন্য কোন অঙ্গের ক্রিয়া এতে তেমন নেই। হাতের লাঠি সামনে বা পিছনে, দুপায়ের মাঝে মাথার উপরে দ্রুত ঘুরানোর মধ্যে যথেষ্ট বীরত্বের ভাব আছে। বিভিন্ন কৌশলে লাঠিনাচ হয়।’[৩] এই নাচটি দক্ষিণবঙ্গের বেশকিছু জেলাতে দেখা যায়। বিশেষত নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায়।

৬. লগন নাচ:

লগন নাচ মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রিয়। বিয়ের আগের দিনে লগনের নাচ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে কমবেশী এই লগন নাচ প্রচলিত আছে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলাতে বিয়ের গীত ও নাচ লগনের দিনে বেশী হয়। এই নাচে সাধারণত সধবা রমণীরা করে থাকে। লগনের গীত অনেকের পেশা পাশাপাশি লগন নৃত্যও অনেকের পেশা।

বিবাহের আগের দিন বিকাল বেলা এরা হবু বর বা কনেকে উঠনের মাঝখানে বসিয়ে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচ ও গান করে। সাজসজ্জায় এদের থাকে মাথায় আফসান ও পায়ে আলতা ও কপালে টিপ যেটা পাত্রের বাড়ি থেকে পাঠান।

লোকনৃত্য একটি লোকসংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ। তারা একটি নির্দিষ্ট জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ শেখায়। তারা তাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। মুসলিম সমাজে বিবাহ উৎসব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই লোকনৃত্য প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১. আহমদ, ওয়াকিল, ‘বাংলার লোকসংস্কৃতি’, পৃ. ১০০।

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ‘বাংলার লোকসাহিত্য’ ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪।

৩. আহমদ, ওয়াকিল, ‘বাংলার লোকসাহিত্য’, পৃ. ১১৪।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আহমদ, ওয়াকিল, ‘বাংলার লোকসাহিত্য’ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আশ্বিন ১৩৭২ অক্টোবর, ১৯৬৫।

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ‘বাংলার লোকসাহিত্য’ ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ।

৩. ঘোষ, শান্তিদেব, ‘গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য’, কলকাতা ১৯৫৯।

৪. চৌধুরী, ড. দুলাল (সম্পাদিত), ‘বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ’, আমাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

…………………………………………………

সৈকত রক্ষিতের মদনভেরি : বাদ্যযন্ত্রে জনজাতির হদিশ

ড. অর্ধেন্দু সরকার
সহ-অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্যামসুন্দর কলেজ

সারসংক্ষেপ-

সৈকত রক্ষিতের 'মদনভেরি ' এক অন্য ধারার উপন্যাস।এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক একটি বাদ্যযন্ত্রের মধ্য দিয়ে একটি জন জাতিকে আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন।একশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে কথাকার সৈকত রক্ষিতের এষনার ছাপ। তিনি যেন পাঠককে সঙ্গী করে খুঁজতে বেড়িয়েছেন মদনভেরির তত্ত্ব তালাশে।যে পুরুলিয়ার তিনি ভূমিপুত্র তার অদূরেই যে এই বাজনা বাজত তা যেন তিনি জরিপ করে দেখিয়েছেন।উপন্যাসের বিস্তৃততর পরিসরে তাঁর সেই রচনা প্রকৌশল ও চিন্তাসূত্রের বীজগুলিকে তুলে ধরা হবে।

সূচক শব্দ-

উপন্যাস, মদনভেরি , বাদ্যযন্ত্র , জনজাতি, গ্রাম

মূল প্রবন্ধ-

বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবন যাঁদের হাতে নতুন পথের হদিশ পেয়েছে তাঁদের মধ্যে সৈকত রক্ষিত অন্যতম। কথাকার সৈকত রক্ষিতের যাত্রা শুরু হয়েছে উত্তাল সত্তর পর্বে। তিনি নলিনী বেরার সমসাময়িক। শহরের নেশায় যখন বাংলা সাহিত্য বুঁদ তখন সৈকত রক্ষিত তাঁর কথাবয়বে শোনালেন গাঁ-ঘরের মানুষ ও তাদের ভুঁই এর কথা। যে ভুঁই সাত পুরুষের বাড়া।

চেনা অথচ ভাঙাচোরা ঐ জীবনের এমন আলেখ্য যে রচিত হতে পারে তা বাংলা সাহিত্য আগে দেখেনি এমনটা নয়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর , বিভূতি, মানিক এমনকি সমরেশ বসুও দেখিয়েছেন। কিন্তু এ দেখানোয় আছে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের বিশেষত রাঢ় বাংলার মানুষের জীবন সংগ্রাম ও তাদের দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ। ভিন্ন ভাষায় বললে তাঁর কথাসাহিত্যে আছে রুক্ষ ভূমির উপর চলমান মানুষগুলির না জানা কিংবা উপেক্ষিত অনাদৃত এক ইতিহাস।

এই ইতিহাস সতীনাথ ভাদুড়ী কিংবা প্রফুল্ল রায়ের কলমেও ধরা পড়েছে। কিন্তু ভূমিপুত্র হিসাবে সৈকত রক্ষিত যখন লেখেন তখন তাঁর মাত্রা হয় আলাদা। কারণ তিনি—

(i) এই চরিত্রগুলির সঙ্গে যাপন করেছেন।
(ii) এখানকার প্রকৃতি, পরিবেশ তাঁর চেনা।
(iii) এর ভাষা তাঁর রক্তে মিশে আছে।
(iv) এদের সংকটও আসলে তাঁরই বসবাসের সমস্যা।
(v) কীভাবে একটা সমাজের রূপান্তর হয় এবং কাকে সোশ্যাল মবিলিটি বলে তাও তিনি দেখিয়েছেন।

নিজেকে আড্ডাবাজ ও ঘুরে বেড়ানো বলা এই কথাকার ঘুরতে ঘুরতেই সংগ্রহ করেছেন তাঁর কথা-বিশ্বের শব্দ সম্ভার। পুরুলিয়াকে তিনি ভালোবেসেছেন। বক্সিং খেলতে গেছেন। কিন্তু সাহিত্য ভুলে যাননি। আর ভুলে যাননি বলেই ‘সমান্তরাল’-এর সাক্ষাৎকার পর্বে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন ক্যাসিয়ার ক্লের কবিতা পাঠের কথা। বহুভুখ ঐ পাঠ এবং বিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতার রসায়নেই তাঁর সাহিত্যের সাজঘর তৈরি। যেখানে একে একে প্রকাশিত হয়েছে ‘আকরিক’ (১৯৮৪) থেকে ‘উত্তরকথা’ (২০১৫)-র মতো গল্প সংকলন।

তিনি যে শুধু লিখিয়ে তা নন। ভালোবাসেন সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্প্রসারণ। আর তাই আয়োজন করেন ‘সৃজন’ উৎসব। যে উৎসবে সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয়। আর এই দেওয়া-নেওয়ার সূত্রেই তিনি জানতে পারেন মানভূমের এক অবলুপ্তপ্রায় জাতি ও তাদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ‘মদনভেরি’র কথা।

উপন্যাসটির উপস্থাপন কৌশলের অভিনবত্ব হল একটি বাদ্যযন্ত্রকে একটি জাতির ইতিহাসের খোঁজের অনুসঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করায়। ঔপন্যাসিক বাদ্যযন্ত্রের মিথ ও তাকে কেন্দ্র করে মানুষের বিশ্বাসের কথা এত সহজ ও সরল ভাষায় বলেছেন যে পাঠক জানতেই পারেন না যে তারা কখন ইতিহাসের বৃত্তে ঢুকে পড়েছেন। এমন করেও যে ইতিহাস বলা যায় কিংবা ইতিহাস মানেই যে রাজ-রাজাদের নয় তারও সাক্ষ্য বহন করেছে আলোচ্য উপন্যাসটি।

শুধু একটি জাতি নয়, তার পেশার অবলুপ্তির পিছনেও থাকে নানা কারণ। অর্থাৎ সামাজিক দিক থেকে যাকে সাংস্কৃতায়ন বলা হয় তার পিছনে একদিকে যেমন থাকে পেশাগত সংকট তেমনি অন্যদিকে থাকে পেশা পরিবর্তনের মানসিকতা। যা ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'গণদেবতা' উপন্যাসে দেখিয়েছেন। আজকের সময়ে যা আরও বেশি সত্য তাকেই সৈকত রক্ষিত মহাশয় 'মদনভেরি'তে দেখালেন চোড়কু খাসির জীবন যুদ্ধের মধ্যে।

একশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটিতে লেখক আরও দেখিয়েছেন পুরুলিয়ার মানবাজারের উপকণ্ঠে থাকা একটি গ্রাম ও তাদের গোষ্ঠী কীভাবে হারিয়ে গেল। উপন্যাসে যার নাম চাপাইটাঁড়। যে গ্রামের অধিবাসী চোড়কু মরা বাড়িতে ঘাটে ওঠার সময় কিংবা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে বাঁশি বাজাতে যায়। এই বাজানোয় যে সে খুব টাকা-পয়সা পায় এমনটা নয়। কখনো সামান্য চাল আবার কখনো পরিধেয় বস্ত্রই তার প্রাপ্য।

অথচ কী আশ্চর্য এই না খাওয়াতেও কিংবা দারিদ্র্যের চরম সীমাতেও চোড়কু ঘাসির মতো তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পেশার উপর বিশ্বাস হারায়নি। কারণ তারা মনে করত— যে ডেরি বাজিয়ে তারা মর্ত্য থেকে স্বর্গে মানুষের আবির্ভাব ও তিরোভাবের বার্তা প্রেরণ করেছে, তা কখনো অভিশপ্ত করতে পারে, মানুষকে?[১]

কিন্তু বিশ্বাস এক আর বাস্তব পরিস্থিতি আরেক। চোড়কু বিশ্বাসে ভর করেছিল। সে বুঝতে পারেনি বদলে যাওয়া কালের সাথে মানিয়ে নিতে না পারলে অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ডারউইনের তত্ত্ব তার জানা ছিল না। তাই অভিযোজন নয়, সে বেছে নিল পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাসকে। যে বিশ্বাস থেকেই তার ঘোষণা এবং একই সঙ্গে সতর্কবার্তা—

"ঈশ্বর প্রদত্ত এই লোকযন্ত্রটিকে জীবিকার অবলম্বন করে তাদের জন্মজন্মান্তর ধরে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং মনে কোনো অসন্তোষ নিয়ে নয়। যদি কেউ কখনো তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে, প্রলোভনে সে তার নিজস্ব জীবিকা বা বৃত্তি ছেড়ে অন্যের বৃত্তি ধরে, তাহলে সে ঈশ্বরের অভিশাপে নির্বংশ হয়ে যাবে।"[২]

তবে চোড়কু ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তারই সম্প্রদায়ের লোক বলিরাম এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। ব্যান্ডের দল খুলেছে। কিন্তু প্রবহমান সময়কে সে ধরতে পারেনি। তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। ডিভিডি-ভিসিডি তার ব্যান্ডকেও ব্যাকডেটেড করে দিয়েছে। এ যেন তারাশঙ্করের খাজাঞ্চিবাবু এই পরিণতি। ফলে সে আবার পুরানো পেশায় ফিরতে চেয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি।

উপন্যাসে শুধুই যে পেশার সংকট দেখানো হয়েছে এমনটা নয়, একই সঙ্গে এখানে উঠে এসেছে এই অন্ত্যজ মানুষগুলির খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদের অভাব, বাসস্থানের অভাব এমনকী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাও। ঔপন্যাসিক এদের যে খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় কুড়া এদের প্রধান খাদ্য। ভাত খাওয়াটা প্রায় বিলাসিতা কিংবা আনন্দভোজের নামান্তর। কুড়োকে নুন দিয়ে, গুড় মাখিয়ে তারা নিজেরা এবং বাড়ির বাচ্চাদেরও খাইয়ে থাকে।

এদের কাছে বিয়ে মানে নারীদেরকে দমিয়ে রাখা। মুখ নামিয়ে খাটা আর রাতে স্বামীকে সুখ দেওয়াই যে নারীদের কর্তব্য। কথাকার সৈকত রক্ষিত তাঁর এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন এখানে নারী সত্যিই দাসী হয়ে ওঠে। চটুল যৌনতার প্রসঙ্গও তিনি দেখিয়েছেন করব গানের মধ্য দিয়ে।

খাসি সমাজ যে শুধু অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত ছিল এমনটা নয়, তাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্যও ছিল। তাই পদবী পরিবর্তনের ব্যাপার নিয়েও তাদের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দেয়। রাজনৈতিক নেতা উল্টুরাম মাহাত পরীক্ষিৎ খাসিকে নিষেধ করে দেয় নায়েক পদবী ব্যবহার করার ব্যাপারে। নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে পড়ার সরকারি সুযোগ-সুবিধার কথাটিও লেখক জানিয়েছেন স্পষ্টভাবে। উল্টুরাম মাহাতোর মুখে তিনি বসিয়েছেন—

"এরেই শ্লা , পৈখরা কই দেখি কথায় বেধায় রাইখেছিস পৈতাটা? নায়েক বলছিস য্যা! নায়েক ও বেরাম্ভণ । তোর পৈতাটা তাহলে কই? ... শুন, তরা বাবু ঘাসি- মাছুয়ার – গরাৎ যা লেখবি লেখ। কিন্তুক নায়েক লিখিস না। তাইলে যদিবা তদেরকে দু - পাঁচশ- টাকা ঘুসুর লোন ফোন হিসাবে বাইর করে দিবার চেষ্টা করা যাতক, স্যাটাও আর হবেক নাই।"[৩]

এর থেকে বোঝা যায় নিম্নবিত্তের কাছে শিক্ষা কিংবা চাকরির চাইতে অনুদান বিষয়টা অনেক বড় ব্যাপার। আজকের রাজনীতিতে যা সবচাইতে বড় আকর্ষণ। স্থায়ী উন্নয়ন নয়; হাতে গরম কিছু দাওনা চাই। তাহলে মানুষ খুশি। কারণ নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে প্রাথমিক চাহিদার পরিপূরণই শেষ কথা।

খাসিরা করমের পাশাপাশি টুসু পান নিয়েও মাতে। টুসুকে নিয়ে পৌষ সংক্রান্তিতে তারা পৌষ পরব করে। টুসু পরবে নদীর ধারে মেলা বসে। যুবক-যুবতীর দল এই সময় আবির মেখে মেতে ওঠে। উপন্যাসটিতে চোড়কুদের খাসি পাড়ায় অনুষ্ঠিত আরেক প্রকার গানের সন্ধান পাওয়া যায়; যার নাম ঝুমুর। ঝুমুরের মধ্যে তাদের আঁতের ব্যথা শোনা যায়। চড়কুর কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করলে যার রূপ এরকম—

'কন্ ধারের নদীরে বঁধু কনধারাকে গেলি
সাঁঝে ফুটল ঝিঙাফুল বিহানে হারালি
বঁধু তুই কনধারাকে গেলি'[৪]

পরব, উৎসবের পাশাপাশি ঘাসিদের ছৌনাচ, মদনভেরি তৈরির প্রকৌশল এখানে বর্ণিত হয়েছে। আছে প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত ঘাসি সংস্কৃতির নিজস্বতার ছাপ। যেমন পুরুলিয়ার রুখা চাষ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় — চাষবাস/স্বগ্গের আশ।' কিংবা কথার দাম প্রসঙ্গে উচ্চারিত— 'মরদের বাত/হাতির দাঁত।' এর মতো কথা।

বোঝাই যায় ঔপন্যাসিক দুদিনের জন্য বেড়াতে গিয়ে আলপটকা কোনো কথা এখানে লেখেননি। বরং ওদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে একটি জাতি ও তার পেশা কীভাবে বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে তার মর্মন্তুদ ইতিহাসকে এখানে অক্ষরে ধারণ করবার চেষ্টা করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. সৈকত রক্ষিত, মদনভেরি, পুরুলিয়া সংস্কৃত কেন্দ্র, পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০০৮ পৃ. ১৪
২. তদেব, পৃ. ২০
৩. তদেব, পৃ. ১৮৮
৪. তদেব, পৃ. ৭৯

সহ-অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্যামসুন্দর কলেজ

………………………………………………

মনোজ মিত্রর পুরাণের মুখচ্ছদে এক রাজনৈতিক স্যাটায়ার : ‘ নরক গুলজার ’

বিশ্বজিৎ কোনার
গবেষক , কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

ভারত তথা বাংলা থিয়েটারের জগতে স্বনামধন্য নট, নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্র এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। স্কুল-কলেজ পড়ার সময়েই তিনি 'বসুমতী', 'মন্দিরা', 'ছোটোদের পাততাড়ি' ইত্যাদি পত্রিকায় গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'অন্যস্রোত' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে মনোজ মিত্র নাটক ও থিয়েটারে আত্মনিয়োগ করেন। অভিনয়, নাটক লেখা, নির্দেশনা, দল পরিচালনা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রেই তিনি অবাধে বিচরণ করেন। কলকাতা, মফস্বল, পেশাদার-অপেশাদার, অফিস-ক্লাব-পাড়ার সৌখিন নাট্যদল সর্বত্রই তিনি গ্রহণীয় ও আদরণীয় হয়েছেন। নাটককার হিসেবে, অভিনেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অতুলনীয়।

মনোজ মিত্রের নাট্যদর্শন জীবনের প্রতিচ্ছবি, সত্যের প্রতিফলনে নির্মিত। তিনি তুলে ধরছেন যুগযন্ত্রণার ছবি। আমাদের দেশে নাটক রচনা, প্রযোজনা, অভিনয়ে যাঁরা নতুন ধারণার প্রবর্তন করেছেন এবং এখনও সক্রিয় আছেন তাঁদের মধ্যে মনোজ মিত্র অন্যতম। সমসাময়িক মানুষ, তাঁর অন্তর ও বাহির, তাঁর সমাজ অর্থনীতি, রাজনীতি, তার ন্যায়, অন্যায়, তিতিক্ষা, লোভ, লালসা, কৌতুক, বেদনা, কষ্ট, দুঃখ, কান্না যে দর্পনে প্রতিফলিত হয়, সে দর্পনের নাম মনোজ মিত্র।

'নরক গুলজার' নাট্যকার মনোজ মিত্রর পুরাণের মুখচ্ছদে এক রাজনৈতিক স্যাটায়ার। নাটকটি রচিত হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয় ১৯৭৬-এ। ওই বছরের ২৭শে ডিসেম্বর 'নরক গুলজার' প্রথম মঞ্চের মুখ দেখে। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজিত এ নাটক দর্শকমনে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। বাংলা নাটকের প্রযোজনার ইতিহাসে 'নরক গুলজার' নিঃসন্দেহে এক মাইলফলক। এই নাটক যখন লেখা হচ্ছে তখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে (১৯৭১)। কিন্তু যুদ্ধ ও শরণার্থীদের আশ্রয় দেবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ওপর সৃষ্টি হয়েছে বিরাট অর্থনৈতিক চাপ। আন্দোলনকারীদের নিজস্ব বিরোধ ও ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি চারু মজুমদার গ্রেপ্তার ও রহস্যময় মৃত্যুর সঙ্গে নকশাল আন্দোলন নির্বাপিত হয়ে এসেছে। এরপরই ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন ২৫ জুন ১৯৭৫-তে। বিনা কারণে মানুষকে হেনস্থা করা হয়। রুদ্ধ করা হয় বুদ্ধিজীবী লেখক শিল্পীদের বাকস্বাধীনতা। সমগ্র ভারতবর্ষে জুড়ে চলতে থাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ' ভিতু বাঙালি গান্ধী পরিবারের মাতা ও কনিষ্ঠ পুত্রের ভয়াবহ সব কার্যকলাপ নিয়ে কানাকানি করে-চাকরি নেই নিরাপত্তা নেই, মুখ ফুটে অভিযোগ করবার অধিকার নেই, ধসে যাচ্ছে সুস্থ জীবনের মূল্যবোধ।'[১] পরবর্তী নির্বাচনে অবশ্য ইন্দিরা গান্ধী গদিচ্যুত হন। ঠিক এইরকম একটা অস্থির সময়ে নাট্যকার মনোজ মিত্র রচনা করেন এক স্যাটায়ারধর্মী রাজনৈতিক নাটক 'নরক গুলজার' যা একই সঙ্গে বিনোদন এবং প্রতিবাদ।

নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পর 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকা মন্তব্য করে --

> ‘ এদেশের সামাজিক অভিশাপ দূর করতে, এই পাপীদের অনন্ত নরকে
> পাঠাতে আজকের সচেতন মানুষ ও শিল্পী সাহিত্যিককে শুধু কলম নয়,
> যে কোন অস্ত্রের আঘাত হানতে প্রস্তুত থাকতে হবে। 'নরক গুলজার'-
> এর নাট্যকারকে এই শুভ এবং সার্থক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ। ’ [২]

‘নরক গুলজার' নাটকটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত। প্রতিটি অঙ্কে আবার কয়েকটি দৃশ্যে বিভাজিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কে আছে চারটি দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যের সংখ্যা ছয়। প্রথম অংশের চতুর্থ দৃশ্যের পর সিনেমার স্টাইলে বিরতির নির্দেশ দিয়েছেন নাট্যকার। গ্রুপ থিয়েটার অভিনীত নাটক বলেই এমন হওয়া সম্ভব, নচেৎ মঞ্চে অভিনীত হলে নিশ্চয়ই বিরতি দান হওয়া সম্ভব ও উচিত নয়। মনোজ মিত্র প্রতিটি অঙ্ক-দৃশ্যে মঞ্চ নির্দেশ দান করেছেন। মঞ্চটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। স্বর্গ-নরক-মর্ত্য-এই নিয়ে ত্রিলোক গড়ে উঠেছে। আলোক

নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাওয়া যাবে এবং তিনটি লোকের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা গড়ে উঠবে। সমগ্র নাটকটিতে লক্ষ করা যায় দৃশ্য থেকে দৃশ্য রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনও ঘটে যাচ্ছে। পাঠক-দর্শকরা এই মজাদার প্রবহমান নিরবিচ্ছিন্নতা উপভোগ করেন সমগ্র নাটক জুড়ে। নাটককার চরিত্র হিসাবে বেছে নেন মানুষ-দেবতা-ভূত-পিশাচ প্রভৃতি। এরা নাট্য ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত কাউকেও বেহিসেবি বলে মনে হয় না। কারণ 'নরক গুলজার' পুরাণের মোড়কে বাস্তব সমাজের সমকালীন দলিল। তাই নাটককার স্বর্গের দেব চরিত্রগুলোর মধ্যে সমকালের মানুষের কথা ও আচরণ আরোপ করেছেন। নরকে হাজির করেছেন জোতদার, ব্যবসাদার, রাজনৈতিক নেতা, ভন্ড সাধু, মস্তান সকলকেই। ' ইন্দিরা গান্ধী এমার্জেন্সি বলবৎ করে দেশটাকে নরকে পরিণত করেন, সেই নরক গুলজার করেন কিছু ভণ্ড ধূর্ত নির্বোধ খারাপ মানুষ। এই খারাপ মানুষগুলোর অত্যাচার শোষণ ও সন্ত্রাসের কথা নাট্যকার এ নাটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ' [৩] নাট্যকার নাটকের শুরুতেই মর্ত্য দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, সেখানে দেখা যায় জোতদার ঘড়ুই কীভাবে পুলিশের ভয় দেখিয়ে চোর সাজিয়ে চাষি মানিকের তেঁতুলগাছ, বাঁশঝাড় সব হাতিয়ে নিতে চাইছে এমনকী ভিটেটাও।

ঘোড়ুই ।। শুধু তেঁতুল। বাঁশ নেই, কুমড়ো নেই, রুই মাছ নেই...ঐ দ্যাখ খ্যাঁচাকল
এসে পড়েছে...

মানিক ।। এত টাকা কোথায় পাব ?

ঘোড়ুই।। না থাকে দে...(মানিক না বুঝে ঘোড়ুই-এর দিকে হাতের জুতো এগিয়ে দেয়।
ঘোড়ুই জুতো ফেলে ধমক দেয়) ভিটের দলিল দে। ভিটেমাটি পিষে দিস
মানকে-কেসগুলো তুলে নিতে পারি --

(মানিক কাঁদে)

ঘোড়ুই ।। দিবি না হাজতে যাবি। ভিটে তো এমনিতেই ভোগ করতে পারি না...
জীবন যাবে জেল খানায়। যা ঋণ করে নিয়ে আয়। আমি ওনাদের শান্ত করি-[৪]

এভাবে সত্তর দশকের জোতদারদের অত্যাচারের ছবি নাটককার ফুটিয়ে তুলেছেন নাটকের পরতে পরতে। দেব চরিত্রগুলোকে নিয়ে নাটককার যথেষ্ট মজা করেছেন। কিন্তু তার মধ্যেও ধরা পড়েছে সমকালীন সমাজের বাস্তব ছবি। সুন্দর সুসজ্জিত স্বর্গ। পিতামহ ব্রহ্মা পালঙ্কের ওপর নিদ্রিত। নারদমুনি নেচে নেচে গান গাইছে --

কথা বলো না কেউ শব্দ করো না
ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন
গোলযোগ সইতে পারেন না। [৫]

এ গান তো মিথ হয়ে গেছে। গানের প্রতিটি ছত্রে, অক্ষরে ঝড়ে পড়ছে তীব্র শ্লেষ। গান শুনতে শুনতে আমরা হয়তো হেসে উঠি কিন্তু আমাদের অজান্তেই পিঠে এসে পড়ে ব্যঙ্গের চাবুক। নাটকের শুরুতেই সময় ও সমাজের তাপ অনুভব করা যায়। ব্রহ্মা এখানে স্বৈরাচারী শক্তির প্রতীক। জগতের কোনো খবরই রাখেন না। আসলে রাখতে চান না। তিনি জানেনই না, নরকে রক্ষীদের চেয়ে ভূতের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। ওয়েস্টবেঙ্গলের ভূতগুলো খুব ফেরোশাস হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের দুরাবস্থা, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলার চিত্র ফুটে ওঠে চিত্রগুপ্তের সংলাপে- 'নরকপুরীতে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস এই ওয়েস্টবেঙ্গল সেল। ওখানে খুনে আছে, ডাকাত আছে, চোর-জোচ্চোর-গুণ্ডা কে নেই? আছে ঘুষখোর মহাজন, মানুষমারা ডাক্তার।' এমন কী নারী অপহরণের মতো জঘন্য অপকর্মও ঘটত। 'নরক গুলজার' নাটকে যমরাজের বারো নম্বর বউকে অপহরণ করেছে নরকবাসী ভূত-পিশাচরা। যমের বউ-এর প্রতি ব্রহ্মার ভীষণ দুর্বলতা। সেই গোপন আসক্তি তিনি চেপে রাখতে পারেন নি। সমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, সমাজবিরোধীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সামন্তপ্রভু ও পুঁজিপতিরা গ্রাস করতে চাইছে সাধারণের সব-কিছু- এসব জেনেশুনেও ব্রহ্মা নির্বিকার, দিবানিদ্রায় আচ্ছন্ন। অথচ যমের বউয়ের চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন। তাঁকে উদ্ধারের জন্যে কিছুটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নরকবাসীদের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা যেখানে বলেন, 'অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছ তোমরা।' নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে রমণীদের ধরে ধরে টানছ। এটা কি ওয়েস্টবেঙ্গল পেয়েছ ?' তখন বোঝা যায়, নারী অপহরণ কিংবা রমণী ছিনতাই-এর ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে তখন আকছার ঘটছে। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র 'নরক গুলজার' নাটকে আদ্যন্ত ফুটে উঠেছে।

নাটকে দেখা যায় যম ডুকরে কেঁদে ব্রহ্মাকে জানায় যে তার স্ত্রীকে নরকবাসীর ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তের কাছে এর কারণ জানতে চান।

ব্রহ্মা ।। কী কাণ্ড এখানেও হাইজ্যাকিং ? তোমাদের দায়িত্ব ভূত পিশাচদের ঠাণ্ডা
রাখা, এখানে ভূতেরাই তোমাদের ধরে টানছে। এসব কী হচ্ছে মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত ?

চিত্র ।। আজ্ঞে হবে তো। নরক আজ রক্ষীদের চেয়ে ভূতের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে প্রভু।

ব্রহ্মা ।। সে কী ?

যম ।। (ধৈর্য্য হারিয়ে) আরে দূর ছাতা। কোন খবর রাখবে না জেগে উঠে যা শুনছে-
সে কী জানেন এই ওয়েষ্ট বেঙ্গলের ভূতগুলো কিরকম ফেরোশাস।
সাধে কী আর বলে ঘাটের ম-ম (সামলে) আমার মাথার ঠিক নেই ঠাকুরদা
-নাতবৌকে ছাড়িয়ে এনে দিন। [৬]

ব্রহ্মা, নারদ, যম চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলোর আড়ালে নাটককার তৎকালীন সরকরের ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার দিকটি রূপকায়িত করেছেন। তখন পশ্চিবঙ্গে কংগ্রেসী সরকার। প্রশাসন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। নরকের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার ভাষণে তার ছবিই ধরা পড়ে।

ব্রহ্মা ।। হে নরকবাসীগণ ভূত ও পিশাচবাসীগণ পশ্চিবঙ্গ থেকে আগত অভদ্রপাপীগণ...
এটা মস্তানীর জায়গা না। (চিত্রগুপ্তকে) পেটে চাপ দিয়োনা। (নরকের প্রতি)
অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছো তোমরা... যমপুরীর নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে রমণীদের
ধরে ধরে টানছো...এটা কী ওয়েস্ট বেঙ্গল পেয়েছো ?... [৭]

সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গে মস্তানদের খুব বেশি মাত্রায় লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের বদান্যতায় তারা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চালিয়ে ছিল। নাটকে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাকে নরকবাসী নেংটির পরিচয় দিতে গিয়ে জানায় --

চিত্র ।। আজ্ঞে হ্যাঁ এখানে যেমন আপনি সবার ওপরে...ওয়েস্ট বেঙ্গলে তেমনি
মস্তান। চোখের নিমেষে লাশ নামায়। নরক গেলে ত্রিশ হাজার বছর।

নেংটি ।। থোবড়া ছিড়ে নেব। শালা ত্রিশ হাজার মারাচ্ছে। ত্রিশ হাজার বছর নরকে
বসে থাকব, ওদিকে দমদম দিয়ে ঝমঝম ওয়াগনগুলো গড়িয়ে যাবে। এক
একখানা কামরা ঝাড়ব,বিশ হাত কালীর খরচা উঠে আসবে। [৮]

তৎকালীন সময়ে জোতদারদের অত্যাচারও কম ছিল না। গরীব মানুষরা তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শহরে চলে আসছিল। আস্তানা গেড়েছিল প্লাটফর্ম, ফুটপাত, ঝুপড়িতে। সেই চিত্রও ফুটে ওঠে 'নরকগুলজার' নাটকের ঘোড়ুই-এর উক্তিতে, যে মরে গিয়েও মানিকের মতো গরিবের খোঁজ করে। প্রতিশোধ নিতেও ছাড়ে না।

ঘোড়ুই ।। ব্যাটা মানকে। ব্যাটা মানকে ঠিক শহরে পালিয়েছে। শালার ব্যাটা শালা
ওকে ধরতে গিয়ে মরলাম। গলায় ফাঁসি দিয়ে তোর দলিল আদায় করব।
চোদ্দশ টাকা পাই--

ব্রহ্মা ।। চোদ্দশ !

ঘোড়ুই ।। এই যে লেখা রয়েছে-হাঁস, বাঁশ, মাছ, তেঁতুল... নেবার সময় ছিলো নশো
চৌদ্দ টাকা ছ পয়সা। অ্যাদ্দিন সেটা চোদ্দশ হবে না অ্যাঁ ? [৯]

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কীভাবে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছিল তাও নাটককার দেখিয়েছেন। মন্ত্রী আমলা থেকে সাধারণ পুলিশ কেউ এই বৃত্তের বাইরে নয়। স্বর্গের পিতামহ ব্রহ্মাকে জোতদার ঘোড়ুই-এর কাছে চিত্রগুপ্ত ঘুষ নিতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করলে, ব্রহ্মার বক্তব্যঃ

ব্রহ্মা ।। (ট্যাকে টাকা গুঁজতে গুঁজতে) মেলা ফাজলামি করোনা। উৎকোচ ছাড়া
আমাদের ইনকাম কী অ্যাঁ ? আমরা কি খাঁটি, না এগরিকালচার করি, না

মেসিন বানাই ? অতবড় স্বর্গ পুরীর এসট্যাবলিশমেন্ট কস্টটা আসবে
কোত্থেকে অ্যাঁ ? বাবুরা সব ভালো ভালো খাবে... ভালো ভালো ঝর্ণায় গা
ধোবে... ভাল ভাল মৃদঙ্গ চাঁটাবে... ভাল ভাল ইয়েদের নিয়ে ইয়ে করবে।

... বরুণবাবুর তো এমনি গরমের ধাত...এয়ার কন্ডিশন একটু বিগড়োলে ...ঠাকুরদা গেলুম। (ঘোড়ুইকে) যা দিলে হিসেব রাখো...ওপারে গিয়ে তুলে নিয়ো। [১০]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘোড়ুই এর নরক থেকে মুক্তি না হলে সে ব্রহ্মাকে গালাগাল দিতে ছাড়ে না। নরকবাসী পুলিশ খগেনকে ঘোড়ুই অ্যারেস্ট করত বললে সে পাঁচ টাকা ঘুস চায়, সে তা না দিতে চাইলে খগেন বলে আট আনা দিন অন্তত। পুলিশের ঘুষ নেওয়ার নির্লজ্জতম নিদর্শন রেখেছেন নাটককার খগেনের গানের মাধ্যমে –

আমি হলাম ঘুষের রাজা... ঘুষ ছাড়া ভাই নড়ি না
কড়ি যদি নাই পড়ে...চোরকে আমি ধরি না।
লেকটাউনে বাড়ি ছিল... বারাসাতে বাগান বাড়ি
আমার প্রিয়ার কণ্ঠে ছিল... চন্দ্রমুখী সপ্তনরী।[১১]

পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন এবং সমকালীন রাজনীতির ভণ্ডামিকে ধরতে চাইছেন, যা ব্রহ্মা এবং ডুপ্লিকেট বাঁটুলরূপী নারদ এর কথোপকথনের মধ্যে ধরা পড়েঃ

ব্রহ্মা ।। ওই জামাকাপড়েই হয়। দেশনেতা...সে একটা খোলতাই ড্রেস ছাড়া আর কী ?
নেংটি ইঁদুরকে পরিয়ে দাও বাঘের মত হালুম করবে। টাকা মেরে
মেরে টিকটিকিগুলো দু দিনেই হয় টাকার কুমীর।

নারদ ।। হ্যাঁ হ্যাঁ টাকা টাকা। পাবলিককে লাইসেন্সের টোপ দিয়ে টাকা...
বেকারকে চাকরির টোপ দিয় টাকা... খরা রিলিফের টাকা। সে বছর খরা
না হয়েছে, খরা সৃষ্টি কর রিলিফ বসিয়েছি। আমি বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস
-জনগণের পকেট কেটে ফেঁপে উঠেছি। [১২]

মনোজ মিত্র এভাবেই পুরাণের স্ট্যাম্প পেপারে সমকালীন সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরেন। 'নরক গুলজার' তাই একটি সমকালের দলিল এবং বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নাটকও। নাট্যকার স্বর্গ ও নরক দৃশ্যের পাশাপাশি মর্ত্য দৃশ্যের অবতারণা করেন। মানিক - ফুল্লরার দুঃখদারিদ্র্য পীড়িত জীবনকে দেখিয়ে সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন সেখানে। শহরের ধারে জলের পাইপের গা ঘেষে পাতানো ঝুপড়ির ভেতর মানিক ফুল্লরার সংসার। বিয়ের আগে ফুল্লরা বালির চরে ছুটে বেড়াত, পাগল গাঙে ভুসভুস করে ডুব মারত, সড়কি দিয়ে চিতাবাঘের মাথা ফাটাত, সটাং সটাং করে তীর বিধত পাখির বুকে। এমনকি রাতের বেলায় দল বেঁধে ঢোলে ঘা দিয়ে গান করত। মানিকের সঙ্গে ঘর বাঁধার পর সে থিতু হয়ে গেছে। মানিক সারাদিন শহরে ঠেলাগাড়ি টানে। কিন্তু যা আয় হয় সমস্ত গ্রাস করে শোষক বাঁটুল বিশ্বাস। মানিক গ্রামে জোতদার ঘোড়ুই-এর শোষণ থেকে বাঁচতে শহরে এসে বাঁটুল বিশ্বাসের হাতে পড়ে। অর্থাৎ শোষক শোষিতের পিছন ছাড়ে না। সেখানে গ্রাম-শহরের ভেদাভেদ নেই। ঠেলাখানা তার, তবু কেন সে টাকা পায়না ফুল্লরা জানতে চাইলে মানিক বলেঃ

মানিক ।। বলে কি করব ? নইলে ঘোড়ুই আমার জমি ভোগ করে, আর আমায়
বলে চোর। তার জাল কেটে বেরিয়ে আসি তো আরেকখানা জাল।
শালা বাঁটুল। আমার ঠেলার দাম তোলে আমারই মুজরি কেটে। ওদিকে
গাঁয়ের ঠ্যালা... ইদিকে সত্তুরের ঠ্যালা। [১৩]

অভাবের তাড়নায় জীবনের প্রতি স্বামী-সংসার-সন্তানের প্রতি ফুল্ললার ঘেন্না ধরে গেছে। বাঁচার খিদের জন্য কান্না, ক্লান্ত মানিকের খাবারের জন্য আকুল প্রার্থনা তাকে ব্যাকুল করে দেয়।

মানিক ।। আর খোঁচাস না। দে, বেতো ঘোড়াটারে দানাপানি দে। (থালা পেতে বসে)

ফুল্লরা ।। ওরে ওঃ ভিখ মেঙে আমি ওরে খাওয়াব। হারামি শালা হাত পা ভেঙে
পড়েছে মোর ঘাড়ে যা যা...

মানিক ।। কুথায় যাব ?

ফুল্লরা ।। (মানিকের সামনে থেকে থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে) এই শালা চাষা...
বাপ বলতো ভেড়ার জাত...না পারে সড়কি ধরতে... মড়ার জাত...
জনম ভোর বাঁধবে বলে ওডারে ডেকে এনেচে। ওডারে রাখবি কুথায়।

মানিক ।। রাস্তায় জন্মেছে রাস্তায় থাকবে।[১৪]

মানিকের এই বক্তব্যে ফুল্লরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সন্তানকে খাদ্য বাসস্থান না দিতে আশঙ্কা ফুল্লরাকে পলায়নকারী করে তোলে। সে মানিক-সন্তানকে ছেড়ে চলে যেতে চায় তার পুরানো যাযাবর জীবনে। সে ঢোল বাজাবে গান শোনাবে বাবুরা পয়সা দিয়ে তাকে মাথায় করে রাখবে। মানিক তাকে কাতর অনুরোধ জানিয়ে বলে রুগ্ন ছেলেটা যে কটা দিন বাঁচে তার কাছে সে যেন থেকে যায়। কিন্তু ফুল্লরা তার অনুরোধে আমল দেয়নি। কারণ তার কাছে এটা শেকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফুল্লরা সন্তানকে ছেড়ে যেতে পারেনি। মূর্তিমান যমরাজকে দেখে ফুল্লরা চিৎকার করে বলে --

ফুল্লরা ।। ও মাগো...ওমা কেডা আছো... আমার ছেলেটারে বাঁচাও... [১৫]

ওদিকে মানিক জীবনের প্রতি ঘৃণায় সন্তানকে নিকেশ করে পথের কাঁটা সরাতে চায়। কিন্তু ফুল্লরা তার সন্তানকে পরম মমতায় আগলে রাখে। মানিক নিজেই বিশেষ পাত্রে চুমুক দেয়, বলে --

মানিক ।। এ শালা জেবন... বেতো ঘোড়ার জেবন-মড়া জাতের জেবন...
বেগার খাটার জেবন... রাখব না এর চিহ্ন রাখব না... [১৬]

শেষ পর্যন্ত মানিকের মৃত্যু হয়। সে নরকে স্থান পায়। সাক্ষাত হয় ঘোড়ুই, মস্তান নেংটি, খগেন, গুঁই বাবা, পান্নার সঙ্গে। ঘোড়ুই মানিককে দেখে শিহরিত হয়ে ওঠে।

ঘোড়ুই ।। তেঁতুল... আমার তেঁতুলের দাম।... হাঁস, বাঁশ, নারকেল... সুদে আসলে
উনিশ শো...হাঁঃ হাঁঃ... [১৭]

শোষিতের যে মরেও নিস্তার নেই এটাই নাটককার বোঝাতে চেয়েছেন। অবশেষে মরণের পারে ঠেকে যাওয়ার মানিক নব জন্মের আশায় নারদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় মর্ত্যের রিবার্থ বুক। বাঁটুলরূপী নারদ তার আসল পরিচয় দিয়ে বলে-'যাও মর্ত্যে আসল বাটুল ঘোড়ুই সব ছাড়া রয়েছে... তোমার ছেলেকে গিলে খাবে বলে। শেষ লড়াইটা ওখানেই হবে যাও। এ উপলব্ধি শুধু মানিকের নয়, নাটককারেরও। তাই নারদের মুখ দিয়ে তাঁর ঘোষণা --

নারদ ।। হ্যাঁ। তোমাদের হবে নবজন্ম... নতুন বিশ্বে মানিকচাঁদ ফুল্লরা – [১৮]

মানুষের নবজন্মে বিশ্বাসী নাটককার মনোজ মিত্রও। তাই দেবতাসহ 'যে সব ক্ষমতাবান ধর্ম ও অর্থকে কব্জা করে মানিক-ফুলিদের উপর আধিপত্য চালাতে চায় মনোজ মিত্রের উৎকল্পনা তাদের সকলকেই গোরু বানিয়ে তোলে। তার হাত থেকে এমন কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও রেহাই মেলে না। নাটককার এও মনে করেন যে 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ মানুষের শেষ লড়াই করে মানুষ নিজেই, স্বর্গের কোন দেবতা নয়। তাই নাটকের শেষে দেখা যায় মানিক-ফুল্লরাদের জয় হয়। শোষিতদের হাতে শোষকদের পরাজয় একদিন নিশ্চিত হবেই এই সত্য স্থাপিত হয়। স্বর্গের দেব-দেবীদের নিয়ে এই মজার একদিকে যেমন হাস্যরসের উদ্রেক তেমনি দেশটা যে ক্রমশ গাভীদের রাজত্ব হয়ে উঠেছে রূপক -পুরাণে এ ইঙ্গিতও দিয়ে দেন নাট্যকার।

পৌরাণিক নাটকে মনোজ মিত্র এযুগের জীবনকে সন্ধান করেছেন। যার ফলে নাটকের গঠন পদ্ধতি অর্থাৎ নির্মিতি এসেছে নতুন ধারায়। মনোজ মিত্র চেয়েছিলেন পুরাণকে তথা পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রকে এই যুগের মানব চরিত্রের উপযোগী রূপে গড়ে তুলতে। মনোজ মিত্রের পৌরাণিক নাটকের বা সামগ্রিকভাবে নাটকের মধ্যে যে অন্বেষণটা প্রাধান্য পেয়েছে তা হল যুগপ্রেক্ষিতে মানবিক উত্তরণ। মানব ধর্মকে উন্মোচিত করা তাঁর নাট্যরচনার মূল বৈশিষ্ট্য। তবে একালের একজন সমালোচকের দৃষ্টিতে যেসব পৌরাণিক যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে সেগুলি সবই ঘটেছে "যোনির জন্য, যোনির উপরেই"। মনোজ মিত্রের পৌরাণিক নাটক তার ব্যতিক্রম নয়। পুরাণে নারীকে যে

চোখেই দেখা হোক না কেন, নারী ছিলেন ভোগের সামগ্রী এবং পুরুষের কৃপার পাত্রী। আমরা একালে পৌঁছে নারী সেই মানবিক অধিকারের পরিবর্তন লক্ষ করেছি। বিশেষ করে মনোজ মিত্র সেই পরিবর্তিত জীবনসত্য ও জীবনভাবনা নিয়েই বাংলা নাট্যচর্চায় পুরাণ প্রসঙ্গকে এক বিচিত্র বাঁকবদলের দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। মনোজ মিত্র মূলত মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং জীবনকে এক মহৎ প্রেরণার গভীরভাবে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন।

তথ্যসুত্র

১) সৌমিত্র বসু, নাটককার মনোজ মিত্র, জনপ্রিয়তার দুই দশক: স্যাস সপ্তম বর্ষ ১৯৯০, পৃ.৮৬

২) এপিক থিয়েটার মার্চ ১৯৯৭

৩) বিভাস চক্রবর্তী: গবেষককে এক সাক্ষাতকারে একথা জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নেওয়ার তারিখ ২৪.১০.২২

৪) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৬০

৫) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৬১

৬) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৬৩

৭) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৬৯

৮) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৭০

৯) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৭১

১০) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৭২

১১) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৭৪

১২) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৭৬

১৩) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৭৮

১৪) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৭৯

১৫) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৮১

১৬) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৮২

১৭) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৯৪

১৮) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ১০৫

সহায়ক গ্রন্থ

১) সময়ের অমেয় আঁধারে মনোজ মিত্র , সম্পাদনা – মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

২) নাট্যকার মনোজ মিত্র পাঁচ দশক(১৯৫৯ -২০০৯) ,জয়ন্ত কুমার সিনহা মহাপাত্র , সোপান

....

মধুসূদন দত্তের 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' : বহুমাত্রিক অন্বেষণ

ড.দেবযানী ভট্টাচার্য্য
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
সংস্কৃত বিভাগ, এম.বি.বি.কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

সংক্ষিপ্তসার:

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। আধুনিক বাংলা কাব্যের এই আদি কবি বঙ্গীয় সাহিত্যভূমিতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য বাণীগঙ্গার স্রোতধারা প্রবাহিত করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণীসাধনাকে তিনি সর্বপ্রথম এক সূত্রে গ্রথিত করলেন। একদিকে বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি কাব্য, অন্যদিকে মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী। এদের মধ্যে যে প্রভেদ তা সামান্য নয় - একেবারে দিন ও রাত্রির প্রভেদ। ছন্দে, ভাষায়, ভাবকল্পনায়, বাগ্ বিন্যাসে, কায়াগঠন রীতিতে, অন্তর্নিহিত রসের আবেদনে মধুসূদনের নির্মিত কাব্য সত্যিই অভিনব। তিনি কাব্যলক্ষ্মীর নির্ভর নির্দেশে, বিশুদ্ধ রসসৃষ্টির প্রেরণা বসেই, সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি মহাকাব্য, খন্ডকাব্য, গীতিকবিতা, নাটক, প্রহসন- সাহিত্যে বহুতর শাখায় দখল রেখে গেছেন।

মধুসুদনের রচিত পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) অমিত্রাক্ষর ছন্দে পত্র আকারে রচিত। এই কাব্যটিতে পৌরাণিক কাহিনির নারীরা এখানে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। ভারতীয় নারী চরিত্রগুলোকে মাধ্যম করে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি সৃষ্টি করেছেন। আমরা জানি যে ধর্মের ভয় ও ধর্মের কথা বলে আবহমানকাল ধরে ভারতীয় হিন্দু সমাজে ও জীবনে নারীদেরকে নির্যাতন অত্যাচার অপমান করা হয়েছে। তাই এই সমাজের নির্যাতিত, অবহেলিত, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত নারীরা পুরুষের সমাজব্যবস্থা ভেঙে, ধর্মের গোঁড়ামি শেকল ছিঁড়ে, শাসকের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে দৃঢ় প্রত্যয়কে ধারণ করে আপন অধিকারের স্বপ্নকে বুকে নিয়ে চরম বিদ্রোহ করেছে। সব অন্যায় জুলুম অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এসব নারীকে কবি মধুসূদন স্বদেশ চেতনার প্রতীক হিসেবে 'বিরাঙ্গনা' কাব্যে দাঁড় করিয়েছেন আমাদের সামনে।

'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম পত্র। এ পত্রের কাহিনির উৎসসূত্র মহাভারত ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক। কাব্যে মহাভারত ও শকুন্তলা নাটকের ভাব ও ভাবনার স্বচ্ছন্দ অনুপ্রবেশ ঘটলেও কবি আখ্যান নির্মাণ ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার আশ্রয় নিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের নাটকে তৃতীয় অঙ্কে দুষ্মন্তকে পদ্মপাতায় নখের আঁচড়ে লেখা শকুন্তলার প্রেমপত্রের কথা কবির অজ্ঞাত ছিল না। তবে একাব্যে শকুন্তলার পত্র-রচনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। মহাভারত ও কালিদাসের নাটক থেকে আমরা জেনেছি রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে তাকে কন্বমুনির তপোবনে রেখেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দীর্ঘদিন যাবৎ পত্নীর আর কোনো তত্ত্বাবধান করেননি। কালিদাস 'দুর্ব্বাসার অভিশাপ' নামক কল্পিত ঘটনার মাধ্যমে ভোগী রাজার ঔদাসীন্যকে কিছুটা শোভনতার আড়ালে রাখতে চাইলেও মধুসূদন তাকে গুরুত্ব দেননি, বরং রাজার এই ঔদাসীন্যে উপেক্ষিতা নারীহৃদয়ের যন্ত্রণা ও উদ্বেগ থেকেই শকুন্তলাকে দিয়ে এই পত্র রচনা করিয়েছেন।

মুল শব্দ:
পত্র, নারী হৃদয়, উদ্বেগ, প্রেমের স্মৃতি, বিরহ, অতিত ও বর্তমানের খণ্ডচিত্র।

মুল প্রবন্ধ:

|| এক ||

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। আধুনিক বাংলা কাব্যের এই আদি কবি বঙ্গীয় সাহিত্যভূমিতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য বাণীগঙ্গার স্রোতধারা প্রবাহিত করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণীসাধনাকে তিনি সর্বপ্রথম এক সূত্রে গ্রথিত করলেন। একদিকে বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী, মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি কাব্য, অন্যদিকে মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী। এদের মধ্যে যে প্রভেদ তা সামান্য নয় - একেবারে দিন ও রাত্রির প্রভেদ। ছন্দে, ভাষায়, ভাবকল্পনায়, বাগ্ বিন্যাসে, কায়াগঠন রীতিতে, অন্তর্নিহিত রসের আবেদনে মধুসূদনের নির্মিত কাব্য সত্যিই অভিনব। তিনি কাব্যলক্ষ্মীর নির্ভর নির্দেশে, বিশুদ্ধ রসসৃষ্টির প্রেরণা বসেই, সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি মহাকাব্য, খন্ডকাব্য, গীতিকবিতা, নাটক, প্রহসন- সাহিত্যে বহুতর শাখায় দখল রেখে গেছেন।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে যশোহর জেলায় সাগরদাঁড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেছেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। বিত্তবিলাসিতা আর অকুণ্ঠ বদান্যতার আবহাওয়ার মধ্যেই বালক মধুসূদন প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে মধুসূদনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। মধুসূদনের বাল্যকালের সাথী ছিল আর্য -মহাভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ- কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত। মধুসূদন নিঃসর্গের নহেন , তিনি মানবজীবনের কবি। তাঁর কাব্যে মানবেরই জয় গান গাওয়া হয়েছে। সুদূর ফরাসী দেশের ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালে বাঙালি- কবি মধুসূদন সাগরদাঁড়ি গ্রামটিকে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করে অশেষ মানসিক বিক্ষোভের মধ্যেও শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেছেন।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন সপরিবারে মধুসূদন ইউরোপ গমন করলেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া শুরু করলেন। উপায়ের চেয়ে খরচ বেড়ে যাওয়ায় দেনায় জড়িয়ে পড়লেন। শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগরের দয়ায় বিপদমুক্তি ঘটলো। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে গিয়ে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সনেটগুলো রচনা করলেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই সনেটগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন স্বদেশে ফিরে আসেন।

স্বদেশে ফিরে এসে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু অর্থের অভাব মিটলো না। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে হাইকোর্টের অনুবাদকের পরীক্ষকের চাকরি নেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মহাকবি হোমারের ইলিয়াডের অনুবাদ 'হেক্টর বধ' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জুন পত্নী হেনরিয়েটা মারা যান। এর ঠিক তিনদিন পরে ২৯ জুন কলকাতায় জেনারেল হাসপাতালে মহাকবি মধুসুদন ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করেন।মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'মায়াকানন' নাটক প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বেই মধুকবি নিজ হস্তে সমাধি লিপি লিখে রেখে যান-

"দাঁড়াও পথিক বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এ সমাধিস্থলে।
জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম, মহীর কোলে মহানিদ্রাকৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।"[১]

মধুসূদন দত্ত নাট্যকার হিসেবেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পদার্পণ করেন। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর রচিত'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়।১৮৫৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর "শর্মিষ্ঠা" নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। এটিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন, যথা: 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং পূর্ণাঙ্গ 'পদ্মাবতী'(১৮৬০) নাটক। পদ্মাবতী নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অমিত্রাক্ষরে লেখেন 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। এরপর একে একে রচিত হয় 'মেঘনাদ বধ কাব্য' (১৮৬১) নামে মহাকাব্য, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬১), 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬২), 'চতুর্দশপদী কবিতা' (১৮৬৬), ১৮৭১ সালের শেষভাগে মহাকবি হোমারের " ইলিয়ড " মহাকাব্য অবলম্বন করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলায় "হেকটর বধ" প্রকাশ করেন।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামক মহাকাব্য। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হলো দ্য ক্যাপটিভ লেডি, শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী (নাটক), পদ্মাবতী (নাটক), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, হেকটর বধ ইত্যাদি।

|| দুই ||

মধুসুদনের রচিত পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) অমিত্রাক্ষর ছন্দে পত্র আকারে রচিত। এই কাব্যটিতে পৌরাণিক কাহিনির নারীরা এখানে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। ভারতীয় নারী চরিত্রগুলোকে মাধ্যম করে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি সৃষ্টি করেছেন। আমরা জানি যে ধর্মের ভয় ও ধর্মের কথা বলে আবহমানকাল ধরে ভারতীয় হিন্দু সমাজে ও জীবনে নারীদেরকে নির্যাতন অত্যাচার অপমান করা হয়েছে। তাই এই সমাজের নির্যাতিত, অবহেলিত, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত নারীরা পুরুষের সমাজব্যবস্থা ভেঙে, ধর্মের গোঁড়ামি শেকল ছিঁড়ে, শাসকের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে দৃঢ় প্রত্যয়কে ধারণ করে আপন অধিকারের স্বপ্নকে বুকে নিয়ে চরম বিদ্রোহ করেছে। সব অন্যায় জুলুম অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এসব নারীকে কবি মধুসূদন স্বদেশ চেতনার প্রতীক হিসেবে 'বিরাঙ্গনা' কাব্যে দাঁড় করিয়েছেন আমাদের সামনে। মধুসূদনের অন্তরে যে স্বদেশবোধ, স্বদেশচেতনা, জাগ্রত হয়েছিল তা তিনি এই কাব্যে নারীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। নারীরা পুতুল নয়, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও আছে। নারীদেরকে তাদের দাবি ও অধিকারে কথা দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন এবং অসত্য অন্যায় বৈষম্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলেছেন। মধুসূদন স্বাধীনতা মুক্তির কথা বিশ্বাস করতেন তাই তিনি নারীদেরও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও মুক্তির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। এখানে স্বাতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও সমমর্যাদার অভিপ্রায় নিয়ে নারীরা জীবন সত্যের জয়গান গেয়ে নির্ভীকচিত্তে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করে তুলেছে। মূলত এই পত্র কাব্যে নারীরা অপার প্রেম ও ভালোবাসার মূল শক্তিতে বীরাঙ্গনা হয়ে ওঠার পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতার ইচ্ছে শক্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

|| তিন ||

'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম পত্র। এ পত্রের কাহিনির উৎসসূত্র মহাভারত ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক। কাব্যে মহাভারত ও শকুন্তলা নাটকের ভাব ও ভাবনার স্বচ্ছন্দ অনুপ্রবেশ ঘটলেও কবি আখ্যান নির্মাণ ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার আশ্রয় নিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের নাটকে তৃতীয় অঙ্কে দুষ্মন্তকে পদ্মপাতায় নখের আঁচড়ে লেখা শকুন্তলার প্রেমপত্রের কথা কবির অজ্ঞাত ছিল না। তবে একাব্যে শকুন্তলার পত্র-রচনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। মহাভারত ও কালিদাসের নাটক থেকে আমরা জেনেছি রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে তাকে কন্বমুনির তপোবনে রেখেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দীর্ঘদিন যাবৎ পত্নীর আর কোনো তত্ত্বাবধান করেননি। কালিদাস 'দুর্ব্বাসার অভিশাপ' নামক কল্পিত ঘটনার মাধ্যমে ভোগী রাজার ঔদাসীন্যকে কিছুটা শোভনতার আড়ালে রাখতে চাইলেও মধুসূদন তাকে গুরুত্ব দেননি, বরং রাজার এই ঔদাসীন্যে উপেক্ষিতা নারীহৃদয়ের যন্ত্রণা ও উদ্বেগ থেকেই শকুন্তলাকে দিয়ে এই পত্র রচনা করিয়েছেন।

শকুন্তলার পত্রটি মূলত 'স্মরণ' অনুসঙ্গ ভিত্তিক। এককথায় একে শকুন্তলার 'visioris of the post' বলা চলে। তবে গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা শকুন্তলা রাজমহীষীর সম্মান তখনো পাননি। দুষ্মন্তের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্যই রাজকুলবধূর প্রাপ্ত সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিতা হয়ে তিনি আজ তাত কন্বের আশ্রমে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। প্রিয়তম কর্তৃক পরিত্যক্তা হওয়ায় দুষ্মন্তের প্রতি অভিমান বশত পত্রটিতে অসহায়া নারীর মৃদু অনুযোগের সুরও কিছুটা যুক্ত হয়েছে। সমগ্র পত্রটিতে শকুন্তলার অন্তর্বেদনা ও অভিমান ব্যক্ত করবার জন্য কবি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করেছেন এবং সেই বিষয়গুলির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে ১২ টি স্তবকে বিন্যস্ত কাব্যাংশটির সূচনা, সমাপ্তি ও মধ্যবর্তী অংশ এই পত্রে পরপর ধারিবাহিক বিষয়গুলি হল—দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম দর্শন, নিকুঞ্জ মিলন, রাজার বিদায়গ্রহণ, রাজা কথা না রাখায় শকুন্তলার দ্বিধা, স্বপ্নচারণ ও পরিশেষে পরিত্যক্ত স্ত্রীর নারীসুলভ অভিমান ও মৃদু অনুযোগ।

প্রথম স্তবকেই দেখি তপোবনবাসিনী শকুন্তলা নিজেকে দাসীরূপে নিবেদন করে রাজেন্দ্র দুষ্মন্তকে প্রণাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেছে। এই স্তবকের মূল বিষয়টি হল আশামদে মত্ত শকুন্তলার দুষ্মন্তের জন্য প্রতীক্ষা এবং সর্বদা প্রাণনাথের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে ধূলারাশি উত্থিত হতে দেখে, বাতাসের শব্দ শুনে রত্নালংকৃতা হস্তীসহ রাজার বনে পুনঃপ্রবেশ ঘটেছে বলে তার মনে ভ্রমের সৃষ্টি। পত্রটি শুরু হয়েছে অপ্রত্যক্ষ উক্তির বৈপরীত্য।

"বননিবাসিনী দাসী নামে রাজপদে,

রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমার কভু পারে কি অভাগী ?
হায় আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!”[২]

এভাবে পত্রের সূচনা থেকেই কবি তাঁর বক্তব্যকে সংলাপাশ্রয়ী করে তোলবার জন্য নায়িকার কথক সত্তাকে বিভাজিত করে দেখিয়েছেন। এই বিভাজনের ক্ষেত্রে নায়িকার দ্বৈত সত্ত্বার এক অংশ অপর অংশকে বিপরীত প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করেন।

দ্বিতীয় স্তবকে ভ্রমবশত শকুন্তলাকে নিকুঞ্জবনে ছুটে যেতে দেখা যায়। সেখানে পূর্বের মতোই মুকুলিত লতা, কোকিলের গীত, কপোত-কুজন, অলি গুঞ্জন সবই আছে, কিন্তু যে পদযুগল দেখার আশায় সে ব্যাকুল ভাবে সেখানে ছুটে উঠেছে। সেই কেবল অনুপস্থিত। আর এবারই তার ভ্রম ভাঙে। তার চোখ জলে ভেসে যায়, স্বামী বিরহে নিকুঞ্জবনের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য শকুন্তলার মনে সৃষ্টি করে অন্য এক উপমা। গাছের পাতার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করে সে বলে ওঠে-

শোন, পত্র সরস দেখিলে
তোরে,সমীরণ আসি নাচে লয়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুখাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে;-
তেমনি দাসীর কি রে ত্যজিলা নৃপতি ?”[৩]

৩য় স্তবকেও এরই পুনরাবৃত্তি। তৃতীয় স্তবক পর্যন্ত সবটাই যেন শকুন্তলার স্বপ্নচারণা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ভরা তাছাড়া, প্রকৃতির বেদনা ও শকুন্তলার মনোবেদনা উভয় যেন একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে এই স্তবক পর্যন্ত। ৪র্থ স্তবক গড়ে উঠেছে শকুন্তলার স্মৃতি রোমন্থনকে কেন্দ্র করে। ৫ম স্তবক থেকে দুষ্মন্তের প্রতি বিরহজনিত উভয়ের মর্মোচ্ছ্বাস-এর প্রকাশ। ষষ্ঠ স্তবকে কবি শকুন্তলাও দুষ্মন্তের মিলন প্রসঙ্গ উল্লেখের সময় থেকে একেবারে শেষ স্তবক পর্যন্ত দেখেছি এরই ক্রমিক বিকাশ। তার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব বিবাহ ও নিকুঞ্জে ফুলশয্যার কথাও বলেছেন। শকুন্তলার জীবনের সব সুখশান্তি নষ্ট করে চলে যাবার জন্য দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার মৃদু অনুযোগ-এর দিকটিও রয়েছে।

দ্বাদশ স্তবকে প্রদত্ত আত্মপরিচয় অংশে শকুন্তলার মধ্যে দুষ্মন্তের প্রতি আত্মনিবেদনের ভাবটি প্রধান হয়ে উঠেছে। নিজেকে সে বারবার বন-দাসী, অভাগী, পাগলিনী, অনাথিনী, অবলা বলতে চেয়েছে। প্রথম পর্যায় থেকে দাসী, বন-বিনাসিনী, বাকল-বসনা এসব বলে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে রাখতে একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে নিজের নাম প্রকাশ করেছেন শকুন্তলা (দশম স্তবক)– “দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ যুগে?”৪ এভাবে নিজের পরিচয় দেবার যে কৌশল তা পত্রটিকে নাটকীয় চমৎকারীত্ব দান করেছে। এসব শব্দের মধ্যে দাসী ও অভাগী শব্দদুটির একাধিক ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো। শকুন্তলা নিজের প্রতি দাসী কথাটি ব্যবহার করেছে এগারবার। শকুন্তলা সামান্যা বনবাসিনী নারী, তবুও সে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর রাজা দুষ্মন্তকে ভালোবেসেছে। এই অসম ভালোবাসার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রযুক্ত বাক্যে। রাজাকে সে নৃপতি, রাজেন্দ্র, মণি সম্ভাষণে ভূষিত করেছে। কিন্তু তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করলেও স্বামী পরিত্যক্ত অবহেলিতা শকুন্তলা নিজের পত্নী পরিচয় গুরুত্ব দিয়ে দাসী শব্দটি প্রয়োগ করেছে মধুসূদনের সৃষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে সচেতন নারীর পক্ষে নিজেকে এভাবে দাসী বলে উল্লেখ করবার ঘটনাটি এজন্যেই কোথাও কোথাও ‘বীরাঙ্গনা' কাব্যের পক্ষে আপাতদৃষ্টিকে বেমানান বলে মনে হয়। হয়তো ‘দাসী’ বলতে শকুন্তলা নিজেকে রাজপদে অবনতা আত্মনিবেদিতা বলেই বোঝাতে চেয়েছে। তাই ‘দাসী' এক অর্থে স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠা শকুন্তলার প্রগাঢ় প্রেমিকা সত্তারই পরিচয়বাহী।‘বন-নিবাসিনী’ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তিনবার (বনাচর সহ)। ‘ধন-নিবাসিনী’-এর অর্থতপোবন লালিতা আশ্রয়বাসিনী কন্যা। ‘পাগলিনী’ শব্দটি একবার প্রযুক্ত হয়েছে। এর অর্থ প্রিয়বিচ্ছেদে উন্মাদিনী। ‘অভাগী’ ও ‘অভাগিনী’ শব্দটি বেশ কিছুবার ব্যবহৃত হয়েছে। সংখ্যাগতভাবে ‘দাসী'ই বেশিবার ব্যবহৃত তবে অন্যান্য শব্দগুলি ‘দাসী' শব্দটির সহযোগী হয়ে অর্থ বিস্তারে সাহায্য করেছে।

পত্রটিকে প্রযুক্তি একটি বাক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ “গন্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে”৫ এই বাক্যের মধ্যে দিয়ে শকুন্তলা ‘গন্ধর্ব' বিবাহকে রাজার ছলনা বলে কটাক্ষ করেছে। এই বাক্যের মধ্যে দিয়ে কৌশলে রাজা দুষ্মন্তের চরিত্রের দুর্বলতম দিকটি অনেকটাই উন্মোচন করেছেন কবি। তাছাড়া এই বাক্যে শকুন্তলার মর্মবেদনার কারণটি সুস্পষ্ট হয়েছে। তবে এই বিরহিণী শকুন্তলাই সব নন, তার

প্রেমে একদিকে রয়েছে বেদনা, অপরদিকে মুগ্ধতা। সে একই সঙ্গে প্রেমের স্মৃতিতে বেদনাবিধুর আবার, স্বামীর কাছে পৌঁছানোর জন্য একান্ত প্রত্যাশায় বুক বেঁধে অপেক্ষারত-প্রেমিকা নারীর এই দ্বৈত সত্তাকে কবি তার প্রতিভার সাহায্যে আপন মহিমায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রিয় বিচ্ছিন্না নারীর তীব্র বিরহবেদনার মধ্যে সজীব রেখেছেন তাঁর প্রাণের আশালতটিকে—

"কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি-এই লোভ মনে,-
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!"[৬]

এই উক্তিটির মধ্যে শকুন্তলা 'বীরাঙ্গনা'-র অন্যান্য নায়িকাদের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। শকুন্তলাকে আমরা এখানে বিবাহিতা বলেই ধরে নেব (কারণ গন্ধর্ব বিবাহ-এর উল্লেখ পত্রে আছে)। সেদিক থেকে বীরাঙ্গনার অন্যান্য বিবাহিতা নারী যেমন কেকয়ী, জনা এরা তাদের স্বামীর অবহেলা, অবিচারকে নীরবে সহ্য না করে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে ও শেষ পর্যন্ত স্বামীর পায়ে নতি স্বীকার না করে প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রাখতে চেয়েছে। কিন্তু শকুন্তলা তেমন নন। তিনি স্বামীর এই চূড়ান্ত অবহেলা সত্ত্বেও দুষ্মন্তের রাজসভায় রাজমহিষীপদে গৃহীতা হবার আশা করে, বিভব নয়, ঐশ্বর্য নয়, কেবল 'দাসীভাবে' স্বামীর পদসেবা করবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কারণ, তার বক্তব্য-"জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!"[৭]

পত্রটিকে নাটকীয় একোক্তিগুলির স্বাভাবিক ছাঁচকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ফলে ধরা পড়েছে বিশেষ শৈলীজাত কৌশল। সেক্ষেত্রে পত্রকাব্যগুলির কাব্যিক নাট্য ধর্মে ভেদরেখা অনেকটাই মুছে গেছে। একোক্তির ছাঁদকে ভেঙে সংলাপাশ্রয়ী করে তোলার জন্য পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একাধিক চরিত্রকে (প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক উভয়প্রকার চরিত্র) আনয়ন করেন কাব্যাংশে। তারা যেন নায়িকার কথোপকথনের সূত্র ধরেই অদৃশ্য মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়। এরা নায়িকার কথক সত্তাকে সক্রিয় করে এবং নাটকীয় একেক্তিকে সংলাপাশ্রয়ী হতে সাহায্য করে। এই সংযোজনের জন্য কখনও কখনও সচেতন জড় পদার্থকেও অদৃশ্যমঞ্চে চরিত্র রূপে উপস্থিত বলে মনে হয়। মনুষ্যতর প্রাণীও এক্ষেত্রে সংযোজনে হয় ও তাদের মধ্যে মনুষ্যসত্তার আরোপণ ঘটে। এজাতীয় সংযোজে নায়ক-নায়িকা জড়পদার্থকে উদ্দেশ্য করে নিজের মনের অবস্থার ব্যক্ত করে। এই রীতি নায়িকার প্রতিরোধকে প্রসারিত করে তোলে। নায়িকার বক্তব্য কেবল চরিত্রভিমুখী হয়ে মনুষ্যতের প্রাণীও বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও শকুন্তলার সংলাপে রয়েছে মেয়েলি ভাষার নিজস্ব টোনের বৈশিষ্ট্য যা চরিত্রের সাথে মানানসই হয়ে তাকে আরও বেশি নাটকীয়তা দান করেছে। যেমন—"মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে"[৮]

আবার কোথাও নায়িকার সংলাপে প্রতিফলিত হয়ে নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি। নায়ক মঞ্চ হবার সময় অভিনেতা বা পাত্র পাত্রীর ক্ষেত্রে অঙ্গিঙ্গি সঞ্চালনের এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শকুন্তলা পত্রিকায়, শকুন্তলার কিছু সংলাপে এ জাতীয় শারীরিক সঞ্চালনের ছাপ সুস্পষ্ট যা নায়িকার বিরহবেদনার প্রকাশে অত্যন্ত সহযোগী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে পত্রকাব্যটি মঞ্চে উপস্থাপিত না হওয়া সত্ত্বেও কেবল শব্দ দিয়েই তাতে ফুটে উঠেছে মঞ্চস্থ কোনো নাটকের পাত্র-পাত্রীর প্রত্যক্ষ অভিনয়ের মতো ছবি। যেমন—

"বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই হতত জ্ঞান ; চেতনা পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!
অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ;................"[৯]

গোটা পত্রকাব্যটি নিরবচ্ছিন্ন কোনো কাহিনিকে আশ্রয় করেনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলিকে কবি একে একে মেলে ধরেছেন। ফলে কাহিনিতে নাটকের মতো flash back স্বপ্নচারণা ও আগামীদিনের সম্ভাব্য ঘটনার আবির্ভাব ঘটেছে। এই পত্রে মধুকবির লিপিচাতুর্যের প্রমাণও আছে। পত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুন্দর ব্যবহার এ পত্রের লালিত্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

|| চার ||

যে প্রেম পরিণয়ে সার্থক হয়নি, সেই প্রেমমুগ্ধ নায়িকার পত্রের সঙ্গে পতিপত্নীর যত্নে স্বাভাবিক কারণে একটি লক্ষ্যণীয় পার্থক্য বর্তমান থাকে। সুতরাং এই শ্রেণির পত্রগুলিতে প্রেমিকা নারী অপেক্ষা পতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নারী আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু দুষ্মন্তের

প্রতি শকুন্তলার পত্রটিতে আমরা জানি শকুন্তলা বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সেই কারণে অমিলনজনিত উৎকণ্ঠায় পত্রটিকে উষ্মার ছোঁয়া জেগেছে এবং জীবনী শক্তির কারণ হয়েছে। শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের পরিচয় ঘটেছে একবারই এবং সেই একবারেই তাদের প্রেম থেকে পরিণয়ে সমাধা হয়েছে। এরপর থেকে দুষ্মন্তের দর্শন আর পাওয়া যায়নি। শকুন্তলা যে অবস্থায় দুষ্মন্তের কথা স্মরণ রেখেছে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ অমনোযোগী হলে এই অদর্শনের পর এক তীব্র, মানসিক যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা শকুন্তলা স্মরণ করতেই পারে।

প্রথম নায়িকা শকুন্তলার পত্র দিয়েই মধু কবি 'বীরাঙ্গনা' কাব্য সূচনা করেছেন। শকুন্তলার উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা স্বাভাবিক কারণেই দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে একবারই প্রবেশ করেছিলেন মুনির আশ্রমে এবং শকুন্তলার কোমল মনের প্রেমের অর্ঘ্য গ্রহণ করে সেই যে চলে গিয়েছিল আর তাঁর দেখা নেই। নিষ্ঠুর ব্যাধের মতোই হৃদয়ের ওপর মৃগয়াবৃত্তি প্রকাশ করে তিনি সেই তপোবনে তপোবনচারিণীকে দেখে বিস্মৃত হয়েছেন। এর পরের যে কাহিনি সকলেরই জানা আছে দুর্বাশা মুনির অভিশাপ। এই অভিশাপের কারণেই দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিস্তৃত হয়েছিলেন, পুরাণ কথা এ ঘটনাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু মধুসূদন তাঁর নায়িকাকে সে প্রণয় স্মরণ করেছেন সময়কাল ও পূর্বের বলে বোঝা যায়। দুষ্মন্ত চলে যাবার পরে তার চিন্তায় শকুন্তলাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল সে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে একেবারেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তাই সমস্তক্ষণেই সে দুষ্মন্তের চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান থাকত। এই ব্যাপারটি বোঝাবার জন্যই দুর্বাশার আগমন বৃত্তান্তটি মূল্যবান। তপোবন পরিচর্যাকারিণী হিসাবে শকুন্তলার সবচেয়ে অতিথি তপোবনে প্রবেশ করে আতিথ্য প্রার্থনা করা সত্ত্বেও শকুন্তলা সে সময় অবহিত হতে পারেনি। মনের এই অবস্থাতেই সে দুষ্মন্তের পত্র রচনা করতে বসেছিল, এটাই কবিকল্পনা।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অবলম্বনে কবি শকুন্তলা চরিত্র নির্মাণ করেছেন। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত রাজা দুষ্মন্ত কন্বের আশ্রিতা তপোবন-বালিকা শকুন্তলার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত এবং গান্ধর্ব মতে তাকে বিবাহ করেন। রাজ্যে ফিরে যাবার সময় তিনি তাকে রাজকীয় মর্যাদায় বরণ করে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও দুষ্মন্তের কোনো সংবাদ না পেয়ে বিরহ বিক্ষুব্ধ শকুন্তলা এই পত্র রচনা করেন। বিশ্বামিত্র ও মেনকা পরিত্যক্ত কন্যা এরকম কোনো পত্র রাজসমীপে প্রেরণ করেছিলেন তা জানা যায় না। সম্ভবত এটি কবিকল্পনা। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার সুগভীর প্রেম প্রথম পত্রে ব্যক্ত হয়েছে। শকুন্তলা প্রতি মুহূর্তে দুষ্মন্তের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। তাঁর আশা দুষ্মন্ত এসে তাকে নিয়ে যাবেন রাজপ্রাসাদের কিন্তু দুষ্মন্তের দিক থেকে কোনো আকর্ষণই কার্যত দেখা মেলে না। তপোবনে বিশ্ব প্রকৃতির নানা স্বাদ, পশুপাখির আনন্দ মুখরতা, সবই তার কাছে নিরর্থক মনে হয়। বনদেবীর সঙ্গে শকুন্তলার ছিল নিবিড় অভিযোগ । আসলে সর্গের প্রতি ছত্রে শকুন্তলার মনোবেদনার প্রকাশ ঘটেছে। শৈশবে পিতা মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন, যৌবনে স্বামীরূপে যাকে বরণ করলেন তিনি তাকে ভুলে গেলেন।

গান্ধর্বমতে বিয়ে করে স্ত্রীকে একেবারে বিস্মৃত হওয়া যে জাতীয় অমানবিক আচরণ তাকে স্ত্রী হিসাবে অনেক কঠোর বাক্য শকুন্তলা প্রয়োগ করতে পারত। কিন্তু কবি একথা বিস্মৃত হননি যে সে আশ্রমকন্যা। সুতরাং তার ভাষা ব্যবহার ও তার উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই তার মানসিক অবস্থাই সে বেশি করে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে, প্রতি মুহূর্তে রাজার প্রত্যাবর্তন আশা তার মনে এতই প্রবল যে, সে বলে—

"অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে।"[১০]

–এই ভুল অবশ্য ভাঙতেও বিলম্ব হয় না। দুই সখী শকুন্তলার দুঃখ দেখে কেবল কাঁদে। বনের পশু পাখি তরুলতাদের আগের মতোই আনন্দিত দেখে শকুন্তলার ক্রোধ হয়। এখানে মধুসূদন প্রাচীন দৃষ্টি ত্যাগ করে আধুনিক হয়ে উঠেছেন। শকুন্তলাকে তপোবন থেকে বিদায় দেবার সময় মনুষ্যেতর প্রাণী এবং তরুলতাদি শোকবিহ্বল হয়ে উঠেছে। এটাই প্রাচীন সৃষ্টি। মধুসূদনের দৃষ্টিতে বিরহিণী শকুন্তলা তাঁর বিরহ বিষণ্ণ মনে তপোবনের মনুষ্যেতর প্রাণীর চিরাচরিতের আনন্দিত জীবন সহ্য করতে পারেন না। সে পুষ্পকুঞ্জকে বলেছে—

"রে নিকুঞ্জ শোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল সুধা?"[১১]

কোকিলকে ডেকে সে বলে—

"কেন তুমি, পিককুল-পতি

এ স্বরলহরী, আজি বরিষ এ বনে?

কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?"[১২]

শকুন্তলার কিছুই ভালো লাগে না। কেবল যেসব স্থান দুষ্মন্ত প্রতি সুরভিত যেসব স্থানে সে ঘুরে বেড়ায়। দুষ্মন্তের সঙ্গে প্রথম দর্শনের প্রথম প্রেমের কিছু বিচ্ছিন্ন চিত্র তাকে উন্মাদ করে তোলে। যে তরুতলে গান্ধর্ব বিবাহ হয়েছিল যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা হয়েছিল সে স্থানে শকুন্তলা বিদগ্ধ হৃদয় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শকুন্তলা তার এই বিদগ্ধ হৃদয় তার দুই সখীকে দেখাতে চায় না কারণ—

"বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,

নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে!-

বজ্র সম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে!

ফাটি অন্তরিত রাগে-বাক্য নাহি ফোটে!"[১৩]

আসলে বিরহের দিনে একটি রোমান্টিক নায়িকা রূপেই শকুন্তলাকে দেখেছেন পল্লবিনী লতার মতোই কোমল তার চরিত্র তাই নিজেই সে কষ্ট পেতে পারে। এই কথাই জানাবার জন্য পত্র লিখতে পারে। বন নিবাসিনী শকুন্তলা তো কিছুই চায়নি চেয়েছিল শুধু এতটুকু ভালোবাসা, একটু সহানুভূতি। সে তাও পেল না, কিন্তু মনে ক্ষীণ আশা তখনও অবশিষ্ট, দুষ্মন্ত একদিন নিশ্চিত ফিরবেন। তাই এই চিঠি epistile টি লিখে রাজার কাছে পাঠালেন শকুন্তলা।"জীবনের আশা, হায়, কে ত্যাজে সহজে!"[১৪] এই পঙ্‌ক্তিতে শকুন্তলার ভগ্ন আশা, তার মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

চিরন্তন কাব্যসুন্দরী শকুন্তলার বিরহিণী রূপ নারী হৃদয়ের উৎকণ্ঠা, স্বামীর প্রতি অনুযোগ ও অভিমান আলোচ্য পত্রিকায় অপূর্ব সুধাময়ে মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়ে বীরাঙ্গনাকে করেছে শ্রেষ্ঠ কাব্য ও মধুসূদন হয়েছেন শ্রেষ্ঠ কবি।

|| পাঁচ ||

"নামে কি আসে যায়, গোলাপের যে নামই হোক না কেন তাতেই সে সুন্দর"

সাহিত্যের নামকরণ আর বাস্তবের নামকরণ এক নয়। সাহিত্য কোন কালা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা হলেও বাস্তবের ক্ষেত্রে তা হয় না। কোন কিছুর নামকরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অন্তর্নিহিত সত্যতা। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা ' পত্রটির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পত্রগুলির বিশ্লেষণে অনেক সমালোচক এঁদের চারটি বিভাগ কল্পনা করেছেন- প্রেম পত্রিকা, স্মৃতিবিষয়ক বা স্মরণার্থ পত্রিকা, প্রত্যাখ্যান পত্রিকা ও অনুযোগ বা অভিযোগ পত্রিকা। সূর্পণখা, রুক্মিণী, উর্বশীর পত্রকে প্রেমপত্র বলা হয়েছে। শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রকে সমরনাথ পত্রিকা এবং 'জনা'র পত্রিকাকে অনুযোগ পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যাখ্যান পত্রিকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে জাহ্নবী দেবীর পত্রকে। অন্য মত হল পত্রিকা সমূহ দু'ভাগে বিভক্ত হতে পারে- বীর পত্রিকা ও প্রণয় পত্রিকা। পত্রিকার বিভাগ কল্পনা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু মধুসূদন বর্ণিত প্রতিটি চরিত্র পৃথক, আপন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত ও সমুজ্জ্বল। নারীচরিত্রের অনন্ত রহস্য ও বৈচিত্র্য প্রকাশে মধুসূদনের ভূমিকা অনন্য। যে একাদশটি পত্র তিনি রচনা করেছেন, তারা সকলেই প্রেমময়ী। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বয়ঃধর্ম, চরিত্রগত বৈচিত্র্যের জন্য একই প্রেমের মধ্যে যে কত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, মধুসূদন তা অসাধারণ শিল্পকুশলতার সঙ্গে উপস্থাপন করেন।

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রটিতে বিবাহ রজনীর সুখস্মৃতি অবলম্বন করে শকুন্তলার স্বামীর প্রেমের স্মৃতি তাকে আলোড়িত করেছে। স্মৃতি নিয়েই তার বেঁচে থাকা সরলা ঋষিবালিকা শকুন্তলা ঐ একটি দিনের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, ঐ সুখস্মৃতি তার জীবনে প্রেমের যে বিচিত্রবার্তা নিয়ে এসেছিল, তাকেই সমগ্র জীবনে পরিব্যপ্ত করে দিয়েছেন। সেই স্মৃতির জগতেই তার মানস পরিক্রমা-

"দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,

যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে

পদযুগ, চারিদিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।"[১৫]

কোনো মোহ বা প্রত্যাশা নয়, মিলনের আশাই জীবনের আশা হয়ে উঠেছে শকুন্তলার কাছে। অন্তিম চরণেও সেই ধ্রুবপদটিই ধ্বনিত-'জীবনের আশা হয়ে কে ত্যজে সহজে।' শব্দসচেতন কবি মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' নামকরণের দ্বারা কাব্যের চরিত্রগুলির প্রতি তাঁর

অন্তরের শ্রদ্ধা ও সৌন্দর্যবোধের মিলিত অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকের মধ্যভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে শুরু হয়েছে নারী জাগরণ। এ দেশেও আছড়ে পড়েছে নারী প্রগতির ঢেউ। 'বীরাঙ্গনা'-য় রয়েছে সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল নারীদের উদ্ভাস। শকুন্তলা বীরের কন্যা নন, তার স্বামীও বীর নন; অন্তরের সৌন্দর্যে তিনি বীরাঙ্গনা হয়ে উঠেছেন। বিচ্ছেদ বিরহে দুঃসহ জ্বালার মর্মান্তিক বেদনায়।

আধুনিক কালের সাহিত্যে, বিশেষত, কাব্য-কবিতায় নামকরণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মধুসূদনের প্রতিটি কাব্যই আধুনিকতার বিশেষ বার্তাবহ। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র পত্রকবিতাগুলি রচনার প্রধান উৎস ওভিডের 'The Heroides' অথবা "Episttes of the Heroines'। কাব্যের প্রকরণে ও পরিকল্পনায় যদি ওভিডের প্রভাব স্বীকৃত হয়, তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে নামকরণেও কবি হয়তো পাশ্চাত্যের কাছে কিছুটা ঋণী। রোমান কবি ওভিড গ্রিক-রোমক ইতিহাস পুরাণ কাহিনির বীর নায়িকাদের মুক্ত প্রেম ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন পত্রের আঙ্গিকে। প্রত্যেক নারী পত্র লিখেছেন তাদের নিজ নিজ প্রেমিক পুরুষদের কাছে। এই নায়িকারা কেউ-ই প্রচলিত অর্থে বীরনারী নয়। পত্রপাঠে এমনও কোথাও মনে হয় না যে, মধুসূদন এইসব নারীদের চরিত্রের বীরত্বের দিকটা কোথাও উজ্জ্বলতর করেছেন।

আক্ষরিক অর্থে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকারা বীরাঙ্গনা না হলেও তাদের আচরণ যে বলিষ্ঠতা এবং সজ্ঞান প্রাণনার প্রেরণা আছে, তার মধ্যেই তাদের যথার্থ, বীরাঙ্গনা সত্তার প্রকাশ। মধুসূদনের নামকরণ যথার্থ, সঙ্গত, তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষত কাব্য বিষয়ের সমকালীন প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট বিচারের নিরিখে।

|| ছয় |

পরিশেষে বলা যায়, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মধুসূদনের পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা' প্রকাশিত হয়। এতে রয়েছে একাদশটি 'বীর' অর্থাৎ নায়িকা-আদর্শের 'অঙ্গনা'র [নারীর] প্রেমভাবাশ্রিত পত্র। এই কাব্যখানি-রচনা-বিষয়ে মধুসূদন রোমক কবি Ovid-এর 'Heroic Epistles'-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ওভিদ্-এর কাব্যটিও পত্রাকারে রচিত। ইংরেজ কবি Pope-ও এই আদর্শে কাব্য রচনা করেছেন। 'বীরাঙ্গনা'য় মধুসূদন ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত এগারজন নায়িকার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন-এঁদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের অধিকাংশই বিরহপত্রিকা- পৌরাণিক সুপ্রসিদ্ধ নারিগণ কর্তৃক তাদের পতিগণের [কোথাও বা প্রণয়ীগণের নিকট লেখা। এইকাব্যে 'ড্রামাটিক' ও 'লিরিক'-এর সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ'-এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে 'বীরাঙ্গনা'য় অমিত্রচ্ছন্দ আশ্চর্য সংহতি লাভ করেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দটি কত বিচিত্র হৃদয়ভাবের সুষ্ঠু বাহন হতে পারে তার পরিচয় মিলবে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। 'মেঘনাদবধ'-এর গাম্ভীর্য ও 'ব্রজাঙ্গনা'র লালিত্যের সমন্বয়ে 'বীরাঙ্গনা' মধুসূদনের সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

বাংলা কাব্যজগতে মধুকবি বিভিন্ন রীতির প্রবর্তক। নিজের জীবনের ব্যথা-বেদনা তাঁর কাব্যসৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। তিনি বাংলা কাব্যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য আঙ্গিকের সমন্বয় সাধন করেছেন। শুধুমাত্র ছন্দের ক্ষেত্রেই নয়, সাবলীল কাব্যরীতিতে, চিত্রকল্প এবং অলংকারের প্রয়োগে তাঁর কাব্য মহান হয়ে উঠেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন-

"তিনি কলম্বাসের ন্যায় দুস্তর সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া নূতন মহাদেশের আবিষ্কার না করিলে সেই নব্যাবিষ্কৃত ভূমিখণ্ডে নানা বিচিত্র চাঁদের উপনিবেশ পরম্পরা এত দ্রুত গতিতে গড়িয়া উঠিত না। বাংলা সাহিত্যে সেই আধুনিকতা-মহাদেশের আবিষ্কারকের জয়মাল্য চিরদিন তাঁহার কণ্ঠে অম্লান হইয়া থাকিবে।"[১৭]

তথ্য সূত্র:

১/https://www.dailyjagaran.com/m/literature-culture/news/22458.

২/ শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত : বীরাঙ্গনা কাব্য, তৃতীয়বার মুদ্রিত, সন ১২৭৫ সাল, কলিকাতা, শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত, পৃষ্ঠা: ১।

৩/তদেব, পৃষ্ঠা: ৩।

৪/তদেব, পৃষ্ঠা: ৭।

৫/তদেব, পৃষ্ঠা: ৫।

৬/ তদেব, পৃষ্ঠা: ৭।
৭/ তদেব, পৃষ্ঠা: ৮।
৮/তদেব, পৃষ্ঠা: ৩।
৯/তদেব, পৃষ্ঠা: ৬।
১০/ তদেব, পৃষ্ঠা: ২।
১১/তদেব, পৃষ্ঠা: ২।
১২/তদেব, পৃষ্ঠা: ৩।
১৩/ তদেব, পৃষ্ঠা: ৫।
১৪/তদেব, পৃষ্ঠা: ৮।
১৫/ তদেব, পৃষ্ঠা: ২।
১৬/তদেব, পৃষ্ঠা: ৮।
১৭/ সান্তনা চক্রবর্তী (সম্পাদিত) : স্বতন্ত্র পাঠ : মধুসূদনের বীরাঙ্গনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি,২০১৮, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা -৭০০০০৯, পৃষ্ঠা: ১৪।

আকর গ্রন্থ:-
১/ শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত : বীরাঙ্গনা কাব্য, তৃতীয়বার মুদ্রিত, সন ১২৭৫ সাল, কলিকাতা, শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।
সহায়ক গ্রন্থ:-
১/ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ:২০০৯-২০১০, কলকাতা -৭০০০৭৩।
২/ ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রকাশক: শ্রী শরৎ চন্দ্র পাল, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: মে, ২০১২, কলকাতা -৭০০০৬৭।
৩/ তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগের সূচনা থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত): প্রজ্ঞাবিকাশ, পুনর্মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১২, কলকাতা -৭০০০৩৭।
৪/ দীননাথ সান্ন্যাল (সম্পাদনা): মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, প্রকাশক: প্রভাস সাধুখাঁ, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই, ২০২২, কলকাতা –৭০০০৩৭।
৫/ সান্তনা চক্রবর্তী (সম্পাদনা): স্বতন্ত্র পাঠ : মধুসূদনের বীরাঙ্গনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি,২০১৮, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা -৭০০০০৯।
৬/ সুকুমারী ভট্টাচার্য্য : প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, অষ্টম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -৭০০০০৯,

....

কাঁটাতারে ক্ষত-বিক্ষত জীবনাখ্যান
(রমেশচন্দ্র সেনের পথের কাঁটা আর প্রফুল্ল রায়ের - রাজা আসে রাজা যায়)

গৌরাঙ্গ পাল
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ –
অখন্ড ভারতবর্ষের মানচিত্রটাকে রাতারাতি বদলে দিয়েছিল যে শব্দটি সেটি দেশভাগ। দেশভাগের স্মৃতি স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও এমন দগদগে ক্ষতের মত জেগে আছে যে সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটে প্রতিনিয়ত। রমেশচন্দ্র সেন এবং প্রফুল্ল রায় – উভয়ের সাহিত্য চর্চাতেও দেশভাগ প্রসঙ্গ এসেছে তাঁদের নানা সাহিত্যরূপে। রমেশচন্দ্র সেনের ‘পথের কাঁটা’ ও প্রফুল্ল রায়ের ‘রাজা আসে রাজা যায়’ ছোটগল্প দুটিতে দেশভাগের দুই ভিন্ন প্রতিচ্ছবি লেখা আছে। ‘কাঁটাতারে ক্ষত-বিক্ষত জীবনাখ্যান (রমেশচন্দ্র সেনের ‘পথের কাঁটা’ আর প্রফুল্ল রায়ের ‘রাজা আসে রাজা যায়’)’ শীর্ষক প্রবন্ধটি দেশভাগের বিস্মৃত ভিন্ন দুই স্মৃতিকে জাগ্রত করেই লিখিত।

সূচক শব্দ –
দেশভাগ, কাঁটাতার, ভারতবর্ষ, স্বাধীনতা, স্মৃতি, মানুষ, ক্ষত, বিক্ষত, সময়

মূল আলোচনা

একটা দেশ মাত্র কয়েক ঘন্টায় পরিণত হয়েছিল দুটো ভিন্ন দেশে। অখন্ড ভারতবর্ষের মানুষ নিমেষে একটা শব্দ শিখেছিল ‘দেশভাগ’। যে শব্দটা আপন জন্মভূমিকে মুহূর্তে করে দিয়েছিল পর। সেদিনের রাষ্ট্রনেতারা আজ সময়ের গর্ভে বিলীন, কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তের কাঁটা আজও অক্ষত লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে। ১৯৪৭ সালের একটা দিনে একটা শীতল বন্ধ ঘরে বসে নেওয়া কয়েকজন মানুষের একটি মাত্র সিদ্ধান্ত এত মানুষের জীবনের চিত্র বদলে দিয়েছিল যে তার চিহ্ন আজকে এত বছর পরেও অমলিন।

সমাজ সবচেয়ে বেশি যাকে প্রভাবিত করে সে হল ‘সাহিত্য’। ‘দেশভাগ’-এর মত এমন একটি সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা যে সাহিত্যকে প্রভাবিত করবে, আলোড়িত করবে – সেটাই স্বাভাবিক। আর যে মানুষগুলো ‘দেশভাগ’ নামক এক যন্ত্রণাদায়ক প্রহসনের সাক্ষী হয়েছিলেন, তাঁরা যখন কলম ধরেন, তখন সেই কলমে আঁকা হয় ক্ষত-বিক্ষত অধ্যায়ের এক অকল্পনীয় ছবি। ‘দেশভাগ’-এর নানা অজানা অধ্যায়ের নানা চিত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছে সাহিত্যিকদের কলমে। যেমন – রমেশচন্দ্র সেনের কলমে ধরা পড়েছে পরাশরের মত একজন সাধারণ মানুষের কাহিনি ‘পথের কাঁটা’। আর দেশভাগের নিভন্ত স্মৃতিতে পুনরায় অগ্নি সংযোগ করেছেন প্রফুল্ল রায় তাঁর ‘রাজা আসে রাজা যায়’ নামক ছোটগল্পটির মধ্য দিয়ে।

রমেশচন্দ্র সেন লিখছেন দ্রুত কাঁটা তারের বেড়া পেরোতে চাওয়া এক পরিবারের কাহিনি। যে কাহিনি ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আদতে শত শত পরিবারের কাহিনি। পরাশর তার স্ত্রী মোহিনী আর পুত্র যাদবকে নিয়ে পূর্ব বাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলার পথে পাড়ি দেয়। এই পাড়ি দেওয়া পথের অভিজ্ঞতাই রমেশচন্দ্র সেনের ‘পথের কাঁটা’র প্রেক্ষাপট। পথশ্রম কাহিল করে শিশু যাদবকে। একটা ভয় তাড়া করে পরাশরকে সে দ্রুত পার হয়ে যেতে চায় কাঁটা তারের বেড়া। পিতার পথচলার সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে বারবার পিছিয়ে পড়ে যাদব। যার কারণে পরাশরের বারবার মনে হয় সেইই তার পথের কাঁটা। এইভাবেই চলতে চলতে দেখা হয় ঘাতক আর তার পরিবারের সঙ্গে। তারাও চলেছে দেশ ছেড়ে। দেখা হয় এক মুসলমান পরিবারে সঙ্গে। একদিক থেকে আর একদিকে দলে দলে মানুষ চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে, “...কাতারে কাতারে মানুষ – পঙ্গু, অন্ধ, খঞ্জ, সুস্থ, বলবান, যুবা, শিশু, বৃদ্ধ, নর ও নারী। পুব হইতে পশ্চিমে বাক্স-পেঁটরা হাঁড়ি-কুড়ি বিছনার যোজনব্যাপী বিরাট কিন্তু বিচ্ছিন্ন মিছিল।”

শিশুর মন বা শরীর কোনো কিছুর সঙ্গেই বড়দের হিসাব-নিকাষ মেলে না। তাই একদিকে পথশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ে যাদব আর একদিকে আনসারদের আসার কথা শুনেও হেসে ওঠে ঘাতকের ছোট ছেলে হাবীর। মুসলমান ধর্মের এই প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ আর এদের নামে বড়দের ভয়ের কারণের গুরুত্ব হাবীর বোঝে না। যাদবের অসুস্থতার কারণেই মোহিনী আর পরাশর আশ্রয় নেয় এক

দীঘির ধারে। এখানেই মোহিনীর সঙ্গে পরিচয় হয় বৈষ্ণবীর। যে বারবার গান শোনায় অসুস্থ যাদবকে, সেবা করে তার। এখানেই একদিন ওদের ছেড়ে চলে যায় ঘাতক, তার পরিবার নিয়ে। একদিন এই দীঘির ধারেই পরাশর দেখেছিল সদ্য সৃষ্টি হওয়া এক শশ্মান। যেখানে পড়েছিল অসংখ্য বাস্তুহারা মানুষের কঙ্কাল। একদিন এখানেই পরাশর খুঁজে পায় এক শিশুকে যার মা অনেক আগেই মারা গেছে। শিশুটিকে বুকে আগলে তুলে নেয় পরাশর। মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে যখন পরাশরদের দীঘির ধার ছেড়ে যেতে হয় তখনও মোহিনীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সেখানে শিশুটিকে ফেলে যায়নি পরাশর। পথে এই শিশুটির কারণেই মূল দল থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে পরাশর আর তার পরিবার। এমনকি বৈষ্ণবীও ওদের ছেড়ে এগিয়ে যায় মূল দলের সঙ্গে। যে বৈষ্ণবী একসময় মোহিনীকে আশ্বাস দিয়েছিল রাধাবল্লভ তার ছেলেকে কলেরার হাত থেকে রক্ষা করবে, সেই বৈষ্ণবীও ওদের ফেলে এগিয়ে যায় প্রাণ ভয়ে। তাই, পরাশর বলে, "এমন রাধাবল্লভের জীবটাও চলিয়া গেল।" কিন্তু, পরাশরের বিবেক বোধ পথের কাঁটার মতো জেগে ওঠে। তাই, শিশুটিকে সে ফেলে রেখে যেতে পারে না, নিজের পরিবারের কথা ভেবেও।

যে দেশ বিভাগের ভিত্তি দাঁড়িয়ে থাকে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। সেই দেশে মুহূর্তে আপন পর হয়ে যেতে বাধ্য। হিন্দুরা ভয় পায় মুসলমানকে, মুসলমানরা হিন্দুদের। এই একের অন্যের প্রতি ভয়টাই বারবার পথের কাঁটার মতো জেগে উঠেছে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর মনে। যাদব বা পরাশরের কুড়িয়ে আনা শিশুটি আপাতভাবে 'পথের কাঁটা' বলে সম্বোধিত হয়ে গেছে মাত্র । শিল্পী পরাশরের মতো অগণিত মানুষের মসৃণ জীবনে 'পথের কাঁটা' বিছিয়ে দিয়েছিল আদতে সমকালীন পরিস্থিতি। যা রমেশচন্দ্র সেনের লেখনিকে আশ্রয় করে রয়ে গেছে স্মৃতির পাতায়।

প্রফুল্ল রায় লিখছেন পূর্ব বাংলার রাজেকের বদলে যাওয়া জীবনের গল্প। দেশভাগ বদলে দিয়েছিল রাজেকের জীবন। আর সেটা এতটাই যে নিজের জীবনের মাত্র আট মাস আগের কথা, রাজেক আজ আর মনে করতে চায় না। কারণ সে জানে দেশভাগ এসেছিল বলেই বৈকুন্ঠ সাহারা দেশ ত্যাগ করেছে বাধ্য হয়ে আর রাজেক বৈকুন্ঠ সাহার সম্পত্তি ভোগ করতে পারছে।

"...আজ এই যে জালি গেঞ্জিটি গায়ে দিয়ে মাথায় শৌখিন টেরিটি কেটে, সুখের নদীতে গা ভাসিয়ে রাজেক পা নাচাচ্ছে, আট মাস আগে তা ছিল অসম্ভব। দেশখানা যদি দু-ভাগ না হ'ত, বৈকুন্ঠ সাহারা যদি এই ছিপতিপুর গ্রাম ছেড়ে চলে না যেত, এত সুখ কপালে ছিল না।"

রাজেকের এই ভাবনার মধ্যেই ছেদ ঘটিয়েছিল তোরাব আলি। ছিপতিপুর গ্রামের অন্যতম ধনী গৃহস্থ। তোরাব আলির আর্বিভাব, রাজেককে ঠিক যতটা বিস্মিত করেছিল তার চেয়েও বেশি করে তুলেছিল চিন্তিত। কারণ তোরাব আলির মত মানুষ যে রাজেকের মতো মানুষকে তার নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রিত করতে এসেছে এটাই রাজেকের কাছে বিস্ময়জনক বিষয়। আর তারেকের আর্বিভাব রাজেককে চিন্তিত করে তোলে, তারেকের স্বভাবগত কারণে। রাজেক জানে ধনী তারেকের ধনী হওয়ার রহস্য। তাই তার আগমনকে মোটেই সুস্থভাবে শান্ত মনে গ্রহণ করতে পারে না রাজেক। কিন্তু রাজেককে খানিক অবাক করেই তোরাব আলি নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করে তাকে। এই হঠাৎ প্রাপ্ত সম্মানকে সাদরে গ্রহণ করতে অপারগ হয় রাজেক। ভয় ও কুণ্ঠা মিশ্রিত এক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় সে। কিন্তু রাজেকের জীবনে চমক বাকি ছিল আরো। তোরাব আলি নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ শুধু করে না, রাজেকের সাথে নিজের মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধের প্রস্তাব রাখে। রাজেক যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ রাজেক জানে আট মাস আগে এই সমাজের চোখে তার স্থান কি ছিল! তাই,

"সামনে বাজ পড়লেও এতখানি চমকাত না রাজেক। ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড়, সব চাইতে মর্যাদাসম্পন্ন গৃহস্থ – যার বাড়ি ক'দিন আগেও সে কামলা খেটেছে, সেই তোরাব আলি কিনা নিজে এসে তাকে নেমন্তন্ন করছে!"

কামলা খেটেছে রাজেক ঠিক আট মাস আগে। এটাই রাজেকের পেশা, সমাজের কাছে এটাই রাজেকের পরিচিতি।

"হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের। ছোটকালেই তো বাপ-মা খেয়ে বসেছে। তারপর থেকে দু গরাস ভাতের জন্য কুকুরছানার মতো ছিপতিপুরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াত। ... কোথাও কিছু জুটত, কোথাও আবার কিছুই না। খিদে ছাড়া সে সময় আর কোনও অনুভূতি ছিল না। সর্বক্ষণ খিদেটা তার পায়ে পায়ে ফিরত। ... কাজেই খানিকটা টোন সুতো আর বঁড়শি জোগাড় করেছিল সে। লোকের বাড়ি থেকে চেয়ে চিনতে এনেছিল খান দুই মূলি বাঁশ। বাঁশ চিরে 'পলো' এবং 'চাই' বানিয়েছিল আর বুনে নিয়েছিল একখানা 'ধর্মজাল'। তখন থেকে কঠিন জীবন-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল তার।"

দেশভাগ একদিকে যেমন বৈকুণ্ঠ সাহাকে করেছে দেশ ত্যাগী আর এক দিকে রাজেকের মতো মানুষের ভাগ্য দিয়েছিল পরিবর্তন করে। রাজেক এখন বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পত্তির অঘোষিত মালিক। যদিও রাজেকের মনের গোপনে ছিল বৈকুণ্ঠ সাহার প্রত্যাবর্তনের ক্ষীণ আশঙ্কা। কারণ বৈকুণ্ঠ সাহারা গৃহ ত্যাগ করে গেলেও রাজেককে সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে যায়নি, দিয়ে গিয়েছিল কেবল দেখাশোনা করার দায়িত্ব। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতি যেভাবে, মানুষকে দিক্‌বিদিক শূন্য করে তুলেছিল তাতে রাজেক কেন তোরাব আলির মতো মানুষও আশায় বুক বেঁধেছিল যে বৈকুণ্ঠ সাহা আর ফিরবে না। তাই, নিজের মেয়ের সাথে রাজেকের বিয়ে দিয়ে, বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পত্তিও নিজের করায়ত্ত করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজেকের সব স্বপ্ন, সুখ আর তোরাব আলির আশায় জল ঢেলে কাকতালিয়ভাবেই রাজেকের বিবাহের দিন এসে উপস্থিত হয় বৈকুণ্ঠ সাহা। কিন্তু সে একা আসে না সাথে নিয়ে আসেন আমিন সাহেব নামে এক ভদ্রলোককে। রাজেক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল বৈকুণ্ঠ সাহা তার সকল সম্পত্তি এই আমিন সাহেবের কাছে দানপত্র করে দিতে এসেছে। আর ঘরবাড়ি গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখার জন্য রাজেককে দিয়েছিল কেবল বাহবা। বৈকুণ্ঠ সাহারা পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদে এসে থিতু হয়। মুর্শিদাবাদে যে বাড়িতে তারা থাকেন সেটি আমিন সাহেবের বাড়ি। আমিন সাহেব নিজের বাড়ি বৈকুণ্ঠ সাহাকে দানপত্র করে আর বৈকুণ্ঠ সাহা আমিন সাহেবকে যাবতীয় সম্পত্তি দানপত্র করেন। দেশভাগের সময় এই ঘটনা ছিল খুবই সাধারণ। কিন্তু তাতে যে রাজেকের মতো অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়েছিল তার খবর কেউ রাখে নি। রাজেক তোরাব আলিকে এইকথা জানাতেই তোরাব আলি মুহূর্তে রাজেকের সাথে কামরনের বিয়ে ভেঙে দেয়। কারণ বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পত্তি ব্যতিত সমাজে রাজেকের মতো মানুষের দামই বা কতটুকু! তোরাব আলিকে বলতে শোনা যায়, 'তাইলে শাদির কথার দরকার কী? খোদা যা করে ভালর লেইগাই করে। ভাগ্যে আইজই বৈকুণ্ঠ সা আইছে--' মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে রাজেক ফিরে যায় তার পূর্ব জীবনে, যে জীবনের নাম 'দুঃখ, অসীম অন্তহীন দুঃখ'। রাজেক আবারও তার পালো, ধর্মজাল, টোন সুতোর বঁড়শি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে খালে বিলে নদীতে, আবারও তার সারাদিনের কাদামাখা পা'টা ফেটে যায়, হাজা হয়, গায়ের চামড়া থেকে খই উড়ে যেন। মাত্র আট মাসের সুখের জীবনটাকে রাজেকের আজকাল স্বপ্ন বলে মনে হয়। তাই আজকাল রাজেক নিজেকেই নিজে বলে,

"দ্যাশখান দু-ভাগ হয়, সাহারা-ভুঁইমালীরা-যুগীরা গ্রাম ছাইড়া যায়, দ্যাশের এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে, তাতে তর কী রে, তর কী?"

সত্যিই তো রাজেকের কি! রাজেকদের তো মন নেই, কোনো স্বপ্ন দেখার অধিকার নেই, সমাজের চোখে যে একটা সামান্য কামলার কাজ করে বেঁচে থাকা মানুষ, তার আবার মন, স্বপ্ন এসব থাকতে আছে নাকি! না কি তাদের জীবন নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে বৈকুণ্ঠ সাহা, তোরাব আলি, আমিন সাহেবদের মতো মানুষদের! দেশভাগ এভাবেই হয়তো আশা জাগিয়ে আশাহত করে দিয়েছিল অসংখ্য রাজেকদের। যার কোনো হিসাবে কোনো সরকারি-বেসরকারি নথিতে নেই। নেই কোনো বৈকুণ্ঠ সাহা, তোরাব আলি, আমিন সাহেবদের মনে – আছে কেবল রাজেকদের মতো মানুষদের মনে কিংবা স্মৃতিতে, যাকে তারা আজও হয়তো ভুলতে চায় পূর্বজন্মের স্মৃতি ভেবে কিংবা বয়ে বেড়ায় দুঃস্বপ্নের মতো।

দেশভাগ আসলে একটা পূর্বজন্মের কাহিনি কিংবা দুঃস্বপ্ন। যা আজও তাড়া করে বেড়ায় মানুষকে। একদিন দেশভাগের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল যাদের হৃদয়, তারা আজ অনেকেই সময়ের গর্ভে লীন হয়ে গেছেন। কিন্তু দেশভাগের স্মৃতি কিংবা ক্ষত সে কি এতই কোমল, যে সময় তাতে প্রলেপ লাগাতে পারে! তাই আজও দেশভাগ শব্দটা বেদনা জাগায় মানুষের বুকে। বেদনা জাগায় সাহিত্যিকদের বুকে। কলমের আঁচড়ে আঁকা হয় একের পর এক চিত্র। আঁকা হয় পরাশর, রাজেকদের ক্ষত-বিক্ষত বুকগুলোর ছবি। বছরের পর বছর ধরে লেখা হয় মানুষের বেদনা, অত্যাচার থেকে স্বার্থপরতা, অনিশ্চয়তা, আত্মগ্লানি ইত্যাদি নানা কিছুর আখ্যান। আর এই আখ্যানগুলোই অক্ষয়িত সেই সময়টায় বেঁচে থাকা মনুষ্যত্ব, বেঁচে থাকা বিবেককের কাহিনিকে, যুগ যুগ থেকে যুগান্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, আজও দিচ্ছে।

গ্রন্থসূত্র

১। মন্ডল গৌরাঙ্গ (সম্পা.) বাংলাদেশের গল্প(প্রথম খন্ড), প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ – ১৯৯৩।

২। রায় প্রফুল্ল, গল্প সমগ্র ১, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

৩। সেন রমেশচন্দ্র, অগ্রন্থিত রমেশচন্দ্র , সম্পাদনা সমর চন্দ, প্রথমত, প্রথম প্রকাশ – ১ লা বৈশাখ ১৩৯৫।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের 'সহরায়' উৎসবে পুজো-পার্বণের রীতি-নীতি ও 'সহরায়' গানের তাৎপর্যতা :

ইন্দ্রাণী মুর্মু
গবেষক, বাংলা বিভাগ,কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনযাপন কৃষিজীবী নির্ভর। তাই তারা প্রকৃতির পূজারী। তাই সহরায় উৎসবের মূল উদ্দেশ হল গৃহপালিত পশু গাই-গরুদের বন্দনা করা। সাঁওতালদের এই উৎসবে কৃষি যন্ত্রপাতি লাঙ্গল, মই, কাস্তে ইত্যাদি সরঞ্জামেও তেল সিঁদুর টিকা দিয়ে পূজার্চনা করা হয়। আসলে সহরায় উৎসবের এক উল্লেখযোগ্য কারণ হল গো-সম্পদ সমৃদ্ধিকরে গড়ে তোলাএবং বছরের শেষে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। যারফলস্বরূপ সারা বছর তারা সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করে।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চলে কার্তিক মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আবার কিছু কিছু অঞ্চলে পৌষ মাসেও অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ মাসে নতুন ফসল ঘরে তোলার পর সহরায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাই-গরু বন্দনা করা ছাড়াও সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সারা বছর ধরে নানান কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার পর বছরের শেষে সমস্ত ক্লান্তি অবসাদ দূর করার জন্য তারা ধামসা-মাদল বাজিয়ে, নাচ-গান করে, হাঁড়িয়া পান করে তারা আনন্দ করে। ফলে তাদের সারা বছরের কোঠর পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

শব্দসূচক :সহরায়, উম, বোঙ্গা, খুন্টৌও, জালে, গড়েৎ

মূল আলোচনা :

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সবথেকে প্রধান উৎসব হল'সহরায়'।সহরায় উৎসবকে 'বন্দনা' উৎসবও বলা হয়।কৃষি-জীবীর মাধ্যমেই তাদের জীবন নির্বাহ হয়।তাই তারা প্রকৃতির পূজারী। তাই সহরায় উৎসবের মূল উদ্দেশ হল গৃহপালিত পশু গরু বন্দনা করা। সহরায় উৎসব পাঁচ দিন, পাঁচ রাত ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। তাই সাঁওতালি ভাষায় সহরায় উৎসবকে বলা হয়— **"মোড়ে সিঞ মোড়ে ঞিদী"**।পাঁচ দিনে পাঁচ রকমের গান গাওয়া হয়। সহরায়ের পাঁচ দিনের পাঁচ রকমের পর্বগুলি হল, যথাক্রমে—

১) প্রথম দিন—'উম মাহা'

২) দ্বিতীয় দিন—'বোঙ্গা মাহা'

৩) তৃতীয় দিন—'খুনটাঁও মাহা'

৪) চতুর্থ দিন—'খুন্টাঁও তোৎ মাহা'

৫) পঞ্চম দিন—'জালে মাহা'

বাংলা অনুবাদ—

১) প্রথম দিন— বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে প্রস্তুতি নেওয়ার দিন। বা আত্মশুদ্ধির করার দিন।

২) দ্বিতীয় দিন— পারিবারিক পুজো অর্থাৎ পূর্ব পুরুষদেরকে স্মরণ করে পূজো করার দিন।

৩) তৃতীয় দিন— এই দিন গাই, গরুদেরকে খুঁটিতে বেঁধে খেলার দিন।

৪) চতুর্থ দিন— গাই, গরু বাঁধাখুঁটি তোলার দিন।

৫) পঞ্চম দিন— আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে কুশল বিনিময়ের দিন।

উম মাহা :-'উম মাহা'র দিনে সকলে মিলে ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, নিজেরাও আত্মশুদ্ধি হয়। সকাল সকাল গ্রামের **'গড়েৎ'** অর্থাৎ মাঝি বাবার বার্তা বাহক, সে গ্রামের ছেলে বালকদেরকে নিয়ে প্রত্যেক বাড়ি থেকে চাল, ডাল, তেল, নুন, মুরগি সমস্ত কিছু আদায় করে। তারপর 'গড়েৎ' বাবা এবং 'নায়কে' বাবা (গ্রামের পূজারী) গ্রামের ছোট-বড়, বৃদ্ধ, সকল পুরুষরা মিলে জাহের থানের পূজার্চনা করার জন্য যাত্রা করেন। নিয়মানুযায়ী পূজা পাঠ করে মুরগি বলি দিয়ে পূজা সমাপ্তি করে। এরপর বলি মুরগির মাংস দিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ রান্না করা হয়। তারপর উপস্থিত থাকা সবাই মিলে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়া-দাওয়া করে। সাথে সাথে বয়স্ক পুরুষরা হাঁড়িয়া পান করেন। আর

সহরায় উৎসব নিয়ে আলোচনা করে। পরিশেষে ধামসা-মাদল বাজিয়ে গান করে। তারপর পূজারী নায়কে বাবা সকলকে নিয়েআনন্দ সহকারে গ্রামের দিকে ফিরে আসে।এইভাবে সহরায়ের প্রথম দিন সমাপ্তি হয়।

উম মাহা দিনের একটি সুন্দর গান হল—

"দিন দিনতে দিন দ চালাঃ
সহরায় দাইনায় সেটেরেন
হেসেচ সেকেচ সহরায় দাইনায় সেটেরেনারে।
ভিত পিঁড়ী অড়াঃ দুওয়ীর
দেবন পতাও লগন লগন
জেড়ের জলম পতাও দরে বীঞ তাঁগিয়া"।।[১]

বাংলা অনুবাদ—

গানটিতে দিদি ও বোনের গানের মধ্য দিয়ে কথোপকথন চলছে। সহরায় উৎসব আর বেশি দিন বাকি নেই। সহরায় এসে গেছে একেবারে দোর-গোড়ায়। তাই ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং দেওয়ালগুলো নানা রকম ভাবে সাজানোর কাজ করতে হবে। কারণ সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না।

সহরায়ের প্রথন দিনের পুজা-পাঠ, কর্ম-ক্রিয়ানুযায়ী সাঁওতাল সমাজের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যটি হল— সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে হবে। কারণ সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না।

তৃতীয় দিনে সকাল থেকেই গ্রামের মাঝি বাবা, নায়েকা বাবা এবং সকল পুরুষরা মিলে গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে গাই-গরুদের বন্দনা করতে যায়। এবং বাড়ির নারীরাও নতুন কুলোতে দূর্বা ঘাস, ধান, তেল, সিন্দুর, ও প্রদীপ সাজিয়ে বন্দনার গান করে। বন্দনা গানটি এইরূপ—

"জাগমা লক্ষ্মীনি জাগমা ভগবতী
জাগেত অমাবস্যারাত।
জাগেকা পতিফল দেবে মা লছুমন (ক মহাদেব)
পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই যে"।[২]

গৃহপালিত পশু গরু বন্দনার গান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী গরু বাছুরকে লক্ষ্মী ও ভগবতী নামেও ডাকে। এবং বলা বাহুল্য এই অমাবস্যার দিনে গৃহের সদস্যরা জেগে থাকলে পাঁচ পুত্রের জন্য দশটি গাই-গরুর বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গৃহপালিত পশু গরু বন্দনার গান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী গরু বাছুরকে লক্ষ্মী ও ভগবতী হিসেবেও পুজা-পাঠ করে । এবং বলা বাহুল্য এই অমাবস্যার দিনে গৃহের সদস্যরা জেগে থাকলে পাঁচ পুত্রের জন্য দশটি গাই বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সহরায়ের প্রথন দিনের পুজা-পাঠ, কর্ম-ক্রিয়ানুযায়ী সাঁওতাল সমাজের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যটি হল— সাঁওতাল সম্প্রদায় যেহেতু কৃষিজীবী মানুষ, সুতরাং তাদের গাই-গরু বন্দনা করা ভীষণ প্রয়োজন। তবেই গো-সম্পদ সমৃদ্ধি ঘটবে, ভালো ফসল উৎপাদন হবে। এবং বছরের পর বছর তারা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে।

দ্বিতীয় দিন 'বোঙ্গা' মাহা :-বোঙ্গা দিন বা পুজো-পার্বণ দিনটিতে বাড়ির নারীরা সবাই মিলে বাড়ি ঘরের চারিদিকে গোবর দিয়ে নিকানো করে, এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঝকঝক করে তোলে। তারপর বাড়ির পুরুষরা পূজার্চনা করার জন্য পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করে প্রধান দেবতা মারাং বুরু, জাহার এরা, মোড়ে ক, তুরুই ক, অর্থাৎ পূর্বপুরুষদেরকে স্মরণ করে পুজার্চনা করা হয়। তারপর দেবদেবীদের উদ্দেশ 'হাঁড়িয়া' উৎসর্গ করা হয়। হাঁড়িয়া হল দেবদেবীদের আসল প্রসাদ। এবং যে যার পরিবারের গোত্র বা পদবী বিভানুযায়ী, ছাগল, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি পশু বলি দেওয়া হয়। তারপর বলি দেওয়া পশুর মাংস দিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ তৈরি করা হয়। এবং বাড়ির সকলে মিলে শাল পাতায় মাংস খিচুড়ি প্রসাদ ভোজন করে। এবং প্রসাদ হিসেবে বাড়ির বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা হাঁড়িয়া পান করে। খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ করে ধামসা-মাদল বাজিয়ে, নাচ-গানে সকলে মিলে সমবেত হয়। দ্বিতীয় দিনে পূজা পার্বণ করার সাথে সাথে একটা আকর্ষণীয় বিষয় হল— আলপনা আঁকা। বাড়ির সদর দরজা থেকে গোটা উঠোন জুড়ে আলপনা আঁকা হয়। আলপনাতে রাখালের ছবি আঁকা হয়।

সহরায়ের দ্বিতীয় দিনের একটি অন্যতম গানহল –

"হিহিড়ি রে জানাম আবন,
হাপড়াম কক লীইতাবন
বোঙ্গাবুরু বন মতো আকা দ
সাসাং গাডা বন পারম আকান,
দাঃ চেতান ঘুটু মাব,
পারম আকান দ।
খদে মাতকম এরে আতনা,
পানতেতে তায়ব জুরি সারজম,
হাপড়াম কক দুরুপ প আকান দ।"[৩]

বাংলা অনুবাদ—

"হিহিড়ি পিপিড়ি তে আমাদের জন্ম,
পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জানা যায়,
পূজার্চনার জন্য রাজি হয়েছি।
জলপূর্ণ নদী আমরা পেয়েছি,
জলময় স্থান ছেড়ে,
পাহাড়ে জায়গায় পৌঁছেছি।
মহুয়া, আসন, পিয়াল, সারিবদ্ধ শালগাছ,
পূর্বপুরুষরা সামাজিক, ধর্মীয় রীতিনীতি খোঁজার জন্য,
বিভিন্ন গাছের নিচে বিচার-বিবেচনায় বসেছিল।"

সহরায়ের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ বোঙ্গা মাহার দিনের গানটি থেকে জানা যায়— সাঁওতালদের আদি বাসস্থান ছিল হিহিড়ি পিপিড়ি নামক স্থানে। এবং তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, পূজা-পার্বণ, ধর্ম-কর্ম নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন স্থানে আলোচনার আসর বসেছিল। যার জন্য তারা বিশাল পরিমাপের জলপূর্ণ নদী পেরিয়েছিল। মহুয়া, কেন্দুয়া, পিয়াল, আসন ইত্যাদি গাছের নিচে বসে নানান সমস্যার বিচার হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে বসে আলোচনা করার সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান বা সঠিক সিদ্ধান্তে তারা নিতে পারেনি। তবে অবশেষে তারা শাল গাছের নিচে বসে তাদের যে কোন প্রশ্নের উত্তর, বা সঠিক সিদ্ধান্তের, সঠিক উত্তর তারা খুঁজে পেয়েছেন। যার জন্য সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ পিলচু হাড়াম, পিলচু বুড়হি বা তাদের বংশ গোষ্ঠীদের উদ্দেশ্যে স্মরণ করে পূজা-পার্বণ করা হয়। তাছাড়া জলবায়ু দেবতা এবং আশ্রয়ের দেবতা মারাং বুরু এবং ফসলের দেবতা জাহের এরা এই সমস্ত প্রধান দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে পূজা-র্চনা করা হয়।

দ্বিতীয় দিনে আর একটি বিশেষ আকর্ষণীয় গান হল-

"হলা দলে উম-এনা দল দলি পুখুরিরে
তেহেঞ দলে বঁগাঃ কানা দারা হারা
বাখোল তালারে"।[৪]

বাংলা অনুবাদ

"গতকাল স্নান করলাম শুদ্ধ করণ দলদলি পুকুরে,
আজ আমরা পূজা করি প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মধ্যে।"

সহরায়ের দ্বিতীয় দিনের গানের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে— এই দিনে সকলে মিলে পরিস্কার পরিছন্ন করে, পূজা-পাঠ করার রীতি-নীতি সাঁওতাল সমাজে বিত্তমান। এবং পূজাপার্বণ কেবলমাত্র পুরুষেরাই করে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী একতা বোজায় রেখে জীবন যাপন করতেই ভালোবাসে।

সহরায়ের দ্বিতীয় দিনের পুজা-পাঠ, কর্ম-ক্রিয়ানুযায়ী সাঁওতাল সমাজের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যটি হল— আগামী প্রজন্ম-দাতাদেরকেও একতা বোজায় রেখে পূজা-পাঠ করার রীতি-নীতির ইঙ্গিত জানানো হচ্ছে।

তৃতীয় দিন বা 'খুন্টাও' মাহা' :-তৃতীয় দিনে একটি বিশেষ আকর্ষণীয় দৃশ্য হল খুঁটিতে বেঁধে গাই-গরুর খেলা দেখা। এবং সকালবেলা থেকেই কেবলমাত্র জামাইকেই খুঁটি পোঁতার কাজে নিয়োজিত করা হয়। এবং এই খুঁটি পোতার কাজকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই গ্রামের ছেলে মেয়েরা সব হৈচৈ করে। এই দিন ঠিক বিকেলে গাই গরুদের শিং এ তেল সিঁদুর মাখিয়ে, ধান-শিষের মুকুট গরুর শিং এ পরিয়ে সাজানো হয়। এরপর গাই-গরু দেরকে একটা খুঁটিতে বেঁধে, কোন শুকনো শক্ত চামড়া বা কোন কিছু শক্ত ধরনের কুলো আকারের কিছু ধরে, গুঁতো দেওয়ার মাধ্যমে খেলানো হয়।

'খুন্টাও' মাহা পর্বের একটি সুন্দর গান হল এইরূপ—

"মিদ বিতৌ মিদ মোকা
গাডা জাঁওয়াই তল বিন
চাঁওড়া ভাঁওরা কাডা যাঁওয়াই তল বিন
দিশম হরক এ্রেলে
আতো হড়ক খেলো নাচুরে
ডাংরা বাপে তলেয়াসে
কাডা বাপেতলেয়া
অনা রেয়াঃ তেলা ইএঃ খজঃ কানা"।[৫]

বাংলা অনুবাদ

"ও জামাই একহাত গর্ত করো
চঁওড়া ভাঁওরা কাঁড়াকে বেঁধে দাও
দেশের মানুষ তাকে দেখবে
গ্রামের মানুষ থাকে খেলাবে
গরু বাঁধবে নাকি কাড়াকে বাঁধবে
এই উত্তরটি আমি চাই।"

খুণ্টাও গানটিতে গরু বা গাইকে খেলানোর জন্য খুঁটি পোঁতানোর দৃশ্য ফুটে উঠেছে। এবং জামাইকে খুঁটি পোঁতার আদেশ করা হয়েছে। জামাই আবার সেই আদেশ পালন করার জন্য জানতে চেয়েছে খুঁটিতে গরু নাকি মোষ বাঁধা হবে। এইরূপ গানে— জামাইকে আপন করার মধ্য দিয়ে জানা যাচ্ছে যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী একতা নিয়ে চলতে ভালোবাসে। তৃতীয় দিনের খুন্টাও মাহা পর্বে খাওয়া-দাওয়া, এবং ধামসা-মাদলের তালে নাচ-গান ইত্যাদি সব কিছু মিলে এক অন্য মাত্রার আনন্দ পাওয়া যায়।

খুন্টাও পর্বের বিশেষ তাৎপর্যটি অর্থ হল— গবাদি পশুকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য ঘরের বাইরে একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়। যাতে গবাদি পশু ভালো দুধ দেয়। এবং সেও যেন স্বাস্থ্যবান থাকে। এই দিন বিকেলে শিং এ তেল মাখিয়ে ধান শিষের মালা পরিয়এ, সিঁদুর টিকা লাগিয়ে গ্রামের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ গবাদি পশুর মঙ্গল কামনার জন্য বন্দনা গান করে থাকে।

চতুর্থ দিন অর্থাৎ খুন্টি তোৎ মাহা :- চতুর্থ দিনে বাঁধানো খুঁটিটি উপড়ে তুলে রাখার দিন। এবং বাড়ির মেয়ের জামাইকে দিয়েই খুঁটি তোলানো হয়। এই দিনে ভোজন করার সাথে ধামসা মাদল তালে তালে সুর করে গান গাওয়া হয়।

খুণ্টাও তোৎ মাহা পর্বের একটি সুন্দর গান হল—

"গাই তল খুন্টী জামাই আবেনগি তদবেন।

খুন্টী তোৎ রেনা অধিকার দ আবিননা গে”।[৬]

বাংলা অনুবাদ

“গবাদি পশু বাঁধা খুঁটিটি জামাই আপনিই তুলে দিন,
খুঁটি তোলার অধিকার তো আপনারই।”

অর্থাৎ তৃতীয় দিনে যে গরু বাঁধার খুঁটি পোতা হয়। চতুর্থ দিনে বাড়ির মেয়ের জামাইকে দিয়ে খুঁটি তোলানো হয়। কারণ সেই খুঁটি তোলার অধিকার তো তারই। এর থেকে বোঝা যায় সাঁওতাল সমাজ মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পরও, মেয়ে-জামাইকেউ অত্যন্ত আপন করে নেয়। এবং সব্বাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকতেই ভালোবাসে। এবং এই দিনে খাওয়া-দাওয়ার সাথে সাথে ধামসা মাদল সুরে তালে তালে নাচ গান করে ঐ দিন সমাপ্ত করা হয়।

সহরায়ের তৃতীয় দিনের পুজা-পাঠ, কর্ম-ক্রিয়ানুযায়ী সাঁওতাল সমাজের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যটি হল— সব্বাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকার ইঙ্গিত।

পঞ্চম দিন অর্থাৎ ‘জালে’ মাহা :- জালে মাহা দিন হল সহরায়ের শেষ পর্ব। জালে মাহা পর্বে আত্মীয় পরিজনদের সাথে পরস্পর কুশল বিনিময় করার দিন। এবং একেওপরের বাড়িতে গিয়ে খাওয়াদাওয়া ভোজন ইত্যাদি হয়। তারপর গ্রামের নীচ প্রান্ত থেকে ওপর প্রান্ত পর্যন্ত, সারা রাস্তা জুড়ে দল বেঁধে সারি সারি নাচ-গান হয়। জালি মাহাতে সারাদিন থেকে শুরু করে প্রায় ভোররাত পর্যন্ত নাচ-গান করে সহরায় উৎসবকে সমাপ্তি করা হয়। সহরায় উৎসব বিদায় নেওয়ার পর সবার মনে এক অজানা বেদনায় ভরে ওঠে। এবং সবার মনের বিদায়ের বেদনা ভরা হৃদয় থেকে যে সুর বেজে ওঠে, তা অতন্ত বেদনা ভরা বিষন্নতার সুর। বেদনা ভরা যন্ত্রনা সুরটা হল এমনই—

“আম এম তাহেলেন ভাললে তাহে কানা
আম এম চালা কানা কষ্টলে বুঝাও এদা
আমা রীস্কী দ দুখ তেদ অলম পেরেযা
কালম আচুর দিন তেদ আরহ হিজুমে”।[৭]

বাংলা অনুবাদ

“তুমি ছিলে সহরায় ভালো ছিলাম
তুমি চলে যাচ্ছো সহরাই খারাপ লাগছে
তোমার আনন্দকে দুঃখ হতাশায় ভরিও না।
বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার ফিরে আস।”

জালে মাহা পর্বের বিশেষ তাৎপর্য হল— জীবনে হাজার আনন্দের মাঝেও দুঃখ বেদনা যদি আসে তবে ভেঙ্গে না পড়ে, পুনরায় নতুন করে বাঁচার লড়াই এর ক্ষমতা রাখার ইঙ্গিত।

উপসংহার :-সাঁওতাল জনগোষ্ঠী যেহেতু কৃষিজীবী সম্প্রদায় মানুষ তাইতারা গো-সম্পদ বৃদ্ধি ঘটানোর জন্যইমূলত গরু বন্দনা করে পূজা দিয়ে সহরায় উৎসব করে থাকে। আর কৃষিজীবী সঙ্গে যুক্ত সমস্ত যন্ত্রপাতিকেও তেল সিঁদুর টিকা দিয়ে পূজা করা হয়.বছরের শেষে ভালো ফসল উৎপন্ন হওয়ার ফলে তারা সারা বছর ধরে সুন্দর ভাবে গানের করতালে জীবন যাপন করে থাকে।

তথ্য সূত্র :

১) দাস, স্বপন কুমার,শারদীয়া আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র (২০০১-২০০৩) আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, বালি, হাওড়া , পৃষ্ঠা সংখ্যা— ৯৩
২)সরেন, সুন্দরী, সাঁওতালিলোকসঙ্গীত, সরকারি আবাসন হাওড়া, প্রথম সংস্করণ- ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা— ৮৯
৩) গঙ্গা মুর্মু, বয়স— ৬৫, কুন্দরু, পুরুলিয়া। (গানের তথ্য)
৪) সরেন, সুন্দরী, সাঁওতালি লোকসঙ্গীত,সরকারি আবাসন হাওড়া, প্রথম সংস্করণ- ২০০৩, সংখ্যা— ৮৯
৫) কালোমনি হাঁসদা, বয়স— ৫০, কুন্দরু, পুরুলিয়া। (গানের তথ্য)
৬) বুধনী মুর্মু, বয়স— ৭০, কুন্দরু, পুরুলিয়া। (গানের তথ্য)
৭) যমুনা মুর্মু, বয়স— ৬৫, কুন্দরু, পুরুলিয়া। (গানের তথ্য)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১) দাস, স্বপন কুমার,শারদীয়া আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র (২০০১-২০০৩) আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, বালি, হাওড়া

২) সরেন,সুন্দরী, সাঁওতালি লোকসঙ্গীত,প্রথম সংস্করণ- ২০০৩, বালি, হাওড়া

৩) ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন, সাহিত্য একাদেমি, নতুন দিল্লী

৪) হেমব্রম, পরিমল, ঝাড়খন্ডের ইতিহাস, নির্মল বুক এজেন্সি, কোললাতা

৫) বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

………………………………………………

ব্যক্তি জীবন থেকে কর্মময় জগতের সংক্ষিপ্ত পরিসর : প্রসঙ্গ কালীপ্রসন্ন সিংহ

ইতিষা নন্দী
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :
উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ঠাকুর পরিবারের পাশাপাশি সিংহ পরিবারের ভূমিকা ছিল অসামান্য। ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ মাত্র ত্রিশ বছরের জীবন পর্যায়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের কর্ম ও কীর্তিতে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের দান ছিল অপরিসীম। যে সময় নগর কলকাতায় বাইজিনাচ, বাচখেলা, বেশ্যা, বুলবুলি - 'ব' কালচারের ওপর নির্ভর করত অধিকাংশ বিত্তবাণ জমিদারের গৌরব; তখন একজন জমিদার বংশের ছেলে হয়েও ভেসে যাওয়ার সময়ের স্রোতের বিপরীতে পথ হেঁটেছিলেন তিনি। সাহিত্য, সঙ্গীত, আভিনয়, রঙ্গমঞ্চ স্থাপণ, সংবাদ পত্র পরিচালনা থেকে সংস্কার, দেশাত্মবোধ, দানশীলতা – নানা দিকেই বিস্তৃত করেছিলেন তাঁর কর্মময় জীবনের ভিন্নমুখী পদক্ষেপ। আদর্শ হিসাবে সামনে রেখেছিলেন – রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্তের মতো মহাপুরুষদের। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর দুরদর্শী মানসিকতার দরুণ মাত্র তেরো বছর বয়সে ১৮৫৫ খিষ্ঠাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বিদ্যেৎসাহিণী সভা'। এই সভা এগিয়ে গিয়েছিলো সামাজের নানা সংস্কারের ভিন্নমুখী সম্ভাবনায়। বিধাবাবিবাহের সমর্থন, কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ রহিত আন্দলনে অংশগ্রহণ, নগরপ্রান্তে বেশ্যাগণের একত্রে বসতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের মতো নানান উদ্যোগ। এছাড়াও এই সভার একটি চিরস্মরণীয় দিক ছিল, ১৮৬১ খিষ্ঠাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে চারিদিকে নিন্দার ঝড়কে প্রত্যাখান করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'র জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্ধনা প্রদান। এই ব্যক্তিটি, যিনি মানব - সাধারনের কল্যানের জন্য তাঁর স্বল্প সময়ের জীবনকে নির্দ্বিদায় উৎসর্গ করেছিলেন; সেই কালীপ্রসন্ন সিংহেরই অন্তিম জীবন কাটে একের পর এক আঘাত ও আশান্তির মধ্যে দিয়ে। কাছের মানুষ, আত্নীয় ও বন্ধুদের থেকে প্রাতারিত হয়ে সম্পত্তিনাশ ও ঋণজালে জর্জরিত হয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের অসংখ্য কর্মকাণ্ড ভবিষ্যৎদের হাতে তুলে দিয়ে ১৮৭০ খিষ্ঠাব্দের ২৪ জুলাই তারিখে বেলা তিনটের সময় দুরারগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে ইহলোকের পাঠে ইতি টানেন তিনি। তিনি যথার্থই মানুষের বন্ধু ছিলেন। তাই, সবকিছুর উর্ধে তিনি 'মহাত্মা' বিশেষণে চিরকাল স্থায়ী হয়ে রয়ে যাবেন আগামী প্রজন্ম, সামাজ ও সময়ের কাছে।

সূচক শব্দ :
ত্রিশ বছর, 'ব'-কালচার, আদর্শ, বিদ্যেৎসাহিণী সভা, সম্বর্ধনা প্রদান, অন্তিম জীবন, 'মহাত্মা' বিশেষণ

মূলপ্রবন্ধ :

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মতো সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সেকালে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারেরও। ঠাকুর পরিবারের ছটায় আপামর বাঙালির হৃদয়ে এই পরিবারটির কথা স্থান পায়নি সেভাবে। যদিও উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই পরিবারটির ভূমিকা ছিল অসামান্য। তাই, একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, মাত্র তেরো বছর বয়সে বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আবির্ভূত হয়ে, ত্রিশ বছর বয়সে অস্তমিত হওয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের অসামান্য প্রতিভার গঠন ও বিকাশে প্রয়োজন নির্ণীত করা তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের দান। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। সেদিক থেকে বিচার করলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সাথে রয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তিরোধান। অর্থাৎ, এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বিস্তার লাভ করেছে তাঁর কর্ম ও কীর্তি। কালীপ্রসন্ন ছিলেন কালের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত। তিনি কালাতিশয়ী প্রতিভার অধিকারীও বটেন। যুগের স্পষ্ট ছায়া পড়েছে তাঁর কর্ম ও চিন্তায়। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করলে কি হত জানা নেই, কিন্তু তিনি যেন অল্প বয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন, হাতে তাঁর সময় অত্যন্ত অল্প। এই অল্প সময়েই তাঁকে চলে যেতে হবে তাঁর করণীয় কাজটুকু সম্পন্ন করে। তাঁর সময়পর্বে যেন ধ্রুবপদের মতো বারবার শোনা গেছে –"সময় কারও হাত ধরা নয়; সময় জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবের পরমায়ুর ন্যায়; কারুই অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে আমরা বড় হচ্চি, দেখতে দেখতে বছর ফিরে যাচ্চে, কিন্তু আমাদের প্রায় মনে পড়ে না যে কোন দিন যে মত্তে হবে তার

স্থিরতা নেই।” [১] তাই, তাঁর চিত্তে প্রশান্তি কম। প্রত্যাশা অনুসারে মেলেনি প্রাপ্তিও। এই অস্থির, উদভ্রান্ত, ব্যকুল যুবকের শতকের প্রথমার্ধের সাথেই ছিল একান্ত আত্মীয়।

এই চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতিভা ও মহত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হয়নি সঠিক অর্থে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, উনত্রিশ বছর সময়পর্বের মধ্যে যিনি কর্ম সম্পন্ন করে ত্যাগ করেছেন ইহলোক তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় তথ্য হয়তো সন্ধান ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে দুষ্কর। কিন্তু যিনি এই অল্পকালের মধ্যেই স্বার্থকে পদদলিত করে, ভেসে যাওয়া সময়ের স্রোতে নিজেকে স্থির রেখে, সমসাময়িক সমাজের ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবকে পিছনে রেখে সমৃদ্ধ করেছেন মাতৃভাষাকে; বা বলা যায়, যিনি লুপ্তপ্রায় হিন্দুনাট্যকলাকে পুনরায় উজ্জীবিত করে, অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন দেশবাসীর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানের পুনঃপ্রচার করিয়ে নিদর্শন রেখে গেছেন নিজের অনন্য সাধারণ প্রতিভার মহত্ব ও দূরদর্শিতার, তাঁর জীবন-ইতিহাস অসম্পূর্ণ হলেও হয়ে ওঠে অবশ্যই আলোচনার দাবিদার। সত্যের খাতিরে বলতে হয় এ বিষয়ে সেভাবে গুরুত্বসহ আলোচনা চোখে পড়েনি আমাদের। তাই প্রথমেই আমাদের সন্ধানী দৃষ্টি ফেলা প্রয়োজন এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের ওপর তাঁর পারিবারিক পটভূমি ও হরচন্দ্র ঘোষের সুদক্ষ অভিভাবকত্বের। সেই পটভূমি বিচার করলেই বোঝা যাবে, এক বিত্তশালী জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও কেন তাঁর সমকালীন সমাজের বিত্তবানদের কপটতা ও কদাচারকে তিনি কশাঘাত করেছিলেন তীব্র মর্মভেদী ব্যঙ্গের মাধ্যমে। তার সাথে এও বোঝা যাবে, তৎকালীন নগর কলকাতায় যখন বাইজিনাচ, বাচখেলা, বেশ্যা ও বুলবুলির সংখ্যার উপরেই নির্ভর করত অধিকাংশ বিত্তবান জমিদারদের গৌরব তখন কীভাবে একজন জমিদার বংশের ছেলে হয়েও কালীপ্রসন্ন সিংহ অধিকারী হয়েছিলেন এক রুচিশীল, সংস্কৃতি-সম্পন্ন, সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতি কামনায় আপ্রান ব্যক্তিত্বে। শুধু তাই নয়, প্রতিভার সেই অপরিপক্ক অবস্থাতেই সমাজ ও সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব বিচার ক'রে আজ অনেকেই মনে করেন যে, অল্পবয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু না হলে তিনি হয়তো হতে পারতেন বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-মাইকেলের মতোই এক দিকপাল ব্যক্তিত্ব। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই একান্ত প্রয়োজন তাঁর সমগ্র জীবনের বিস্তৃততর আলোচনার। কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনপর্ব আলোচনায় বার বার সন্ধীহান হয়ে ওঠে তাঁর সময়সীমা। তাঁর জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে পওয়া যায় বিভিন্ন তথ্য। ‘পুরাতন প্রসঙ্গ’-এ আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন – “বোধ হয় আমি তাঁহার সমবয়স্ক ছিলাম।” সুকুমার সেনও তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কালীপ্রসন্নের সময়সীমা উল্লেখ করেছেন – ১৮৩০ থেকে ১৮৭০। অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘সাহিত্যসাধক চরিতমালায়’ উল্লেখ করেছেন “ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলকাতার এক ধনী জমিদার-বংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম হইয়াছিল এবং মাত্র ত্রিশ বৎসরের স্বল্পস্থায়ী জীবন যাপন করিয়া তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন।” [২]

কালীপ্রসন্ন সিংহের বয়স যখন ছয় বছরের কিছু বেশি, তখন ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর পিতা নন্দলাল সিংহের। সেই সময় তাঁর অভিভাবক ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ। এঁনার তত্ত্বাবধানে কালীপ্রসন্নের শুধু সম্পত্তি বৃদ্ধি নয়, তাঁর শিক্ষালাভ ও বালক বয়সে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশের পথ সুগম হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুকুমার সেন তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’-র দ্বিতীয় খণ্ডে যথার্থই মন্তব্য করেছেন – “তেরো চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি (কালীপ্রসন্ন) স্বগৃহে debating club ও বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহার পিছনে সকলেই অলৌকিক বালকপ্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার যিনি অভিভাবক ছিলেন সেই বিদ্বান ও বিচক্ষণ হরচন্দ্র ঘোষের প্রভাব কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। বালক ও কিশোর কালীপ্রসন্নের বিদ্যালাভ ও সংস্কৃতিচর্চার মূলে হরচন্দ্র ঘোষের হাত অনেকখানি ছিল এই ধারণা অপরিহার্য।” [৩]

কিন্তু তেরো চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা সেই তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে এই প্রতিভাবান মানুষটি যে খুব অল্প বয়সেই সমকালীন সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তা বলা যেতে পারে নির্দ্বিধায়। এই হরচন্দ্র ঘোষ নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ নন, বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮)। কালীপ্রসন্নের জীবন সম্পর্কে কোথাও এঁনার বিস্তারিত আলোচনা না থাকলেও ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রীর দেওয়া তাঁর সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যের উপর দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে মানুষ হিসেবে কিরূপ ছিলেন তিনি। এবং কালীপ্রসন্নের জীবন গঠনে ও প্রতিভার বিকাশে কতদূর কার্যকরী হয়েছিল তাঁর অভিভাবকত্ব।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'-য় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তথ্যসহ কালীপ্রসন্নের পারিবারিক জীবনের কথা। এনেছেন শান্তিরাম সিংহের প্রসঙ্গও। যদিও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মদের সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য তিনি পরিবেশন করতে সক্ষম হননি তাঁর 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'-য়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বসন্তকুমার বসু প্রণীত 'কায়স্থ পরিচয়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশ একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। এঁনারা ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয় আনুলিয়া সমাজভুক্ত। আদিনিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত বাকসো গ্রামে। এই বংশোদ্ভবের সূচনা হয় মহেন্দ্রনাথ সিংহের সূচনা পর্ব থেকে। মহেন্দ্রনাথের এক পুত্র ছিলেন দেবীদাস। তাঁর এক পুত্র মধুসূদন। এই মধুসূদনের দুই পুত্র–জ্যেষ্ঠ রামকিশোর ও কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকিশোর দুই পুত্র রেখে পরলোক গমন করেন। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামরাম, কনিষ্ঠ শান্তিরাম। এই শান্তিরাম বা কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ ছিলেন একজন স্বনামধন্য পুরুষ। এই শান্তিরাম-ই ছিলেন জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ সিংহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি যে শুধুমাত্র স্বীয় ক্ষমতায় বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন তা-ই নয়; প্রিন্স দ্বারকানাথের মতো ছিলেন ধর্মপরায়ণ, ক্রিয়াবান ও দানশীল ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে কালীপ্রসন্নের চরিত্রে যে অসামান্য শিল্পানুরাগ লক্ষিত হয় তা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়; বরং এটি পূর্বপুরুষাগত পারিবারিক ঐতিহ্যের সার্থক প্রতিফলন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্নের চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের তৎপরতা তাঁর পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ সতীদাহ নিবারণী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রাণকৃষ্ণের দুই পুত্র রাজকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের থেকেই প্রাপ্ত – একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

কালীপ্রসন্ন মাত্র ছ'বছর বয়সেই হয়েছিলেন পিতৃহীন। তারপর তাঁর শিক্ষালাভ কীভাবে ঘটেছিল সে প্রসঙ্গে সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ডে বলেছেন যে, তিনি বাংলা ও ইংরেজী শিখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর শিক্ষা কোথায় এবং কতটা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে করা হয় তাঁর শিক্ষা বাড়িতেই। তাঁর এই বিদ্যাশিক্ষার ধরণের সাথে অনেকটাই সাযুজ্য পওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষার। দুজনেই ছিলেন ধনী জমিদার বংশের সন্তান। দুজনেরই শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ে ছিল একটি বিশিষ্ট পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারা। দুজনেরই প্রকৃত শিক্ষা বিদ্যালয়ে নয়, গৃহে। তবে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রভাব ও পরিমান যেমন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, কালীপ্রসন্নের ততটা নয়। তাঁর জীবনে বিদ্যালয় শিক্ষা ও গৃহ শিক্ষা – দু'য়েরই মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

অল্প বয়স থেকেই কালীপ্রসন্নের সংগঠনশক্তি প্রকাশ পেয়েছিল নানা কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ স্থাপন, সংবাদ পত্র পরিচালনা থেকে সংস্কার, দেশাত্মবোধ, দানশীলতা – নানা দিকেই কালীপ্রসন্নের জীবন ছিল কর্মমুখর। বাল্যকাল থেকেই তিনি জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন – কাশীদাস, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের মতো মহাপুরুষদের। এঁনাদের দলে প্রবেশ করার ক্ষমতা ছিল না সকলের। কিন্তু যে বালকের হৃদয়ে ছিল এঁনাদের সমকক্ষ হবার প্রবল বাসনা, সেই কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে উঠেছিলেন সময় অগ্রবর্তী চিন্তা ও চেতনায় এক পুরোধা ব্যক্তি। তাঁর এই দূরদর্শী মানসিকতার দরুণ বঙ্গভাষা অনুশীলনের জন্য সমালোচকদের মতে মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি সভা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভাকেই নির্দেশ করেছেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' বলে। যদিও দুষ্ট লোকেরা এই সভার নামকরণ করেছিলেন 'মদ্যোৎসাহিনী সভা' বলে। তিনি সভার প্রতিষ্ঠাকাল বলেছেন ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব্বে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না কোন পত্র পত্রিকায়। আবার ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি অধিবেশন হয় এই সভার সাম্বৎসারিক অনুষ্ঠান। সেদিক থেকে সংগত কারণেই মনে করা যায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে।

কালীপ্রসন্ন তাঁর সভা করতেন মূলত শনিবার সন্ধ্যাবেলা। প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতার পর সেই বিষয় নিয়েই হতো আলোচনা। তৎকালীন সমাজের অনেক কুপ্রথা দূরীকরণে সহায়ক হয়েছিল এই সভা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কালীপ্রসন্ন অগ্রসর হয়েছিলেন এই সভার পক্ষ থেকে তাঁকে সাহায্য দান করতে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, এই আইনের বিরুদ্ধে যখন বহু রক্ষণশীল মানুষদের আবেদন পত্র প্রেরিত হচ্ছিল, তখন আইনের পক্ষে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে প্রায় তিন হাজার জন গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এর পাশাপাশি কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ রহিত আন্দোলনেও এই সভা অংশগ্রহণ করেছিল সক্রিয়ভাবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে অগ্রসর হয়েছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। তখন কলকাতা নগরে ভদ্রপল্লীর মধ্যে বেশ্যাগণের বাস ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকায় ভদ্রপল্লী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল অভদ্র নিয়মে। এই সমস্যা দূরীকরণে

'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' উদ্যোগী হয়ে কলকাতা নগরের নগরপ্রান্তে (সোনাগাছি ইত্যাদি স্থানে) বেশ্যাগণের একত্র বসতির জন্য একটি আবেদন পত্র জমা দেয় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়। -

"আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চিৎকারের সময়ে কলার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বর কীর্তি কোন কালেই পতাকারূপে উড্ডীন হইতে পারে না।" [৪]

এই প্রসঙ্গকে সামনে রেখেই বলা যায়, একালের দেহজীবী নারীদের সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের ভাবনায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি ছিলেন উনিশ শতকের একজন প্রতিনিধি। স্বভাবতই দেহজীবী নারীদের প্রতি সহমর্মিতার পরিবর্তে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তাদের দ্বারা সমাজ কলুষিত হবার দিকটি। তাঁর সেই ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছিল এই পত্রের মধ্যে। কারণ তিনি ছিলেন রক্ষণশীল পন্থী। তাই তিনি হয়ত বেরোতে পারেননি রক্ষণশীল ধারনা থেকে। এইভাবে একের পর এক আবেদন পত্র পেশ করে কালীপ্রসন্ন সচেষ্ট হয়েছিলেন সমাজকে কলুষিত ভার থেকে মুক্ত করবার।

কালীপ্রসন্নের এই সভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল – ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বর্ধনা প্রদান। 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত এই অপূর্ব কাব্যটিকে উপলক্ষ করে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যখন নিন্দা-প্রশংসার ঝড় বইতে লাগল তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের অপূর্ব গুণগ্রাহিতার জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে আয়োজন করলেন তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদানের। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, কিশোর রবীন্দ্রনাথ যখন মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে মেনে নিতে পারছেন না। সমালোচনা করছেন তীব্র ভাষায়; তখন কালীপ্রসন্ন তাঁর বিপক্ষে গিয়ে সমর্থন জানাচ্ছেন মধুসূদনকে। যদিও পরবর্তীকালে পরিবর্তন ঘটেছিল তাঁর এই ভাবনার। আমাদের বক্তব্য স্বল্প বয়সে উনিশ শতকের দুই পুরোধা পুরুষ একটি যুগান্তকারী কাব্যকে নিয়ে নিজেদের ভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত করছেন তখন কালীপ্রসন্নের ভূমিকা আজকের নিরিখে আমাদের কাছে অনেক বেশি সার্থক বলে মনে হয়েছে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন মধুসূদনের এই কাব্য বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাই তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে সম্বর্ধনা দিতে পিছু পা হননি তিনি। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন –

"কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা কেবলমাত্র সাহিত্য সমালোচনা কার্য্যেই ব্যপৃত ছিল না। গণ্যমান্য সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনাদি দ্বারা সাহিত্যানুশীলনে সাধারণকে উৎসাহিত করাও ইহার অন্যতম উদ্দ্যশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যানুসারে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে একটি সভার আয়োজন করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয়, মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে।" [৫]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা, শরৎ-সম্বর্ধনা ইত্যাদি অনেক কবি-সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হলেও বাংলায় কালীপ্রসন্নের দ্বারাই হয়তো এই রীতির প্রচলন হয় প্রথম।

বিদ্যোসাহিনী সভায় প্রধানত জ্ঞানচর্চামূলক নানা বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা হত। তার সাথে চলত সামাজিক উন্নতি সাধন কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ পর্ব। এই সূত্রেই ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল থেকে বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ প্রকাশিত হতে থাকে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'। এখান থেকেই মুদ্রিত হতে থাকে কালীপ্রসন্নের রচনাবলী, বিশেষত যে সকল প্রবন্ধগুলি তিনি সভায় পাঠ করতেন। সভায় কখনো পরিবেশিত হত বঙ্গদেশের কুরীতি বিষয়ক প্রবন্ধ, হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্টতা বিষয়ক প্রবন্ধ, আবার কখন বা দেশকাল বিষয়োপযোগী অভিপ্রায় বিষয়ে উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার সংকল্প গ্রহণ করেছিল এই সভা। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেও এই সভায় পাঠ করেছিলেন বাংলা ভাষায় লিখিত বেশ কিছু প্রবন্ধ – ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন' বিষয়ক প্রবন্ধ, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙ্গালা নাটক' সম্বন্ধে বক্তৃতা, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কৃষি সম্বন্ধীয় অবস্থা ও কৃষি-প্রদর্শণী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ। এছাড়াও বঙ্গসাহিত্য অনুশীলনে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে এই সভা পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে আয়োজিত হত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার। কালীপ্রসন্ন উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ঘোষণা করতেন পুরস্কারও। এই সভার উদ্যোগেই ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। কালীপ্রসন্নের গৃহে এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রথম যে নাটকটির সন্ধান পাওয়া যায়, সেটি রামনারায়ণ তর্করত্ন অনুদিত ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার'। এরপর কালীপ্রসন্ন নাট্যরচনায় উৎসাহী হয়ে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুবাদ করলেন কালীদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী'

নাটক। এই নাটকের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে কালীপ্রসন্ন ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রনয়ণ করলেন ‘মালতীমাধব’ নামে আর একটি নাটক। এই সভার নাট্যোউদ্দীপনায় মুগ্ধ হয়ে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ তাঁদের কাছে অনুরোধ করেন বঙ্গদেশে একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করার। ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ এইভাবে প্রায় সকল দিক থেকেই তার নামের সার্থকতা সাধন করে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে গেছে নিরন্তন।

কালীপ্রসন্নের কর্মময় জীবনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল – বিচারপতি হিসেবে তাঁর দক্ষতা ও কৃতিত্ব। তৎকালীন সমাজে যখন অধিকাংশ দেশী হাকিমের উৎকোচ গ্রহণ ও অপবাদ ছিল অদক্ষ বিচারের, তখন কালীপ্রসন্নের ন্যায় বিচারের আদর্শ অনুসরণে বিচারপতি হিসেবে তাঁর পক্ষপাশূন্য নির্ভীকতা আজও আকর্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ‘সধবার একাদশী’ নাটকে তুলে ধরেছিলেন ‘কেনারাম’ নামে এমনই এক চরিত্রকে। যিনি বিচার ও আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হলেও অসৎ বুদ্ধিবলে সাধারণ মানুষের থেকে উৎকোচ গ্রহণ করতেন প্রভূত। এবং সম্মান পেতেন বিচারক হিসেবেও। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অব্ দি পীস্ হিসেবে। কালীপ্রসন্ন আদালতে বসে শুধু নিজেই যে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতেন তাই নয়; অন্য সকলেও যাতে ন্যায় বিচারের মর্যাদা রক্ষার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগের নির্দেশ সহজে পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি প্রকাশ করেন ‘The Calcutta Police Act’ নামে একটি আইনের বই। এছাড়াও তিনি ছিলেন ন্যায় কর্মে নির্ভীক ও হৃদয়বান ব্যক্তি। নীলকরগণের মানহানী করার অপরাধে লঙ্ সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করে যখন এক মাসের কারাদণ্ড ও সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তখন কালীপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ সেই বিচারলয়েই প্রদান করেন সেই অর্থ। ‘পুরাতন প্রসঙ্গ’ এ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন – “যেদিন Revd. Mr. Long -এর মোকদ্দমা রায় প্রকাশ হইবার কথা ছিল, সেদিন কালীপ্রসন্ন আদালতে উপস্থিত ছিলেন; হাজার টাকা জরিমানা হইবামাত্রই তিনি তৎক্ষনাৎ সেই জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। কেহ তাঁহাকে টাকা লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন নাই। আমরা কেহই জানিতাম না যে তিনি মনে মনে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।” [৬]

কালীপ্রসন্নের মহত্ব ও গৌরব সাহিত্যপ্রেম ও সমাজপ্রেমকে ছাড়িয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বদেশপ্রেমের উচ্চতর আসনে। তিনি সমাজসংস্কার বিষয়ে উদারনীতির পক্ষপাতী হলেও, ঘোর বিরোধী ছিলেন জাতীয়তা বিসর্জনের। পাশ্চাত্যের আলোক প্রাপ্ত হলেও অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন প্রাচ্যপ্রভাব সংরক্ষণে। সেই সময় ইংরেজি শিক্ষিত নব্যযুবকগণ ইংরেজ অনুকরণকে মনে করেছিলেন জীবনের সারবত্তা। কালীপ্রসন্নও অনুকরণ করতেন; কিন্তু বিদেশীর নয় – এদেশের সমাজের আদর্শস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না করলেও সমর্থন করেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি। এছাড়াও তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য পিতা ও পিতামহের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অবৈতনিক বিদ্যালয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় মুক্তহস্তে প্রদান করেছিলেন অর্থ। এবং ‘মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ব কোথায়’ শীর্ষক একটি প্রস্তাব মুদ্রিত ও বিতরণের মাধ্যমে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষ দমনে এগিয়ে আসতে। তিনি কলকাতা শহরে পরিশ্রুত জলের অভাব দেখে ইউরোপ থেকে তিন হাজার টাকা খরচ করে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে চারটি ফোয়ারা স্থাপনের আবেদন জানান। এছাড়াও ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে চিৎপুর অঞ্চলে নিজ ব্যয়ভারে স্থাপন করেছিলেন একটি দাতব্য ঔষধালয়। তাঁর এই উদারতা, মহত্ব, সদ্‌গুণ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমায় দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বিরাজ করেছে চিরকাল।

এই ব্যক্তিটি, যিনি মানব-সাধারণের কল্যানের জন্য তাঁর জীবনের সর্বস্ব ব্যয় করেছেন চিরকাল সেই ব্যক্তিটিরই শেষ জীবন কাটে একের পর এক আঘাত ও অশান্তির মধ্য দিয়ে। যাদেরকে তিনি বিশেষভাবে আত্মীয়রূপে স্থান দিয়েছিলেন হৃদয়ে, তারাই কালীপ্রসন্নের শেষ জীবনে তাঁর অধিকাংশ সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে জর্জরিত করিয়েছিলেন ঋণজালে। ঠিক এমনই বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মানবতাবাদী ব্যক্তিও শেষ জীবনে দেহ, হৃদয় ও মনের শুশ্রূষার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন কার্মাটাড়ের সাঁওতালপল্লীতে। তিনি কালীপ্রসন্ন খুঁজে পাননি এরূপ কোন আশ্রয়। তিনি জীবনের অন্তিমপর্বে বিশ্বাসঘাতকতার জ্বালা ভুলতে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন অতিরিক্ত মদ্যপানে। ‘পুরাতন প্রসঙ্গে’ আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখছেন, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছিল তাঁর চরিত্রের বেশ কিছু নৈতিক অবনতির দিক। জীবনের শেষ পর্যায়ে আত্মীয় বন্ধুদের দ্বারা নানাভাবে প্রতারিত হয়ে মানুষের প্রতি অভিমান ও ক্ষোভ থেকে ও দু’বছর পূর্বে অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু, সম্পত্তিনাশ ও ঋণজাল – সবকটি কারণ একসঙ্গে জীবনে

উপস্থিত হওয়াই ছিল তাঁর নৈতিক অবনতির জন্য দায়ী। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জুলাই বা ৯ শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দে বেলা তিনটের সময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের অসংখ্য কর্মকাণ্ড ভবিষ্যৎ-এর জন্য সঞ্চিত করে রেখে ত্যাগ করেছিলেন ইহলোকের পাঠ। তাঁর মৃত্যুর পর কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় 'বঙ্গভূষণ' গ্রন্থে লিখেছেন -

"যদিও তোমাতে কিছু দোষ দেখা যায়,
এহেন মহান্ গুণে সে দোষ কি আর
ধরে কেহ; দোষা করে যেমতি সুধার
কলঙ্ক ঢাকিয়া করে গুণের প্রচার।
রহিল তোমার নাম সমুজ্জ্বল হয়ে
বালার্ক-বিভার সম এ বঙ্গ-নিলয়ে।" [৭]

কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের একমাত্র শব্দ তাঁর নামের আগে 'মহাত্মা' বিশেষণ। তাঁর গুণে লাভবান হয়েছে পৃথিবী। তিনি যথার্থই মানুষের বন্ধু ছিলেন। তাই, ব্যক্তিগত জীবনের অন্তিমপর্বে সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বেও তাঁর সাহিত্যপ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম – মহাত্মার ভূমিকায় চিরকাল শিক্ষা দিয়ে গেছে ও যাবে আগামীকে। আগামী প্রজন্ম ও সময়কে।

তথ্যসূত্র :

১. দীপেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ : জীবন ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা - ২৭
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, পৃষ্ঠা – ৫
৩. সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা – ১০৯
৪. সংবাদ প্রভাকর, ১৯ নভেম্বর, ১৮৫৬
৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, পৃষ্ঠা – ১২
৬. বিপিন বিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা – ৮৮
৭. মন্মন্থনাথ ঘোষ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃষ্ঠা – ১০১

সহায়ক গ্রন্থ :

১. গুপ্ত, বিপিন বিহারী, পুরাতন প্রসঙ্গ, প্যারাগণ প্রেস, কলিকাতা, ১৩২০
২. ঘোষ, মন্মথনাথ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট, কলিকাতা, ১৩২২
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ফাল্গুন, ১৩৫০
৪. বসু, দীপেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন সিংহ : জীবন ও সাহিত্য, অক্ষর প্রাকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯
৫. বসু, স্বপন, চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর, ২০০৩
৬. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র ১৩৬৪
৭. সর, রমেনকুমার (সম্পা.), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা-সংগ্রহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩
৮. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৯৮

....

লীলা মজুমদারের উপন্যাসে স্বতন্ত্র নারী চরিত্র

পরিতোষ পাল , গবেষক , বাংলা বিভাগ , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ড. উৎপল মণ্ডল , প্রফেসর, বাংলা বিভাগ , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

একলা-চলা, একলা-পথে-চলতে-পারার সবলতার মধ্যেই খুঁজে নেওয়া যায় লীলা মজুমদারের উপন্যাসের নায়িকাদের বৈশিষ্ট্য। প্রায়ই স্বজনহীনা তাঁর নায়িকারা, কখনো কোনো ঘনিষ্ঠ স্বজন তাদের থাকলেও কোনো না কোনো কারণে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জনবিচ্ছিন্না হয়েই দীর্ঘদিন জীবনের পথে চলতে হয় তাদের। প্রত্যেকেই স্বাবলম্বিনী এই নারীরা— নানা বৈচিত্র্যময় পেশায় স্বাধীন জীবিকাবলম্বিনী। গায়িকা, শিক্ষিকা, ডাক্তার, নার্স, অফিসচাকুরে, হাউসকিপার থেকে মেয়ে-পুলিশ পর্যন্ত— কতরকম বিচিত্রতাই আছে লীলা মজুমদারের নায়িকাদের জীবিকার সম্ভারে।

এত বিচিত্রতার মধ্যেও কিন্তু সমরূপতা আছে একটি জায়গায়— চলার পথটিকে শেষপর্যন্ত চলার পথের শেষ বিন্দুটি পৌঁছে গেছে একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত প্রেমের ঘরে। সেই যে প্রথম একটি-দুটি উপন্যাস লিখে বলেছিলেন লীলা মজুমদার— গল্পের শেষে চালো ভালো পাত্রের সঙ্গে সক্কলের বিয়ে দিয়ে দিলেন আর পাঠকেরা সবাই ভারি খুশি হল একটি-দুটি নয়, লীলা মজুমদারের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই অন্তিমে ঘটেছে এই সুখসমাপন; প্রথম উপন্যাসটির সমাপ্তিতে হয়তো মনে রেখেছিলেন সম্পাদিকার শর্ত, আর তারপর থেকে সেই শর্তই বোধহয় জড়িয়ে গেছে তাঁর নিজের মনের তারেও; তাই দেখি, শুধু সাধারণী নায়িকারাই নয়, ‘মণিকুন্তলা’ উপন্যাসে মণিকুন্তলার মতো অনুপম গায়িকা নিজেকে হারিয়ে খুঁজে পেয়েও শেষপর্যন্ত ধরা দিয়েছে তার নীরব প্রেমিকের আহ্বানে, মেনে নিয়েছে যে তার সঙ্গে জীবন জড়িয়েই সার্থকতা পাবে মণিকুন্তলার জীবনসাধনা।

লীলা মজুমদারের উপন্যাসের পর উপন্যাস জুড়েই ছড়িয়ে আছে এমন একলা-নায়িকা আর তার পথ-চলার রমণীয় সমাপন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘শ্রীমতী’। নায়িকা শ্রীমতী যে অনাথ নয়, একুশ বছর বয়সেই তা জানত না সে, পিতৃহীন স্বজনসঙ্গবিচ্যুত শ্রীমতী দেড় বছর বয়স থেকে মানুষ হয়েছিল রমেশ চৌধুরী নামে এক স্বাধীনচেতা, উদারমনা মানুষের ঘরে— তাঁরই শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিল স্বনির্ভর হওয়ার মন্ত্রে, তাঁর মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকেই দাঁড়িয়েছিল রূঢ় কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি। একলা পথে চলতে শুরু করে কতো কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করেছে শ্রীমতী— ধনী বৃদ্ধার কম্প্যানিয়ন হয়েছে দার্জিলিং-এ, শিক্ষিকার চাকরি নিয়েছে মেয়েদের হাইস্কুলে, চাঁপাডাঙা গ্রামে; আর শেষপর্যন্ত বিগতযৌবনা অভিনেত্রী মাকে খুঁজে পেয়ে তাঁর ইচ্ছা চরিতার্থ করতে চেয়ে নিজের জন্যও বেছে নিতে চলেছিল চিত্রাভিনেত্রীর জীবন— জীবনের এই নতুন-বাঁক-ফেরার মুহূর্তেই তার সামনে এসে দাঁড়ায় শুভেন্দু, সঙ্গী হতে চায় তার জীবনের বাকি-পথ-চলাটুকুর— সার্থক হয় শ্রীমতীর এতদিনের গোপন ভালোবাসা, বিহ্বল আপ্লুত শ্রীমতী ভাবে—

“এ মুহূর্তটি আর কখনো ফিরে আসবে না জীবনে, কিন্তু যা বলা হয়ে গেল, শোনা হয়ে গেল, কোনোদিনও কি ম্লান হবে তার মাধুর্য? স্থূল পৃথিবীর দুঃখ আর তার কি করতে পারে?”[১]

শ্রীমতীর মতোই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার শেষে ব্রজসুন্দরকে পেয়েছিল মন্দিরা, ‘জোনাকি’ উপন্যাসে (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। স্বজনহীনা ছিল না মন্দিরা, কিন্তু যৌবনের প্রথম প্রেমিক শঙ্করের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেলে পাটনা থেকে চলে এসেছিল কলকাতায়, তার অবস্থাপন্ন বিধবা মাসির কাছে— তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গদান ও নিজের ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগাবার জন্য। তারপর কেটে গেছে সাত-বছর, কুড়ি বছরের মন্দিরা পা দিয়েছে সাতাশ বছরে, স্টেনোগ্রাফি শিখে পাঁচ বছর ধরে চাকরি করে চলেছে সরকারি অফিসে— শেষপর্যন্ত তার জীবনে এসেছে ব্রজসুন্দরের স্নিগ্ধ প্রেম; মন্দিরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—

“আর আমি সুখ-সুখ করে ছুটে বেড়াব না। এই আমার জীবন, এই যা আমি পেলাম, এই দিয়েই আমরা সুখী হব। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তা নইলে একথা আমি বুঝতাম না।”[২]

মন্দিরা-ব্রজসুন্দরের সমান্তরালে আর একটি প্রণয়কাহিনিও পরিণয়ের সমাপনে পৌঁছেছে এ উপন্যাসে— মন্দিরার অনুজা অনিলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মন্দিরারই প্রথম প্রেমিক শঙ্করের। কিন্তু অনিলা যদিও যথেষ্ট অপরিণতমনা এবং আত্মসুখপরায়ণা আর শঙ্কর তার দিদিরই প্রাক্তন প্রেমিক, তবু 'মেঘে ঢাকা তারা'-র অশোভনতা নেই তাদের মিলনে; মন্দিরার জীবন থেকে, মন থেকে যে নিঃশেষে মুছে গেছে— অনিলা নিজের জীবনে তাকেই বরণ করে নিয়েছে। অনিলা-শঙ্করের বিয়ের সময়েও অনূঢ়াই রয়ে গেছে মন্দিরা, ব্রজসুন্দরের সঙ্গে তার বোঝাপড়াও সম্পূর্ণ হয়নি তখনও, তবু কিন্তু প্রথম নেয়ভীতা মেয়েটি স্বাধীন জীবিকা আর স্বাবলম্বনের শক্তিতে এমন ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে যে, মন্দিরাকে করুণার চোখে দেখার কথা ভাবেনি সমাজের পরশ্রীকাতর মানুষেরাও। স্বাধীন মেয়ের সক্ষমতা আর সামর্থ্যের এও এক দৃষ্টান্ত।

গানই জীবন, গানই গৌরব ছিল 'মণিকুন্তলা' উপন্যাসে (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) মণিকুন্তলা নামে এক একলা-মেয়ের। সুখী স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের স্বাদ আশৈশব কোনোদিন চায়নি সে। সঙ্গীত প্রতিভাই এনে দিয়েছিল তার মান, যশ, অর্থ। হঠাৎ একদিন গলা থকে স্বর হারিয়ে গেল তার, নীরবে নিজেকে নির্বাসিত করল সে প্রত্যন্ত এক মফস্বল হরে, আর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দিয়ে, নিঃসঙ্গের মধ্যে দিয়ে খুঁজে নিলো তার প্রাণের গভীর গোপন মহা আপনকে। মণিকুন্তলার এই নীরবতার নির্বাসনে সমবেদনা নিয়ে, সহমর্মিতা নয়ে বারে বারেই ছুটে এসেছে নিমাই চৌধুরী, সে-ই আহ্বান জানিয়েছে শেষে—

"বাকি জীবনটা আমার সঙ্গে বাঁচো মণিকুন্তলা, তোমার বেঁচে থাকার সাধনা আমাকেও শিখিয়ে ও।"[৩]

এ আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছে মণিকুন্তলা, যদিও জীবনের পথে এতদূর চলে সে আত্মাশ্রয়ী সে, অনন্যসাপেক্ষও— নিমাই চৌধুরীর সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগের কোনো ছবিও ফুটে ওঠেনি উপন্যাসে, তবু এ মিলন ঘটল বোধহয় মণিকুন্তলার হয়ে ঠাকে সম্পূর্ণতা দিতেই।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'ঝাঁপতাল' উপন্যাস অবশ্য প্রৌঢ়া অলিমাসিমার আজীবনের স্বপ্ন-দেখা আর স্বপ্ন-ভাঙার গল্প, তবু তাঁর জীবনযাপনের পাশাপাশি পূর্ণতা পেয়েছে বিলম্বিনী স্বজনহারা তরুণী কেয়ার জীবন— শৈশবসঙ্গী আনন্দকে জীবনে বরণ করেছে সে। সমসাময়িক 'চীনে লণ্ঠন' উপন্যাসও (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) দুই শৈশবসঙ্গী খেলার সাথীর মিলনের উপাখ্যান— অনেক ভুল-বোঝাবুঝি, অনেক মন-খারাপ করা পেরিয়ে শেষপর্যন্ত পলাশ আর মল্লিকা চিনে নিয়েছে পরস্পরকে। লীলা মজুমদারের অন্য অনেক নায়িকার মতোই মল্লিকাও একলা কলকাতায় এসেছিল চাকরি করতে, পিছনে আগ্রা শহরে ফলে এসেছিল বাবা-মা-পরিবারের সকলের সতর্ক, সযত্ন স্নেহ, পলাশের আশৈশব বন্ধুত্ব। শেষপর্যন্ত অবশ্যই তার সব পথ এসে মিলে গেছে পলাশের দুই হাতের বন্ধনে।

ভালোবাসায় ভাস্বর, মিলনে মধুর সমাপনের এই প্রবণতা একইরকম উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে লীলা মজুমদারের পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতেও। 'আমি নারী' সংকলনে বিন্যস্ত তাঁর পাঁচটি কাহিনীই মিলনান্তক, সুখ-সম্মিলনে সমাপ্ত। 'পাখি' নামের আখ্যায়িকাটি শুধু বর্ষীয়সী বড়নার বেদনার্ত জীবনের ছবি নয়, বাসবের বাবা-মার মর্মান্তিক মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের কাহিনি নয়, এ গল্প একলা-মেয়ে মালার বাসবকে পাওয়ার গল্প, ঘর-হারানো মেয়ের ঘর পাওয়ার গল্প, একলা পাখির ডানা মুড়ে বসে নীড় বাঁধার গল্প। 'অন্তরা' গ্রামের উপন্যাসটিতে ডিটেকটিভ-রসের ছোঁয়া লেগে থাকলেও শেষে সহজেই অপাবৃতয় সব রহস্যের আবরণ, বোর্ডিং-এ একলা বেড়ে ওঠা কালো মেয়ে সুমতি তার শৈশবের একাকীত্ব মুছে ফেলে খুঁজে পায় তার মা-কে, ভবিষ্যৎকে মধুরতর করে তুলতে তার জীবনে আসে সুন্দর পুরুষ অরবিন্দ। এমনকি, সুন্দরী বরুণা আর সুযোগসন্ধানী উকিল কৌশিকের বিয়ে নির্ধারিত হয়ে যেতেও দেরি হয় না। 'পঞ্চমী পুরাণ' গল্পের নায়িকা টুনিও নিজেকে জানত অনাথ বলেই— অনেক উৎকণ্ঠা, অনেক রহস্যের জাল ভেদ করে সে-ও হয়েছে মাতামহের অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, পেয়েছে আনন্দর মতো আকাঙ্ক্ষিত স্বামী। 'বাঁশের ফুল' নামে ছোট্ট কাহিনিটির নায়িকা মায়া একলা-মেয়ে তো বটেই, তার পেশাটিও ছিল চমকপ্রদ— দক্ষ এক মেয়ে-পুলিশ সে, তদন্তের কাজে ছদ্ম-পরিচয়ে এসেছিল দার্জিলিং-এ আর বুক-জোড়া স্নেহ নিয়ে হয়ে উঠেছিল এক মা-হারা স্নেহকাঙাল বালকের মা— তারই সূত্রে তার জীবন ভরে উঠেছিল স্বামী-ঘর-সংসারের পরিপূর্ণতায়। কী বলব এ গল্পগুলিকে— ইচ্ছাপূরণের আখ্যান? সত্যিই, দুঃখী অনাথ মেয়েদের জীবনের পাত্রগুলি কানায় কানায় ভরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে নিয়েই যেন এমন নিটোলভাবে উপাখ্যানগুলিকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন লীলা মজুমদার।

তথ্যসূত্র :

১. মজুমদার, লীলা, পাকদণ্ডী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, ১৯৮৬, পৃ. ২৮২

২. তদেব, পৃ. ৩৪৪

৩. তদেব, পৃ. ৩১৯

....

শিবায়নের চাষপালা : কবি রামেশ্বরের মৌলিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ , নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, উদয়পুর, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের বিভিন্ন রচনায় এই দেশের কৃষিমাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন সময়কালে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের ফসল উৎপাদন চাষবাসকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। ভারতবর্ষ কৃষিসম্পদের জন্য বিখ্যাত, কারণ এদেশের ভৌগলিক অবস্থান চাষের জন্য খুবই অনুকূল। এদেশের চাষিদের গৌরব-ও সেকারণেই বেশি। কৃষিকাজকে নানাভাবে প্রশংসা করা হয়েছে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে। শাস্ত্রে আরও উল্লেখ আছে যে, কৃষিযুগের দেবতা রাম। আর লাঙ্গলের অগ্রভাগেই তো সীতার জন্ম। বলরাম ছিলো কৃষক, কৃষ্ণ ছিলো রাখাল। কৃষির দু'টি উৎসব ভারতবাসীর-ও দু'টি শ্রেষ্ঠ উৎসব বটে। নবান্ন ও পৌষপার্বণ উৎসবের মাহাত্ম্য কৃষকদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আমাদের আলোচ্য শিবায়ন কাব্যের চাষপালায় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব কৃষক বা চাষি। তাই এ কাব্যে কবিকে কৃষকের কবি বলে মনে হয়। কাব্যে গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রাও কৃষি নির্ভর এবং তাদের দেবতাও কৃষক। কবি রামেশ্বর শিবকে দেবতার স্থান থেকে সরিয়ে এনে সাধারণ মানুষের মতো করে গড়ে তুলেছেন। এখানেই কাব্যটির মাহাত্ম্য এবং কবির কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে।

Key words

রামেশ্বর, শিবায়ন, চাষপালা, মৌলিকতা, কৃষিকাজ, বাঙ্গালি, কাব্য।

মূল আলোচনা

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন শিবায়ন কাব্যধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায়, ঘাটাল থানার অন্তর্গত বরদা পরগনার যদুপুর গ্রামে কবির জন্ম। গ্রামটিতে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার ছিলো। গ্রামবাসীরা মনে করেন, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কবি রামেশ্বর দেহত্যাগ করেন।

বংশপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন-

"ভট্টনারায়ণ মুনি সন্তান কেশর কণী
যতি চক্রবর্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃত কীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ।।
তস্য সুত রামেশ্বর সম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যা নগর নিকেতন।।"[১]

নারায়ণ চক্রবর্তী কবির প্রপিতামহ, পিতামহ গোবর্দ্ধন চক্রবর্তী। কবির পিতা লক্ষ্মণ চক্রবর্তী সম্ভবত ভট্টাচার্য উপাধি গ্রহণ করেন পূজার্চনা করার জন্য। কবির মাতার নাম রূপবতী। যৌবন বয়সেই কবি যদুপুর ছেড়ে কর্ণগড়ে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে শিবায়ন রচনায় কবি উল্লেখ করেন-

"পূর্ব্বে বাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে বসিয়া পুরাণ পাঠে

রচাইল মধুর সঙ্গীত।"[২]

-কবি রামেশ্বরও মুকুন্দরামের মতো ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সামন্তরাজ শোভা সিংহের ভাই হেমন্ত সিংহ কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে কবি রামেশ্বরকে যদুপুরের বাড়ি থেকে উৎখাত করে। এরপর কবি কর্ণগড়ের সামন্তরাজ রামসিংহের কাছে আশ্রয় লাভ করেন এবং কর্ণগড়ের কাছে অযোধ্যা নগরে নতুন করে বসবাস শুরু করেন।

কবির রচিত কাব্যের মধ্যে কৌশিকী নদীর নামোল্লেখ করেছেন। এরই তীরে কবি রামেশ্বরের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে দেন রাজা রামসিংহ। কবি সেখানে পল্লী বালকদের নদীতে সাঁতার কাটার দৃশ্য উপভোগ করতেন। পল্লী ললনাদের দলবেধে নদীতে আগমনের দৃশ্য কবির মনে রোমান্সের সৃষ্টি করতো। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে চাষিদের চাষ করার দৃশ্য কবিমনে শিবায়ন কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলো।

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রথমে তাঁর কাব্যের নাম রাখেন 'শিবসঙ্কীর্তন', পরবর্তীসময়ে সম্ভবত রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কাব্যটির নামকরণ করেন 'শিবায়ন'। পরবর্তীতে নতুন নামেই কাব্যেটি বেশি বা সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যের ভণিতায় অনেক অংশে বলেছেন-

"চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর।।"[৩]

কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যের প্রেক্ষাপট ছিলো সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। সময়কালটি ছিলো অবক্ষয়ের কাল। এরূপ প্রেক্ষাপটেও রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে পরিশীলিত রুচিবোধ ও ভদ্রতার পরিবেশ রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যে তিনি শিবের জয়গান গান নি, এই কাব্যের জনপ্রিয়তার মূল কারণ তাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও মৌলিকতা। কাব্যের কাহিনি বর্ণনায় তিনি গার্হস্থ্য জীবনরস পরিবেশন করেছেন। তাছাড়া রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্য অন্যান্য কাব্যের মতো অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয়। আমরা 'শিবায়ন' কাব্যের চাষপালায় দেখতে পাই-

"গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।"[৪]

আবার কবি বলেছেন-

"পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।"[৫]

-এই চরণগুলোর ব্যবহারে কবির নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিচয় যেমন পাই, তেমনি তাঁর মার্জিত রুচিবোধেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশাপাশি এ-ও লক্ষ করা যায় যে, সংসারের সব সুখের উৎসস্থলে কবি নারীদেরকেই রেখেছেন। চাষপালার শুরুতে কবি বলেছেন শিবের ঘরে আর মাত্র ছয় মাসের খাবার মজুত আছে। তাই শিবকে চাষবাসের কাজে হাত লাগানো উচিত। এই পালার 'ব্যবসায় বিচার' অংশে কবি বলছেন-

"পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
মহেশের সে ত নাঞি সকলি অনুল।।"[৬]

-পুঁজি, প্রবঞ্চনা, শিবের কিছুই নাই। কিন্তু এগুলোই বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। এরপর 'হরপার্ব্বতীর কলহ' অংশে কাত্যায়নী অর্থাৎ পার্বতী শিবকে বলছেন চাষের জন্য কুবেরের বাড়ি থেকে বীজ ধান আনতে এবং যমের কাছ থেকে মহিষ আনতে। হাল ধরবেন ভীম। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা কোনও রকমের পারিশ্রমিক ছাড়াই চাষের জন্য লাঙ্গল, জোয়ালি প্রভৃতি যন্ত্রগুলো তৈরি করে দেবেন। এখানে কবি রামেশ্বর দেবতাদেরকে যেনো আমাদের দেখা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজনদের মতো করে গড়ে তুলেছেন। এখানেই তাঁর কবিত্বশক্তি।

'শূলের গুণবর্ণনা' অংশে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য বলছেন যে-

"অসিদ্ধি সুসিদ্ধ করে হরে রিপুপ্রাণ।
শূলে হৈতে সঙ্কটে সেবক পরিত্রাণ।।"[৭]

-এভাবে শূলের নানারকম প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয় যে শূলে করেই নাকি শিবঠাকুর ব্রহ্মান্ডকে ধরে রেখেছেন। নয়তো অন্য গ্রহদের সাথে ঠেকাঠেকি হয়েই এটি বিনষ্ট হয়ে যেতো।

'কৃষির উদযোগ' অংশে শিব বলছেন যে, তাঁকে সবাই ভালোবাসেন। শিবের কথায়-

"কার কোন কর্ম্ম আমি না কর‍্যাছি কবে।
ভূতনাথে ভব্য লোক ভালবাসে সভে।।"[৮]

-পরবর্তী সময় দেখা যায় শিবঠাকুর দেবরাজ ইন্দ্রকে চাষের ভূমি দিতে বলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও শিবের সান্নিধ্য লাভ করতে পেরে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান বলে মনে করেছেন। দেবতাদেরকে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য মাটির কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, এখানেই তো তাঁর কৃতিত্ব।

এরপর 'ইন্দ্রের নিকট শিবের চাষভূমি গ্রহণ' অংশে ইন্দ্র বলছেন-

"ভৃত্যে কেন ভূমি মাগ ভূমিস্বামী হৈয়া।
যত পার জোত কর কাজ নাঞি কয়্যা।।"[৯]

-শিব ইন্দ্রের কাছে চাষভূমি চাওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র লজ্জিত বোধ করছেন। শিব চাষের জন্য শঙ্কর চক ও বিশ্রাম করার জন্য দেবীচক দ্বীপ দিতে বলেন ইন্দ্রকে। পাশাপাশি ইন্দ্রের কাছ থেকে ফেরার সময় ইন্দ্রকে সাবধানও করে এসেছেন যে, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি যেনো শিবের চাষের কাজের জন্য অন্তরায় না হয়। এরপর যমের কাছ থেকে মহিষ আনতে যান শিব।

'চাষের সজ্জার নিমিত্ত শূলভঙ্গের চেষ্টা' নামক অংশে দেখা যায় শিবের ত্রিশূল ভেঙ্গে বিশাই অর্থাৎ বিশ্বকর্মা জোলুই, কোদাল, ফাল, দা, উখুন, পাশী প্রভৃতি যন্ত্রগুলো তৈরি করছেন। কবির ভাষায়-

"পাঁচ মনে পাশী করি আশী মনে ফাল।
দু মনে দু জোলই তার অর্দ্ধেকে কোদাল।।
দশ মনের দা অষ্ট মনের উখুন।
দুশ দশ মন দেখ হইল একুন।।"[১০]

-কী ভয়ানক আকারের যন্ত্রসব, শুনে হাসি পায়, মনে ভয়-ও লাগে। এখানেই তো কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সার্থকতা।

'চাষের সজ্জা প্রস্তুতকরণ' অংশে কবি রামেশ্বর বলছেন-

"মহামদে মোহমোহ মহেশের বাড়ি।
প্রেতভূত পিচাশ প্রমথ গড়াগড়ি।।"[১১]

-এই অংশের শেষে কবি বলছেন-

"বাঁট দিয়া কোদালে জুয়ালে দিয়া সলি।
পুরস্কার পায়্যা চলে লৈয়া পদধূলি।।
হরপদতলে বলে দ্বিজ রামেশ্বর।
বাড়ি বীজ কর‍্যা চাষ চষ অতঃপর।।"[১২] –

এখানে আমরা দেখতে পাই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা অর্থাৎ বিশাই শিবের কাছ থেকে পুরস্কার অর্জন করছেন চাষের যন্ত্রগুলো তৈরি করে দেওয়ার জন্য।

'বীজধান্যের অন্বেষণ' অংশে চাষের কাজের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের মধ্যদিয়ে এই কথাটি উঠে এসেছে-

"ধরাধরসুতা ধান্য ধার কর তুমি।
পার্ব্বতী বলেন প্রভু পারি নাঞি আমি।।
চল চাষ্যা কাজ নাই মাগ্যা খাব ভিক।
মেয়্যার করজ করা মরণ অধিক।।"[১৩]

'কুবেরের নিকট বীজধান্য সংগ্রহ' নামক অংশে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য বলেন-

"দুষ্টের দ্রবিণ দিন দুই বই নয়।
উত্তমের উন্নতি অনেক কাল রয়।।
কোথা গেল বেণু বা সে কোথা গেল বাণ।
কোথা গেল দুর্য্যোধন করিয়া গুমান।।"[১৪]

-এখানে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য মহাভারতের প্রসঙ্গ টেনেছেন। এখানে তাঁর ভাবনার গভীরতার যেমন প্রকাশ পাওয়া যায়, তেমনি আধ্যাত্মিক চিন্তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

'শিবের চাষ করিতে গমন' অংশে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য বলছেন-

"গদ গদ হয়্যা গৌরী গঙ্গাধরে বলে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের জলে।।"[১৫]

-এখানে গৌরীর কষ্টের জীবনযাপনের চিত্র আমরা দেখতে পাই। অনেক দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের মধ্যদিয়ে পার্ব্বতীর সংসার জীবন অতিবাহিত করছেন। এ কষ্টের কথা শিব ছাড়া যেনো কাউকেই এমন করে বোঝানো যাবে না। কবি রামেশ্বর বলছেন-

"ভগবতী কহ অতি অনুচিত কথা।
গৃহস্থ থাকিলে ঘরে পরে চাষ বৃথা।।"[১৬]

-সংসারের দুঃখ-দুর্দশা, আর্থিক অনটনকে দূর করতে হলে ঘরের পুরুষকে কাজে যেতেই হবে। আর এটা যেহেতু চাষের কাজ, পুরুষমানুষ ঘরে বসে থাকলে চলবে কেমন করে? এখানে কবির বাস্তববাদী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় সুস্পষ্টভাবেই।

'শিবের কৃষি' অংশে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন কীভাবে শিবঠাকুর তাঁর চাষের কাজে সহায়তাকারীদেরকে খায়িয়েছেন। কবি বলছেন-

"বাঘছাল বিছায়্যা বসিল বৃষকেতু।
ভীমের ভাবনা হল্য ভক্ষণের হেতু।।
ক্ষেতে খাট্যা ক্ষুধা বড় খাব কিহে মামা।
বিশ্বনাথ বলে বাপু আজি কর ক্ষেমা।।"[১৭]

-এরপর কবি বলছেন-

"মামীর সহিত মামা যুক্তি কর্য়া ঘরে।
ভোকে মোকে মারিতে আন্যাছে তেপান্তরে।।
জঠর অনলে যেন জীউ জ্বলে মোর।
তেমত প্রস্তুত খন্দ পুড়িবেক তোর।।
বিশ্বনাথ বলে বাপু বাটী হত্যে আস্য।
ভাত খায়্যা আসিয়া প্রভাতে চাষ চষ্য।।
ভীম কহে ভূতনাথ ভাল কও কথা।
সারাদিন ক্ষেতে খাট্যা খেত্যা জাব তথা।।
মামী জিজ্ঞাসিলে আমি কয়্যা দিব ভাল।
কোচনীকে লৈয়া মামা পলাইয়া গেল।।"[১৮]

-এখানে কবি রামেশ্বরের রচনায় হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। শেষে কবি বলছেন-

"চাকরের চারা নাঞি চিন্তিলেন নাথ।
রামেশ্বর বলে হর খাওয়াইবেন ভাত।।"[১৯]

-শিবের ঘরে অভাব-অনটন প্রতিনিয়ত লেগেই আছে। এমন অবস্থায় শিব অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়েই যাচ্ছেন, খাওয়ার কথা বলছেন না একবারও। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, অন্যরা মানবেন কেনো? শেষে শিবকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেই হলো।

এই কাব্যের চাষ পালার শেষ অংশ অর্থাৎ 'ভীমের ভোজন' অংশে দেখতে পাই শিব সকলকেই খাওয়াচ্ছেন। কবি রামেশ্বর বলছেন-

"সন্ধ্যাকালে কুতূহলে আস্যা যত পেঁতি।
যোগীর নৌতন ঘরে যোগাইল বাতি।।
ভূত প্রেত প্রমথ পিশাচ দক্ষ দানা।
মহেশের মন্দির বেড়িয়া দিল থানা।।
কতক্ষণ কোলাহল কর‍্যা আশ্চম্বিত।
শক্র আস্যা স্বগণ সহিত উপস্থিত।।
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধরী বরাবর।
আন্যা অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণিত কৈল্যা ঘর।।"[২০]

-এখানে আমরা লক্ষ করি যে, শিবের খাওয়ানোর কথা শুনে অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন। ভীমকে যখন খাবার দেওয়া হলো, তখন সে এমন করে গ্রাস তুলতে শুরু করলো যেমন সে বহুদিন উপবাস যাপন করেছে। কবি রামেশ্বর বলছেন-

"গণ্ডশৈল সমান নির্ম্মাণ কর‍্যা গ্রাস।
দেব দৈত্য দানব দেখিয়া পাইল ত্রাস।।"[২১]

-এই অংশের শেষে কবি বলছেন-

"নারদের ঢেঁকি আন্যা ধান ভানে ভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন ভালা মোর পুত।।"[২২]

-এভাবেই শেষ হয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যের 'চাষপালা'।

'চাষপালা'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে সাহিত্যিক কালিদাস রায় তাঁর 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' গ্রন্থে বলেন- "শিবায়নে শিবের মাহাত্ম্য অপেক্ষা চাষের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে অনেক বেশী, চাষের গৌরব বাড়াইবার জন্য, চাষীদের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য কবি শিবকে দিয়া চাষ করাইয়াছেন কিনা, তাই বা কে জানে? গোয়ালার মর্য্যাদা, রাখালের মর্য্যাদা বাড়াইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ, আর শিব শিবায়নে শাঁখারী ও চাষীর মর্য্যাদা বাড়াইলেন।"[২৩] (পৃ.৩১৭)

লেখক বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁর 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন- "কাজেই শিব হচ্ছেন হরিজন দেবতা এবং হরিজনদের দেবতা। আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে তিনি খুব অ্যারিস্ট্রোক্র্যাটিক নন। এই ধারা তো বরাবর চলে আসছিলই। তার উপর ধর্ম্মপূজা শূন্যপূজা ও শিবপূজা এককালে বাঙ্গালীর লোকসংস্কৃতির মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় শিবের উপাসনা, সমাজের প্রান্তে যে সব শ্রেণী বাস করে, তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।"[২৪] (পৃ.১০১)

দরিদ্র শিবের কথা প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন- "বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্রকে মহত্বে এবং দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বৈরাগ্য এবং আত্মবিস্মৃতির দ্বারা দারিদ্রের হীনতা ঘুচাইয়া কবি তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা অনেক বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। ভোলানাথ দারিদ্রকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন- দরিদ্র সমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় আদর্শ আর কিছুই নাই। আমার সম্বল নাই যে বলে, সেই গরিব;- আমার আবশ্যক নাই যে বলিতে পারে, তাহার অভাব কিসের। শিব তো তাহারই আদর্শ।"[২৫] (পৃ.৯০)

অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বিচিত্র সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন- "রামেশ্বরের শিব এক-হেলে চাষী, আর গৌরী তাঁর সেই দরিদ্র একমাত্র সংসারের কর্ণধার গৃহিণী। দরিদ্র, তবে ভদ্র এবং দেবতা।"[২৬] (পৃ. ১৩৪)

শ্রীকৃষ্ণ যশোদা মায়ের কাছে শাস্তি পেয়েছিলেন। মা কালীও কবিদের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন কন্যারূপে। আর শিবঠাকুর কবিদের কলমে পড়ে গাঁজা, ভাঙ্গ ইত্যাদি খেয়ে নেশায় মেতেছিলেন এবং কোঁচনী পাড়ায় প্রবেশ করেছিলেন। আর দারিদ্র্যের জ্বালা তো আছেই। অবশেষে

আমরা বলতে পারি, বাঙালি কবিদের মধ্যে যাঁরা স্বর্গের দেবতাদেরকে মাটির কাছাকাছি এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যও একজন আদর্শ কবি। এখানেই তাঁর কাব্য মৌলিকতার সাক্ষর বহন করেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১) ড. তারকনাথ ভট্টাচার্য- কবি রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ : বইমেলা, ২০২০, পৃষ্ঠা-৭

২) তদেব, পৃ-৭

৩) তদেব, পৃ-১৩, ১৫৩

৪) তদেব, পৃ-১৫২

৫) তদেব, পৃ-১৫৩

৬) তদেব, পৃ-১৫৩

৭) তদেব, পৃ-১৫৪

৮) তদেব, পৃ-১৫৫

৯) তদেব, পৃ-১৫৫

১০) তদেব, পৃ-১৫৬

১১) তদেব, পৃ-১৫৭

১২) তদেব, পৃ-১৫৭

১৩) তদেব, পৃ-১৫৭

১৪) তদেব, পৃ-১৫৮

১৫) তদেব, পৃ-১৫৮

১৬) তদেব, পৃ-১৫৮

১৭) তদেব, পৃ-১৫৯

১৮) তদেব, পৃ-১৫৯

১৯) তদেব, পৃ-১৫৯

২০) তদেব, পৃ-১৫৯

২১) তদেব, পৃ-১৫৯

২২) তদেব, পৃ-১৫৯

২৩) তদেব, পৃ-৩১

২৪) তদেব, পৃ-৩১

২৫) তদেব, পৃ-৩২

২৬) তদেব, পৃ-৩২

....

‘এক অন্তহীন আত্মানুসন্ধানঃ সন্মাত্রানন্দের ‘নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা’

প্রভাত দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নুর মোহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসারঃ

অতীশ দীপঙ্করের জীবন ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখা ‘নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা’ একটি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। ‘নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা’ উপন্যাসের লেখক সন্মাত্রানন্দ যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতী এক সন্ন্যাসী। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক এক অপূর্ব কথন কৌশলকে ব্যবহার করেছেন। ঔপন্যাসিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পারম্পর্যকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনী অংশ তিনটি- অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও দৌবারিক কন্যা কুন্তলার কাহিনী(দশম একাদশ শতক); তীব্বতাগত লামা চাগ লোচাবা তন্ত্রবিদ্যা পটিয়সী স্বয়ংবিদ্যার কাহিনী (ত্রয়োদশ শতক); কৃষক অনঙ্গ দাস , কন্যা জাহ্নবী ও শাওন বসু (আমি কিংবা আপনি) বর্তমানকাল সাম্প্রতিককাল (একবিংশশতক)। গভীর জীবন জিজ্ঞাসা ঔপন্যাসিককে এই উপন্যাস রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমরা আমাদের জীবনের অর্থ খুঁজছি নিজের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করছি; এই আত্মজিজ্ঞাসাই মানুষের জীবন, মানুষের ইতিহাস। জীবনের সঠিক অর্থ অন্বেষণই আমাদের উদ্দেশ্য । অমিতায়ুধ খুঁজছে তিনমূর্তির রহস্য, কুন্তলা, স্বয়ংবিদা, জাহ্নবী খুঁজেছিল তাদের হারিয়ে যাওয়া মানুষকে, শাওন খুঁজেছেন তার জীবনের সারবান তাৎপর্য, চাগ লোচাবা বিনয়ধরের দেহের ভিতর প্রবেশ করেও খুঁজে চলেছিলেন কশেরুকা মালা। বিনয়ধর তার দেহের ভিতর চাগ লোচাবাকে আশ্রয় দিয়েও খুঁজে ফিরেছিলেন অতীশ দীপঙ্করকে, অতীশ তবে কী খুঁজছিলেন? ত্রিকালদর্শী এক শাশ্বত মানবীসত্ত্বা যুগে যুগে কর্মউদ্দীপনা যুগিয়েছে প্রেমে দাম্পত্যে বাৎসল্যে জীবনকে লালন করেছে জন্মজন্মান্তর। আটশোবছর আগেকার কোনো এক বাঙালী কূলবধূর পিপাসার্ত হৃদয়বিন্দুতে আধুনিককালের এক কৃষক কন্যার কথা ফিরে ফিরে আসতে দেখল অমিতায়ুধ। উপন্যাসে আত্মতত্ত্বে মনের প্রস্তুতি দেহতত্ত্বে সাধনার রীতি-পদ্ধতি, গুরুতত্ত্বে গুরুর চরণ শরণ; সৃষ্টিতত্ত্বে জীবসৃষ্টির রহস্য এবং মানুষতত্ত্বে পরমাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে ।

সূচক শব্দঃ

আত্মান্বেষণ, দেহতত্ত্ব, শূন্যবাদ, নির্বাণ, বৌদ্ধদর্শন, জন্মান্তরবাদ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব,

‘নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা’ উপন্যাসটি অতি আধুনিক, শুধু সময়ের প্রেক্ষিতে নয় বিষয় বৈচিত্র্যে। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবন নিয়ে উপন্যাস এই প্রথম নয়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ বাণী বসুর ‘মৈত্রেয় জাতক’ উপন্যাসেও অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কথা আছে। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এমন সব তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে একক ও অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। শুধু বৌদ্ধদর্শনের কথা নয়, সেইসঙ্গে প্রচুর দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসে মান্যচলিত ভাষার পাশাপাশি বঙ্গালী উপভাষার এমনকি সংস্কৃত ভাষার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন যুগের আখ্যান বয়নে প্রয়োজনে একাধিক ভাষা ছাঁদের ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটির কথনশৈলী আদৌ একরৈখিক নয়; উপন্যাসের সময় তিন খন্ডে বিভক্ত- দশম শতকের শেষ থেকে একাদশ শতক, ত্রয়োদশ শতক ও একবিংশ শতক। এই তিন যুগের কাহিনীকে লেখক একত্র সন্নিবেশিত করেছেন; যেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাহিনী ও চরিত্ররা একে অপরের সঙ্গে কথপোকথন করছেন যা সত্যই কল্পনাতীত। ‘নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা’ উপন্যাসে তিনযুগের কাহিনীর একত্র সমাবেশ সত্যিই অভিনব। উপন্যাস পাঠ করতে করতে আমরা কখনো অতীত, কখনো বর্তমান, কখনো ভবিষ্যৎ কিংবা একই সময়ে তিনকালকেই স্পর্শ করে চলেছি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে লেখক একটি যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। অতীত কাহিনী বর্তমানের দিকে তাকিয়ে আছে আর বর্তমান অঙ্গুলীনির্দেশ করে আছে ভবিষ্যতের দিকে। আকাশের নক্ষত্ররা অতীত মানবেতিহাসের সাক্ষী সেই সঙ্গে বর্তমানকেও সে নিয়ত প্রত্যক্ষ করে চলেছে। ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে সে সমদৃষ্টিতে দেখবে। আজ যা বর্তমান দুদিন পর তা অতীত আজ যা অতীত একদিন তা

বর্তমান ছিল। আজকের বর্তমান অতীতযুগের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ছিল, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি বৃত্তাকার আবর্ত দেখতে পেয়েছেন লেখক।

'নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক এক অপূর্ব কথন কৌশলকে ব্যবহার করেছেন। ঔপন্যাসিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পারম্পর্যকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত পরস্পরছেদী তিনবৃত্তের মতন, এই তিন বৃত্তের ছেদবিন্দু গুলির মধ্যে কোনো বিশেষ মুহূর্তে কোনো এক যুগের চরিত্রের সঙ্গে অন্যযুগের দেখা হয়ে যেতে পারে তাদের বিনিময় ও হতে পারে। উপন্যাসের কাহিনী অংশকে তিনটি- অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও দৌবারিক কন্যা কুন্তলার কাহিনী(দশম একাদশ শতক); তীব্বতাগত লামা চাগ লোচাবা তন্ত্রবিদ্যা পটিয়সী স্বয়ংবিদ্যার কাহিনী (ত্রয়োদশ শতক); কৃষক অনঙ্গ দাস কন্যা জাহ্নবী ও শাওন বসু (আমি কিংবা আপনি) বর্তমানকাল সাম্প্রতিককাল (একবিংশশতক)। লেখক এক যুগের মানুষের সঙ্গে অন্যযুগের মানুষের অবয়বের হুবহু মিল খুঁজে পেয়েছেন। আকাশগঙ্গার কথা বলেছেন লেখক কখনো বলেছেন আকাশের এক একটি তারা যা আমরা দেখছি সে এক এক সময়ের ছবি; সবমিলিয়ে গোটা আকাশটা যেন নানা যুগের সমন্বয়ে সময়ের একখানি অন্তহীন ইতিহাস। সময়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে যুগ যুগান্তরের ঘটনাস্রোত ধরা আছে মানুষের এই মনে। মানব মনের অন্তস্তরের মধ্যদিয়ে যদি দেখি, জাহ্নবী যদি দেখতে পেত তবে হাজার বছর আগের অভিজ্ঞতার স্রোত মনে হত যেন পাশের বাড়ির ঘটনা। উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা ভাবতন্ময় হয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে চলে যাই। রহস্য উপন্যাস বর্ণনার ভঙ্গিতে জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাই। চরিত্রের মনগহনে প্রবেশ করতে ঔপন্যাসিক চেতনা প্রবাহরীতি কিংবা আত্মকথন রীতির প্রয়োগ না করে হুবহু একটি যুগের মানুষকে অপর একটি যুগের মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। জাহ্নবীকে গান গাইতে বললে সে বলে –'গাইছি তো বহুৎবার গাইছি কতো শিশুর মা হইছি তাগো শিয়রে বইয়া এই গান গাইয়া ঘুম পাড়াইছি আমার মনের মানুষ ঘরে আইলোনা দেইখা বর্ষারাতে হুইয়া হুইয়া নিজের মনে হেই গান গাইছি।'[১] জাহ্নবীর কথায় বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাই আমরা। কত স্বামী, কত শিশু, কত পিতা, কত প্রেমিক কীসব বলে গেল অবিবাহিত মেয়েটি? মেয়েটি বলল না অন্য কেউ তাকে বলাল? এসব ভাবনা শুধু অমিতায়ুধের নয় আমাদেরও।

আমাদের জীবন গতিশীল এই গতিশীল জীবনে মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজছে নিজের আত্মপরিচয়ের সন্ধান করছে তাঁর এ অন্বেষণ অনন্তকালের। এই অনন্ত আত্মজিজ্ঞাসাই মানুষের জীবন। মানুষের ইতিহাস মানুষ খুঁজতে খুঁজতে হয়তো পায় কখনো একটি স্নেহকাতর হৃদয় কখনো সে ইয়াংচুবা কখনো স্বয়ংবিদ্যা কখনোবা জাহ্নবী। তারা সকলেই কুন্তলা কিংবা কুন্তলার মতো কেউ যারা জীবনের অর্থকে খুঁজে পেতে চায়; যুগ যুগান্তরে জন্মজন্মান্তরে সঞ্চরণশীল নারীসত্তা কুন্তলাও চায়, তাই তীব্বতীয় জপযন্ত্রের মতো ঘুরতে থাকে। মানুষ জন্ম-জন্মান্তরে তারই অন্বেষণ করে ফেরে। সহস্রবর্ষ পূর্বের কোনো কিশোরের কাহিনী যে জীবনের অর্থ খুঁজেছিল তার বাল্য সঙ্গিনীকে খুঁজেছিল মহাকরুণাকে খুঁজেছিল হয়তো তার নাম দীপঙ্কর হয়তো তার নাম দীপঙ্কর নয়; হয়তো তার নাম তুমি অন্যনাম আমি হয়তো সে আজও খুঁজছে আত্মপরিচয়। কি পরিচয় এই আমির? এ আমিকে আমি অনেক অনুসন্ধান করেছি পাইনি কেবলই পেঁয়াজের খোসা মনে হয়েছে, মনে হয়েছে আরেকটি খোঁসা খুললেই তাকে পাবো। এই উপন্যাসে আরও কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে- 'বৌদ্ধমতে নির্বান কী? মৃত্যুতে কী হয়? আমাদের পরিচয় কী? আমার পরিচয় কী? এই আমিকে আমি অনেক অনুসন্ধান করেছি পাইনি। এই আমির প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাইনি।'[২] আমাদের জীবনে শৈশব, কৈশোর, বার্ধক্য একের পর এক আসে আমরা সেই অতীতকে ফিরে পেতে চাই আমার সেই অতীত আজ কোথাও কী নেই? শিলারক্ষিতের মতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একই পদার্থ বিদ্যমান। সে পদার্থের পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তনের জন্য একপ্রকারের সজ্জাকে বর্তমান অন্য প্রকারের সজ্জাকে অতীত ও অন্য আরেক প্রকারের সজ্জাকে ভবিষ্যৎ বলা হয়। বস্তুত অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সকলই এখানে আছে। কোনো বৃক্ষের বীজ কালক্রমে পত্র পুস্প ও ফলে পরিণত হয় ফলে সকল সম্ভবনা বীজেই নিহিত থাকে; বীজ অতীত ফল ভবিষ্যৎ । বোধিসত্তার ভিতরেই সকল নিহিত। অলক্ষ্য শূন্য লক্ষ্য ও শূন্য, শূন্য থেকে শূন্য উদ্ভূত হয়, শূন্য থেকে শূন্য নিলে অবশিষ্ট থাকে শূন্য, শূন্যতায় পূর্ণ এইভাবে শূন্যবাদের কথা উপন্যাসে বারংবার ফিরে ফিরে এসেছে।

উপন্যাসের সকল চরিত্র কল্পনাপ্রসূত শাওন শুধু একা খুব একা, সে পারছে না কাল্পনিক চরিত্রগুলির সঙ্গে জীবনের বাস্তবতাকে মেলাতে। আধুনিক মানুষের মতো সে একা হাঁটছে ফুটপাত ধরে একাই হাটবে। আমরা আমাদের জীবনের অর্থ খুঁজছি নিজের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করছি; এই আত্মজিজ্ঞাসাই মানুষের জীবন, মানুষের ইতিহাস। আমি কে? রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান

বা আত্মচেতনার প্রবাহ এই পঞ্চস্কন্ধ মিলেই আমি। বিচ্ছিন্নভাবে আমরা কেউই জীবনধারণ করতে পারি না। সে ব্যক্তি হোক বা জাতি তাদের স্বয়ং স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভর সত্তা নেই। এই বিশ্বসংসার পরস্পর নির্ভরশীল, একের উপস্থিতির দ্বারাই অন্যের অস্তিত্ব সূচিত হয়। আমি আছি তাই তুমিও আছ, আমরা একে অপরের সহযোগী সত্ত্বা। মানুষের মন এ ভবকারাগার থেকে মুক্তি চায়। সে বুঝতে পারে না একার মুক্তি কখনোই সম্ভব নয়। এই দেহমনকে প্রক্ষালন করতে না পারলে জীবনোপন্যাসের আগামী অধ্যায়ে যে তার আর প্রবেশ করা হবে না। জীবনের সঠিক অর্থ অন্বেষণই আমাদের উদ্দেশ্য অমিতায়ুধ খুঁজছে তিনমূর্তির রহস্য। কুন্তলা, স্বয়ংবিদা, জাহ্নবী খুঁজেছিল তাদের হারিয়ে যাওয়া মানুষকে, শাওন খুঁজেছেন তার জীবনের সারবান তাৎপর্য, চাগ লোচাবা বিনয়ধরের দেহের ভিতর প্রবেশ করেও খুঁজে চলেছিলেন কশেরুকা মালা। বিনয়ধর তার দেহের ভিতর চাগ লোচাবাকে আশ্রয় দিয়েও খুঁজে ফিরেছিলেন অতীশ দীপঙ্করকে অতীশ তবে কী খুঁজছিলেন?

আমরা সত্যের এক একটি রূপ কল্পনা করি আর তাকেই মতবাদ বলি কিন্তু কোনো মতবাদই সত্যকে সাক্ষাৎ করাতে পারে না, সামান্য যুক্তি প্রয়োগে সমস্ত মতই খন্ডিত হয়ে যায়। হিতবাদ, ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ, মার্ক্সবাদ, সকলই আমাদের চলমান জীবনে দেশ ও কালে আবদ্ধ। উপনিষদে বর্নিত আত্মা জীবের অপরিবর্তনীয় সত্তা। মানুষ আনন্দময় জীবনের স্বপ্নদেখে তাঁরা মুক্তি চায় না বাঁচতে চায়। তারা করায়ত্ত করতে চায় দুঃখ অতিক্রমী আনন্দময় জীবনযাপনের কৌশল। কী বৈদিক, কী শ্রামণিক, কী আস্তিক, কী নাস্তিক, তাদের ধর্মদর্শন লোকসাধারণের কী উপকারে আসে? অতীত আদর্শকে আমরা লালন করি আবার সেই আদর্শকে ভবিষ্যতে বহন করি এভাবে আদর্শের স্থানান্তর ঘটে। আদর্শের মৃত্যু নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তেমনি অনুভবের বিষয়, আমরা যদি মনে করি তিনি আছেন তবে তিনি আছেন নতুবা নেই।

ঔপন্যাসিক সমগ্র উপন্যাসে বিভিন্ন জীবন তত্ত্বকথা ও তার প্রায়োগিক দিক তুলে ধরেছেন। নগ্ন সন্ন্যাসী ও তার সাধনসঙ্গিনী সেই সাধন মিলনের ভিতরই তো সর্ব প্রত্যাখ্যান। এখানে কুন্তলানামে কেউ নেই বস্তুত আমাদের কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই, আমরা সাধক সাধিকামাত্র। 'আমার এই সামান্য জীবনে আমি দেখেছি, শিক্ষা কেবল সাধ্যাপক গ্রন্থ হতেই আসে না প্রত্যুত জীবনই শিক্ষা দেয়; শাস্ত্র ও আচার্য গৌণ শিক্ষক জীবনবীথিকাই প্রকৃত শিক্ষিকা। অতীতে কোনো যুবক যে জীবনের অর্থ খুঁজেছিল, খুঁজেছিল বাল্য সঙ্গিনীকে তার নাম হয়তো দীপঙ্কর, হয়তো তার নাম দীপঙ্কর নয়, হয়তো তার একনাম তুমি অন্যনাম আমি হয়তো সে আজও খুঁজছে।'[৩] অতীতের কোনো গান গাথা কত পথ ঘুরে ফিরে ফিরে এসেছে পাড়াগাঁর কোনো গরীব ঘরের মেয়ের গলায়।

অতীশ দীপঙ্করের জীবন ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখা নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা একটি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। সন্ন্যাসী লেখকের সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। বিশবছর পর কলকাতায় ফিরে কলকাতাকে আর চিনতে পারছেন না। 'উড়াল পুলের ঘোমটা আর বাইপাসের ওড়না পড়েছে কল্লোলিনী।' কলকাতার কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য একশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের কাছে বিকিয়ে গেছে। রাজনীতিতে আদর্শ বলে কিছু নেই ক্ষমতাই সব। শাওনের মনে হয় সে লিখবে অবশ্যই লিখবে সমস্ত লেখা ফেলে দিয়ে সে অতীশ দীপঙ্করকে লিখবে। অমিতায়ুধের গবেষণা লব্ধ তথ্য দিবে সেখানে ভবিষ্যতে মানুষ সমর্থ উত্তরাধিকারের কথা পড়বে যে উত্তর পুরুষের জন্য তাকে লিখে যেতে হবে এ কাহিনী। শাওন বসু (আমি কিংবা আপনি) উপন্যাসের শেষ বাস্তব নয়, তাকে যে এঁকে চলেছে সেই উপন্যাসের লেখক, শাওনের স্রষ্টা, স্রষ্টার ও স্রষ্টা, স্রষ্টার এই সৃষ্টিকে পলকহীন চোখ মেলে কে যেন অধীর বিষ্ময়ে তাকিয়ে আছে। জাহ্নবী যেন- 'হাজার বছর থেকে পৃথিবীর পথ হাঁটিতেছে' এ যাত্রা অন্তহীন জীবনপথ পরিক্রমা।

ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় প্রকৃতি ও নারীর রূপ সত্যি মনোমুগ্ধকর। চাগ লোচাবার সয়ংবিদার রূপদর্শন করছে- 'কী দেখছ লামা? একে রূপ কহে এই রূপ সমুদ্র অতিক্রম করতে পারলে সন্ন্যাসী হবে, আর যদি অতিক্রম করতে সমর্থ না হও যদি এতে নিমজ্জিত হও তবে কবি হবে।' ৪ এই উপন্যাসের বিষয় চিরন্তনী নারীসত্তা যা আমাদের সমষ্টি চেতনার ভেতর সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে প্রোথিত হয়ে আছে। যে নারীসত্তা যুগে যুগে কর্মউদ্দীপনা যুগিয়েছে প্রেমে দাম্পত্যে বাৎসল্যে জীবনকে লালন করেছে জন্মজন্মান্তর, সেই শাশ্বত মানবীসত্তাই নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নগ্ননারীর রূপমুগ্ধ সেই কিশোরের চক্ষুতে কোনো পাপ তো ছিল না, কবিত্ব ছিল, সৌন্দর্যমুগ্ধতা ছিল। সত্য চির নগ্ন, সুন্দর চির অপাবৃত।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র গবেষক অমিতায়ুধ আজ তিন বৎসর যাবৎ গবেষণা করছেন। তিনি নাস্তিক পন্ডিতের ভিটায় পাওয়া সেই বাক্সের ভেতরে যে সামগ্রীগুলো রয়েছে তার তথ্যানুসন্ধানে সেই ভিটায় গিয়েছেন। ড্রাগনের মুখ আঁকা বাক্সে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর

উপবিষ্ট দেবী, একটি তসবির মালা ও একটি তালপাতার পুঁথি অমিতায়ুধের টেবিলে রাখা। অমিতায়ুধ আর্কিওলজির ছাত্র গবেষণা করেন সম্যক ঘোষের কাছে। শ্রীপর্ণা কাছ থেকেও এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিল অমিতায়ুধ পুঁথিটির কন্টেন্টে দেখা গেছে এটি তিব্বতি ভাষায় লেখা। পুঁথিটিতে যখন যে ভাবে প্রয়োজন পরেছে তখন সেই এলোমেলো বিষয়কে লেখা হয়েছে। পুঁথিটির একটি অংশ মহীপাল ও নয়পালের সঙ্গে রাষ্ট্রকূট বংশের কূটনৈতিক সম্বন্ধ ও রাজনৈতিক আলোচনা করা হয়েছে। তবে কী এই বইটি অতীশ দীপঙ্করের হাতে লেখা। সেখানে আরও একটি তথ্য দেওয়া আছে যে পাহাড়ের উপর একটি রূপ অপর দুটি রূপ সুতিকা গৃহের কাছে বজ্রযোগিনী গ্রামে।

আটশোবছর আগেকার কোনো এক বাঙালী কূলবধূর পিপাসার্ত হৃদয়বিন্দুতে আধুনিককালের এক কৃষক কন্যার কথা ফিরে ফিরে আসতে দেখল অমিতায়ুধ। দুপুর বেলায় ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে তামাক টানে অনঙ্গ। সকালে সুখবাসপুরে যাবার রাস্তার গাঁয়ে তিন কানি জমি আর ঘরের একটু দূরে দুই কানি জমি এইমাত্র সম্বল অনঙ্গ দাসের। কন্যা জাহ্নবীকে নিয়ে কোন মতে দিন কাটে তার। ঘর গৃহস্থালির কাজ একা হাতে করে জাহ্নবী, তা দেখে অনঙ্গ দাস অবাক হয়ে যায় কন্যার মধ্যে সে স্ত্রীর প্রতিরূপ খুঁজে পায়। জাহ্নবীর যা বয়স এই বয়সেই ঊষা তার ঘরে এসেছিল। এই বিবাহযোগ্য কন্যাকে বিবাহ দিতে না পারলে অনঙ্গের যেন স্বস্তি নেই। সময় সময় সে উদাস হয়ে যায়; সেই কবে ইমতিয়াজ শেখের জমিতে অনঙ্গের পূর্বপুরুষ মজুর খাটত। ইমতিয়াজ চাচা সন্তান স্নেহে তাকে লালন করে ও বিয়ে দেয়। দেশভাগ মুক্তিযুদ্ধ কোনো কিছুরই আঁচর তার গায়ে লাগতে দেয়নি। মুনশিগঞ্জের প্রভাবশালী লোক ইমতিয়াজ শেখের দেওয়া জমি চাষ করে খাচ্ছে অনঙ্গ। কৃষকরা অনুর্বর ভূভাগে বীজ বোনে, পশুচারণ করে, গান গাঁয় নদীপারাপার করে। মহাকালের রথের চাকা তাদের পেশিশক্তির জোরেই আজও সচল। ইতিহাস এদের মনে রাখে না চিরকাল সময় চক্রের সঙ্গেই এরা পরস্পরক্রমে ঘূর্ণিত হয় যুগান্তরকে এরাই গতিদান করে।

জাহ্নবীদের জমির পাশে একটি মাটির ঢিবি যা নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা বলে পরিচিত। কে সেই পন্ডিত সেই ভেবে উন্মনা হয়ে ওঠে জাহ্নবী। রাজাদের সময় আজ আর নেই এই ভেবে দুঃখ হয় জাহ্নবীর। এই জমি চাষ করতে গিয়েই আইনুদ্দি ও অনঙ্গ কারুকাজ করা পুরনো কাঠের বাক্স পেল। আবু তাহের মাস্টার সেটা নিয়ে যায় বিনিময়ে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল অনঙ্গ নেয়নি সে বলেছে সে চাষাভূষা মানুষ পন্ডিতের জিনিস নিয়ে কি করবে। জাহ্নবী পুকুর ঘাটে যায় কতদিনের নিস্তরঙ্গ মজা পুকুর যা জাহ্নবীর নিস্তরঙ্গ জীবনের দ্যোতক। পুকুর জলের মতো স্বচ্ছতার চোখ যেন মনের তলদেশ অবধি দেখা যায় এমনি সরল। এই বজ্রযোগিনী গ্রামে নগরের চিহ্ন সবুজ ঘাসের মধ্যে দাঁত বের করে আছে যেখানে সেখানে। জাহ্নবী পুকুর পাড়ে বসে মনের খেয়ালে পুকুরে একটি ঢিল ছোরে। পুকুরের অপর প্রান্ত থেকে কে যেন সেই ঢিলের উত্তরে একটি ঢিল ছুঁড়ে বসে। কে ঢিল ছুঁড়লো জানতে পুকুর পাড়ে এগিয়ে যায় জাহ্নবী, কিন্তু কাউকে দেখতে পায়না জাহ্নবী। তবে ঐদিক থেকে ঢিলটা ছুড়লো কে? ঔপন্যাসিকের কৌতুহলী কল্পনা যেন ঢিলের প্রতিরূপ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের রাজা-রাজরারা যেন আজও জাহ্নবীর ঢিলের উত্তরে ঢিল দিয়ে তাদের অস্তিত্বকে জানান দিচ্ছে। জাহ্নবী অতীত রাজাদের দেখতে পায়নি কারণ জাহ্নবীর সে চোখ নেই। ঔপন্যাসিকের মতে আমাদের অনেকের সে চোখ নেই, থাকলে দেখতে পেতাম সেখানে অতীত ও বর্তমান পরস্পর হাত ধরাধরি করে সহবস্থান করছে।

সময়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে যুগ যুগান্তরের ঘটনাস্রোত ভরা আছে মানুষের মনে। সেখানে দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ নির্মল দিঘি আর সেই প্রাসাদে চন্দ্র বংশের রাজকর্মীরা বসবাস করেন। জাহ্নবী যে মজা পুকুর দেখছে তা আসলে বর্তমান । মানব মনের অন্তস্তরের মধ্যে দিয়ে যদি দেখি তবে মনে হবে সে পাশের বাড়ির ঘটনা । আচম্বিতে কোনো একটি ঘটনা ধরা দিতে পারে আমাদের দৃষ্টিতে যেমন দেখেছিল জাহ্নবী ঢিল পড়তে। অন্যভূমি থেকে মন চলে আসে বাস্তবে। নইলে জাহ্নবী দেখতে পেত দিঘির অপর প্রান্তে ঢিলটি ছুড়ছে কুন্তলা। চন্দ্র বংশের রাজপুত্র এই বজ্রযোগিনী তার পিতা কল্যানশ্রীর রাজধানী। কুন্তলার পিতা রাজপ্রাসাদের সামান্য প্রতিহারী দৈবারিক। প্রাসাদটি বস্তুত রাজকর্মচারীবৃন্দের আবাদ, নিখিল জীবের বেদনার প্রধান অন্তরায়। তাই রাজকুমার সম্বোধনে চন্দ্রগর্ভের চরম আপত্তি, চন্দ্রগর্ভ অতি শৈশবে দার্শনিক হয়েছিলেন। সংসারে তার মোহ ছিল না একদিন সে মহর্ষী জিতারির সঙ্গে দেখা করেন। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে চন্দ্রগর্ভ নিজেকে রাজপুত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন। জিতারি বলেন- অহমিকা পরিত্যাগ কর রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ কর, সেই উৎসের অনুসন্ধান কর। চন্দ্রগর্ভ এত অল্প বয়সে ভুবন ভরা এ ব্যাথার উৎস তুমি অনুভব করলে কি প্রকারে সেও এক বিস্ময়। পৃথিবীতে প্রেম নামক বস্তু আছে কিন্তু তার অস্তিত্ব নেই মনুষ্যকুল ও জীবকুলের হৃদয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে সংসারের জলতলে ভাসমান।অহমিকা পরিত্যাগ করো রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করো সেই উৎসের অনুসন্ধান করো।

অতীশের নামের সঙ্গে একটি গাথা নালন্দায় প্রচলিত ছিল-'যখন বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বয়ে যাবে সমুষ্ণ বাতাস, নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধূলীকালীন মেঘ, পুষ্পরেণু ভেসে আসবে বাতাসে, আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাবে বিক্ষিপ্ত স্রোতোধারায় ...তখন, কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব...' [৫] এই কথা বলে হাজার বছর আগে এক নারী ডুব দিল মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে। শতবর্ষ পরে অপর একটি নারী যেন সেই জলতল থেকে উঠলেন একই জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে। ঠিক যেমন জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজতে গিয়ে চন্দ্রগর্ভ হয়ে উঠলেন অতীশ, তিব্বতি পর্যটক চাগ লোচাবা উত্তর কুরু বর্ষ বা তিব্বত থেকে নালন্দায় বিদ্যালাভের জন্য এসেছিল। নালন্দায় বখতিয়ার খলজি আক্রমণ করেছিল লুকানো ধনের প্রত্যাশায়। নালন্দার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা, সোমপুরী, অদন্তপুরী কারও রক্ষা নেই। নালন্দার সঙ্গে সবই যাবে এই দ্বিধা চাগ লোচাবাকে দ্বিধান্বিত করে। চাগ লোচাবা তিন নারীর কথা বলেছেন এ কথার অর্থ কী? এই নারী কী তবে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না? বজ্রযান মতে এই নরদেহ ভান্ডস্বরূপ এর মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিহিত। মেরুদন্ড সেই ব্রহ্মাণ্ডের অক্ষ, মেরুদণ্ডের বামপার্শে রসনা, দক্ষিনপার্শে ললনা এবং মধ্যে অবধূতি নাড়ি বিদ্যমান। এই পন্থায় আমরা অবতরণ করি, এই পথেই উত্তরণ সম্ভব। এই উত্তরণের জন্য প্রাণকে ঊর্ধায়িত করতে হবে। 'দেহের প্রকৃত আনন্দ নির্বাণ নয়, রতিমিলন উপায়মাত্র। উপেয়-প্রাণের সংযমের দ্বারা সহজানন্দে উপনীত হওয়া।' [৬] রমণ বাহিরে নাই তা অন্তরে। সেই অপার্থিব প্রেমলীলাই সাংকেতিক ভাষায় অভিব্যাক্ত হয়েছে।

বৌদ্ধমতে মানব শরীরেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথা নিহিত আছে মানব শরীরে তাদের বিশ্বাস এই দেহভান্ডের জ্ঞান লাভ করলেই আমরা ঈশ্বরের সন্ধান পেতে পারি । সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানবশরীরে অবস্থান করে । বৌদ্ধমতে মানুষই যে স্বয়ং ঈশ্বর বা স্রষ্টা বা পরমাত্মা তাতে কোনো সন্দেহ নেই । মনের মানুষ ব্রহ্মরূপে মনিরূপে বা সর্বোচ্চ নিভৃত ঘরে বাস করে । ইড়া পিঙ্গলা ও সুষম্না নারীর মিলনস্থল ত্রিবেণীর ঘাট স্ত্রীযোনি । এদেহের মধ্যেই যে পরমাত্মার সিংহাসন এধারনা বৌদ্ধগণ, সুফীদর্শন, উপনিষদ, হিন্দুধর্মে স্বীকার করে নিয়েছেন। সাধনার প্রথমাবস্থায় রতিকে ঊর্ধ্বে ইড়া নাড়ির মাধ্যমে মস্তিষ্কে চালনা করা হয় । এই সাধনা তারুণ্যরূপ অমৃতধারার তথা বিন্দুর অটল অবস্থার সাধনা একে কারুন্য বলা হয় । দ্বিতীয় অবস্থায় সাধক বিন্দু ধারনে সমর্থ হলে পিঙ্গলা নাড়ির সাহায্যে নিম্নে আনার সাধনা করেন তখন তা জোয়ারের জলের মত গতি পায় একে তারুণ্য রস বলা হয় । তৃতীয় রসসাধনা লাবণ্য এই সাধনায় সাধক ইচ্ছামত ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না পথে বিন্দুকে চালিত করে এই সাধনায় শরীর মন পুলকিত হয়। বৌদ্ধধর্মে যা কিছু স্থান পেয়েছে সেগুলো হল আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ,গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব প্রভৃতি । বৌদ্ধরা যৌগিকক্রিয়া ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে দমের সাধনা করে । কুম্ভক, রেচক, পূরক, কপালভাতি, ষটচক্রকে মেনে ও কর্মকরে দেহকে অটল রাখা রতিসাধনার অংশ । ঊর্ধ্বরতিকে শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা ষটচক্রে প্রবাহিত করে কুন্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে কাম সাধনা করে। আত্মতত্ত্বে মনের প্রস্তুতি দেহতত্ত্বে সাধনার রীতি-পদ্ধতি, গুরুতত্ত্বে গুরুর চরণ শরণ; সৃষ্টিতত্ত্বে জীবসৃষ্টির রহস্য এবং মানুষতত্ত্বে পরমাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। জগৎ ও জীবনজিজ্ঞাসার এমন কঠিন তত্ত্বকথা এভাবেই উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সৃষ্টির উৎসমূল অনুসন্ধান আমাদের আজন্ম প্রত্যাশা, কিন্তু সেই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি এক সরলরেখায় মেলে না আমাদের জীবনে। যিনি তত্ত্বের অর্থ করতে পেরেছেন তার জীবনদর্শন উপলব্ধি করার মত দার্শনিক বোধ আমাদের নেই; তাই 'নাস্তিক পন্ডিতের ভিটার' মত উপন্যাস লেখা হবে বারংবার।

তথ্যসূত্রঃ

১। সন্মাত্রানন্দ, 'নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা' ধানসিড়ি, কলকাতা-৭০০০০৪, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৩

২। প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৯৩

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৯

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৭

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০

৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯২

....

বনফুলের 'কৈকেয়ী' নাটক: নবভাবনায় রামায়ণ

পূজা পাসী
গবেষক, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্য জগতের এক অন্যতম কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক,নাট্যকার ছিলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। নাট্যকার হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে না পারলেও প্রচলিত ধারা থেকে সরে কিছুটা নতুন ভাবনায় তিনি উপস্থাপিত করেছেন তাঁর' নাটকগুলিকে। এরকমই একটি নাটক 'কৈকেয়ী'(১৯৭৬)। নাটকটি কৈকেয়ী কর্তৃক রামকে বনবাসে পাঠানোর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। যদিও এর মাধ্যমে আর্য-অনার্য মেলবন্ধনের প্রসঙ্গটিকেই বড়ো করে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। রামের বনবাসে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য এখানে ভরতকে সিংহাসনে বসানো নয় বরং কৈকেয়ীর খল্লটকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও উন্মুক্ত প্রকৃতিতে রামের মুক্তির ইচ্ছাকে প্রদর্শিত করেছে। আর এভাবে নাট্যকারের নবদৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে নাটকে। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখকের এই নবভাবনাই আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

সূচক শব্দ:

বনফুল, নাটক, কৈকেয়ী, রামচন্দ্র, খল্লট বনবাস , আর্য- অনার্য, রামায়ণ।

মূল প্রবন্ধ

বাংলাসাহিত্যের জগতে এক সার্বভৌম সাহিত্যিক ছিলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল। সাহিত্যের সব বিভাগেই তাঁর অবাধ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। কারণ নির্দিষ্ট কোনো শিল্পরীতিতে থেমে না থেকে স্বল্পমাত্রায় হলেও সর্বত্র নিজের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করেছিলেন তিনি। গল্পকে নব নব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ করে ছন্দ, ভাষা, সংলাপ ও আয়তনের বিন্যাস ঘটিয়ে কখনো কবিতা, কখনো গল্প, কখনো উপন্যাস, আবার কখনো নাটকে রূপদানের চেষ্টা করেছেন তিনি। জীবনরসিক সাহিত্যিক বলাইচাঁদ বস্তুজগতের ঘাতপ্রতিঘাত, উত্থান-পতনকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন ।তাই তাঁর রচনায় অস্পষ্ট-অস্ফুট ভাবের পরিবর্তে বাঁকে বাঁকে চমক, কৌতূহল এবং উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত ছোটগল্পে তাঁর অধিক নামডাক থাকলেও, থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একসময় নাটক লেখায় আগ্রহ জন্মে বনফুলের। নাটকের ক্ষেত্রে বনফুলের জীবনী নাটকগুলো অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারলেও, অন্যান্য নাটক গুলো বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও তাঁর বেশ কিছু নাটকে নবআধুনিকী ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এরকমই একটি নাটক 'কৈকেয়ী'। নাটকটির কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণ থেকে গৃহিত হলেও নাট্যকারের হাতে তা কিছুটা বিবর্তিত হয়ে নবআধুনিকী রুপ লাভ করেছে।

নাটকটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। নাটকে নাট্যকার মূল রামায়ণ থেকে সরে গিয়ে কৈকেয়ীর প্রিয় পুত্র রামকে বনবাসে পাঠানোর ভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন অনার্য রাজা খল্লটের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কৈকেয়ী আর্য-অনার্য সমাজের মেলবন্ধনের সেতু হিসেবে রামকে বনবাসে পাঠানো পরিকল্পনা করেছেন। সেই হেতু সিংহাসনে বসার পূর্বদিন কৈকেয়ী রামকে নিজের প্রতিশ্রুতির কথা জানায়। পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে প্রথমত রাম সিংহাসনে বসার পরিকল্পনা করলেও শেষে সিংহাসনের কারাগার থেকে মুক্তি পেতে তথা বিমাতার আদর্শকে রূপায়িত করতে কৈকেয়ীর সাথে পরামর্শ করে সীতা ও লক্ষ্মণসহ বনবাসে যাত্রা করেন। এভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার।

নাটকে ইতিহাসচিন্তক নাট্যকার আর্য-অনার্যের এক অপরূপ মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন কৈকেয়ী চরিত্রের দ্বারা। একদা পুরাকালে অনার্যদের অধিকৃত রাজ্যগুলো বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে তুলেছিল আর্যরা। দুর্ধর্ষ সেই আর্য জাতির আধুনিক অস্ত্র ও অশ্বারোহী সৈনিকদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল অনার্যরা। তবুও মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে চেয়েছিল অনার্যরা । তবে আর্যরা এক জায়গায় দমে থাকেনি, সময়ের ও কালের বিবর্তনে তারা শক্তিশালী থেকে আরও পরাক্রমী হয়ে উঠে একে একে পিষে ফেলতে থাকে অনার্য অধিকৃত রাজ্যগুলি। শুধু তাই নয় অনার্যদের আবার তারা অভদ্র ও অমানুষ বলেও জ্ঞান

করত। অনার্যদের মধ্যে অনেক গুণীজনের বাস রয়েছে, শিল্পীও রয়েছেন। তবুও তাদেরকে তাদের প্রাপ্য যোগ্য মর্যাদা দিত না আর্যরা। নাটকে এই সমস্যার কথাই তুলে ধরা হয়েছে এবং তা থেকে সমাধানের পথ অন্বেষণ করা হয়েছে। রাজা খল্লট আর্যদের সম্পর্কে বলেছেন–"তাঁরা আমাদের নাম দিয়েছেন দস্যু, ব্যাধ, পক্ষী, দাস, শূদ্র -যেন আমরা মানুষ নই। তাঁরা মাঝে মাঝে আমাদের যুবতী মেয়েদের হরণ করে' নিয়ে যান, কখনও বিয়ে করেন, কখনো করেন না। যখন বিয়ে করেন তখনও তাকে শুদ্রাণী আখ্যা দিয়ে শুদ্রানীর মতো ব্যবহার করেন তার সঙ্গে। এ কি রকম ভদ্রতা? অনার্য দাসদের কাঁধে চড়ে' বেড়িয়ে বেড়ান আর্য মুনি ঋষিরা, আমরা যেন মানুষ নই - জানোয়ার। এটাকে কি ভদ্রতা বল? "[১] আলোচ্য নাটকে অনার্যদের নিজের সম্মান ফিরে পাওয়ার আক্রোশ পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই সমস্যা সমাধানের মূল কান্ডারী হিসেবে নাট্যকার কৈকেয়ীর দ্বারা রাম চরিত্রটিকেই বেছে নিয়েছেন। পিতার আজ্ঞা পালনকারী রাম রাজসিংহাসনে বসে অনার্যদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার কথা বললে কৈকেয়ী তাঁকে বলেছে –" রাজাদেরও রাজনীতি মেনে চলতে হয়, তারা যা খুশি তাই করতে পারে না। অনার্য দমন করা আর্যদের সুবিদিত রাজনীতি। তুমি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবে না। তাছাড়া উপর থেকে অনুগ্রহ বর্ষণ করে' কাউকে আপন করা যায় না। কাউকে আপন করতে হলে তাদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে হয়, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হ'তে হয়। তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা অর্জন করতে হয়। সেটা একটা সাধনা।"[২]আসলে সিংহাসনে বসে অনার্য দমন করাই যে আর্য রাজাদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য। তাই সিংহাসন লাভ করে অনার্যের উৎখাত না করে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যে সত্যিই দুষ্কর তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কৈকেয়ী, আর তাই প্রথমেই রামকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

নাটকে মন্থরার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কৈকেয়ী রামকে বনবাস পাঠাননি বরং কৈকেয়ী নিজ প্রতিজ্ঞালব্ধ বাক্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রামকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন মাত্র। শেষে রামের মত নিয়েই তিনি দশরথের মত পরিবর্তনের পথ তুলে ধরেছেন রামের সামনে। কৈকেয়ী প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা রামকে জানিয়ে জোরপূর্বক তাঁকে বনবাসে পাঠাননি এবং এক্ষেত্রে তিনি বারংবার রামের আজ্ঞা নিয়ে নিজের দোষ স্খলনের চেষ্টা করেছেন। বারবার তিনি রামকে বলেছেন –" বৎস রামচন্দ্র আর এক বার তোমাকে প্রশ্ন করছি এটা সত্যিই তোমার অন্তরের ইচ্ছা তো?"[৩]-রাম চরিত্রটিরও সিংহাসনে বসার ইচ্ছা কেবল তাঁর পিতার আদেশ রক্ষার হেতুই, তাই কৈকেয়ী যখন বলে সে স্বামীর আদেশ বদলে দিতে পারে তখন রামের অন্তরের সুপ্ত ইচ্ছা প্রকটিত হয়ে ওঠে। রাম মাতা কৈকেয়ীকে বলেছেন – "সিংহাসনের কারাগার থেকে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে আমাকে মুক্তি দিন আপনি"।[৪]এভাবে রামের বনবাস শুধুমাত্র কৈকেয়ীর প্রয়োজন হয়ে থেমে থাকেনি, নগর-সভ্যতার জীবন থেকে উন্মুক্ত প্রকৃতিতে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বপ্রয়োজনও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক অর্থে পিঞ্জর মুক্ত বিহঙ্গের মতো নগর জীবনের ঐশ্বর্য থেকে বনপ্রান্তে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেতে চেয়েছিল রাম চরিত্রটি।

মূল বাল্মীকি রামায়ণে রামকে বনবাসে পাঠানোর ফলস্বরূপ কৈকেয়ীকে কম গঞ্জনার সম্মুখীন হতে হয়নি, পদে পদে সেখানে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল তাঁকে। এখানেও জনগণের সেই গঞ্জনার সম্মুখীন হতে দেখা যায় তাঁকে । নাগরিকদের মধ্যে তৃতীয় জন কৈকেয়ীকে উদ্দেশ্য করে বলে -"সতীনের ছেলেকে বনে পাঠিয়ে নিজের ছেলেকে রাজা করেছে। শয়তানী।"[৫]তবে নাটকে দেখা যায় রাম স্বয়ং ভরতকে অযোধ্যার যোগ্য রাজা হিসেবে নির্বাচন করেছেন। মূল বাল্মীকি রামায়ণে কৈকেয়ীর মতের পরিবর্তন ঘটিয়েছে মন্থরা, তবে এখানে রামের বনবাসের পেছনে মন্থরা চরিত্রের কোন হাত নেই। এমনকি এখানে মন্থরা সেই বৃদ্ধা কুব্জা মন্থরা নয়। এখানে সে অষ্টাদশী রূপসী নারী, কৈকেয়ীর কিঙ্করী প্রধানা। রামের আগমন বার্তায় এখানে সে প্রসাদ কক্ষ সুসজ্জিতেই ব্যস্ত।

নাটকে কৈকেয়ী রামের বিমাতা হলেও তাঁকে রামচন্দ্রের স্নেহশীলা জননীর স্বরূপ হিসেবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যদিও মূল রামায়ণের মতো এখানে তাঁর স্নেহভাবনার কোনো বিকৃতি ঘটেনি। নাটকে রামের আগমনে তাঁর কক্ষ রাজকীয় আভিজাত্যের মহিমায় সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছে। কিঙ্করীদের দ্বারা সুরুচিপূর্ণ এক সুন্দর মনোরম আবহ গড়ে তোলা হয়েছে কক্ষ মধ্যে। ধান,দূর্বা, চন্দন, ফুলের মালা,শাঁখ, তূর্যধ্বনি – ইত্যাদির মাধ্যমে রামের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার যথাযথ খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাম আপ্যায়নের দৃশ্য এরূপ –" শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীকে প্রণাম করিলেন। কৈকেয়ী তাঁহাকে ধান দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিলেন, কপালে চন্দনের টিপ পরাইয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিয়া তাহার মস্তক অঘ্রাণপূর্বক ললাটে চুম্বন করিলেন।"[৬] বাল্মিকী রামায়ণে অবশ্য রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনে কৈকেয়ীর মধ্যে এমত মাতৃস্নেহ খুঁজে পাওয়া যায়না। নাটকে কৈকেয়ী ব্যক্তি হিসেবে ভরতের থেকে অধিক রামকেই বিশ্বাস করেছেন। রামকে আদর্শবান পুত্র হিসেবে সম্বোধন করেছেন। রামকে তিনি বলেছেন – "তোমাকে আজ আমি আমার এই গোপন কথা বললাম, কারণ যদিও তোমাকে আমি পেটে ধরি নি তবু তুমিই আমার প্রিয়তম পুত্র, তুমিই আমার

নয়ন-মনি।"[৭] রামকে আবার তিনি বলেছেন-"তুমি শুধু আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নও, তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ পুত্র।"[৮]এভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রামের প্রতি কৈকেয়ীর বিশুদ্ধ মাতৃস্নেহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

অনার্যদের আর্যরা অসভ্য, বর্বর, অশিক্ষিত, মূর্খ বলে জ্ঞান করলেও, কৈকেয়ী প্রত্যক্ষ করে তারা আসলে মায়াবী অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। শতদল দেখতে এসে কৈকেয়ী তাদের হাতে ধরা পড়লে তাঁকে প্রথমত বন্দি করে অনার্য রাজা খল্লট -এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজা খল্লট আর্যকন্যা জানতে পেরে তাঁকে সম্মানের সহিত ছেড়ে দিয়ে সিংহাসন এনে দিতে বলেন, পানীয়র ব্যবস্থা করতে বলেন। কৈকেয়ীর পিতার সাথে তাদের বচসা থাকলেও কোনরূপ অভদ্র আচরণ করেননি তারা। প্রথমত আর্যদের মতো কৈকেয়ীও অনার্যদের অসভ্য বর্বর বলেই জ্ঞান করত, তবে তাদের মাঝে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন আসলে কতটা উদার মানসিকতার লোক তাঁরা। দূর থেকে কাউকে বিচার না করে তাদের মাঝে গিয়ে যে বিচার করে দেখা উচিত তা বুঝতে পেরেছিল দ্বাদশবর্ষীয় আর্যকন্যা কৈকেয়ী। আর তাই অনার্যদের প্রতি আর্যদের মানসিকতার বদল ঘটাতে আর্য- অনার্য মেলবন্ধনে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন তিনি। মানবিক রাজা খল্লট কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনেরও ব্যবস্থা করেন। সেদিন প্রথম কৈকেয়ী অনার্য রাজা খল্লটের বিচার ব্যবস্থা দেখে অবাক হন। খল্লটের সব বিচার তাঁর মনঃপূত না হলেও তিনি যে একেবারে অসন্তুষ্ট হননি বলা চলে। খল্লট নিজের নাতনির মতোই স্নেহ করেছিল কৈকেয়ীকে। তবে কৈকেয়ীকে নজর বন্দী রেখে তাঁর বাবার কাছে পুনরায় প্রস্তাব পাঠানোর কথা ভাবলেও পরমুহুর্তেই অনার্যদের পরম পূজনীয় হনুমানের কথা শুনে তার ভাবনার রূপান্তর ঘটে যায়। হনুমান খল্লটকে বলে –" আমরা নিজেরা ভদ্র না হলে অপরের কাছে ভদ্রতা দাবি করতে পারি কি?"[৯] আর্য সমাজে অভদ্র বলে পরিচিত এই মানুষদের দ্বারাই লেখক ভদ্র সমাজের কাছে এই নীতিমূলক বার্তা প্রেরণ করেছেন।এভাবে অনার্যদের সাথে খানিক সময় অতিবাহিত করে অনার্যদের প্রতি কৈকেয়ীর মনোভাব পাল্টে যায়। তাই বিদায় বেলায় কৈকেয়ী খল্লটকে প্রতিশ্রুতি দেয় ভবিষ্যতে এমন এক আদর্শ আর্য পুরুষ সে পাঠাবে যিনি আর্য – অনার্যের অপরূপ মেলবন্ধন ঘটাবেন। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ খল্লট বুঝতে পারে ভুলে যাওয়া যে সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম, তাই অতীতের এই দিনটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই মায়া-অঞ্জন ও শতদলের চারা উপহার দিয়েছিল কৈকেয়ীকে। সেই শতদলের চারা থেকেই ফুটে ওঠা একটি শতদল কৈকেয়ী তুলে দিয়েছিল রামের হাতে।

সামাজিক লোকনিন্দার প্রসঙ্গও নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। বছর বয়সে কৈকেয়ীর জীবনের এহেন ঘটনা ঘটলেও লোকনিন্দার ভয়ে, সমাজের চোখ রাঙানীর ভয়ে সে তা লুকিয়ে রেখেছিল। রামের সামনে উন্মোচন করতে গিয়েও বারংবার রামের কাছে প্রতিশ্রুতি চেয়ে নিচ্ছিলেন তিনি, একথা যেন শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই থাকে। এমনকি কৈকেয়ীর বাবা-মাও তা জানতে পারেনি কোনোদিন। এছাড়া অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছ। যেখানে অনার্যদের খাওয়ার ঘি অপচয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন নাট্যকার। পাশাপাশি খল্লটের বিচার সভায় বেশ কিছু নবভাবনার পাশাপাশি কিছু গোঁড়ামিও খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্ষকের মুন্ডু কাটায় পুরস্কার, যমজ সন্তান হলে একটি বর্জন, ডাইনি বুড়িকে পুড়িয়ে মারার বিধান, পারিবারিক সমস্যা সমাধান ইত্যাদি।

নাটকের কাল্পনিকতাও স্থান পেয়েছে অনায়াসেই যা শুনলে পাঠকের অবাস্তব বলেই মনে হয়। খল্লটের রাজ্যে কৈকেয়ী এলে খল্লট তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য গাং-কে ডাকে। গাং চকমকি ঠুকে সূর্যকে ক্ষণেকের জন্য নিবিয়ে দিয়েছিল। অপ্সরাদের নাচ দেখিয়েছিল। মায়া-অঞ্জনের বিষয়টিও অবিশ্বাস্য তথা কাল্পনিক বলেই জ্ঞান হয়। এভাবে রামায়ণকে যে নতুন দৃষ্টিতেও দেখা যেতে পারে তাই তুলে ধরেছেন নাট্যকার। মূল রামায়নের সাথে পুরোপুরি তাল মিলিয়ে না চললেও রামের বনবাসের এই কাহিনি যে পাঠকের অন্তরাত্মায় খানিক তৃপ্তি জোগায়। নবভাবনায় কল্পনিকতা তথা অবিশ্বাস্যতা সব মিলিয়ে নাট্যকার অন্যরকম এক রামায়ণনির্ভর নাটকের প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করেছেন এবং এবিষয়ে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছেন বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

১.বনফুল,বনফুলের নাটক সমগ্র,প্রকাশক অবনীন্দ্রনাথ বেরা বানীশিল্প ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৫৮

২.ঐ,পৃষ্ঠা-৪৬২

৩.ঐ,পৃষ্ঠা-৪৬৩

৪. ঐ,পৃষ্ঠা-৪৬৩

৫. ঐ,পৃষ্ঠা-৪৬৪
৬. ঐ,পৃষ্ঠা-৪৫১
৭. ঐ,পৃষ্ঠা-৪৬২
৮. ঐ,পৃষ্ঠা-৪৬২
৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬০

গ্রন্থপঞ্জি:

১.বনফুল,বনফুলের নাটক সমগ্র(দ্বিতীয় খণ্ড),প্রকাশক অবনীন্দ্রনাথ বেরা বানীশিল্প ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫
২. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস',দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৮
৩. ঘোষ, ড. অজিতকুমার , 'নাটক ও নাট্যকার', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০২১
৪. মুখোপাধ্যায়, জীবন, 'স্বদেশ, সভ্যতা ও বিশ্ব' , শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৬, পুনর্মুদ্রণ: জুন ২০২৩

....

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : সামাজিক বৃত্তি ও মানবের ইচ্ছাশক্তি

সুজিত কুমার সাহু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্ত সার:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলি সেকালের সমাজের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁর গল্পের বাস্তবের মাটিতে কল্পনার রঙিন ছাপ নেই। উচ্চ-নীচ মানব সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা তাঁর গল্পের কাহিনিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কৃষক, ব্রাহ্মণ, বেদে, ওঝা প্রত্যেক সমাজের চিরাচরিত প্রথা ও আচার-আচরণকে গল্পকার তারাশঙ্কর নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। বংশ ও জাতের মর্যাদাকে প্রত্যেক সমাজ মান্যতা দেয়। নিজ বংশের পরিচয় কর্ম ও বৃত্তির মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হয়। ডাকাতি শিক্ষিত সমাজে অপকর্ম ও অপরাধের কাজ হলেও বাগদী সমাজে ডাকাতি বৃত্তি গৌরবের বিষয়। মাঝি তারা পারাপারের দায়িত্ব পালন করে পুণ্য কর্মের ফল সঞ্চয় করছে। ওঝা সাপকে বশীভূত করে নিজ বৃত্তির সঙ্গে অন্তরের আদিম প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করেছে। কৃষক রংলাল বৃত্তির সঙ্গে পশুপ্রীতির বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। অদম্য ইচ্ছা শক্তি প্রত্যেক মানব চরিত্রের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল হলে তা প্রকট হয়ে ওঠে। গল্পকার তারাশঙ্কর তাঁর গল্পগুলিতে ভাগ্য নিয়ন্তার হাতে সমর্পণ করে চরিত্রগুলিকে পাঠকের কাছে নবরূপে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

সূচক শব্দ:

গায়েব, অগ্রদানী, পল্টন, লগীদীগরি, নাগিনী, ময়ূরাক্ষী, কুলীর ঘাঁটি।

মূল প্রবন্ধ:

বাস্তবের মাটি ছেড়ে যিনি মানুষের জীবনের কাহিনি শোনাননি, যিনি কল্প কাহিনি রচনা করেননি—অন্যতম সেই গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে চরিত্রকে যেভাবে দেখেছেন ঠিক সেইভাবে চরিত্রটিকে অবিকলভাবে নির্মাণ করেছেন। রাজার পোষাক, খাদ্য, আচরণ যেমন হওয়া উচিত তাকে সেভাবেই গল্পে সাজিয়েছেন। অন্যদিকে দারিদ্র্যে জর্জরিতখোঁড়া শেখ, বিবি, তারিণী মাঝী, ডাইনী, বেদেনীদের সমাজ ও তাঁদের সমাজের লোকাচারগুলিপিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতিকে চিনিয়ে দেয় তিনি অসহায় মানুষদের জীবিকা কেমন, তাদের খাদ্যাভ্যাস কেমন, তারা কাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন গল্পগুলিতে। সমাজের জমিদার, মহাজন, ধনী ব্যক্তিরা যেভাবে জীবনযাপন করে, তার বিপরীতে অভাব, দারিদ্র্য নিয়ে যারা বেঁচে থাকে জীবন কাহিনিও কম অমূল্য নয়। লোভ-লালসা-কামনা-বাসনা সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে আদিম প্রকৃতির পার্থক্যটা শুধু রুচির ক্ষেত্রে। জমিদারতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে অহংকার ও মর্যাদা। জমিদারের অহংকারের মধ্যে সকল মানুষের করুণা পাওয়ার অধিকার নেই। উচ্চ মেজাজ নিয়ে তারা নিজেদের মর্যাদা রাখার চেষ্টা করে। রায়বংশের জমিদার বিশ্বম্ভর সপ্তম পুরুষের স্মৃতিচারণ করে গর্বসুখ অনুভব করেন। রাজ্য দখলের লড়াই রাজার দুরন্ত রক্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত। গল্পকার তারাশঙ্কর অসমসাহসী বিশ্বম্ভর রায়ের প্রশস্ত বুকের গর্বোদ্ধত আচরণ প্রকাশ করেছেন—

> "সেকালে, সেকালে কেন, দুই বৎসর পূর্বেও দেশদেশান্তরের পথচারী বাদশাহ-সড়কের উপর প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ার পিঠে মাথায় পাগড়ি বাঁধা গৌরবর্ণ বীরবপু আরোহীকে দেখিয়া ও দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিত, কে হে উনি?
> লোক বলিত, আমাদের রাজা উনি বিশ্বম্ভর রায়। বড়দরের শিকারী, বাদ্য মারা ওঁর খেলা।"[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক অসাধারণ শিল্পী। সাধারণের জীবনযাত্রার গতিবিধিকে তিনি নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। 'তারিণী মাঝি' গল্পের সঙ্গে 'জলসাঘর' গল্পের বিশ্বম্ভর রায়ের মন ও মেজাজের পার্থক্যে গল্প দুটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘাঙ্গী তারিণী মাঝি চরিত্রটি বংশ, সমাজ ও অর্থের অমর্যাদায় মাথা হেঁটে করে চলার অভ্যাস করে নিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের একটা অংশে স্বতন্ত্রতা থাকে। সেই স্বাধীনতার অধিকারকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কোন কোন ভাবে দমিয়ে রাখতে পারে না। তারিণী মাঝিকেও তার অর্জিত ক্ষমতার

অধিকার থেকে শক্তিকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। পথশ্রমকাতর যাত্রীদের, পুণ্যি অর্জনকারী যাত্রীদের নাবিক তারিণী মাঝি। গল্পকার তারাশঙ্কর বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ পারদর্শিতার জন্যই তারিণী মাঝিকে জয়মাল্য পরিয়েছেন। যে অবস্থায় ক্ষমতার দর্পের জন্য অপরিচিত পথিক সম্ভ্রমে চোখ তুলে বিশ্বম্ভর রায়কে দেখত, গল্পকার তারাশঙ্কর ঠিক ক্ষমতার সূক্ষ্ম অহংকারে তারিণী মাঝিও মর্যাদার জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। দেশ-কাল-সমাজ তারিণী মাঝির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অতি সাধারণ অথচ দক্ষ মাঝি হিসেবে তারিণীর গর্ব প্রকাশ পেয়েছে—

"তারিণী মাঝির অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ তারিণী ঘরের দরজায়, গাছের ডালে, সাধারণ চালাঘরে বহু বার বহু ঘা খাইয়া ঠেকিয়ে শিখিয়াছে। কিন্তু নদীতে যখন সে খেয়া দেয়, তখন সে খাড়া সোজা। তালগাছের ডোঙার উপর দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লগির খোঁচা মারিয়ে যাত্রী বোঝাই ডোঙার উপর দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লগির খোঁচা মারিয়া যাত্রী বোঝাই ডোঙাকে ওপার হইতে এপারে লইয়া আসিয়া থাকে।"[২]

তারাশঙ্করের গল্পে কালের আঘাতে জমিদার তন্ত্র ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সাধারণের মহৎ হৃদয়বৃত্তি চুরমার হয়েছে ভাগ্যের পরিহাসে। নিয়তির পরিহাসে যোগ্যতার কোন মূল্য নেই। বহু বিপদের হাতছানিকে তারিণী মাঝি অতি সহজেই অবজ্ঞা করেছে। আশঙ্কা পীড়িত জনতার ঔৎসুক্য দৃষ্টিকে তৃপ্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছে। ক্ষিপ্ত গতির স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে তারিণী মাঝি উদ্ধার করেছে লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন। কিন্তু তারিণী মাঝির সমস্ত দর্পচূর্ণ হয়েছে নিজের স্ত্রী সুখীর প্রাণ উদ্ধারের প্রয়োজনে। উদ্ধত, দুর্দান্ত ক্ষিপ্র স্রোতকে তারিণী চিরকাল স্বচ্ছন্দ ভাবে চিনে নিয়েছে। চির পরিচিত ময়ূরাক্ষীকে দেখে তারিণী মাঝি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। গভীর অন্ধকারে ময়ূরাক্ষীর গর্জন অচেনা হয়ে উঠেছে তারা কাছে। লেখক বর্ণনায়—

"কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়েছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ; লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চিৎকার যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে।"[৩]

'আখড়াইয়ের দিঘী' গল্পে গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্নমাত্রার এক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লিখেছেন। যে নেশার ঝোঁকে পিতা-পুত্রকে মুহূর্তের মধ্যে খুন করতে পারে। তারাশঙ্কর মাটির লেখক। অশিক্ষিত লোকেরা তাঁর গল্পের চাবিকাঠি। ঘৃণ্য পেশার দ্বারা জীবন ধারণ করে সে সমাজের কথা বাদ পড়েনি তারাশঙ্করের গল্পে। তারিণীর শরীর যেমন রোদে টান ধরে, তেমনি বাদলের জল ফেলে ফোলে ওঠে। নিম্নশ্রেণির মানুষদের জীবনের প্রকৃতি ছাঁদ ভিন্নরকম। সেখানে সোজা চোখের হিসাব মেলে না। গল্পের রসকে ঘনভাবে পরিবেশন করেছেন এই গল্পে। সন্ধ্যার অন্ধকার, প্রকাণ্ড দীঘি জলে আকাশের তারার প্রতিবিম্ব এবং অশান্ত প্রেতাত্মার অনুভব গল্পটিকে রোমহর্ষক করে তুলেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘীর ভয়ংকর বর্ণনা দিয়েছেন। নিম্নশ্রেণির মানুষের পেশা ও নেশার শিহরণে গল্পটি সাক্ষী হয়ে উঠেছে।

"তাড়া দেবেন না মশাই। গল্পের রস নষ্ট হবে। কথাটা হচ্ছে আখড়াইয়ের দীঘির মাটি, বাহাদুর পুরের লাঠি, কুলীর ঘাঁটি। এই তিনের যোগাযোগে এখানে শত শত নরহত্যা হয়ে গেছে। রাত্রে এ পথে পথিক চলত না ভয়ে। বাহাদুর পুরে বিখ্যাত লাঠিয়ালের বাস। কুলীন ঘাঁটিতে তারা রাত্রে এই পথের উপর নরহত্যা করত। আর সেই সব মৃতদেহ গোপনে সমাহিত রত আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভে।"[৪]

লেখক তারাশঙ্কর জানিয়েছেন এ সব মানুষেরা মাটির জগৎ থেকে দূরে বসবাস করে না। এদের দিনে ও রাতে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা প্রকাশ পায়। রাতের মূর্তি অদ্ভুত ও ভীতিপ্রদ। এদের কোটরাগত চোখ মানুষকে খুনের নেশায় জ্বলে ওঠে। মানুষের দর্শনে এদের পেশী হিংস্র ও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আহত পশুর মতো মানুষের মৃত্যুর আর্তধ্বনি কালী বাগদীর মতো ব্যক্তিকে উন্মত্ত করে তোলে।

লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লোক-সমাজের লোকবৃত্তিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। শিক্ষিত ভদ্র সমাজের কাছে লোকবৃত্তি যতই ঘৃণার কারণ হোক না, লোকসমাজের কাছে তা বংশগৌরবের। প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব বংশ মর্যাদা আছে। সে জাতির ঐতিহ্য বজায় রাখাটাই মহৎ কাজ। বাগদীর কুলবধূ কিংবা বাগদীর মেয়ে বংশের গৌরবকে বহন করতে পিছপা হয় না। ছোট জাতের সমাজের উৎসবের, আমোদের অন্যতম অঙ্গ ছিল মদ। বাগদীদের সমাজে 'ঘাঁটি খেলা' ছিল লোকপেশার ও লোকক্রীড়ার অন্যতম দিক। কালীচরণের ছেলে তারাচরণ। রাত্রির অন্ধকারে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে এবং সারা নিশি শিকারির অপেক্ষার পর শেষ রাতে অচেতন ভাবে, অপেক্ষার উন্মত্ততায় নিজের সন্তান তারাচরণকে খুন করেছে কালীচরণ। সাক্ষী ছিল তারাচরণ বাগদীর আঠারো বছরের কুলবধূ

এলোকেশী বাগদিনী। এলোকেশী শাশুড়ির মুখে শুনেছে রক্তমাখা টাকা-গহনাকে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে। ডাকাতি বৃত্তির অংশীদার ও সহায়ক মেয়েরাও। এলোকেশী জেরার উত্তরে সাক্ষী দিয়েছিল নির্ভীক ভাবে—

"সাক্ষী উত্তর দিল, আমরা বাগ্দীর মেয়ে। আমাদের মরদে খুন করে, আমরা লাস গায়েব করি হুজুর, আমরা লাস গায়েব করি। হুজুর আমার হাতে যদি তখন কিছু থাকতো তবে ঐ খুনেকে ছাড়তাম না।"[৫]

লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু লোজসমাজের নিম্নবৃত্তিকে তুলে ধরেননি। কেন বাগদী সমাজে কালীচরণ এই নিম্ন কর্মকে বেছে নিয়েছিল তার উৎস সন্ধান করেছেন। একসময় বাগদী জাতেরা নবারের পল্টনে কাজ করত। লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে কোম্পানির পল্টনের কাজকে হাসিল করে দিত। যখন কোম্পানি ভারত ছেড়ে চলে গেল, তখন বাগদীদের দাপুটে ব্যবসা থেমে গেল। কৃষিকাজকে বাগদীরা ঘৃণার চোখে দেখত। জমিদার বাড়িতে যে সব বাগদীরা আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ছোটলোক বলে তাদের নিম্ন করাতো। অপমানের কাজের চেয়ে অপরাধের কাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল বাগদী সমাজ—

"তাদের ঘরে চাকরি করতে গেলে এখন নীচ কাজ করতে হয়, গাড়ু বইতে হয়, মোট মাথায় করতে হয়, জুতো খুলে দিতেও হয় হুজুর। তাই আমরা এই পথ ধরি। আজ চারপুরুষ ধরে আমরা এই ব্যবসা চালিয়ে চলেছি, আমাদের। রাত্রির পর রাত্রি চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে কুলীর ঘাঁটিতে ওৎপেতে বসে থেকেছি। মদের নেশায় মাথার ভেতর আগুন ছুটত। সে নেশা ঝিমিয়ে আসতে পেত না। পাশেই থাকত মদের ভাঁড়! সেই ভাঁড় চুমুক দিতাম। অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠতাম।"[৬]

'নারী ও নাগিনী' গল্পে লেখক ওঝা জাতির জীবনের কাহিনি লিখেছেন। এখানে খোঁড়া শেখ ও জোবেদা বিবি নামে দুই মুসলমান চরিত্রের দাম্পত্য জীবনের কাহিনি তুলে ধরেছেন। ঢাক ও তুবড়ি বাঁশি নিয়ে খোঁড়া সাপের খেলা দেখায়। যা রোজগার করে, তার অনেকটা অংশ গাঁজা, আফিঙে খরচ করে। কখনও কখনও মদ পান করে সর্বহারা পড়ে খোঁড়া শেখ। অদ্ভুত স্বভাব খোঁড়ার। যখন সে আর্থিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। কখনও তোষামোদ করে প্রাণপণ খেটে মজুরিগিরি করে অর্থ উপার্জন করে। অভাব অনটনের সংসারে খোঁড়া ও জোবেদার প্রেম নেহাত মন্দ ছিল না। খোঁড়া চরিত্রটি অদ্ভুত প্রকৃতির। আর্থিক নেশার সঙ্গের সঙ্গে প্রেমের নেশাও বদলে যায়।

"যেদিন না মেলে, সেদিন সে ঝুড়ি কাঁধেই ভিক্ষা আরম্ভ করে। যাহা পায়, তাই দিয়াই খানিকটা গাঁজা-আফিং কেনে। কিনিয়াও যদি কিছু থাকে, তবে খানিকটা পচাই মদ গিলিয়া বাড়ি ফিরিয়া জোবেদা বিবির পা ধরিয়া কাঁদিতে বসে, আমার হাতে পড়ে তোর দুর্দশার আর সীমা থাকল না। না খেতে দিয়ে মেরে ফেললাম।

জোবেদা হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলে—লে, খেপামি করিস না, ছাড় আমাকে—দুটো চাল দেখে আনি।

খোঁড়ার কান্না বাড়িয়া যায়, সে একবার জোবেদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, এক জেরা নতুন কানি কখন দিতে লারলাম। পুরানো তেনা পরেই তোর দিন গেল।"[৭]

খোঁড়া শেখের জীবনের পথ বদলে ছিল সাপিনী সংস্পর্শে। সাপিনীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিল খোঁড়া শেখ। উদয়নাগ সাপিনীর ঠোঁট দুটি চেপে ধরে সে চুম্বন করেছিল। মানবীকে ছেড়ে নাগিনীর রূপের মোহে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পাশবিক প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল নাগিনীকে ঘিরে। খোঁড়া শেখ তার দাম্পত্য জীবনে যেখানে জোবেদার জন্য একটুকরো নতুন কাপড় খরিদ করতে পারে না, সেই খোঁড়া আদিম রসের ইতর টানে নাগিনীর নাক ফুটিয়ে মিনি পরায়। শুধু তাই নয়, খোঁড়া নাগিনীকে জীবন সঙ্গিনীর খেলায় বাঁধতে চেয়েছে। লাঠির ডগায় সিঁদুর দিয়ে নিকা করেছে।

"জোবেদা আয়না সিঁদুর লইয়া আসিয়া ঈষদ্দুরে নামাইয়া দিল। খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি লাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লাল রেখা আঁকিয়া দিয়। হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, আর তোর সতীন হল।"[৮]

খোঁড়া শেখের প্রাণের কৌতুক ভাগ্যের পরিহাসে ফলে গিয়েছিল। উদয় নাগিনী খোঁড়া শেখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এত দিনের বন্ধন দশার প্রতিশোধ নিতে এসেছিল। খোঁড়ার প্রকৃত ভালোবাসা জোবেদা না নাগিনীর প্রতি ছিল তা লেখক তারাশঙ্কর নিপুণ হস্তে গল্পের পরিণতিতে তুলে ধরেছেন। জোবেদাকে কেটে ছিল নাগিনী। খোঁড়া জোবেদার মৃত্যুর আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

"খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাপটাকে ধরিয়া ঝাঁপিতে বন্দী করিয়া বলিল, জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।"[৯]
কিন্তু খোঁড়া শেখের চরিত্র দ্বিচারিণী হয়ে উঠেছিল। নাগিনীকে মুক্তি দিয়ে খোঁড়া বিমর্ষ হয়ে পড়ে ছিল। সত্যি সত্যিই নাগিনী খোঁড়ার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। জোবেদার প্রেমের চেয়ে নাগিনীর মোহপাশের বন্ধনের শক্তি খোঁড়ার কাছে অনেক বেশি শক্ত ছিল। জোবেদার প্রেম, জোবেদার প্রাণ খোঁড়ার হৃদয়কে অটুট বন্ধনে বাঁধতে পারেনি। তাইতো খোঁড়া নাগিনীকে শাস্তি নয় মুক্তি দিয়েছে—

"বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়া ছিল। বলিয়াছিল শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।"[১০]

কৃষক পরিবারকে নিয়ে লেখা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অসাধারণ গল্প 'কালাপাহাড়'। কৃষক রংলাল ছিল প্রথম শ্রেণির একজন বড় চাষি। চাষাবাদে তার প্রাণপণ চেষ্টার বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই। রংলালের চেহারাতেও বিশেষত্ব রয়েছে। প্রকাণ্ড বলশালী রংলালের পরিচয় অতুলনীয়। রংলালের মনের ইচ্ছা গল্পকার তারাশঙ্কর প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন—

"তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর—কাঁচা বয়স, বাহার রঙ, সুগঠিত শিঙ, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয় না। আর একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গোরুর মত গোরু যেন আর কাহারও না থাকে। গোরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায়, সময়ে সময়ে তাহাদের পদ সেবাও করে। কোনদিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা কেষ্টর জীব।"[১১]
রংলালের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সে আপন মনের মতো সামগ্রী খুঁজে নিতে জানে। হৃষ্টপুষ্ট দুখানি মহিষ কিনেছিল—কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। লাঙল বড় করে এই দুটি মহিষকে বশ করেছিল রংলাল। যশোদার মা মহিষ দুটোকে দেখে বিদ্রোহ করে উঠেছিল। তবে কৃষক রমণী রংলালের গিন্নি ভয়ংকর রূপের মধ্যে অহংকার খুঁজে পেয়েছিল। রংলালের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল দুটি মহিষ।

"মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়ে ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুইধারে উল্টাইয়া পড়ে। একহাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটার একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে; রংলাল হাসে।"[১২]

'অগ্রদানী' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ণ, শীর্ণ, দারিদ্র্যগ্রস্ত, লোভাতুর ব্রাহ্মণের উদর লালসার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজে কিছু লোক রয়েছে বংশ নয়, মর্যাদা নয়, আত্মসম্মান নয়, সামান্য খাদ্যরসে লালায়িত। আহারের অন্ধ লোভে শোক, দুঃখ, কষ্ট ভুলে রসাস্বাদনে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের লোলুপতা ব্রাহ্মণ বংশকে কলঙ্কিত করেছে। পূর্ণ চক্রবর্তীর কদর্য লোভ আপন শিশুকে অন্যের শিশুর সঙ্গে পরিবর্তন করে আজীবন আহারের ব্যবস্থা পাকা করেছে। দশবিঘা জমি ও সিংহবাহিনীর প্রসাদ এক থালা পাওয়ার লোভে নিজের ছেলে অপরের মৃত্যুন্মুখীর ছেলের সঙ্গে পরিবর্তন করেছে।

"মৃত্যুদ্বার হইতে শিশু ফিরিয়াছে। দেবতার দান ব্রাহ্মণের প্রসাদ। চক্রবর্তী নাকি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুকে দিয়াছে। হতভাগ্যের সন্তান মারা গিয়াছে।"[১৩]
লোভী পূর্ণ চক্রবর্তী লোলুপ রসনাকে তৃপ্ত করতে গল্পকার শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করতে বাধ্য করিয়েছেন। মাত্রাতিরিক্ত লোভ ভাগ্যের পরিহাসে পূর্ণ চক্রবর্তীকে বিধবা পুত্রবধূর হাতে অগ্রদানী ভোজনে দুর্মর লোভাসক্তিকে ধিক্কার জানিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, শ্রেষ্ঠ গল্প, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, তৃতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০২২, পৃ. ২০। ২. তদেব, পৃ. ৩৭। ৩. তদেব, পৃ. ৪৭। ৪. তদেব, পৃ. ৫৮।

৫. তদেব, পৃ. ৬৫। ৬. তদেব, পৃ. ৬৫।

৭. তদেব, পৃ. ৬৯।

৮. তদেব, পৃ. ৭১।

৯. তদেব, পৃ. ৭২।

১০. তদেব, পৃ. ৭৩।

১১. তদেব, পৃ. ৭৪।

১২. তদেব, পৃ. ৭৯।

১৩. তদেব, পৃ. ১০৫।

....

"দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি': বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থান"

সুস্মিতা গুহ
অধ্যাপিকা,
বাংলা বিভাগ, (রাজগঞ্জ কলেজ)

সারাংশ :

লোককথার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় শাখা হল রূপকথা। পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানো, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী ইত্যাদি নানা কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা সমন্বিত রূপকথার যে নিজস্ব জগৎ তা আপাত অলৌকিক ও ঐন্দ্রজালিক। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা জন্মে যে, এই অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ঘটনা সমন্বিত গল্পগুলি বাস্তব জগতের স্পর্শ বিবর্জিত এবং একেবারেই নিরীহ শিশুপাঠ্য কাহিনি। অথচ রূপকথার অন্তর্লোকে সচেতন প্রবেশ করলে দেখা যাবে আপাত কাল্পনিক কাহিনিগুলির অন্তরালে সক্রিয় রয়েছে সামাজিক মানুষের জীবন বাস্তবতা। রূপকথার গল্পগুলি আধুনিক সময়ে যতই বিদগ্ধ সমাজের মনোযোগ দাবি করছে; যত এই কাহিনিগুলির নানা তত্ত্ব-পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ চলছে, ততই এর পরতে পরতে উন্মোচিত হচ্ছে চলমান সমাজ জীবনের নানা মাত্রা। বিশেষত রূপকথা নিয়ে আধুনিক ও সময়োপযোগী বিশ্লেষণে পিতৃতান্ত্রিক ভাবনা ও লিঙ্গবৈষম্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাগুলিও আজ অভিনিবেশের দাবি রাখে।

বাংলা রূপকথার গল্পগুলি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে নারী-অবস্থানের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। আবহমানকাল ধরে বাঙালি নারীসমাজ কর্তৃক গল্পগুলি সৃজিত ও বাহিত হয়ে আসছে। প্রায় গল্পে রাজার বহুবিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে। কন্যা সন্তান নয়, পুত্র সন্তানের কামনা, সপত্নী কলহ, সপত্নী পুত্র-কন্যাদের প্রতি বিমাতার কূট ষড়যন্ত্র- বাংলা রূপকথার গল্পের জনপ্রিয় মোটিফ হয়ে উঠেছে। পুরুষশাসিত সমাজে বাঙালি নারীকে নানাভাবে নির্যাতন-অবদমন-বৈষম্যের শিকার হতে হয়। তাই বাঙালি নারীর জীবনে চাহিদা ও প্রাপ্তির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নারীর মনে তবুও বাসা বাঁধে অজস্র ইচ্ছাকুসুম। বাস্তবের মাটিতে হয়তো কোনদিনও তার চরিতার্থতা সম্ভব নয়। তাই বাঙালি নারী সমাজ তার অবচেতন মনের কামনা-বাসনাগুলির চরিতার্থতা খুঁজে নেয় রূপকথার কল্পলোকে এবং শেষপর্যন্ত এই রূপকথার গল্পই হয়ে ওঠে নারী-সমাজের ইচ্ছে পূরণের গল্প।

সূচক শব্দ :

রূপকথা, লোক-ঐতিহ্য, সমাজচিত্র, নারী, পুরুষতন্ত্র।

মূল আলোচনা :

সাহিত্য সবসময় জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে। পরিশীলিত বিদগ্ধ জনের সাহিত্যে যেমন এ সত্যের পরিচয় মেলে, তেমনি মাটি ঘেঁষা, প্রাকৃত জনের আপনার প্রাণের সম্পদ যে রূপকথা'র গল্প, তাতেও মানব জীবন ও মানব সমাজ বেশ ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে বলেছিলেন 'মানব সমাজ'। তাঁর বক্তব্য ছিল: "সাহিত্যের মধ্যে মানুষের হাসিকান্না, ভালবাসা, বৃহৎ মানুষের সংসর্গ এবং উত্তাপ, বহুজীবনের অভিজ্ঞতা, বহুবর্ষের স্মৃতি সবশুদ্ধ মানুষের একটা ঘনিষ্ঠতা পাওয়া যায়। সেইটেতে বিশেষ কি উপকার করে পরিস্কার করে বলা শক্ত। এই পর্যন্ত বলা যায় 'আমাদের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বকে পরিস্ফুট করে তোলে।" (১) রূপকথার গল্পের সচেতন পাঠে এ সত্যই প্রতিভাত হয়।

মৌখিক লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা হল রূপকথা। ইংরেজিতে যাকে Fairytale বলে। রাজা-রাণী-রাজপুত্র-রাজকন্যা-রাক্ষস-খোক্কস-পক্ষীরাজ ঘোড়া-দৈত্য-দানো-নানা কথা বলা প্রাণী- নানা কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা সমন্বিত রূপকথার যে নিজস্ব জগৎ তা অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক। আপাতভাবে গল্পগুলি বাস্তব জগতের স্পর্শ বিবর্জিত। এই অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ঘটনা সমন্বিত গল্পগুলির সঙ্গে আমাদের ধূলিধূসারিত বাস্তব পৃথিবীর আদেও কোন সম্পর্ক নেই। তাই প্রাথমিক ভাবে ধারণা জন্মে যে, রূপকথা কেবলমাত্র শিশুতোষ সাহিত্যের অন্তর্গত। কিন্তু গল্পগুলির নিবিড় পাঠে ও বিশ্লেষণে অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক কুয়াশার রহস্যঘন আবরণ ছিন্ন হয়ে যে জগৎ উঁকি

দেয় তা একেবারেই আমাদের পরিচিত আটপৌড়ে জগৎ। রূপকথার রাজা-রাণী-রাজপুত্র-রাজকন্যারা কোনো অপরিচিত লোকের বাসিন্দা নয়। আমাদেরই পরিচিত জন। এমনকি রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানো এরাও আমাদেরই সমাজে রয়েছে নানা ছদ্মবেশের আড়ালে। এদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য দেখে আমাদের চিনে নিতে খুব বেশি কষ্ট পেতে হয় না। তাই রূপকথার গল্পের এই আপাত অলৌকিকতার আবরণ উন্মোচন করলে দেখা যাবে রূপকের আড়ালে আসলে পরিবেশিত হয়েছে সামাজিক মানুষের জীবন বাস্তবতা।

রূপকথা সৃষ্টির নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নির্ধারণ করা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে নানা প্রেক্ষিত বিচার করে একথা বেশ স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, মানব সভ্যতা সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই মানব সমাজ কর্তৃক রূপকথা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সাধারণত রূপকথার গল্পগুলির স্রষ্টা নারী সমাজ। শীতের অবসর সন্ধ্যায় আগুনের সামনে জড়ো হয়ে, ঘরকন্নার কাজ করতে করতে, হয়তবা নিঝুম রাতে কাঁথার তলায় শুয়ে শিশুদের গল্পগুলি বলে চলতেন মা-ঠাকুমা-দিদিমা-মাসীমা-পিসিমারা। সকলেই মা- অর্থাৎ নারী। রূপকথার গল্পগুলি সেই নারী সমাজ কর্তৃক সৃজিত ও বাহিত হয়ে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভুমিকা লিখতে বসলেন তখন অকুণ্ঠ চিত্তে রূপকথার গল্প সৃষ্টিতে নারীর ভুমিকাকে অভিবাদন জানিয়ে বলেছিলেন: "এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালীবালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্য্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে। নিখিল বঙ্গদেশের এই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।" (২)

সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে নারী কর্তৃত্বময় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তবে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সমাপন হল। প্রতিষ্ঠিত হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। গৃহ পরিসরের বাইরে গিয়ে দৈহিক শ্রমের প্রেক্ষিতে অর্থ উপার্জন করবে পুরুষ। নারী তেমনই অন্তঃপুরের পারিবারিক বেষ্টনীতে স্বামী সন্তান-পরিবারের লালন পালন করবে। এ ব্যাবস্থাই বলবৎ হল। জীবন সংগ্রামময়। বহির্বিশ্বে পুরুষ যত কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছে তার প্রভাব পড়েছে অন্তঃপুরবাসিনীদের দিনযাপনের ওপরে। একদিকে সাংসারিক অভাব-অনটন, স্বামীর দৈহিক-মানসিক নির্যাতন, সন্তানের জ্বালা, একান্নবর্তী পরিবারের সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব, সকলের মন জুগিয়ে চলার দায়বদ্ধতা- নারীকে এ সবকিছু নীরবে সহ্য করতে হয়। তবুও বাঙ্গালি নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তবুও তাদের শিকড় এই সংসারের গভীরে প্রথিত। তারা এই সংসারকে ভালোবাসে। ভালোবেসে সংসারের জটিল আবর্তে দাঁড়িয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখার সাহস রাখে। রূপকথার জগৎ হয়ে ওঠে তাদের সেই অবদমিত অবহেলিত স্বপ্ন ও ইচ্ছেগুলির পরিপূরণের একমাত্র আশ্রয়।

বাংলা মুদ্রিত রূপকথার গল্পের ক্ষেত্রে যার নাম সর্বপ্রথম স্মরণে আসে তিনি হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তাঁর সংকলিত ও সংগৃহীত 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র (১৯০৯) জনপ্রিয়তা আজও অবিসংবাদিত। গল্পগুলি শিশুতোষ সাহিত্যের উদাহরণ হিসেবে পরিচিতি পেলেও, নিছক শিশুপাঠের মাঝে এর আবেদন সীমাবদ্ধ নয়। গল্পগুলিতে বাঙালি সমাজের বিশেষত বাঙালি নারীর জীবন বাস্তবতার যে মাত্রাটি ফুটে উঠেছে তা এককথায় অনবদ্য। সাধারণত নারী সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট এই গল্পগুলিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে নারী অবস্থানের ছবি ধরা পড়েছে। রাজার বহুবিবাহের প্রসঙ্গ, পুত্র সন্তান কামনা, সপত্নী কলহ, সপত্নী পুত্র কন্যাদের প্রতি কূট ষড়যন্ত্র- এই সকল সামাজিক সমস্যাগুলি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র প্রায় প্রতিটি গল্পের মোটিফ হয়ে উঠেছে।

পুরুষের বহুবিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে প্রায় প্রতিটি গল্পে। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র প্রথম গল্প 'কলাবতী রাজকন্যা'র শুরু হচ্ছে এভাবে- "এক যে রাজা, রাজার সাত রানী। বড়রানী, মেজরানী, সেজরানী, ন-রানী, কনেরানী, দুয়োরানী আর ছোটরানী।" (৩)
আবার 'সাত ভাই চম্পা' গল্পেও এক রাজার 'সাত রানী'। আবার শুধুমাত্র যে রাজারাজরাদের মতো সমাজের বিত্তশালী ক্ষমতাবানেরাই একাধিক বিবাহ করতেন এমনটা নয়। নিম্নবৃত্তিয়দের মধ্যেও পুরুষের বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। যেমন- 'সুখু আর দুখু' গল্পে 'এক তাঁতী, তার দুই স্ত্রী'র প্রসঙ্গ রয়েছে। আসলে পুরুষের বহুগামিতা ও একাধিক বিবাহ বাঙালি সমাজে বহুযুগ ধরেই স্বীকৃত; অথচ নারীর ক্ষেত্রেই দাবি করা হয় একনিষ্ঠতা।
আবার পুরুষের বহুবিবাহের পশ্চাতে কারণ হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যে যুক্তিটা খাড়া করে, তা হল স্ত্রীর সন্তান ধারণের অপারগতা। প্রতিটি গল্পে ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টিতে বা সমস্যার ক্ষেত্র তৈরিতে পুরুষের একাধিক বিবাহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ। 'কলাবতী

রাজকন্যা' গল্পে "রাজার মস্ত-বড় রাজ্য; প্রকাণ্ড রাজবাড়ী। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মাণিক, কুঠরীভরা মোহর, রাজার সব ছিল। এছাড়া মন্ত্রী, অমাত্য, সিপাই, লস্করে-রাজপুরী গম্‌গম্‌ করিত।

কিন্তু, রাজার মনে সুখ ছিল না, সাত রানী; এক রানীরও সন্তান হইল না। রাজা, রাজ্যের সকলে, মনের দুঃখে দিন কাটেন।"(৪) এই একই প্রসঙ্গ এসেছে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 'পুষ্পমালা', 'মালঞ্চমালা' প্রভৃতি গল্পে। রাজার এই সন্তানহীনতাই তার একাধিক বিবাহের কারণ রূপে দেখানো হচ্ছে। আজকের এই আধুনিক যুগেও সন্তানহীনতার দায় কেবলমাত্র নারীর উপরে চাপিয়ে দিয়ে পুরুষতন্ত্র যেখানে নিশ্চিন্তে থাকে, সেখানে কোন স্মরণাতীত কালে অশিক্ষিত জনগণের দ্বারা সৃজিত এই গল্পগুলিতেও, সেই দায় যে নারীর উপরেই বর্তাবে তা তো বলাই বাহুল্য। সন্তানহীনতার দায় একতরফা নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার এই প্রবণতা সেই সময় থেকে শুরু করে আজও বলবৎ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবনার মধ্যে বিশেষ কোন যে পরিবর্তন ঘটেনি তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলে এই সকল গল্পের পরিসরে।

পুরুষের সন্তান লাভের কামনায় বহুবিবাহ বা বহুগামিতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রূপকথার অন্তর্লোকে বেশ স্পষ্ট। গল্পগুলিতেও প্রায়শই দেখা যায় পুরুষ নয়, নারী কর্তৃক অপর নারী নির্যাতনের চিত্র। কখনো সুয়োরাণী দুয়োরাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কখনো আবার সপত্নী পুত্রকন্যাদের অনিষ্ট সাধন করে চলেছে। নারী সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের এই টানাপোড়নের পশ্চাতে পুরুষতন্ত্রের দায়িত্ব একেবারেই কি অস্বীকার করা যায়? সমাজ বাস্তবতাই নারীকে জানাচ্ছে, যে নারী সন্তানবতী স্বামী, পরিবার এমনকি সমাজের কাছেও সে আদরনীয়। অন্যদিকে বন্ধ্যা নারী স্বামীর প্রেম বঞ্চিত। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও পদে পদে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবমাননার শিকার হয়। তাই স্বামীর মনোযোগ দাবি করতে এবং তার সম্পদের ওপর নিজের ও নিজের সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে নারী নীতিগর্হিত কাজে লিপ্ত হয়। 'সুখু আর দুখু' গল্পে দেখা যায়- "একদিন তাঁতী মরিয়া গেল অমনি বড় তাঁতীবউ তাঁতীর কড়িপাতি যা ছিল সব লুকাইয়া ফেলিল, আপন মেয়ে নিয়া, দুখু আর দুখুর মাকে ভিন্ন করিয়া দিল।" (৫)

রূপকথার বেশিরভাগ গল্পগুলিতে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর ভূমিকা অধিক সক্রিয়। স্বপত্নী এবং স্বপত্নী পুত্র-কন্যাদের প্রতি অন্য স্ত্রীর নির্যাতনের দৃশ্য একাধিক গল্পের সমস্যার কেন্দ্র। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে বড়রাণী, মেজরাণী থেকে শুরু করে কনেরাণী যারা সংসারে জটিল আবর্তে পোড়া খাওয়া তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হচ্ছে দুয়োরাণী আর ছোটোরাণীকে।

সন্তানপ্রাপ্তির জন্য সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড় বাটা অন্য পাঁচ রাণীর ভাগে পড়লেও দুয়োরানী বাটির তলানি আর ছোটরাণী শিলনোড়া ধোওয়া জল খেলো। দশ মাস দশ দিন পর পাঁচ রাণী সোনার চাঁদ ছেলের জন্ম দিল। অন্যদিকে দুয়োরাণী আর ছোটরাণী অপর রাণীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে প্যাঁচা ও বানর জন্ম দিল। আর তার পরিণতিতে রাজার জীবনে এমনকি রাজবাড়ীতেও দুয়োরাণী, ছোটরাণী এবং তাদের মানবেতর সন্তানদের ঠাঁই হল না। রাজার রাণী থেকে তারা যথাক্রমে চিড়িয়াখানার বাদী ও ঘুটে কুড়ানী দাসীতে পরিণত হল। 'সাত ভাই চম্পা' গল্পেও ছোটরাণীর একই পরিণতি ঘটে। অর্থাৎ গর্ভজাত সন্তানের কোন দোষ ত্রুটি থাকলে তার দায় একতরফা মাকেই নিতে হয় এবং তার জন্য কঠোর শাস্তিও ভোগ করতে হয়। 'কিরণমালা' গল্পে দেখা যায়, সতীন নয় নিজের বড় দুই দিদির হিংসের শিকার হতে হয় রাণীকে। রাণী দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্ম দেয়। কিন্তু বড় দুই দিদি ষড়যন্ত্র করে তার সন্তানদের জলে ভাসিয়ে দেয় এবং রাজাকে জানায় তার রাণীর গর্ভে যথাক্রমে কুকুরছানা, বিড়াল ছানা ও কাঠের পুতুল হয়েছে। তা শুনে "রাজ্যের লোক বলিতে লাগিল, "ও মা! এ আবার কি! অদিনে কুক্ষণে রাজা না-জানা না-শোনা কি আনিয়া বিয়ে করিলেন, এক নয়, দুই নয়, তিন তিনবার ছেলে হইল- কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা আর কাঠের পুতুল। এ অলক্ষণে রানী কখখনো মনিষ্যি নয় গো, মনিষ্যি নয়। নিশ্চয় পেত্নী কি ডাকিনী।" (৬) অবিবেচক রাজা এসব শুনে ভাবলেন- "তাই তো! রাজপুরীতে কী অলক্ষ্মী আনিলাম- যা'ক, এ রানী আর ঘরে নিব না।"(৭) এবং শেষপর্যন্ত অলক্ষুণে 'ডাইনী' রাণীর জন্য কঠোর শাস্তি বরাদ্দ হল। "রাজ্যের লোকেরা ডাকিনী রানীকে উল্টো গাধায় উঠাইয়া, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ডালিয়া, রাজ্যের বাহির করিয়া দিয়া আসিল।"(৮) কেবলমাত্র সন্তানের দোষ ত্রুটির দায় নয়, পরিবারের যেকোনো অশুভ, যেকোনো অঘটনের দায় কেবলমাত্র নারীর উপরেই বর্তায়। 'দাদামশাইয়ের থলে'র অন্যতম গল্প 'মালঞ্চ মালা'য় শিশু রাজপুত্র বিয়ের রাতে বিধাতার বিধানকে অনিবার্য প্রমাণ করে মারা গেলে রাজা বলে উঠলেনঃ "ডাইনী কোটালকন্যা নিশ্চয় ডাইনী! কোটালকন্যাকে চুলে ধরিয়া বাহির কর, চোক উপড়াইয়া আগুনে পোড়।"(৯) এভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে কোনো অসঙ্গতি, অকল্যাণ, অঘটনের দায় নারীকে মাথা পেতে

নিতে হয়। ডাইনী অপবাদ দিয়ে কখনও তাকে পুড়িয়ে মারা হয় কখনও বা চোখ উপড়ে মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে সমাজ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়।

আবার বেশিরভাগ রূপকথার গল্পে দেখা যায় কন্যা সন্তান নয় পুত্র সন্তান কামনা বার বার প্রাধান্য পাচ্ছে। পুত্র সন্তান লাভের কামনায় যাগযজ্ঞ থেকে শুরু করে নানা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, সাধু-সন্ন্যাসী, নানা ফেটিস বস্তু ধারণ বা সেবন এমনকি 'পুত্র সরোবরে' স্নান করতেও দেখা যাচ্ছে। 'পুষ্পমালা' গল্পে নিঃসন্তান রাণী ও আঁটকুড়ে কোটালের স্ত্রী পুত্র সন্তানের কামনায় 'পুত্র সরোবরে' স্নান করতে যায়। 'পুত্র সরোবরে' স্নান করে রাণী সন্তান সম্ভবা হন। গল্পের একটি জায়গায় দেখা যায় পুত্র লাভের উদগ্র কামনা নিয়ে রাজা আঁতুড়ঘরের সামনে অপেক্ষা করছেন।

"কি হইল, কি হইলো"
-ক্ষীরের পুতুল কন্যা!
মুখ নীচু করিয়া রাজসভায় চলিয়া গেলেন!"[১০]

এ চিত্র কেবলমাত্র কোন রূপকথার কল্পরাজ্যের নয়। এই চিত্র একেবারেই আমাদের অতি পরিচিত সমাজের বাস্তবচিত্র। এখনো এই আধুনিক যুগেও পুরাতান্ত্রিক সমাজের পটভূমিতে কন্যা সন্তানের জন্ম বড় গ্লানিময়। এই গল্পে সদ্য মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়া রাণীর প্রতিক্রিয়াও বেশ ইঙ্গিতবহ। কন্যা সন্তান প্রসব করে রাণী আনন্দিত হননি বরং "রানীর গা ঘামিল"। আসলে পুত্র সন্তান প্রাপ্তির পারিবারিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে না পারায় ভয়ে ত্রাসে তার এহেন প্রতিক্রিয়া। আবার 'শঙ্খমালা' গল্পে "মেয়ে হয় মার্বো, ছেলে হয় রাখ্বো"[১১] - এই উচ্চারণ কোন পুরুষের কণ্ঠে কিন্তু ধ্বনিত হয়নি। আশ্চর্যভাবে ধ্বনিত হয়েছে নারীরই কণ্ঠে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতিনিয়ত অবদমন; অন্যদিকে পুরুষের সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব আসলে অবচেতন মনে 'নারী' হিসেবে নিজের সত্তাকেই বিদ্বেষ করতে, ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। তাই নারী হয়েও নারীর কণ্ঠে কন্যা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা নয় বরং ক্ষমতাশালী বীর পুত্রসন্তানের কামনাই ধ্বনিত হয়েছে। সমাজে নারীর অবস্থান কোথাও যেন নারীর মধ্যে, নিজের অস্তিত্বের প্রতিই জিঘাংসা জাগিয়েছে।

'মালঞ্চমালা' গল্পে দেখা যায় "পুত্র কামনায় রাজা, যোগী জ্যোতিষী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসী আনাইয়া, 'সমারোহ' করিয়া যাগ-যজ্ঞ দিলেন।"[১২] 'শঙ্খমালা' গল্পেও একই প্রসঙ্গের অবতারণা : "রাজার রানীর, ছেলে হয় ছেলে হয় সোর পড়ে, কিন্তু, রানীর ছেলে হয় না। কত পন্ডিত কত গণিলেন, কত ওঝা কত কত মন্ত্র পড়িল, কিছু না!" [১৩] আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে যুগ যুগ ধরে কন্যা সন্তান নয়, পুত্র সন্তানই বংশের যথার্থ উত্তরাধিকারী রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। নারী যতই উপযুক্ত হোক না কেন, শেষপর্যন্ত উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 'কিরণমালা' গল্পে কিরণমালার মধ্যে সৌন্দর্যের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। কিরণমালা যেন এক কথায় 'বীরাঙ্গনা'। দুই দাদাকে বিপদমুক্ত করতে সে নিশ্চিত আশ্রয় ত্যাগ করেছে। সব বাধা-বিপত্তিকে বুদ্ধিবলে সুকৌশলে অতিক্রম করেছে। শেষপর্যন্ত সে জয়ী হয়েছে। জরামুক্ত রাজপুত্ররা তাকে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে বলছে, "সাত জুগের ধন্য বীর।" [১৪] অথচ গল্পের পরিণতিতে রাজকার্য পরিচালনার ভার কিন্তু কিরণমালা পাচ্ছে না, পাচ্ছে তার দাদারা। 'কিরণমালা' গল্পে আরেকটি বিষয় অভিনিবেশের দাবি রাখে। মা তার সন্তানের জন্য কখনো খড়্গহস্ত, কখনো অশ্রুনেত্র। নারী তার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে যেকোনো বাধা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে। এ সত্য 'কিরণমালা' গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদিও নীতিকথা বলে লোককথার স্বতন্ত্র একটি বিভাগ আছে; তবু রূপকথার গল্পগুলিতে প্রচ্ছন্নভাবে নীতি শিক্ষা দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সুকৌশলে নারীকে শিখিয়ে দিচ্ছে ত্যাগ, সহনশীলতা ও পারিবারিক সুখ শান্তি বজায় রাখার একতরফা দায়িত্ব কেবল নারীর। যেখানে রূপকথার গল্পের নায়কের। নানা দুঃসাহসিক অভিযান করছে। বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে, সংকট মোচন করে কাহিনির পরিণতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সেখানে নায়িকা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রকে আঁকা হচ্ছে অসহায় নিষ্ক্রিয় রূপে। পেলবতা, নমনীয়তা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ভীতা সন্ত্রস্তা- এই সকল চারিত্রিক ধর্ম আরোপ করা হচ্ছে নারীর মধ্যে। রূপকথার গল্পের নায়িকা চরিত্র নিজেকে রক্ষা করতে অপারগ। সেক্ষেত্রে সে পুরুষেরই মুখাপেক্ষি। তাই 'ঘুমন্ত পুরী' গল্পে, অথবা 'পাতালকন্যা মণিমালা' গল্পে রাজকন্যারা কত কত বছর ধরে অচেতন হয়ে অপেক্ষা করছে কোন এক রাজপুত্র এসে তাকে কোন দৈত্য বা রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

কোনরকম বুদ্ধিবৃত্তি নয়। মাত্র দৈহিক সৌন্দর্যই রাণী, রাজকন্যা বা গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের আবশ্যিক শর্ত। 'কলাবতী রাজকন্যা'র বিবরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে- 'কুঁচ-বরণ কন্যা মেঘ-বরণ চুল'(১৫) 'ঘুমন্ত পুরী' গল্পে রাজপুত্র এক আশ্চর্য দেশে উপনীত হয়ে দেখে- "ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটে হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলান রহিয়াছে; সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন।"(১৬) সেই 'চাঁদের কিরণ মুখখানি'(১৭) দেখতে দেখতে বিভোর রাজপুত্র কত বছর কাটিয়ে দিল। 'মধুমালা' গল্পে রাজপুত্র মদনকুমার মধুমালার রূপের ছটায় নিজের স্বাভাবিক চেতনা হারিয়েছে। 'কাঞ্চনমালা' গল্পে সওদাগর পুত্র রূপলাল স্বপ্নে রাজকন্যার রূপ দেখে বিমোহিত। "কি সে রাজকন্যার রূপ! -রূপ উথলিয়া পড়ে! রাজকন্যার চুল থরে থরে মেঘের বরণ হইয়া সোনার অঙ্গ ঢাকিয়া পড়ে!"(১৮) নারীর অন্তর সৌন্দর্য নয়, তার দৈহিক সৌন্দর্যেরই মূল্যায়ন হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম তাই রূপজ মোহের ঘেরাটোপেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকেছে। 'সুখু আর দুখু' গল্পেও এ সত্যের প্রচ্ছন্ন প্রমাণ রয়েছে। চিরদুখিনী মায়ের কর্তব্যপরায়ণা, মিষ্টি স্বভাবা দুখুর রাজপুত্র লাভ তখনই সম্ভব হয়েছে যখন সে চাঁদের মা বুড়ির দক্ষিণ্যে এক পরমা সুন্দরী কন্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। স্বভাব গুণে কিন্তু তার রাজপুত্র লাভ হয়নি। নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের যে স্টিরিওটাইপ নির্ধারণ করা হচ্ছে, তা শুধুমাত্র আমাদের দেশের রূপকথায় নয়, পৃথিবীর যে কোন দেশের রূপকথায় লক্ষণীয়। রূপকথার নায়িকা বা প্রধান নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে এ এক আবশ্যিক শর্ত। সিন্ডেরেলা, স্নোহোয়াইট, রাপুনজেল- এর মত বিদেশি রূপকথা গুলিতেও নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তা লৈঙ্গিক রাজনীতির একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

দৈহিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়, পুত্র সন্তান ধারণে সক্ষম এবং নিঃশর্তে পুরুষের আনুগত্য মেনে নেবে এমন নারীই রূপকথার নায়িকা হওয়ার উপযোগী। এই সকল গুণাবলীর বিপরীত আচরণ কখনোই একজন আদর্শ নারীর কাছ থেকে কাম্য নয়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী' গল্পে ব্রাহ্মণ অলস, উদরপরায়ণ, সংসার উদাসীন। "সংসারের যত কাজ ব্রাহ্মণীরই হত করতে, ব্রাহ্মণ শুধু খেতেন বসে, ব্রাহ্মণীর হত মরতে।"(১৯) ব্রাহ্মণী এহেন স্বামীর অন্ধ আনুগত্য না করে তার দোষ ত্রুটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। স্বামীর যথাযথ পরিচর্যা না করে বরং তাকে তিরস্কার করা ব্রাহ্মণ মেনে নিতে পারেনা। ব্রাহ্মণীর সত্য ভাষণ তার 'বিষ' বলে মনে হয়। সাধারণ ঘরের নারী থেকে শুরু করে রাজার দুলালী পুরুষের অধীনস্ত হওয়াই যেন নারীর নিয়তি।

মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রের বিবর্তনের পথে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ হল। অন্তঃপুরের চার দেওয়াল নির্ধারিত হল নারীর সক্ষেত্র। ত্যাগ, সেবা, তিতিক্ষা দিয়ে সংসার ধর্ম পালন করবে, স্বামী ও পরিবারের সকলের মন যুগিয়ে চলবে- শৈশব থেকে সকল নারীকে এই পাঠ নিতে হয়। রূপকথার গল্পগুলিও প্রচ্ছন্নভাবে নারীকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে। 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা' গল্পে কুটনী দাসী ষড়যন্ত্র করে রাণী কাঁকনমালার পোষাক পরিধান করে রাণী সাজে এবং রাণী কাঁকনমালাকে দাসী সাজতে বাধ্য করে। কিন্তু যখনই গৃহকর্ম ও শিল্পকর্মের পরীক্ষা হয়, তখনই দাসীর আসল পরিচয় সকলের সামনে প্রকাশ পায়। রাণী কাঁকনমালার তৈরি 'আসকে পিঠে বাঁসকে পিঠে' শেষপর্যন্ত তাকে তার পুরনো পরিচয় ফিরিয়ে দেয়। 'সুখু আর দুখু' গল্পেও দেখা যায় চিরদুঃখিনী দুখু তার সেবাপরায়ণতা, কর্মনিপুণতা ও সততার জন্যই চাঁদের মা বুড়ি এবং প্রকৃতির দাক্ষিণ্য পেয়েছে এবং শেষপর্যন্ত তার সকল দুঃখ কষ্টের অবসান হয়েছে। অর্থাৎ রূপকথার গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে সমাজে একজন আদর্শ নারীর সংজ্ঞা কেমন হওয়া উচিত, সেই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলা রূপকথার গল্পে একটি বিষয় বেশ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। গল্পগুলিতে যে সকল নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাদের সচেতনভাবে দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নারী চরিত্র। রাণী, রাজকন্যা অথবা গল্পের নায়িকা প্রায়শই নিষ্ক্রিয় চরিত্র। সততা, আত্মত্যাগ, ধৈর্য, উদারতা, সর্বোপরি পুরুষের আনুগত্য-এ সকল মানসিক বৃত্তি তাদের চরিত্রের অপরিহার্য ধর্ম। অন্যদিকে যে সকল নারী চরিত্রের মধ্যে আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কর্ম তৎপরতার পরিচয় পাই তাদের দেখানো হচ্ছে অঘটন ঘটন পটিয়সী খলচরিত্র রূপে। হয় তারা ষড়যন্ত্রকারিনী সুয়োরাণী, কুচুটে সৎমা নয়তো রাক্ষসী ডাইনী। আসলে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তার তেজ, দৃপ্তি, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা পিতৃতন্ত্র মেনে নিতে নারাজ। যখনই পুরুষের বেঁধে দেওয়া চারিত্রিক কাঠামোর বাইরে বেরিয়ে ভিন্ন পথে হেঁটেছে তখনই পিতৃতন্ত্র নারীকে নেতিবাচক চরিত্র রূপে চিহ্নিত করেছে। আসলে যুগ যুগ ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী পুরুষের সম্পত্তি রূপেই বিবেচ্য হয়ে এসেছে। তার অস্তিত্ব তার স্বতন্ত্রসত্তা পুরুষেরই অধীনস্ত। এই মানসিকতার প্রকাশ পরিশীলিত সাহিত্যের পরিসর থেকে শুরু করে লোকসাহিত্যের অন্দরমহল-সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে রাজকন্যা অসংকোচে আত্মপরিচয় দিয়ে রাণীদের বলেছে-

"কলাবতী রাজকন্যা মেঘ-বরণ কেশ,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ।
আনতে পারে মতির ফুল ঢো-ল-ডগর,
সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসবো তোমার ঘর।"[২০]

যে রাজকন্যা পরখ করে নিজের স্বামী নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর, পুরুষের দৈহিক সৌন্দর্য নয়, চারিত্রিক গুণাবলী প্রাধান্য দেওয়ার মতো বুদ্ধিমত্তা যার আছে, সেও "রাজকন্যা তুমি কার?"[২১] এই প্রশ্নের উত্তরে শেষপর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে-"আগে ছিলাম বাপের-মায়ের, তা'র পরে ছিলাম আমার; এখন তোমার।" [২২]

অর্থাৎ নারী তার জীবনের একেকটা পর্যায়ে একেক জনের অধীন, একেক জনের সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হচ্ছে। তার নিজস্ব স্বাধীন সত্তা যেন নেই। তাইতো 'শিয়াল পন্ডিত' গল্পে দেখা যায় বিভিন্ন জড় বস্তুর সঙ্গে অনায়াসে একই সারিতে বিনিময় প্রথার মাধ্যম রূপে নারী ব্যবহৃত হচ্ছে-

"নরুণ দিয়ে হাঁড়ী পেলাম- তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !
হাঁড়ীর বদলে কনে পেলাম- তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !
কনে গিয়ে ঢোল পেয়েছি- তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্!"[২৩]

বিনিময় প্রথায় নরুন, হাড়ি, ঢোলের সঙ্গে একটি জলজ্যান্ত মানবীর যেন কোন পার্থক্যই নেই। নারীর অস্তিত্ব এখানে গৌণ। আসলে পিতৃতন্ত্র নারীর কাছে সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করে। আর যখনই সেই আনুগত্যের অভাব দেখেছে তখনই পুরুষতন্ত্র নারীর উপর আঙুল তুলেছে। যখনই নারী নিজের অধিকার বুঝে নিতে চেয়েছে অথবা নিজের ইচ্ছের আকুণ্ঠ প্রকাশ করেছে তখনই সেই আচরণকে পিতৃতন্ত্র নারীর ঔদ্ধত্য বলেই মনে করেছে। আর তখনই নারীর সেই ইচ্ছাশক্তিকে পদদলিত করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। 'শীত-বসন্ত' গল্পে- "রাজকন্যা রূপবতী স্বয়ম্বর করিবেন না; রাজকন্যার পণ, যে রাজপুত্র গজমতি আনিয়া দিতে পারিবেন, রাজকন্যা তাঁহার হইবেন- না পারিলে রাজকন্যার নফর হইয়া থাকিতে হইবে।" [২৪] কিন্তু কোন রাজপুত্রই রাজকন্যা রূপবতীর শর্ত মতো গজমোতি আনতে পারে না। তাই শেষপর্যন্ত তাদের রাজকন্যা রূপবতীর নফর হয়ে থাকতে হয়। রাজকন্যা কিন্তু তার পূর্ব শর্ত মতই আচরণ করেছে। যে সকল রাজপুত্রেরা তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে অথচ গজমোতি আনতে পারেনি রাজকন্যা তাদের নিজের 'নফর' করে রেখেছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর এহেন আচরণ ন্যায় সঙ্গত বলে কেউ মনে করে না বরং তার ঔদ্ধত্য বলেই বিবেচ্য হয়। তাই শীতরাজা রাজকন্যা রূপবতীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছে-"কি! রাজকন্যার এত তেজ, রাজপুত্রদিগকে নফর করিয়া রাখে। রাজকন্যার রাজ্য আটক কর।" [২৫]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে আশৈশব শিক্ষা দেওয়া হয়, পুরুষের অন্ধ আনুগত্য তার একান্ত পালনীয় ধর্ম। তার স্বাধীন চিন্তন, স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অধিকার নেই। আর কোনো নারী যদি এর বিপরীত আচরণ করে, তাহলে তার জীবনে নিশ্চিত বিপদ ঘনিয়ে আসবে। 'পাতাকন্যা মণিমালা' গল্পে এই ভাবনারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। গল্পে আছে মণিমালাকে তার স্বামী পাতালপুরি থেকে পৃথিবীর বুকে আসতে বারণ করেছিল। বহির্বিশ্ব দেখার কৌতূহলে মণিমালা তার স্বামীর কথা উপেক্ষা করে। যার ফলশ্রুতিতে তাকে অপর এক রাজার দ্বারা আটক হতে হয়। এই গল্প আসলে নারীকে জানাচ্ছে যে, পুরুষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে নারীর জীবনে ঘোরতর বিপদ ঘনিয়ে আসবে। অতএব প্রশ্নহীন ভাবে পুরুষের আজ্ঞা পালন করাই তার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কেবলমাত্র নারীর স্বাধীন চিন্তন নয় তার অধিক শিক্ষালাভ সমাজ কখনো ভালো চোখে দেখেনা। আজকের এই একবিংশ শতকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নারীশিক্ষা নিয়ে যেখানে সরকারকে প্রচার করতে হয় "বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও", নানা রকম স্কিম আনতে হয়, সেখানে এই সকল রূপকথার গল্পগুলি কোন্ স্মরণাতীত কালে; যে সামাজিক পটভূমিতে সৃজিত হয়েছে, সেখানে নারীশিক্ষা যে কতটা অবহেলিত হবে, তা বলাই বাহুল্য। বারবার শোনা যায় বেশি বিদ্যেবতী নারীর বর মেলা ভার। এমনকি অধিক শিক্ষা লাভ নারীর অকাল বৈধব্যের কারণ হতে পারে। বাংলার জনপ্রিয় রূপকথার গল্প 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 'মধুমালা'য় এই ভাবনার প্রকাশ বেশ স্পষ্ট-

"সেই দেশে রাজকন্যা নাম চম্পকলা,
হরিণ-নয়নী, বিদ্যাবতী।

ভারত পুরানে কন্যার মন চারিবেলা;
আজো তাঁর না আসিল পতি।” (২৬)

জ্ঞানচর্চা মানুষের মধ্যে মননশীলতা, ব্যক্তিস্বতন্ত্রতাবোধ যুক্তিধর্মীতা, প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। কিন্তু গৃহপরিসরে নারীর মধ্যে এই সকল চারিত্রিক ধর্ম পুরুষতন্ত্র দেখতে নারাজ। আমাদের সমাজে সুন্দরী, সহনশীল, গৃহকর্ম নিপুণা পাত্রীই কেবলমাত্র কাম্য। তাই বিদ্যেবতী ও হরিণ নয়নী হওয়া সত্বেও রাজকন্যার বর পাওয়া দায় হয়েছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন- “এই রূপকথার মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক সমস্যা এমন একটা আদর্শ শান্তি ও কল্পিত সমাধানের মধ্যে পর্যবসিত হয় যাহা বাস্তব জীবনে একান্ত দুর্লভ এবং যাহার অভাব আমাদের সমস্ত জীবন প্রবাহে একটা অব্যক্ত-মধুর, অবিচ্ছিন্ন করুন মর্মর জড়াইয়া তোলে।” (২৭)

‘আদর্শ শান্তি’ ও ‘কল্পিত সমাধান’ রূপকথার কল্পলোকে বাঙালি নারী যেন এদু’টিই অনুসন্ধান করে ফেরে। আমাদের সমাজ জীবনে রয়েছে নানা বৈষম্য, নানা বিভেদ। পুরুষশাসিত সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর চাহিদা ও প্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নারীর অচেতন মনে বাসা বাঁধে অজস্র ইচ্ছা কুসুম। বাস্তব জীবনে হয়তো কোনদিনও তার সমাপন ঘটা সম্ভব নয়। তাই বাঙালি নারীসমাজ তার নির্জ্জান মনের কামনা-বাসনাগুলির চরিতার্থতা খুঁজে নেয় রূপকথার জগতে। এই সকল গল্প তাই হয়ে ওঠে নারীসমাজের ইচ্ছেপূরণের গল্প। যুগ যুগ ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বুকে নারীর অবহেলিত, নির্যাতিত, অবদমিত সত্তা তাদের সকল নিগড় ভেঙে মুক্তির পথ খুঁজে নেয় রূপকথার গল্পের পরিসরে।

তথ্যসূত্র :

(১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য (প্রবন্ধ-সাহিত্য), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।
(২) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, দক্ষিণারঞ্জন শতবার্ষিকী গ্রন্থাবলী, দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, (ঠাকুরমা’র ঝুলি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৪
(৩) ঐ, পৃঃ ৩।
(৪) ঐ, পৃঃ ৩।
(৫) ঐ, পৃঃ ১১৫।
(৬) ঐ, পৃঃ ৫৩।
(৭) ঐ, পৃঃ ৫৩।
(৮) ঐ, পৃঃ ৫৩।
(৯) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, দক্ষিণারঞ্জন শতবার্ষিকী গ্রন্থাবলী, দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২১, পৃঃ ৩৭৭।
(১০) ঐ, পৃঃ ৩৫১।
(১১) ঐ, পৃঃ ৪৪৭।
(১২) ঐ, পৃঃ ৩৬৯।
(১৩) ঐ, পৃঃ ৪৪৮।
(১৪) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃঃ ৬০।
(১৫) ঐ, পৃঃ ৭।
(১৬) ঐ, পৃঃ ২৩।
(১৭) ঐ, পৃঃ ২৩।
(১৮) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক), পৃঃ ৪০৪।
(১৯) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃঃ ১২১।
(২০) ঐ, পৃঃ ৮।

(২১) ঐ, পৃঃ ১৫।
(২২) ঐ, পৃঃ ১৫।
(২৩) ঐ, পৃঃ ১১৪।
(২৪) ঐ, পৃঃ ৪১, ৪২।
(২৫) ঐ, পৃঃ ৪২।
(২৬) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক), পৃঃ ৩৩৫।
(২৭) একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন, প্রাক্ স্নাতক বাঙ্লা পাঠপর্ষৎ কর্তৃক সংকলিত, (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথা') কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২।

আকর গ্রন্থ :

(১) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জনঃ দক্ষিণারঞ্জন শতবার্ষিকী গ্রন্থাবলী, দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র, প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৪।
(২) মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জনঃ দক্ষিণারঞ্জন শতবার্ষিকী গ্রন্থাবলী, দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২১।

সহায়ক গ্রন্থ :

(১) চক্রবর্তী বরুণকুমার, সম্পাদক, লোককথার সাতকাহন, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০১২।
(২) সিদ্দিকী, আশরাফ, লোক-সাহিত্য। প্রথম খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২।
(৩) মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, বাংলার লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স। অনুষ্টুপ, ১৯৯৩।
(৪) দাস ক্ষুদিরাম, একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন (প্রবন্ধ- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথা') কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২।
(৫) ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, কথা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৬।

....

সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত

তাপস পাল
গবেষক , বাংলা বিভাগ , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক নির্মলেন্দু দাসের মতে, সুন্দরবনের লোকসঙ্গীত বৃহত্তর জনজীবনের লোকসঙ্গীত। এর বিষয়বস্তু এখানের জনজীবন চর্যার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। লোকসঙ্গীতের সব পর্যায়ের গানগুলি প্রায় উৎসবকেন্দ্রিক। বিশেষ বিশেষ উৎসবের আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গানগুলি বিকশিত হয়ে উঠেছে। তবে, সর্বত্রই যে উৎসবের আচার-অনুষ্ঠান এইসব গানের মূল বিষয় তা নয়– এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিক, ভৌগোলিক পরিবেশ, লৌকিক আচার, সামাজিক সংস্কার, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও ধর্মীয় সংস্কার।[১]

তুষার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, লোকসঙ্গীত লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। পল্লীকবিরা এইসব গানের রচয়িতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যিনি রচনা করেন তিনিই সুর সংযোগ করেন। এক কথায় যিনি কবি তিনিই গায়ক। বলাবাহুল্য, গানগুলির লিখিত রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় লোকজীবন থেকে। লোকজীবনের ছোটখাটো দুঃখ, আশা-আনন্দ, নিরাশা-হতাশার আর্তিই এই কবিতাগুলির ভাবময় রূপ। এখানে রয়েছে সূক্ষ্ম রসের পাশে সূক্ষ্ম রসের ভাবনা, জীবনের সূক্ষ্মরূপের পাশে স্থূলরূপের ছবি।[২]

'বাংলার লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সুন্দরবন এক সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের অধিকারী। সুন্দরবনের বৃহত্তর ভূমিভাগ জুড়ে যে জনবসতি— সেখানে নানা স্থানের নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়ে এক নূতন লোকসংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে তারা আর একটি বিষয় নিজেদের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে লালিত করে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তা হচ্ছে লোকসঙ্গীত।[৩]

আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, সুন্দরবনের লোকসঙ্গীতকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা চলে। প্রথম পর্যায়ে পড়ে সুন্দরবনের নিজস্ব লোকসঙ্গীত যা এখানকার মাটির একান্ত ফসল। দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী আদিবাসী সাঁওতাল ও ওঁরাও প্রভৃতি উপজাতির লোকগীতি।[৪]

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অরুন দাসের মতে, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকসঙ্গীত নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার দ্বারা পুষ্ট হয়ে উঠে। আঞ্চলিক ভাষাগুলির ব্যাপক নিদর্শন লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হয়।[৫]

বলাবাহুল্য লোকসাহিত্যের লিখিত রূপের মধ্যে তার, প্রকৃত রস সুপরিস্ফুট হওয়া সম্ভব হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসঙ্গীতকে লোকসংস্কৃতিবিদ্ নির্মলেন্দু দাস নিম্নলিখিত দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়— ১) দক্ষিণ রায়ের গান, ২) বনবিবির গান, ৩) ফকিরদের গান, ৪) মাটি কাটার গান, দ্বিতীয় পর্যায়: ১) সারুল গান, ২) করম গান, ৩) দশই গান, ৪) কাঠি নাচের গান, ৫) সাঁওরাই গান, ৬) মশাতাড়ানো গান, ৭) টুসু গান, ৮) ঝুমুর গান।[৬]

বিশিষ্ট আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ্ অমর কৃষ্ণ চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানা যায়, দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্র দেবতা অথবা বনদেবতা। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় দ্বারা পূজিত। দক্ষিণ রায়ের পূজা অবলম্বন করে এই অঞ্চলের লোকগীতি দক্ষিণ রায়ের গান গীতি হয়ে থাকে । সাধারণত: দক্ষিণ রায়ের পূজা করে থাকে 'মৌলে' (যারা জঙ্গল হতে মধু সংগ্রহ করে), কাঠুরে ও জেলে সম্প্রদায়। দক্ষিণ রায়ের অধিকাংশ গানের বিষয়বস্তু হচ্ছে রায় বন্দনা। অনেক ক্ষেত্রে পালা আকারে পাঁচালীর ঢং-এ গান গীত হয়।

কিশোর কল্লোল পত্রিকা থেকে জানা যায়, কোথাও কোথাও দক্ষিণ রায়ের কীর্তি কাহিনি ঐতিহাসিক তথ্য বর্জিত কল্পলোকের রচনা, ঘটনা প্রায় ক্ষেত্রে রায়মঙ্গল কাব্য অনুসারে।[৭] সনৎ মিত্রের সম্পাদিত 'বাঘ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, দক্ষিণ রায় আর কালু রায় দুই ভাই। একটি গানে দুই ভাই-এর রূপ বর্ণনার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

শুন রায়ের কথা সর্বজনে।/আগে চলেন বড় রায়, পিষ্ঠে চলেন ছোট রায়, (পিষ্ঠে-পিছনে)/ পুন্নিসার পিষ্ঠেযেন-/আমাবস্যা যায়।/শুন রায়ের কথা সর্বজনে-/শুন রায়ের কথা একমনে।।/ বড় রায়ের বাহন যিনি/হালুম করেন তিনি বাবা (গো)/ছোট রায় ঘোড়ায় চড়ে দাদার রনুগামী।। (রনুগামী-অনুগামী)।[৮]

বিমলকৃষ্ণ মৈত্রের, দক্ষিণরায়ের গানগুলির মধ্যে মানুষের সচেতন জীবনরক্ষার একটি সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। অরণ্য পরিবেশে মানুষ যে কতো অসহায় এই গানগুলির বক্তব্য হতে তা উপলব্ধি করা যায়, তাই প্রতিটি গানের মধ্যে 'দয়া' অথবা 'রক্ষা' কথাগুলি যুক্ত হতে দেখা যায়। এই গানই তাদের প্রাণের উৎস।[৯]

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বনবিবি অরণ্যের দেবী। বনবিবির পূজামণ্ডপে সাধারণত: বনবিবির গান পাঁচালি আকারে গাওয়া হয়ে থাকে। গানগুলির বিষয়বস্তু 'ধনা, মোনা ও দুঃখের কাহিনি। আবার অনেক গানে বনবিবির শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে।[১০]

এমন একটি গান হল—

ফুলের সুবাশ ছড়ায় বনময়।
সারা বন আলোয় আলোময়।
বনের রানী বনবিবি বসেছেন পূজায়।।
মাথায় তার ফুলের চূড়া
হাতে ধনুক ধরা,
সারা অঙ্গে ফোনার জ্যোতি ছড়ায়।[১১]

ক্ষেত্রানুসন্ধান করে আর একটি গানে কাঠুরেদের আন্তরিক বাসনার কথা জানা গেছে—

বনে বনে ঘুরি মোরা
কাঠের চালান বাই।
বনবিবির পূজা দিয়ে
ঘরে ফিরে যাই।।[১২]

পীরের গান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন বিশিষ্ট লেখক গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, মানিক পীর- পাঁচ পীরের এক পীর। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের মতো সুন্দরবন অঞ্চলে মানিক পীরের গান ও কাহিনির জনপ্রিয়তা খুব। মুসলমান ফকিরগণের মুখে মানিক পীরের কীর্তি কাহিনিমূলক গান প্রায়ই শোনা যায়। দক্ষিণবঙ্গে পাঁচ পীরের এক পীর মানিক পীর সাধারনতঃ গো ধনের কল্যাণকামী পীর বলে পুজো ও শিরনি পেয়ে থাকে। এই অঞ্চলের ফকিরেরা এই সমস্ত গান বাড়ি বাড়ি গেয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করে থাকে। কে যে এইসব গানের রচয়িতা তা তারা কেউ জানে না।[১৩]

মাটি কাটার গান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, নির্মলেন্দু দাস। তিনি বলেছেন, মাটি কাটার গান একক ব্যক্তির দ্বারা গীত সঙ্গীত নয়, যৌথ জনসঙ্গীত। 'ভেড়ি' অর্থাৎ বাঁধ বাঁধতে গেলে মাটি কাটতেই হবে, আর মাটি কাটতে গেলে চাই কোদাল। ঝপ্ ঝপ্ কোদালের কোপ পড়ে নরম অথবা শক্ত মাটির বুকে। সারিবদ্ধভাবে লোক দাঁড়িয়ে থাকে। এক একটি মাটির 'চাপড়া' কেটে 'কোদালিয়া' তুলে দেয় নিকটবর্তী লোকের হাতে। মাটির চাপড়া হস্তান্তরিত হতে থাকে এক হাত থেকে অন্য হাতে। তারপর গিয়ে পড়ে ভেড়ির গায়ে। কোদালিয়া মাটি কাটছে কোদালে, প্রতি কোপের তালে তালে গাইছে গান আর অন্যরা দলবদ্ধভাবে ধুয়া ধরে চলেছে।[১৪]

তিনি আরো বলেছেন, 'মাটি কাটার গান' সুন্দরবনের নিজস্ব লোকসঙ্গীত। এ গান প্রধানত: গেয়ে থাকে আদিবাসীরা। সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাওরা এসে ছিল জঙ্গল কেটে নদীর কিনারে বাঁধ দিয়ে এদেশে বসবাস করতে। কিন্তু আদিবাসীদের পূর্বপুরুষেরা সুন্দরবনের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। দক্ষিণবঙ্গ সমভূমির দেশ; পলিমাটির দেশ। মাটি কাটা বেশ কঠিন কাজ। তাই মাটি কাটতে গান ধরে 'কোদালিয়া'। এ গানের জন্য কোনো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন নেই। কোদাল দিয়ে মাটি কাটার শব্দই তো মাদলের বাদ্যধ্বনি।

মাটিকাটা ওড় বড়ি বিষমরে কাম,

যেরম দাম তেমন কাম।।
খাল চাপাও ঘোতা বুজাও
তবে ঘর যাঁউ তবে পান্তা খাঁউ।
কদাইল উলটালা কি পাল টালা
ব্যাঙ রানী গীত গাহেলা,
কদাইল মাদল বাহালা।।[১৫]

মাটি কাটা বড় কষ্টের কাজ; মাটি কাটার গানগুলিতে সুন্দরবনের আঞ্চলিক জীবনযাত্রার একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।

সারুল গান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন পূর্ণেন্দু ঘোষ, তাঁর মতে, সুন্দরবনের আদিবাসী ওঁরাও সম্প্রদায়ের মধ্যে সারুল নাচ ও গান এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। সারুল নাচের রূপকর্ম একটু আলাদা। তাল ও পদবিন্যাস একটু বিলম্বিত। মাদল ও ঢোলের বাদ্যবাহযোগে গানের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ নৃত্যের ছন্দদ্যোতিত হয় সারুল নাচে। উৎসবের সময় চৈত্রের শেষ এবং বৈশাখের প্রথম। পুরানো বছর চলে যাচ্ছে। নূতন বছর আসছে। সারুল নূতন বছরের গান।[১৬]

'করম গান' সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন, নির্মলেন্দু দাস। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, "করম কাটি কাটি আখড়ায় স্থাপন করি/সবজারি দিল গো রেসমের বাতি/হায়রে করমক বাতি"।। ভাদ্রের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি অথবা ভাদ্রমাসের যেকোনো দিন করম পূজার দিন। পূজা মানেই তার সঙ্গে নাচ, আর নাচের সঙ্গে গান। পূজা শেষ হলেই শুনতে হবে করম কাহিনি। সুন্দরবনের আদিবাসী সাঁওতাল এবং ওঁরাও সম্প্রদায়ের মধ্যে করম নাচ-গান একটি আনন্দমধুর উৎসব ও নৃত্যগীত। করম গানের সময় মূলত ভাদ্রমাস। করমগানে মেয়েরা নাচবে, পুরুষেরা নাচবে আর মাদল বাজবে।[১৭]

দশই গান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন নিমাই মজুমদার। তিনি বলেছেন, 'দশই গান' আগমনী গানের অনুরূপ। এ গানের আরো নাম আছে: বাটি বাজানো গান অথবা 'টাইনী' মাগা গান। টাইনী মাগা অর্থাৎ ভিক্ষে মাগা। সাধারণত: বাটি বাজিয়ে এ গান গাওয়া হয় বলেই একে 'বাটি বাজানো' গান বলে। দশই গান এক সঙ্গে তিন চার জন মিলে গান গায়। আদিবাসীরা এই গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষের চাল সংগ্রহ করে। অনেকে একে 'মাগন' অর্থাৎ দেবতার পূজা করার জন্য ভিক্ষা বলে থাকে। গায়কদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে কাঁসার বাটি থাকে এবং এই বাটি বাজানোর জন্য একটি সরু লোহার শিক ব্যবহার করে। বাটিকে মন্ত্রপুত করতে হবে, যাতে কোন শত্রু 'বাণ মেরে' বাটি চটিয়ে না দেয়। 'দশই' কথাটির অর্থ মনে হয় বিজয়া দশমী সংক্রান্তি। তাই এই গানকে দশই বলা হয়ে থাকে।[১৮]

সুন্দরবন অঞ্চলের নানা প্রান্তে এই উৎসব হয়ে থাকে। দশই গান সম্পর্কে স্ফুলিঙ্গ পত্রিকা থেকে জানা যায়। দশই গানের উৎসবগুলি দশমী তিথির সঙ্গে যুক্ত। হিন্দু অনুষ্ঠানে 'দশকর্ম' বলে একটি কথা আছে। এগুলি হিন্দু অনুষ্ঠানে দশবিধ সংস্কার (গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নাম করণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ)। এর সঙ্গে দশই গানের কোনো সম্পর্ক নেই। 'দশই' বিজয়া দশমীর সঙ্গে যুক্ত। দশই গান সমবেত সঙ্গীত। কিন্তু সে মন্ত্রটা জানা দরকার। মন্ত্র জানে গুরুভাই অর্থাৎ 'গুনিন'। গুনিন না থাকলে অন্যপক্ষ বাটিতে 'বান' মারবে। তখন বাটি আর বাম হাতের তালুতে বসিয়ে রাখা যাবে না। গরম হয়ে উঠবে বাটি। তখনই মন্ত্র দিয়ে 'বাটি সারাই' করে নিতে হয়—

'ছিক পড়ে পদণী-
চিরণ চারণ দাঁত হো
সরগে বাঁধো ইন্দ্রচন্দ্র
পাতালে বাঁধো দেহ হো।।
(ছিক্-শিক; পদণী-বাটি)

অর্থাৎ শিক বাটির উপর পড়লো। চিরুনীর মতো ষাঁড়ের দাঁত তাদের বাঁধো, স্বর্গের ইন্দ্র চন্দ্রকে বাঁধো, পাতালের দেবতাকে বাঁধো গুরুভাই। আর এই যে গুরু, এর সাধন অপূর্ব। সাধনার দ্বারা বেতের লাঠি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং 'কেঁদরা' অর্থাৎ খারাপ বাঁশি সুন্দরভাবে বাজতে থাকে।[১৯]

সুন্দরবন অঞ্চলে একটি বহুল প্রচলিত দশই গান ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা গেছে, "এতি চিরল বেতি থার ভেল পুরিয়া হোঁ। (এতি-এই; চিরল বেঁতি-বেত; থার-দাঁড়িয়ে আছে; হনু হনু-শ ঘন ঘন)। এই চিরল অর্থাৎ সরু বেত গরুর সাধনের প্রভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেঁদারা বাঁশি গুরুর সাধন বলে ঘন ঘন বাজছে।[২০]

তবে সুন্দরবনে একশত বছরের উপর বসবাসের ফলে তারা এখানে মাটির উপযোগী নিজস্ব লোকসঙ্গীত সৃষ্টি করে নিয়েছে- যদিও কিছু গানে আমি রূপের ভগ্নাংশ এখনও টিকে রয়েছে। এমন একটি দশই গান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন পরিমল চক্রবর্তী।

"দশঞাকা ঝলমল দেবিরে দূর্গা,
মায়েক ঝলমল খেলরে খেলরে।।
ম্যায় তো দেশে দেশে যোগিয়া
ম্যায় তো যামু লঙ্গর শহর বুলে হো।
লঙ্গর শহর বুলে চেলা কিনা পাওলে?
ম্যায় তো পালু আড়োয়া চাল কাঞ্চা দুধ যোগিয়া,
ম্যায় তো পালু সিথাকে সিদুর, কিয়া ভূর ভূর সিন্দুরা।
লঙ্গ র শহর বুলে চেলা কিনা কিনা পাওলে?
আর সিন্দুর আহো সিন্দুরা রাঙ্গা মাটি সিন্দিরা।
গুরুবাবা রোপল সিন্দুরা
গুরুয়ানী মা নিদি জাগরম।
তুলশী তুলসী ভাইকে রোপল তুলসী?
গুরু রোনল তুলসী।
গুরুয়ানী মা নিদি জাগর...
গুরুকে রো আঙ্গনাই তুলসী চাওয়া
ডাল বিইসে হিলে হো!
যথন আওয়ে শুরু গুরুয়াইন,
তখন ডাল হিলে হো"।।[২১]

(দশঞাকা-দশহাতের; লঙ্গর- নগর; বুলে-বেড়াতে; কিবা-কি; পাওলে-পেলে; আড়োয়া-আতপ; কাঞ্চা-কাচা; রোপল-রোপন করল; আঙ্গনাই-আঙ্গিনা; চাওরা-চারা; কিইসে-কিসে; হিলে দুলে।)

ক্ষেত্রানুসন্ধান করে কাঠি নাচের গান সম্পর্কে জানা যায়। কাঠি নাচের গান সাধারণতঃ গাওয়া হয়ে থাকে আশ্বিন মাসে দূর্গা পূজার আগে। এক অর্থে একে 'আগমনী' গানের পর্যায়ে ফেলা যায়। কাঠি নাচ যৌথ নৃত্যকর্ম। একসঙ্গে দশবারোজন নাচতে পারে। নাচের সঙ্গে চলে বাদলের বাদ্য একজন মূল গায়েন, একজন সহকারী গায়েন আর থাকে একজন 'রংদার' তার হাতে থাকে একটি বাঁশের রেঁজা। বাঁশের 'রেঁজার' মধ্যে একটি অসমান কাঠি ঢুকিয়ে 'চরর' শব্দ করতে করতে মুখে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে দলের সঙ্গে নাচে। 'রংদার' মাঝে মাঝে নাচের ফাঁকে 'ছি হো' এই বিশেষ শব্দটি উচ্চারণ করে। নাচের দলটি অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ায়, প্রত্যেকের হাতে থাকে দুটো ছোট কাঠি। নাচের সময়ে সকলে নুয়ে ডানহাতের কাঠি দিয়ে প্রত্যেকের বাম হাতের কাঠি স্পর্শ করে; সমবেত কাঠির শব্দে পায়ের তাল নিয়মিতভাবে পড়তে থাকে।[২২]

ক্ষেত্রানুসন্ধান করে আরো জানা যায়, কাঠির শব্দের তালে তালে এক পা এগিয়ে আগে আবার এক পা পিছিয়ে যায়। এই অঞ্চলে আদিবাসীদের নিজস্ব পল্লীতে মেয়েদের এই নাচে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়, তবে খুব ব্যাপক নয়। না হলে প্রায়ই পুরুষেরা মেয়েদের সাজপোশাক পরে কাঠি নাচে অংশগ্রহণ করে। দুর্গাপুজোর আগেও সাধারণতঃ আশ্বিন মাসে গ্রামে গ্রামে একাধিক দল কাঠিনাচের নাচ নেচে ও গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে অথবা মাগন সংগ্রহ করে। ভিক্ষে সংগ্রহ ছাড়া নিজেরা আনন্দ উৎসবেও কদাচিৎ এই নাচ নাচে। কাঠি নাচের সঙ্গে কিছু গান গীত হয়। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে কাঠিনাচের যে গানগুলি পাওয়া যায় সেগুলি প্রায়ই

কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা বিষয়ক। এই গানগুলির রচয়িতা আদিবাসী পল্লী কবিরা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাবের দিক থেকে সেগুলি উচ্চ পর্যায়ের নয়।

সুন্দরবন অঞ্চলের একটি পরিচিত কাঠি নাচের গানের কথা বলেছেন সুকুমারী সাহা—

উপরে সুরুজের ছটা নীচে তাতা বালি গো
আর চলিতে না পারে কীতা করিছে বিকলি
ওকি শুন গো মরমেরে ছাই
শিশু সবে চলি সারাসারি।
রাম ধরে তরু ডাল, লক্ষণ তার শিরে গো
আর চলিতে না পারে সীতা করিছে বিকলি
ওকি শুন গো মরমের সই।[২৩]

অর্থাৎ উপরে সূর্যে প্রখর কিরণ, পায়ের তলায় তপ্ত বালি। সীতা (বনবাসে বেরিয়ে) আর চলতে পারছে না; আকুলি বিকুলি করছে। ওগো মরমের সই শোন, শিশুরা সব সারি দিয়ে চলছে। রাম গাছের ডাল ধরেছে (মাথার উপর রৌদ্র নিবারণের জন্য)। আর একটি কাঠি নাচের গানে কৃষ্ণের গোষ্ঠ লীলার কথা বলেছেন নির্মলেন্দু দাস—

"পাল জুড়ো করো ছিলাম সইন্ধা হলো মাঠেরে
তোমার লাগি বলাই দাদা দাঁড়িয়ে আছে পনে গো।
আমার কামাই লাগি সবে দাঁড়িয়ে আছে পথে গো
আরে পাল সরো করোরে ছিদাম সইন্ধা হলো মাঠেবে।।"[২৪]

তিনি আরো একটি গানের কথা বলেছেন—

আরে, আরে আনোরে পোলাসের পাত,
বাড়ায়ে ব্যঞ্জন ভাত,
শিশু সবে বৈসে সারি
ওকি শুন গো মরমের সই,
অন্নখালে জল চাই
চালনা, যমুনার চলে যাই।
(আজ) শিঙ্গায় করে আনিব জল-পানি।।
ওকি শুনবে মরমের সই, শিঙ্গায় করে আনিব জন-পানি।।"[২৫]

পলাশের পাতায় অন্ন ব্যঞ্জন বাড়ো। শিশুরা সব সারি দিয়েছে। ওগো মরমেই সই শোন, ভাত খেলে জল খেতে হয়। চল, সকলে যমুনার জলে যাই। আজ শিঙ্গায় করে জল আনতে। সাঁওরাই গান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন বৃন্দাবন মণ্ডল। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, 'সাঁওরাই' অথবা 'সাঁহরাই' কথার অর্থ 'হেমন্তকাল'। কেউ কেউ বলে কার্তিক মাস। সাঁওরাই গান তাই হেমন্তের গান। কার্তিকী অমাবস্যায় গোয়াল পুজোর গান হচ্ছে সাঁওরাই গান। গোয়াল পুজোকে কেন্দ্র করে যে গানগুলি গীত হয় তাকেই সুন্দরবনের সাঁওতালরা বলে সাঁওরাই গান। সাঁওরাই গান মূলত: গরু জাগানো গান। সাঁওরাই গানের সঙ্গে নৃত্য সংযুক্ত। সাঁওরাই গান হচ্ছে গরু নাজানো বা জাগানো গান। সুন্দরবনের 'বাঁধনা' পরব রূপান্তরিত হয়েছে গোয়াল পূজায় আর 'অহীরা গীত' পরিবর্তিত হয়েছে সাঁওরাই গানে। 'আহির' কথার অর্থ গোয়ালা; হিন্দীতে শব্দটি 'অহীর'। সুন্দরবনে সাঁওরাই গান শোনা যায় কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে; গোয়াল পূজার দিন। দক্ষিণবঙ্গে এই দিনটির বৈশিষ্ট্য তাই নানা উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য। এদিন ঘরে ঘরে তেলেভাজা পিঠে তৈরি হয়। কোনো সম্প্রদায় এই দিনে লক্ষ্মীপূজাও করে থাকে। গোয়ালপূজা অর্থাৎ গরু পূজা। সুন্দরবন অঞ্চলে বছরে দু'বার গোয়াল পূজা হয়। একবার হয় ভাদ্র মাসের 'গোমা' পূর্ণিমাতে এবং দ্বিতীয়বার পুজো হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে।[২৬]

মশা তাড়ানো গান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন পরিতোষ বারুই। তাঁর মতে, সুন্দরবনের আদিবাসীরা সাঁওরাই গানের বৈঠক শেষে মশা তাড়ানোর জন্য সকলে গোয়ালে যায়। গোয়ালে তখন মশাদের কনসার্ট শুরু হয়েছে। গরু পূজার দিন মানুষ আর গরুর মাঝে কোনো পার্থক্য রাখতে নেই। গরুকে সুখ দেওয়া জন্য তাদের পূজার ব্যবস্থা হয়। এমন দিনে তারা মশার কামড় খাবে? গোয়ালের এক কোণে যদিও সন্ধ্যা থেকে ‘সাঁজাল’ অর্থাৎ আগুনের উপর ভিজে খড়চাপিয়ে ধোঁয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। তবুও মশা কমে না। এমন দিনে মশা তাড়ানো উচিৎ। এমন একটি মশা তাড়ানো গান হল—

ধাঁরে মশা ধাঁ
গোহাল থেকে ধা

অর্থাৎ মশা গোয়াল থেকে চলে যা। শুরু হয় গান: মশা সাঁধাইলো গোহাল ঘরে
আছে সাঁজাল আছে।
মশা সাঁধাইলো তেঁতুল গাছে
আছে ধমা আছে।।[২৭]

(সাঁধাইলো ঢুকলো, সাঁজাল আগুনের উপর ভেজা খর চাপিয়ে ধোঁয়া করা, ধুমা ধোঁয়া)।

সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে মশা তাড়ানো গান সম্পর্কে জানা যায়। তিনি লিখেছেন মশা ঢুকেছে গোয়াল ঘরে কিন্তু সেখানে সাঁজাল আছে। তাই সেখান থেকে মশা ঢুকেছে তেঁতুল গাছের পাতার মধ্যে কিন্তু সেখানেও ধোঁয়া আছে। সারাক্ষণ শুধু মশা তাড়ানোর গান গায় না; অল্প সময়ের জন্য তারা কিছু হালকা রসাত্মক সুরের গানও গায়। যেমন—

কাহা যাসরে দাদা ধোতি পিধি লে।
কাঁহা যাবরে দিদি তেলাং শাড়িলে।
গোহাল তো গরু নাই ঝাটি কেনে হিলে।
পাছে দাদা কুমীর আছে।[২৮]
(পিধি-পরিধান করা; তেলাং-তৈল; ঝাটি-ঝাঁটা; হিলে-দুলে; পাছে-পিছে, পেছনে)।

অর্থাৎ কোথায় যাচ্ছ দাদা ধুতি পরে। কোথায় যাচ্ছ দিদি তেল আর শাড়ি নিয়ে? গোয়ালে তো গরু নেই তবু ঝাঁটা নড়ছে কেন? নিশ্চয় কুমীর এসেছে। এ গানটিতে সুন্দরবনের নদী তীরবর্তী গ্রামের কুমীরের উপদ্রবের কথা বলা হয়েছে। মশা তাড়ানো গান সম্পর্কে ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা যায়, একটি গানে কোনো বুড়োকে নিয়ে রসিকতা করা হয়েছে। বুড়ো হয়তো মশা তাড়ানোর দলে যেতে যেতে পিছিয়ে পড়েছে। তাই— কেউ বললো বুড়ো মরলো/কেউ বললো আছে।/শুখা পুখুরে বুড়া/ঢ়ালুক খুঁড়া খাছে।। অর্থাৎ কেউ বললো বুড়া মরেছে, কেউ বললো আছে। (দেখা গেল) বুড়ো শুকনো পুকুরে শালুক খুঁড়ে খাচ্ছে। গান গাইতে গাইতে সকলে এসে উপস্থিত হয় গ্রামের শেষপ্রান্তে কোনো তেমাথা অথবা পাঁচমাথা রাস্তার মোড়ে। এমনি করে মশা তাড়িয়ে নিয়ে উপস্থিত হয় গ্রামের শেষ সীমানায়। ‘গুণিন’ তখন রাস্তার মোড়ে কালো মুরগির ডিম পুতে দেয় অথবা মুরগির বাচ্চাকে অন্য সীমানায় ফেলে দেয়। উদ্দেশ্য এই যে মশা এবং কোনো অপদেবতা বা শয়তান তাদের পিছু পিছু আর আসতে পারবে না। মশা তাড়ানো গান পথের গান; সামগ্রিক আনন্দের গান। এ গানের মধ্যে দিয়ে জনস্বাস্থ্য চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।[২৮]

টুসু সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য পেষ করেছেন শান্তি সিংহ। তাঁর মতে, টুসুপূজাকে কেন্দ্র করেই টুসু গান। টুসু গান আদিবাসীদের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। টুসুপূজার রাতে সারারাত ধরে আদিবাসী মেয়েপুরুষ সকলে মিলেই গান করে। টুসুগান কেবল মাত্র দেবীর বন্দনা গীত নয়। দেবী টুসুকে কেন্দ্র করে স্বপ্নায়তন গানগুলির মধ্য দিয়ে সামাজিক, পারিবারিক এবং কখনো রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তাই টুসুগানকে কেবলমাত্র টুসুর মাহাত্ম্য বিষয়ক গান বলে মনে করলে ভুল হবে। আসলে টুসুপূজাকে কেন্দ্র করে একটা পারিবারিক তথা সামাজিক মজলিস বা সম্মেলন ঘটে। এই সম্মেলনে প্রথমে টুসু বিষয়ক গান গাওয়া হয় ঠিকই কিন্তু ক্রমানুসারী টুসু বন্দনা করে গায়েনদের মন সন্তুষ্ট থাকে না। স্থানীয় চাঞ্চল্যকর কাহিনির রূপ অথবা পারিবারিক জীবনের নানা সমস্যার কথা দিয়ে গাঁথা গানের ডালি টুসুকে উপহার দেওয়া হয়। তাই টুসুর বন্দনা গানে শোনা যায়—

টুসু ঠাকুর মা গ।

আলতাপরা পা গ।

সনার খিটে হেলান দিহেন (খিটে-খাটে)/রূপার খিটে পাতা।। টুসু যে ফসলের দেবী তাতে সন্দেহ কি? তার পূজার উপচার হচ্ছে কলা আর বেগুণ। কলাম দিলাম সারি সারি

বেগুণ দিলামদুবারি।।

এবার যা গো মা টুসু।

আর কিছু নাই দিতে পারি।। শুধু তাই নয়, এই টুসু মহিষ ও চরায়-হামদের টুসু মষ মহিষ চরাছে

গেঁদা ফুলের বাগানে।[২৯]

তাঁর লেখা থেকে আরো জানা যায়, টুসু আদিবাসী সমাজের প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। টুসু-ই সারা ফসল জুটিয়ে আনে। দু'মুঠো অন্ন তুলে দেয় মানুষের মুখে। যে দেবী সারা বছরের অন্ন জুটিয়ে আনে তার মতো আপনজন আর নেই। তার কাছে পরিবারের সমস্ত দুঃখের কথা বলা যেতে পারে। এমনকি, কারোর যদি দুই স্ত্রী থাকে তারা যেন সতীন কোন্দল না করে, সে আবেদনও টুসুর কাছে করা হয়। আম গাছে ডাব ঝুলেছে/টুসুর যেন লাগে না।/রতন বেটার দুটো বউ মা/ঝগড়া যেন করে না।। আবার কোনো পরিবারে সতীনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সতীনকে পান্তা ভাত খাইয়ে সান্নিপাত রোগে আক্রান্ত করে মারবার পরিকল্পনাও টুসুকে জানানো হয়েছে। আয়লো মিতিন আয়লো সতীন/খা লো সতীন পান্তা ভাত/পান্তা খাওয়াই শুখাই রাখব/ধরাইব শনিপাত।। অর্থাৎ সতীন তুমি আমার পরম মিত্র এস পান্তাভাত খাবে। তোমাকে পান্তা খাইয়ে শুকিয়ে রাখব এবং সান্নিপাত রোগ ধরাব। পারিবারিক জীবনের নানা ছবি এমনি টুসু গানের মধ্যে ধরা পড়েছে। আমাদের সমাজে গৌরীদান প্রথা আজকের নয়, কিন্তু আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এর দৃষ্টান্ত বিরল।[৩০]

ঝুমুর গান সম্পর্কে জানা যায়, লোনানী পত্রিকা থেকে। এই পত্রিকায় পরিমল চক্রবর্তী বলেছেন, সুন্দরবন অঞ্চলের আদিবাসীরা 'ঝুমুর' গানের ও নাচের ধারা বহন করে এনেছে তাদের মাতৃভূমি হতে। ঝুমুর যদিও কোনো উৎসব কেন্দ্রিক নৃত্যগীত নয় তবুও সব উৎসবে ঝুমুর গাওয়া হয় অথবা ঝুমুর নাচের অনুষ্ঠান দেখা যায়। রাঁচি, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার মতো সুন্দরবনেও ঝুমুরের প্রচলন খুব ব্যাপক। তবে অভাব অনটন সুন্দরবনের আদিবাসীদের জীবন হতে ধীরে ধীরে অতীতের ভূমিকাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ঝুমুর গানের বিষয়-বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ আদিবাসীদের সমাজ জীবনের টুকরো টুকরো চিন্তা-ভাবনা অবলম্বনে এই স্বল্পায়তনের সঙ্গীতগুলি রচিত হয়েছে। গানগুলির মুখ্য উপজীব্য প্রেম ও সামাজিক আচার বিচার। এছাড়া আছে প্রকৃতি রাজ্যের গাছ, লতাপাতা, ফুল ও নাম না জানা পাখি। কিছু কিছু গানে রাধাকৃষ্ণের লীলাও স্থান পেয়েছে। রামলীলা বিষয়ক গানও শোনা যায়।

লোনানী পত্রিকা থেকে জানা যায়, সুন্দরবন অঞ্চলের আদিবাসীরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য বর্ণ হিন্দুদের বাড়িতে কাজকর্ম করে, তাছাড়া শিক্ষার প্রসারও এদের মধ্যে ঘটেছে। এই দুই মিলে আদিবাসী সংস্কৃতিতে রাধাকৃষ্ণ লীলা ও রামলীলা বিষয়ক ঝুমুর গানের প্রচলন সম্ভব হয়েছে। এই অঞ্চলে প্রচলিত ঝুমুরের বিভাগগুলি নিম্নরূপ। (ক) দাঁড় শালিয়া ঝুমুর, (খ) নাচনী ঝুমুর অথবা নাচনী শালের ঝুমুর, (গ) খেমটা ঝুমুর)।[৩১]

ঝুমুর গান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন দেবব্রত বাগচি। তাঁর মতে—

ক. দাঁড়শালিয়া ঝুমুর : অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে নাচগান চলে 'দাঁড়শালিয়া' ঝুমুর-এ। মূলত পুরুষদের নৃত্যগীত; যদিও, নারীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। নাচের সময় প্রত্যেকে পিছন দিক থেকে পাশ্ববর্তী সঙ্গীর বাহু আকর্ষণ করে থকে। পৌরাণিক বিষয়, বিশেষ করে রামলীলা অথবা রাধাকৃষ্ণলীলা দাঁড়শালিয়ার বিষয়। গানগুলিরও দুটি স্তর। প্রথম স্তর রূপকধর্মী; বিলম্বিত লয়ে গীত হয়। দ্বিতীয় স্তর রং; দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। একটি গান—

কাঁহাসে উবজলা (তৈরি মাটিকে মিরদঙ্গিয়া (মৃদঙ্গ) গড়ল সুন্দরী? কাঁহাকে উবজলা গীহিত সব সড়লো (আরম্ভ) সুন্দরী?

বারান্দা হে উবজলা মাটিকে নিরদঙ্গিয়া গড়লো সুন্দরী।

বরগুাহে (গীতমন্দির) উজলা গীত গ ছাড়লো সুন্দরী

কোথা থেকে মৃদঙ্গ তৈরি ও কোথা থেকে গান লিখে গাইতে আরম্ভ করলে সুন্দরী ? সুন্দরী বারান্দার মাটি দিয়ে মৃদঙ্গ গড়েছে ও গীতমন্দির থেকে গান রচনা করে গাইতে আরম্ভ করেছে।

খ. নাচনী ঝুমুর : 'নাচনী ঝুমুর' রাত্তিরে বৈঠকী আসরে, বিবাহ বাসরে কিংবা পালা-পার্বণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত মহিলাকেন্দ্রিক নৃত্য-গীতানুষ্ঠান হলেও কখনো বা পুরুষ মহিলা সেজে অংশগ্রহণ করে। নাচনী ঝুমুরেরও দুটি স্তর। প্রথমটি দেববন্দনা এবং দ্বিতীয়টি নাচনীর নাচ। হাঁড়িয়া উন্মত্ত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী মাদল-বাঁশির তালে-তালে নাচনী ঝুমুরের আদিরসাত্মক গানের সঙ্গে দেহভঙ্গি ও মুদ্রার নিগূঢ়ার্থ উপভোগ করে। একটি গান—

পেরথমে বন্দনা করি দেবী সরস্বতী/তাঁহার পদযুগলেতে জানাই প্রণতি।
তারপরে বন্দনা করি গুরুদেবের পায়ে/মাতাপিতা পরমগুরু রাখিব মাথায়।
বৃথাকুঞ্জ সাজালাম/রাত্তির বসে জাগিলাম/কোথা রইল কার সনে/
না আইল মনচোর/প্রেমবিষে অঙ্গজ্বর/প্রিয় মোর না আইল কাছে।। এমন মধুরাতে প্রিয় গো/মোর না আইল কাছে।।
শিমুল ফুল লালে খানিক/পুরুষ মন শঙ্খবণিক/এজীন রাখবে। কী বলে।। যদি
আসে কালো সোনা/সহইরে তাসের করিস মানা/খুঁজতে বলিস যমুনার জলে।।

গ. খেমটা ঝুমুর : 'খেমটা' অর্থে সংগীতে তাল; সংগীতে তাল; যদিও সুন্দরবনে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ঝুমুরের খেমটানাচ আদিবাসীদের নৃত্যগীত। নর্তকীগণ মূলত স্ত্রী হলেও পুরুষেরা মেয়েদের পোশাক পরে নাচে। গোটা আসর জুড়ে নর্তকীরা ঘুরে ঘুরে নাচে-গায়; আর মাদল-ধামসা-বাঁশি বাজে। হাঁড়িয়ার সহাবস্থান আবশ্যিক। চটুল নৃত্যের বিচিত্র মুদ্রায় শ্রোতারা উপচে পড়ে; মত্ততায় বাহারি চিৎকার ছুঁড়ে দেয় 'ঘুরে-ফিরে'। একটি গান—

শুকনো কাঠিতে ফুল ফুলিল/কেমনে তুলিব ডামিল লো/ও ডামিল তো নিলে না।।
ওই কতরঙ্গের ফোটা ফুল/লিবে কোন ফুল গো।/এই যৌবনের বাগানে
ফুল/তুলিতে ছরম লাগে গো?/ও ডালিম তো নিলে না।।
উথালি পাথালি সাঁঝের বন/কালো ভ্রমর উড়ছে ফিরছে করছে গুনগুন।
ও ডালিম তো নিলেম।।[৩২]

বাংলার লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ লোকগান। সুন্দরবনের জনজীবন থেকে নীরবে নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা করায়ত্ত জীবনে লোকসংস্কৃতির এই ধারাটিও লুপ্ত হয়ে যাবে। বর্তমান প্রসঙ্গে, বিপুল ও বিচিত্র গানের পসরা থেকে কয়েকটি মাত্র নমুনা পরিবেশিত হয়েছে। এই লোকগীতি শুধু গীতি নয়, এর মধ্যে আছে সুন্দরবনের জীবনের চিত্রকল্প। সে চিত্রকল্প স্পষ্ট উজ্জ্বল, তাতে আছে ভৌগোলিক বিবরণ, আছে তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস, মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রয়োজনের কথা। সুন্দরবনের সাধারণ মানুষদের জীবনের চিত্রানুগ বিবরণ এইসব লোকসঙ্গীতে স্পষ্টত প্রতীয়মান।

তথ্যসূত্র :

১. দাস, নির্মলেন্দু; সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫-৪৭
২. চট্টোপাধ্যায়, তুষার; সাক্ষাৎকার, ২৫/৪/২০০০, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ; বাংলার লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, অমর্ত্য প্রকাশন, ১৩৯২ ব., পৃ. ৫৬-৬৪
৪. পূর্বোক্ত
৫. দাস, অরুন কুমার; সুন্দর সুন্দরবন, কলকাতা, বাণী প্রকাশনী, ১৪০৯ ব., পৃ. ৯৬-১০৩
৬. দাস, নিমলেন্দু; পূর্বোক্ত
৭. দাস, সুবর্ণ; বাদাবনের বনবিবি, কিশোর কল্লোল পত্রিকা, শারদীয়া, ১৯৯৯
৮. মিত্র, সনৎ (সম্পা); বাঘ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮০, পৃ. ৩৮
৯. মৈত্র, বিমলকৃষ্ণ; সাক্ষাৎকার, ১০/০৬/২০২২
১০. বসু, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ; বাংলার লৌকিক দেবতা, কলকাত, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৬, পৃ. ১৫৩, ১৬৯, ২০১
১১. পূর্বোক্ত
১২. পূর্বোক্ত

১৩. পূর্বোক্ত
১৪. দাস, নির্মলেন্দু; মাটি কাটার গান, সুন্দরবন, শারদ সংখ্যা, ১৩৮১ ব
১৫. পূর্বোক্ত
১৬. ঘোষ, পূর্ণেন্দু; গাঙের সুর, স্বর ও মাঝিমাল্লা, আদিগঙ্গা, ২, বিশেষ দঃ ২৪ পরগণা সংখ্যা, ১৯৯৭
১৭. দাস, নির্মলেন্দু; সারুল গান, সুন্দরবন, শারদ সংখ্যা, ১৩৮১ ব
১৮. মজুমদার, নিমাই; সাক্ষাৎকার, ১২/০৬/২০২২
১৯. দাস, নির্মলেন্দু; দশই গান, স্ফুলিঙ্গ পত্রিকা, ২, শারদীয়া, ১৩৮৪ ব
২০. ক্ষেত্রানুসন্ধান (হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, গোসাবা); তাং- ১৪/০৬/২০২২, ১৬/০৬/২০২২ – ১৮/০৬/২০২২
২১. চক্রবর্তী, পরিমল; সুন্দরবনের লোকসঙ্গীত, লোনানী, ১, ২; ২০০২, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর
২২. ক্ষেত্রানুসন্ধান (বাসন্তী, সন্দেশখালি); তাং- ২০/০৬/২০২২ – ২৪/০৬/২০২২
২৩. সাহা, সুকুমারী; সাক্ষাৎকার, ২৬/০৬/২০২২
২৪. দাস, নির্মলেন্দু; পূর্বোক্ত
২৫. পূর্বোক্ত
২৬. মণ্ডল, বৃন্দাবন; সাক্ষাৎকার, ২৮/০৬/২০২২
২৭. বারুই, পরিতোষ; সাক্ষাৎকার, ২৯/০৬/২০২২
২৮. ক্ষেত্রানুসন্ধান (ক্যানিং, কুলতলি); তাং- ৩০/০৬/২০২২, ১/০৭/২০২২
২৯. সিং, শান্তি; টুসু, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৪০৫ ব., পৃ. ৮৫-১০০
৩০. পূর্বোক্ত
৩১. চক্রবর্তী, পরিমল; পূর্বোক্ত
৩২. বাগচি, দেবব্রত; সাক্ষাৎকার, ২/০৭/২০২২

....

বিনতা রায়চৌধুরী রচিত ছোটোগল্প : বার্ধক্য জীবনের সংকট ও মধ্যবিত্ত নারীজীবনের আত্ম সংকটের প্রেক্ষিতে

অভিজিৎ দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপে :

আলোচ্য প্রবন্ধটি বিনতা রায়চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে রচিত । বিশ্বায়নের প্রভাবে কর্পোরেট জগতের রমরমা বেড়েছে, নারীরাও কর্ম ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করছে । অপরদিকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক মূল্যবোধেরও অবক্ষয় ঘটেছে। ফ্ল্যাট কালচারের প্রবণতা বেড়েছে।পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দূরত্বও বেড়েছে । সমাজের এমনই ঘটনা প্রবাহ নিয়ে বিনতা রায়চৌধুরীর গল্পগুলি রচিত হয়েছে । সমগ্র প্রবন্ধ জুড়ে গল্পের চরিত্র গুলির মনস্তাত্ত্বিক দিক এবং নীতিবোধের বিসর্জন দিয়ে কীভাবে বৃদ্ধ প্রিয়জনদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তার বিবরণ যেমন আছে, তেমনই আছে মধ্যবিত্ত নারী জীবনের আত্মকথা ও মাতৃত্বের সংকটের কথা।সাধারণ ঘরের নারী ন্যূনতম সুখের আশায় যাবতীয় কষ্ট সহ্য করে নিচ্ছে এবং শত সংকটের মাঝেও মাতৃসত্তার জয়গান ধ্বনিত হচ্ছে তা দৃষ্টান্ত সহকারে প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।

মূলশব্দ :

মধ্যবিত্ত নারী, নারীর আত্মসংকট , বার্ধক্য জীবন ও সংকট, বিশ্বায়ন, নিউক্লিয়াস পরিবার, ফ্ল্যাট কালচার, বৃদ্ধাশ্রম

মূল আলোচনা :

সংসার কর্মের স্থান হলেও ব্যক্তি মানুষের কোন স্থান নেই। একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শৈশব- কৈশোর-যৌবন এবং শেষে বার্ধক্যের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। সংসার এমন একটি অধ্যায় যেখানে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বেদনা-আনন্দ সমস্ত অনুভূতিগুলি একসঙ্গে অনুভব করার সুযোগ মেলে। কোন মানুষই একা বাঁচতে পারে না। জন্মের আদি লগ্নে যখন মানুষ বনে বসবাস করত, তা প্রাচীন ইতিহাস দেখলেও জানা যায় । মানুষ হল গোষ্ঠীবদ্ধ জীব একসঙ্গে খাদ্যের অন্বেষণ, একসঙ্গে বাসস্থান নির্মাণ করে বসবাস করত। এখন সময় বদলেছে, এই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই চলেছে , তারপরেও সংঘবদ্ধ জীবনের শেষ সম্বল হিসেবে নিউক্লিয়াস পরিবার গুলি টিকে আছে।

বর্তমান নিউক্লিয়াস পরিবার গুলির মধ্যে অবহেলিত, নিপীড়িত বৃদ্ধ - বৃদ্ধাদের নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হল স্মৃতি । সারা জীবন ধরে পুঞ্জিভূত হওয়া স্মৃতিগুলি আঁকড়ে বাঁচতে চায় বৃদ্ধরা । চেনা জগত অর্থাৎ নিজ বাসস্থান যেখানে তার জন্ম, শৈশব কেটেছে, জীবন-জীবিকা,সন্তান লালন পালন সহ আরো বিচিত্র মুহূর্ত গুলি অতিবাহিত করেছে, এই শেষ সম্বল ভিটে-বাড়িটুকু নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে হয় বার্ধক্য বয়সে । স্মৃতি গুলিকে আঁকড়ে ধরে যে বাড়িতে নিজের মতো করে থাকা যায় ক্ষেত্র বিশেষ শেষ সম্বল টুকুও প্রিয়জনেরা ছিনিয়ে নেয় । এই বাস্তব ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে বিনতা রায়চৌধুরী একাধিক ছোটোগল্প লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে 'চেনা ছবির ভিতরে' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই গল্পে বার্ধক্য জীবনের বিভিন্ন সমস্যার চিত্র উঠে এসেছে। চার অধ্যায়ে বিভক্ত এই গল্পটি সূচনা হয়েছে এভাবে- "লাল চকচকে সিঁড়ি। তার পিছনে লাল চাতাল । সেটাও অমন চকচকে। দুর্দান্ত পালিশ হয়েছিল। তুরি মেরে মোজাইক মেঝেকে হারিয়ে দিতে পারে । সূর্যশেখর তাই চেয়েছিলেন । নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মোজাইকের বদলে লাল মেঝে লাল সিড়ি করিয়েছিলেন" [১] এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় সূর্যশেখরের বাড়ির প্রতি কতটা ভালোবাসা রয়েছে এবং কতটা যত্নে বাড়িটাকে গড়ে তুলেছে । বাড়িটির সঙ্গে অনুভূতি জড়িয়ে রয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যৌবনের ফুলের রূপ এক রকম মনে হয়, বয়স হলে অন্যরকম মনে হয় । সূর্যশেখরের স্ত্রী কবিতা হঠাৎ একদিন ছাদে এসে মনে করিয়ে দেয় বাবলুর প্রস্তাবটার কথা । বাবলুর প্রস্তাব ছিলো বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাট বানাবে । প্রস্তাবের কথা বলতেই সূর্যশেখর তা গুরুত্ব না দিয়ে ছাদে জলের রিজার্ভারটা বানানোর সময়ের স্মৃতি মনে করে এবং কবিতার সঙ্গে একটি দীর্ঘ আলোচনা হয় । সূর্যশেখর আরো বলেছে "এ বাড়ি তো শুধু একটা বাড়ি নয়, এর পেছনে রয়েছে

একশোটা গল্প"।[২] বাবার প্রিয় বাড়িটিই বাবলু ভেঙে ফেলতে তৎপর পিতার শত কষ্ট হলেও সন্তানের সুখের জন্য সই করতে রাজি হয়ে যায় । একদিকে বাবা-মা সন্তানের সুখের কামনা করছে অন্যদিকে পুত্র এবং পুত্রবধূর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে নিকৃষ্ট মানসিকতার রূপ , "যতদিন না প্রোমোটার ফ্ল্যাটটা হ্যান্ডওভার করছে, সে কটা দিনই তো বাবা-মাকে বৃদ্ধাবাসে থাকতে হবে । তারপর তো নিয়ে আসবো বলেছি"।[৩] এ প্রসঙ্গে পুত্রবধূ নিজস্ব যুক্তি খাড়া করে বলে হয়তো বৃদ্ধাবাসে ওদের এমন মন লেগে যাবে যে, আর আসতেই চাইবে না সমবয়সীদের পেয়ে । এই কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্তমান সমাজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় আধুনিক সমাজের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে, স্ট্যাটাস মেন্টেন করতে গিয়ে বাড়িতে মা-বাবাকে সময় দেওয়া এবং বাবা মায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার গুরুত্ব দিতে ভুলে গেছে । গল্পে সূর্যশেখর একটি সময়োপযোগী বার্তা দিয়েছেন, বলেছেন -"জানো না, স্নেহ নিম্নগামী । শিক্ষাও একদিক থেকে নিম্নগামী । উত্তরসূরিকে ঠিকঠাক শিক্ষা দেওয়াও পূর্বসূরীর কর্তব্য"।[৪] এখান থেকেই যেন অসহায়তা কাটিয়ে উঠে প্রতিবাদের সুর শোনা যায় সূর্যশেখরের মুখে । এদিকে বাবলু নিজে বারাসাতের বৃদ্ধাবাস সুখনীড়ের সঙ্গে কথা বলে এসেছে । এবং বাবাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে বাবার সই বাকি, বাবা সই করলেই ফ্ল্যাট তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে। বাবলু বাবার মত পরিবর্তনের কথা বুঝতে পারে না, বাবলুকে শিক্ষা দিতে চেয়ে বাবলুরই ঘর সূর্যশেখর প্রিয়ব্রতকে দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়েছে, এটি একপ্রকার সূর্যশেখরের প্রতিবাদী ভাবনা । সূর্যশেখর শুধুমাত্র পরিস্থিতির শিকার না হয়ে, নিজের মনের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে, নিজের মতামত ব্যক্ত করেছে এবং নিজের বাড়িকেই বানিয়ে তুলেছে বৃদ্ধাবাস । এই গল্পে লক্ষ্যনীয় ফ্ল্যাট কালচারের কারণে পিতা পুত্রের সম্পর্কে কিভাবে ফাটল ধরছে, আর পুত্র ও পুত্রবধূ বৃদ্ধ বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়ার যে কুচিন্তা করছে তার ভয়ঙ্কর দিক গল্পে ফুটে উঠেছে ।

'আকাশ অন্ধকার' গল্পে দেখা যায় এক মায়ের চরম দুর্দশার ছবি । ছেলে পিনাকি বিয়ে করে বাইরে চাকরি নিয়ে চলে গেছে অনেক দিনই । পিনাকির মা ভারতী, পিতা বিদ্যাচরণ । বিদ্যাচরণ নিজের ছেলে সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং সবকিছুই বোঝে সে । বিদ্যাচরণ ভারতীকে বলেছে, "তোমার পিনাকি বড় হয়েছে ঠিকই কিন্তু মানুষ হয়েছে কিনা কে জানে"।[৫] ছেলে কর্মসূত্রে আমেরিকায় থাকে। মাতা- পিতার সেই কবে পাসপোর্ট করিয়ে রেখেছে, আশা করে ছেলে একবার ডাকলেই তারা আমেরিকায় ঘুরে আসবে । এ তো শুধু আশা মাত্র, বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই । পুত্র ও পুত্রবধূর আন্তরিকতা বিহীন কয়েকটি মিষ্টি কথা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় কর্তা-গিন্নীকে। পিতার মনে যদিওবা অভিমানের একটুখানি মেঘ দেখা যায়, মাতার মনে কোন ক্ষোভ নেই, তার আকাশ পরিষ্কার , কোথাও একটুও অন্ধকার নেই । হঠাৎই বিদ্যাচরণ চলে গেল । তারপর থেকে এই গোটা ঘরে একাকিত্বে ভুগতে থাকে ভারতী । নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে সর্বসময় সে স্মৃতিচারণা করে এবং বিদ্যাচরণের কথাই মনে করে। সব কাজ মিটে যাওয়ার বহুদিন পর এলো পিনাকি। মুখাগ্নি করতে পারেনি বাবার, এই শোক ভারতীর বুকে গাঁথা হয়ে রইল চিরজীবনের জন্য । বারবার ভারতী বলতে থাকে, তোর বাবা থাকলে তুই একবার এলি না কেন? এলে তোর বাবা খুব খুশি হতেন, টানা তিন বছর তোকে একবারও চোখের দেখা দেখতে পাইনি, পুরুষ মানুষ মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু ছেলের জন্য তার মন কাঁদতো । এমন শোকের দিনেও বৌমা ও নাতি টুকাই আসতে পারেনি । কটা দিন পিনাকিকে নিয়ে মোটামুটি কেটে গেল ঠিকই কিন্তু পিনাকি এবার চলে যাবে আমেরিকা । এবার তো শুধু শূন্যতাই আর শূন্যতা । মাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে ছেলে পিনাকি ভালো খদ্দের দেখে বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করে ফেলেছে । মায়ের কাছে যত্ন করে সই করিয়ে নিয়েছে। কত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছে পিনাকি মাকে। ভারতী মনে মনে ভাবতে থাকে তার পিতা যদি বেঁচে থাকতো এবং এ দৃশ্য দেখতে কত খুশি হত । তার মনে যত অভিমান ছিল সব অভিমান ধুয়ে মুছে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেত । ছেলে ফ্লাইটের টিকিট কেটে মাকে বিদেশে নিয়ে যেতে চায় । সকালে ফ্লাইট । এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পর পিনাকি মাকে বসিয়ে রেখে আসছি বলে অনেকক্ষণই তার পাত্তা নেই । সময় গড়াতেই বারবার মা বলতে লাগলো, ছেলেকে খুঁজে এনে দেওয়ার জন্য,এক অফিসার বাড়ি কোথায় জানতে চাওয়ায় ভারতী কিছুই বলতে পারল না । শুধু বলল "আমার তো আর বাড়ি নেই"।[৬] ছেলের নাম জানতে চাওয়ায় নাম বললো এবং অনেক তদন্তের পর জানা গেল ছেলে মাকে এয়ারপোর্টে বসিয়ে রেখে সকালের ফ্লাইটেই আমেরিকা ফিরে গেছে । এ কথা ভারতীর বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না, কিন্তু এটাই সত্যি । ভারতী যখন বুঝতে পারল তখন তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল । চোখের সামনে আকাশটা অন্ধকার হয়ে গেল । মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে । আকাশ অন্ধকার দেখা সত্ত্বেও পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে পুত্রের মঙ্গল কামনাই করছে । তার নিজের যে অবস্থান, তার নিজের অসহায়তা সে একবারও ভেবে দেখলো না । সর্বত্রই সে মনে করল এটা ভুল হচ্ছে, এটা ভুল হচ্ছে, এটা হতে পারে না । এখানে এক বৃদ্ধ মায়ের দুর্দশার চরম রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তার

অসহায়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার ছবি স্পষ্ট । এই ভাবেই বৃদ্ধা-বৃদ্ধরা আজও ঠকছে । এমন ঘটনা মানবিকতার চূড়ান্ত অবক্ষয় এবং সামাজিক ব্যাধি । এছাড়াও 'অপচয় ' 'শুভশ্রী' 'শেষ পারিজাত' প্রভৃতি গল্প গুলিতেও পরিবারের কনিষ্ঠ আপনজনেরা মূল্যবোধের বিসর্জন দিয়ে পূর্বসূরিদের অপমান করেই চলেছে । নির্ভেজাল বিবরণের মাধ্যমে পাঠক সমাজকে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন যেমন করেছেন তেমন গল্পের চরিত্র গুলির মাধ্যমে প্রতিবাদী ভাবনার উদয় ঘটিয়ে সমাধানের পথও দেখিয়েছেন ।

কালগত অভিজ্ঞানের দিক থেকে উনিশ শতকীয় ছোটোগল্প প্রধানত বাস্তবতা ও প্রকৃতিবাদের যুগ্ম তরঙ্গের রূপ । মননের আবর্তন-বিবর্তন ঘটতে থাকে পাশ্চাত্য নবজাগরণের সংস্পর্শে । একদিকে রাবীন্দ্রিক দর্শনের ঐতিহ্য পাঠকের মনে দাগ কাটতে থাকে অন্যদিকে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য বিরোধী জীবনবোধ যা প্রকৃতিবাদী চেতনা । চিন্তনের ধ্যান-ধারণার প্রবল ধাক্কা প্রাচীন মূল্যবোধকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো । বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পের বিকাশের ধারায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।বিশেষত বাংলা ছোটোগল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে সামাজিক পরিসরে মধ্যবিত্ত নারীর আত্মিক সংকটের কথা । এই আত্মিক সংকট তৈরি হয় বৈষম্যের কারণে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দমন পীড়নের কারণে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারনে । আমাদের পরিবার পরিকাঠামোগুলো নারীর আত্মিক সংকটের কারণ হিসেবে অনেকাংশে দায়ী এ প্রসঙ্গে মল্লিকা সেনগুপ্তের ব্যক্তি জীবনের একটি উপলব্ধির কথা বলা যেতে পারে। মল্লিকা সেনগুপ্ত বলছেন "আয়া কাম রাঁধুনি না আসায় যে দুটি অনিবার্য কাজে আমি জড়িয়ে পড়লাম -শিশু ও রান্নাঘর- এই দুই কারণেই তাবৎ মেয়েরা পিছিয়ে আছে । এই দুই পিছুটান সামলানোর দায় শুধুমাত্র মেয়েদের এরকম একটা ধারণা বহুদিন ধরে গড়ে তোলা হয়েছে । যদিও জৈবিক বা প্রাকৃতিক কোন অনিবার্য ভিত্তি নেই এর পিছনে"।[৭]

'জ্যোৎস্না রঙের মুখ' গল্পটির মধ্যে দুটি দিক দেখা যায় । এক নারীর সুখ অপর নারী মেনে নিতে পারছে না, আরেকটি দিকে একটি নারী কিভাবে নিজের মনে মনে গড়ে তোলা সুখের সংসারের ছবি অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে থাকে তার দিক । নারীর জীবনে কাঙ্খিত সাংসারিক সুখ না পাওয়া ও যে স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে সেই স্বপ্নকে স্মিতা ব্যক্ত করেছে গল্পে ।আসলে স্মিতার বিবাহ অনেকবার ঠিক করার প্রচেষ্টা করা হলেও স্মিতাকে বিষকন্যা রূপে বদনাম রটায়, বিয়ে হয়নি, বারবারই বিয়ে ভেঙে গিয়েছে । ফলে স্মিতা যে স্বপ্ন তার মনের মধ্যে লালন করেছিল সে স্বপ্নের মধ্যে যেন সুখী সংসারের ছবি স্পষ্ট দেখতে পায় এবং প্রত্যেকের কাছে ব্যক্ত করে । পুরোনো বান্ধবী তমন্নার সঙ্গে দেখা হলে সে তার মনগড়া সংসারের কথা ব্যক্ত করতে থাকে । এবং স্মিতার এই সুখী জীবন সে মেনে নিতে পারেনি এবং ইচ্ছে হয় স্মিতার সংসার একবার দেখে যাওয়ার । পরবর্তীকালে বাড়িতে আসে তখন স্মিতার বাবা-মার কাছ থেকে সমস্ত সত্য জানতে পারে যে, আসলে স্মিতার বিবাহই হয়নি । তখন আর মানবিক বোধের উদয় হয়। তমন্না বলে সে এখানে এসেছিলাম সেটা স্মিতা কে বলার দরকার নেই । সে মনে মনে এটাই ভাবতে থাকে, অন্তত কোন একটা জায়গায় স্মিতার যত্নে অঙ্কন করা সুখী মানচিত্রখানা রঙিন হয়েই থাকুক । সে স্মিতাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল । এক প্রকার বলতে গেলে পালিয়ে গিয়েছিল, যাতে স্মিতার মনে মনে গড়ে তোলা সংসার, যা কোনদিনই হয়নি এবং সম্ভবত হওয়ার নয়, সেই সংসারের যে সুখের ছবি সবার কাছে ব্যক্ত করেছে, সে সংসার যেন ভেঙে না যায় । একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ের কাছে কাঙ্খিত সংসারে রূপ কেমন হতে পারে গল্পে সেই দিকটি যেমন আছে তেমনি স্মিতার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও নিজের অস্তিত্বের সংশয় গল্পে ফুটে উঠেছে ।

'কালো রাজকন্যা' গল্পে নারীর অস্তিত্ব সংকট ও নারীর আত্ম সম্মান হানির কথা উঠে এসেছে । গুণের কথা বাদ দিয়ে রূপাসক্তির ফলে কিভাবে বাবার কাছে রাজকন্যার মতো করে মানুষ হওয়া একটি মেয়ে, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অবহেলিত হয়, মানসিকভাবে অসহায় বোধ করে সে কথায় উঠে এসেছে এ গল্পে । সুবলের একমাত্র মেয়ে কালিশ্রী রাজকন্যায় বটে। তাকে সকলেই কালো হিসেবেই দেখে কিন্তু সুবল শুধুমাত্র মেয়ের শ্রী টুকুই দেখে । মেয়ে কালো বলে মেয়ের জন্য একাধিক চেষ্টা করার পরও পাত্র জোগাড় করতে পারছে না । শেষমেষ অনেক কষ্ট করে সুবল পাত্র জোগাড় করল, পাত্রের নাম বিপুল। কাগজ কলে কাজ কারে, বিবাহ করেছে বিপুল শুধুমাত্র টাকার জন্য আর কিছুই নয় । বিপুলের দাদা শহরে থেকে চাকরি করে, তার বৌদি এখানেই থাকে। বিপুলের সাথে বৌদির প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়, একথা জানায় পর কালী দিশেহারা হয়ে যায় । ফলে কালীর তখন আর অসহায়তার অন্ত নেই । কালীর সঙ্গে করে নিয়ে আসা ধন-সম্পত্তি ও যৌতুকেই এই বাড়ির সম্পদ বৃদ্ধি, শ্রীবিদ্ধ হয়েছে। "পণের গায়ে কালো রং লেগে নেই কিন্তু বউ এর গায়ে লেগে আছে কালী রং"।[৮] সুবলের রাজকন্যা এই সংসারের নিয়ম বুঝে গেছে। ফর্সা বউ সোহাগী হয়ে ঘুরে বেড়াবে । কালো বউ খালি পেটে দিনভর গতর খাটবে, তার কদর কেউ করবে না ।স্বামী সারা রাত্রি বৌদির ঘরে রাত কাটাবে । শুধুমাত্র টাকার লোভে বিয়ে

করে আনা নববধূকে দিনরাত্রি খাটানো এবং শুধুমাত্র একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। স্ত্রীলোকের মনের অনুভূতির কোন কদর নেই। এ যেন প্রতিটি মধ্যবিত্ত পরিবারের নিত্যদিনের ঘটনা। এ এক ব্যাধি, এ ব্যাধি থেকে নিস্তার পাওয়া হয়তো এত দ্রুত মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের সম্ভব নয়, কিন্তু প্রতিবাদের সুর আরো উচ্চতর করতে হবে। সংকীর্ণ মানসিকতার গণ্ডি ভাঙার জন্য আঘাত আনতে হবে। এই গল্প প্রসঙ্গে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'আমি মাধবী' গল্পের মাধবী চরিত্রের সঙ্গে কিছু মিল পাওয়া যায়।মাধবী প্রকৃতই রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও সুবলের কালিশ্রী মেয়ের সঙ্গে খুব একটা তফাৎ থাকে না তাই মাধবী আক্ষেপ করে বলেছে "মেয়েদের আলাদা কোন সত্তানেই, রাজকন্যায় হই, আর যাই হই"।[৯]

'এক গৃহবধূর চিঠি' গল্পে ব্যঙ্গর সুর শোনা যায়, গল্পটি পত্র আকারে রচিত। বন্দনা নামের এক গৃহবধূ তার বৌদিকে চিঠি লিখেছে। সে বলেছে, আমার উপরে খুব রাগ করেছো জানি ভাবছো মেয়েটা বিয়ের আগে বৌদি বৌদি করে পাশে ঘুরতো, সে মেয়েটা আমায় কিভাবে ভুলে গেল। একটুও ভুলিনি বরং তোমাদের কথা আরও বেশি করে মনে পড়ে। তুমি বলতে বিয়ের পর বুঝবে সংসার কি জিনিস। সত্যি বুঝেছি, খুব ভালো করে বুঝেছি। সংসারের যাবতীয় অসুবিধা গুলিকে বন্দনা সুবিধা করে নিয়েছে। এবং নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে। বৌদিকে লেখা চিঠিতে মূলত এই অসুবিধেগুলির কথা ব ব্যাঙ্গের সুরে বলেছে। এ কথাও রয়েছে "আমার স্বামী বউয়ের চাকরি করা পছন্দ করেনা"।[১০] বউয়ের তো সবকিছুই খাওয়া পড়া জুগিয়ে দেয় তাহলে আবার বউয়ের চাকরি করা কিসের। আবার তার স্বামী নাকি সব সময় তাকে লুকিয়ে টাকা গোনে। কিন্তু তাকে ভালবাসে। আবার বলেছে শুনলে খুশি হবে সংসারের সব গুরুত্ব তাকে ঘিরে, তার ঠিক ভুল ধরার জন্য প্রত্যেকে সচেতন। সংসারের সব দায়িত্ব তার ওপরে, শাশুড়ির মন যে কত উদার, ভাবতেই পারবে না। সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর তুলে দেওয়া হলো। সারাদিন কাজ করতে করতে নিজের কথা ভাবার সময় থাকে না এতটাই ব্যস্ত সে। পুরুষতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোই নারীদের অবস্থান এবং নারীর সম্পর্কে একটি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ভাবনা কীরকম সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তাদের কতটুকু স্বাধীনতা রয়েছে সে বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে তুলে এনেছে এক গৃহবধূ চিঠির মধ্যে দিয়ে। শেষে আবারও বলেছে খুব ভালো আছি আমি। সংসারের মধ্যমণি হয়ে আছি। আর নিয়মিত রাতে স্বামী সোহাগ সুখে আছি, স্বামী আমাকে সত্যিই বড় ভালবাসে।

'সেল্ফ প্রোট্রেট'গল্পে দেখা যায় একটি গৃহবধূকে তার স্বামী কিভাবে জোরপূর্বক ছবি আঁকতে বাধ্য করেছে। কখনো আবার নিজের মর্জি মতো ছবি আঁকতে মানা করেছে। স্বামীটি স্কলার স্টুডেন্ট। ভালো চাকরি করে। কিন্তু এই রকম শিক্ষিত সমাজের মানুষের কাছেও মেয়েরা এখনো শুধুমাত্র ভোগ্যবস্তু। ফাইফর্মাস খাটানোর মানসিকতাতেই আবদ্ধ থেকে গেছে। মেয়েদের আত্মসম্মান বলে কোন কিছু আছে সেটা মনে করতে পারে না। অনেক কিছু করতে চাই কিন্তু তাকে কিছুই করতে দেওয়া হয় না। সে সাহিত্য ভালোবাসে, সে পড়াতে ভালবাসে কিন্তু তাকে কিছুই করতে দেওয়া হয় না। স্বামীর অফিসের বস একদিন ডিনারে এসে একটি পোট্রেট দেখে বলে, যে তার স্ত্রী যদি দয়া করে তার মায়ের একটি পোর্ট্রেট এঁকে দেয়। ফলে স্বামী জোর করে চাপ দেয় স্ত্রীকে তার বসের মায়ের একটি ছবি এঁকে দেওয়ার জন্য তাদের বাড়িতে গিয়ে। স্ত্রী লোকটি মানা করলেও তাকে জোর করা হয় কেননা এখানে স্বামীর স্বার্থ জড়িয়ে আছে। তার প্রমোশনের দরকার অর্থাৎ বসকে চটালে হবে না। এভাবেই স্বামীর কথামতো সে যেতে রাজি হয় হঠাৎই বেশ কিছু ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে সে উপলব্ধি করে এভাবে মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিক্ষেত্রে সে শুধুমাত্র স্বামীর মন মতো চলতে পারে না।স্ত্রী উপলব্ধি করে যে তার প্রতিবাদ করা উচিত। তাই সে অর্ধেক তৈরি করা পোর্ট্রেটটি ফেলে চলে আসে এবং জানিয়ে দেয় যে এটা সে কমপ্লিট করতে পারবে না। এই নিয়ে অশান্তি দেখা দিলেও, সে তার স্বামীকে জানায় আগে সেল্ফ প্রোট্রেট বানানো উচিত, তারপরই এই পোর্ট্রেটের কথা সে ভেবে দেখবে। স্ত্রীলোকের ট্যালেন্ট কে নির্দ্বিধায় নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে তার নিজেরই স্বামী। নিজের স্ত্রীর মানসিক অবস্থার কথা না ভেবে প্রতিক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করা হয়েছে, আঘাতে আঘাতে স্ত্রী নিজেকে শানিয়ে তুলেছে,তাই সে বলেছে, "প্রত্যেকেরই উচিত একখানা আত্ম প্রতিকৃতি তৈরি করা মনের ক্যানভাসে। নিজেকে একটু জানতে চিনতে হয়"।[১১]

'কস্তুরী' গল্পে দুই বান্ধবীর মধ্যে মাতৃত্বের সংকট দেখা যায়। রাই ও মনীষা দুই ছোটোবেলার বান্ধবী। রাই ও মনীষার বিবাহের পর হঠাৎ তাদের দেখা হয়। মনীষার একটি মেয়ে রয়েছে এবং তার অভাবের সংসার হলেও সুখের সংসার। এদিকে রাই এর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হলেও রাই ও জিষ্ণুর সংসারে মানসিক সুখ নেই। জিষ্ণু একটি সন্তান চাইলেও রাই নিজের শরীর নষ্ট হওয়ার কারণে সন্তান নিতে চায় না। পরে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, মনীষার বাড়িতে গিয়ে মনীষার কন্যাকে দেখে হঠাৎই

রায়ের মা হওয়ার স্বপ্ন জাগে এবং সে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল মনীষাকে টাকা দিয়ে হায়ার করতে চাই সারোগেট মাদার হিসেবে। অনেক টাকার বিনিময়ে এই প্রস্তাবে রাজি হলেও পরে দেখা যায়, কোনোভাবেই মনীষা পুত্র সন্তানকে হাতছাড়া করতে চায় না। যতই হোক এই শিশুটিকে মনীষা জন্ম দিয়েছে। পুত্র স্নেহ বসত তার মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। যাকে সে এতদিন নিজের গর্ভে পালন করেছে তাকে ছেড়ে থাকবে কি করে। এই নিয়ে রাই ও মনীষার মনোমালিন্য তৈরি হয়। রাই অপমান করে মনীষাকে। আশা নিয়ে বসে থাকে সদ্যজাত শিশুটির বাড়িতে আগমনের জন্য। রাই -এর স্বামী বারবার করে এসে মনীষাকে বলা সত্ত্বেও মনীষা বাচ্চাটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল এবং ওর চোখের জলে নিষ্পাপ শিশুটির গাল ধুয়ে যাচ্ছিল। তাই ওর মনে হয়েছিল রাই-এর থেকে মনীষা অনেক বেশি এই বাচ্চাটির মা। তাই শেষ পর্যন্ত মাতৃত্বের কাছে হেরে গিয়ে, শিশুটিকে মনীষার কাছেই রেখে ফিরে আসে। দেখা যায় যে হঠাৎই রাত্রিবেলা রাই জিষ্ণুর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে আমি মা হতে চাই। এছাড়াও 'প্রথম ফুল', 'বৃষ্টি ভেজা জুঁই ফুল' প্রভৃতি গল্পেও মধ্যবিত্ত নারীর আত্ম সংকটের কথা গল্পকার সুনিপনতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারীকে সংসারের অসহায় নির্মমতার মধ্যে দাঁত চাপা প্রাণ ধারণ করতে হয়, তারপরেও সংসার থেকে পালিয়ে যাওয়ার সাহস দেখায় না,কারণ সংসারে থাকা স্বামী, সন্তান-সন্ততিদের আঁকড়ে ধরে জীবন তরীতে অতিক্রম করতে নারী অভ্যস্ত।

বিনতা রায় চৌধুরী দেবীর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক লেখকের রচনার সঙ্গে একাধিক বিষয়ের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী এনাদের লেখার ঘরানার সাথে মিল -অমিল দুই রয়েছে। যে সময়কালে গল্পগুলি লেখা হচ্ছে সেই সময়কালের প্রভাব গল্পে পড়বে এমনটাই কাঙ্ক্ষিত। মহাশ্বেতা দেবীর অনেক গল্পেই, নিম্নবর্গীয় নারীর জীবন কথা, তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনের কথা, অন্তজ মানুষের আন্দোলনের কথা ফুটে উঠেছে যেমন 'বান', 'দ্রৌপদী' ও 'শিকার' প্রভৃতি গল্পে নারীর দ্রোহের রূপ ফুটে উঠেছে। আবার আশাপূর্ণা দেবীর 'ছিন্নমস্তা', 'আয়োজন' এছাড়াও অন্যান্য কিছু গল্পে একেবারে সাদামাটা বাঙালি ঘরের মেয়েদের কথা যাদের জীবন যাপন নিতান্তই সাধারণ ও তাদের মনস্তত্ত্বের কথা, সমাজের দ্বিচারিতার কথা, অশিক্ষার কথা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। সমসাময়িক লেখক অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'বোগেনভিলিয়া' 'জলসত্র' সুচিত্রা ভট্টাচার্যর 'দূরের মানুষ' 'ফিফটি ফিফটি' অনিন্দিতা গোস্বামীর 'খোলস', 'তারা হওয়ার দিন, 'সেই বিরলতম মেয়ে' প্রভৃতি গল্পে নারীর আত্ম সংকট ও মাতৃত্ব সংকটের কথা নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন এই দিক থেকে বিনতা রায় চৌধুরী সাথে বিষয়বস্তুগত ভাবনার সাদৃশ্য থাকলেও বার্ধক্য ভাবনায় বৃদ্ধাদের জীবনের সংকটের চিত্র রূপায়নে নিজস্বতা বা নতুন ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বায়নের প্রভাবে নৈতিক অবক্ষয় ও নিউক্লিয়াস পরিবারের সংকীর্ণতা বার্ধক্যের জীবনকে একাকী করে তুলেছে।

বিনতা রায়চৌধুরী মধ্যবিত্ত নারী জীবনকে উপেক্ষা করতে পারেনি, রচিত গল্পগুলি তার প্রমাণ। নারী জীবনের অসহায় দিক ও নারী জীবনের জটিল রূপের চিত্র অঙ্কন করেছেন। নারী সত্তার দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে নারী সত্তার জাগরণও সম্ভব তা তিনি দেখিয়েছেন। নারীর জীবনে অস্তিত্বের লড়াই আজও চলছে। যন্ত্র সভ্যতার যুগে প্রতি মুহূর্তে খন্ডিত হচ্ছে মাতৃ সত্তা। রূপাসক্তির ফলে গৃহবধূর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূর জীবন সংকটের কাহিনী, কলঙ্কিত অবস্থাতেও কলঙ্কের চেয়ে মাতৃত্ব কিভাবে বড় হয়ে উঠেছে তা ফুটে উঠেছে বিভিন্ন গল্পে। নারীর আত্মসংকট, একটি গৃহবধূর স্বপ্নহীন যাপনের আলেখ্য হয়ে উঠেছে কিছু ছোটোগল্প। আত্ম স্বীকৃতি লাভের সংগ্রাম, অন্তর জগতের দ্বান্দ্বিক চিত্রকথা ফুটে উঠেছে। স্বাধীন দেশে নারীর পরাধীনতার গল্প এবং মাতৃত্ব সংকট এর ঘটনাগুলো সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন সংসারে সকলের মাঝে থেকেও মানুষ কীভাবে একাকীত্ব অনুভব করে। বিশেষত বার্ধক্যে এসে মানুষের একাকীত্ব আরো প্রকট হয়ে ওঠে। নিঃসঙ্গ জীবনে নেমে আসে বিষন্নতা আর অসহায়তা। সকলের মাঝে থেকেও যেন কেউ নেই। সন্তান লালন-পালন ও সন্তান সন্ততিদের প্রতিষ্ঠার পিছনে পিতা-মাতার কর্তব্যে কোন ত্রুটি না থাকলেও একবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায় সন্তানরা তাদের কর্তব্যে উদাসীন। মানুষের সামাজিক এবং মানবিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ফলস্বরূপ বৃদ্ধাশ্রমগুলিতে শত শত বৃদ্ধাকে চোখের জল ফেলতে হচ্ছে। সন্তানের বাড়ির একটি কোনেও পিতা-মাতার আশ্রয় দিতে পারেনা, পোঁছে দেয় বৃদ্ধাশ্রমে। অনেকে হয়ত এক সংসারে একসঙ্গে থেকেও মা-বাবাকে দূরেই সরিয়ে রাখে। এখানে মনের দূরত্ব তৈরি হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবা পরে রইল দেশে, ছেলে চাকরিসূত্রে বিদেশে পাড়ি দিল। এমন ক্ষেত্রে মনের সঙ্গে সঙ্গে পথের অর্থাৎ মন ও পথ উভয় দূরত্বই তৈরি হয়। আবার এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, উত্তরাধিকার সূত্রে ধন-সম্পত্তির লোভে মাতা পিতার

কদর করার পর, স্বার্থসিদ্ধি হলেই তাদের পরিবার থেকে বিতাড়িত করেছে। তাদের স্থান হয় কখনো বৃদ্ধাশ্রমে, কখনো ফ্ল্যাটের এক কোণে। এক কথায় জীবনের সকল আয়োজন, আরম্ভর বার্ধক্যে এসে বিবর্ণ হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র :

১.রায়চৌধুরী বিনতা, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬, পৃ.৯০

২. ঐ পৃ. ৯১

৩. ঐ পৃ.৯১

৪. ঐ পৃ.৯৫

৫. ঐ পৃ. ২১০

৬. ঐ পৃ. ২২০

৭) সেনগুপ্ত মল্লিকা। গদ্যসমগ্র। আনন্দ প্রকাশনী। কলকাতা। আগস্ট ২০১২ পৃষ্ঠা ৪৪০

৮. রায়চৌধুরী বিনতা। গল্প ২১। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০১৮ পৃ. ৫৫

৯. ভট্টাচার্য সুচিত্রা। গল্প সমগ্র ২। দে'জ প্রকাশনী। কলকাতা। ডিসেম্বর ২০১৮ পৃষ্ঠা ১৯০

১০. রায়চৌধুরী বিনতা। গল্প ২১। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০১৮ পৃ. ৬৭

১১. রায়চৌধুরী বিনতা। গল্প ২১। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০১৮ পৃ. ১২০

গ্রন্থপঞ্জী:

১)রায়চৌধুরী বিনতা। 'শ্রেষ্ঠ গল্প'। দেজ পাবলিশিং। কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬

২)রায়চৌধুরী বিনতা। গল্প ২১। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০১৮

৩)সেনগুপ্ত মল্লিকা। গদ্যসমগ্র। আনন্দ প্রকাশনী। কলকাতা। আগস্ট ২০১২

৪) বাগচী যশোধরা। নারী ও নারী সমস্যা। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। জানুয়ারি ২০০২

৫) বন্দোপাধ্যায় অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা (নতুন সংস্করণ: ২০০৬-০৭, পুনর্মুদ্রণ ২০১২-২০১৩)

৬) ভট্টাচার্য সুতপা। মেয়েলি আলাপ। পুস্তক বিপনি। কলকাতা। জানুয়ারি ২০১৮

....

টুসু গানে রাধা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ

ড. শান্তনু ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, অচ্ছুরাম মেমোরিয়াল কলেজ

সারসংক্ষেপ :
টুসু বা তুষু অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে পৌষসংক্রান্তির দিন পর্যন্ত পালিত লোক-পরব। টুসু একান্তভাবেই শস্য-ঐশ্বর্যের দেবী, আদিবাসীদের কাছে লক্ষ্মীস্বরূপা। এই পুজো এক অর্থে পৌষ লক্ষ্মীর আরাধনা। টুসু পুজোর তেমন কোনো বৈদিক মন্ত্র নেই। আছে কেবল গান। যা টুসু গান হিসাবেই লোকসমাজে পরিচিত। এই টুসু লোকগানের বিষয়বস্তু হিসাবে উঠে এসেছে নারীমনের অন্তর্লোকের নানা প্রসঙ্গ, পুরাণেরনানাপ্রসঙ্গ, সমাজ-ভাবনা, বৈষ্ণবচেতনা, আগমনী-বিজয়া প্রসঙ্গ ইত্যাদি। বৈষ্ণবচেতনা অংশের মধ্যে বেশিরভাগটাই জুড়ে আছে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। এমনি কিছু রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক টুসুগানের অনুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ :
টুসুগান, রাধাকৃষ্ণ, লোকগান, বৈষ্ণবচেতনা, লোকপরব, সমাজভাবনা

টুসু একান্তভাবেই শস্য-ঐশ্বর্যের দেবী। আদিবাসীদের নিকট লক্ষ্মীর প্রতিরূপ। এই পরব এক অর্থে পৌষলক্ষ্মীর উপাসনা। পৌষ মাসে ধান কাটা হলে পিঠে-পুলি সহযোগে দেবীকে নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি। অনেকে নবান্নের সঙ্গে এই পরবের মিল খুঁজে পান। 'ভাদ্র মাসে বিশেষ শুদ্ধাচারে জমি থেকে আড়াই মুঠো ধানগাছ কেটে হলুদ রঙের একখণ্ড কাপড়ে সেটি জড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। গৃহিণীরা জলধারা দিয়ে ধানগাছটিকে ঘরের মধ্যে বেদির উপর রাখে। অগ্রহায়ণ মাসে একটি শুভ দিনে নবান্ন উৎসবের সময় ঐ ধানের চাল দিয়ে নবান্ন হয়, কিন্তু তুষগুলিকে যত্নসহকারে তুলে রাখা হয়। ধানের তুষ হতে টুসু উৎসব।... পৌষ মাসের প্রথম দিনে মহিলারা একটি নতুন মালসা সাদা রঙ করে লাল আর সবুজ ফোঁটা দিয়ে নক্সা করে। পরে মালসার মধ্যে ধানের তুষ ভরতি করে তার উপরে গাঁদা ও আকন্দ ফুল দিয়ে সাজানো হয়।'[১] সারারাত ধরে টুসুর উদ্দেশ্যে জাগরণ ও গান করা হয়। পরবের শেষদিনে নদী বা পুকুরে মালসা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। পুরুলিয়া জেলার কোথাও কোথাও চৌদলে বা চৌডলে করে তুষু বা টুসু বিসর্জনের রীতি আছে। 'চৌডল' অর্থে চতুর্দোলা। গাছের ডাল, বাঁশের কঞ্চি, রঙিন কাগজ, সোলা ইত্যাদি দিয়ে চৌদল তৈরি করা হয়। চৌদল দেখতে অনেকটা ছোটো ছোটো রথের মতো। তবে এতে কোনো চাকা নেই। চৌদলগুলোকে মাথায় করে আদিবাসী নারীরা নদীর তীরে নিয়ে যায়। এই চৌদলকে ঘিরে তারা গান গায়, নাচে, আনন্দ করে। পরে এই চৌদলসহ টুসুকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। 'কোন কোন অঞ্চলে টুসুরাণীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ঘরে ঘরে সরা ও চৌদোল থাকবেই, কিন্তু ঘরে ঘরে টুসুর মূর্তি নাও থাকতে পারে। মূর্তি থাকবে পাড়ায় পাড়ায়। এক একটি পাড়ার জন্য এক একটি মূর্তি। টুসুরাণীর মূর্তি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মানভূমে; আরও বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে।'[২]

টুসু পরবের প্রাণ টুসুগান। টুসুগান আকারে খুব বড়ো নয়। দু-চার কলির ভিতর দিয়েই নানা কথার প্রকাশ। টুসুগানের সুর সহজ। ভাষাও সহজ। বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ধুয়ো পদের ব্যবহার দেখা যায়। টুসুগান সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। কিছু গান উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে, কিছু গান আধুনিক সময়ে রচিত। এইসব গানগুলির মূল বিষয় টুসু। তবে গানগুলিতে টুসুকে কেন্দ্র করে নারীদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের কথাই মূলত ফুটে ওঠে। বিশিষ্ট গবেষকের মতে, 'টুসু ও উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে আত্মপ্রকাশ। দেখতে পাব, টুসুর ওপর আরোপিত হচ্ছে সবকিছুই, যা একান্তভাবে তাদের নিজের কথা। এই গানের মধ্যে টুসু কখনো বা তাদের ঘরের মেয়ে, কখনো-বা সহচরী কখনা-বা মাতা। আর— গানের বিষয়বস্তু তো সবকিছুই। গোটা একটা সমাজের রূপরেখা : প্রেমের গান, প্রীতির গান, সুখের গান, দুঃখের গান, হাসি-ঠাট্টা আনন্দের গান, এমনকি অশ্লীল গানও। গানের মধ্যে পরিবেশ আছে, প্রতিবেশ আছে, বিধিনিষেধ,

কর্তব্যবোধ আছে, পুরাণ আছে, কাহিনি আছে, কটাক্ষ আছে, ঈর্ষা আছে, অভিসার আছে, অভিমান আছে, রাজনীতি আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ গানের মধ্যে পল্লী-হৃদয়ের কাব্য আছে।'[৩]

সীমান্ত বাংলার লোকায়ত টুসু গানে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ বার বার ঘুরে ফিরে আসতে দেখা যায়। এর কারণ অনুসন্ধানে গেলে প্রথমেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবের কথা উল্লেখ করতে হয়। মহাপ্রভুর মথুরা গমনের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কীয়দংশের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

"প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপ পথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা।।...
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি।।"[৪]

মহাপ্রভুর 'প্রেমভক্তি' তথা ভাবাদর্শ প্রভাবিত করেছিল সীমান্ত বাংলার লোকসমাজকে। এরপর বৈষ্ণবচেতনা বিকাশে সর্বাধিক ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। মল্লভূমের রাজা বীরহাম্বীরকে শ্রীনিবাস আচার্য বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দান করেন। বীরহাম্বীরের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার সুবাদে বিষ্ণুপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকার বহু মানুষ বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। মল্লভূমরাজাদেরবৈষ্ণবচেতনার প্রভাবে সীমান্তবাংলার নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণ মন্দির, রাসমঞ্চ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকমানসে বৈষ্ণবচেতনা ক্রমে বিস্তার লাভ করে। ফলস্বরূপ লোকসমাজে সৃষ্ট টুসু গানগুলিতে বিষয়বস্তু হিসাবেও স্থান করে নেয় রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ।তেমনি কিছু টুসু গানের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পরবর্তী পর্যায়ে করা হল।

কৃষ্ণ কদমতলায় বাঁশী বাজায়। গোপিনীরা সেই বাঁশীতে মুগ্ধ। সংসার পরিবার সব ফেলে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়। লোকে কী বলবে তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের অপ্রতিরোধ্য টানের কথা টুসু গানে আছে।

চল্ সজনী যাব যমুনা।
দেইখে আইস্‌ব গো কালসনা।।
ছল কইরে জন আইন্‌তে যাব
দেইখ্‌ব গো কালসনা।
কালশশী দিবানিশি আছে গো কদমতলায়
আড় নয়নে মুচকি হাঁসি দেইখলে কিগো প্রাণ জুড়ায়।
যে দ্যাখে কালবদন
তার ঘরে রহা বড় দায়।।

সংসার পরিবার পরিজন সবই কেমন যেন তুচ্ছ মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যেন মোহের সাগরে নিমজ্জিত করে গোপিনীদের। যে মোহ থেকে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই কখনো কখনো গোপিনীদের মনে জাগ্রত হয়—

আর ত যাব না জলে।
কালা থাকে গ কদমতলে।

কিন্তু যেতে তারা বাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ বহু গোপি-বল্লভ। তাই রাধিকার প্রতি তিনি আপাত দৃষ্টিতে অবিচার করেন। রাধিকার প্রিয়-সখীরা চায় না শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার কাছে যায়। কারণ রাধিকার প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ অন্যান্য গোপিনীদের প্রতিও আসক্ত। এমনি অনুভূতির প্রকাশ এই টুসু গানে—

কাল ভমর পিরীত জানে না।
রাধার কুঞ্জে যাইতে দিব না।
যাও ফিরে যাও কালসনা।

রাধার কুঞ্জে যাইতে দিইব না।

কৃষ্ণের বাঁশী বাজলে আর ঘরে স্থির থাকা যায় না। বাঁশীর টানে সকল প্রাণী আকুল হয়ে ওঠে। টুসু গানে তাই কৃষ্ণকে এমন পাগলপারা বাঁশী বাজাতে নিষেধ করার জন্য কেউ যেন তার মাকে অনুরোধ করছে।

বারণ কর মা কৃষ্ণকে বাঁশী বাজাইতে।
ভাঙে না চুরে না বাঁশী ফেইলে দিক মা নিরলে।।
কৃষ্ণের বাঁশী দিবানিশি শুনি মাগো কানেতে।
বাঁশী শুনে হয় না শান্তি হয় না গো জীবনেতে।।
যখন কৃষ্ণ বাজায়, তখন আমি কাঁদি হাসি।
বাঁশী শুনে হয় গো মনে আমি হই কৃষ্ণের দাসী।।

বাঁশীর সুরে বিরহিনীদের মনের বীণাতেও যেন ঝংকারে জাগে। যে নারীদের কৃষ্ণ সমীপে যাওয়া সম্ভব নয়, তাদের গুমরে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এমনি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে টুসু গানে।

বাঁশী বাজে ললিত সুরে
মন বিপিনে সাঁঝ দুপুরে।।
যে রাগেতে বাঁশী বাজে রাধা নামে সুস্বরে।
আমার বিরহবীণা বেজে ওঠে সেই সুরে।।
বাঁশী বাজে সুতানে মোর অন্তরে।
আমি ধনি বিরহিনী মরি সদা গুমরে।।

আবার বেশকিছু রাধা কৃষ্ণ কেন্দ্রিক টুসু গানে আদি রসের আধিক্য লক্ষ করা যায়। এসব গানে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ নেই বললেই চলে। এখানে কৃষ্ণ-রাধা কেবলই গ্রাম্য নর-নারীর প্রতিভূ। জৈবিক চাহিদায় পরিপূর্ণ। দেব-দেবী মাহাত্ম্য বর্জিত। লোকজীবন থেকে উঠে আসা রক্তমাংসের সজীব নর-নারী। শরীরী চাহিদার আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নারীলোলুপতা ও সম্ভোগতৃষ্ণার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে টুসু গানে।

একলা ধনি যাইস্ না বিকালে।
জল আনিতে নদীর কূলে।।
সরোবরে প্রস্ফুটিত হেরিলে কমল ফুলে।
অনায়াসে পাইলে মধু ত্যজে না অলিকুলে।।
তেমনি কালা পাইলে একা ছাইড়বে না জীবন গ্যালে।
পান করিবে প্রেমমধু বসিয়া যৌবন ফুলে।।

একলা নারীকে বিকাল বেলায় জল আনতে নিষেধ করা হয়েছে গানটিতে। সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল থেকে পতঙ্গ অনায়াসে যেমন মধু পান করে থাকে তেমনি একাকিনী নারীকে পেলে শ্রীকৃষ্ণও তার যৌবনরূপ ফুলের মধু পান করবে। কৃষ্ণের কাছে না যাওয়ার অনুরোধ এই গানটিতে ধরা পড়েছে। ঠিক এর বিপরীতে আরও একটি টুসু গানের উল্লেখ করা যায়। যেখানে নিজ যৌবন শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করার জন্য কোনো এক নারী ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে।

কুঞ্জে ক্যান আইল না কালা।
বাসি রইল হে ফুলের মালা।।
কুঞ্জে কালা আইস্‌ব বইলে গাঁথিনু বনমালা।
যতনে রাইখেছি জ্বালে সুন্দর যৌবন-আলা।।
চাইয়ে কালার পথ পানে কাইট্‌ল রে অনেক ব্যালা।
বিরহ-মারুত অসি মরমে দিচ্ছে দলা।।

শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সচেতন। একাধিক নারীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কের কথা শ্রীমতী জানেন। তাই বিনয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে নিজ অবগতির কথা জানাতেও পিছপা হন না তিনি। টুসু গানে রাধিকার মুখে তেমনি কিছু কথা শোনা যায়।

বিনয় করি কহেন শ্রীমতী।
বঁধু, শুন মন মিনতি।।
তুমি হে ভমরা জাতি নানা ফুলে বসতি।
এ-কুসুমে, ও-কুসুমে মধু খাও নিতি নিতি।।
বিকশিত সরোবরে হেরি নলিনী ভাতি।
মধুকর পিয়ে মধু হইয়া হৃষ্টমতি।।

ভ্রমরের মতোই শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব। ভ্রমরের জন্য যেমন নির্দিষ্ট কোনো ফুল থাকে না, সে এফুল ওফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ বহু রমণীর সঙ্গে মিলিত হন।

শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীশক্তি সর্বাধিক। সহজেই সে মন হরণ করে। স্বেচ্ছায় সকলে তাকে মন দিয়ে দেয়। টুসু গানে এমনি মোহময় মনচোরা কৃষ্ণের কথা আছে।

ওলো ধনি বাঁকা আড় নয়ন।
তকে দেইখ্‌লে লো জুড়ায় জীবন।।
সাঁঝ সকালে জল্‌কে যাবি কাঁখে কলসী নিলি ধন।
রাস্তার মাঝে দেখা হইলে লিব লিব করে মন।

রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ কেন্দ্রিক টুসু গানে পৌরাণিক কাহিনির উল্লেখও পাওয়া যায়। জটিলা-কুটিলার প্রসঙ্গ টুসু গানে এসেছে। রাধিকা নানা প্রতিকূলতার কথা বলতে গিয়ে জটিলা-কুটিলার নামোল্লেখ করেছে।

বাঁশীর স্বরে কী মধু আছে।
আমার মনকে হরণ করেছে।।
বল বৃন্দে কোন্ পথে যাব গো বঁধুর কাছে।
জটিলা-কুটিলা আজি দুয়ারে দ্বারী আছে।।
ঘরে বাদী বাইরে বাদী সবাই নিঠুর হয়েছে।
প্রাণসখী বল আমায়, বল কী উপায় আছে।।
ঘরে আমি রইতে নারি বিরহে প্রাণ দহিছে।
শ্যামের মিলন লাগি আঁখি ধারা বহিছে।।
পরাণ ছাড়িব সখী বিনা শ্যামের পরশে।
ছাড়ি জাতি কুলমান মিলিব বঁধূর সাথে।।

শ্যাম বিরহে আকুল শ্রীমতীর কথা এই টুসু গানে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য জীবন দিতেও পিছপা নয় রাধিকা। প্রেমের এক গভীর স্তরে রাধিকা সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করছে। এখানে তার পরম আকাঙ্ক্ষা শ্রীকৃষ্ণ। বিরহিনী রাধিকার কাতর যন্ত্রণার কথা টুসু গানে উঠে এসেছে।

কবে শ্যামকে পাব হে দ্যাখা।
একা মন করে ফাঁকা ফাঁকা।।
শ্যাম বিনা রইতে লারি, পাই না হে তাকে দ্যাখা।
দ্যাখ্যা পাইলে ধইর্‌ব গলে, যদি পাই তার দ্যাখা।।
কার কুঞ্জেতে রইলে ভুইলে তুমি হে বাঁকা সখা।
শিশুকালে পিরীত কইরে আজ ক্যান দিলে দাগা।।

এমনিভাবে নানা টুসুগানে রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আসলে রাধাকৃষ্ণের রূপকে উঠে এসেছে সাধারণ নর-নারীর প্রণয় উপাখ্যান। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপের নয়, মধুর রূপের বন্দনাই করা হয়েছে। প্রেমের চিরন্তন প্রতীক রাধা-কৃষ্ণ তাই অনেক বেশি মানবিক আবেদন নিয়ে ধরা দিয়েছে এই টুসু গানগুলিতে। গ্রাম্য-নারীরা তাদের প্রেমিক পুরুষকে খুঁজে পেয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। কাঙ্ক্ষিত পুরুষের প্রতি নারী মনের যে ক্ষোভ, আবেগ, অনুভূতি তার প্রকাশই রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক টুসু গানগুলির মূল উপজীব্য।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, নদীয়া, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ২৮৪

২. করণ, সুধীরকুমার, সীমান্ত বাংলার লোকযান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৯

৩. তদেব, পৃ. ১৭১

৪. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, চৈতন্যচরিতামৃত, লঘু সংস্করণ, সেন, সুকুমার (সম্পা.), সাহিত্য অকাডেমি, কলকাতা, ২০০২ খ্রি., পৃ. ২৮৪

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সিংহ, শান্তি। টুসু। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। কলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

....

'মৌরিফুল' ও 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' : এক নতুন ধরনের সন্ধানে

প্রসেনজিৎ রায়
গবেষক, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার

বাংলা কথা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক ব্যতিক্রমী লেখক তিনি এমন কিছু বিষয় নিয়ে লিখেছেন যেগুলো একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবতে হচ্ছে। কেননা যে সময়কালে তিনি বিদ্যমান সেই সময়পর্বে বসে এই ধরনের লেখা এই ধরনের চিন্তাভাবনা আমাদেরকে বিস্মিত করে। বিশেষ করে বাংলা ছোট গল্প ধারায় তিনি এক নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। বাংলা ছোটগল্পে যদি দেশীয় রীতি থেকে থাকে তবে তার সূচনা কিন্তু বিভূতিভূষণের হাত ধরেই। তিনি দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্য নয়, আমাদের দেশে ঐতিহ্য এর মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের ছোট গল্পের বিষয়। বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব উনিশ শতক। এর আগে ছোটগল্পের আমরা কোনও নিদর্শন খুঁজে পাই না। অবশ্য ছোটগল্পের বিভিন্ন উপাদান, ফর্ম ছিল। কিন্তু ছোটগল্প বলতে আমরা যা বুঝি, আর একটু বিস্তৃত করে বললে আমাদের যা বোঝানো হয় সেগুলি ছিল না। আমরা যাকে ছোটগল্প বলে জানি সেই ছোটগল্প আমাদের নয়, তার বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এসেছে। তবে আমাদের দেশে ছোটগল্প অনেক আগে থেকেই ছিল, কিন্তু তার ফর্ম যেমন আলাদা তেমনি কনটেন্টও। সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প কাহিনি আমাদের ছোটগল্পের পূর্বসূরী। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ছিল প্রধানত দেব স্তুতি ও প্রার্থনামূলক। এই সূক্তগুলির মধ্যে রয়েছে গল্প। যেমন ঊর্বশী সংবাদ সূক্তের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভূতিভূষণের গল্পগুলি একটু মন দিয়ে পড়লে মনে হয় কোথাও যেন একটু আলাদা তাঁর বলার মধ্যে বা গল্পের মধ্যে একটা নতুন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি যেন ছোটগল্পের এক নতুন ধরন (যে ধরন বেশি মাত্রায় দেশিয়, গ্রামজীবনকেন্দ্রিক) তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বারবার। আমি তাঁর 'মৌরিফুল' ও 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পে সেই নতুন ধরনটাই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ:

পঞ্চতন্ত্র, জাতক, দেশীয় রীতি, বোধিসত্ত্ব

বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব উনিশ শতক। এর আগে ছোটগল্পের আমরা কোনও নিদর্শন খুঁজে পাই না। অবশ্য ছোটগল্পের বিভিন্ন উপাদান, ফর্ম ছিল। কিন্তু ছোটগল্প বলতে আমরা যা বুঝি, আর একটু বিস্তৃত করে বললে আমাদের যা বোঝানো হয় সেগুলি ছিল না। আমরা যাকে ছোটগল্প বলে জানি সেই ছোটগল্প আমাদের নয়, তার বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এসেছে। কিন্তু আমাদের নিজস্ব মানে দেশীয় ছোটগল্পের রীতি কি নেই? যদি থেকে থাকে তা কোথায় প্রয়োগ হয়েছে বা হচ্ছে? এসব নিয়ে আমি কিছু ভাবনাচিন্তা করেছি সেগুলোই সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করব আলোচ্য প্রবন্ধে।

গল্প বলা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আদিমকাল থেকেই মানুষ এই আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে পূরণ করে এসেছে। কিন্তু কেন এই আকাঙ্ক্ষা? এর উত্তরে বলা যেতে পারে শিক্ষা ও আনন্দ গল্প। যেমন গান গেয়ে আর গান শুনে আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি। প্রাচীন কাল থেকে এই সহজাত প্রবৃত্তির ফলে পৃথিবীর নানা দেশে নানা রকমের গল্প রচিত হয়েছে, হয়ে আসছে। মিশরের চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত 'টেল অফ দ্যা ম্যাজিসিয়ান্স'ই হল প্রাচীনতম গল্প সংগ্রহ। এছাড়া হিন্দু, হিব্রু, আরবদেরও নিজস্ব গল্পসাহিত্য রয়েছে। প্রাচীনকালে গল্পগুলো ছিল কাহিনি জাতীয়, পরে এগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। আমাদের দেশে ছোটগল্প অনেক আগে থেকেই ছিল, কিন্তু তার ফর্ম যেমন আলাদা তেমনি কনটেন্টও। সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প কাহিনি আমাদের ছোটগল্পের পূর্বসূরী। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ছিল প্রধানত দেব স্তুতি ও প্রার্থনামূলক। এই সূক্তগুলির মধ্যে রয়েছে গল্প। যেমন ঊর্বশী সংবাদ সূক্তের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার অথর্ববেদে আমরা আর্য সমাজে যারা ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বহির্ভূত আর্যদের কথা পাই। উপনিষদে অধ্যাত্মচিন্তা ও জীবন জিজ্ঞাসা এগুলোও গল্প। সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকাব্যগুলি মূল কাব্য ছাড়া বহু আখ্যান-উপাখ্যান রয়েছে গল্পের আকারে। রামায়ণে শবরী

এবং ঋষ্যশৃঙ্গের উপখ্যান, মহাভারতে দুস্যন্ত- শকুন্তলা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান ইত্যাদি উপাখ্যান- এগুলো একাধারে গল্পই, মানবিক আবেদন এখানে প্রধান।

তবে পঞ্চতন্ত্র, জাতকের গল্পগুলোই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ছোটগল্প। সংস্কৃত সাহিত্যে কথা ও আখ্যায়িকা এই দুটো শব্দ আমরা খুঁজে পাই। কথা মানে হল সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনি, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফেবল' আর আখায়িকা হল বড়ো ধরনের গল্প, ইংরেজিতে যাকে বলে 'টেল'।

'কথা'র উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের কথা। জাতক সাহিত্যের দুটি অংশ কেন্দ্রতিগ আর কেন্দ্রাভিগ। কেন্দ্রাভিগ মানে হল কেন্দ্রের দিকে বা অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। যেমন রস, নীতিকথা ইত্যাদি বিষয়। আর কেন্দ্রাতিগ হল কেন্দ্রকে অতিক্রম করে যাচ্ছে যেমন কল্পনা। এবার প্রশ্ন হল পঞ্চতন্ত্র বা জাতক যে আমাদের দেশের তা বুঝবো কিভাবে? জাতক পড়লে সেখানে দেখা যাবে যে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এর রচনাকার বৌদ্ধভিক্ষুকেরা। আর পঞ্চতন্ত্র পড়লে দেখা যাবে সেখানে রাজাদের কথা বর্ণিত আছে। সেই গুপ্তযুগ থেকে শুরু। এভাবে ধীরে ধীরে এই জাতক, পঞ্চতন্ত্র সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। জাতক পাঠ করলে পাওয়া যায় 'বোধিসত্ত্ব', যেটা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্জেরা দিয়ে থাকেন। এই 'বোধিসত্ত্ব' মানে হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি। আর পঞ্চতন্ত্র মূলত রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য তৈরি করা একটা ইথিকস।

'আখ্যায়িকা' হল যা আয়তনে বড় হবে এবং বিষয় কোনও রাজার কাহিনি- যেমন দশকুমারচরিত, হর্ষচরিত ইত্যাদি। এছাড়া ব্রতকথা লোককথা, রূপকথা ইত্যাদি।

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক নিদর্শন ১৮৭৩ সালে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মধুমতি' গল্প। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮৮৪ সালে লেখা 'ঘাটের কথা'। তবে সার্থক ছোটগল্প ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা'। এই গল্পটি প্রথম সর্বগুণ সমন্বিত ছোটগল্প। বাংলা ছোটগল্প পাঠে আমরা দুই ধরনের রীতির সম্মুখীন হয়েছি। একটা হল চাবুক হাঁকড়ানো পরিণতি আর একটা হল স্বাভাবিক অর্থাৎ দিনের আলো যেমন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসে ঠিক সেই পরিণতি। প্রথম রীতি অর্থাৎ চাবুক হাকড়ানো পরিণতির পক্ষপাতী ছিলেন এডগার এলান পো, ও হেনরি এবং ও হেনরি। তাঁরা মনে করেন এই জাতীয় সমাপ্তির দ্বারা পাঠক চিত্তে ক্ষতচিহ্নের মতো স্থায়ী প্রভাব অঙ্কিত করা সম্ভব। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' গল্পটির কথা উল্লেখ করতে পারি। দ্বিতীয় রীতিতে আন্তন চেকভের, হেনরি জেমসের তৈরি, সাধারণভাবে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। আমার প্রশ্ন যে এর বাইরে লেখকেরা আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে মাথায় বজায় রেখে গল্পের কোনও ফর্ম তৈরি করেছেন কিনা? আসলে কোন সৃষ্টি স্বয়ম্ভূ নয়। অ্যারিস্টটল তাই সমস্ত শিল্পকে মাইমেসিস বা অনুকরণ বলেছেন। একটি পাথরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মূর্তি খুঁজে ফেরাই যথার্থ শিল্পীর কাজ। এই খোঁজাটাই আসল। বিভূতিভূষণের গল্পগুলি একটু মন দিয়ে পড়লে মনে হয় কোথাও যেন একটু আলাদা তাঁর বলার মধ্যে বা গল্পের মধ্যে একটা নতুন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি যেন ছোটগল্পের এক নতুন ধরন (যে ধরন বেশি মাত্রায় দেশিয়, গ্রামজীবনকেন্দ্রিক) তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বারবার। আমি তাঁর 'মৌরিফুল' ও 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পে সেই নতুন ধরনটাই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

'মৌরিফুল' গল্পের বিষয় তেমন কিছু নয়। খুব সাদামাটা গ্রামজীবনের কথা। রামতনু মুখুজ্যে চৌধুরীদের পক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে চরম হেনস্থার শিকার হয় উকিলের কাছে। তারপর বাড়িতে পুত্রবধূর (সুশীলা) কাছে অপমানিত হয়। সুশীলার সংসারে ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকে। তার দুই সখি একজনের বাড়ি কলকাতায় আরেকজনের বাড়ি তার গ্রামেই। মুখুজ্যের পুত্রবধূ সুশীলা এদের সঙ্গে এদের সঙ্গে 'মৌরিফুল' সখি পাতায়। একদিন স্বামীকে পুত্র সন্তানের জন্য শিকড় বাটা সুশীলাকে ডালের বাটিতে মেশাতে দেখে শাশুড়ি মোক্ষদা ঠাকরুন তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে দেয়। তারপর সুশীলাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। অসহায় সুশীলা প্রথমে তার স্বামীর সোহাগ স্নেহের কথা ভাবতে থাকে, তারপর মৌরিফুলের কথা ভাবতে থাকে। অবশেষে মারা যায়, দ্বিতীয় বিবাহ করে স্বামী কিশোরীলাল।

ছোটগল্পের উপসংহারে কেমন হবে? একটা ব্যঞ্জনা সেখানে সর্বদা থাকবে। ব্যঞ্জনা মানে জানার কৌতূহল, লেখক পাঠকের মধ্যে তৈরি করে দেবেন। এই ব্যঞ্জনার কারণেই আমরা ছোটগল্প বারবার পড়ি। কিন্তু এ গল্পে ব্যঞ্জনা কই। একজনের স্ত্রী শত অসহায়তার মধ্যে মারা গেল। এমন কিছু নেই যা আমাদের বারবার পড়তে হবে গল্পটি। সমাজে যা ঘটে চলেছে তারই এক টুকরো প্রতিফলন। গল্পের পরিণতি আদৌও কোনও রীতি মেনে হয়েছে কি না সেটা একটু দেখে নিই। মোপাসাঁ, পো প্রমুখের তি কিন্তু এখানে নেই। যদি হতো

তাহলে দ্বিতীয় বিবাহের পর কিশোরীলালের অর্থাভাব শুরু হল- যদি এমন হত তাহলে মোপাসাঁ রীতিতে ফেলা গেলও যেতে পারত। কিন্তু সে সম্ভাবনাটুকুও নাই। আমরা উপসংহারে দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় স্ত্রী আসার পর সংসারে অর্থের আগমন প্রচুর ঘটে। এতটাই তারা আনন্দিত যে পূর্ব স্ত্রীর কথা ভুলে গেছে। কিন্তু গল্প শেষে পাঠকের মনে একটা সমবেদনা থেকে যায়। যদি পরিণতি এমন হতো যে কিশোরীলালের দ্বিতীয় বিবাহে তাদের সংসার পথে বসতে যাচ্ছে তাহলে আমরা সুশীলার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আনন্দ পেতাম, এই যুক্তিতে যে কিশোরীলালের ঘটনা আমাদের সঙ্গে ঘটেনি। যেমনটা ট্র্যাজেডিতে দেখার সময় হয়ে থাকে। রসের বিকৃতি ঘটিয়েছেন বিভূতিভূষণ। কিশোরীলালের সংসারে আনন্দ আছে, কিন্তু আমরা আক্ষেপ করছি সুশীলার ট্রাজিটিতে। কোন সুশীলা? যে শশীলা বেড়ে উঠেছে উন্মুক্ত প্রকৃতিতে, যদি সুশীলা বেড়ে উঠতো অন্য কোনও পরিবেশে তাহলে তার প্রতি সমর্থন থাকত কতটা এটা বিচার সাপেক্ষ। এখন প্রশ্ন হল কেন মৌরিফুল সখীদের নাম?

দেবেশ রায় তাঁর 'উপন্যাস নিয়ে' বইতে নতুন রীতির কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের বাংলায় নাকি একমাত্র বা প্রধান নদী বদ্বীপ যেখানে এত মানুষ বাস করে অথচ আমাদের উপন্যাসে সে বিবরণ লেখা হলো না কত নদী জল কত রঙের মাটি ভাঙ্গে সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই বাংলা বাংলার ও নাকি অন্যতম আকাশ যেখানে থেকে বছরে এতগুলো মাস এত বৃষ্টি পরে অথচ আমাদের উপন্যাসে সে বিবরণ দেখা হলো না কত রঙের মেঘ কত জল ঝরায় সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই বাংলার ওপর দিয়েই বয়ে যায় রহস্যময় এক সামুদ্রিক বাতাস যার নাম মৌসুমী বায়ু অথচ আমাদের উপন্যাসে সেই বিবরণ লেখা হলো না কোন খাদ দিয়ে কি বাতাসে আমাদের গাছপালা দোলে, আর এই নদী এই বৃষ্টি এই বাতাস এই পাহাড় এই সমতল আর এ সমুদ্রকে উন্নীত করে যে মানুষ সে তার নিজের বাঁচার কাহিনী নিয়ে আমাদের উপন্যাসে এলোনা। শুধু উপন্যাস কেন, বাংলা ছোটোগল্পে এধরনের উপাদান কই? তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন রীতির আমদানি করেছেন। তাঁর প্রচুর গল্প রয়েছে যেখানে আমরা এই ধরনের বিষয় খুঁজে পাই।

'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পটি বাংলা সাহিত্যে অভিনব বলে আমার মনে হয়েছে। গল্পের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। অতি সাদামাটা এক গল্প। কিন্তু বিভূতিভূষণ একটা নতুন ধরনের সম্ভাবনা রেখে গেছেন সাধারণের মধ্যে। গল্প শুরু হচ্ছে দ্রবময়ী বলে এক বৃদ্ধার ম্যালেরিয়া জ্বর দিয়ে। তার বাসস্থানের যে বর্ণনা আছে তাতে এ ধরনের অসুখ স্বাভাবিক। পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেঃ
"দ্রব ঠাকরুনের বাড়ীর চারিধারে বনে বনে নিবিড়, সূর্যের আলো কস্মিনকালে ঢোকে না, তার ওপর বাড়ীর সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটুম্বুর দিনরাত 'যাঁওকো' 'যাঁওকো' ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিন রাতে মশার বিনবিনুনি" [১]

ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুলতে পারছে না তার পোষা গরু মুংলিকে। গরু কোথায় খাবার দিল কিনা কেউ বারবার এই ভাবনা ভেবে চলেছে। তার পরিবার বলতে তার ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনি আছে। তবে এখানে নেই। ইছাপুরে তাদের বাসস্থান। আর দ্রবময়ী থাকে গোপীনাথপুরে। এছাড়া এই ঘন জঙ্গলমহলে পুত্রবধূরা আসতে নাক সিটকায় তাই নির্জন এলাকায় থাকে দ্রব তার গরু ও গাছগাছালি সঙ্গে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের থেকেও তীব্র। খয়ের খাগি, কাঁঠাল গাছ, লেবু গাছে কেউ হাত দিতে পারে না। ১০-১১ বছরের ছেলে তার কাছে লেবু চাইলে ম্যালেরিয়া জ্বরে শীর্ণ দ্রব ঠাকরুন এমনভাবে তাকায় যে বালক ভয় পেয়ে চলে যায়। এছাড়া একজনের হাতে শুয়োপোকা লেগে যায় সেইটা তোলার জন্য ডুম্বুর গাছের পাতা চাইলে দ্রব দিতে নিমরাজি হয়। এর দ্বারা সহজেই বোঝা যায় গাছের সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্ককে। তারপর তার নাতি তাকে কাশিতে নিয়ে যায়। কাশিতে দশাশ্বমেধ, রামকৃষ্ণমঠ প্রভৃতি জায়গায় ঘোরানো হলেও তার মন টেকে না। তার সঙ্গী হিসেবে ছিল তার নাতির বন্ধুর মা নীরজাবাসীনি, বয়সে দ্রব ঠাকুরানীর থেকে পাঁচ বছরের বড়, তা সত্ত্বেও দ্রবময়ী থাকতে না কাশিতে। বারবার মনে পড়ে তার মুংলির কথা, কাঁঠাল গাছের কথা, লেবু গাছের কথা ।মাস তিনেক হল সে গ্রামে নেই। তার কাঠাল, লেবু কেউ চুরি করছে কিনা, মুংলিকে ঠিকঠাক খেতে দিচ্ছে কিনা এই ভাবনায় সে রাতে স্বপ্ন দেখে যে বারো ভূতে তার সম্পত্তি লুটেপুটে খাচ্ছে। তারপর বাড়িতে চলে আসে।

গল্পের মধ্যে বেশ কয়েকটা বিষয় উঠে আসে প্রথমত, যে পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের চেনা, আমাদের ঐতিহ্য। গ্রামবাংলার তথা ভারতবর্ষের বর্ণনা তাঁর মত কজন সাহিত্যিক দিতে পেরেছেন। 'আরণ্যক', 'পথের পাঁচালী' তে যে ভারতবর্ষ তা আমাদের ঐতিহ্য, রক্তের সর্বদা বহমান। কল্লোল যুগে কল্লোলিয়ানরা রবীন্দ্র প্রভাব থেকে বের হওয়ার জন্য পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। পরিবেশ, চরিত্র হিসেবে আমাদের দেশ ও সমাজের মানুষদের বেছে নিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো তো চিরস্থায়ী

হল না। কয়লাকুঠির শ্রমিকদের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে বাস্তব থাকলেও বাস্তবতার বড় অভাব। কিন্তু শতবর্ষ পেরিয়ে বিভূতিভূষণের পরিবেশে আমাদের পুনরায় ভাবাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ককে বুঝতে হবে। প্রকৃতি বিশেষত গাছের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণা হচ্ছে। এমনকি প্লান্ট স্টাডিস নতুন ডিসিপ্লিনের সূচনা হয়েছে, যেখানে মানুষের সঙ্গে গাছের আন্তঃসম্পর্কের নানাদিক আলোচনা করা হয়ে থাকে। ২০২২ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস সুমনা রায়ের 'How I Become A Tree' -র কথা উল্লেখ করি, যেখানে তিনি মানুষ ও গাছের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন । বিভূতিভূষণ কিন্তু এই কাজ অনেক আগেই করে গেছেন। দ্রবময়ীর কাশীবাস হলেও তাকে বেশি মাত্রায় চিন্তিত করেছে তার পোষা গরু মংলি আর কাঁঠাল গাছ ও লেবু গাছ। এছাড়া আরও জঙ্গল গাছ ছিল, কিন্তু সে গাছের কাঠ জ্বালানি হিসেবে বিক্রি করতে চাননি। অনেকে টাকার লোভ দেখিয়েছে কিন্তু তিনি রাজি হননি।

এবার প্রশ্ন হল কেন দ্রবময়ী ফিরে এলেন? দ্রবময়ীর ইচ্ছা স্বর্গে যাওয়ার আগে কাশীতে যাওয়া। কিন্তু সেই কাশী থেকে তার কাছে সেই স্যাঁতস্যাঁতে, মশামাছি বাসস্থান অনেক ভালো। আসলে গল্পকার বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে শিকড়ে ফেরার কথা। যে জায়গা আমরা বেড়ে উঠেছি তা দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তাকে পুনরায় পাবার জন্য যে ব্যাকুলতা তার কথাই বলেছে, যেটা উত্তরআধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুনরায় আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আমাদের শিকড়ের দিকে কিন্তু এ কথা ঠিক যে প্রকৃতিতে ফিরে আসবো তা পূর্বের মতো নয়, কিছুটা আলাদা- কিন্তু ফিরে আসা প্রয়োজন।

বিভূতিভূষণের গল্প বলার রীতিটা অনেকটাই আলাদা। তিনি প্রচলিত রীতিতে গল্প বলননি, অনেকটা কথকতার মতো- যেখানে নিজের ইচ্ছে মত কাহিনি ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, তৈরি করছেন নিজস্ব এক আখ্যান। 'মৌরিফুল' ও 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্প দুটি লেখা হচ্ছিল তিরিশের দশকে। এই সময়টা বাংলা সাহিত্যেকে যে নিয়ন্ত্রণ করছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য। এর বাইরে বেরিয়ে এসে বিভূতিভূষণ দেশীয় ঐতিহ্যকে যেন নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই ভাবনা এবং সম্ভাবনা যে এক নতুন দিক নির্দেশের সূচনা করেছে সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্রঃ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণঃ শ্রেষ্ঠ গল্প, ভাষা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশঃ ২০১৬, পৃ. ৯৬।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ন, সাহিত্যে ছোটোগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ১৪০৫।

২। রায়, দেবেশ, উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯১।

৩। রায়, দেবেশ, উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৪।

৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০১।

....

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা পরিভাষা

সায়ক বসু
পিএইচ.ডি. গবেষক
ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ (ABSTRACT) :

আঠেরো শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ হয়। যার ফলে ভারতীয় সরকারি বিচারবিভাগে যে সমস্ত রেগুলেশনগুলি নথিভুক্ত আছে সেগুলি মফস্বল আদালতে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ আসে। প্রশাসনিক স্বার্থেই ইংরেজি ভাষায় যে সমস্ত আইন প্রণীত আছে তার বাংলা অনুবাদের পক্ষে মত দেন কর্নওয়ালিস, ডানকান, এডমনস্টোন, ফরস্টার, রবিনসন, উইলসন, আপজন, মিলার সহ অন্যান্য ইংরেজ প্রশাসক গোষ্ঠী। উপরমহলের প্রস্তাব মোতাবেক একদিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ, রাজীবলোচন, গোলকনাথ, চণ্ডীচরণ, তারিণীচরণ, হরপ্রসাদ, কাশীনাথ, পদ্মলোচন, রামরাম বসুর মতো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠী, অন্যদিকে কেরি, টমাস, মার্শম্যান, ওআর্ড এর মত শ্রীরামপুর মিশনারি গোষ্ঠী এই অনুবাদকর্মে মনোননিবেশ করেন। তাঁরা সচেতন ভাবে পরিভাষা নির্মাণে ব্রতী হননি কিন্তু তাঁদের লেখার মধ্যেই পরিভাষা নির্মাণের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

শাসকের ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পিছনে রুটি-রুজির প্রয়োজন থাকে। উনিশ শতকে বাঙালির ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চায় মনোননিবেশ করতে অধিকাংশক্ষেত্রে বাধ্য করেছিল কর্মপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা। অন্যদিকে এর সমান্তরালে এক ধরনের প্রতিরোধে সাহিত্যচর্চাও গড়ে উঠেছিল। ইংরেজির সমান্তরালে দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার পরিসরকেও গণমানসে প্রচার করার দাবি উঠতে থাকে। তাই নতুন করে দেশীয় ভাষায় পরিভাষা রচনার প্রয়োজন দেখা যায়।

ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গীয় অনুবাদক পদ সৃষ্টি, আদালতের ভাষারূপে ফারসির বিলুপ্তি ও বাংলার প্রবর্তন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, স্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস গতি লাভ করে, যা মাতৃভাষায় শিক্ষা আন্দোলনের ধারাটিকে পরিপুষ্ট করেছিল।

আমরা এই আলোচনাকে সংহত করতে মাতৃভাষায় শিক্ষা আন্দোলনের ধারা বজায় রেখে বাংলায় পরিভাষা নির্মাণে কিছু নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের একক প্রয়াসের কথা তুলে ধরব। এই ক্রমটি কেবল আন্দোলনের ধারায় কীভাবে বাংলা পরিভাষার নির্মাণ ও তার বিবর্তন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল তা নির্দেশ করে। এর বাইরেও এই সময়পর্বে আরও অনেকে একক প্রয়াসে বাংলা পরিভাষা নির্মাণের ধারাটিকে পুষ্ট করেছিলেন, সেবিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় বিশদে আলকপাত করা যাবে।

মূল শব্দ (KEYWORD) :

পরিভাষা, বঙ্গীয় অনুবাদক, মাতৃভাষায় শিক্ষা আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি ।

মূল প্রবন্ধ (MAIN ARTICLE)

জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আবশ্যিক হল পরিভাষা নির্মাণ। পরিভাষা বলতে বোঝায় এমন শব্দ যা কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দের দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনও নির্দিষ্ট ধারণাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়, তাকে পরিভাষা বলে। বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি পরিভাষা নির্ভর আলোচনায় একটিমাত্র শব্দের মাধ্যমে যে অর্থ প্রকাশ করা যায়, একগুচ্ছ অন্য শব্দের সাহায্যেও অনেক সময় সেই সুনির্দিষ্ট অর্থ যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা যায় না।

সাধারণভাবে পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি হল-

১) বিদ্যাচর্চায়

২) গবেষণায়

৩) উচ্চশিক্ষা

৪) বুনিয়াদি শিক্ষায়।

৫) দৈনন্দিন জীবনে।

অর্থাৎ শুধুমাত্র বিদ্যাচর্চাতেই নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিভাষার ব্যবহার হয়ে থাকে। এপ্রসঙ্গে লোকগণিতের পারিভাষিক শব্দগুলির কথা বলা যেতে পারে। তেরিজ, জমা-খরচ, ওয়াসিল, ফজিল, কাঠাকালি, বিঘাকালি, জমাবন্দি, মোকরা জমাবন্দি, মোকরা মনকসা, মাস মাহিনা, বৎসর মাহিনা, আসল লাফা, মাঘট, সুদকষা, সোনাকষা, চেয়োকালি, সপকালি ইত্যাদি।

বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের ধারাটি একটি সুসংহত রূপ পেয়েছে মোটামুটি বিশ শতকের চারের দশকে। কিন্তু বাংলায় পরিভাষা নির্মাণ ও তার বিবর্তনের ধারাটির সূচনা পর্বে খেয়াল করলে দেখা যায় যথেষ্ট পরিমাণে পারিভাষিক শব্দের যোগান থাকা সত্ত্বেও ভাষা-সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় বাংলা পরিভাষা নতুন করে নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল মূলত দুটি কারণে।

১) ভাষাকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য ।

২) বিদ্যাচর্চাকে মাতৃভাষায় সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

আঠেরো শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ হয়। যার ফলে ভারতীয় সরকারি বিচারবিভাগে যে সমস্ত রেগুলেশনগুলি নথিভুক্ত আছে সেগুলি মফস্বল আদালতে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ আসে। উইলিয়াম হেস্টিংস এর নির্দেশে নাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেড 'আ কোড অফ জেন্টু ল'জ বা হিন্দু স্মৃতি সংহিতা (১৭৭৬) প্রকাশ করেন। যেখানে সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে পরিভাষা নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপর ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে জনাথন ডানকান-এর 'মপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম' বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে প্রকাশিত হয়। এখানেই প্রথম বাংলা পরিভাষা নির্মাণের একটা চেষ্টা দেখা যায়।

অন্যদিকে এই সময় শাসকশ্রেনির সংস্কৃতিকে দুর্বলভাবে অনুসরণ (বা অনুকরণ) করাই নতুন শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেনির রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ এর বিরুদ্ধে নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিল। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এদেশীয় কৃষ্টি-কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় চেয়েছিলেন। তারই অনুষঙ্গে অনুবাদের ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রশাসনিক স্বার্থেই ইংরেজি ভাষায় যে সমস্ত আইন প্রণীত আছে তার বাংলা অনুবাদের পক্ষে মত দেন কর্নওয়ালিস, ডানকান, এডমনস্টোন, ফরস্টার, রবিনসন, উইলসন, আপজন, মিলার সহ অন্যান্য ইংরেজ প্রশাসক গোষ্ঠী। উপরমহলের প্রস্তাব মোতাবেক একদিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ, রাজীবলোচন, গোলকনাথ, চণ্ডীচরণ, তারিণীচরণ, হরপ্রসাদ, কাশীনাথ, পদ্মলোচন, রামরাম বসুর মতো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠী, অন্যদিকে কেরি, টমাস, মার্শম্যান, ওআর্ড এর মত শ্রীরামপুর মিশনারি গোষ্ঠী এই অনুবাদকর্মে মনোননিবেশ করেন। তাঁরা সচেতন ভাবে পরিভাষা নির্মাণে ব্রতী হননি কিন্তু তাঁদের লেখার মধ্যেই পরিভাষা নির্মাণের প্রথম পরিচয়পাওয়াতযায়।যেমন-

Banyan - মুচ্ছদি

public duties - মোতালকের কার্য্য

prohibited - নিসেধ

interior public servants - আমলাগণ

In the event of death - দৈবাধিন মরিলে

In the event of removal - সাক্ষাৎ না থাকিলে

Advance - তাগাবি

Dismiss - তগরী

Limi সরহদ্দ প্রভৃতি

তবে এইসময় ডানকান(১৭৮৫), এডমনস্টোন(১৭৯১), ফরস্টার(১৭৯৩) -এর মত প্রশাসকরা নির্দিষ্ট কিছু আদর্শকে সামনে

রেখেই সচেতনভাবে পরিভাষা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা মূলত যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেগুলি হল-

যাথার্থ্য

সারল্য

ভারসাম্য

স্পষ্টতা

দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা, বাংলায় পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম মাইলস্টোন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিদেশিদের হাত ধরে বিজ্ঞানচর্চা শুরুর অনেক আগেই এদেশীয় ফলিত বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য সম্পূর্ণ ভাবেই লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দের যোগানও বন্ধ হয়ে আসে। তাই মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রণয়ন আবশ্যিক হয়ে দেখা দেয়। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ফেলিক্স কেরির 'বিদ্যাহারাবলি' গ্রন্থে বাংলা পরিভাষা রচনা প্রথম প্রয়াস দেখা যায়। তিনি পরিভাষা রচনার একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করেছিলেন-

'অপর সকল বিদ্যা গ্রন্থে সংজ্ঞাশব্দ না হইলে নির্বাহ হয় না অতএব যে ২ স্থানে উপযুক্ত সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে তাহাই গৃহীতা (ভূ) হইয়াছে। কিন্তু যে স্থানে উপযুক্ত সংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই সেই ২ স্থানে সাবধান অনুসারে সংস্কৃত সংজ্ঞা গঠন গিয়াছে।'

অন্যদিকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হওয়া 'কিমিয়াবিদ্যার সার' গ্রন্থের ভূমিকায় জন ম্যাক বাংলায় পরিভাষা নির্মাণ সম্পর্কে বলেছেন -

'ইংরাজি পরিভাষিক শব্দসমূহকে অক্ষরান্তরিত করা উচিত অথবা তাদের অনুবাদ করা উচিত। এই নিয়ে তর্ক স্বীকার্য, রসায়নশাস্ত্রে যেসব পারিভাষিক নাম প্রচলিত তাদের অনুবাদের প্রয়াস পন্ডশ্রম মাত্র।'

'অক্ষরান্তরিত' করার সময় বাঙালির 'বাগযন্ত্রের উচ্চারণ সামর্থ্যে'র প্রতি নজর রেখে শব্দগুলিকে 'ঈষৎ কেটেছেঁটে মোলায়েম' করে নেওয়ার কথাও তিনি বলেছেন।

এই সময়পর্বে রচিত যে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাগুলি বাংলা পরিভাষা নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেছে, সেগুলি হল-

১৮১৯ : বিদ্যাহারাবলি- ফেলিক্স কেরি

১৮২৪: ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক কথোপকথন - জে ডি পিয়ারসন।

১৮২৫: A vocabulary of the various parts of the human body and medical and technical terms- পিটার বৃটন।

১৮৩৩: জ্যোতিষ- ফার্গুসন ইয়েটস কর্তৃক সংক্ষেপিত।

১৮৩৪: কিমিয়া বিদ্যার সার- জন ম্যাক।

১৮৩৪ :পদার্থবিদ্যাসার -ইয়েটস।

১৮৪৯: The London Pharmacopeia বঙ্গানুবাদ- মধুসূদন গুপ্ত।

এছাড়া স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 'মে গণিত' (১৮১৮), 'Ula Utata Bibaran', 'Lawson's History of the Lion' (১৮১৯), 'পশ্বাবলী'(১৮২২), 'পশ্বাবলী'(১৮৩৪), 'পাখি বিবরণ', 'Astronomy' (১৮৩৩), 'Camel Elephant' (১৮৫১), 'Map of the world' (১৮২১) প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকগুলি বাংলা পরিভাষা নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

শাসকের ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পিছনে রুটি-রুজির প্রয়োজন থাকে। উনিশ শতকে বাঙালির ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চায় মনোননিবেশ করতে অধিকাংশক্ষেত্রে বাধ্য করেছিল কর্মপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা। ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের জন্য সর্বপ্রথম শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে যা নিম্নগামী পরিস্রবন শিক্ষানীতি নামে পরিচিত। এর সাথে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে পোক্ত করতে দোভাষী তৈরীর লক্ষ্যে টমাস ব্যাবিংটন মেকলের মত শিক্ষাবিদদের তৈরি 'মেকলে মিনিটস' বা চুইয়ে পড়া নীতির (১৮৩৫ , ফেব্রুয়ারি) ফলে উপমহাদেশের মানুষ ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে আরো বেশি করে ঝুঁকেছিল। তাই ইওরোপীয় জ্ঞানচর্চাকে দেশীয় ছাঁদে ফেলে জনপরিসরে প্রচার করার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল।

অন্যদিকে এর সমান্তরালে এক ধরনের প্রতিরোধে সাহিত্যচর্চাও গড়ে উঠেছিল অনুবাদের মাধ্যমে। এই যে ইংরেজির সমান্তরালে দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার পরিসর, তাকেও গণমানসে প্রচার করার দাবি উঠতে থাকে। তাই নতুন করে দেশীয় ভাষায় পরিভাষা রচনার প্রয়োজন দেখা যায়। বিষয়টি আরো পরিস্কার হয় রাজশেখর বসুর 'বাংলা পরিভাষা' নিবন্ধ পাঠ করলে।

'আমাদের দেশে এখনও উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজি ভাষা, নিম্নশিক্ষায় মাতৃভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা উচ্চই হক আর নিম্নই হক মাতৃভাষায় যে শ্রেষ্ঠ বাহন তা সকলে ক্রমশ বুঝতে পারছেন। মাতৃভাষার প্রয়োগের উপযুক্ত পরিভাষা যতদিন প্রতিষ্ঠা লাভ না করবে ততদিন বাহন পঙ্গু থাকবে। অতএব বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক।' **(রাজশেখর বসু, বাংলা পরিভাষা, লঘুগুরু, ১৩৪৬, কলকাতা)**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, বি.এন.শীল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের একক ও সংঘবদ্ধ প্রয়াসে বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের একটি সুবিস্তৃত ও সংহত ধারা তৈরি হয়।

আমরা এই আলোচনাকে সংহত করতে মাতৃভাষায় শিক্ষা আন্দোলনের ধারা বজায় রেখে বাংলায় পরিভাষা নির্মাণে কিছু নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের একক প্রয়াসের কথা তুলে ধরব। এই ক্রমটি কেবল আন্দোলনের ধারায় কীভাবে বাংলা পরিভাষার নির্মাণ ও তার বিবর্তন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল তা নির্দেশ করে। এর বাইরেও এই সময়পর্বে আরও অনেকে একক প্রয়াসে বাংলা পরিভাষা নির্মাণের ধারাটিকে পুষ্ট করেছিলেন, সেবিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় বিশদে আলকপাত করা যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আলাদা কোনও আলোচনা নেই তবে বিজ্ঞান রহস্য বইটিতে বাংলা শব্দ গঠন সম্পর্কে তিনি যে স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা পরিভাষা নির্মাণের পক্ষেও ইঙ্গিতপূর্ণ। হাকসলি, টিনডাল, প্রকটর, লকিয়র, লায়েল, গ্লেসর, উইলিয়াম টমাস প্রমুখ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। ডঃ নবেন্দু সেন বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের বিষয়ে তিনটি সূত্র লক্ষ্য করেছেন।

এক) রূপান্তরিত, প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্তে কোনও স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নয়।

ভ্রাতৃভাব যত প্রয়োজন ভাইভাব ততটা নয়।

দুই) প্রচলিত তৎসম শব্দের তদ্ভব রূপ ব্যবহার করা উচিত নয়।

যেমন- জল (Water), অম্লজান(Oxygen)।

তিন) প্রয়োজনে নতুন সংস্কৃত শব্দ বাংলায় গ্রহণ করা আবশ্যক। যেমন ইংরেজি Gravitation শব্দটির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মাধ্যাকর্ষণ (সংস্কৃত) শব্দটির প্রয়োজন অনুভূত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার-এর তৈরি পরিভাষাগুলির তুলনা করলে দেখা যায়, অক্ষয়কুমারের ঝোঁক ছিল তৎসম শব্দের দিকে, বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম শব্দমূলক পরিভাষার প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য দেখাননি। প্রয়োজনের নিরিখে যে কোনও শব্দ গ্রহণে তাঁর সম্মতি ছিল, অপ্রয়োজনেই আপত্তি। প্রয়োজন বলতে তিনি মনে করেছিলেন -

কার্যকারিতা

স্বাভাবিকতা

সহজে ব্যবহারযোগ্যতা

এর ফলে একদিকে যেমন শব্দরোধ, পীড়াবীজ, তুষারকণা, জৈবনিক, প্রকৃতিবাদ, বর্ণরেখা পরীক্ষক, শব্দচ্ছেদ জাতীয় মৌলিক পরিভাষা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, অন্যদিকে রেলওয়ে ট্রেন, মাইল, সেকেন্ড, ফুট ফিট, অ্যাসিড, ফসিল, সোডাওয়াটার প্রভৃতি ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারেও উদারতা দেখিয়েছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'Scheme for the Rendering of European Terms into the Vernaculars of India' (1877) গ্রন্থে পরিভাষা সম্পর্কে মূল্যবান পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তারই সারসংকলন করেন প্রথমে ইংরেজিতে, পরে বাংলায়।

পরিভাষা গঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন-

Concept

Abstract name

Adjectival name

Thought process কে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

'বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশগত ও জাতিগত পার্থক্য সম্বন্ধ যতদূর না থাকে ততই কল্যাণ ... বিজাতীয় শব্দ বাঙালির কানে বড়ই ঠেকে এবং বাঙালির বাগযন্ত্র তাহার উচ্চারণে পরাঙ্মুখ। সুতরাং সেই সেই পারিভাষিক শব্দের প্রচারের কোন আশা নাই। বাংলা ভাষায় বাঙালির প্রকৃতির উপযোগী বিজ্ঞানের ভাষা সংকলন করিতে হইবে।' **(বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ)।**

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রথম বাংলায় ধারাবাহিক ও প্রণালীবদ্ধভাবে পরিভাষা প্রণয়ন, সংকলন, সংগঠন এবং আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর পরিভাষা বিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধ হল- 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', 'রাসায়নিক পরিভাষা', 'বাঙ্গালার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ', 'বৈদ্যক পরিভাষা', 'শরীর বিজ্ঞানের পরিভাষা'। এগুলি প্রথমে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, পরে 'শব্দকথা' গ্রন্থে (১৯১৭) গৃহীত হয়। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে তিনি পরিভাষা রচনার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রয়াসের বিচিত্র ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কন করে পরিভাষা নির্মাণের সুশৃঙ্খল পথ প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১) পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে যে শব্দটি প্রয়োগ করা হবে তার যেন একটি সুনির্দিষ্ট, বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট তাৎপর্য থাকে।

২) প্রত্যেক শব্দকে নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হবে। সেই শব্দের দ্বিতীয় অর্থের প্রয়োগ ঘটবে না। এটি পরিভাষা রচনার মূল সূত্র।

৩) ইংরেজি শব্দের অনুবাদ না করে তাদের অবিকল গ্রহণ করা যায় কিনা -এই কথা প্রথমে বিবেচনা করতে হবে। টেবিল, চেয়া, কোট, টেলিফোন, মিনিট, ডিগ্রীর মতো নিত্যব্যবহার্য শব্দ অকাতরে গ্রহণ করার কথা বলেন তিনি।

৪) সংস্কৃত ও চলিত বাংলা থেকে গৃহীত শব্দ পরিভাষায় ব্যবহার করার পক্ষপাতি ছিলেন তিনি।

অক্ষান্তর- latitude

লম্বান্তর - co lattitude

দেশান্তর- longitude

বস্তু -mass

হাওয়া -wind

কাজ- work

৫) 'সুবিধা, সরলতা, শ্রুতিসুখতার' দিকে দৃষ্টি রেখে 'ব্যাকরণ-এর খুঁটিনাটি ত্যাগ করে' পরিভাষা নির্মাণের পদ্ধতিকে তিনি সমর্থন করেন।

রাজশেখর বসু

'সাধারণে যে বস্তুর ইংরেজি নাম ব্যবহার করে, কেবল সাহিত্যের জন্য সে বস্তুর দেশী নাম রচনা পন্ডশ্রম মাত্র। মিস্ত্রি লোহা জুড়ীবার জন্য অ্যাসিটিলিন ও অক্সিজেন ব্যবহার করে তাহাকে 'অসিতলীন' ও 'অম্লজান' বা 'অক্ষজন' শিখাইবার চেষ্টা বৃথা।' **(রাজশেখর বসু, বাংলা পরিভাষা, লঘুগুরু, ১৩৪৬, কলকাতা)**

রাজশেখর বসুর মতে বাংলা পরিভাষা রচনার কাজে সীমাবদ্ধতা গুলি হল-

ক) ইংরেজি শব্দের নানা প্রতিশব্দ তৈরি হলেও কোনটি গ্রহণযোগ্য তা নির্বাচন হয়নি।

খ) সংগ্রহ হলেও অসম্পূর্ণ ।

গ) সাধারণের শব্দ সম্পর্কে রক্ষণশীলতা।

ঘ) ইংরেজি পরিভাষার বিপুল প্রতিষ্ঠা।

বাংলা পরিভাষা নির্মাণের পথ প্রস্তুত করতে গিয়ে রাজশেখর বসু 'লঘুগুরু' প্রবন্ধাবলীর 'বাংলা পরিভাষা' প্রবন্ধে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন-

১) দর্শন, মনোবিদ্যা, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যার ক্ষেত্রে বহু পরিভাষা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে এগুলি সহজেই গ্রহণীয়।

২) পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহু সংস্কৃত শব্দ নতুন করে গড়তে হবে। হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকেও পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করতে হবে।

৩) চন্দ্র, সূর্য, বুধ, হিমালয়, ভারত প্রভৃতি বিশেষ্যবাচক শব্দ আমাদের যা আছে তা থাকবে। যে নাম বহু প্রচলিত যেমন- প্রশান্ত মহাসাগর তাও থাকবে। অবশিষ্ট শব্দের ইংরেজি নাম গ্রহন করা যুক্তিযুক্ত।

৪) স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি দ্রব্যবাচক শব্দের দেশী নাম রাখাই যুক্তিযুক্ত।

৫) ধাতু, ক্ষার, অম্ল, লবণ, প্রাণী, মেরুদন্ডী প্রভৃতি বর্গবাচক শব্দের প্রাচীন বা নতুন দেশীয় নাম রাখাই বাঞ্ছনীয়।

৬) ক্রিয়াবাচক শব্দের অধিকাংশই দেশি হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'পারিভাষিক শব্দ পুরোনো জুতো বা পুরনো ভৃত্যের মতো। ব্যবহার করতে করতে তার কাছ থেকে পুরো সেবা পাওয়া যায়।...রচনার প্রসঙ্গে পরিভাষা যখন আপনি এসে পড়ে তখন সেটা মাপসই মানানসই হয়। পা রইল এ পাড়ায় আর জুতো তৈরি হচ্ছে ও পাড়ায় ব্যবহারের পক্ষে এটা অনেক সময় পীড়াজনক ও ব্যর্থ হয়। অপরপক্ষে নতুন জুতো প্রথমটা পায়ে আঁট হলেও চলতে চলতে পা তাকে নিজের গরজে আপনার মাপের করে নেয়। পরিভাষা সম্বন্ধেও সেরকম প্রায়ই ঘটে।' **(শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)**

পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিবেচনার মধ্যে ছিল-

1. বাংলা গদ্য ভাষার সম্ভাবনা কতটা ।
2. তার ঋণ গ্রহণের সামর্থ্য কতটা ।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা পরিভাষা সূত্র সন্ধান, পারিভাষিক শব্দ নির্মাণ ও নতুন তৈরি শব্দতালিকা সংকলিত হয়েছে 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের শেষতম সংস্করণে প্রায় ৯১৩টি রবীন্দ্রকৃত পারিভাষিক শব্দের তালিকা দেওয়া আছে। এগুলি সযত্নে অনুধাবন করলে আমরা রবীন্দ্রকৃত পরিভাষার কিছু সচেতন ভাবনার পরিচয় পাই-

এক) প্রয়োজনে পারিভাষিক শব্দ অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে। পরিভাষা যখন রচনা প্রসঙ্গে আপনি এসে পড়ে তখন তা মানানসই হয়।

দুই) পরিভাষা নির্মাণে মূল শব্দের স্মরণ নেওয়া যায় অথবা সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয় থেকে তা গড়ে তোলা যায়।

তিন) পরিভাষা প্রথমেই সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। ব্যবহার করতে করতে তা হয়ে ওঠে সকলের ব্যবহারযোগ্য।

চার) পরিভাষার ক্ষেত্রে সর্বজন ব্যবহারযোগ্যতা ও শ্রুতিসুখতার চেয়ে তিনি বেশি জোর দিয়েছিলেন প্রকাশ সামর্থ্যর উপর।

রবীন্দ্রকৃত কিছু পারিভাষিক শব্দের নমুনা-

Bagpipe-ব্যাঘ্রপাইপ,

Chair-আসন্দ

Lively-অতিজীব

Drop-দ্রপ্স

Popular -জনাদর

Aping-হনুকরণ

Amiable -প্রিয়চারী

Alarm-ভীতধ্বনি

Certificate -অভিজ্ঞানপত্র

Elected- বৃত

পরিশেষে বলা যায় ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গীয় অনুবাদক পদ সৃষ্টি, আদালতের ভাষারূপে ফারসির বিলুপ্তি ও বাংলার প্রবর্তন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, স্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস গতি লাভ করে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডানকান, রবিনসন, ফস্টার, উইলিয়াম কেরি, জনসন, ফেলিক্স কেরি, জন ম্যাক, বৃটন, পিয়ারসন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একক প্রয়াস যা পরিভাষা নির্মাণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলায় আইনি, প্রশাসনিক, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার ভিত্তি স্থাপন করে।

তবে বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের সঙ্ঘবদ্ধ পরিণত প্রয়াসের সূচনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হয়েছিল। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১৮৯৪ -১৯৩৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি (১৯৩৪), সত্যচরণ লাহার সম্পাদনায় প্রকৃতিপত্রিকা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পত্রিকা, এছাড়াও ভারতবর্ষ, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গশ্রী, প্রবাসী, সাহিত্য, প্রতিভা, বিশ্বভারতী, চতুরঙ্গ পত্রিকাগুলিতে পরিভাষা সম্পর্কে বহু আলোচনা মুদ্রিত হয়েছে। যা মাতৃভাষায় শিক্ষা আন্দোলনের ধারাটিকে পরিপুষ্ট করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা শব্দতত্ত্ব, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৮৬।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, শব্দকথা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, কলিকাতা, ১৩২৪(বঙ্গাব্দ)।

বসু , রাজশেখর, লঘুগুরু, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৯(বঙ্গাব্দ)।

সহায়ক পত্রিকা

আনিসুজ্জামান, পরভাষা ও পরিভাষা, *ইত্তেফাক*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, ও দত্ত, অপূর্বচন্দ্র, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর (সম্পাদিত), *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) ১৩০১ বঙ্গাব্দ ।

------, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা), ১৩০২ বঙ্গাব্দ ।

------, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* (১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা), ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

দত্ত, অপূর্বচন্দ্র, ‘পরিভাষা’, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* , মাঘ, ১৩০১।

বিশ্বাস, বীরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরাজি শব্দের বঙ্গানুবাদ, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* (বর্ষ ৬৬) ১৩৬৬ (বঙ্গাব্দ)।

মনসুর মুসা, ১৯৮৪, বাংলা পরিভাষা ইতিহাস ও সমস্যা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, অরুনকুমার, বাংলা পরিভাষা, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ফেব্রুয়ারি ২০, ১৯৭৭।

রহমান, আতেয়ার, পরিভাষা সমস্যা, *পরিক্রম,* ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

রায়, পুণ্যশ্লোক, বাংলায় পরিভাষা সংকলনের রীতিনীতি, *বিশ্বভারতী পত্রিকা,* মাঘ-চৈত্র, ১৮৭৯-৮০ (শক) ।

হুদা, নুরুল, বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমস্যা, *বাংলা একাডেমি পত্রিকা,* ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩৭৫ ।

....

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাস : প্রসঙ্গ স্থান-পরিসর

সন্দীপ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) :

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ক্ষুদ্র পনের বছরের জীবন-পরিসরে নয়টি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাশাপাশি বিশ-শতকের প্রথম দশকের বাংলা ও বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে 'ব্যতিক্রম'(১৩৩০), 'পক্ষান্তর'(১৩৩০), ও 'অনুক্রম'(১৩৩০)—এর মতো তিনটি পূর্নাঙ্গ সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। এছাড়াও 'অতিক্রম' উপন্যাসটি তিনি লেখা শুরু করলেও শেষ করে যেতে পারেননি। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অনেকটা নির্দিষ্ট। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের সবিশেষ বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ তার একটি বিশেষ দিকের উপর দৃষ্টি রেখেই প্রবন্ধের বাকি অংশ আমরা লেখার চেষ্টা করব—যা প্রবন্ধের নামকরণে 'স্থানিক পরিসর' বলে আমি চিহ্নিত করেছি। এখন সমস্যা হল, উপন্যাস বা আখ্যান গঠনে স্থানের ভূমিকা দু'দিক থেকে হতে পারে। প্রথমত—উপন্যাসের নির্বিশেষ গঠন প্রণালীর উপর ভিত্তি করে। যাকে বর্তমান সমালচোকেরা 'ন্যারাটোলোজির' আওতায় ফেলতে চান। অন্যদিকে সবিশেষ আখ্যানের একটি নান্দনিক দিক থাকে, যার অবস্থান আখ্যানের গঠনের উর্দ্ধে। অর্থাৎ যার দ্বারা পাঠক আখ্যানের সৃজিত বাস্তবের 'পেপার রিয়ালিটি'-কে তার চোখে দেখা, কানে শোনা পাশের বাড়ির কিংবা পাড়ার কাহিনি বলে বিবেচিত করে। যদিও ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে এরও একটা পোশাকি নাম আছে—'ক্যাথারসিস'। এর ফলেই পাঠক সরাসরি লেখকের আখ্যানে সৃজিত কাহিনির অভ্যন্তরে সহজেই নিজেকে একটা চরিত্রের সাথে সাযুজ্য রেখে হিসাব-নিকাশ কসতে থাকে। এখন স্থান আলোচনায় এই-যে দুটো সম্ভাবনার কথা আমরা বলার চেষ্টা করলাম—তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক নিয়ে প্রবন্ধের বিষয় ভাবনা স্থির করা হয়েছে।

সূচক শব্দ (Keyword) :

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থান-পরিসর, ব্যতিক্রম, পক্ষান্তর, অনুক্রম, আখ্যান, বাচন, সামাজিক উপন্যাস, কাহিনি, চরিত্র, ঘটনা ইত্যাদি।

শুরুর কথা—

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ক্ষুদ্র পনের বছরের জীবন-পরিসরে নয়টি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাশাপাশি বিশ-শতকের প্রথম দশকের বাংলা ও বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে 'ব্যতিক্রম'(১৩৩০), 'পক্ষান্তর'(১৩৩০), ও 'অনুক্রম'(১৩৩০)—এর মতো তিনটি পূর্নাঙ্গ সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। এছাড়াও 'অতিক্রম' উপন্যাসটি তিনি লেখা শুরু করলেও শেষ করে যেতে পারেননি। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অনেকটা নির্দিষ্ট। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের সবিশেষ বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ তার একটি বিশেষ দিকের উপর দৃষ্টি রেখেই প্রবন্ধের বাকি অংশ আমরা লেখার চেষ্টা করব—যা প্রবন্ধের নামকরণে 'স্থানিক পরিসর' বলে আমি চিহ্নিত করেছি। এখন সমস্যা হল, উপন্যাস বা আখ্যান গঠনে স্থানের ভূমিকা দু'দিক থেকে হতে পারে। প্রথমত—উপন্যাসের নির্বিশেষ গঠন প্রণালীর উপর ভিত্তি করে। যাকে বর্তমান সমালচোকেরা 'ন্যারাটোলোজির' আওতায় ফেলতে চান। অন্যদিকে সবিশেষ আখ্যানের একটি নান্দনিক দিক থাকে, যার অবস্থান আখ্যানের গঠনের উর্দ্ধে। অর্থাৎ যার দ্বারা পাঠক আখ্যানের সৃজিত বাস্তবের 'পেপার রিয়ালিটি'-কে তার চোখে দেখা, কানে শোনা পাশের বাড়ির কিংবা পাড়ার কাহিনি বলে বিবেচিত করে। যদিও ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে এরও একটা পোশাকি নাম আছে—'ক্যাথারসিস'। এর ফলেই পাঠক সরাসরি লেখকের আখ্যানে সৃজিত কাহিনির অভ্যন্তরে সহজেই নিজেকে একটা চরিত্রের সাথে সাযুজ্য রেখে হিসাব-নিকাশ কসতে থাকে। এখন স্থান আলোচনায় এই-যে দুটো সম্ভাবনার কথা আমরা বলার চেষ্টা করলাম, তার মধ্যে আখ্যানে দুটো দিকই খুবই গুরুত্ব পায়। এটা অনেকটা এরকম ভাবেও বলা চলে যে, আখ্যানে স্থান যদি হয় একটা 'মন' তাহলে 'ন্যারাটোলজি'র আলোচনা সেক্ষত্রে 'ভঙ্গি'। অন্যদিকে 'অ্যাস্‌থেটিক' বা নান্দনিক সবিশেষ দিকটি হল তার 'দেহ'। যাকে কেন্দ্র করে (কাহিনি+চরিত্র+ঘটনা)-গুলি আখ্যানে আবর্তিত হয়। এখন তাহলে প্রশ্ন মনে জাগতে পারে, তাহলে পাঠক ও লেখকের অবস্থান কি একটা আখ্যান নির্মাণে অতটা গুরুত্ব পায় না? অবশ্যয় পায়। তবে সেটা কাহিনিতলের বাইরে।

পাঠক কাহিনিতলের বাইরে স্থান পরিসরে অবস্থান করলেও, লেখকের যাতায়াত দুই ক্ষেত্রেই। কখনো সে কাহিনি তলের বাইরে থেকে কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করে, একের-পর-এক ঘটনার আবহ নির্মাণের যোগ-সাযুজ্যে, আবার পাঠকের প্রয়োজনে কিংবা চরিত্রের, ঘটনার দাবি মেনে কখনো কাহিনিতলের ভিতরেও প্রবেশ করতে পারেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে কিংবা বঙ্কিমের উপন্যাসে যেটা প্রয়শই দেখা যেত। যেমন, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'পাঠকের কোর্টশিপটা বোধহয় বড় ভালো ঠেকিল না'।[১] লেখক এখানে সরাসরি আখ্যানের কাহিনির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, পাঠক-এর কাছে কাহিনি বোঝানোর দায় সামলাতে। আবার 'শ্রীকান্ত'র মতো জীবন-নির্ভর উপন্যাসে আখ্যানের ভিতরের শ্রীকান্তই যেন লেখকের সত্তায় পাঠকের কাছে ধরা দিতে চায়। অর্থাৎ, বিষয়টা ঠিক এরকম,—

আখ্যানে স্থান পরিসর: কাহিনি, চরিত্র ঘটনা বনাম লেখক, পাঠক সম্পর্ক (কাহিনিতলের বাইরে ও ভিতরে)

উপরিউক্ত চিত্রের মাধ্যমে একটি বৃত্তের মধ্যে বিষয়টি দেখানো গেল। এই নিয়ে ব্যখ্যার প্রয়োজন বোধ করি না, কারণ না হলে অযথা প্রবন্ধের স্থান-পরিসর আবার বৃদ্ধি পাবে। এখন আসা যাক একটা আখ্যানের স্থান-পরিসর কতোগুল দিক থেকে আখ্যানের কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে কথায়—

- কাহিনিতলের বাইরে ও অভ্যন্তরের স্থানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে আখ্যানে বাঁক (Turning) আনতে পারেন লেখক। এক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক স্থান অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও মুক্ত পরোক্ষবাচনের (Free Indirect Discourse) দ্বারা লেখক আখ্যানের সৃজনে ব্যবহার করতেই পারেন।
- কাহিনিতলের অভ্যন্তরে দুই বা ততোধিক চরিত্রের স্থানিক অবস্থান ভিন্ন দেখিয়ে তাদের সংস্কৃতির ভিন্নতায় চরিত্রের মধ্যে দূরত্ব কিংবা নৈকট্য সৃষ্টি করতে পারেন লেখক।
- আবার আখ্যানে মূল-কাহিনির প্রয়োজনে উপকাহিনি নির্মাণে স্থানের গুরুত্ব প্রদান করতে পারেন লেখক।
- আখ্যানে বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে স্থানের সাথে পরিবেশের একটা মেলবন্ধন সৃষ্টি করতে পারেন লেখক।
- চরিত্রের মনোভাবনার প্রকাশে কখনো-কখনো স্থানের সক্রিয় উপস্থাপন ঘটিয়ে লেখক চরিত্রের, ব্যবহার, পেশাগত তারতম্য, অবস্থান, সংস্কৃতি-গুলিকে স্পষ্ট করে দিতে চান। মূলত এই দিকগুলি কাহিনির গঠনের বিশেষত 'সাংগঠনিক' দিকের উপর ঝোঁক রেখেই আখ্যানে স্থান নির্মাণ করে থাকেন লেখক, কিছুটা সচেতন কিংবা অবচেতন ভাবেই। আবার উপন্যাসে এই সাংগঠনিক ভিত্তিতেই নান্দনিক দিকটি প্রকটিত করে দেন ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে। দিকগুলি এক্ষেত্রে একই। উক্ত ক্রমানুসারে কাহিনি নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি দিক আমরা বলার চেষ্টা করেছি।

এবার, আলোচনায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি সামাজিক উপন্যাসের স্থানিক-উপাত্ত নিয়ে কাহিনির বিবর্তন বা কাহিনির বাঁকগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যতিক্রম', 'অনুক্রম', ও 'পক্ষান্তর'—এই তিনটি উপন্যাসের মূলকাহিনি গড়ে উঠেছে সমাজের অসমবর্ণ হিন্দু নরনারীর প্রণয় কাহিনি নিয়ে। নায়ক উচ্চবংশজাত, পিরুলি ব্রাহ্মণ। শিক্ষিত, গ্রাম-নিবাসী। অন্যদিকে নায়িকা শহুরে ব্রাহ্ম। হয় পতি অচ্ছ্যুতা, নচেৎ বিধবা। ফলে দুজনের মধ্যে প্রণয়ের সৃষ্টি হলেও সমাজ কিংবা উভয় পরিবারে পরিণতিতে বাধা দান। অর্থাৎ সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে তাদের প্রণয় সম্পর্ক অবৈধ। এমত মূলকাহিনির অবক্ষেপনে স্থানের গুরুত্ব কি কি

থাকতে পারে? আদৌ কি এমন অসমবর্ণ প্রণয় সমস্যায় কাহিনি গঠনে স্থানের ভূমিকা কিছু থাকে? সেই বিষয়টা আলোচনা করে দেখে নিতে চাইব এবার আমরা।

ব্যতিক্রম :

রাখালদাস একজন ঐতিহাসিক, তবে আখ্যান রচনা করতে যখন তিনি বসতেন তখন আবার তিনি সুনিপুণ গল্পাকার। ওঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সৃষ্ট আখ্যানে কোথায় কোনো মারপ্যাঁচ নেই, বাড়তি চটক ও চমক আনার চেষ্টা নেই, অথচ স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্তভাবে তিনি ঘটনার পর ঘটনা হৃদয়ের মালা গেঁথেছেন একান্ত মানবিকভাবে। এই কাহিনির মালা বুননে স্থান-কাল-পাত্রের ভূমিকা অত্যন্ত সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে কাহিনির ঘটনার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। ব্যতিক্রম উপন্যাসের কাহিনি-কাল উপন্যাসে প্রাপ্ত চিঠির তারিখের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। উল্লেখিত সময়পর্ব একবছরের। ১৩০৮-১৩০৯ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ বিশ-শতকের প্রারম্ভ কাল। গল্পটি শুরু হয়েছে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের পূজার ছুটি উপলক্ষে, এবং শেষ হয়েছে পরের বছর অর্থাৎ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে পরবর্তী পূজার পরবর্তী সময় পর্বে। এছাড়াও উপন্যাসে এই কালপর্বের প্রাচীন বাংলার সামজিক অবস্থান সম্পর্কে লেখক কাহিনিতে কয়েকটি মোটা দাগের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যা কাহিনির কাল নির্ধারণে প্রামাণ্যতা প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন, বিশ শতকের সূচনায় বাঙালির পোশাক সম্পর্কিত ধারণা প্রদান—

"খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার ছাত্র মহলে কাপড়ের উপর কামিজের ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছিল, তখন সবে মাত্র চুড়িদার আস্তিন ও ঢিলা মির্জ্জাই ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"[২]

আবার, অন্যদিকে সমকালে সমাজে বিবাহরীতির সম্পর্কে সামাজিক অবস্থানটি স্পষ্ট করেছেন লেখক বিনয় আর নির্মলের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে—

"দেখ এটা ১৯০১ সাল, আর বাঙ্গলাদেশে ইংরেজ রাজ্য। ভদ্র ব্রাহ্মণের কুমারী, তোর রূপে মুগ্ধ হয়ে গ্রেটনাগ্রীনেও যাবে না, তার সঙ্গে সিভিল ম্যারেজও হবে না।"[৩]

এভাবে উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে ছোটো-ছোটো কারিকুরির মধ্যে দিয়ে লেখক সময়পর্ব সম্পর্কে পাঠককে জানিয়েছেন। এই এক-বছরের সময়-কাল আবর্তিত হয়েছে কাহিনির স্থান ও তাকে আশ্রয় করে চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। যার ফলে ঘটনার সমস্যাগুলি স্থানভেদে চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে অবর্তিত হয়েছে। গল্পের কাহিনিটি চারটি স্থানে উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নে ঘটনার পরিসর অনুসারে স্থান-পরিসর ব্যয়ের একটি পরিসংখ্যান দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে,- (ঘটনাটি মোট চৌষট্টিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, এর মধ্যে শতকরা স্থানের অবস্থান)।

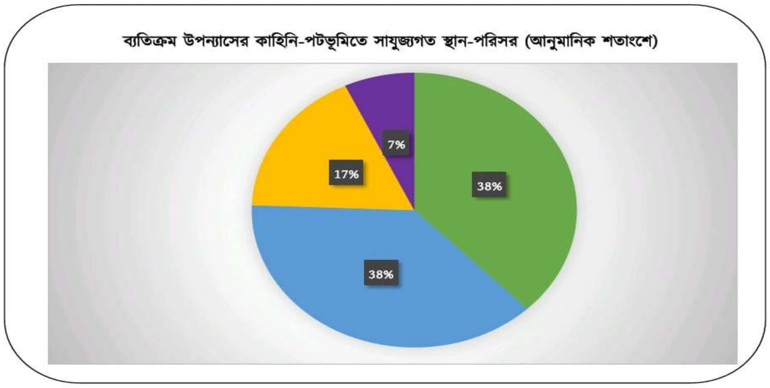

স্থান : গ্রাম-সমাজ (হরিহরপু ও শ্রীকৃষ্ণপুর)- ৩৮ শতাংশ (পাইচার্টে আকাশী বর্ণ দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে)

স্থান : নগরজীবন ও সমাজ (কলকাতা)- ৩৮ শতাংশ (পাইচার্টে সবুজ বর্ণ দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে)

স্থান : কাশী- ১৭ শতাংশ (পাইচার্টে হলুদ বর্ণ দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে)

স্থান : লক্ষনৌ- ৭ শতাংশ (পাইচার্টে ঘনসবুজ বর্ণ দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে)

গল্পটির প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে শহর কলকাতা ও নির্মলদের বাড়ির বর্ণনায় কালাতিপাত করেছেন লেখক, এবং এখানেই ইন্দুর প্রতি বিনয়ের পূর্বরাগের সূচনা। অর্থাৎ প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদেই কাহিনির মূল-সমস্যার সূচনাপর্বটি তৈরি করে নিয়েছেন লেখক। পরবর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে গ্রামজীবন-কে দেখানো হয়েছে। পূজার ছুটিতে নির্মল বিনয়ের বাড়ি হরিহরপুরে গিয়েছে। সেখানে ইছামতী নদীর ঘাটে সদানন্দ চক্রবর্তীর মেয়ে মোহিনীকে দেখে নির্মলের পূর্বরাগের বিষয়টি সেরে নিয়েছেন লেখক। এরপর ঘটনার ডিম্যান্ডে স্থান বদলাতে থেকেছে ক্রমশ। ইন্দুর নলিনাক্ষের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর হরশঙ্কর, বিনয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্নদার সঙ্গে বিয়ে দিলে ও অন্যদিকে অনুরূপ গৌরমোহনবাবু নির্মলের অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে উভয়ে মিলে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে দশম-পরিচ্ছেদে কাশী যাত্রা করেছে। সেখানে ভবসুন্দরী, অন্নদা ও সারদা সেবাদাস পরেশচন্দ্রের সঙ্গে তীর্থে যাওয়ার ফলে ঘটনায় একটি চমক সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কাশী ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তারা। পরে যখন ইন্দুর স্বামী নলিনাক্ষের মৃত্যু হয়, আত্মনির্ভর ইন্দু সেবাদাসীর কাজে যুক্ত হয়। তখন আবার বিনয়ের নিরুদ্দেশের উদ্দেশে কাশীর কথা কাহিনিতে প্রসঙ্গক্রমে চলে এসেছে। মূলত কাহিনিতে ঘটনাগুলি মূল-সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শেষে গ্রামে বিনয়ের বাড়ি হরিহরপুরের কথা প্রসঙ্গে কাহিনি শেষ হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখকের গ্রাম ও শহরের সমান পরিসরে গুরুত্বের দিকটি লক্ষনীয়। কাহিনির শুরু শহর কলকাতা দিয়ে শেষ হরিহরপুর গ্রামে। কাহিনির চিত্রণে স্থানের গতিরেখাটি সংক্ষেপে এইরকম—

কোলকাতা ----(শহুরে সমাজ জীবন) --- হরিহরপুর ----- (গ্রাম সমাজ জীবন)-----কলকাতা---- কাশী

শ্রীকৃষ্ণপুর --- কলকাতা—হরিহরপুর -কলকাতা – লক্ষনৌ – হরিহরপুর ।

উপন্যাসে প্রযুক্ত স্থানগুলোর কথা বলতে গেলে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয় কাশীকে। কারণ কাশী প্রযুক্ত হয়েছে গল্পের দশম-পরিচ্ছেদ থেকে ষোড়শ-পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনির দাবি মেনে। এই স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে সংসার-ত্যাগী মানুষের শেষ জীবনের সম্বল হিসাবে। এক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের মৃণালের কথা, কিংবা প্রভাতকুমারের কাশীবাসিনি গল্পটির কথা স্বরণ করতে পারি। রাখালদাসও এখানে কাশীকে ঘটনায় প্রযুক্ত করেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। কি সেই উদ্দেশ্য? একদিকে ইন্দুকে বিনয়ের না পাওয়া, অন্যদিকে মোহিনীকে নির্মলের না পাওয়া। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বিনয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভবসুন্দরীর ছোটো কন্যা অন্নদার হাত থেকে মুক্তি। এই উল্লিখিত কারণগুলি থেকে রেহাই পেতেই স্বাভাবিকভাবে বিনয় ও ইন্দু কাশী যাত্রা করেছে। কাহিনিতে লক্ষনৌ-এর কথাও এই প্রসঙ্গে বলা যায়। উপন্যাসে দুটি পরিচ্ছেদের কাহিনি-স্থান লক্ষনৌ। ষোড়শ ও ষটপঞ্চাশত্তম। বিধবা ইন্দু যখন নিজের মাথার চুল কেটে সমাজে বেঁচে থাকার তাগিদে সেবাদাসীর কাজে নিযুক্ত হয়, অন্যদিকে বিনয়কে বিবাহ করতে অমত করে, ঠিক সেই পরিস্থিতিতে বিনয়ের নিরুদ্দেশগমন দু'বার। দুবারই লক্ষনৌ। আবার কলকাতার মহানগরীকে শুধুমাত্র ঘটনার স্থান হিসাবে গল্পে প্রযুক্ত করেননি রাখালদাস, কখনও কখনও চরিত্রের মানসিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করে উপস্থাপিত করেছে। বিনয়ের মনে যখন ইন্দুর জন্য হাহাকার—ইন্দুর কামনায় সে চোখে শূন্য দেখছে, তখন কলকাতার মহানগরীকে রাখালদাস বিনয়ের চাওয়া-পাওয়ার সাথে কোথাও যেন এক করে দিতে চেয়েছেন এভাবে—

"রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, নিস্তব্ধ মহানগরী একটা সুপ্ত মহাদানবের মত ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল, বিনয় তাহাও বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে অভিসারিকার মত ঊষার ম্লানমুখ পূর্ব্বদিকে দেখা দিল। বিনয়ের দেহের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হইয়া, তাহার প্রায় বিকৃত মস্তিস্কে আক্রমণ করিতেছিল, হেমন্তের রাত্রি শেষের শীত সে একেবারেই অনুভব করিতে পারিতেছিল না। মানসিক উত্তেজনায় ও অনিদ্রায় তাহার চক্ষু দুইটা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, ঊষার ক্ষীণ আলোকে সমস্ত জগতের সঙ্গে তাহার শয়নকক্ষ ও গৃহসজ্জা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।"[৪]

অর্থাৎ, বিধবা ইন্দুর কামনায় তার মস্তক মুণ্ডনের চুল হাতে নিয়ে বিনয়ের মনের ভাবটি যেন স্থানের দ্বারা পরিপূর্ণ করতে চাইলেন লেখক। সেই জন্য হয়তো, নগর কলকাতার ঊষার আলোকে 'অভিসারিকা'র সঙ্গে এবং কামনার্থ বিনয়ের হৃদয়কে মহানগরের 'সুপ্ত মহাদানবে'র সাথে তুলনা করা হয়েছে বেশ দক্ষতার সঙ্গে।

স্থান-কালে সব মিলে গল্পের ঘটনাবর্ত একবারে জমাট করে তুলেছেন লেখক। একবছরের অতি সংক্ষিপ্ত সময় পরিসরের মধ্যে অপরিচিত, বিনয়, ইন্দু, অন্যদিকে নির্মল ও মোহিনীর প্রণয় গাঢ় ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। প্রথমে হরশঙ্করের জন্য বিনয় ও ইন্দুর বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে সদানন্দ চক্রবর্তীর জন্য নির্মল ও মোহিনীর বিয়ে সম্পন্ন হতে পারেনি। গৌরমোহনের জেদের জন্য

মদপ্য-লম্পট নলিনাক্ষের সঙ্গে ইন্দুর বিয়ে হয়েছে। তবে মন থেকে ইন্দু তাকে স্বামী বলে না মানলেও, একজন ট্রিপিকাল বাঙালি ঘরের বধুর মতো অদৃষ্ট মেনে নিয়ে নলিনাক্ষের ঘর করেছে। যদিও তার অত্যাচারে সে শেষমেষ গৌরমোহনবাবুর বাড়িতেই এসে উঠেছে। অন্যদিকে বিনয়ের বিয়ে হয়েছে, হরিহরপুরের লাগোয়া গ্রাম শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার ভবসুন্দরী দেবীর কনিষ্ঠ কন্যা অন্নদার সঙ্গে। অন্নদা কোনোদিনই বিনয়কে স্বামী বলে মেনে নেয়নি। সে ভালোবাসে বেশ্যা পুত্র পূর্ণশশীকে। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত সে পূর্ণশশীর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। এমন সময় রাখালদাস বিনয়ের মনকে ক্রমে ইন্দুর অভিমুখিন করেছেন অনাস্বাদিতপূর্ব এক স্বতন্ত্র রোম্যান্টিক অনুভূতির ক্রমিক বিকাশে।

পক্ষান্তর :

পক্ষান্তর উপন্যাসের কাহিনির গঠন নায়ক গোপীনাথ ও নায়িকা নির্মলার অবস্থানের দিকে তাকিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। দুজনের অবস্থান-অনুযায়ী ঘটনাধারা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে এগিয়েছে। কলকাতা থেকে পুরী, পুরী থেকে দার্জিলিং, দার্জিলিং থেকে নির্মলার শ্বশুর বাড়ি, নির্মলার শ্বশুর বাড়ি থেকে পুরীতে এসে কাহিনি শেষ হয়েছে। মাঝখানে কাহিনি দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িতেও যাওয়া আসা করেছে বেশ কয়েকবার, মন্দা ও রাধানাথের প্রয়োজনে। কলকাতা থেকে গোপীনাথ নিরঞ্জনের পরিবার নিয়ে পুরী ভ্রমণে গিয়েছে। সেখানে নির্মলার সঙ্গে তার প্রেমের সুত্রপাতও হয়েছে। অন্যদিকে শিলিগুড়িতে অবস্থানরত রাধানাথ ও মন্দা সম্পত্তির লোভে গোপীনাথের উপর আক্রমণকারী দুস্কৃতি পাঠিয়ে হত্যা করার চেষ্টাও করেছে। এরপর গোপীনাথ, নির্মলার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় সেরে উঠলে তার স্বভাব-বশে পুরী থেকে দার্জিলিং যাত্রা করেছে। সঙ্গে নির্মলাও গিয়েছে। গল্পও পুরী থেকে দার্জিলিং-এ পৌঁছেছে। সেখান থেকে নির্মলার হাত ধরে কাহিনি নির্মলার শ্বশুরবাড়ি রওনা দিয়েছে। শেষে কাহিনি পুরীতে বিজিতেন্দ্রর বাড়িতে এসে শেষ হয়েছে। পক্ষান্তরের স্থান-ভেদে কাহিনি-ক্রমটি এভাবে এগিয়েছে—

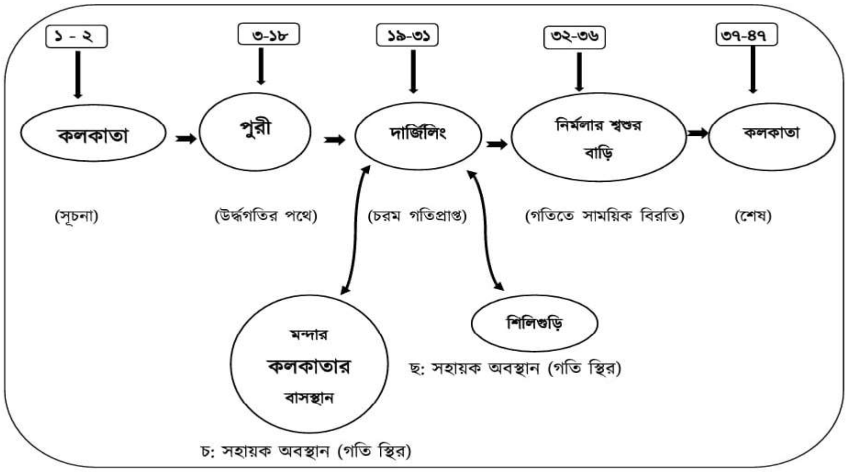

বি: দ্র:- (প্রতিটি স্থানের শীর্ষে সংখ্যা দ্বারা পরিচ্ছেদ সংখ্যা উল্লেখিত হয়েছে। স্থানের নিম্নে কাহিনির গতি উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে।)

অর্থাৎ, কাহিনির ক্রমটি চিত্র থেকে কিছুটা বোঝা যেতে পারে। গল্পে কাহিনির ক্রম একমুখী হলেও, দার্জিলিং-এ কাহিনির প্রয়োজনে স্থান আসা-যাওয়া করেছে দুটি ভিন্ন অবস্থানে। একদিকে মন্দার কলকাতার বাড়ি, অন্যদিকে শিলিগুড়িতে মন্দা ও রাধানাথের ভাড়া বাড়িতে। আবার, কাহিনির গতিভেদে স্থানের দিকে তাকালে দেখতে পাব, প্রথম দুই পরিচ্ছেদে কাহিনির সূচনা অংশটুকু বিবৃত। সেখানে শুধু গোপীনাথের কথাই ব্যক্ত। তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে আঠারো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনির স্থান পুরী, সেখানে কাহিনি উচ্চগতি প্রাপ্ত হওয়ার পথে এগিয়েছে। ১৯-৩১ নং পরিচ্ছেদ দার্জিলিং-এর পটভূমিকায় কাহিনি গড়ে উঠেছে। কাহিনি চরম উচ্চগতি ধারণ করেছে এখানে। ৩২-৩৬ নং পরিচ্ছেদে নির্মলার শ্বশুরবাড়ির গ্রামের কথা তুলে এনে মূল ঘটনাক্রমে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে এবং

উপন্যাসের শেষ দশটি পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ৩৭-৪৭ নং পরিচ্ছেদের কাহিনি-স্থান কলকাতা, গোপীনাথের বাড়ি। সেখানে কাহিনির বাঁক বদলেছে। আবার কখনো শিথিল হয়েছে। এভাবেই পরিসমাপ্তির পথে এগিয়েছে কাহিনিটি। শুধু ১৯-৩১ নং পরিচ্ছেদের মধ্যে ঘটনার স্থান ক্রমশ বদলেছে, মূলকাহিনির সহায়ক হিসাবে। চিত্রে আমরা সেই দুই স্থানকে যথাক্রমে 'চ' ও 'ছ' বর্ণে চিহ্নিত করেছি। অন্যদিকে উপন্যাসে কাহিনি বর্ণনে কালভেদে আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে চরিত্রের মানসিক অবস্থান লেখক মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন খুব দক্ষতার সাথে। পূর্বেই বলা হয়েছে উপন্যাসের কাহিনিকাল ১৯১৮ সালের ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় পরিসরের। মোট চার মাসের ক্ষুদ্র সময় পরিসর কাহিনিতে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসে আলোচ্য দুটি প্রকৃতির সঙ্গে চরিত্রের মিশ্র প্রতিক্রিয়া এই প্রসঙ্গে দেখানো যেতে পারে—

১। পুরীতে অবস্থানকালে সিধুকে বিজিতেন্দ্র দেখতে পারত না। তার কারণ সিদ্ধেশ্বরের রক্ষণশীল হিন্দু বাহ্মণ কালচারের জন্য। তার সমস্ত মাথায় একখানি টিঁকি ছাড়া সমস্তটাই মুণ্ডন করা। সে সর্বদা একটি সাদা ধুতি পরে থাকত। বড়োদের মাথা নিচু করে প্রণাম করত। আর এগুলো ছিল সাহেবী পোশাক পরিহিত বিজিতেন্দ্রর কাছে চক্ষুশূল। অন্যদিকে আরেকটি কারণ আছে, সিদ্ধেশ্বরের জন্যই নির্মলা তার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যেতে চেয়েছে, যেটা বিজিতেন্দ্র চায়নি। কিন্তু দার্জিলিং-এ এসে যখন নির্মলা দেখল সিধু গোপীনাথের খুব প্রিয় পাত্র হয়ে উঠছে তখন তার মনে এক অভুতপূর্ব আনন্দ হলো। গ্রন্থে এই পরিস্থিতির সঙ্গে লেখকের প্রাকৃতিক মেলবন্ধন উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে—

"বর্ষা আরম্ভ হইয়া গেল। গ্রীষ্মের শেষের দিকে পুরী ছাড়া হইয়াছিল, সুতরাং দার্জিলিং-এ একপক্ষ কাটিবার পূর্ব্বেই বর্ষা আরম্ভ হইয়া গেল, এত বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে বাড়ির বাহির হওয়া দুস্কর হইয়া গেল।"[৫]

প্রতীক: গ্রীষ্ম = বিজিতেন্দ্রর বিধুর প্রতি বিরূপতা। বর্ষা = গোপীনাথের সিধুর প্রতি ভালবাসা।

(উভয় কারণে দার্জিলিং স্থান-পরিসর কাহিনিতে গুরুত্ব পেয়ে যায়)

২। সিধু ব্যাধিতে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। অন্যদিকে গোপীনাথ এসে দাঁড়িয়েছে তার দ্বারে। ফলে 'আমারি দুয়ারে কেন আসিল/নিশি ভোরে যোগী ভিখারী' চিন্তনে নির্মলার পরিস্থিতি গোপীনাথের প্রতি দুর্বল। আবার মাতৃপ্রেমের কারণে সিধুকেও সে ছাড়তে পারছে না। অর্থাৎ এই দ্বিবিধ প্রেমের টানে নির্মলার মধ্যে একটা দোলাচলের সৃষ্টি করেছেন লেখক। সে কথা যেন প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন অতি যত্ন সহকারে। যেমন—

"সে দিনটা বড় সুন্দর। প্রথম বর্ষার পর মেঘ কাটিয়া দূরে তুষার মণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা নিজের বিশাল শুভ্রদেহ নীল আকাশের মধ্যে উন্নত করিয়াছিল, অস্তাচলগামী সূর্য্যের শেষ আলো তুষারের উপরে ঘন ঘন লাল হইতে ক্রমশ নীলাভ হইয়া আসিতেছিল।"[৬]

প্রতীক: তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা = গোপীনাথ। অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ আলো = সিধু

(দার্জিলিং-এর পার্বত্যময় শুভ্র সকালের অবস্থান এক্ষেত্রে কাহিনির স্থান পরিসরে জায়গা করে নিয়েছে, চরিত্রের মনোবিকলনের অন্য ভূমিকায়)

অনুক্রম :

উপন্যাসের কাহিনি গঠনে প্রযুক্ত স্থানগুলির কথা বলতে হলে তিনটি স্থানে ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের শুরু থেকে ১৪ নং পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটনা স্থান শিলং-এর ভুটিয়া পল্লী ও তার আশে-পাশের এলাকা। ১৫ নং থেকে ২১ নং পরিচ্ছেদের ঘটনা স্থান কাশীর বাঙ্গালীটোলা ও তার আশে-পাশের এলাকা। তারপর ঘটনা স্থান ক্রমে বদলেছে। যেমন—

২২ নং পরিচ্ছেদ—শিলং, ২৩ নং পরিচ্ছেদ—কাশী, ২৪ নং পরিচ্ছেদ—শিলং ২৫ নং পরিচ্ছেদ—কাশী, ২৬/২৭/২৮ নং পরিচ্ছেদ—এলাহাবাদ রেইল ষ্টেশন ও তদ্সন্নিকট বাংলোবাড়ি, ২৯/৩০ নং পরিচ্ছেদ—পুনরায় কাশী হয়ে, কলকাতা এবং উপন্যাস শেষ হয়েছে ৩২ নং পরিচ্ছেদে এসে শিলং-এ। অর্থাৎ, এই ঘটনার বিন্যাসে স্থানের একটা বিশেষ গুরুত্ব লেখক নির্মাণ করেছেন, সে কথা পরে বলছি, তার আগে ঘটনা বিন্যাসে 'অনুক্রম' উপন্যাসের স্থানিক-পরিসরের ক্রমটুকু দেখে নেওয়া যেতে পারে—

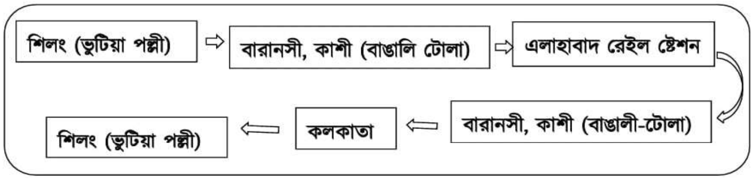

অর্থাৎ, উপন্যাসের সূচনা অংশের ঘটনাস্থান শুরু হয়েছে শিলং-এ। এবং শেষও হয়ছে এসে শিলং-এ। লেখক উপন্যাসে শিলং-এর ঘটনা নির্মাণ করেছেন প্রথম পনেরো অধ্যায় জুড়ে। সেখানে উপন্যাসের মূলকাহিনির ক্ষেত্রটি তিনি প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। একদিকে নায়িকা মণির অসহায় জীবনে বেঁচে থাকার লড়াই, অন্যদিকে অনুপমের মধ্যে মণির প্রতি প্রেমের দুর্বলতার নানান ইঙ্গিত তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে কাহিনি গঠনে স্থান পরিসরে শিলং অপেক্ষা কাশী অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে এসেছে। ঊনিশ কিংবা বিশ-শতকের বাংলার সমাজ-জীবনে কুলত্যাগী কিংবা বিধবা, বৃদ্ধা নারীদের শেষ ভরসার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল কাশী। বাংলা সাহিত্যে কাশী একটি গুরুত্ব স্থানও বটে। কুলত্যাগী নারীদের শেষ অবস্থান হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বারবার এই কাশী প্রসঙ্গ এসেছে। সেই কারণে হয়তো প্রথা মেনে অনুক্রমে রাখালদাসও কুলত্যাগিনী মণিমালিনীর শেষ অবস্থান হিসাবে কাহিনির প্লট টেনে নিয়ে গিয়েছেন কাশীতে। মণির কাশী যাওয়ার পূর্বে তার মুখের সংলাপগুলিই প্রমাণ করে তার অসহায়ত্বের কথা। মাসিমা যখন জিজ্ঞাসা করে এরপর কোথায় যাবে সে? তার উত্তরে মণি বলে—

"বন্যার মুখে তৃণের মত ভাসতে ভাসতে আপনার দুয়ারে এসে উঠেছিলুম, আবার ভাসতে ভাসতে আরম্ভ করে দেখি, কোথায় গিয়ে কূল পাই!"[৭]

সেই 'কূল' যে কাশীই হবে সে কথা আর পাঠকের ধরতে বাকি থাকে না। কারণ লেখক তার পূর্বে পাঠকের সামনে কিছুটা হলেও আভাস দিয়েছিল কাশীবাসিনীর প্রসঙ্গ টেনে—

"কাশীবাসিনী দুই সম্প্রদায়, স্থিরমতি ও অস্থিরমতি। মণি স্থির হইয়া যাইবে।"[৮]

'অনুক্রম' উপন্যাসে ঘটনাস্থল হিসাবে বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে কয়েকটি জায়গা তার মধ্যে অন্যতম হলো, শিলং-এ হারানচন্দ্রের বাড়ি, কাশীতে বাঙালিটোলায় তারাপদ বাবুর বাড়ি, এলাহাবাদ রেল ষ্টেশন, এলাহাবাদে ফণীন্দ্রনাথের বাংলো বাড়ি ইত্যাদি। স্থানগুলিতে কাহিনির অধিকাংশ প্লটই পরিবর্তিত হয়েছে। কাহিনির বাঁক সৃষ্টি করেছে। যেমন—

- শিলং-এ হারানচন্দ্রের বাড়ি— স্বামী পরিত্যাক্তা মণি দীর্ঘ পনেরো বছর পর তার স্বামী নিতাইসুন্দরের দেখা পেয়েছে। ফলে উপন্যাসে চলে আসা কাহিনির ক্রমে লেখককে বদল ঘটাতে হয়েছে। মণিকে শিলং ছেড়ে কাশীতে চলে যেতে হয়েছে। মণির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনিও শিলং ছেড়ে কাশীর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে।
- কাশীতে বাঙালিটোলায় তারাপদ বাবুর বাড়ি—নারীলোলুপ ফণীন্দ্রনাথের ভয়ে মণিকে পুনরায় কাশী ছেড়ে এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়েছে। কাহিনিতে এসেছে নতুন বাঁক। কারণ, অনুপম ততক্ষণে নিজের প্রেম প্রকাশ ক'রে দিয়েছে মণিকে। অন্যদিকে ফণীন্দ্রনাথ মণিকে ভোগ করার জন্য মুখিয়ে আছে। এমত দ্বিবিধ পরিস্থিতিতে মণির সিদ্ধান্ত কাহিনির গতি অন্য আরেকদিকে বাঁক সৃষ্টি করেছে।
- এলাহাবাদ রেল ষ্টেশন—ফণীন্দ্রনাথ মণিকে খুঁজে পেয়েছে। রেল স্টেশনের পুলিশ ও জনতার সামনে নাটকের আশ্রয় নিয়ে নিজেকে মণির স্বামী বলে প্রতিপন্ন করেছে। জোরপূর্বক মণিকে তার বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। এখানে আখ্যানের কাহিনি চরম গতি প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ, পাঠক তখনও জানে না, মণির কপালে কি ঘটতে চলেছে।
- এলাহাবাদে ফণীন্দ্রনাথের বাংলো বাড়ি—উপন্যাসের শেষ প্লটটি লেখক এখানেই নির্মাণ করেছেন। বলতে গেলে মণির পরবর্তী জীবনের ভাগ্য এখানেই গড়ে উঠবে। ফণীর বুদ্ধিকে পরাস্ত করে, নিজের উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে, মণি ফণীন্দ্রনাথের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। মণি, ফণীকে বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। পাঠক একদিক থেকে ভয়ে থাকে মণির পরবর্তী জীবন নিয়ে। কিন্তু পরে আমরা দেখি ফণীর তেমন কিছুই হয়নি। বরঞ্চ এই ঘটনার পর অমানুষ ফণী মানুষে পরিণত হয়েছিল।

অর্থাৎ, 'অনুক্রম' উপন্যাসের কাহিনি গঠনে এই চারটি স্থান বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। উপন্যাসের গতি কখনো প্রয়োজনে বৃদ্ধি করেছে, আবার কখনো প্লটের পরিবর্তন ঘটিয়ে পাঠকের মনে চমক সৃষ্টি করেছে। লেখকের এই স্থান নির্মাণ অবশ্যই কাহিনির সাপেক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

শেষের কথা—

আখ্যান পরিসর গড়ে তুলতে চরিত্র, ঘটনার, সঙ্গে সঙ্গে স্থানের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকবেই। কারণ, স্থান ব্যতীত কাহিনির ঘটনার সংঘটন সম্ভব নয়। তবে, আখ্যানে স্থান দুটি দিক থেকেই আলোচনায় আসতে পারে, এক, সদর্থক স্থান। দুই, নিরির্থক স্থান। সদর্থক ক্ষেত্রে আখ্যানে স্থানই হয়ে উঠবে কোনো একটি চরিত্র, ঘটনা, বা মূল ঘটনার সমস্যার পরিপূরক। অন্যদিকে নিরর্থকের ক্ষেত্রে তেমনটা নাও ঘটতে পারে। শুধু মাত্র আখ্যান বাচনে ঘটনার অবস্থান ভেদে লেখক ক্রিয়াহীন স্থানের অবলোকন করতেই পারেন। রাখালদাসের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে এই দুই ধরণের স্থানই ব্যবহৃত হয়েছে লেখকের সুদক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে—সেই কথাই উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে।

মূলগ্রন্থ :

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, ব্যাতিক্রম, শ্রী কালিকিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড, এলাহাবাদ। প্রথম প্রকাশ—৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, পক্ষান্তর, শ্রী কালিকিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড, এলাহাবাদ। প্রথম প্রকাশ—কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, অনুক্রম, শ্রী কালিকিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড, এলাহাবাদ। প্রথম প্রকাশ—কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

সহায়ক-গ্রন্থ ও তথ্য-সূচি একত্রে:

(প্রথমে ক্রমানুসারে তথ্যসূচি, পরে প্রবন্ধে সহকারী কিছু সয়াহক গ্রন্থের নাম প্রদান করা হলো।)

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজসিংহ, আদিত্য প্রকাশালয়, ২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা, ২৩।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, ব্যাতিক্রম, পৃষ্ঠা, ০১।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা, ১৭৩।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা, ২৪৮।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, পক্ষান্তর, পৃষ্ঠা, ১২২।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা, ১৪৭।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, অনুক্রম , পৃষ্ঠা, ৬৫।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা, ৮২।

চক্রবর্তী, অলোক কুমার, আখ্যানের তত্ত্বভুবন, আশাদীপ, ২০২১, কলকাতা—৯।

দাস, আমিতাভ, আখ্যানতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং,২০১৯, কলিকাতা—৯।

Dijk, Tenna Van (Ed.), Discourse and Literature, Johon Benjamins Publishing Compaany, 1995, Amsterdam/ Philadelphila.

Fowler, R (Ed.). Style and Structure in Literature, Oxford, 1975, Basil Blackwell.

Todorov, Tzvetan, The place of style in the structure of the text, Oxford University Press, 1971, London & New york.

....

অমর মিত্রের উপন্যাসে 'সময় থেকে সময়ান্তরে যাত্রা' : একটি পর্যালোচনা

দীপক পাত্র

গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

অমর মিত্রের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্থানীয় অতীত ঐতিহ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান নিয়ে উপন্যাসের আখ্যান নির্মিত হয়েছে ।'পাহাড়ের মত মানুষ' উপন্যাসে ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর অঞ্চলের ভূমির অধিকার নিয়ে সংগ্রাম-নিজের চোখে দেখেছেন।এর নেপথ্যের পূর্ব ইতিহাস সন্ধান সন্ধান করে বর্তমান ও অতীতের মেলবন্ধনে কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন। 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসে কালিদাসের সময়ের উজ্জয়িনী আর বর্তমানের উজ্জয়িনীর প্রভূত পার্থক্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে ঐতিহ্যময় ভারতীয় প্রাচীন জনপদ ও বর্তমানের অরাজক পরিস্থিতির তুলনা করেছেন। 'অশ্বচরিত' উপন্যাসে ভগবান বুদ্ধের তপস্যা কথা, তাঁর পক্ষীরাজ ঘোড়াকেও দীঘার হোটেল কর্মী ভানুর হারানো ঘোড়ার রুপ নিয়ে সময়ের সীমারেখা ছিন্ন করে হিংসা-বিদ্বেষী পৃথিবীতে বুদ্ধের পুনরায় আগমনের প্রসঙ্গ এনে শান্তির কামনা করা হয়েছে। প্রতিটি উপন্যাসে বর্তমান প্রেক্ষিত থেকে অতীত প্রসঙ্গে আখ্যানের সময় প্রবাহিত হয়েছে।

সূচক-শব্দ (Key word):

অমর মিত্র, ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা, পাহাড়ের মত মানুষ, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের জনজীবন, অতীত ইতিহাস, ধ্রুবপুত্র, উজ্জয়িনী, অতীত ঐতিহ্য, অশ্বচরিত, বুদ্ধের ঘোড়া, শান্তির বাণী, ধনপতির চর, ভুমিউচ্ছেদ, রূপকথা, পুরাণ প্রসঙ্গ, উপন্যাসের সময় যাত্রা।

অমর মিত্র 'মেলার দিকে ঘর' গল্প লিখে সাহিত্য যাত্রা শুরু করেন। পিতা হয়ে নিজে কন্যাকে বিক্রির জন্য মেলার দিকে এই যাত্রা যেন লেখকেরও সাহিত্য সৃষ্টির যাত্রাপথের মূল-সুরটিকে সূচিত করেছিল। মনিজের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে নাগরিক জীবনের সামনে এক অপরিচিত ভারতবর্ষের সন্ধান দিয়েছিলেন—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর ও সুবর্ণরেখা নদী-পাড়ের মানুষের যাপন চিত্র এঁকে। শ্রী মিত্রের উপন্যাসের কাহিনিও কেন্দ্র থেকে প্রান্তে, শহর হতে পাড়াগ্রামের নিম্নবর্গীয় মানুষের দিকেই যাত্রা। শুধু বর্তমান সময়ের ভারতের দিকেই নয়, কালের গভীরে হারিয়ে যাওয়া অতীত ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রাচীন জনপদের বিভিন্ন রূপকথা, লোকাচার, কিংবদন্তি ও মিথ হয়ে থাকা বিভিন্ন পুরাণ কথাকে নতুন আঙ্গিকে পুণঃনির্মাণ করেছেন। তাই তাঁর আখ্যানের 'সময়' প্রায়শই অতীব প্রাচীন থেকে নিকট অতীত ও বর্তমানের সীমা অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশক হয়েছে। তাই সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য অমর মিত্রকে 'সময়ের নথিরক্ষক' (উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা) আখ্যা দিয়েছেন।

প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন—তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। একইসঙ্গে যাপিত জীবনকালের সাক্ষী হিসেবে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনার প্রভাব রয়ে যায় কাহিনির অন্তরে।কথাকার অমর মিত্রের সাহিত্যে তা পুরোমাত্রায় লক্ষণীয়।

১৯৫১ সালে পূর্ব-বাংলার সাতক্ষীরা জেলার ধুলিহর গ্রামে জন্ম তাঁর। শৈশবেই পিতা-মাতার হাত ধরে দেশ ত্যাগ। ছোটবেলা থেকেই মা'র মুখ থেকে জন্মভিটে, আত্মীয়-স্বজন, শৈশব-স্মৃতি এবং দেশভাগের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা হৃদয়ে গেঁথে থাকে। এই যন্ত্রণা তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে।পরবর্তীতে অমর মিত্রকে ল্যাণ্ড বিভাগের চাকরিসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষেরসঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়। এসময়ে তিনি দু'চোখ ভরে দেখেছেন তাদের যন্ত্রণাকে,উপলব্ধি করেছেন হৃদয়ে। মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রকৃতির সম্পর্ক, এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাসে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। নিরন্ন, আধপেটা, মাড়-ভাত খাওয়া দেশবাসীর বিপন্নতা দেখে নিজের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁদের হয়ে কলম ধরেছেন।তাই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে ক্রমশ জীবন-যন্ত্রণার আখ্যান। মানুষের এই আনন্দ বেদনাকে ধরতে গিয়ে অনেক সময় মাটি চাপা পড়ে থাকা সুপ্রাচীন গল্পকথাকে নতুন ভাষায়, নতুন শব্দে, নতুন করেমহাকালকে সমকালে ফিরিয়ে আনেন। সময়ের এই নিরন্তর প্রবহমানতা উপন্যাসে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

'পাহাড়ের মত মানুষ' উপন্যাসটি অমর মিত্রের সাহিত্যজীবন ও কর্মজীবনের একেবারে শুরুর সময়কার রচনা। ঝাড়গ্রাম সংলগ্ন গোপীনাথপুর কলাবনি অঞ্চলের ১৯৭৭-৭৮ সালের সময়ে জমির মালিকানা ও হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে ভূস্বামী, ভাগচাষী, আদিবাসী শ্রেণির মানুষের জাগরিত ধ্বনিতে অস্থির হয়েছিল এলাকা। লেখক এই বাস্তব প্রেক্ষাপটের নেপথ্যের শেকড় খুঁজতে এলাকার অতীত সময়কে অনুসন্ধান করেছেন। আর তাতেই উপন্যাসটিতে প্রচ্ছন্নভাবে ছায়া ফেলেছে অষ্টাদশ শতকের সুবর্ণরেখা তীরবর্তী ঝাড়গ্রামে মঙ্গলরাজাদের রাজত্বকাল থেকে জমিদার, ভূ-স্বামী, জোতদার, ওঅধিকার থেকে বঞ্চিত আদিবাসী থেকে অন্য প্রাচীন জনজাতিরদের ধারাবাহিক ঘটনাক্রম। রাজা হতে জোতদারদের হাতে ভূমির হাতবদল নিয়ে একটি প্রসঙ্গ এরকম- মঙ্গলরাজকে শালগ্রাম শিলার মোহে ফেলে ব্রাহ্মণ শংকরদাসের রাজানুকূল্য লাভ করার প্রসঙ্গটি অদ্ভুত—

"এক প্রহর ঘোড়া ছুটিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ শংকরদাস সথপথী হয়ে উঠলেন শংকরদাস প্রহরাজ সতপথী। কংসাবতীর তীরে এসে ঘর বাঁধলেন, দেবতা সঙ্গে আছেন। আস্তে আস্তে জ্বলে উঠল প্রহরাজ বংশের প্রদীপ, নদীর তীরে কলাবনিতে মাথা তুলে দাঁড়াল বিশাল রাজগৃহ। নারায়ণের জন্য তৈরি হল মন্দির। চারপাশের সত্তরটা মৌজা নিয়ে রাজত্ব শুরু করলেন প্রহরাজ বংশের মানুষ"।[১]

এইভাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, দেবত্ব সম্পত্তি, জমিদার, রাজতন্ত্রই ত্যাদির প্রসঙ্গ টেনে লেখক বোঝাতে সক্ষম যে—সময়ের পদচিহ্নে জমির মালিকানা কিভাবে হাতবদল হয়ে আসছে। এই চিত্র যে শুধু নির্দিষ্ট কোন এলাকার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ;তা নানান রূপে ধরা দেয় তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও।

উপন্যাসে দীপঙ্কর চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে নিয়ে যান পাঠককে। ফা-হিয়েন, হিউ-এন সাঙ-এর ভ্রমণপথে ভারতের মানচিত্র বগলে নিয়ে দীপঙ্কর সমগ্র দেশের ভূ-ভাগকে দেখাতে চান।লর্ড কার্জনের ভারতবর্ষ হয়ে ক্রমে-ক্রমে ১৯৭৮ এর ভারতে পা রাখেন। মাঝপথে গোবি মরুভূমি, মাঙ্গোলিয়া, কপিলাবস্তু, তাম্রলিপ্ত থেকে গয়া-কাশী, বারানসি ও পাটলীপুত্র হয়ে সমগ্র ভারতের ভূ-মানচিত্রকে এক রেখায় এনে ঝাড়গ্রাম-এর কলাবতির সঙ্গে মিলিয়ে দেন। সেইসঙ্গে ১৯৭৮ এর ঝাড়গ্রাম সংলগ্ন এলাকার প্রবল বন্যা এই সমস্ত জমি অধিকার প্রমাণ স্বরূপ দলিলপত্র কংসাবতী সুবর্ণরেখার গ্রাস করার প্রসঙ্গ টেনে লেখক জমি কেন্দ্রিক এই শ্রেণি-বিভাজকদের বোঝাতে চেয়েছেন ; ভূমি আসলে মানুষের নয়, প্রকৃতির।

এইভাবে বর্তমানের সমস্যার সূত্রে অমর মিত্র অতীত-বর্তমানের দূরত্ব ঘুচিয়ে সমগ্র ভারতের জমি হারানো মানুষের ধারাবাহিক সংঘটিত সংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেইসঙ্গে ফেলে আসা অতীত সময় ও বর্তমান সময়ের প্রবাহমান যাত্রায় সংযুক্ত করেছেন মানুষের জীবনযাত্রাকে।

'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের পটভূমি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে বর্ণিত প্রাচীন উজ্জয়িনী। ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ খ্যাত গুপ্ত-শাসনের সেই প্রাচীন স্বপ্নরাজ্যে একরাশ কৌতূহল নিয়ে অমর মিত্র পৌঁছেছিলেন আত্মীয়তা সূত্রে। সেখানের বাস্তব পরিস্থিতি দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন,'আমার লেখালেখি' নামক প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন_

"বর্ষার উজ্জয়নী গিয়ে দেখি সে দেশে বর্ষা হয়ই না। যে নগরের কবি 'মেঘদুত' কাব্য লেখেন সেই নগরে ন্যূনতম বৃষ্টি হয়ে থাকে। জলকষ্ট খুব। গ্রীষ্মকালে দু-দিন অন্তর জলপায় নগরবাসী। সমস্ত বছরে ১৭-১৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু আকাশে মেঘ কই? উজ্জয়িনী, দশার্নদেশ (বিদিশা নগরী) কোথাও তো তেমন বৃষ্টি হয় না, অথচ কবি কিনা মেঘের কথাই লিখে গেছেন। তখন মনে হয়েছিল 'মেঘদূত' কাব্যটি কি আসলে মেঘের আকাঙ্ক্ষা? যে দেশে মেঘেরই তেমন গভীর আনাগোনা নেই, সেই দেশের কবি যখন মেঘের কথা লেখেন, তখন তো মেঘের আকাক্ষার কথাই মনে করিয়ে দেয়। মেঘ ও বৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন বৃষ্টিহীন পৃথিবীর কবি। ধ্রুবপুত্র উপন্যাস রচনার মূলসূত্র এখানে"।[২]

মহাকবি কাব্যে কি শুধুই কল্পনার মেঘ-বর্ষণ দিয়ে অবন্তিকে যৌবনস্বরূপার রূপ দিয়েছিলেন? এই কৌতূহল থেকেই 'ধ্রুবপুত্র'উপন্যাসের পরিকল্পনা। গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্যতিনি বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়ন করেছেন। এমনকি তিনি একাধিকবার অলকাপুরীর অলি-গলিতে ঘুরেও বেড়িয়েছেন।

ঔপন্যাসিক তথাকথিত অতীতের পথে না চলে নিজ চোখে দেখা উজ্জয়িনীকে এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেখেছেন মাঠ-ঘাট শুকিয়ে কাঠ, জলশুন্য জলাশয়ের পদ্ম গেছে হারিয়ে ; ভুলেছে ময়ূর নৃত্য করতে।নগরের সুন্দরী দরিদ্র যুবতীদের ধরে আনা হয় মন্দিরের দেবসেবার নামে।কিন্তু ভণ্ড পুরোহিত নিজের বিকৃত যৌনলালসা মেটাতে পবিত্র মন্দিরকে বেশ্যাপল্লীর স্তরে নামিয়েছে।তাছাড়া যেখানে

জ্ঞানের উর্ধ্বে অর্থ-প্রতিপত্তি-জাতপাত এর অবস্থান। সেখানে মূল্যবোধের অবক্ষয় অবধারিত। বণিক শুভগ দত্ত সমান্তরাল কায়েমি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় গোপনে। রাজভ্রাতা বিক্রমকে প্রশ্রয় দিয়ে রাজপাট দখল করার কৌশল চালিয়ে যায়। অর্থদাস উতঙ্ককে দিয়ে নগরে ত্রাসের সৃষ্টি করে। শূদ্র-পল্লীতে অগ্নিসংযোগ ঘটায়। ধ্রুবপুত্রকে রাস্তায় ফেলে পেটায়। অর্থাভাবে পিতা-মাতা সন্তান বেচে। গণিকালয়ে নিষ্ঠুর কামুকতায় হিংস্র হয়ে ওঠা মুখোশধারীদের নারীর প্রতি হীন দৃষ্টিভঙ্গি, হুণ আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া বীর যোদ্ধা কার্তিককুমারের পরিবারকে রাষ্ট্র সহানুভূতির বদলে বারে বারে আঘাত করেছে। এমনকি স্ত্রী, কন্যাও পিতাকে নিগৃহীত হতে হয়েছে। নিম্নশ্রেণির মানুষ ও নারীর অবস্থান সম্বন্ধে উপন্যাসে বলা হয়েছে—

"নারী এবং শূদ্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম কী? শূদ্রের জন্ম যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যর দাসত্ব করতে নারী জন্ম তো পুরুষের ভোগ্যা হতে। সমস্ত নারী যেন শূদ্রাণী। শূদ্রকে স্পর্শ করা যেমন অশৌচকর্ম, শূদ্রানীকে ভোগ করা তা নয়। দেবদাসী তো শূদ্রাণীর মতোই এক নারী। তার ভাগ্য ভালো রাজা তাকে ভোগ করেছেন মাত্র। শিয়াল কুকুর দিয়ে ভক্ষণ করাননি"।[৩]

একদিকে অনাবৃষ্টি, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট ; অন্যদিকে মনুষ্যত্বহীন লোভীদের হিংসা-লালসা-দুর্নীতি, কালোবাজারি সহ সার্বিক অজ্ঞানতা, সমাজকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়—- তথাকথিত স্বপ্নরাজ্য উজ্জয়িনীকে। তাই লেখক সেই ঐতিহাসিক মিথকে ভেঙ্গে মানুষের নির্মিত সংকটের নিরসনে ভক্তিভাব নয়, শিক্ষা ও জ্ঞানেরপ্রতীক রূপে ধ্রুবপুত্রের আগমণ প্রতীক্ষাকে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন। কেবল ধ্রুবপুত্রের প্রতীক্ষা নয়, অন্যান্য প্রতিটি প্রতীক্ষাতে যেমন—বৃদ্ধ শিবনাথের পুত্র কার্তিককুমারের প্রতীক্ষা, ধ্রুবপুত্রের জন্য গন্ধবতীর প্রেমরপ্রতীক্ষা, রাজভ্রাতা বিক্রমের সিংহাসনের প্রতীক্ষা, ইত্যাদির প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করাতে চেয়েছেন। যেখান থেকে সংকটের মুক্তি ঘটেছে শেষ পর্যন্ত এবং অকারণ প্রতীক্ষার মোহভঙ্গও হয়েছে। কর্মজীবনের প্রায় শুরুর দিকে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়,শালতোড়া এলাকার গ্রীষ্মের জলকষ্ট তাঁর মনে যে গভীর প্রভাব রেখেছিল, তিনি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তা স্বীকার করেছেন।বাঁকুড়া পুরুলিয়ার এইসুখা-অঞ্চলের জলকষ্টকে তিনি ধ্রুবপুত্র সহ বিভিন্ন উপন্যাসে স্থাপন করেছেন।

উপন্যাসের বিষয় নির্মাণে লেখক যাত্রা শুরু করেছিলেন কালিদাসের রোমান্টিক উজ্জয়িনী, শিপ্রা, রেবা নদীসহ মহাকাল মন্দির আর অলকাপুরী স্বপ্ন-রাজ্যের সময় থেকে। কিন্তু সময় প্রবাহকে অতীত থেকে বর্তমান বাস্তবতায় নামিয়ে এনে, কল্পনার মিশ্রণে উপন্যাসে প্রাধান্য দিলেন শাসকের নির্মমতায় বিপন্ন নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে। যেখানে প্রকৃতি আর শাসকের শোষণযন্ত্রের সাঁড়াশি আক্রমণ ধ্বংস করতে চায় নিচের তলার মানুষকে। আর এই সামাজিক অরাজকতা, প্রকৃতির রুষ্টতা যেন ধ্রুবপুত্রকে নগর থেকে নিষ্কাশনই একমাত্র কারণ বলে সবাই বিশ্বাস করতো। কেননা প্রতিবাদী ধ্রুবপুত্র ছিল, জ্ঞান, চেতনা ও সৃষ্টির প্রতীক। তাই উপন্যাসের শেষদিকে ধ্রুবপুত্রের আগমনে বৃষ্টি নেমেছে, শাসকের চেতনাও ফিরেছে। এই উপন্যাসে তাই ধ্রুবপুত্রের জন্য প্রতীক্ষা যেন—বৃষ্টির-সৃষ্টির-জ্ঞান-চেতনার প্রতীক্ষা।বৃষ্টিরজন্য এই প্রতীক্ষা যেমন অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে, আগামীদিনেও থাকবে।

'অশ্বচরিত' উপন্যাসের কাহিনির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক প্রচ্ছদপটে 'বুদ্ধচরিত' এর চতুর্দশ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন-

'পুনঃ কুমারোবিনিবৃত্যইত্যথোগবাক্ষমালাঃ প্রতিপেদিরেহঙ্গনাঃ।
বিবিক্ত পৃষ্ঠাংচনিশাম্য বাজিনংপুনর্গবাক্ষাণি পিধায়চুক্রুশুঃ'।।[৪]

রাজকুমার গৌতম মহাতপস্যার জন্য তপোবনে চলে যান। দীর্ঘ অপেক্ষার পর তাঁর প্রিয় অশ্ব কন্থক সারথি ছন্দককে রেখে শূন্যপৃষ্ঠে ফিরে আসে নগরে।

প্রায় আড়াই'হাজার বছর পূর্বের মিথ হয়ে থাকা এই পৌরাণিক সময়কটিকে চুম্বক করে অমর মিত্র তাঁর অশ্বচরিত উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ করেন। লেখক দীঘার সমুদ্রপাড়ে এক হোটেলে থাকার সময় বুদ্ধের জন্মতিথি পূর্ণিমার দিনে হোটেল মালিক শ্রীপতির পালিত ঘোড়াকে নিরুদ্দেশ হতে দেখেন। বন্ধ জুটমিলের কাজ হারানো ভানুদাস ঐ ঘোড়াটির পালক। ভানু ঘোড়ার অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে পাড়ি দেয়। অমর মিত্রর কল্পনায় এই নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়াটি যেন পৌরাণিক সময়ে একা ছেড়ে আসা সারথি গৌতমকে ফিরিয়ে আনতে যায়।সময় থেকে সময়ান্তরে অশ্বেরএই যাত্রাকে নিয়েই 'অশ্বচরিত' উপন্যাস। লেখক অদ্ভুতভাবে নিজের পুরাণ-ইতিহাসবোধ, কল্পনা আর লেখনীর মায়াজালেসময়সীমার বেড়া ভেঙ্গে বাস্তব অবাস্তবের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যান জাদু-বাস্তবতার জগতে।

ছিন্নমূল ভানুদাস আর শ্রীপতির নিতান্ত এক জীর্ণ সাধারণ ঘোড়াটিকে উপন্যাসে অসাধারণ রূপে বর্ণনা করে লেখক পাঠককে বিভ্রান্ত করেন–

"ছিল পক্ষীরাজ হয়ে গেল কন্থক। ছিল ভানুচরণ, ভানুদাস হয়ে গেল ছন্দক।"[৫]

নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়ার খোঁজে ভানু মর্পোঁছে যায় কিংবদন্তির জাহাজঘাট থেকে রকেট উৎক্ষেপণের কেন্দ্র হয়ে সুবর্ণরেখার মিলনস্থল বঙ্গোপসাগরের চরভূমি- যেখানে স্বপ্নতাড়িত ঘোড়ারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে ছুটে যায়, সেখানেও নেই। আসলে শূন্যপৃষ্ট এই অশ্ব যেন অশ্বমেধের ঘোড়া। যাকে অনুসরণ করছে হত্যাকারীরা, নিঃশব্দে নিশ্চুপে। উপন্যাসে লেখক ঘোড়ার পিছনে দৌড়ানো ভানুর চোখ দিয়ে দেখাতে চান বর্তমান ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত যাত্রাকে। কারণ এই নিখোঁজ ঘোড়া যে হিংসার বিষবাষ্পে ঢাকা পড়েছে। হিরোশিমার তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে আটকে পড়া ঘোড়ার চোখ গলে পড়ছে। খসে যাচ্ছে দেহ। প্রবল চেষ্টাতেও সে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ, তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। যেভাবে বর্তমানে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে গোপন মারনাস্ত্র মজুত করছে, নিজেকে এবং অপরকে ধ্বংস করতে। বর্তমান বিশ্বের হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার রাজনীতির কুফল হিসেবে ভবিষ্যত কালের সম্ভাব্য পরিণামকে চিনিয়ে দিতে চান লেখক। চিনিয়ে দিতে চান আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতায় বিবেকহীন সমাজ, শোষকরূপী শাসক আর ঘৃণ্য রাজনীতিতে শ্রমজীবী মানুষের অসহায়তাকে। ভানুর চলার পথে পাঠকও এই যাত্রায় সামিল হয়ে ভানুর চোখ দিয়ে দেখে- সরকারের জমি অধিগ্রহণের ভ্রান্ত নীতি, রাষ্ট্রের সম্পদের অসমবন্টন, নারীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ।

সমাজসচেতন শিল্পী অমর মিত্র তাই লেখনীর মাধ্যমে যেন প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে রাষ্ট্রের যত অব্যবস্থা, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে উল্লেখ করে অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি পূর্ণিমার দিনে পোখরানে পরমাণু নিষ্ক্রমণের শব্দে ভীত-সন্ত্রস্তয়ে ঘোড়াটি নিরুদ্দেশ হয়েছিল, সেনির্বাণ লাভ করেতে যাওয়া মহাতপস্বী গৌতমবুদ্ধকে ফিরিয়ে আনতেই গিয়েছিল।কেননা ষড়রিপু জর্জরিত চেতনাহীন এই সমাজকে প্রকৃত জীবন দর্শন, জ্ঞান ও প্রেমের দীক্ষা দিয়ে পুনরায় সুস্থ-সমাজ গড়তে গৌতমবুদ্ধর মতো কোন মহামানবকে আজকে বড় প্রয়োজন।

এখানে বন্ধ কারখানা শ্রমিক ভানুদাসের স্মৃতি যেন আড়াই' হাজার বছরের স্মৃতি। এই স্মৃতি প্রবাহমান সমাজ, সভ্যতার স্মৃতি। গৌতমবুদ্ধের প্রসঙ্গ আর খণ্ড সময় থেকে মহাসময়ের যাত্রার মধ্যেই লেখকের অভিপ্রায়টিও নিহিত আছে।

'ধনপতিরচর' উপন্যাসে লেখক তাঁর বর্তমান সময়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতে এক মায়াবী কল্পিত চরের আবিষ্কার করেছেন।হাজার হাজার বছরের পুরনো মিথ, লোকাচার, রূপকথা ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে, বেদ-পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের সময়কালকে মিলিয়ে দিয়েছেন বর্তমান সময়ের সঙ্গে।

ভূমি দপ্তরের কর্মসূত্রে সুন্দরবনের গোসাবায় কদিনের জন্য জম্বুদ্বীপে ছিলেন। বজবজে ইণ্ডিয়ান অয়েলের প্ল্যান্ট নির্মাণের সময় উর্বর দ্বি-ফসলী জমি অধিগ্রহণের জন্য নিজে গিয়েছিলেন। সেখানে সাধারণ মানুষ ও অস্থায়ী মৎস্যজীবীদের সরকার কর্তৃক নির্মমভাবে উচ্ছেদের বিষয়টি লেখকের মর্মে আঘাত করেছিল।সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন—

"আমি ১৯৯৪-৯৫ সালের কথা বলছি। কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। ভিটে-মাটি চলে যাচ্ছে তো। তখন এক বৃদ্ধাকে দেখলাম ।.... আমার কাছে ছুটে এসে আছড়ে পড়লেন।'আমার ভিটে-মাটি রক্ষে কর বাবা'-সে ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু ওই আর্তনাদ আমাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছিল। সারাদিন মন খারাপ করে কাজ দেখলাম, বিকেলে ফেরার পথে মনে হলো কাঁথা-মাদুর নিয়ে বুড়িমা পালাচ্ছেন, যদি গ্রামখানি নিয়ে পালাতে পারতেন?"[৬]

নিজে সাতবছর বয়সে মা-বাবার হাত ধরে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এদেশে এসেছেন।তাই জন্মভিটে হারানোর দগদগে ঘা তাঁর স্মৃতিতে লালিত। তাই এই যন্ত্রণা যেন নিজেরেই।এখান থেকেই কল্পনায় ডুব দিয়ে তুলে আনলেন ধনপতির চরকে।

ধনপতি নামটি শুনে চন্ডীমঙ্গলের ধনপতির কথা স্মরণে আসে। যদিও কাহিনি আলাদা। সুদূর লিসবোঁয়া থেকে পর্তুগিজ জলদস্যুরা লুট, বাণিজ্য করতে এসেছিল। এই ধনপতি সেই দস্যু পেদরুর বংশধর। কবে কোন কালে এসেছিল, তাঁর নিজেরও মনে নেই। সে কিনা বাদশাহকে ধনরত্ন দিয়ে এই চর লাভ করেছিল। বাণিজ্যে লক্ষীলাভ করা মঙ্গলকাব্যের ধনপতির সঙ্গে উপন্যাসের ধনপতির কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে এখানে। বর্তমানে কাছিমের পিঠে এই চর নিয়ে সে ভেসে আছে। বৈদিক সাহিত্যে আছে—ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য নিজে কূর্ম অবতার ধারণ করে, ডুবন্ত পর্বতকে পিঠে করে তুলে, কচ্ছপ-রূপে নিরাপদে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাগবত ও মৎস্য পুরাণেও এই কূর্ম বিষ্ণুর কাহিনি বিদ্যবান।

কাছিমের পিঠে ভেসে থাকা এই চরটিতে বাসা বেঁধেছে ছিন্নমূল নারী পুরুষরা। বাইরে থেকে মৎস্যজীবীরা এই চরে এসে ছয় মাসের পৃথিবী গড়ে তোলে। জেলেদের কাছ থেকে পুলিশ, সরকার নানান আছিলায় চাঁদা তোলে। তবুও সরকারের নজর পুরো চরটিকে আয়ত্ত্ব করার। কখনো যদি কাছিমটি সরে যায়, তলিয়ে যাবে পুরো দ্বীপটি ; তা সত্ত্বেও সরকার মেতে ওঠে দ্বীপটিকে দখল নিতে।উর্দিধারীদের নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতায় অসহ্য হয়ে চরের নারীরা কাছিমকে জাগ্রত হওয়ার প্রার্থনা করে। শেষ পর্যন্ত কাছিম জেগেছিল এবং সমগ্র দ্বীপকে নিয়েই নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

এভাবেই উপন্যাসে কাহিনিতে বর্তমান সময়ের সরকারি আগ্রাসনে চরের জন-জীবনের বিপন্নতাকে আঁকতে গিয়ে লেখক অতি প্রাচীন বেদ, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, ও লোককথা ইত্যাদির কাহিনি ও সময়ের আশ্রয় নিয়েছেন।তাই উপন্যাসের সময় ও কাছিমের মতো'ই যেন বারবার ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে।

অমর মিত্রের উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণের বৃহত্তর অংশ জুড়ে রয়েছে তার সমসাময়িক নানান অভিজ্ঞতা। কিন্তু সমসময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে স্বচ্ছন্দ নন তিনি। তাই বারে বারে বর্তমানের খণ্ড-সময়কে মিলিয়ে দিয়েছেন মহাসময়ের কাঠামোতে। তবে সময়ের চেনা ছন্দে নয়, বরং কালানুক্রমকে আগে-পিছিয়ে ফ্রেম ভেঙ্গে দিয়ে কাহিনিরজাল বুনেছেন। তার সহায় হিসেবে আশ্রয় নিয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় অতীত ঐতিহ্য, মিথ, পুরাণ এবং লোকজ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে। তাই উপন্যাসে আমরা বারে বারে দেখি—তিনি সময়কালকে জাদুর মতো করে একটি সুতোয় গেঁথে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান। কাহিনি সময় বিন্যাস সম্পর্কে নিজেইবলেছেন-

"যতক্ষণ পারি নিজের চারপাশ, সমকাল, সমকাল থেকে উত্তীর্ণ কাল প্রবাহের কথা লিখতে চাই। এই দেশ, দেশ-কাল, আমার চারপাশের নিরুপায় মানুষকে আমি পারিনা এড়াতে"।[৭]

আসলে তিনি সমকালকে নিজে চিনতে ও পাঠককে চেনাতে চান মহকালের আধারে। তিনি প্রমাণকরতে চেয়েছেন—সময়বদলায়, কিন্তু আখ্যান না বদলায়, না পুরাতন হয়।নতুন ভাষা, শব্দ ও নতুন আঙ্গিকে বারেবারে ফিরে আসে নতুন রূপে। তাই অমর মিত্রের উপন্যাসে এই সময় স্থির থাকেনি। আখ্যানের কাহিনিও সময় থেকে সময়ান্তরে পাড়ি দিয়েছে বলাই যায়।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, অমর,'পাহাড়ের মত মানুষ', দে'জ প্রকাশন, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা. ১৯
২. মজুমদার, সমীরণ(সম্পাদক), অমৃতলোক পত্রিকা, অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা,মার্চ২০০৩, সংখ্যা ৯৭, পৃষ্ঠা.৩১৫
৩. মিত্র, অমর,'ধ্রুবপুত্র', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা০৯, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৪, পৃষ্ঠা. ১০৮
৪. মিত্র, অমর,'অশ্বচরিত', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, প্রচ্ছদ অংশ
৫. তদেব, পৃষ্ঠা. ১
৬. দাশগুপ্ত, রাহুল(সাক্ষাৎকার), মুখোমুখি অমর মিত্র, চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা০৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৪, পৃষ্ঠা. ৫৬
৭. তদেব, পৃষ্ঠা.৫১

....